নবজীবন।

১ম ভাগ।] শ্রাবণ ১২৯১। [১ম সংখ্যা।

সূচনা।

যাহা সকলেই বুঝেন, তাহা বুঝাইতে যাওয়া ঘোরতর বিড়ম্বনা; জানিয়া শুনিয়া সে বিড়ম্বনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন দেখি না। সুতরাং বঙ্গভাষায় আর একখানি উচ্চ-অঙ্গের সাময়িকপত্র প্রকাশিত হওয়া, যে এই সময়ে আবশ্যক হইয়াছে, তাহা আর নাই বুঝাইলাম। তবে আর বলিব কি? বলিবার কথা অনেক আছে।

আর একখানি উচ্চ-অঙ্গের সাময়িকপত্রের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু এত দিন ধরিয়া যে ভাবে সাময়িক পত্র সকল চলিতেছিল, সেইরূপ পত্রেই কি বর্ত্তমান বাঙ্গালির অভাব পূরণ এবং মানসিক তৃপ্তিসাধন হইবে? আমাদের তাহা বোধ হয় না। বাঙ্গালির হৃৎক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত। যখন তত্ত্ববোধিনী প্রকাশিত হয়, সেই এক যুগ; বিবিধার্থ সংগ্রহ, আর এক যুগ; বঙ্গদর্শন প্রভৃতির আবির্ভাবে তৃতীয় যুগ; এখন আবার যুগান্তর উপস্থিত। নূতন দিকে বাঙ্গালির দৃষ্টি পড়িয়াছে; বঙ্গবাসী নূতন অভাব অনুভব করিয়া, অভিনব পথে অগ্রসর হইতে উদ্যত; বাঙ্গালি আজি কালি নব উৎসাহে উৎসাহিত; আমরা এই উৎসাহের উৎসবে যোগ-দান করিতে সংকল্প করিয়াছি। আমরা বিবেচনা করি-

ভেছি, এই কথাটি একটু বিস্তৃত ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। আরও দশবিধ কারণে আমরা এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, কিন্তু সে সকল কথার বোধ হয় কৈফিয়ৎ না দিলেও চলিবে।

ভারতবাসী চিরদিনই ধর্ম্মব্রত। পাশ্চাত্য সভ্যতা আলোকের প্রতিবিম্ব পাইয়া প্রথমে ভারতবাসী ধর্ম্মের নাম লইয়া গাত্রোত্থান করিল। ধর্ম্মের কথাই কহিতে লাগিল। খ্রীষ্টানের একেশ্বরবাদের কথা শুনিয়া আপনাদের প্রাচীন বৈদান্তিক এবং তান্ত্রিক একেশ্বরবাদ গৌরবে প্রচার করিল। মহাত্মা রামমোহন রায় অবতীর্ণ হইলেন। দেশীয় ও বিলাতীয় একেশ্বরবাদে ঘোরতর বিতর্ক চলিতে লাগিল; ইংরাজি ও বাঙ্গালায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মপুস্তিকা প্রচারিত হইল। আন্দোলনে বাঙ্গালা মাতাইয়া মহাত্মা স্বর্গারোহণ করিলেন; ঝঞ্ঝাবাত্যা থামিল; তরঙ্গ কমিয়া আসিল; কিন্তু স্রোত চলিতেছে। সেই স্রোতের বাহিনী—তত্ত্ববোধিনী। সুতরাং প্রথম প্রথম তত্ত্ববোধিনী, কেবল ধর্ম্ম কথাতেই পরিপূরিতা। আমাদের দেশে কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব একটু না বুঝিলে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝা কঠিন; কাজেই তাহাতে প্রত্নতত্ত্ব আসিল; ক্রমে দেহতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব আসিয়া পড়িল; চারুপাঠের ভ্রূণ তত্ত্ববোধিনী-গর্ভে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; যুগ হইতে যুগান্তর এই রূপেই হয়। য়ুরোপীয় ধর্ম্ম-হীন বিজ্ঞান ক্রমেই দেশে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল; ধর্ম্মের স্রোত মন্দা হইল, তত্ত্ববোধিনীর তত্ত্ব কথা আর কেহ পাঠ করিল না। তত্ত্ববোধিনীতে যে সকল প্রাণীতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাহাই সাধারণে পাঠ করেন।

পদার্থতত্ত্বে প্রবেশ করিতে করিতে বঙ্গবাসীর ভূগোল ইতিহাসের বুভুক্ষা হইল; এই বুভুক্ষা নিবারণের জন্যই বিবিধার্থ সংগ্রহের অবতারণা। বাঙ্গালিকে নূটকা জাতির অবস্থা পর্য্যন্ত, নোবাজেম্‌ব্লা দ্বীপের বিবরণ পর্য্যন্ত,—শুনান হইল; বাঙ্গালি মগধ, কাশ্মীরের ইতিহাস শুনিল, রাজপুতগণের কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণ করিল; বহুকালের পতিত ক্ষেত্র স্থানে স্থানে কর্ষিত হইল; জাতি-ভক্তি বীজের এখানে সেখানে অঙ্কুর দেখা দিল। বাঙ্গালি তখন অল্প স্বল্প জ্ঞান লাভ করিয়া উপদেশ লাভের জন্য ব্যস্ত হইল।

বঙ্গদর্শন এই উপদেষ্টা বন্ধু ভাবে জন্ম গ্রহণ করিলেন। বঙ্গদর্শন, বান্ধব, আর্য্যদর্শন, ভারতী—উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষক; ইহাঁদিগকে কাণে-কলম-দেওয়া পাখীর কথা বলিতে হয় নাই; জল জমিলে বরফ হয়, বুঝাইতে

হয় নাই ; ভারতচন্দ্রের জীবনী বা রত্নাবলীর কেবল গল্প ভাগ বাঙ্গালিকে শিখাইতে হয় নাই। বঙ্গদর্শন প্রভৃতি উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র পাইয়া উচ্চতর উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। বঙ্গদর্শন প্রভৃতিতে বালকের প্রলোভন চিত্র ছিল না, বালকের শিক্ষণীয় ইতিহাস ভূগোল ছিল না। বঙ্গদর্শনের উদয়ে, বাঙ্গালি-জীবনে, ও বঙ্গসাহিত্যে আবার যুগ প্রলয় হইল।

বাঙ্গালি কোম্‌তের প্রত্যক্ষ বাদ, ডার্ব্বিনের পরিণাম বাদ, রুষোর সাম্য বাদ, মিলের হিতবাদ ও স্বৈর বাদ, সাংখ্যের দ্বৈত বাদ, বেদান্তের মায়াবাদ, হিন্দুর অদৃষ্ট বাদ, এ সকলই বঙ্গদর্শন প্রভৃতি হইতে শিখিতে লাগিল। পাশ্চাত্য সংঘর্ষণে যে জ্ঞান আত্ম দর্শনে উদ্ভূত হইয়া প্রথমে তত্ত্ববোধিনীতে বিকশিত হইয়াছিল, তাহাই ক্রমশ পুষ্টিতে জগৎ সংসার ব্যাপিয়া লইল ; মহতী বিস্তৃতি লাভ করিল। বঙ্গদর্শন প্রভৃতি বাঙ্গালিকে স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতলের কথা গভীর আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার মত ধীরে ধীরে শিখাইয়াছে। জাপানের বাক্সর মত, পলাণ্ডুর কোষের মত যে আধ্যাত্মিক জগতের, স্তরের নীচে স্তর আছে, তাহা বঙ্গবাসীকে বঙ্গদর্শনই দেখাইয়াছেন। পুরাণে, ইতিহাসে,—দেবতত্ত্বে, সমাজতত্ত্বে,—কবিত্বে, সাহিত্যে,—সর্ব্বত্রই যে স্তরের নীচে স্তর আছে, বঙ্গদর্শন আজি বার বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত তাহাই দেখাইয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন পৌরাণিক মহাদেবতার অন্তর স্তরে, যে, বৈজ্ঞানিকের স্বীকৃত তিনটী জড়শক্তির ভাব রহিয়াছে, কৃষ্ণ-চরিত্রের বাহ্যকোষ ভেদ করিলে, যে একটী মহান্ পুরুষ তন্মধ্য হইতে আবির্ভূত হন, দ্রৌপদীকে অন্তর্বীক্ষণে দেখিলে, যে একজন মহতী তেজস্বিনী আর্য্যরমণী দেখিতে পাওয়া যায়, দশ মহাবিদ্যার পৌরাণিক স্তর ভেদ করিলে, যে ভারতের অবস্থান্তর পরিণাম বুঝিতে পারা যায়, এ সকল কথার উপদেষ্টা বঙ্গদর্শন। বঙ্গদর্শনই বুঝাইয়া দিয়াছেন, যে, পূর্ব্বতন সময়ের জন শ্রুতির স্তর ভেদ করিলে, মাতৃগুপ্তই কালিদাস ; মধ্যকালে যাহা ভারত-কলঙ্ক বলিয়া মনে ধারণা করিয়াছ, ইতিহাসের সূক্ষ্ম অস্ত্র লইয়া সেই কলঙ্ক ব্যবচ্ছেদ করিলে দেখিবে, তাহাই ভারত-গৌরব। এমন কি, সে দিন যাহা শুনিয়াছিলে জালপ্রতাপের অত্যাচার, সেটি কেবল আসল ইংরেজের অবিচার। বঙ্গদর্শন দেখাইয়াছেন, যে কোম্‌তের মহামনু—পুরাণের নারায়ণ; কারলাইলের

অশ্রান্ত পরিশ্রমই—হিন্দুর প্রকৃত বৈরাগ্য। কবিত্ব সাহিত্যর স্তরোদ্ঘাটন করিয়া বঙ্গদর্শন দেখাইয়াছেন, যে, কুমার-সম্ভবের শিব পার্ব্বতী অনন্ত জগতের অনন্ত কালের পুরুষ প্রকৃতি; দেখাইয়াছেন, যে, কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল একখানি গূঢ় সমাজতত্ত্বের গ্রন্থ; দুষ্মন্ত—কঠোর রাজ-ধর্ম্মের সহিত, দৃঢ় নিবিষ্ট সমাজধর্ম্মের সহিত—মনুষ্যের ব্যক্তিগত প্রকৃতির ঘোরতর সংঘর্ষণ। স্তরোদ্ঘাটন ব্যাপারে বঙ্গদর্শনের সামান্য বিষয়েও উপেক্ষা ছিল না। বঙ্গদর্শন বুঝাইয়াছেন, যে বাঙ্গালির আহার ভুষি, আমোদ বিভীষিকা। রামচন্দ্র বনে গেলে দশরথ বেহালা বাজান, কৌশল্যা নৃত্য করেন। অথচ সেই বাঙ্গালিরই সামান্য তাসের খেলায় নব-মনুসংহিতার বর্ণাশ্রম ও গৃহাশ্রম তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে।

বঙ্গদর্শনের এই যুগব্যাপী উপদেশের ফল ফলিয়াছে। এখন আমরা সকল বিষয়েরই অন্তঃস্তর দর্শন করিতে ব্যগ্র হইয়াছি। এই ব্যগ্রতায় যুগান্তর উপস্থিত।

স্তরোদ্ভেদ করিবার অভ্যাস বশত আমরা যেন ক্রমেই একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি, যে, সকল প্রকার স্তরের অন্তরে অন্তরে, একটি সাধারণ স্তর আছে। মানব-তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব,—জড়তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব,—পুরাণ, ইতিহাস—কবিত্ব, সাহিত্য—শ্রদ্ধা, ভক্তি—সকল স্তরের অন্তরে একটী মহান্ ও বিশাল স্তর, সকলের আধাররূপে, আশ্রয়-স্বরূপ হইয়া, অবলম্বনভাবে বিরাজ করিতেছে। সেই আধারের সহিত আধেয় সকলের সম্বন্ধ না বুঝিলে, কি অবলম্বনে জীবতত্ত্বাদি অবস্থিত, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে, কোন বিষয়েই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হওয়া অসম্ভব। এই যে সমুদ্রে কত জীব জন্তু, কত রত্নরাজি, কত পাহাড়, পর্ব্বত, কত প্রকার শৈবালদাম রহিয়াছে, সে সকলের আকৃতি প্রকৃতি বুঝিতে গেলে আমরা কি সমুদ্রের সহিত ঐ সকলের কি সম্বন্ধ তাহা না ভাবিয়া পরিষ্কারভাবে কিছু বুঝিতে পারি? তাহা পারি না। লবণাম্বু মধ্যে বাস করে বলিয়া, সাগরচর জীবগণের রক্ত মাংস কিরূপ বিশেষ গুণযুক্ত হয়, সাগরের অন্তঃপ্রবাহ তরঙ্গাভিঘাতে পাহাড় পর্ব্বতের গঠন কিরূপ বিভিন্ন হইয়া থাকে, জলমধ্য হইতে বায়ু নিষ্কাশন করিয়া কিরূপে জীবগণ নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সমাধান করে, সামান্য উত্তাপে, আলোক অভাবে জলতলে শৈবালাদি কি কৌশলে বর্দ্ধিত হয়,—ইহার কোন একটি কথা বুঝিতে হইলেই,

অগ্রে সমুদ্রের প্রকৃতি এবং কৃতি বুঝিতে হইবে; যেরূপ সমুদ্রতত্ত্ব উপেক্ষা করিয়া সাগর-চর জীবাদির আকৃতি বা প্রকৃতি সম্যক বুঝিতে পারা অসম্ভব, সেইরূপ যে বিশাল মহান্ স্তর সমাজতত্ত্বাদির আশ্রয় স্বরূপ, অবলম্বন স্বরূপ হইয়া ঐ সকলকে গর্ভে ধারণ করত অনবরত উহাদের পুষ্টিসাধন, অবস্থা পরিবর্ত্তন, এবং ক্ষয়সাধন করিতেছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া,—সেটি যে অবলম্বন এবং আশ্রয়, কিয়ৎ পরিমাণে উপাদান এবং হেতু, তাহা না বুঝিয়া,—সেইটিই সকল তত্ত্বের সারতত্ত্ব—সম্পূর্ণরূপে না হৌক, কিন্তু অংশ ত সকল তত্ত্বের একেবারে সমবায়ী, অসমবায়ী এবং নিমিত্ত কারণ, ইহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া,—কোনও তত্ত্বের কথা কহিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। চিন্তাশীল বাঙ্গালি দেখিতে দেখিতে এই অন্তরস্তরের আভাস পাইয়াছেন। একটু একটু বুঝিতেছেন, যে, সেই মূলীভূত সারস্তরের কথা উপেক্ষা করিয়া সাম্যবাদ বা বৈষম্যবাদ, বিতর্কবাদ বা স্থিতিবাদ, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। সেই বিশাল মহান্ আশ্রয়-স্তরের নাম—ধর্ম্ম। নবযুগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি একটু একটু বুঝিতেছেন, যে, ধর্ম্মে উপেক্ষা করিলে আমরা কোন তত্ত্বই বুঝিব না, আমাদের কোন উন্নতিই হইবে না।

এত দিন পরে আমরা এই ভাবের আভাস পাইয়াছি মাত্র; ধর্ম্মের বিশোদর ভাব যে আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, সে ভ্রম বা স্পর্দ্ধা আমাদের নাই। নিয়মিত রূপে সাময়িক পত্রে এই বিষয়ের চর্চ্চা করিয়া, আমরা আপনারাও বুঝিব, এবং সাধারণকে বুঝাইব, এ আশা আমাদের হৃদয়ে আছে। আজি কালি বঙ্গদেশে যে অস্ফুটশক্তি বিকাশোন্মুখী হইয়া নব-মুঞ্জরিত বঙ্গ-সমাজ-পাদপে একটু একটু দেখা দিতেছে, যদি আমাদের দুর্ব্বল চেষ্টায় দশ দিনের জন্যও শীত বাতাতপ হইতে, কীট পতঙ্গ হইতে, তাহা সুরক্ষিত হয়, তাহা হইলেও আমরা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব। সিদ্ধি, মানবের সাধ্যায়ত্ত মধ্যে নহে। তবে সাধনা করিতে আমরা পারি বটে। সকলে বলুন, এই সাধনায় যেন আমাদের জ্ঞানকৃত ত্রুটি না হয়।

ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা।

শিষ্য। মহাশয়! আজ আপনাকে যে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিব, শুনিয়া আমাকে ঘৃণা করিবেন না। অনেকে অনেক কঠিন বিষয় আয়ত্ত করিয়াও, অতি সহজ ব্যাপার বিনা-উপদেশে বুঝিতে পারে না। আমি তাহারই এক জন।

গুরু। প্রশ্নটা কি?

শিষ্য। ধর্ম্মে কিছু কি প্রয়োজন আছে?

গুরু। ইহার কি কোন উত্তর কোথাও শুন নাই?

শিষ্য। শুনিয়াছি। যথা—ধর্ম্মে পরকালে উপকার হয়।

গুরু। সেটা কি সদুত্তর নয়?

শিষ্য। যে পরকাল মানে তাহার পক্ষে এটা সদুত্তর হইলে হইতে পারে। কিন্তু যে পরকাল মানে না? তাহার পক্ষে কি ধর্ম্মে কি কোন প্রয়োজন নাই?

গুরু। যে পরকাল মানে না, এমন একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর, শোন সে কি বলে?

শিষ্য। সে বলিবে ধর্ম্মে প্রয়োজন আছে। কেন না ধর্ম্মে আস্থাশূন্য বলিয়া কেহই আপনাকে পরিচিত করিতে সম্মত নহে।

গুরু। বাপু হে, ধর্ম্ম কথাটা লইয়া তুমি বড় গোলযোগ করিতেছ। কখন্ কোন্ অর্থে ইহা ব্যবহার করিতেছ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ধর্ম্ম শব্দের আধুনিক ব্যবহার-জাত কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তাহার ইংরেজি প্রতি-শব্দের দ্বারা আগে নির্দ্দেশ করিতেছি, তুমি বুঝিয়া দেখ। প্রথম, ইংরেজ যাহাকে Religion বলে, আমরা তাহাকে ধর্ম্ম বলি, যেমন হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম। দ্বিতীয়, ইংরেজ যাহাকে Morality বলে, আমরা তাহাকেও ধর্ম্ম বলি, যথা অমুক কার্য্য "ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ" "মানব ধর্ম্ম শাস্ত্র" "ধর্ম্মসূত্র" ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালায়, ইহার আর একটী নাম প্রচলিত আছে—নীতি। বাঙ্গালি একালে

আর কিছু থাকুক না থাকুক "নীতি বিরুদ্ধ" কথাটা চট করিয়া বলিয়া ফেলিতে পারে। তৃতীয়ত ধর্ম্ম শব্দে Virtue বুঝায়। Virtue ধর্ম্মাত্ম মনুষ্যের অভ্যস্ত গুণকে বুঝায়; নীতির বশবর্ত্তী অভ্যাসের উহা ফল। এই অর্থে আমরা বলিয়া থাকি অমুক ব্যক্তি ধার্ম্মিক, অমুক ব্যক্তি অধার্ম্মিক। এখানে অধর্ম্মকে ইংরেজিতে Vice বলে। চতুর্থ রিলিজন বা নীতির অনুমোদিত যে কার্য্য তাহাকেও ধর্ম্ম বলে, তাহার বিপরীতকে অধর্ম্ম বলে। যথা দান পরম ধর্ম্ম, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, গুরুনিন্দা পরম অধর্ম্ম। ইহাকে সচরাচর পাপপুণ্যও বলে। ইংরেজিতে এই অধর্ম্মের নাম "Sin"—পুণ্যের এক কথায় একটা নাম নাই—"Good deed" বা তদ্রূপ বাগ্‌বাহুল্য দ্বারা সাহেবেরা অভাব মোচন করেন। পঞ্চম, ধর্ম্ম শব্দে গুণ বুঝায়, যথা চৌম্বুকের ধর্ম্ম লৌহাকর্ষণ। এস্থলে যাহা অর্থান্তরে অধর্ম্ম, তাহাকেও ধর্ম্ম বলা যায়। যথা, "পরনিন্দা—ক্ষুদ্রচেতাদিগের ধর্ম্ম।" এই অর্থে মনু স্বয়ং "পাষণ্ড ধর্ম্মের" কথা লিখিয়াছেন, যথা—

"হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে, ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
যদ্যস্য সোহদধাৎ সর্গে তত্তস্য স্বয়মাবিশৎ॥"

পুনশ্চ—"পাষণ্ডগণধর্ম্মাংশ্চ শাস্ত্রেঽস্মিন্নুক্তবান্ মনুঃ"। অপি ষষ্ঠত ধর্ম্ম শব্দ কখন কখন, আচার বা ব্যবহারার্থে প্রযুক্ত হয়। মনু এই অর্থেই বলেন,—

"দেশধর্ম্মান্ জাতিধর্ম্মান্ কুলধর্ম্মাংশ্চ শাশ্বতান্।"

এই ছয়টি অর্থ লইয়া এ দেশীয় লোক বড় গোলযোগ করিয়া থাকে। এই মাত্র এক অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিয়া, পরক্ষণেই ভিন্নার্থে ব্যবহার করে; কাজেই অপসিদ্ধান্তে পতিত হয়। এইরূপ অনিয়ম প্রয়োগের জন্য, ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন তত্ত্বের সুমীমাংসা হয় না। এ গোলযোগ আজ নূতন নহে। যে সকল গ্রন্থকে আমরা হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহাতেও এই গোলযোগ বড় ভয়ানক। মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের শেষ ছয়টি শ্লোক ইহার উত্তম উদাহরণ। ধর্ম্ম কখন রিলিজনের প্রতি কখন নীতির প্রতি, কখনও অভ্যস্ত ধর্ম্মাত্মতার প্রতি, এবং কখন পুণ্য কর্ম্মের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে, নীতির প্রকৃতি রিলিজনে, রিলিজনের প্রকৃতি নীতিতে, অভ্যস্ত গুণের লক্ষণ কর্ম্মে, কর্ম্মের লক্ষণ অভ্যাসে

ন্যস্ত হওয়াতে, একটা ঘোরতর গণ্ডগোল হইয়াছে। তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ধর্ম্ম (রিলিজন)—উপধর্ম্ম সঙ্কুল, নীতি—ভ্রান্ত, অভ্যাস—কঠিন, এবং পুণ্য—দুঃখজনক হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুনীতির আধুনিক অবনতিও তৎপ্রতি আধুনিক অনাস্থার গুরুতর এক কারণ এই গণ্ডগোল।

শিষ্য। আমি এমন কি কথা বলিলাম, যে তাহাতে এ সকল বড় বড় কথা আসিয়া পড়ে?

গুরু। তুমি বলিলে, "ধর্ম্মে আস্থাশূন্য বলিয়া কেহই আপনাকে পরিচিত করিতে স্বীকৃত নহে।" এখানে তুমি নীতি অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিতেছ। আবার যখন জিজ্ঞাসা করিলে, "ধর্ম্মে কিছু প্রয়োজন আছে কি?" তখন তুমি রিলিজন অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিয়াছ?

শিষ্য। কিসে বুঝিলেন?

গুরু। নীতিতেই আস্থা-শূন্য বলিয়া কেহই আপনাকে পরিচিত করিতে স্বীকৃত নহে, ইহা সত্য। কিন্তু রিলিজনে যে আস্থা-শূন্য বলিয়া কেহ আপনাকে পরিচিত করিতে স্বীকৃত নহে, ইহা সত্য নহে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল, প্রকৃত ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। অথচ রিলিজনের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এইরূপ য়ুরোপীয় বিস্তর কৃতবিদ্য, ভাবুক, বিজ্ঞ, এবং সচ্চরিত্র লোক আছেন, তাঁহারা রিলিজনের আবশ্যকতা মানেন না। এ দেশীয় নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও এরূপ লোকের সংখ্যা বড় অধিক এবং তুমিও সেই সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াই আমাকে প্রশ্ন করিয়াছ "ধর্ম্মে কি কিছু প্রয়োজন আছে?"

শিষ্য। আপনি কেন মনে করেন না, যে আমি নীতিরই প্রয়োজন সম্বন্ধেই প্রশ্ন করিয়াছি।

গুরু। আমি তাহা মনে করিতে পারি না, কেন না নীতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে কেহই সন্দিহান নহে।

শিষ্য। যদি তাহাই হইবে, তবে এত দুর্ব্বিনীত লোক দেখিতে পাই কেন?

গুরু। দুর্ব্বিনীত মনে করে, যে আমার নীতির বশবর্ত্তী হইবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু সে কখন মনে করে না, যে আর সকলেরও নীতির বশবর্ত্তী হইবার প্রয়োজন নাই। চোর ইচ্ছা করে না, যে অন্যে

তাহার ধনাপহরণ করুক, নরঘাতী ইচ্ছা করে না, যে অন্যে তাহাকে খুন করুক, পারদারিক মনে করে না, যে অন্যে তাহার ভার্য্যাহরণ করুক। অতএব দুর্নীতেরাও নীতির প্রয়োজন স্বীকার করে।

শিষ্য। আপনি যে কয়টি উদাহরণ দিলেন, সে গুলি আইনের কাজ। হইতে পারে দুর্নীতেরাও ইচ্ছা করে না, যে আইন উঠিয়া যাক্, কেননা তাহা হইলে কেহই সমাজে বাস করিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে কি নীতির প্রয়োজন স্বীকার করা হইল?

গুরু। আইন নীতি মাত্র। ব্যবস্থাপক কর্তৃক বিধিবদ্ধ বা প্রচারিত যে নীতি, তাহাই আইন। এই কথা তলাইয়া বুঝিলে বুঝিতে পারিবে, যে মানবাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র—হিন্দু নীতি মাত্র, হিন্দু ধর্ম্ম নহে। তাহার বিপর্য্যায়ে, আচার ভ্রংশ ঘটিলে ঘটিতে পারে, ধর্ম্মচ্যুতি ঘটে না। কিন্তু সে পরের কথা। আইন নীতি; তাহার লঙ্ঘন সমাজ অথবা সমাজের মুখপাত্র রাজা দণ্ডিত করেন। আর কতকগুলি নীতি আছে, তাহা সমাজ বা রাজা দণ্ডিত করেন না, প্রকৃতি একাই তাহার দণ্ডপ্রণেত্রী। যথা, অধিক সুরা পান। রাজা ইহার দণ্ডবিধান করেন না। অনেক সমাজও ইহার দণ্ডবিধান করে না। মহাভারতে যদুবংশীয়দিগের ও অপরের মদ্যাসক্তির বর্ণনা যেভাবে প্রণীত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া বোধ হয়, অতিশয় মদ্যাসক্তি তখন সমাজ কর্তৃক দণ্ডিত হইত না। কিন্তু রোগ, অবনতি, ক্ষয় প্রভৃতি দণ্ডের দ্বারা প্রকৃতি এ পাপের দণ্ড করিয়া থাকেন। মহাভারতের কবিও সে কথা বিস্মৃত হয়েন নাই। মৌসল পর্ব্বে সেই দণ্ডের কীর্ত্তন আছে। এই দ্বিবিধ নীতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে কেহই সন্দিহান নহেন। সুরাপায়ীও কখন বলিবে না, সমাজ শুদ্ধ মাতাল হউক। এক্ষণে বুঝিলে যে তোমার প্রশ্ন কেবল রিলিজন সম্বন্ধেই সঙ্গত।

শিষ্য। আমিও সেই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহার সদুত্তর প্রার্থনা করি।

গুরু। উত্তরের আগে, একটা নিয়ম করা যাউক। এই রিলিজন কথাটা বাঙ্গালায় সর্ব্বদা ব্যবহার করা চলে না। এ বিচারে ধর্ম্ম শব্দই আমাকে ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু ধর্ম্ম শব্দের ছয় প্রকার প্রয়োগ প্রচলিত আছে—দেখাইয়াছি। এই ছয়টি সর্ব্বদা একের স্থান

অপরে অধিকার করে। ইহা মহান্ অনর্থের মূল। এই জন্য এই ছয়টির জন্য পৃথক্ পৃথক্ শব্দ নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। আমি রিলিজনকে ধর্ম্মই বলিব আর কিছুকে ধর্ম্ম বলিব না। Morality অর্থাৎ আমার ব্যাখ্যাত দ্বিতীয় অর্থে নীতি শব্দ ব্যবহার করিব, ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিব না।

শিষ্য। এখন কথাটা পরিষ্কার হইল। এক্ষণে প্রার্থিত উপদেশ প্রদান করুন—ধর্ম্মে প্রয়োজন কি?

গুরু। কিছুই পরিষ্কার হয় নাই। ধর্ম্মে প্রয়োজন কি,—জিজ্ঞাসা করিতেছ। আমি আগে জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম কি তাহা না বুঝিলে কি প্রকারে বলিব, তাহাতে কোন প্রয়োজন আছে কিনা?

শিষ্য। ধর্ম্ম ত রিলিজন।

গুরু। রিলিজন কি?

শিষ্য। সেটা জানা কথা।

গুরু। বড় নয়—বল দেখি কি জানা আছে?

শিষ্য। যদি বলি পারলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস।

গুরু। প্রাচীন য়ীহুদীরা পরলোক মানিত না। য়ীহুদীদের প্রাচীন ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়?

শিষ্য। যদি বলি দেব দেবীতে বিশ্বাস।

গুরু। ঈস্‌লাম, খ্রীষ্টীয়, য়ীহুদ, প্রভৃতি ধর্ম্মে দেবী নাই। সে সকল ধর্ম্মে দেবও এক—ঈশ্বর। এ গুলি কি ধর্ম্ম নয়?

শিষ্য। ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম্ম?

গুরু। এমন অনেক পরম রমণীয় ধর্ম্ম আছে, যাহাতে ঈশ্বর নাই। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রাচীনতম মন্ত্রগুলি সমালোচন করিলে, বুঝা যায়, যে তৎ প্রণয়নের সমকালিক আর্য্যদিগের ধর্ম্মে অনেক দেব দেবী ছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর নাই। বিশ্বকর্ম্মা, প্রজাপতি, ব্রহ্ম, ইত্যাদি ঈশ্বরবাচক শব্দ, ঋগ্বেদের প্রাচীনতম মন্ত্রগুলিতে নাই—যে গুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সেই গুলিতে আছে। প্রাচীন সাংখ্যেরাও অনীশ্বরবাদী ছিলেন। অথচ তাঁহারা ধর্ম্ম হীন নহেন, কেন না তাঁহারা কর্ম্ম ফল মানিতেন, এবং মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স কামনা করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মও নিরীশ্বর। অতএব ঈশ্বর বাদ ধর্ম্মের লক্ষণ কি প্রকারে বলি? দেখ, কিছুই পরিষ্কার হয় নাই।

শিষ্য। তবে বিদেশী তার্কিকদিগের ভাষা অবলম্বন করিতে হইল—লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাসই ধর্ম্ম।

গুরু। অর্থাৎ Supernaturalism। তাহা বলিলে তোমার প্রশ্নের উত্তরটা সহজ হইয়া আসিল। যদি লোকাতীত চৈতন্যের অস্তিত্বের প্রমাণ থাকে, তাহাতে বিশ্বাস অবশ্য কর্ত্তব্য। অবশ্য কর্ত্তব্য কেন, অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইলে প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ। কেন না যাহার প্রমাণ আছে, তাহাতে বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ। তাহা হইলে ধর্ম্মের প্রয়োজন প্রমাণের উপর নির্ভর করিল। কিন্তু ইহাতে তুমি কোথায় আসিয়া পড়িলে দেখ। প্রেততত্ত্ববিদ্ সম্প্রদায় ছাড়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মত, লোকাতীত চৈতন্যের কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং ধর্ম্মও নাই—ধর্ম্মের প্রয়োজনও নাই। রিলিজনকে ধর্ম্ম বলিতেছি মনে থাকে যেন।

শিষ্য। অথচ সে অর্থেও ঘোর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও ধর্ম্ম আছে। যথা "Religion of Humanity."

গুরু। সুতরাং লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাস ধর্ম্ম নয়।

শিষ্য। তবে আপনিই বলুন ধর্ম্ম কাহাকে বলিব।

গুরু। প্রশ্নটা অতি প্রাচীন। "অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" মীমাংসা দর্শনের প্রথম সূত্র। এই প্রশ্নের উত্তর দানই মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্য। সর্ব্বত্র গ্রাহ্য উত্তর আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আমি যে ইহার সদুত্তর দিতে সক্ষম হইব, এমন সম্ভাবনা নাই। তবে পূর্ব্ব পণ্ডিতদিগের মত তোমাকে শুনাইতে পারি। প্রথম, মীমাংসাকারের উত্তর শুন। তিনি বলেন 'নোদনা লক্ষণো ধর্ম্ম।" নোদনা, ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বাক্য। শুধু এই টুকু থাকিলে বলা যাইত, কথাটা বুঝি নিতান্ত মন্দ নয়; কিন্তু যখন উহার উপর কথা উঠিল, "নোদনা প্রবর্ত্তকো বেদবিধিরূপঃ" তখন আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি উহাকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবে কি না।

শিষ্য। কখনই না। তাহা হইলে যতগুলি পৃথক্ ধর্ম্ম গ্রন্থ ততগুলি পৃথক্-প্রকৃতি সম্পন্ন ধর্ম্ম মানিতে হয়। খ্রীষ্টানে বলিতে পারে, বাইবেল বিধিই ধর্ম্ম; মুসলমানও কোরাণ সম্বন্ধে ঐরূপ বলিবে। ধর্ম্ম পদ্ধতি ভিন্ন হউক, ধর্ম্ম বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি? Religions আছে বলিয়া Religion বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি?

গুরু। এই এক সম্প্রদায়ের মত। লৌগাক্ষি ভাস্কর প্রভৃতি এইরূপ কহিয়াছেন যে "বেদপ্রতিপাদ্যপ্রয়োজনবদর্থো ধর্ম্মঃ।" এই সকল কথার পরিণাম ফল এই দাঁড়াইয়াছে, যে যাগাদিই ধর্ম্ম। এবং সদাচারই ধর্ম্ম শব্দে বাচ্য হইয়া গিয়াছে,—যথা মহাভারতে

শ্রাদ্ধকর্ম্ম তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এবচ।
স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং বিদ্যানসূয়িতা।
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মঃ সাধারণো নৃপ॥

কেহ বা বলেন, "দ্রব্য ক্রিয়াগুণাদীনাং ধর্ম্মত্বং" এবং, কেহ বলেন ধর্ম্ম অদৃষ্ট বিশেষ। এই সকল কথার সবিস্তার ব্যাখ্যা তুমি সম্প্রতি শুনিয়াছ, এজন্য আমি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম না। ফলত আর্য্যদিগের সাধারণ অভিপ্রায় এই যে বেদ বা লোকাচার সম্মত কার্য্যই ধর্ম্ম যথা বিশ্বামিত্র—

যমার্য্যাঃ ক্রিয়মাণংহি শংসন্ত্যাগমবেদিনঃ।
সধর্ম্মো যং বিগর্হন্তি তমধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে যে ভিন্ন মত নাই, এমত নহে। "দ্বেবিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্মযদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরাচ," ইত্যাদি শ্রুতিতে সূচিত হইয়াছে যে, বৈদিক জ্ঞান ও তদনুবর্ত্তী যাগাদি নিকৃষ্ট ধর্ম্ম, ব্রহ্মজ্ঞানই পরধর্ম্ম। ভগবদ্গীতার স্থূল তাৎপর্য্যই কর্ম্মাত্মক বৈদিকাদি অনুষ্ঠানের নিকৃষ্টতা এবং গীতোক্ত ধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রতিপাদন। বিশেষত হিন্দু ধর্ম্মের ভিতর একটি পরম রমণীয় ধর্ম্ম পাওয়া যায়, যাহা এই মীমাংসা এবং তন্নীত হিন্দু ধর্ম্মবাদের সাধারণত বিরোধী। যেখানে এই ধর্ম্ম দেখি, অর্থাৎ কি গীতায়, কি মহাভারতের অন্যত্র, কি ভাগবতে, সর্ব্বত্রই দেখি, শ্রীকৃষ্ণই ইহার বক্তা। এই জন্য আমি হিন্দু শাস্ত্রে নিহিত এই উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মকে শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত মনে করি, এবং কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম বলিতে ইচ্ছা করি। মহাভারতের কর্ণ পর্ব্ব হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া উহার উদাহরণ দিতেছি।

"অনেকে শ্রুতিরে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্ম্ম তত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণীগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসাযুক্তকার্য্য করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রকদিগের হিংসা নিবারণার্থেই

ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণীগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম্ম নাম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণীগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম।

ইহা কৃষ্ণোক্তি। ইহার পরে বনপর্ব্ব হইতে ধর্ম্ম ব্যাধোক্ত ধর্ম্ম ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। "যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক তাহাই সত্য। সত্যই শ্রেয়োলাভের অদ্বিতীয় উপায়। সত্য প্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও হিতসাধন হয়।" এস্থলে ধর্ম্ম অর্থেই সত্য শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে।

শিষ্য। এ দেশীয়েরা ধর্ম্মের যে ব্যখ্যা করিয়াছেন, তাহা নীতির ব্যাখ্যা বা পুণ্যের ব্যাখ্যা। রিলিজনের ব্যাখ্যা কই?

গুরু। রিলিজন শব্দে যে বিষয় বুঝায়, সে বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য আমাদের দেশের লোক কখন উপলব্ধি করেন নাই। যে বিষয়ের প্রজ্ঞা, আমার মনে নাই, আমার পরিচিত কোন শব্দে কি প্রকারে তাহার নাম করণ হইতে পারে?

শিষ্য। কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। তবে, আমার কাছে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ আছে, তাহা হইতে একটু পড়িয়া শুনাই।

"For Religion, the ancient Hindu had no name, because his conception of it was so broad as to dispense with the necessity of a name. With other peoples, religion is only a part of life; there are things religious, and there are things lay and secular. To the Hindu his whole life was religion. To other peoples, their relations to God and to the spiritual world are things sharply distinguished from their relations to man and to the temporal world To the Hindu, his relations to God and his relations to man, his spiritual life and his temporal life, are incapable of being so distinguished. They form one compact and harmonious whole, to separate which into its component parts is to break the entire fabric. All life to him was religion, and religion never received a name from him. because it never had for him an existence apart from all that had received a name. A department of thought which the

people in whom it had its existence had thus failed to differentiate, has necessarily mixed itself inextricably with every other department of thought, and this is what makes it so difficult at the present day to erect it into a separate entity *

শিষ্য। তবে রিলিজন কি, তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য আচার্য্যদিগের মতই শুনা যাউক।

গুরু। তাহাতেও বড় গোলযোগ। প্রথমত রিলিজন শব্দের যৌগিক অর্থ দেখা যাউক। প্রচলিত মত এই যে *re-ligare* হইতে ঐ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার প্রকৃত অর্থ বন্ধন,—ইহা সমাজের বন্ধনী। কিন্তু বড় বড় পণ্ডিতগণের এ মত নহে। রোমক পণ্ডিত কিকিরো (বা সিসিরো) বলেন, যে ইহা re-legere হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার অর্থ পুনরাহরণ, সংগ্রহ, চিন্তা, এইরূপ। মক্ষমূলর প্রভৃতি এই মতানুযায়ী। যেটাই প্রকৃত হউক, দেখা যাইতেছে যে এ শব্দের আদি অর্থ এক্ষণে আর ব্যবহৃত নহে। যেমন লোকের ধর্ম্ম বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, এ শব্দের অর্থও তেমনি স্ফূরিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

শিষ্য। প্রাচীন অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে ধর্ম্ম অর্থাৎ রিলিজন কাহাকে বলিব, তাই বলুন।

গুরু। কেবল একটি কথা বলিয়া রাখি। ধর্ম্ম শব্দের যৌগিক অর্থ, অনেকটা religio শব্দের অনুরূপ। ধর্ম্ম=ধৃ+মন্ (ধ্রিয়তে লোকো অনেন, ধরতি লোকং বা) এই জন্য আমি ধর্ম্মকে religo শব্দের প্রকৃত প্রতিশব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

শিষ্য। তা হোক—এক্ষণে রিলিজনের আধুনিক ব্যাখ্যা বলুন।

গুরু। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে জর্ম্মানেরাই সর্ব্বাগ্রগণ্য। দুর্ভাগ্যবশত আমি নিজে জর্ম্মান জানি না। অতএব প্রথমত মক্ষ

* লেখকের প্রণীত কোন ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধৃত হইল। উহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহার মর্ম্মার্থ বাঙ্গালায় এখানে সন্নিবেশিত করিলে করা যাইতে পারিত, কিন্তু বাঙ্গালায় এ রকমের কথা, আমার অনেক পাঠকে বুঝিবেন না। যাঁহাদের জন্য লিখিতেছি তাঁহারা না বুঝিলে, লেখা বৃথা। অতএব এই রুচি বিরুদ্ধ কার্য্যটুকু পাঠক মার্জ্জনা করিবেন। যাঁহারা ইংরেজি জানেন না, তাঁহারা এটুকু ছাড়িয়া গেলে ক্ষতি হইবে না।

মূলরের পুস্তক হইতে জর্ম্মাণদিগের মত পড়িয়া শুনাইব। আদৌ, কাণ্টের মত পর্য্যালোচনা কর।

"According to Kant, religion is morality. When we look upon all our moral duties as divine Commands, that, he thinks constitutes religion. And we must not forget that Kant does not consider that duties are moral duties because they rest on a divine command (that would be according to Kant merely revealed Religion); on the contrary, he tells us that because we are directly conscious of them as duties, therefore we look upon them as divine commands."

তার পর ফিক্তে। ফিক্তের মতে "Religion is knowledge. It gives to a man a clear insight into himself, answers the highest questions, and thus imparts to us a complete harmony with ourselves, and a thorough sanctification to our mind." সাংখ্যাদিরও প্রায় এই মত। কেবল শব্দপ্রয়োগ ভিন্নপ্রকার; তারপর সি্লয়ের মেকর। তাঁহার মতে,—"Religion consists in our consciousness of absolute dependence on something, which through it determines us, we cannot determine in our turn." তাঁহাকে উপহাস করিয়া হীগেল বলেন,—"Religion is or ought to be perfect freedom; for it is neither more or less than the divine spirit becoming conscious of himself through the finite spirit—" এ মত কতকটা বেদান্তের অনুগামী।

শিষ্য। যাহারই অনুগামী হউক, এই চারিটির একটী ব্যাখ্যাও ত শ্রদ্ধেয় বলিয়া বোধ হইল না। আচার্য্য মক্ষমূলরের নিজের মত কি?

গুরু। তিনি বলেন, "Religion is a subjective faculty for the apprehension of the Infinite."

শিষ্য। Faculty! সর্ব্বনাশ! বরং রিলিজন বুঝিলে, বুঝা যাইবে,—faculty বুঝিব কি প্রকারে? তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি?

গুরু। এখন জর্ম্মানদের ছাড়িয়া দিয়া দুই একজন ইংরেজের ব্যাখ্যা আমি নিজে সংগ্রহ করিয়া শুনাইতেছি। টেলর সাহেব বলেন, যে

যেখানে "Spiritual Beings" সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে, সেই খানেই রিলিজন। এখানে "Spiritual Beings অর্থে কেবল ভূত প্রেত নহে—লোকাতীত চৈতন্যই অভিপ্রেত; দেব দেবী ও ঈশ্বরও তদন্তর্গত। অতএব তোমার বাক্যের সহিত ইহাঁর বাক্য ঐক্য হইল।

শিষ্য। সে জ্ঞান ত প্রমাণাধীন।

গুরু। সকল প্রমাজ্ঞানই প্রমাণাধীন, ভ্রম জ্ঞান প্রমাণাধীন নহে। সাহেব মৌস্থকের বিবেচনায় রিলিজনটা ভ্রমজ্ঞান মাত্র। এক্ষণে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের ব্যাখ্যা শোন।

শিষ্য। তিনি ত নীতি মাত্র বাদী, ধর্ম্মবিরোধী।

গুরু। তাঁহার শেষাবস্থার রচনা পাঠে সেরূপ বোধ হয় না। অনেক স্থানে দ্বিধাযুক্ত বটে।—যাই হোক, তাঁহার ব্যাখ্যা উচ্চশ্রেণীর ধর্ম্ম সকল সম্বন্ধে বেশ খাটে।

তিনি বলেন "The essence of Religion is the strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence, and is rightfully paramount over all selfish objects of desire."

শিষ্য। কথাটা বেশ।

গুরু। মন্দ নহে বটে। সম্প্রতি আচার্য্য সীলীর কথা শোন। আধুনিক ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাকারকদিগের মধ্যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ। তাঁহার প্রণীত, "Ecco Home" এবং "Natural Religion" অনেককেই মোহিত করিয়াছে। এ বিষয়ে তাঁহার একটি উক্তি বাঙ্গালি পাঠকদিগের নিকট সম্প্রতি পরিচিত হইয়াছে।* বাক্যটি এই *"The Substance of Religion is Culture."* কিন্তু তিনি একদল লোকের মতের সমালোচন কালে, এই উক্তির দ্বারা তাঁহাদিগের মত পরিস্ফুট করিয়াছেন—এটি ঠিক তাঁহার নিজের মত নহে। তাঁহার নিজের মত বড় সর্ব্বব্যাপী। সে মতানুসারে রিলিজন *"habitual and permanent admiration."* ব্যাখ্যাটি সবিস্তারে শুনাইতে হইল।

"The words Religion and worship are commonly and conveniently appropriated to the feelings with which we regard God.

* দেবী চৌধুরাণীতে।

But those feelings—love, awe, admiration,—which together make up worship—are felt in various combination for human beings and even for inanimate objects. It is not exclusively, but only *par excellence* that religion is directed towards God. When feelings of admiration are very strong and at the same time serious and permanent, they express themselves in recurring acts, and hence arises ritual, liturgy and whatever the multitude identifies with religion. But without ritual, religion may exist in its elementary state and this elementary state of Religion is what may be described as *habitual and permanent admiration.*

শিষ্য। এ ব্যখ্যাটি অতি সুন্দর। আর আমি দেখিতেছি, মিল যে কথা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ইহার ঐক্য হইতেছে। এই "habitual and permanent admiration" যে মানসিক ভাব, তাহারই ফল, strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence.

গুরু। এ ভাব, ধর্ম্মের একটি অঙ্গ মাত্র।

শিষ্য। কেন?

গুরু। "Habitual and permanent admiration," ইহার দেশী নামটি কি,—তোমার স্মরণ হইতেছে না?

শিষ্য। কি?

গুরু। ভক্তি। কেবল ভক্তি ধর্ম্ম নহে। যাহা হউক, তোমাকে আর পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে বিরক্ত না করিয়া, অগস্ত কোম্‌তের ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনাইয়া, নিরস্ত হইব। এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন, কেন না কোম্‌ৎ নিজে একটি অভিনব ধর্ম্মের স্থষ্টিকর্ত্তা, এবং তাঁহার এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়াই তিনি সেই ধর্ম্ম স্থষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলেন, Religion, in itself expresses the state of perfect *unity* which is the distinctive mark of man's existence both as an individual and in society, when all the constituent parts of his nature, moral and physical, are made habitually to con-

verge towards one common purpose."—অর্থাৎ "Religion consists in regulating one's individual nature, and forms the rallying point for all the separate individuals."

যতগুলি ব্যাখ্যা তোমাকে শুনাইলাম, সকলের মধ্যে এইটি উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। আর যদি এই ব্যাখ্যা প্রকৃত হয়, তবে হিন্দুধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম।

শিষ্য। আগে ধর্ম্ম কি বুঝি, তার পর, পারি যদি তবে না হয়, হিন্দুধর্ম্ম বুঝিব। এই সকল পণ্ডিতগণকৃত ধর্ম্মব্যখ্যা শুনিয়া আমার সাত কাণার হাতী দেখা মনে পড়িল।

গুরু। কথা সত্য। এমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে, ধর্ম্মের পূর্ণ প্রকৃতি ধ্যানে পাইয়াছে? যেমন সমগ্র বিশ্বসংসার কোন মনুষ্য চক্ষে দেখিতে পায় না, তেমনই সমগ্র ধর্ম্ম কোন মনুষ্য ধ্যানে পায় না। অন্যের কথা দূরে থাক, শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, কি চৈতন্য,—তাঁহারাও ধর্ম্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এমত স্বীকার করিতে পারি না। অন্যের অপেক্ষা বেশী দেখুন, তথাপি সবটা দেখিতে পান নাই। যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান, এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার। ভগবদ্গীতার উক্তি, ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, কি কোন মনুষ্য প্রণীত, তাহা জানি না। কিন্তু যদি কোথাও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়।

শিষ্য। তবে সেই ভগবদ্গীতায় যে ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, আমাকে তাহাই বুঝাইয়া দিন।

গুরু। তাহা পারিতেছি না, কেন না তোমাকে যাহা বুঝাইতে হইতেছে, তাহা রিলিজন। ভগবদ্গীতার রিলিজন সকল রিলিজনের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাহাতে রিলিজনের প্রতিশব্দ কোথাও নাই। সমগ্র মানবধর্ম্মের যে ভাব টুকু রিলিজন, তাহার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা কোথাও নাই। ইহার কারণ পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি। আর্য্যদিগের চিত্তে সমগ্র মানব-জীবন হইতে রিলিজন কখন পৃথগ্ভূত হয় নাই।

শিষ্য। তবে আমার রিলিজন বুঝিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহাদিগের মনে রিলিজন ভাব কখন উদ্ভূত হয় নাই—তাঁহারা যদি তদভাবেও

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রণয়ণে সক্ষম হইয়াছিলেন, তবে আমার সেই বৈদেশিক চিত্ত-বিকারের আন্দোলনে কিছুই প্রয়োজন নাই। গীতায় যে ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তাহাই বুঝিবার বাসনা করি।

গুরু। এখন আর ধর্ম্মস্রোতে রিলিজন ভাসাইয়া দিলে চলিবে না। বিদেশ হইতেই হউক, স্বদেশ হইতেই হউক, স্বর্গ হইতেই হউক, নরক হইতেই হউক, যখন রিলিজন সামগ্রীটা ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন তাহাকে অবশ্য বুঝিয়া দেখিতে হইবে। ফেলিয়া দিই বা ঘরে তুলি, না বুঝিয়া কিছু করা হইবে না। কথাটি না বুঝার কারণে অনেক সামাজিক উৎপাত উপস্থিত হইতেছে। যাহারা রিলিজনের উপর বীতরাগ হইয়াছে, তাহারা তদন্তর্গত বলিয়া সেই সঙ্গে নীতি ও পুণ্য পরিত্যাগ করিতেছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ধর্ম্মশব্দ বহ্বর্থ। অনেক অর্থ যখন আছে, তখন অনেক সামগ্রীও আছে। সকল সামগ্রী গুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া চিনিয়া লওয়া চাই।

শিষ্য। তবে আপনিই আমাকে রিলিজন বুঝাইয়া দিন। জৈমিনি হইতে অগস্ত কোম্‌ৎ পর্য্যন্ত যে সকল পণ্ডিতকৃত ধর্ম্মব্যাখ্যা আপনি আমাকে শুনাইলেন, তাহাতে আমার কিছুই হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। অনেক আলোতে যেমন লোকের চোক ধরিয়া যায়, আমার সেইরূপ হইয়াছে।

গুরু। তুমি আমাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, ধর্ম্মে প্রয়োজন কি? কেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? কেবল কৌতুহল বশত অথবা কথোপকথনের ইচ্ছায় যদি তুমি এ প্রশ্ন করিয়া থাক—তবে যাহা বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট; তা ছাড়া তোমার আর কিছু উদ্দেশ্য ছিল কি?

শিষ্য। সকলেই ধর্ম্ম কামনা করে—সকলে করুক না করুক, আমি করি। নীতি কি তাহা জানি—ধর্ম্ম কি তাহা জানি না, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম।

গুরু। পরকাল মান?

শিষ্য। তত প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

গুরু। তবে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু হইয়াছ কেন? ইহলোকে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া যশস্বী হইবে এই বাসনায়?

শিষ্য। ঠিক তা নয়। ধর্ম্মে যদি সুখ থাকে এই সন্দেহে।

গুরু। তবে ঠিক বল দেখি তুমি খুঁজিতেছ কি? ধর্ম্ম না সুখ?

শিষ্য। সুখ খুঁজি বলিয়াই ধর্ম্ম খুঁজিতেছি।

গুরু। যেমন অন্ধকারে হাতড়াইয়াও লোকে ঠিক পথ পায়, তোমার সেইরূপ ঘটিয়াছে। প্রকৃত সুখের যে উপায় তাহারই নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্মের আর সকল ব্যাখ্যা অশুদ্ধ।

শিষ্য। এ কি ভয়ঙ্কর কথা। লৌকিক বিশ্বাস ত ঠিক বিপরীত! লোকের বিশ্বাস যে যদি পরকাল থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্মে পরকালে সুখ হইলে হইতে পারে (সে স্থলেও প্রমাণাভাব), কিন্তু ইহলোকে যে ধর্ম্মে সুখ হয়,এ কথাটা ত ভূয়োদর্শন বিরুদ্ধ।

গুরু। সে ভূয়োদর্শনটা কিরূপ?—

শিষ্য। দেখুন ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তি ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তথাচ সুখ বটে।

গুরু। ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তি মাত্রই যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ, এটা ঘোরতর মূর্খের কথা। আমি, মনে কর,নীতি-সঙ্গত উপায়ে প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়া উত্তম আহার সংগ্রহ করিয়াছি, দরিদ্র প্রভৃতি যাহাদিগকে দেয়, তাহাদিগকে উপযুক্ত অংশ দিয়াছি; তার পর, যদি অবশিষ্ট অংশের দ্বারা স্বাস্থ্যের উপযোগী পরিমাণে নিজের রসনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করি, তবে অধর্ম্ম কোথায় হইল?

শিষ্য। যে ভোগাসক্ত, সে কি ধার্ম্মিক?

গুরু। ভোগাসক্তি কি সুখ? ইন্দ্রিয়ের পরিমিত এবং যথাকর্ত্তব্য পরিতৃপ্তি সুখ হইলে হইতে পারে—কিন্তু ইহা সুখের অল্পাংশ; একটা নিকৃষ্ট প্রকারের সুখ মাত্র। সুখের যাহা উপায়, তাহাই ধর্ম্ম, এই কথার যথার্থ ব্যাখ্যার পূর্ব্বে আগে বুঝা চাই যে সুখ কি?

শিষ্য। বলুন সুখ কি?

গুরু। পিপাসা পাইলে জল খাইলেই সুখ। মনুষ্য প্রকৃতি পিপাসাময়। মনুষ্য প্রকৃতিকে কতকগুলি শারীরিক,মানসিক ও আন্তরিক বৃত্তির সমষ্টি মনে করা যাইতে পারে। সেইগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য, এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ। যদি ইংরেজি কথা ব্যবহার করিতে চাও, তবে ইহাকে Culture বলিতে পার।

শিষ্য। বৃত্তি কথাটা লইয়া ত প্রথমে গোলে পড়িলাম। এই মাত্র faculty কথা লইয়া মক্ষমূলারকে উপহাস করিতেছিলাম।

গুরু। মনুষ্য প্রকৃতি এক বটে, কাঠের বোঝা বা শাকের আঁটির মত মত কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সমষ্টি নহে। তথাপি, মনুষ্য প্রকৃতি অবি-

ভাজ্য এক বস্তু হইলেও, তাহার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া বা ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ আছে। যে বলে আমার হাতের বল, সেই বলেই আমার পায়ের বল। তথাপি হাত ও পা পৃথক। ক্রোধ ও স্নেহ একই মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ক্রিয়া। এই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া-শক্তিকেই ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি বল না কেন? দেখা যায়, কাহারও কোন প্রকার কাজে অধিক পটুতা, তাহার সেই বৃত্তি সমধিক স্ফূরিত বল না কেন?

শিষ্য। এতে ত ঘোর ঐন্দ্রিয়কতা দোষে দূষিত হইতে হয়। প্রথম মানসিক বৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিই। দেখুন যদি শারীরিক প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি আমি খুঁজি, তাহা হইলে আমি ঘাতক, পারদারিক এবং চোর হইবারই সম্ভাবনা।

গুরু। দুইটি বিষয় বিবেচনা করিলে না। প্রথমত তুমি যদি চোর, পারদারিক এবং ঘাতক হইলে, তবে তোমার মানসিক বৃত্তি সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি কোথায়? তোমার সে বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ হইলে তুমি কি চোর পারদারিক এবং ঘাতক হইতে পারিতে? দ্বিতীয়ত তুমি সংসারে একা নহ; তুমি মনুষ্যসমাজের একটি মনুষ্য মাত্র; সমাজের সঙ্গে তুমি গ্রন্থিত; সমাজ-সমুদ্রে এক বিন্দু জল মাত্র। সমাজ সুখী না হইলে, তুমি একা কখন সুখী হইতে পার না; কেন না তুমি সমাজের অংশ মাত্র। এখন, সামাজিকদিগের পরদারাদি নিবৃত্তি, অর্থাৎ পরস্পর অনিষ্ট সাধন কখনই সমাজের সুখের কারণ হইতে পারে না; এবং কাজেই তোমারও হইতে পারে না, কেন না তুমি সমাজ-ভুক্ত। অতএব ইন্দ্রিয় নিরতিতে প্রথমত তোমার নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি প্রবলতর হইয়া উৎকৃষ্ট বৃত্তির স্ফূর্ত্তি এবং পরিতৃপ্তির ব্যাঘাত জন্মিয়া সুখের ধ্বংস করিবে, দ্বিতীয়ত দুঃখ তোমার উপর প্রতিহত হইয়া তোমার সুখের ধ্বংস করিবে। অতএব ইন্দ্রিয় নিরতি বা স্বার্থপরতা সুখ নহে, দুঃখ।

শিষ্য। তা বুঝিলাম, কিন্তু সুখ কি এখনও বুঝি নাই।

গুরু। সুখ বলিয়াছি, আমাদিগের সকল বৃত্তির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য, ও সমুচিত পরিতৃপ্তি। এই বাক্য গুলির অর্থ ভাল করিয়া বুঝ। সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি —অর্থাৎ অনুশীলনের দ্বারা যতদূর স্ফূর্ত্তি হইতে পারে। কিন্তু তাহার একটি সীমা আছে—পরস্পরের সামঞ্জস্য। কেহই যেন এতদূর স্ফূরিত হইতে না পারে, যে তদ্দারা অন্য বৃত্তির বিলোপ বা উপযুক্ত স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত হয়। আর সমুচিত পরিতৃপ্তি—অর্থাৎ যেরূপ পরিতৃপ্তিতে আপনার এবং পরের অনিষ্ট না হয়। এই সুখ; ইহা প্রাপ্তির উপায় ধর্ম্ম।

শিষ্য। অনুশীলনত ইহার এক উপায়—অনুশীলন কি ধর্ম্ম?

গুরু। অনুশীলনই ধর্ম্ম নয়—অনুশীলন ধর্ম্মাচরণ—অর্থাৎ ধর্ম্মানুমত কার্য্য। এক্ষণে অনুশীলন ও পরিতৃপ্তি অর্থাৎ সুখে জীবন নির্ব্বাহ, অন্তর্জগত ও বহির্জগতের অধীন। পার্শ্ববর্ত্তী জড়প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতি সেই অনুশীলন ও পরিতৃপ্তির উপায়ও বটে, সীমাও বটে। অতএব বহির্জগতের এবং অন্তর্জগতের প্রকৃতি আমাদিগের জানা চাই। যেখানে জানিতে না পারি, সেখানে একটা তত্ত্ব মনে মনে স্থির করিয়া লই—যথা, এই জগৎ ঈশ্বর সৃষ্ট, এবং ঈশ্বর-নিয়ত; এবং ইহলোকের ফল, পরলোকে বা জন্মান্তরে ভোগ করিতে হয়। জগৎ সম্বন্ধে ঈদৃশ জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলা যায়। ইহাই ধর্ম্মের মূল। বৈজ্ঞানিক সত্যও ইহার অন্তর্গত। "Religion of Humanity." নামক অভিনব ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানাংশ কেবল বৈজ্ঞানিক।

শিষ্য। ধর্ম্মের যে ভাগকে "Doctrine" বা "Creed" বলা যায়, বোধ হয়, এ ভাগ তাই।

গুরু যদি ইংরেজি কথা নহিলে, বুঝিতে না পার, তবে তাই বলিও। এক্ষণে শোন। তত্ত্ব জ্ঞানের অন্তর্গত যে সকল পদার্থ, তাহার মধ্যে উপাস্য পদার্থ পাই। এক্ষণে মিলের সেই বাক্য স্মরণ কর—"Ideal object of the highest excellence" ইহা তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে পাই। ইহাই উপাস্য। ইহা কোথাও ঈশ্বর, কোথাও দেব দেবী, কোথাও গাছ পাথর, কোথাও Humanity। পরে সীলীর সেই বাক্য স্মরণ কর। ঈদৃশ পদার্থ সম্বন্ধে আমাদিগের মানসিক অবস্থা— "habitual and permanent admiration." ইহাই উপাসনা। ইহা ধর্ম্মের দ্বিতীয় উপাদান।

শিষ্য। Worship বা Rites.

গুরু। ঠিক। তারপর, কি জন্য তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা মনে কর। আমাদিগের বৃত্তিগুলির সম্যক্ অনুশীলন এবং চরিতার্থতার অর্থাৎ জীবননির্ব্বাহের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। যে যে নিয়মে উহার অনুশীলন ও তৃপ্তিসাধন করিতে হইবে, সে সকল ঐ জ্ঞান হইতে অনুমিত করিয়া লই। সেই নিয়ম নীতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র। ইহা ধর্ম্মের তৃতীয় উপাদান।

শিষ্য। Morality.

গুরু। এই তিনের সমবায় ধর্ম্ম। সমাজস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ইহার দ্বারা নিয়ত, এবং সম্যক্ সমাজের ইহাই কেন্দ্রীভূত। অতএব ইহাই

উল্লিখিত কোম্‌তের বচনানুমত ধর্ম্ম; মিল ও সীলীর ব্যাখাও ইহার অন্তর্গত, এই মাত্র বলিয়াছি। কান্তের নীত্যাত্মিকা ও ফিক্তের জ্ঞানাত্মিকা ব্যাখ্যাও এই ব্যাখ্যার অন্তর্গত দেখিতে পাইতেছ। আর, যাহা কার্য্যের প্রবর্ত্তক তাহাই যদি নোদনা হয়, তবে এ ধর্ম্ম " নোদনালক্ষণঃ " বটে।

শিষ্য। এ ব্যাখ্যায় আমি তত সন্তুষ্ট হইলাম না। ইহাতে আমার প্রথম আপত্তি এই যে, অনেক এমন ধর্ম্ম আছে, বিশেষত অসভ্য জাতিদিগের ধর্ম্ম, যাহাতে এই তিনটি উপাদানের মধ্যে কোনটি বা কোন দুইটি নাই। কাহারও তত্ত্বজ্ঞান আছে, উপাসনা নাই। কাহারও বা উপাসনা আছে, কিন্তু নীতি নাই। এ সকলগুলিকে ধর্ম্ম বলিবেন কি না?

গুরু। আমাদিগের সম্মুখে যে ইমারতের আধখানা প্রস্তুত হইয়াছে, উহাকে ইমারত বলিবে কি? আমার এই ইংরাজি গ্রন্থখানি, অল্পমাত্র রচিত হইয়াছে, উহাকে গ্রন্থ বলিবে কি? ঐ সকল ধর্ম্মও সেইরূপ। কাল নামক মিস্ত্রী উহা গড়িতেছে বা রচিতেছে। ক্রমে অঙ্গত্রয় বিশিষ্ট হইবে।

শিষ্য। আমার দ্বিতীয় আপত্তি এই, যে এ ব্যাখ্যার অনুমত ধর্ম্ম ভ্রমসঙ্কুল হইবার সম্ভাবনা। তত্ত্বজ্ঞান, প্রমাজ্ঞানও হইতে পারে, ভ্রমও হইতে পারে। যতটুকু তাহাতে ভ্রম থাকিবে, উপাসনা ও নীতি সেই পরিমাণে দূষিত হইবে। তারপর, তত্ত্বজ্ঞান খাটি হইলেও, তাহা হইতে উপাস্যের অবধারণে ভ্রান্তি হইতে পারে। উপাস্য ঠিক হইলেও, উপাসনা ভ্রান্ত হইতে পারে। আর নীতিত অনুমানের বিশুদ্ধির উপর নির্ভর করে, অতএব তত্ত্বজ্ঞান খাটি হইলেও নীতি ভ্রান্ত হইতে পারে। অতএব ধর্ম্ম ভ্রমসঙ্কুল হইবার সম্ভাবনা। তবে যদি কোন ধর্ম্মবিশেষকে ঈশ্বর বা অভ্রান্ত ঋষি প্রণীত, এবং সেইজন্য অভ্রান্ত বলিয়া স্থির করেন, তবে সে স্বতন্ত্র কথা।

গুরু। আমারও ঠিক সেই মত। আমি কোন ধর্ম্মকেই ঈশ্বর প্রণীত বা অভ্রান্ত ঋষিপ্রণীত বলিয়া স্বীকার করি না। সকল ধর্ম্মেই অনেক ভুল, অনেক মিথ্যা আছে মানি। কিন্তু ধর্ম্ম মাত্রেই যে ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহা স্বীকার করি না। তাহা বলিলে মনুষ্য বুদ্ধির অনুচিত অবমাননা করা হয়। বস্তুত সকল ধর্ম্মেই কিছু মিথ্যা, কিছু ভ্রম আছে। আবার সকল ধর্ম্মেই কিছু সত্য আছে। কেহই একেবারে সত্য, বা একেবারে মিথ্যা নহে। একেবারে মিথ্যা, এমন কোন ধর্ম্ম যদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে তাহা টিকে নাই, এবং তদ্দ্বারা মনুষ্যের কোন উন্নতি সিদ্ধ হয় নাই।

শিষ্য। এই কথায় আমার তৃতীয় আপত্তিও খণ্ডন হইতেছে। আমি বলিতে যাইতেছিলাম, যে যখন জ্ঞানের তারতম্যে, ধর্ম্মের পার্থক্য জন্মিতে পারে (ও জন্মিয়াছে), তখন ধর্ম্মের নিত্যত্ব কোথায় ? কিন্তু এখন বুঝিলাম, যে সকল ধর্ম্মেই যখন কিছু সত্য আছে, তখন সকল ধর্ম্মেরই কিয়দংশ নিত্য। কিন্তু আমার চতুর্থ আপত্তি এই যে, এই ব্যাখানুসারে নিখিল ধর্ম্মের অন্তর্গত, একটা শারীরিকধর্ম্ম মানিতে হয়।

গুরু। শারীরিকধর্ম্ম অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এবং বিশুদ্ধ চিত্তে শারীরিক ধর্ম্ম আচরিত করিতে হইবে। তদ্বিপর্য্যয়েই এই বলিষ্ঠ আর্য্য জাতি দুর্ব্বল হইয়া পরাধীন হইয়াছে; এবং পরাধীন হইয়া অন্যবিধ ধর্ম্মচ্যুত ও সুখচ্যুত হইয়াছে। ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বাঙ্গের সঙ্গে পরস্পর নিগূঢ় সম্বন্ধ বিশিষ্ট। একের ধ্বংসে অন্যের ধ্বংস হয়।

শিষ্য। আমার পঞ্চম আপত্তি, যদি সুখের জন্য ধর্ম্ম, তবে ধর্ম্ম নিষ্কাম হইল কই ? আপনি এই মাত্র ভবদ্গীতার প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু এ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা ত ভগবদ্বাক্যের সঙ্গে মিলে না।

গুরু। নিষ্কাম ধর্ম্মই সুখের উপায়, সকাম ধর্ম্ম সুখের উপায় নয়। সকাম ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়, অধর্ম্ম। আমি তোমাকে বুঝাইবার জন্য বলিয়াছি, যে সুখের উপায়ই ধর্ম্ম। বস্তুত ধর্ম্মই সুখ। এখানে সাধনায় এবং সাধ্যে ভেদ নাই। বৃত্তিগুলির অনুশীলনই পরিতৃপ্তি—এই জন্য সাধনই সাধ্য। এই জন্য ধর্ম্ম ও সুখ,—একই। আমাদের বুঝিবার জন্য উহার মধ্যে প্রভেদ কল্পনা করিয়া নামকরণ করিতে হয়। অতএব ধর্ম্মাচরণে ধর্ম্মভিন্ন যদি আর কিছু কামনা কর, তবে তোমার ধর্ম্ম বিপথগামী হইল—তোমার ধর্ম্মচ্যুতি হইল। নিষ্কাম ধর্ম্মের এরূপ তাৎপর্য্য নহে, যে ধর্ম্ম কামনা করিবে না। ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই কামনা করিবে না, ইহাই তাৎপর্য্য। ধর্ম্মার্থ কর্ম্ম করিবে, কর্ম্ম-ফলের জন্য কর্ম্ম করিবে না। নিষ্কাম ধর্ম্ম এত অল্প কথায় বুঝান যায় না। সে আর এক দিনের কথা।

শিষ্য। আমার ষষ্ঠ আপত্তি এই যে, ধর্ম্ম মাত্রেই যদি ভ্রম এবং মিথ্যার সংস্রব আছে, তবে কোন ধর্ম্মই অবলম্বনীয় হয় না। কেননা মিথ্যা মাত্রেই অনিষ্ট আছে।

গুরু। এই জন্য সকল ধর্ম্মের সংস্কার আবশ্যক। যে ধর্ম্মই অবলম্বন কর, তাহার সংস্কার পূর্ব্বক, ভ্রান্তি ও মিথ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তদন্তর্গত সত্যকে ভজনা করিবে।

শিষ্য। তবে কি সকল ধর্ম্মই তুল্য রূপে অবলম্বনীয় হইতে পারে?

গুরু। আমি এমন কথা বলি না যে, জেলখানায় যেমন একটি মাত্র ফটক, স্বর্গেরও তেমনি একটি মাত্র দ্বার। যে ব্যক্তি বলে, আমার গৃহীত ধর্ম্ম ভিন্ন আর সকল ধর্ম্মই মিথ্যা, কেবল আমি আর আমার সধর্ম্মীরাই স্বর্গে যাইবে, আর সকলই নরকে পচিয়া মরিবে, তিনি আর্য্যঋষিই হউন, পাণ্ডিত্যাভিমানী ইংরেজই হউন, বা সর্ব্ব শাস্ত্রবেত্তা জর্ম্মানই হউন, আমি তাঁহাকে ঘোরতর মূর্খ মনে করি। আমি ঈশ্বরকে কখনও এমন পক্ষপাতী এবং খলস্বভাব মনে করিতে পারি না, যে, তিনি কেবল জাতিবিশেষকে স্বর্গে যাইবার উপায় বলিয়া দিয়া, পৃথিবীস্থ আর সকল জাতিকে নরকে পাঠাইবার বন্দবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আমার বিবেচনায় নরক কেবল—ইহলোকের নরকই হউক বা পরলোকের নরকই হউক, এক শ্রেণীর লোকের জন্য—যাহারা কোন ধর্ম্ম মানে না। তথাপি, আমি এমন বলি না, যে সকল ধর্ম্মই তুল্যরূপে অবলম্বনীয়। যে ধর্ম্মে সত্যের ভাগ অধিক, অর্থাৎ যে ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানে অধিক সত্য, উপাসনা যে ধর্ম্মে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকর, এবং মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তিদায়ক, যে ধর্ম্মের নীতি সর্ব্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, সেই ধর্ম্মই অবলম্বন করিবে। সেই ধর্ম্মসর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

শিষ্য। আপনার মতে কোন্ ধর্ম্ম এই লক্ষণাক্রান্ত? কোন্ ধর্ম্ম সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ?

গুরু। হিন্দু ধর্ম্মই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ইহাই অবলম্বন কর।

শিষ্য। শুনিতে পাই, ইহ জগতের সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা হিন্দু ধর্ম্মই মিথ্যা ধর্ম্মপূর্ণ, অধর্ম্মপূর্ণ, কদর্য্য, এবং পাশুব ধর্ম্ম।

গুরু। তুমি হিন্দু ধর্ম্মের কিছু জান কি?

শিষ্য। হিন্দুর ছেলে, কাজেই কিছু জানি।

গুরু। ম্লেচ্ছের ছাত্র, কাজেই কিছু জান না।

শিষ্য। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনিই না হয় এবিষয়ে আমাকে উপদেশ দিন।

গুরু। আমি ব্রাহ্মণ, যুগে যুগে ধর্ম্ম ব্যাখ্যাই পুরুষ পরম্পরাগত আমার ব্যবসা। অতএব, আমার শাস্ত্রজ্ঞান অতি সামান্য হইলেও আমি তোমাকে যথাসাধ্য হিন্দুধর্ম্মে উপদিষ্ট করিতে স্বীকৃত আছি; তবে আজ বেলা অবসান হইয়াছে, সময়ান্তরে হইবে। আজ, একজন ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের একটি বাক্য তোমাকে উপহার দিব—রাত্রে শুইয়া তুমি তাহা কণ্ঠস্থ করিও।

আচার্য্য গোলডষ্টুকরও আমার মত বলেন ;—হিন্দুর ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম। এই কথা বলিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—

"If the creed of an individual is founded on Texts held Sacred it is a national creed; no nation can surrender it without laying the axe to its own root. For a religion based on Texts believed sacred, embodies the whole history of the Nation which professes it; it is the shortest abbreviation of all that ennobles the nation's mind, is most dear to its memory, and most essential to its life." *

এমন অমৃতময়ী বাণী ম্লেচ্ছ ভাষায় আর কখন আমার কাণে যায় নাই।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সিংহলযাত্রা।

১২৯০।২০শে মাঘ—অদ্য বেলা সাড়ে আটটার সময়ে ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়াষ্টীম নাবিগেসন্ কোম্পানীর কোএটা নামক বাষ্পীয় পোতে আরোহণ করিলাম। প্রথম শ্রেণীর সিংহল যাত্রীকে ১৮০৲ টাকা রিটরণ টিকিটের জন্য দিতে হয়; টিকিটের মিয়াদ ছয় মাস পর্য্যন্ত। তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত জাহাজের অধ্যক্ষেরাই করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি একজন চাকর লইলে, তাঁহাকে নিজে আহারের বন্দোবস্ত করিতে হয়; কেবল চাকরের জন্য অতিরিক্ত ভাড়া লাগে না। আমি একজন চাকর লইয়াছিলাম; সুতরাং আহারের বন্দোবস্ত নিজে করিতে হইয়াছিল। যাত্রীদের স্মরণ থাকা উচিত যে, জাহাজ চলিলে রাক্ষসের ন্যায় ক্ষুধা হয়; সুতরাং তাঁহারা যুবা হইলে, কেবল ব্রাহ্মণের বিধবার ন্যায় আহার্য্য লইলে চলে না। নদীর মধ্যে জাহাজের মন্দ গতি। এমন কি ১০ টার সময় কলিকাতা ছাড়িয়া উলুবেড়িয়া আসিতে প্রায় দুইটা হইল। প্রায় ছয় টার সময় জাহাজ কুল্পীর অপর পারের নিকট নঙ্গর করিল। এইস্থলে নদীর পূর্ব্বপারে অল্প জল; পশ্চিম পারে অধিক জল। আরোহীদের মধ্যে কয়জন মগ্ ছিল, তাহাদের মধ্যে দুইটি স্ত্রীলোক। প্রসিদ্ধ তামাসা প্রদর্শক মেষ্টার বার্ণম্ ইহাদিগকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইতেছেন। মগ্ সকল সর্ব্বদাই প্রফুল্লচিত্ত ও হাস্যমুখ। যাঁহারা

---

* Goldstucker's Literary Remains. Vol II, p 41.

রেঙ্গুন বা মুলমেনে গিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে ভারতবর্ষে বিষণ্ণ-মুখের সংখ্যা অধিক; কিন্তু ব্রহ্মদেশে হাস্য-মুখের সংখ্যা অধিক। ইহার কারণ কি? বিষণ্ণ বদন কি গাম্ভীর্য্যের লক্ষণ? যাঁহারা ঈশ্বরকে আনন্দ-স্বরূপ বলেন, যাঁহারা তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া ডাকেন, তাঁহারা এত নিরানন্দ কেন? যদি বল হিন্দুরা বড় দরিদ্র, অন্নচিন্তায় সর্ব্বদা চিন্তিত। আমি একথা স্বীকার করি, কিন্তু ইহাও বলি যে, মুখ ভারী করিয়া থাকিলে জঠরানলের নিবৃত্তি হয় না, তবে অকারণ চিত্তের স্ফূর্ত্তি কেন হারাই?

২১ শে মাঘ—অদ্য দুই প্রহরের পর জাহাজ ছাড়া হইল। প্রায় একটার সময় রাঙ্গাফলার শ্বেতস্তম্ভ দৃষ্ট হইল। আমি ডায়মণ্ড হার্ব্বর মহকুমায় কিছুকাল ছিলাম; সুতরাং রাঙ্গাফলা সম্বন্ধে আমার দুই এক কথা বলিবার আছে। আমার বিশ্বাস এই যে চব্বিশ পরগণায় যতগুলি মহকুমা আছে, তাহাদের মধ্যে ডায়মণ্ড হার্ব্বর খলতায় অগ্রগণ্য; এবং ডায়মণ্ড হার্ব্বর মহকুমার মধ্যে রাঙ্গাফলা ফাঁড়ির এলাকার লোক সর্ব্বাপেক্ষা খল। যদি কাহারও এ কথায় সংশয় হয়, উক্ত মহকুমার কয়েকটি দেওয়ানী ও ফৌজদারী নথী দেখিলে, তাঁহার আর কোন সন্দেহ থাকিবেনা। বিশেষত মথুর দাস এবং অদ্বৈত দাস নামক দুই ভায়ের গুণ যাহাতে কীর্ত্তিত আছে, তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন মানব প্রকৃতি কত দূর অধম হইতে পারে। বাখরগঞ্জ জেলার সম্বন্ধে এই প্রবাদ আছে যে তথাকার লোক নরহত্যা করিয়া কখন কখন মিথ্যা মোকদ্দমা প্রস্তুত করে। যিনি ডায়মণ্ড হার্ব্বরের পুলিসে বা ফৌজদারী আদালতে কার্য্য করিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে এই মহাপাপ চব্বিশপরগণায়ও একান্ত বিরল নহে। বাঙ্গালার যেখানে ভূমি উর্ব্বরা, সেখানেই সীমার বিবাদ, হাঙ্গামা, দাঙ্গা, মিথ্যা নালিস, মিথ্যা সাক্ষ্য ও কৃত্রিম নিদর্শন পত্রের প্রাদুর্ভাব। ভূমির উর্ব্বরতা বাঙ্গালীর পক্ষে কতদূর মঙ্গলজনক সে বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।

জাহাজ ঘোড়া মারার নিকটে পৌছিলে বোধ হইল যেন উভয় কূলের গাছ জল হইতে উঠিয়াছে।

সাগর উপদ্বীপের নিকটে নদীর পশ্চিম পার দৃষ্টি বহির্ভূত হইল। সাড়ে চারিটার সময় জাহাজ উপদ্বীপ ছাড়াইয়া সমুদ্রে পড়িল। ঘোলা জল ক্রমে হরিত বর্ণ হইল। অদ্য নীলাম্বু দেখিতে পাইলাম না। গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত নাবিক-সহায় দীপ-পোত (Light-ship) সাড়ে পাঁচটার সময় ছাড়াইলাম।

এইখানে পাইলট্‌ সাহেব আমাদের জাহাজ হইতে নামিয়া কলিকাতাভিমুখ-গামী এক জাহাজে উঠিলেন। জাহাজ চালানর ভার সম্পূর্ণরূপে কাপ্তেন সাহেবের হাতে পড়িল। কয়েকটা সাগর-চর কিংহংস (sea-gulls) জাহাজের নিকট ইতস্তত বিচরণ করিয়া মৎস্য ধরিতেছে; অন্য কোন পশু পক্ষী দেখিতে পাইলাম না। অদ্য সমস্ত রাত্রি জাহাজ চলিল।

২২শে মাঘ—অদ্য প্রাতে প্রথমত নীলাম্বু দেখিলাম। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই ঘন শ্যাম জল রাশি। এক্ষণে সমুদ্রের শান্ত মূর্ত্তি; কোন ভয় নাই; তথাপি যে যাত্রী আর কখনও সমুদ্র দেখে নাই, তাহার মনে অবশ্যই অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। পূর্ব্ব কালে কাহারও পোত নির্ম্মাণে নৈপুণ্য ছিল না। কেহ কোম্পাসের ব্যবহার জানিত না, এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যা দ্বারায় পোতের স্থান নিরূপণ করিতে পারিত না; তখন ভয়ের প্রচুর কারণ ছিল। এক্ষণে আবাল বৃদ্ধ বনিতা নির্ভয়ে সমুদ্র যাত্রা করিতেছে। তথাপি বঙ্গোপসাগরে ভয়ের কারণ একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে,—এমন কথা বলা যায় না। কোন কোন বৎসর জ্যৈষ্ঠ ও কার্ত্তিক মাসে এমন বাত্যা হয়, যে নিত্য সাগরচর, অভিজ্ঞ নাবিকদেরও ভয় পাইতে হয়। আমি এক জন নাবিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আবর্ত্তনী-বাত্যার(cyclone) সময় আপনারা কি করেন?' তিনি বলিলেন, 'ডুবিয়া মরিব, আর কি করিব?' বঙ্গোপসাগর, চীনোপসাগর এবং ওএষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপ পুঞ্জের নিকট আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর—এই তিন স্থান পৃথিবীর মধ্যে প্রচণ্ড বায়ুর প্রধান আকর। মিষ্টর ব্লান্‌ফোর্ড ১১৫টি আবর্ত্তনী-বাত্যার (cyclones) সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এতগুলি পবনোৎপাত বঙ্গোপসাগর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহার একটিও ফেব্রুয়ারি মাসে ঘটে নাই; জানুয়ারিতে ২টি, মার্চে ২টি, জুলাইয়ে ৩টি, আগষ্টে ৪টি, সেপ্টেম্বরে ৬টি, এপ্রিলে ৯টি, ডিসেম্বরে ৯টি করিয়া, জুনে ১০টি, নবেম্বরে ১৮টি, মে মাসে ২১টি, এবং অক্টোবর মাসে ৩১টি ঘটিয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, যে কার্ত্তিক মাস বায়ব্যোৎপাতের সর্ব্বপ্রধান মাস।

বঙ্গোপসাগরের তটস্থ বলিয়া মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, খুলনা, বাখরগঞ্জ নোয়াখালী, ও চট্টগ্রাম জেলায় যেমন পবনোৎপাত হয়, বাঙ্গালার অন্যান্য জেলায় তদ্রূপ কখনও হয় না। ১৮৮৬ সালের ৩১শে অক্টোবরের ঝড়ে লক্ষাধিক মনুষ্য দক্ষিণ সাহাবাজপুরে ও চট্টগ্রামে বাটীতে থাকিয়া ডুবিয়া মরি-

য়াছে। এমন প্রলয়োপম প্রচণ্ড-বাত্যা পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে কখন হইয়াছে কি না সন্দেহ।

সিংহল বঙ্গোপসাগরের নৈঋত কোণে স্থিত; কিন্তু সেখানে প্রচণ্ড বাত্যা বিরল *। এজন্য সিংহলের পূর্ব্বোপকূলে ত্রিঙ্কোমালী নগরের নিকট ভারতবর্ষের রণতরী সমস্ত রক্ষিত হয়। অদ্য কোন জলচর বা পক্ষী দেখিতে পাইলাম না। একটি কিংহংসও নাই। কল্য দুই প্রহর হইতে অদ্য দুই প্রহর পর্য্যন্ত জাহাজ ২৬০ গিরা অর্থাৎ ১৩০ ক্রোশ চলিয়াছে। গত কল্য সমুদ্রে সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছিলাম; অদ্য ভাল করিয়া দেখিলাম। কি বিচিত্র সৌন্দর্য্য! যাহা বর্ণিতে বঙ্কিমের ও হেমচন্দ্রের লেখনী অশক্ত, আমি তাহার বর্ণনার চেষ্টা করিব না; তবে বলিব যিনি সাগর ও হিমাদ্রি না দেখিয়াছেন, তিনি ভগবানের মহিমার কিঞ্চিন্মাত্রও বুঝিতে অক্ষম।

২৩শে মাঘ—জাহাজ অহোরাত্র অবিশ্রান্ত চলিতেছে। প্রতি ঘণ্টায় ১০ কি ১১ গিরা—প্রতি গিরায় এক মাইল। দক্ষিণ দিকের ৩৫০ অংশ পশ্চিমে ধাবমান। ঘোর নীল, কৃষ্ণবর্ণ প্রায়, জলরাশি মধ্যে দুই একটি বৃহদাকার কচ্ছপ দেখিলাম এবং তদুপরি বহুসংখ্যক পক্ষধর মীন (flying fish) উড্ডীয়-মান দেখিলাম। প্রাকৃত ইতিবৃত্তবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে এই মৎস্যের উড়ন—কেবল বৃহল্লম্ফ মাত্র; ইহাদের বক্র গতি নাই। অধিকাংশ পক্ষধর মীনের গতি সরল রেখায় (প্রকৃত প্রস্তাবে প্রক্ষেপণী রেখায়) বটে; কিন্তু আমি দেখিয়াছি কয়েকটা মৎস্য উড়িতে উড়িতে আপনাপন বাম বা দক্ষিণ দিকে গেল। তবে ধাবমান জাহাজ হইতে দেখিয়াছি বলিয়া আমার দৃষ্টির ভ্রম হইলেও হইতে পারে।

জাহাজের কর্ম্মচারী ও আরোহীদের মধ্যে কেহই আমার সহিত অসদ্ব্যবহার করেন নাই। কাপ্তেন টেম্প্লটনের মুখে কেবল এক কথা "বাবু কেমন আছ? কি খাইতেছ? তুমি বড় আহাম্মক্ যে আমাদের সঙ্গে আহারে যোগ না দিয়া কষ্ট পাইতেছ।" আমি বলিলাম "যতদূর পারি মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিব; কষ্ট অধিক হয় নাই; যদি এমন কষ্ট হয়,

---

* The atmospheric disturbances which periodically agitate the Bay of Bengal and carry in hurricanes and cyclones destruction to the shiphing on the exposed road-stead of Madras and the devoted Hooghly, seldom or never approach the north eastern shores of the island—Ferguson's Ceylone in 1883, P. 94.

যে তাহাতে স্বাস্থ্যের হানি হইতে পারে বা প্রাণ লইয়া টানাটানি হয়, তখন কোন নিয়ম বা আজ্ঞা মানিব না; এমন স্থলে নিয়ম মানিয়া চলা আপনাদের শাস্ত্র নহে, আমাদেরও শাস্ত্র নহে; আপনাদের দাউদ রাজা প্রাণ রক্ষার্থ—য়িহুদী যাজকদের ভুজ্য, অপর লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ, নৈবেদ্য রুটি খাইয়াছিলেন; আমাদের বিশ্বামিত্র প্রাণরক্ষার্থ চণ্ডালদত্ত কুকুরের মাংস খাইয়াছিলেন।"

মান্দ্রাজ যাত্রী একজন ইংরেজ ইলবর্ট বিল সম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "সকল বাঙ্গালির যে মত, আমারও সেই মত; কিন্তু উহা এমন কিছু পদার্থ নহে, যে উহার জন্য এতটা গোলযোগ ভাল দেখায়।" আমি ইংরাজিতে এই কথা বলিয়া শেষ করিলাম; "The game is not worth the candle." শ্রীরামপুর প্রবাসী বাপ্তিষ্ট মিসনের একজন পাদ্রী বাটী যাইতেছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস এই যে, ১৫।১৬ বৎসর মধ্যেই ইহ লোকের শেষ হইবে; পরে স্বর্গ রাজ্য স্থাপিত হইবে। তিনি বলিলেন "আমার বোধ হয় যে, কেশবচন্দ্র সেন খৃষ্টিয়ান ছিলেন, স্বজাতীয়দের মধ্যে আপন প্রতিপত্তির হ্রাস হইবে বলিয়া প্রকাশ্যরূপে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই।" আমি বলিলাম "যতদূর জানি, সেন মহাশয় খৃষ্টকে মহাপুরুষ বলিয়া মানিতেন; পরমাত্মার অবতার বলিয়া মানিতেন না।" পাদ্রীসাহেব খৃষ্ট মাহাত্ম্য বিষয়ক কয়েকটি বাঙ্গালা গান রামপ্রসাদী সুরে গাইলেন; এবং কেশবচন্দ্র রচিত ভিন্ন সুরে সেই বিষয়ে, আর একটি গানও করিলেন। তাঁহার উচ্চারণ ঠিক্ বাঙ্গালির মত; তবে 'ত' বলিতে 'ট' বলেন এবং 'ধ' বলিতে 'ঢ' বলেন। তিনি ট্রিনিটারীয় খৃষ্টিয়ান বটেন; তথাপি তনয়েশ্বরকে জনকেশ্বরের ন্যূন বলিয়া মানেন। তিনি রামায়ণের অনেক প্রশংসা করায়, এলাহাবাদ প্রবাসী একজন পাদ্রী আমাদের নিকটে ছিলেন, বলিয়া উঠিলেন, 'আমি জানি কোন কোন খৃষ্টিয় যাজক কখন কখন রামায়ণ ও মহাভারতের বচন লইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে; কারণ রাম চরিত্র ভাল হইলেও তাহা নিষ্পাপ নহে; কেবল খৃষ্টই মানব মণ্ডলের মধ্যে অপাপ-বিদ্ধ ছিলেন।" আমি কোন উত্তর দিলাম না; কারণ গোঁড়াদের সঙ্গে তর্ক করা নিষ্ফল।

২৪ শে মাঘ। অদ্য প্রাতে উঠিয়া দেখি জাহাজ মান্দ্রাজে পৌঁছিয়াছে। ৯২ ঘণ্টায় ৭৭০ মাইল আসিয়াছে। উপকূলে তরঙ্গ-রোধ

(Break-water) নির্ম্মিত হইয়াছে; তথাপি এখানকার ঢেউ বড় ক্ষুদ্র নহে। এখানে জাহাজ যেমন দোলে অন্যত্র এমন দোলে না। যে নৌকায় উঠিয়া বেলা ভূমিতে যাইতে হয়; তাহাকে মসুল্লা বোট বলে; যেমন ঢেউ, তাহার উপযুক্ত নৌকা। সমুদ্র হইতে মান্দ্রাজ নগর দেখিতে অতি সুন্দর; তবে কোম্পানীর বাগান হইতে কলিকাতা যত সুন্দর দেখায় তত সুন্দর নহে। ধীবরেরা মৎস্য ধরিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় উপকূল হইতে ৪।৫ ক্রোশ দূরে যায়। কর্কট, আহার্য্য কস্তুরি (oysters), সামুদ্রিক বাগদা চিঙ্গড়ি (prawns), সামুদ্রিক গলদা চিঙ্গড়ি (lobsters); সামুদ্রিক খোরসোলা (mullets) ও অন্যান্য অনেক প্রকার মৎস্য মান্দ্রাজের বাজারে পাওয়া যায়। ডেস্ মৎস্য ইলিশের ন্যায় সুস্বাদু কিন্তু তাহা হইতে বড়। বাঙ্গালোর হইতে ষ্ট্রবেরি ও রাস্পবেরি ফল আইসে; এখনকার ফলের মধ্যে তাহাই উৎকৃষ্ট। মান্দ্রাজে যে হিমক্ষীর (ice-cream) প্রস্তুত হয়, তাহা কলিকাতার বরফের কুল্পী অপেক্ষা কিছু ভাল বোধ হয়। উপকূলে ভাল ভাল টীনের বাক্স ও ট্রোঙ্ক প্রস্তুত হয়। মান্দ্রাজে পীপ্‌ল্‌স্ পার্ক নামক উদ্যান ও পশ্বালয় অতি রম্যস্থান বলিয়া বিখ্যাত; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত আমার তাহা দেখিবার অবকাশ হয় নাই।

মান্দ্রাজের ভদ্র পল্লীতে (যেখানে ব্রাহ্মণ ও শেঠীর বসতি) বেড়াইয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, বাঙ্গালা অপেক্ষা তথায় স্ত্রীস্বাধীনতা অনেক অধিক। ইহার কারণ এই যে, এতদঞ্চলে মুসলমানদের অধিক প্রাদুর্ভাব হয় নাই, সুতরাং এখানে প্রাচীন হিন্দুদের অনেক রীতিনীতি আছে। আমার বিবেচনায় কলিকাতায় অন্তত মান্দ্রাজের ন্যায় স্ত্রীস্বাধীনতা হইলে ভাল হয়। বাঙ্গালীরা কি বলিতে পারেন, যে মান্দ্রাজের তামিল, স্ত্রীলোক এবং বোম্বায়ের মহারাষ্ট্রীরা বঙ্গাঙ্গনাদের অপেক্ষা দুশ্চরিত্রা? মান্দ্রাজের চলিত ভাষা তামিল; কিন্তু এখানের কুলীরা পর্য্যন্ত ইংরাজী কহিতে পারে; তাহাদের ইংরেজী কলিকাতার চীনে বাজারের ইংরাজী অপেক্ষা ভাল। একজন কৃষ্ণকায়, মলিন চীর-পরিচিত, দরিদ্র বালক আমার নিকট এই বলিয়া ভিক্ষা চাহিল, "No rice, sir; no pice; very hungry; eating congee, sir." জাহাজের উপর মান্দ্রাজী আয়ারা যেরূপ ইংরেজী উচ্চারণ করে, তাহা শুনিলে, অনেক কলেজের ছাত্রদের অবাক হইতে হয়। আমি মান্দ্রাজের দুইটি পাঠশালা দেখিয়াছি। শিক্ষক গানের সুরে

একখানি তামিল গ্রন্থ পড়িতেছেন। ছাত্রেরা উড়িয়া পাণ্ডাদের মত টুপী মাতায় দিয়া, লৌহ লেখনীর দ্বারায় তালপাতে আঁচড় দিতেছে। দোয়াত কলমের সহিত কাহারও সম্পর্ক নাই।

২৫শে মাঘ—অদ্য দ্বিপ্রহরের সময় জাহাজ মান্দ্রাজ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণের ১৫ অংশ পূর্ব্বে চলিল। ক্রমে মান্দ্রাজের দক্ষিণের পর্ব্বত-শ্রেণী দৃষ্টি-পথের বহির্ভূত হইল। আবার সেই অকূল নীলাম্বু রাশি। জাহাজের অনেক মেম সাহেব রূপার চুড়ি পরিয়া থাকেন। চুড়ির গঠন বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদের চুড়ির সদৃশ নহে। একগাছি ডায়মণ্ড কাটা রূপার দীর্ঘ তার স্ক্রু পেঁচের ন্যায় পাক দিয়া ঐ বিবি-আনা চুড়ি প্রস্তুত হইয়াছে। মেম সাহেবদের মধ্যে নীল ফিতা ধারিণী মিস্ মিনোর সহিত আমার ভাল আলাপ হইয়াছিল। তিনি মদ খাওয়া মহাপাপ বলিয়া অনেক উপদেশ দিলেন, এবং তদ্বিষয়ে কয়খানি গ্রন্থ আমাকে পড়িতে দিলেন। বোধ করি তাঁহার এই বিশ্বাস, যে বাঙ্গালি বাবুরা সকলেই মদ্যপায়ী। আমি বলিলাম, "শুনিয়াছি সমুদ্রে বমনোদ্যম হইলে, অল্প পরিমাণে সুরা পান করিলে ভাল হয়।" তিনি বলিলেন "এ কথা মিথ্যা; যদি প্রকৃত প্রস্তাবে সাগর-পীড়া (sea-sickness) হয়, কিছুতেই বমন নিবারণ হয় না; কেবল স্থির হইয়া শুইয়া থাকিলে এবং কিঞ্চিৎ বরফ সেবন করিলে পীড়ার উপশম হইতে পারে।" কেহ কেহ এই পীড়ার জন্য আনারস খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এ যাত্রায় আমার সাগর-পীড়া হয় নাই।

২৬ শে মাঘ—অদ্য প্রাতে জাহাজের গতি প্রায় দক্ষিণে। মধ্যকার মাস্তলে পা'ল তোলা হইয়াছে। গতকল্য দ্বিপ্রহর হইতে অদ্য দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত জাহাজ ২৬৪ মাইল চলিয়াছে। বেলা ৪টার সময় একটা পর্ব্বত দৃষ্ট হইল। কাপ্তেন সাহেব বলেন, "এ সব সিংহলের পর্ব্বত।" সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে অস্পষ্টরূপ কূল দৃষ্ট হইল।

২৭ শে মাঘ—অদ্য প্রাতে সিংহলের উপকূল স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম। কি অপূর্ব্ব শোভা! এই দ্বীপের অনুপম নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই বোধ হয়, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইহাকে স্বর্ণময়ী লঙ্কা বলিয়া ডাকিতেন। বালুকাময় বেলা-ভূমি একটি পীতবর্ণ রেখার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে; তাহার নীচে শুভ্র; তুষারবৎ, সাগরোত্থিত ফেন-মালা। কূলে

বৃক্ষরাজির মধ্যে কেবল নারিকেল ক্রমই তালরূপ নয়ন গোচর হইতেছে; কিয়দ্দূরে নারিকেল বনের পশ্চাতে, পর্ব্বতশ্রেণী নীল কাদম্বিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। পর্ব্বত সকলের সানুদেশ মেঘজালে জড়িত। সমুদ্রে ধীবরগণ মৎস্য ধরিতেছে; এবং কিংহংসগণ (sea-gulls) মৎস্য আহার জন্য ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। মহাশিশুমার (dugongs) জলে ক্রীড়া করিতেছে।

"বৈদেহি পশ্যা মলয়াৎ বিভক্তং মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃত চারুতারম্॥"

শরদাকাশের ছায়াপথ সদৃশ ফেনাবলী দেখিলাম; কিন্তু সেতুবন্ধ দেখিতে পাইলাম না। সিংহলের উত্তর দিয়া জাহাজ চলিতে পারে না; চলিতে পারিলে মান্দ্রাজ হইতে কলম্বো এক দিনেই যাওয়া যাইত। জাহাজ প্রথমে সিংহলকে পশ্চিমে রাখিয়া দক্ষিণে মুখে, পরে ঐ দ্বীপকে উত্তরে রাখিয়া পশ্চিম মুখে, পরিশেষে সিংহল পূর্ব্বে রাখিয়া উত্তর-গামী হইয়া কলম্বো নগরে পৌঁছে।

প্রায় ১০ টার সময় আমরা পইণ্ট্‌ডিগাল্‌ ছাড়াইলাম। সিংহলীরা এই নগরকে 'গালী' বলে। আগে গাল্‌ নগর সিংহলের একটি প্রধান বন্দর ছিল। এক্ষণে তথায় অধিক জাহাজ থামে না। তাহাতে তথাকার বাণিজ্যের হ্রাস হইয়াছে।

গত কল্য দ্বিপ্রহর হইতে অদ্য দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত জাহাজ ২৯৬ মাইল চলিয়াছে। গতকল্য পা'ল দেওয়া হইয়াছিল, এ জন্য এত বেগে আসিয়াছে। প্রায় বেলা ৪ টার সময় আমরা কলম্বো নগরের তরঙ্গ-রোধের নিকট পৌঁছিলাম। এই নগরে দুইজন বাঙ্গালি চাউলের কারবার করেন—শ্রীযুক্ত বাবু শশী ভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত বাবু রঘুপতি চট্টোপাধ্যায়। তাঁহারা আমাকে সাদরে তাঁহাদের বাসায় লইয়া গেলেন।

২৮শে মাঘ—সিংহলে নিত্য বসন্ত বা নিত্য গ্রীষ্ম বিরাজমান্‌। কলম্বো বিষুব রেখা হইতে প্রায় ৭ অংশ উত্তরে। সুতরাং এখানে সূর্য্য অতিশয় প্রখর; কিন্তু সাগরোত্থিত শীতল সমীরণে সৌর তেজের এত লাঘব হয় যে সিংহলে বসন্তের নিত্যাধিকার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রায় প্রতি মাসেই বৃষ্টি হয়; যে সময়ে বৃষ্টি হয় না, সে সময়েও নভোমণ্ডলে শ্বেত মেঘ দৃষ্ট হয়। পৌষ মাঘ মাসের রাত্রে এক খানা চাদর গাত্রে দিলেই চলে। বায়ুর

তাপাংশ ফারেন্‌হিটের তাপমাণের ৮০ অংশের বড় উপরে উঠে না বা নীচে নামে না; এই কারণে সিংহলে প্রায় প্রতি মাসেই পাকা আম্, পাকা কাঁটাল্ ও পাকা আনারস পাওয়া যায়। আমি মাঘ মাসে এক গাছে, আম্র মুকুল, অপক্ক আম্র, এবং অর্দ্ধপক্ক আম্র দেখিয়াছি। এখানে পনস-তালিকা অনেক জন্মে। এই ফল দেখিতে ঠিক্ কাঁটালের মত; পাক করিলে ইহার রুটীর ন্যায় স্বাদ; এই জন্য ইংরেজেরা ইহাকে রুটী ফল (bread-fruit) বলেন। নেবু, পেয়ারা,চাঁপাকলা, কাঁচকলা প্রভৃতি আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রকার ফল সিংহলে জন্মে। সজিনাখাড়া ও ফুল বারমাস পাওয়া যায়। গোল মরিচ, জাতিফল, লবঙ্গ, ছোট এলাচি, ও দারুচিনি এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এক কালে দারুচিনির আবাদ এখান কার প্রধান আবাদ ছিল। ভল্লাতক বা কাজুফল (cashew-nuts) মেদনীপুর জেলায় ও বাঙ্গালার অন্যত্র হিজলির বাদাম নামে খ্যাত, উহা সিংহলের সাধারণ ফল। ধান্য উত্তর প্রদেশে অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়; অন্যত্র ধান চাস নাই। গোধূম, ছোলা, মটর, গোল আলু, ও সর্ষপ সিংহলে জন্মে না বলিলেই হয়। এই সমস্ত দ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে আইসে। এখানে সর্ষপ তৈলের ব্যবহার নাই। নারিকেল ও তিল তৈলে পাক হয়। নুয়ারেলিয়া সিংহলের শীত প্রধান স্থান। যত কপি কলম্বোর বাজারে বিক্রীত হয় তাহা ঐ অঞ্চল হইতে আইসে। গ্রীষ্ম সন্তপ্ত ইউরোপীয় প্রবাসীরা শীতল বায়ু সেবনের জন্য ঐ স্থানে কখন কখন গিয়া থাকেন। কলম্বো নগরে যত কেন সৌর তেজ হউক না, এক বার সমুদ্র কূলে, বিশেষত গাল্ ফেস্ ওয়াক্ নামক সুন্দর রাস্তায় দাঁড়াইলে শরীর শীতল হয়।

আদিম সিংহলীদের অর্থাগমের প্রধান উপায়, নারিকেল; ঔপনিবেশিকদের, কাফি। কাফিগাছের এক প্রকার রোগ হওয়ায় অনেকে চা ও কোকোর আবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। এখানে চা উত্তম জন্মে।

(ক্রমশ)

তা. প্র. চ.

SOCIAL ORGANISM.

অথবা

সমাজ-শরীর।

প্রত্যেক শতাব্দীতেই মনুষ্য সময়ক্ষেত্রে দুই চারিটি করিয়া কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই রূপ কীর্ত্তিস্তম্ভের অভাব নাই। বাহ্য জগতে মনুষ্য নিত্য নিত্য নব নব আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা প্রকৃতির উপর নিজ আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন। অন্তর্জগতেও নিত্য নিত্য নব নব চিন্তাপ্রণালী আবিষ্কৃত হইতেছে, নব নব তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইতেছে, জ্ঞান ধর্ম্ম ও নীতি প্রভৃতির নব নব বিকাশে মনুষ্য ক্রমশই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। জীবাদির ক্রমবিকাশ ও পুরুষাণুক্রমিকতা এবং বিভিন্ন জাতি জীবের উৎপত্তির কারণ, প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বমালা চিরকালই ঊনবিংশ শতাব্দীর জয়স্তম্ভ বলিয়া পরিগণিত হইবে। সম্প্রতি ইয়ুরোপে আর একটি প্রকৃষ্ট দার্শনিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরা অদ্য ঐ নবাবিষ্কৃত তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি পদার্থকেই লোকে শরীরী বলিয়া বলিয়া অভিহিত করিত। কিন্তু এক্ষণে অবধারিত হইয়াছে যে মনুষ্য-সমাজও শরীরী পদের বাচ্য। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে ব্যক্তি-সমষ্টিকে সমাজ বলা যাইতে পারে না, ব্যক্তির উন্নতিতে সমাজ উন্নত হয় না; ব্যক্তির বিনাশে সমাজ বিনষ্ট হয় না। যেমন বীজনিহিত শক্তি-প্রভাবেই বৃক্ষের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পাদিত হয়, অবধারিত হইয়াছে যে সেইরূপে সমাজনিহিত শক্তি দ্বারাই সমাজের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পাদিত হইতেছে। আমরা এস্থলে সংক্ষেপে এই তত্ত্বের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলাম। নিম্নে ইহার সবিস্তার আলোচনা করিব। কিন্তু ঐ কথার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে দুই একটি আনুষঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিতে হইতেছে।

বিখ্যাত দার্শনিক কোম্‌ত প্রথমে এই সমাজ শরীরতত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। পরে পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ স্পেন্‌সার্‌ বহুল প্রমাণ সংযোগে এই মতের সম্প্রসারণ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ লেখক হ্যারিসন সাহেব তাঁহার বক্তৃতার এক স্থলে বলিয়াছেন—"The great philosophical discovery of this century was the proof of the reality of the organic laws in

man's life and history, and the full maturity of the idea which our great English philosopher had made familiar to us, under the name of social organism. This is......a clear and triumphant idea." ইয়ুরোপে এখনও এই তত্ত্ব সর্ব্বত্র সাদরে পরিগৃহীত হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ইয়ুরোপীয় চিন্তাপ্রণালী আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই সমাজ-শরীর-তত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, নীতিবিদ্যা প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই নিজ অধিকার ও প্রভাব বিস্তার করিবে। ফলত বিজ্ঞানে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম যেরূপ মহা বিপ্লব উপস্থাপিত করিয়াছে। বোধ হয় সামাজিক সকল শাস্ত্রেই সমাজ-শরীর তত্ত্বও সেইরূপ মহাবিপ্লব উপস্থাপিত করিবে। এই মহাবিপ্লবের পূর্ব্ব-লক্ষণ সমস্ত এক্ষণেই কতক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতেছে। মরিসন নামে একজন সাহেব গিবনের ইতিহাসের সমালোচনা স্থলে বলিতেছেন—"The pervading defect of it (Decline and Fall) all, has been already referred to—an inadequate conception of society as an organism, living and growing like other organisms, according to its own laws."

কোথায় বিশ্ববিখ্যাত গিবন আর কোথায় অজ্ঞাতনামা মরিসন! কিন্তু তথাপি সমাজ-শরীর-তত্ত্ব সাহায্যে মরিসন গিবনকে ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রতিপাদিত করিলেন। কার্লাইল ইতিহাসবেত্তা বলিয়া জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু তিনিও যে প্রণালীতে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা সেই প্রণালীকেও নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া গণনা করিবে। কার্লাইল Hero-worship নামক গ্রন্থে বলিতেছেন—"For, as I take it, universal history, is at bottom, the history of the great men who have worked here." যদি সমাজ-শরীর-তত্ত্ব প্রকৃত হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা ভ্রম-সঙ্কুল কথা আর কি হইতে পারে? এবং যদি সমদর্শী গিবন ও সত্যনিষ্ঠ কার্লাইল ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রতিপাদিত হয়েন, তাহা হইলে মেকলে, জেম্‌স্ মিল, আলিসন, ফ্রুড্ প্রভৃতি আলঙ্কারিক ও একদেশ-দর্শী ঐতিহাসিকগণ যে অপাঠ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এইরূপে অনেক দার্শনিক অনেক নীতিবেত্তা অনেক বার্ত্তা-বিৎ ভ্রমাত্মক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেন। কিন্তু তাই বলিয়াই যে এই সব মহাত্মাদিগের পুস্তকরাশি একে-

খায়েই অব্যবহার্য্য হইবে, তাহাও নহে। ইহারা জ্ঞান-জগতে যে সমস্ত বিশাল হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু ঐ সমস্ত হর্ম্ম্যের উপাদান সামগ্রী লইয়া আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তর ভিত্তির উপর অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তর প্রণালীতে নূতন হর্ম্ম্য প্রস্তুত করিয়া লইবেন। ইহাতে নৈরাশ্য, ক্ষোভ বা বিষাদের কিছুমাত্র কারণ নাই। যেহেতু ঐ সমস্ত নূতন হর্ম্ম্যে বাগ্‌দেবী শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া শুভ্র সিংহাসনে উপবেশন করিয়া শুভ্র সরসিজে শুভ্র চরণদ্বয় বিমণ্ডিত করিয়া সত্যের শুভ্র কিরণ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিবেন। অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইলে জগৎ জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত হইবে। যদি আমরা বঙ্গে ঐ জ্ঞানালোকের কিঞ্চিন্মাত্র জ্যোতিও আনয়ন করিতে পারি, তাহা হইলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব।

সে যাহা হউক, এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অবতারণা করা যাউক। কি অর্থে মানব সমাজকে শরীরী বলা যাইতে পারে, কি কি বিষয়ে মানবসমাজের সহিত শরীরী পদার্থের সাদৃশ্য আছে, কি কি বিষয়েই বা মানবসমাজের সহিত শরীরী পদার্থের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই সমস্ত প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। মানব সমাজকে শরীরী বলিয়া স্বীকার করিলে,সমাজের কি কি উপকার,বা কি কি অপকার, সঙ্ঘটিত হইবে তাহারও বিচার করা যাউক। এবং সর্ব্বশেষে মানবসমাজকে শরীরী বলিলে অন্য অন্য কি কি পদার্থকেও শরীরী বলিতে হয়, তাহা নিগূঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যাউক।

যে যে বিষয়ে মানবসমাজের সহিত শরীরী পদার্থের সাদৃশ্য আছে অগ্রে তাহাদের উল্লেখ করা যাউক।

ক। বৃদ্ধি।

(ক ১)। শরীরী পদার্থের প্রথম নিয়ম এই যে উহারা প্রথমে অতি ক্ষুদ্র অবস্থায় থাকিয়া পরে কালসহকারে অতি বৃহৎ আয়তন প্রাপ্ত হয়। সর্ষপ-কণার ন্যায় ক্ষুদ্রাকার বীজ কাল-সহকারে শাখাপ্রশাখাযুক্ত বহুবিস্তৃত বৃক্ষে পরিণত হয়। পরমাণুর ন্যায় ক্ষুদ্র শুক্রকণা কালসহকারে সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত বলিষ্ঠ দীর্ঘাকার যুবা-শরীরে পরিণত হয়। মানবসমাজও এইরূপে ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে অতীব বৃহৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অসভ্যসমাজের লোক-

সংখ্যা দশ, পনর, কুড়ি বা চল্লিশ। কিন্তু ঐ অসভ্য সমাজই ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকে পরিপূরিত হয়। অচেতন পদার্থের কলেবর কখনই এইরূপে * "শতকোটি গুণে" বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

(ক ২) সকল শরীরী পদার্থের আয়তন একরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। কোন শরীরী বা দীর্ঘকায় হস্তীর ন্যায় অতি বৃহৎ আকার ধারণ করে। কোন শরীরী বা পিপীলিকার ন্যায় চিরকালই ক্ষুদ্রাকার থাকে। মনুষ্য সমাজেও এইরূপ আয়তন বৃদ্ধির তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। উড্ডেদ্দা নামক অসভ্য জাতির সমাজ শুদ্ধ স্ত্রী পুরুষ লইয়া সংগঠিত হয়। ফিউজিয়ানদের সমাজ বার বা কুড়ি জন লইয়া গঠিত হয়। আণ্ডামানবাসীদের সমাজের লোক সংখ্যা কুড়ি বা পঞ্চাশের অধিক হয় না। এইরূপে ক্রমশ উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে দেখা যাইবে যে কোন সমাজ বা দুই শত কোনটি বা দুই সহস্র কোনটি বা দুই লক্ষ, কোনটি বা দুই কোটি লোকদ্বারা সংগঠিত হয়।

(ক ৩) শরীরী পদার্থের মধ্যে কতকগুলি এরূপ জাতি আছে যে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উদ্ভূত হইয়া পরে একত্র সম্মিলিত হয় এবং ঐ সম্মিলনের দ্বারা আবার নূতন এক শরীরী পদার্থের উৎপত্তি হয়। আর্দ্র প্রাচীরের উপর যে শেওলা পড়ে, ঐ শেওলার কতকগুলি প্রথমে একত্রিত হইয়া ক্ষুদ্র কোন উদ্ভিদের সহিত যুক্ত হয়। তাহার পরে ঐ শেওলা সংযুক্ত ক্ষুদ্র উদ্ভিদটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অন্য উদ্ভিদের সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহার কলেবর বৃদ্ধি করে। মনুষ্য সমাজেও এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা সমাজের কলেবর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মনুর সময়ে আমাদের সমাজের বোধ হয় ঐরূপ গঠন ছিল। দশটি পরিবার এক স্থানে একত্রিত হইয়া একটা সমাজ হইল। অন্য এক স্থানে আর দশটি পরিবার একত্রিত হইয়া আর একটি সমাজ হইল। পরে ঐ দুইটি সমাজ একত্রিত হইয়া আর একটী নূতন সমাজের সৃষ্টি করিল। শরীরী পদার্থের মধ্যে এরূপ সম্মিলন অনেক স্থলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সেইরূপে মনুষ্য সমাজেও পূর্ব্বোক্তরূপ সম্মিলন অনেক স্থলেই বহুকাল স্থায়ী হয় না।

---

* "তখন তাহারা কজন ছিল,

* * * *

এখন তোরা যে শত কোটি তার"——ভারতসঙ্গীত।

বৃদ্ধি সম্বন্ধে সমাজের সহিত শরীরী পদার্থের যে বৈলক্ষণ্য আছে তাহাও স্মরণ করিয়া রাখা উচিত। মনুষ্য সমাজে কোন এক ব্যক্তি এক সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্য এক সমাজে যোগ দিতে পারে। কিন্তু শরীরী পদার্থের এরূপ হয় না। এক শরীরীর অংশ অন্য শরীরীর সহিত সংযুক্ত হয় না।

খ। শরীরায়তন অনুসারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি।

খ ১। শরীরী পদার্থের আয়তন বৃদ্ধির সহিত নব নব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মৃত্তিকা নিহিত বীজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই বলিলেই হয়। অঙ্কুরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বীজ হইতে অনেক অধিক। পরে যখন অঙ্কুর বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, তখন ইহার শাখা প্রশাখা মূল কাণ্ড পুষ্প মুকুল ফল প্রভৃতি নানা প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উদ্গম হইয়া থাকে। শরীরী পদার্থের আয়তন যতই বর্দ্ধিত হয়, উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।—মনুষ্য সমাজেও এইরূপ আয়তন বৃদ্ধির সহিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অসভ্য অবস্থায় যখন সমাজের লোকসংখ্যা কুড়ি বা ত্রিশ, তখন সকল মনুষ্যই সমানভাবে অবস্থিতি করে। কিন্তু যখন উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তখন উহাদের মধ্যে একজনকে প্রধান রাজা বলিয়া গণ্য করিতে হয়। রাজা ঐ সমাজের মস্তকরূপে অবস্থান করেন, অর্থাৎ ঐ সমাজে প্রথম নূতন এক অঙ্গের সৃষ্টি হয়। পরে যখন ঐ সমাজ অন্য সমাজকে পরাজিত করিয়া নিজ সমাজভুক্ত করিয়া লয়, তখন সমাজে আর একটি অঙ্গের সৃষ্টি হয়। তখন সমাজের মধ্যে একদল লোক (জেতৃগণ) শাসনকর্ত্তা বা প্রভু বলিয়া গণ্য হন, আর এক দল লোক (বিজিতেরা) অনুশাসিত বা ভৃত্য বলিয়া পরিগণিত হয়। পরে সমাজ মধ্যে যতই লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হয়, ততই জাতিভেদ বা ব্যবসাভেদ বা অন্যরূপ প্রভেদের দ্বারা সমাজের নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকশিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। কোন অঙ্গ পুরোহিতরূপে পরিগণিত হয়; কোন অঙ্গ কৃষক বলিয়া পরিগণিত হয়। কোন অঙ্গ যুদ্ধজীবী কোন অঙ্গ পণ্যজীবী বলিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যায়। ভারতবর্ষে যে জাতিভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা বোধ হয় সমাজের এইরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বৃদ্ধির ফল মাত্র। ব্রাহ্মণেরা এই সামাজিক নিয়মের প্রতিপোষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহার স্রষ্টা নহেন। শাস্ত্রেও লিখিত আছে, যে ব্রহ্মাই জাতিভেদের স্রষ্টা।

৫২। আয়তন বৃদ্ধির সহিত যে শুদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের সৃষ্টি হয়, তাহা নহে। একই অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যঙ্গে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। জরায়ুজ শিশু প্রথমে মাংস পণ্ডের ন্যায় অবস্থান করে। পরে কাল-সহকারে ঐ মাংসপিণ্ডের কোন অংশ বা মস্তক, কোন অংশ বা হস্ত, কোন অংশ বা পদ রূপে পরিণত হয়। যে অংশে হস্ত হয়, তাহার কথাই বিবেচনা করা যাউক। ঐ অংশই কালসহকারে ভুজ প্রকোষ্ঠ অঙ্গুলি নখ প্রভৃতি নানাবিধ প্রত্যঙ্গে বিভক্ত হয়।—মনুষ্য সমাজে ঐরূপে অঙ্গ হইতে প্রত্যঙ্গের উদ্ভব হইয়া থাকে। যখন প্রথম পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়, তখন ঐ এক পুরোহিতই মন্ত্রবিৎ, গণক, ওঝা, চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হন। কালসহকারে ঐ পুরোহিত শ্রেণীর কতকগুলি লোক শুদ্ধ গণকতা করেন, কতকগুলি শুদ্ধ চিকিৎসা করেন, কতকগুলি শুদ্ধ ওঝাগিরি ব্যবসা অবলম্বন করেন। এইরূপে এক অঙ্গ হইতে নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হয়।

৫৩। শরীরী পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে নানারূপ বৈলক্ষণ্য আছে বটে, কিন্তু ঐ সমস্ত বৈলক্ষণ্যের মধ্যেও কতকগুলি সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। মূত্রকোষ ও যকৃৎ এ উভয়ের আকার গঠন ও প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে উহাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। উভয়ের মধ্যেই রক্তাগম যোগ্য ও রক্তনির্গমোপযোগী শিরা আছে। উভয়ের মধ্যেই অসার পদার্থ নিষ্ক্রমণের উপায় আছে। উভয়ের মধ্যেই এইরূপ নানা সাদৃশ্য লক্ষিত হইতে পারে।—মনুষ্য সমাজেও কোন দুই শ্রেণীর মধ্যেও এইরূপ সাদৃশ্য ও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এ উভয় জাতিতে অনেক প্রভেদ আছে। কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর পারিবারিক ও শ্রেণীগত ব্যাপার সমস্ত যে নিয়মে সম্পাদিত হয়, শূদ্রের পারিবারিক ও শ্রেণীগত ব্যাপার সমস্তও সেই নিয়মে সম্পাদিত হইয়া থাকে। যখন কাহাকেও জাতি-চ্যুত করিতে হয়, অথবা যখন কাহাকেও কোন ঘৃণিত অপরাধে সমাজিক দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়, তখন ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এ উভয়ের পারিবারিক ও জাতিগত নিয়মাবলীর সাদৃশ্য স্পষ্টরূপে অনুভূত হইতে পারে। অথবা দুইটি প্রদেশের কথা বিবেচনা করুন। বাণিজ্যপ্রধান কলিকাতার সহিত কৃষি-প্রধান কোন এক পল্লীগ্রামের তুলনা করুন। পূর্ব্বোক্ত দুই প্রদেশের আকার গঠন ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক বৈলক্ষণ্য আছে, বটে কিন্তু তথাপি এ উভয়ের আভ্যন্তরিক অবস্থা অনেক বিষয়ে তুল্য।

খ৬। যে নিয়মে শরীরী পদার্থের যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় সমূহের উৎপত্তি হয়, সেই নিয়মে সামাজিক যন্ত্র বা অঙ্গেরও উৎপত্তি হয়। প্রথমে শরীরী পদার্থের যকৃৎ নামক যন্ত্রের কথা বিবেচনা করা যাউক। সর্ব্ব প্রথমে জন্তু মধ্যে যকৃৎ নামক যন্ত্র থাকে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুর পাকস্থলীর নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি কোষ থাকে। উহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি করিয়া নির্গমদ্বার থাকে। পরে ঐ সমস্ত কোষের প্রত্যেকটিই বহু সংখ্যক কোষে বিভক্ত হয় এবং সর্ব্বশেষে ঐ সমস্ত কোষ একত্রিত হইয়া একটি যন্ত্রের সৃষ্টি করে।—মনুষ্য সমাজেও তন্তুবায় নামক শ্রেণীর বিষয় বিবেচনা করুন। প্রথমে তন্তুবায় বস্ত্রবয়ন বস্ত্র বিক্রয় প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই নিজে সম্পাদন করে। পরে তন্তুবায়ের স্ত্রীপুত্র পরিবার সকলেই ঐ কার্য্যে তাহার সাহায্য করে। সর্ব্ব শেষে ঐরূপে বহু-পরিবার একত্রিত হইলে একটি শ্রেণী বা জাতি বা সামাজিক অঙ্গের উৎপত্তি হয়। আমাদের দেশে শূদ্রদের মধ্যে যে নানা প্রকার জাতির সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা আলোচনা করিলেও এই সামাজিক যন্ত্রের উৎপত্তি বিষয় সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

গ। প্রক্রিয়া।

গ ১। শরীরী পদার্থের মধ্যে যেগুলি সর্ব্বনিকৃষ্ট তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোনরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে না। স্পঞ্জ অথবা পুরুভুজের অঙ্গ হইতে অঙ্গ কাটিয়া লইলেও উহাদের জীবনের বা জীবনী ক্রিয়ার কোনরূপ ব্যাঘাত হয় না।—সেইরূপ অসভ্য সমাজের মধ্যেও মনুষ্যে মনুষ্যে নিগূঢ় সম্বন্ধ থাকে না। অসভ্য সমাজ হইতে কতকগুলি লোক বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও সমাজের কোন ক্ষতি হয় না। অসভ্য সমাজের প্রত্যেকেই নিজ প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্য্যই নিজে করিয়া লয়। সুতরাং এক জনকে অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা করিতে হয় না।

কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর শরীরী পদার্থে এক অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গের সম্বন্ধ এরূপ নিগূঢ়, যে উহাদের কোন এক অঙ্গের বিনাশ হইলেই সমস্ত অঙ্গের বিনাশ একরূপ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। পক্ষী বা পশুর মস্তকচ্ছেদন করিলে তৎক্ষণাৎ উহাদের মৃত্যু হয়। হস্ত পদাদির বিচ্ছেদও অধিকাংশ স্থলেই মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে।—সভ্য সমাজের অঙ্গ সমূহের মধ্যেও এইরূপ নৈকট্য ও বাধ্যবাধকতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রকে পৃথক

করিলে অথবা শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণকে পৃথক করিলে, তৎক্ষণাৎ সমাজের মহা অমঙ্গল সংসাধিত হইবে। এইরূপে কলিকাতা হইতে পল্লীগ্রামকে পৃথক করিলে, কলিকাতা ও পল্লীগ্রাম উভয়ই বিনষ্ট হইতে পারে। বৈদ্যবাটী না থাকিলে কলিকাতার লোকের আহার চলিবে না; আবার কলিকাতা না থাকিলে বৈদ্যবাটীতে এক্ষণে যতগুলি কৃষক প্রতিপালিত হইতেছে, ততগুলির প্রাণরক্ষা হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিবে।

গ ২। নিকৃষ্ট শ্রেণীর শরীরী পদার্থের এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের কার্য্য অক্লেশে সম্পাদিত করিতে পারে। এমন একরূপ জন্তু আছে যে তাহার পৃষ্ঠদেশ অক্লেশে উদরের কার্য্য করিতে পারে এবং তাহার উদর অক্লেশে পৃষ্ঠের কার্য্য করিতে পারে। উচ্চ শ্রেণীর শরীরী পদার্থে কেবল দুই এক স্থলেই ঐরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইয়া থাকে। কোন কারণে যকৃতের ক্রিয়া-রোধ হইলে মূত্রকোষ বা ত্বক্ দ্বারা পিত্ত নির্গম ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু যেখানে শরীরী পদার্থ অত্যুচ্চ শ্রেণীতে অবস্থান করে অথবা যেখানে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ ভিন্ন ভিন্ন আকার ও গঠন ধারণ করে, সেখানে এক অঙ্গের দ্বারা অন্য অঙ্গের কার্য্য চলে না।—মনুষ্য সমাজেও এই সমস্ত বিষয়ের সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায়। অসভ্য সমাজে একজন মনুষ্যের কার্য্য অক্লেশে অন্য একজনে সম্পন্ন করিতে পারে। কিন্তু সভ্য সমাজে এরূপ হয় না। বিচারপতি যাজকের কার্য্য করিতে পারেন না। শ্রমজীবী বিচারপতির কার্য্য সম্পাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম। এইরূপে এক ব্যবসার লোক অন্য ব্যবসা চালা-ইতে পারেন না।

গ ৩। শরীরী পদার্থের আর এক নিয়ম এই যে, যে শরীরীর আকার গঠন ও প্রক্রিয়া যত পৃথক, যে শরীরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যত পার্থক্য, সে শরীরী সেই পরিমাণে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে।—সেইরূপ মনুষ্য সমাজেও যে সমাজের প্রক্রিয়ার যত পার্থক্য অর্থাৎ যে সমাজে যে পরিমাণে জাতিভেদ ও ব্যবসা ভেদের আধিক্য, সেই সমাজ সেই পরিমাণে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

ঘ।

শরীরী পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বৃক্ষে ফল পুষ্প পত্র প্রভৃতি প্রতি বর্ষে নব নবরূপে উদ্গত হইয়া থাকে। শাখা প্রশাখা ছেদ করিয়া লইলেও তাহা হইতে বৃক্ষের বিনাশ সম্পাদিত

হয় না।—এইরূপে মনুষ্য সমাজেও অহরহ নানা ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, কখন কখন বা দুই একটি শ্রেণীও বিলুপ্ত হইতেছে, তথাপি ইঁহাতে সমাজের বিনাশ সম্পাদিত হইতেছে না।

এইরূপ শরীরী পদার্থের সহিত মনুষ্য সমাজের আরও অনেক সাদৃশ্য দেখাইতে পারা যায়। কিন্তু এই প্রবন্ধে আমাদিগকে অনেক কথা বলিতে হইবে। এজন্য এক্ষণে শরীরী পদার্থের সহিত সমাজের কি কি বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

১। সাধারণত শরীরী পদার্থ আকার বিশিষ্ট। কিন্তু মনুষ্য সমাজ সাধারণ শরীরী পদার্থের ন্যায়স্বতন্ত্র আকারবিশিষ্ট নহে। তবে এক কথা এই যে মনুষ্য সমাজের ন্যায় বহুতর উদ্ভিদ্ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক জন্তুরও স্বতন্ত্র আকার নাই। কিন্তু তথাপি উহারা শরীরী পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

২। শরীরী পদার্থের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক স্থলেই সম্বদ্ধ ও সম্মিলিত হইয়া অবস্থান করে। কিন্তু মনুষ্য সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দূরে দূরে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করিতে পারে। হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণশ্রেণীর কতক অংশ পূর্ব্বে, কতক অংশ উত্তরে অবস্থান করে। এই বৈলক্ষণ্য আপাতত অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এমন অনেক উদ্ভিদ্ ও ক্ষুদ্র জন্তু আছে যে তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পরস্পর হইতে অনেক দূরে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে।

৩। শরীরী পদার্থের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজে নিজে গতিবিধি করিতে পারে না। অর্থাৎ কোন একজন মনুষ্যের হস্তপদাদির স্বতন্ত্র গতিশক্তি নাই। কিন্তু মনুষ্য সমাজের অঙ্গ অর্থাৎ মনুষ্য নিজে যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে পারে। তবে এস্থলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে মনুষ্য সামাজিক কোন ঘটনা সম্বন্ধে নিজে যথেচ্ছা গমনাগমন করিতে পারে না। যদিও বিধবা-বিবাহের ঔচিত্য আমরা সকলেই সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, কিন্তু তথাপি আমরা স্বতন্ত্রভাবে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে কোনরূপ কার্য্য করিতে পারিতেছি না।

৪। শরীরী পদার্থের সকল অংশেরই বুদ্ধিশক্তি বা প্রবৃত্তি নাই। অর্থাৎ মনুষ্যের মস্তিষ্কেই ঐ দুইটি ক্ষমতা আছে। কিন্তু হস্তপদাদি অন্য কোন অঙ্গে ঐ দুইটি শক্তির বিদ্যমানতা অনুভব করা যায় না। কিন্তু মনুষ্য সমাজের প্রত্যেক অঙ্গের অর্থাৎ প্রত্যেক মনুষ্যেরই বুদ্ধিশক্তি, প্রবৃত্তি, বিচার-শক্তি প্রভৃতি আছে।

এইরূপে মনুষ্য সমাজে ও শরীরী পদার্থে এতদ্ভিন্ন অনেক বৈলক্ষণ্য দেখাইতে পারা যায়। কিন্তু সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে, যে নানাবিধ বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও শরীরী পদার্থে ও সমাজে বহুবিধ প্রবল সাদৃশ্য আছে। অন্তত ইহা বোধ হয় অবাধে বলা যাইতে পারে, যে উৎপত্তি, স্থিতি ও বৃদ্ধি বিষয়ে শরীরী পদার্থ ও সমাজ প্রায়ই এক নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। স্পেন্সর অধিকাংশ স্থলেই প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা সমাজ-শরীরতত্ত্বের প্রতিপোষণ করিয়াছেন। আমরা দুইটি বর্ত্তমান ঘটনার উল্লেখ করিয়া নিম্নে ঐ তত্ত্বের সমর্থন করিতেছি।

যখন অষ্ট্রেলিয়াতে ইংরেজেরা প্রথম উপনিবেশ সংস্থাপন করেন তখন তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিতেন। অর্থাৎ তখনও অষ্ট্রেলিয়াতে সমাজ সংস্থাপিত হয় নাই। পরে যতই অষ্ট্রেলিয়াতে ইংরাজদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, ততই তথায় সমাজের আয়তনও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং ঐ আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তথায় ইংরাজদের মধ্যে ঐক্য ও সংযোগ পরিপক্ব হইতে লাগিল। এক্ষণে অষ্ট্রেলিয়াতে একটি সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। ঐ সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করিতে শিখিতেছে, পরস্পর পরস্পরের সহিত ঐক্য সংস্থাপন করিতেছে এবং সমস্ত সমাজ যেন একটি শরীরী পদার্থের ন্যায় কার্য্য করিতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের সহিত উহার বর্ত্তমান ইতিহাসের তুলনা করিয়া অর্ল অব্ কারনারবন বলিতেছেন—"Some few years ago Australian confederation was no popular subject in Australia. I can remember the time when mere allusion to such a contingency would have been considered very infelicitous. Long too, after that time the certain conflict of interests, the opposition of tariffs, and the risk of local jealousies would have made any such proposal absolutely idle. In all these respects we may note a great change ... ... Canadian confederation was no exceeption to this rule, though at first sight it may seem so... .. But though ultimate and complete union must probably be approached by successive steps, the last few years have contributed some what to this result. As regards Australia itself the rivalries and jealousies of former times are lessened; there has been an insensible growth of common action in matters of postal,

telegraphic, ocean and railway communication, and there has been a larger intercourse social and commercial ; there have been conferences binding one and all to a sense of common interest and action." এই সমস্তের অর্থ এই যে, অষ্ট্রেলিয়ার সমাজ শরীরের আয়তন ও প্রক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মানুসারে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বদেশের কথাও ভাবিয়া দেখুন। মুসলমানেরা অস্ত্রবলে হিন্দু সমাজকে সাংঘাতিকরূপে আহত করিয়াছিল। হিন্দু-সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত হীনবল ও হততেজা হইয়া বিচ্ছিন্নভাবে এখানে সেখানে অল্প পরিসর ক্ষেত্রের উপর অল্পপ্রাণ লইয়া কার্য্য করিতেছিল। কিন্তু কালসহকারে ইংরাজেরা এদেশে আসিয়া মুসলমানদিগকে পরাজিত করিবার জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, হিন্দুদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। সেই সময় হইতেই হিন্দু সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইতে চেষ্টা করিতেছে। এক্ষণে হিন্দুসমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ পূর্ব্বাপেক্ষা পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলামঙ্গলে সমবেদনা প্রকাশ করিতে শিখিয়াছে। নিত্য নিত্য নব নব কারণে হিন্দুসমাজ পুনর্ব্বার একত্রিত হইবার চেষ্টা ও আয়োজন করিতেছে। জাতীয় সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। রেলওয়ে পথকর প্রভৃতির দ্বারা এই সম্মিলনের সাহায্য করা হইতেছে। অন্য দিকে মুসলমান সমাজ স্পষ্ট হইতেছে। ইংরাজদের আক্রমণে মুসলমান সমাজ চূর্ণীকৃত ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। অল্পে অল্পে ঐ সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্মিলিত হইতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সমাজ-সম্মিলনের পূর্ব্বলক্ষণ দেখা যাইতেছে। উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, বোম্বাই মান্দ্রাজ, —সর্ব্বত্রই এই শুভানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইতেছে। যদি শত্রু কর্ত্তৃক আহত না হয়, তাহা হইলে আশা করা যাইতে পারে, যে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সমাজ একত্রীকৃত হইয়া এক মহাবল সমাজ শরীরের উদ্ভব সম্পাদন করিবে।

হয়ত সেই প্রকাণ্ড সমাজ-শরীর এক ধর্ম্মে, এক নীতিতে, এক ভাবে, এক প্রবৃত্তিতে এমন কি এক ভাষায় সংবদ্ধ হইয়া, এক স্বরে এক প্রাণে ভারত মাতার অর্চ্চনা করিয়া, সম উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া পৃথিবীতে ভারত সমাজ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। এক্ষণে আমাদের সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রভূত অনৈক্য দেখা যাইতেছে। ঐ অনৈক্য স্বাভাবিক নিয়মের ফল।

উহা দেখিয়া ভীত বা নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। প্রথম সম্মিলনের সময় সকল সমাজেই ঐরূপ অনৈক্য, বিসম্বাদ ও মনান্তর ঘটিয়া থাকে,—এই কথা স্মরণ করিয়া আমাদের সকলেরই এই জাতীয় সম্মিলনের সাহায্য করা উচিত। বাঙ্গালি অসার কাপুরুষ, উড়িষ্যাবাসী নির্ব্বোধ, বেহারবাসী কোপন স্বভাব প্রভৃতি আত্মনিন্দাকর কথার ব্যবহার না করিয়া আমাদের সকলেরই সমাজ-শরীর সংগঠনের চেষ্টা করা উচিত। কারণ, যদিও স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই এই সমাজশরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে সত্য, তথাপি মনুষ্য নিজ নিজ চেষ্টায় ও পরিশ্রমে উহার নানারূপ উন্নতি সংসাধিত করিতে পারে।

হরগৌরী সম্বাদে সর্ষপ মাহাত্ম্য কথন।

মহানগরে মহামেলা। ইংরাজের অসীম ভারতসাম্রাজ্যের অপূর্ব্ব রাজধানীতে অপরিমেয় রাজশক্তির সাহায্যে, অতুল অদৃষ্টপূর্ব্ব অভিনব রাজসূয়। ইংরাজ দম্ভ করিয়া বলিতেছে—পৃথিবীতে যে যেথানে আছে সকলকে বলিতেছে—'আইস, কে কোথায় আছ, আইস, যাহার যাহা দেখাইবার আছে, তাহা লইয়া আমার এই অন্তর্জাতিক রাজসূয়ে আইস। কে কেমন শিল্পী, কে কেমন বিজ্ঞানবিৎ, কে কেমন কৃতী, কে কেমন সৌভাগ্যশালী, আমার এই রাজসূয়ে তাহার পরীক্ষা হইবে।' শুনিয়া, সেই অপূর্ব্ব রাজসূয়ে কত দেশ হইতে কত লোক আসিল—ইংলণ্ড হইতে ইংরাজ, ফ্রান্স্ হইতে ফরাসী, জর্ম্মণি হইতে জর্ম্মাণ, ইতালী হইতে ইতালীয়, আমেরিকা হইতে আমেরিক, চীন দেশ হইতে চীন, জাপান হইতে জাপানবাসী, দেনমার্ক হইতে দিনামার, দ্বীপ হইতে দ্বীপবাসী, উপদ্বীপ হইতে উপদ্বীপবাসী—দিগ্ দিগন্ত হইতে অসংখ্য অগণ্য লোক আসিল। কত সোণা রূপা আসিল; কত মণিমাণিক্য আসিল; কত ঝাড়লণ্ঠন আসিল; কত গাড়ী পাল্কী আসিল; কত চিত্র চিত্রফলক আসিল; কত রকমের কত কি আসিল; সভ্যের সভ্যতা আসিল; অসভ্যের অসভ্যতা আসিল। যুগযুগান্তের গোড়া হইতে যুগযুগান্তের শেষ পর্য্যন্ত মানুষ জ্ঞানবলে, বুদ্ধিকৌশলে, শিল্পে যত সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহার সকলই আসিল। ভারতের আধুনিক হস্তিনাপুরে পৃথিবীর অসংখ্য যুগের এবং অসংখ্য জাতির মহা সম্মিলন হইল। মহাস্মৃতির সহিত মহাপ্রত্যক্ষ মিশিয়া

গেল। মহাকালের মহাস্রোত অদৃশ্য হইল। মহাকাল মহামূর্ত্তি ধারণ করিল। সে মূর্ত্তিতে সকলই দেখিলাম, সকলকেই দেখিলাম। কেবল দেখিলাম না—বঙ্গের ক্ষুদ্র সরিষা। ক্ষুদ্র বলিয়া কি বঙ্গের সরিষা মহাকালের মহাশরীরে স্থান পাইল না? ভাবিতে ভাবিতে সেই অপূর্ব্ব পুরাণ কথা মনে পড়িল। মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

দ্বাপর যুগে মাল্যবান নামে এক গন্ধর্ব্ব ছিল। চিত্রাণী এবং চিত্রারাণী নামে তাঁহার দুই পত্নী ছিল। একদা মাল্যবান পত্নীদ্বয়কে লইয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিল একটি বৃক্ষশাখাস্থিত পক্ষীর বাসা হইতে একটি ক্ষুদ্র শাবক মাটীর উপর পড়িয়া গেল। 'আহা! কি হইল, কি হইল!' বলিয়া মাল্যবানের পত্নীদ্বয় দৌড়াইয়া গিয়া শাবকটিকে তুলিয়া লইয়া দেখিল, ছানাটি অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার একটি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! সুশ্রুষা দ্বারা ভাল করিবে বলিয়া, তাহারা শাবকটিকে লইয়া গৃহাভিমুখিনী হইল। কিন্তু পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখিল, শাবকজননী এক এক বার শূন্য নীড়টি বেড়িয়া বেড়িয়া, এক এক বার তাহাদিগেরই দিকে একটু অগ্রসর হইয়া সকরুণস্বরে চীৎকার করিতেছে। দেখিয়া তাহারা ফিরিল। ফিরিয়া সেই বৃক্ষতলে একটি ক্ষুদ্র লতামণ্ডপ প্রস্তুত করিল। পতিকে কহিল—'আপনি গৃহে গমন করুন। যতদিন পক্ষীশাবকটি আরাম না হয়, তত দিন আমরা এই লতামণ্ডপে থাকিয়া ইহার সেবা করিব। অতএব প্রার্থনা, যে আপনি তত দিন এ লতামণ্ডপে আসিবেন না, কিন্তু যখন ইচ্ছা হইবে তখনি পরিচারিকা দ্বারা উহার তত্ত্ব লইবেন।' 'তোমাদের পবিত্র কামনা সিদ্ধ হউক,' এই কথা বলিয়া মাল্যবান সহর্ষচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। সপত্নীদ্বয় পক্ষীশাবকের সুশ্রুষা করিতে আরম্ভ করিল। উদ্যান হইতে নানাবিধ লতাপাতা আনিয়া সেইগুলির রস শাবকটির গাত্রে লাগাইতে লাগিল। তাহার জন্য অতি কোমল শয্যা প্রস্তুত করিল। রাত্রিকালে হয় চিত্রাণী নয় চিত্রারাণী তাহাকে আপন বক্ষোপরি শোয়াইয়া রাখিতে লাগিল। শাবকের প্রতি এত স্নেহ ও যত্ন দেখিয়া শাবকজননীও লতামণ্ডপে আসিতে আরম্ভ করিল এবং তাহাকে ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল যোগাইতে লাগিল। ক্রমে রমণীদ্বয়ের বক্ষোপরি শাবকের পার্শ্বে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিতে লাগিল। স্নেহের সুশ্রুষায় পক্ষীশাবক অল্পদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। তখন পতিকে ডাকাইয়া, তাহার সমক্ষে

সেই ক্ষুদ্র লতামণ্ডপটি শাবক এবং শাবকজননীকে দান করিয়া সপত্নীদ্বয় গৃহে প্রত্যাগমন করিল। গৃহে আসিয়া মুগ্ধ মাল্যবান্ জ্যেষ্ঠা চিত্রাণীকে হীরক নির্ম্মিত একটি নথ এবং কনিষ্ঠা চিত্ররাণীকে নীলাভ মুক্তার মুখে হীরকের টীপ দেওয়া একটি ক্ষুদ্র নোলক—প্রেম সম্ভাষণ সহকারে উপহার দিল। সপত্নীদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বে কেহ কখন সপত্নীর বিদ্বেষ দেখিতে পায় নাই। কিন্তু আজ মাল্যবানের পাপে—ধর্ম্মচর্য্যার পুরস্কার করার পাপে—বিদ্বেষানল জ্বলিয়া উঠিল। চিত্রাণী নথ পাইয়া যারপর নাই আহ্লাদিত হইল, কিন্তু চিত্রারাণী নোলক দেখিয়া রাগে, অভিমানে জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িল। "ওর অত বড় আর আমার এত ছোট," এই বলিয়া চিত্রারাণী ক্ষুদ্র নোলকটি স্ফাটিক নির্ম্মিত গৃহতলোপরি সজোরে নিক্ষেপ করিয়া কক্ষান্তরে গমন করিল। নোলকের নীলাভ মুক্তা চূর্ণ হইয়া মুক্তা মুখস্থিত সূর্য্য রশ্মি বিন্দুবৎ তিনটি হীরকের টীপসহ স্ফাটিকোপরি ছড়াইয়া পড়িল। মাল্যবান চিত্রারাণীকে অনেক বলিল, অনেক বুঝাইল, অনেক মিনতি করিল—চিত্রারাণীর রাগ পড়িল না। চিত্রাণীও সপত্নীকে কত বলিল—সপত্নী কিছুতেই বুঝিল না। শেষে নাসিকা হইতে নথ উন্মোচন করিয়া স্নেহ বিগলিত স্বরে—"দিদি তুমিই তবে এই নথ পর,"—বলিয়া জোর করিয়া চিত্রারাণীকে নথ পরাইতে উদ্যত হইল। তখন চিত্রারাণীর রাগ দ্বিগুণ হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। নথ দূরে নিক্ষেপ করিয়া "আমি আমার মার কাছে যাই"—বাষ্প গদগদস্বরে এই কথা বলিয়া, ভগবতী-ভক্ত ভামিনী অভিমান ভরে কৈলাসে গমন করিয়া, কৈলাস বাসিনীর নিকট অভিযোগ করিল। ভক্ত প্রিয়া গৌরী মাল্যবানের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া হরের নিকট গমন করিয়া দেখিলেন, মহাদেব দেবর্ষি নারদের সহিত তত্ত্বকথা কহিতেছেন। কিন্তু ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া গৌরী—তত্ত্বকথা উপেক্ষা করিয়া বলিলেন—"দেব, গন্ধর্ব্ব মাল্যবান আজ তাহার জ্যেষ্ঠা পত্নী চিত্রাণীকে এক খানি বহুমূল্য বৃহৎ অলঙ্কার দিয়া এবং কনিষ্ঠা পত্নী চিত্রারাণীকে অতি ক্ষুদ্র একটি নোলক মাত্র দিয়া যারপর নাই গর্হিত কার্য্য করিয়াছে। আপনি এই দণ্ডে দুষ্টের প্রতি যথাবিহিত দণ্ড বিধান করুন। এই কথা শুনিয়া ভবানীপতি ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং ভবানীর হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে আপনার বামপার্শ্বে বসাইলেন। তিনি বসিলে পর, গন্ধর্ব্বপত্নী চিত্রারাণী ভবানীর পাদমূলে উপবেশন করিল। তখন দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন করিয়া ভগবান ভবানীপতি এইরূপ কহিতে লাগিলেন;—

'তবে আরো একটি তত্ত্বকথা শ্রবণ কর। বৃহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনা করিয়া গন্ধর্ব্ব কন্যা অভিমান করিয়াছেন। মনে করিয়াছেন যে, ক্ষুদ্র পদার্থ অতি তুচ্ছ; বাস্তবিক লোকে এই রূপই মনে করিয়া থাকে। যে অতি ক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্ম, লোকে তাহাকে অসার অপদার্থ ভাবিয়া ঘৃণা করে। কিন্তু তত্ত্বকথা এই,—যে, ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম হইলেই অসার বা অপদার্থ হয় না। পরমব্রহ্ম সূক্ষ্ম, তন্মাত্র সূক্ষ্ম, লিঙ্গশরীর সূক্ষ্ম; কিন্তু পরমব্রহ্ম, তন্মাত্র, লিঙ্গশরীর—সকলই অতি উৎকৃষ্ট; সকলই স্থূল ও শরীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—পরমব্রহ্ম ব্রহ্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ভূতের তন্মাত্র—ভূত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; লিঙ্গশরীর স্থূলশরীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব স্থূলের তুলনায় সূক্ষ্ম কোন রকমেই তুচ্ছ নয়। আবার প্রণিধান করিলে বুঝিতে পারিবে যে, ক্ষুদ্র যদি ক্ষমতাশালী হয়, তবে সে বৃহৎ অপেক্ষাও বৃহৎ। লোকে বৃহতের সহিত ক্ষমতার সংযোগ কল্পনা করিয়া থাকে। সেটি ভ্রম। জীবদেহে যে পদার্থ হইতে শক্তি ও ক্ষমতা উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ দেহের অবশিষ্টভাগ অপেক্ষা অনেক অল্প। ফলত শক্তি-তত্ত্বের মূল কথা এই যে, শক্তি শরীরের ফল নয়; গুণের ফল। গুণের নামই শক্তি। গুণ স্বল্পশরীর বিশিষ্ট বা শরীর শূন্য হইলেও বৃহৎ। অতএব ক্ষুদ্রের যদি গুণ থাকে, তবে ক্ষুদ্র তুচ্ছ পদার্থ নয়। এই প্রসঙ্গে সৃষ্টি খণ্ডের একটি রহস্য পূর্ণ উদাহরণের দ্বারা প্রকৃত শক্তিতত্ত্ব বুঝাইতেছি। অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। মর্ত্ত্যভূমিতে যত রকম শস্য ও বীজ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে সর্ষপ অতি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম। দেখিলে সর্ষপকে এক জাতীয় পদার্থ বলিয়া মনে হয় না, কেননা সর্ষপের বর্ণ বহুবিধ—এমন কি, স্থির নিরীক্ষণ করিলে দুইটি সর্ষপের এক বর্ণ বলিয়া বোধ হইবে না। অতএব দৃশ্যে সর্ষপ অতি ক্ষুদ্র, এবং জাতীয়-লক্ষণ বিবর্জ্জিত। এবং সেই জন্য মর্ত্ত্যভূমে লোকে সর্ষপকে তুচ্ছ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সর্ষপ অতি বৃহৎ, অতি মহৎ পদার্থ। সর্ষপ উচ্চ জমিতে জন্মে, নীচ জমিতে জন্মে না, যেন সে কত উচ্চ, কত মহৎ বংশ হইতে উদ্ভূত। যেখানে সর্ষপ জন্মে, সেই খানেই দেখিবে, সর্ষপ পৃথিবীর উচ্চতর স্তরে অবস্থিত। সর্ষপ পৃথিবীর নিম্নতর স্তরে নামিতে পারে না, নামিলে মরিয়া যায়। উচ্চ স্তরে জন্মিয়াও সর্ষপ ক্ষুদ্র বটে—এত ক্ষুদ্র যে লোকমধ্যে সর্ষপই ক্ষুদ্রতার পরিচয় স্থল। কিন্তু ক্ষুদ্রতম হইয়াও সর্ষপ অসম্ভব রকম শক্ত। ক্ষুদ্রতম সর্ষপকে অঙ্গুলি দ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া অমিতবল প্রয়োগ পূর্ব্বক পেষণ করিলেও ভাঙ্গিতে পারা যায়

না। দেবর্ষি! এত ক্ষুদ্র হইয়াও যে, এত শক্ত, এত টন্‌কো, সেইত পদার্থ। যে টন্‌কো, সে ক্ষুদ্র হইলে কি আসিয়া যায়? যে ক্ষুদ্র সে টন্‌কো হইলে যত বড়, যত প্রশংসার বস্তু হয়, যে প্রকৃত পক্ষে বৃহদাকার, সে টন্‌কো হইলে তত বড়, তত প্রশংসার বস্তু হয় না। আবার ক্ষুদ্র সর্ষপের যে সার পদার্থ তৈল, তাহার অপেক্ষা সার পদার্থ ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই। যেখানে ব্যথা, যেখানে বেদনা সেই খানেই সর্ষপ তৈলের প্রয়োজন—যেখানে প্রাণবায়ু কুপিত, জ্ঞান-প্রবাহ অস্থির ও অনিশ্চিত, সেই খানেই ক্ষুদ্র সর্ষপের তৈল অমৃত বিন্দুবৎ স্নিগ্ধকর ও স্নায়ব-স্থৈর্য্য-সাধক। যেখানে যে কোন যন্ত্র অচল, সেই খানেই ক্ষুদ্র সর্ষপের তৈল সেই যন্ত্রের একমাত্র পরিচালক। যন্ত্ররূপী ব্রহ্মাণ্ড তৈল নহিলে চলে না। যন্ত্রের দোষে যেখানে কাজ আটকায়, সেখানে ক্ষুদ্র সর্ষপের তৈল ভিন্ন উপায় নাই। মর্ত্ত্যভূমে তৈল গতির একমাত্র উপায়। সর্ষপ তৈলের এতগুণ। আবার তৈল বাদে সর্ষপের যে খোসা ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা মর্ত্ত্যভূমে সমস্ত গো-জাতির জীবন স্বরূপ এবং সকল প্রকার শস্য উৎপন্ন করিবার প্রধান শক্তি স্বরূপ। দেবর্ষি! ক্ষুদ্র সর্ষপের তেজইবা কত। বজ্র নির্ম্মিত দেহকেও ক্ষুদ্র সরিষা জ্বালাইয়া দিতে পারে, মৃত্যুমুখী জীবকেও ক্ষুদ্র সরিষা মৃত্যুমুখ হইতে টানিয়া আনিতে পারে। এসকলই বিজ্ঞানের কথা—প্রকৃতি-তত্ত্ব জ্ঞাত হইলেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানও বুঝাইতে পারে না, ক্ষুদ্র সরিষায় এমন একটি অলৌকিক ও অসাধারণ গুণ আছে। লোক মধ্যে প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, দুরন্ত দৈত্য, দানব, ভূত, প্রেত ক্ষুদ্র সরিষার তেজ সহ্য করিতে অক্ষম। দুই একটা সরিষা দেখিলেই দুর্দ্দান্ত দানবও দশদিক ছাড়িয়া পলায়ন করে, জগতে যত কিছু এবং যে কেহ দুষ্ট আছে, ভীতিবিহ্বল হইয়া সব দূরে লুকাইয়া পড়ে। সরিষার এত শক্তি, এত তেজ বলিয়া, সে যখন প্রস্তুত হইতে থাকে, তখন তাহার ফুল দেখিলেই লোকে হতজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং সেই জন্য হতজ্ঞান হওয়া কাহাকে বলে বুঝাইতে হইলে, লোকে "সরিষা ফুল দেখা" এই বিষম বাক্য প্রয়োগ করে। এসব কথা বিজ্ঞান বুঝাইতে পারে না। একথা মন্ত্র তত্ত্বের অন্তর্গত। অতএব বুঝিলে যে, প্রকৃত শক্তি থাকিলে ক্ষুদ্রত্বই প্রকৃত মহত্ত্ব, যে ক্ষুদ্র সেই সর্ব্বাপেক্ষা বড়।

অপূর্ব্ব রহস্যপূর্ণ তত্ত্ব কথা শুনিয়া গন্ধর্ব্বপত্নী চিত্রারাণী ভূতপতি এবং ভবানীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে গন্ধর্ব্বপুরে গমন করিল। তখন জগজ্জননী গৌরী দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—বৎস!

তুমি তত্ত্বজ্ঞ। সর্ষপ-মাহাত্ম্য কথার তাৎপর্য্য বুঝিয়াছ। এখন যাও, আমার অভিমত প্রকারে মর্ত্ত্যে সেই কথা প্রচার কর। শুনিয়া নারদ ঋষি ক্ষণমাত্র ধ্যানস্থ হইলেন। তাঁহার চিত্ত পুলকিত, শরীর রোমাঞ্চিত, এবং শুভ্র শ্মশ্রু এবং শুভ্র জটা স্ফীত হইয়া উঠিল। বীণাযন্ত্রে উপর্য্যুপরি বড় বড় ঘা মারিয়া হরগৌরী স্তব গাহিতে গাহিতে দেবর্ষি যেখানে পুণ্যসলিলা সুরধুনী অনন্ত সাগরে মিশিয়াছেন, সেই অপূর্ব্ব সাগরসঙ্গম তীর্থে মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং গন্ধর্ব্বপত্নীর ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া সুমধুর ও সুগম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন;—

যে দেশ এই সাগরসঙ্গম পুণ্যে পুণ্যবতী, সেই দেশে কোন মহাবংশ হইতে অতি ক্ষুদ্র দেহবিশিষ্ট একটি মানব জাতি উৎপন্ন হইবে। প্রথমে তাহারা ক্ষুদ্র বলিয়া লোকমধ্যে ঘৃণিত হইবে। কিন্তু কালসহকারে ক্ষুদ্র সরিষার ন্যায় অনন্ত গুণে ভূষিত হইবে। তখন জীবমধ্যে তাহারা উচ্চ পথে বিচরণ করিবে। ক্ষুদ্র হইয়াও তাহারা এক একজন এক একটি লৌহ গুটিকার ন্যায় শক্ত হইবে। তাহারা এত কার্য্যক্ষম হইবে যে, যেখানে কার্য্য কঠিন, সেখানে তাহাদের সাহায্য ব্যতীত কার্য্যসম্পন্ন হইবে না। যেখানে গতির প্রয়োজন, লোক সমাজে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক, সেখানে তাহারাই একমাত্র উপায়। তাহারা এত তত্ত্বদর্শী হইবে যে, অন্যের যাহা গূঢ় তথ্য, তাহাদের নিকট তাহা অতি তুচ্ছ কথা। তাহাদের প্রভাবে বলবান আপনাকে হৃতবল অনুভব করিবে; নির্জ্জীব নিষ্পীড়িত মুমূর্ষু সজীব হইয়া উঠিবে। যাহারা দুষ্ট এবং দুর্দ্দমনীয়, তাহারা সেই দুর্গতিনাশিনী দুর্গাভক্ত জাতির ব্যক্তিমাত্রকে দেখিলে ভয়ে পলায়ন করিয়া পৃথিবীর অপরিচিত প্রদেশে লুকাইয়া থাকিবে এবং স্বল্পকাল মধ্যে লয়প্রাপ্ত হইবে।

এই অপূর্ব্ব কাহিনী প্রকাশ করিয়া দেবর্ষি নারদ বেদব্যাসের নিকট বিদায় হইয়া দেবলোকে প্রত্যাগমন করিলেন। ভারত ভক্ত বেদব্যাস যথাকালে সেই কাহিনী পুরাণে লিপিবদ্ধ করিলেন।

পুরাণ কথা কি মিথ্যা হইবে?

বেদব্যাসের বাসনা কি পূর্ণ হইবে না?

বঙ্গের ক্ষুদ্র সরিষা কি মহাকালের মহাশরীরে স্থান পাইবে না?

নবজীবনের গান।

ভোর হইল, জগত জাগিল, চেতনে চাহিল নারী নর,
মধুর তানে, বিভুর গানে, বিহঙ্গমকুল ছাড়ে স্বর।
উদিত গগনে, লোহিত বরণে, তিমির-নাশন দিবাকর,
আলোকে ভাসিছে, পুলকে হাসিছে, নিখিল নাথের চরাচর।
অচল অসাড়, অটল পাহাড়, সমুখে হেরিয়া প্রভাকর,
চমকি চাহিল, থমকি রহিল, ঝক্‌মক্ করে গিরিবর।
মাঠেতে রাখাল, গোঠেতে গোপাল, শ্যামলে ধবল মনোহর,
বেণুর বাদনে, ধেনুর চারণে, শ্রবণ নয়ন তৃপ্তিকর।
লতার উপরে, পাতার ভিতরে, শাদা শাদা ফুল কি সুন্দর,
বায়ুর চালনে, প্রভুর চরণে, প্রণিপাত করে ভক্তি-ভর।
সরসী শোভিনী, রূপসী নলিনী, পরশি কোমল রবিকর,
ত্যজিল শয়ন, তুলিল বয়ন, ঝরিছে নয়ন ঝর ঝর।
সুগন্ধ লইয়ে, সুমন্দ বহিয়ে, শীতল সমীর সুখকর,
শাখীরে নাড়িল, পাখীরে বলিল, যাও গাও দিক্‌দিগন্তর;
জাগিল পাখী, জাগিল শাখী, হেরিল লতারে হৃদিপর,
বনের লতা, মনের কথা, বলিছে কাঁপিছে থর২।
ঘাসের ফলায়, গাছের পাতায়, মোতি ছড়াছড়ি অজস্র,
প্রতুল ঐশ্বর্য্য, অতুল আশ্চর্য্য, এ রাজ্যেরই যোগ্য রাজেশ্বর।
অনন্ত কেতন, অচিন্ত্য চেতন, মহান বিশাল বিশ্বধর,
সময় জীবন, প্রলয় ক্রীড়ন, ললিত ভৈরব মহেশ্বর।

কুঞ্জ সরকার।

কুঞ্জ সরকারকে কুঁজো মহাশয়ও বলিত। তিনি বাস্তবিক কুব্জ ছিলেন। কুঁজো মহাশয়ের নামে ও আকৃতিতে এইরূপ সাদৃশ্য লইয়া রাঢ় অঞ্চলে একটা বড় গণ্ডগোল ছিল। এক দিন একজন পড়ো গাছে চড়িয়া আমড়া পাড়িতেছিল, কুঞ্জ সরকার তাহাকে কিছু অতিরিক্ত ভৎর্সনা করেন; শেষে বলিয়া ফেলেন যে, "ঐরূপ মামড়া-ধরা গাছে চড়িয়াই আমার এ হেন দুর্দ্দশা, তুই আবার ঐরূপ গাছে উঠিলি?"

এই দিন হইতে মহাশয়ের নামের ও আকৃতির সাদৃশ্য লইয়া মহা গণ্ড-গোল আরম্ভ হইল। মহাশয় যদি জন্ম ধারণের পর হইতেই কুঁজো নয়, তবে উহার কুঞ্জ নাম হইল কিরূপে? এই প্রশ্নের নানা জনে নানারূপ মীমাংসা করিত। কেহ বলিত, "মহাশয় বড় সেয়ানা, কুঁজো হওয়ার পর হইতেই আপনার গ্রাম বদল ও নাম বদল করিয়াছে। মনে ভাবিয়াছে যে, লোকে ত কুঁজো বলিবেই, তবে কুঞ্জ নাম লওয়াই ভাল।" মুরুব্বিরা বলি-তেন, যে "উহার জন্মের পর গণকে গণিয়া বলিয়া দেয় যে, ও কুঁজো হইবে, তাহাতে বৃশ্চিক রাশিতে জন্ম, কাজেই বাপ মায়ে ককারের নাম দিতে গিয়া আদর করিয়া কুঁজো বলিয়া ডাকিত।" কেহ বলিত না, "উহার মামড়া-ধরা আমড়া গাছ হইতে পড়ার কথাটা একেবারে মিথ্যা, ওটা পড়ো শাস-নের ছলনা। অমন মিথ্যা কথা, ও রোজ সাড়ে সতের গণ্ডা কয়।" মীমাং সকেরা বলিতেন, যে "ও বরাবরই একটু কুঁজো ছিল বটে, কিন্তু আমড়া গাছ হইতে পড়িয়া অবধি একেবারে কাঁদিশুদ্ধ কলাগাছ ভাঙ্গার মত হইয়াছে।" এইরূপ নানা জনে নানা কথা কহিত। রাঢ় অঞ্চলে কুঞ্জ সরকারের কুব্জা-কৃতি লইয়া বড়ই একটা গণ্ডগোল ছিল।

একজন গুরু মহাশয়ের নাম লইয়া একটা অঞ্চলের লোক গণ্ডগোল করিত, এ কিরূপ কথা? তাহা যদি না হইবে, তবে তাহার কথা কে লিখিতে যাইত? আরও ত শিক্ষক রহিয়াছেন, শ্লেট্‌ ভাঙ্গিয়া কাষ্ঠ লইয়া, সেই কাষ্ঠ খণ্ড আবার ছাত্রের পৃষ্ঠে ভাঙ্গিতেছেন, কৈ কাহারও নামে প্রবন্ধ লেখা গেছে কি? না ক্ষণজন্মা লোক না হইলে তাহার স্থান-জন্মের কথা ভাবিবই বা কেন? আর দশের কাছে শাদা কাগজ কালো করিয়া

ছাপিতে যাইবই বা কেন? না কুঞ্জ সরকার এক সময়ের এক প্রদেশের প্রসিদ্ধ লোক বলিয়াই তাহার পরিচয় দিতে আমরা প্রয়াস পাইতেছি।

আমড়াগাছের ঘটনা না ঘটিলে, কুঞ্জ সরকারকে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘাকৃতি মানুষ বলা যাইত। এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে মানুষ বলাই একরূপ কবিত্ব। তিনি দ্বিপদ হইয়াও প্রায় চতুষ্পদ। কোমরটা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে শরীরটা মাটামের মত হইয়াছে, হাত দুখানা আর একটু হইলেই ভূমিতে ঠেকিত। শরীরটা আসল তিন ভাঁজ। প্রথম ভাঁজ অবশ্য পা হইতে কোমর পর্য্যন্ত; ঠিক খাড়া। তাহার পর কোমর হইতে কণ্ঠা,—দ্বিতীয় ভাঁজ, সমতল; তৃতীয় ভাঁজ মুখখানি, আবার বেশ খাড়া। সেই মুখের উপর দুই চক্ষু;—

সিঁদুর ত সবাই পরে;
সিঁদুর কপাল গুণে ঝলমল করে।

মুখের উপর দুই চক্ষু, অনুমান করি, অন্ধ ও কাণার ছাড়া আর সকলেরই আছে। কিন্তু কুঞ্জ সরকারের সেই দুই চোখ, আর তোমার আমার চোখ? ভাষা সঙ্কীর্ণ; তাই সেই হৃৎপিণ্ড পরীক্ষক লৌহশলাকা সমষ্টির আধারের নামও চক্ষুঃ, আমার কপালের নীচের এই পীত পিঙ্গল পরকলাও চক্ষুঃ, আর, (কুরুচি বাঁচাইয়া বলিতে গেলে) ঐ ঘুম-মাখান,ঘুম-ভাঙ্গান মন্ত্র মণিদ্বয়ও চক্ষু।—বাস্তবিক কিন্তু এসকল এক পদার্থ নহে। কুঞ্জ সরকারের চক্ষুঃ জ্যোতির্ম্ময়, এ কথা যে বলিতে হয়, বলুক, কিন্তু আমরা তাহা বলি না; কেন না, আমরা জানি কুঞ্জ সরকারের ছাত্রদের বোঝা বোঝা শোলা আনিতে হইত, এবং কোন দিন দৈবাৎ পড়োরা শোলা পোড়াইয়া রাত্রির জন্য রাখিয়া না গেলে, পর দিন অন্তত দশ পনের জন কঠোর বেত্রাঘাতে দণ্ডিত হইত। কুঞ্জ যে তীব্র দৃষ্টিতে লোকের চালের লাউ কুমড়া দেখিতেন, তাঁহার চক্ষুতে তেজ থাকিলে অবশ্যই নিত্য লঙ্কাকাণ্ড ঘটিত। না, মহাশয়ের চক্ষু তেজোময় নহে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি ও দুটি কেবল নিরাকার লৌহশলাকাময়। সেই শলাকা দ্বারা তিনি লোকের হৃৎপিণ্ড মানসে ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার মধ্যে ভয়, ভক্তি, ভালবাসা, ভণ্ডামি, কতটকু আছে তাহা বুঝিতে পারিতেন। সেই চক্ষু নিয়তই ঘুরিতেছে; দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, নিম্নে সকল দিকেই ঘুরিতেছে, কিন্তু কখন উপর দিকে যাবে না। অনেকে বলিত যে, কুঞ্জ সরকার ঐহিক পারত্রিক কোনরূপ উপরওয়ালা

মানেন না বলিয়াই, তাঁহার দৃষ্টিও কখন উপরের দিকে উঠে না। কিন্তু কুঞ্জ সরকারের সম্বন্ধে ও কথাটা যে বড় ধরা আবশ্যক, তাহা আমরা বিবেচনা করি না। কেননা তাহার চক্ষুঃ উপর দিকে ঘুরিলেও দৃষ্টি কখনই ভ্রূ ছাড়াইয়া উঠিতে পারিত না। খড়খড়ে-জানালার উপর বাহিরের দিকে দেওয়ালের গায়ে যেমন কাঠের গড়নের টপ থাকে, কুঞ্জ সরকারের খুব কাল, খুব ঘন মোটা চুলের ভ্রূ জোড়াট সেইরূপ তাঁহার চক্ষুর উপর ঝাঁপিয়া পড়িয়া ছিল। সেই ভ্রূকে আর দু জোড়া গোঁপ বলিলেও চলে। সঙ্কল্পবাদীরা বলেন, যে, চক্ষুতে কুটি কাটি না পড়িতে পারে, এই জন্য মনুষ্য-ললাটে ভ্রূ দেওয়া হইয়াছে; বাস্তবিক তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে কুঞ্জ সরকারের বেলায় ধাতার সে সঙ্কল্প যে সুসিদ্ধ হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়; কুটিকাটা দূরে থাকুক, টিক্‌টিকি আরশোলাও মাথার উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িলে, সেই ভ্রূজালে বাধিয়া থাকিত। তাহার পর সেই নাসিকা; সে ত খগ-দর্প-নাশিকা নহে; নগ-দর্প-নাশিকা। অটুট, অনড়, অসাড়, মুখমণ্ডলের মাঝে সিংহল দ্বীপের আদিম শিখরের মত দাঁড়াইয়া আছে; আর বন জঙ্গল কর্দ্দমপিচ্ছিল পরিপূর্ণ দুই গুহা নিম্নে হাঁ হাঁ করিতেছে। আর সেই নাসিকার সেই পাঠশালার আটচালার কলরব ভেদী গর্জ্জন! জড় জগতের কেমন আশ্চর্য্য কৌশল, সেই গর্জ্জনেই ছাত্রগণের সন্ত্রাস, এবং নিকটস্থ বাপীকূলসমাগতযুবতীপ্রৌঢ়াগণের হাস্য পরিহাস! গর্জ্জনের পর বর্ষণ আছে বলিয়াই ছাত্রগণের গর্জ্জনে সন্ত্রাস। আহারের পর কুঞ্জ মহাশয় একখানি পড়ো মাদুরি বিছাইয়া, আটচালার শালের খুঁটিতে একখানি পিঁড়ে লাগাইয়া, তাহাতে ঠেসান দিয়া বাম হাঁটুর উপরে দক্ষিণ পা রাখিয়া ভোরপূর গুড়ক সেবা করিতে করিতে একেবারে বিশ্রাম করিতেন। চক্ষুর চঞ্চলতা ক্রমে সম্বরণ করিয়া, স্তম্ভ-লম্বিত বেত্র দণ্ডে স্থাপিত করিতেন। তখন তদীয় সেই বেত্রনিহিত একদৃষ্টি দেখিলে ভাবুক অবশ্যই বুঝিতেন, যে কুঞ্জ মহাশয় সার বুঝিয়াছিলেন, যে তাঁহার ইহকাল, পরকাল; সকাল, বিকাল;—সকলই সেই বেত্রের ভরসা; বুঝিতেন, যে কুঞ্জ মহাশয় একান্ত মনে ভাবিতেছেন,—

ত্বয়া বেত্রদণ্ড করস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।

এই নিধিধ্যাসনের পর সমাধির গর্জ্জন; গর্জ্জন যদি হঠাৎ একটু থামিল, তবেই অমনই পার্শ্বস্থিত হুপ্‌টি প্রকৃতির বারি বর্ষণের মত যেখানে সেখানে

পাত্র নির্ব্বিশেষে ছাত্রগণের শরীরে পতিত হইবে। সুতরাং গর্জ্জনের পর বর্ষণ নিশ্চয় জানিয়া ছাত্রেরা গর্জ্জনে বিষম সন্ত্রস্ত ছিল।

আর, যুবতীর হাস্য পরিহাস; তা পুরুষের অনেক গর্জ্জনেরই ঐরূপ পরিণাম—কুঞ্জ সরকারের নাসিকার তাহাতে বিশেষ সৌভাগ্য বা দৌর্ভাগ্য নাই। স্ত্রীলোকেরা জানিত, যে, নিম্ন গহ্বরের গর্জ্জন কালে, উচ্চ কোটরের লৌহশলাকা সকল নিস্তব্ধ থাকে; তাহাদের সেই লাভ; অভ্যাস বশত গুরু মহাশয় নর নারী পশু পক্ষী এমন কি গাছ পাথর পর্য্যন্ত তাঁহার পড়ো বলিয়া মনে করিতেন; সেই নব বেদান্ত জ্ঞানেই তিনি বাপীকূলাগত রমণী-কুলের উপর তীব্র দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন, তাহারা কিন্তু ভাবিত যে কাঁধের কাছে কাপড় একটু ছেঁড়া আছে, বাম পদের বাঁকামল একটু ঢিলা হইয়াছে, কপালের টিকা একটু বাঁকা হইয়াছে, দুষ্ট গুরু মহাশয় বুঝি তাহাই দেখিতেছে। মহাশয়ের সহিত নারীগণের বিরোধ হইবারই কথা। তা সকল দেশেই হয়; মহাশয়দের সহিত মহাশয়াগণের বিরোধত চির প্রসিদ্ধ। বালিকারা পাঠশালার আশে পাশে দৌড়িয়া বেড়ায় মহাশয় তাহা অবশ্য সহ্য করিতে পারিতেন না। কখন একটি আধটিকে পড়ো দিয়া ধরিয়া আনিতেন; তাহারা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যাইত, ছেড়ে দিলেই দূরে গিয়া এক চোক রগড়াইতে রগড়াইতে 'পোড়ারমুখো মহাশয়' বলিত; যুবতীদের সহিত আরও ঘোরতর বিবাদ। কুঞ্জ public instructor অর্থাৎ সরকারি গুরু মহাশয়। যুবতীরা প্রত্যেকেই private-tutor অর্থাৎ খাসগুরু। অথচ উভয়েরই মনে বিশ্বাস আছে, যে তাঁহারা প্রত্যেকেই জগৎ গুরু। এই প্রথম বিরোধ। তাহার পর কুঞ্জ মহাশয় কদাকার, কুব্জ, কঠোর; যুবতীরা কান্তিমতী, কমনীয়া ও কোমলা। ইহাতে দ্বিতীয় বিরোধ; মহাশয় বেত্র-বল, মহাশয়াগণ—(বলিতেই হইতেছে) নেত্র-বল.; আর বাড়াবাড়িতে কাজ নাই, সুতরাং যুবতীগণের সহিত মহাশয়ের নানা দিকেই বিরোধ। আর প্রৌঢ়ারা ত গুরু মহাশয়কে একেবারেই দেখিতে পারিতেন না। সোণার গোপালের যে ছেলে পিট দাগড়া দাগড়া করিয়া দেয়, তাহাকে কখন গোপালের মা ভাল বলিয়াছেন কি? না এদেশে মাতৃশরীরে শাসনের ভাব কখন দেখা যায় নাই। আমাদের দেশের ভদ্রসন্তানগণের অল্প বয়সে দুর্দ্দশা, প্রধানত মায়ের আদরে ঠাকুমার প্রশ্রয়ে, পিসিমার গুণেই হইয়া থাকে। মা যে সেই মুখ খানি কাঁদ কাঁদ করিয়া কোলে বসাইয়া বস্ত্রাঞ্চলে কপাল মুছাইয়া দিয়া—বলি-

লেন, "হোক মেনে একটা যেন অকাজই করিয়াছিল, তা এমনই করে কি লাঞ্ছনা করে গা?—শরীরে কি একটু দয়া নাই?" সেই দিন হইতেই ছেলের পরকাল খসিতে লাগিল।—তা খসে খসুক,—আমরা কেন আসল কথা হইতে খসিয়া পড়ি?—প্রৌঢ়ারা গুরু মহাশয়কে একেবারেই দেখিতে পারিতেন না। বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা,—বালক, যুবক, বৃদ্ধ কেহই দেখিতে পারুক আর নাই পারুক, অথবা দেখিয়া হাসুক বা কাসুক, তাহাতে কুঞ্জ সরকারের বড় একটা দৃক্পাত ছিল না। আট চালার মধ্যে হইলে, বেত্র পাত ছিল। যুবতীরা মহাশয়ের খাস রাজধানী মধ্যে আসিতেন না,—তাই রক্ষা।

গুরুমহাশয় কাহাকেও দৃক্পাত করিতেন না, কিন্তু দুইটি পদার্থে তাঁহার হৃৎ পাত হইত। বোস্ বাগানের তলার পথ দিয়া যাইতে হইলে, দিনের বেলাতেই তিনি জড় সড় হইতেন, রাত্রি কালে সর্ব্বত্রই তাহার সমান ভূতের ভয় ছিল। ক্রমশঃ।

ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী।

ভারতবর্ষে কোন্ মূর্খ বা কোন্ পণ্ডিত কোন্ খৃষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন বা মরিয়াছিলেন, তাহার কিছুই স্থির নাই, অতএব ভারতবর্ষে ইতিহাস ছিল না ইহা স্থির। এ বিষয়ে পণ্ডিতবর হচিন্‌সন সাহেব যে অতি পরমাশ্চর্য্য সারগর্ভ গবেষণাপূর্ণ যুক্তিবহুল কথা বলিয়াছেন তাহা এইখানে উদ্ধৃত করি—"প্রকৃত ইতিহাস না থাকিলে আমরা প্রাচীন কালের বিষয় অতি অল্পই জানিতে পারি।"*

আমাদের দেশে যে ইতিহাস ছিল না, এবং ইতিহাস না থাকিলে যে কিছুই জানা যায় না তাহার প্রমাণ, বৈষ্ণব চূড়ামণি অতি প্রাচীন কবি ভানুসিংহ ঠাকুরের বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। ইহা সামান্য দুঃখের কথা নহে। ভারতবর্ষের এই দুরপনেয় কলঙ্ক মোচন করিতে আমরা অগ্রসর হইয়াছি। কৃতকার্য্য হইয়াছি এইত আমাদের বিশ্বাস। যাহা আমরা স্থির করিয়াছি, তাহা যে পরম সত্য তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

---

* Memoires of Cattermob Cruikshank Hutchinson. Vol. V. P. 1058. ইংরাজিতে বানান ভুল যদি কিছু থাকে, পাঠকেরা জানিবেন তাহা মুদ্রাকরের দোষ। ভবানী মাষ্টারের কাছে আমি দেড় বৎসর যাবৎ ইংরাজি পড়িয়াছিলাম, বাঙ্গালা আমাকে পড়িতে হয় নাই; কাঁটাগাছের মত বিনা চাসে আপনিই গজাইয়া উঠিয়াছে।

কোন্ সময়ে ভানুসিংহ ঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাই প্রথমে নির্ণয় করিতে হয়। কেহ বলে বিদ্যাপতি ঠাকুরের পূর্ব্বে, কেহ বলে পরে। যদি পূর্ব্বে হয় ত কত পূর্ব্বে, ও যদি পরে হয় ত কত পরে? বহুবিধ প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে এ সম্বন্ধে বিস্তর সাহায্য পাওয়া যায়; যথা—

প্রথমত—চারি বেদ। ঋক্ যজু সাম অথর্ব্ব। বেদ চারি কি তিন, এ বিষয়ে কিছুই স্থির হয় নাই। আমরা স্থির করিয়াছি, কিন্তু অনেকেই করেন নাই। বেদ যে তিন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদে আছে—'ঋষয় স্ত্রয়ী বেদা বিদুঃ ঋচো যজুংষি সামানি।' চতুর্থ শতপথ ব্রাহ্মণে কি লেখা আছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বেদের সূত্র যাঁহারা অবসর মতে পড়িয়া থাকেন, তাঁহারাও দেখিয়া থাকিবেন তন্মধ্যে অথর্ব্ব বেদের সূত্রপাত নাই। যাহা হউক, প্রমাণ হইল বেদ তিন বই নয়। এক্ষণে সেই তিন বেদে ভানুসিংহের বিষয় কি কি প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। বেদে ছন্দ আছে মন্ত্র আছে, ব্রাহ্মণ আছে, সূত্র আছে, কিন্তু ভানুসিংহের কোন কথা নাই। * এমন কি, বেদের সংহিতা ভাগে ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, অগ্নি, রুদ্র, রবি প্রভৃতি দেবগণের কথাও আছে কিন্তু ইতিহাস রচনায় অনভিজ্ঞতা বশত ভানুসিংহের কোন্ উল্লেখ নাই। §

শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে নন্দ বংশ রাজগণের কথা পাওয়া যায়। এমন কি, তাহাতে ইহাও লিখিয়াছে যে, মহাপদ্ম নন্দীর সুমাল্য প্রভৃতি আট পুত্র জন্মিবে—কৌটিল্য ব্রাহ্মণের কথাও আছে, অথচ ভানুসিংহের কোন কথা তাহাতে দেখিতে পাইলাম না। ¶ যদি কোন দুঃসাহসিক পাঠক বলেন যে হাঁ, তাহাতে ভানুসিংহের কথা আছে, তিনি প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিন—তিনি আমাদের এবং ভারতবর্ষের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

আমরা ভোজ প্রবন্ধ আনাইয়া দেখিলাম, তাহাতে ধারা নগরাধিপ ভোজরাজার বিস্তারিত বিবরণ আছে। তাহাতে নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের নাম

* See English Translation of Hitopadesha by H. M. Dibdin. Vol. 3. page 551.

§ কোন কোন অতি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এরূপ সন্দেহ করিয়া থাকেন যে, উক্ত ইন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরগণের মধ্যে রবির যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহা ভানুর নামান্তর হইতে পারে। কিন্তু তাহা নিতান্ত অপ্রামাণিক।

¶ Vide Pictorial Handbook of Modern Geography. Vol 1. page 139.

পাওয়া যায়—কালিদাস, কর্পূর, কলিঙ্গ, কোকিল, শ্রীদচন্দ্র। এমন কি মুচকুন্দ, ময়ূর ও দামোদরের নামও তাহাতে পাওয়া গেল, কিন্তু ভানুসিংহের নাম কোথাও পাওয়া গেল না। *

বিশ্বগুণাদর্শ দেখ—মাঘশ্চোরো ময়ূরো মুরারিপুরপরো ভারবিঃ সারবিদ্যঃ
শ্রীহর্ষঃ কালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাদয়ো ভোজরাজঃ

দেখ, ইহাতেও ভানুসিংহের নাম নাই। §

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন উল্লেখ স্থলে ভানুসিংহের নাম পাওয়া যায় ভাবিয়া আমরা বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি—

ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোমর সিংহ শঙ্কু বেতাল ভট্ট ঘটকর্পূর কালিদাসাঃ
খ্যাতা বরাহ মিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্ত।

কই, ইহার মধ্যেওত ভানুসিহের নাম পাওয়া গেল না। P তবে, কোন কোন ভাবুকব্যক্তি সন্দেহ করেন কালিদাস ও ভানুসিংহ একই ব্যক্তি হইবেন। এসন্দেহ নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে, কারণ কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে উভয়ের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়!

অবশেষে আমরা বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঁচিশ, তুলসীদাসের রামায়ণ, আরব্য উপন্যাস ও সুশীলার উপাখ্যান বিস্তর গবেষণার সহিত অনুসন্ধান করিয়া কোথাও ভানুসিংহের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। অতএব কেহ যেন আমাদের অনুসন্ধানের প্রতি দোষারোপ না করেন—দোষ কেবল গ্রন্থগুলির।

ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে চারি প্রকার মত দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ পাঁচকড়ি বাবু বলেন ভানু সিংহের জন্মকাল খৃষ্টাব্দের ৪৫১ বৎসর পূর্ব্বে। পরম পণ্ডিত বর সনাতন বাবু বলেন খৃষ্টাব্দের ১৬৮৯ বৎসর পরে। সর্ব্বলোক পূজিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য নিতাইচরণ বাবু বলেন ১১০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে ভানুসিংহের জন্ম হইয়াছিল। আর, মহা মহোপাধ্যায় সরস্বতীর বর পুত্র কালাচাঁদ দে মহাশয়ের মতে ভানুসিংহ, হয় খৃষ্ট শতাব্দীর ৮১৯ বৎসর পূর্ব্বে, না হয় ১৬২৯ বৎসর পরে জন্মিয়াছিলেন, ইহার কোন সন্দেহ মাত্র নাই। আবার কোন কোন মূর্খ নির্ব্বোধ গোপনে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের নিকটে প্রচার করিয়া বেড়ায় যে ভানুসিংহ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে

* See Hong-chang-ching. By kong-fu.

§ সাহনামা, দ্বিতীয় সর্গ।

P Peterhoff's Chromkroptologisheder Unterlutungeln.

জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন। ইহা আর কোন বুদ্ধিমান পাঠককে বলিতে হইবে না, যে একথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। যাহা হউক, ভানুসিংহের জন্ম কাল সম্বন্ধে আমাদের যে মত তাহা প্রকাশ করিতেছি। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিমান সুবিবেচক পাঠকের সন্দেহ থাকিবে না। নীল পুরাণের একাদশ সর্গে বৈতস মুনিকে ভানব বলা হইয়াছে। * তবেই দেখা যাইতেছে তিনি ভানুর বংশজাত। এক্ষণে, তিনি ভানুর কত পুরুষ পরে ইহা নিঃসন্দেহ স্থির করা দুঃসাধ্য। রামকে রাঘব বলা হইয়া থাকে। রঘুর তিন পুরুষ পরে রাম। মনে করা যাক্, বৈতস ভানুর চতুর্থ পুরুষ। প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে ২০ বৎসরের ব্যবধান ধরা যাক্, তাহা হইলে ভানুসিংহের জন্মের আশি বৎসর পরে বৈতসের জন্ম। যিনি রাজ তরঙ্গিনী পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন বৈতস ৫১৮ খৃষ্টাব্দের লোক $। তাহা হইলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ভানুসিংহের জন্মকাল ৪৩৮ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ভাষার প্রমাণ যদি দেখিতে হয় তাহা হইলে ভানুসিংহকে আরও প্রাচীন বলিয়া স্থির করিতে হয়। সকলেই জানেন, ভাষা লোকের মুখে মুখে যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই সংক্ষিপ্ত হইতে থাকে। "গমন করিলাম" হইতে "গেলুম" হয়। "ভ্রাতৃজায়া" হইতে "ভাজ" হয়। "খুল্লতাত" হইতে "খুড়ো" হয়। কিন্তু ছোট হইতে বড় হওয়ার দৃষ্টান্ত কোথায়? অতএব নিঃসন্দেহ "পিরীতি" শব্দ "প্রীতি" অপেক্ষা "তিখিনী" শব্দ "তীক্ষ্ণ" অপেক্ষা প্রাচীন। অষ্টাদশ ঋকের এক স্থলে দেখা যায় "তীক্ষ্ণানি সায়কানি।" সকলেই জানেন অষ্টাদশ ঋক্ খৃষ্টের ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। একটি ভাষা পুরাতন ও পরিবর্ত্তিত হইতে কিছু না হউক দুহাজার বৎসর লাগে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, খৃষ্ট জন্মের ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভানুসিংহের জন্ম হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইল যে, ভানুসিংহ ৪৩৮ খৃষ্টাব্দে অথবা খৃষ্টাব্দের ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ যদি ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, তাঁহাকে আমাদের পরম বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিব কারণ, সত্যের প্রতিই আমাদের লক্ষ্য; এ প্রবন্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

---

* See the Grammer of the Red Indian Tchouk-Tchouk-Hmhm-Hmhm Language. Conjongation of Verbs. Vol. 3. page 999.

$ History of the Art of Embroidery and Crewel work. Appendix,

ভানুসিংহের আর সমস্তই ত ঠিকানা করিয়া দিলাম, এখন এইরূপ নিঃসন্দেহে তাঁহার জন্ম ভূমির একটা ঠিকানা করিয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এসম্বন্ধেও মত ভেদ আছে। পরম শ্রদ্ধাস্পদ সনাতন বাবু একরূপ বলেন ও পরম ভক্তি ভাজন রূপ নারায়ণ বাবু আর একরূপ বলেন। তাঁহাদের কথা এখানে উদ্ধৃত করিবার কোন আবশ্যকই নাই। কারণ, তাঁহাদের উভয়ের মতই নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও হেয়। তাঁহারা যে লেখা লিখিয়াছেন তাহাতে লেখকদিগের শরীরে লাঙ্গুল ও ক্ষুরের অস্তিত্ব এবং তাঁহাদের কর্ণের অমানুষিক দীর্ঘতা সপ্রমাণ হইতেছে। ইতিহাস কাহাকে বলে আগে তাহাই তাঁহারা ইস্কুলে গিয়া শিখিয়া আসুন, তার পরে আমার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইবেন। আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি তাঁহাদের উপরে আমার বিন্দু মাত্র রাগ নাই, এবং আমার কেহ প্রতিবাদ করিলে আমি আনন্দিত বই রুষ্ট হই না, কেবল সত্যের অনুরোধে ও সাধারণের হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এক একবার ইচ্ছা করে তাঁহাদের লেখা গুলি চণ্ডালের দ্বারা পুড়াইয়া তাহার ভস্মশেষ কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং লেখক দ্বয়ও গলায় কলসী বাঁধিয়া তাহারই অনুগমন করেন।

সিংহল দ্বীপের অন্তর্ব্বর্ত্তী ত্রিন্‌কমলীতে একটি পুরাতন কূপের মধ্যে একটি প্রস্তর ফলক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ভানুসিংহের নামের ভ এবং হ অক্ষরটি পাওয়া গিয়াছে। বাকি অক্ষরগুলি একেবারেই বিলুপ্ত। "হ" টিকে কেহ বা "ক্ষ" বলিতেছেন, কেহ বা "ঞ্চ" বলিতেছেন কিন্তু তাহা যে "হ" তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার "ভ" টিকে কেহ বা বলেন "র্চ্চ," কেহবা বলেন "ক্লৈ," কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, "ভানুসিংহ" শব্দের মধ্যে উক্ত দুই অক্ষর আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব ভানুসিংহ ত্রিন্‌কমলীতে বাস করিতেন, কূপের মধ্যে কি না সে বিষয়ে তর্ক উঠিতে পারে। কিন্তু আবার আর একটা কথা আছে। নেপালে কাটমুণ্ডের নিকটবর্ত্তী একটি পর্ব্বতে সূর্য্যের (ভানু) প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাহার কাছাকাছি সিংহের প্রতিমূর্ত্তিটা পাওয়া গেল না। পাষণ্ড যবনাধিকারে আমাদের কত গ্রন্থ, কত ইতিহাস, কত মন্দির ধ্বংশ হইয়াছে; সেই সময়ে ঔরংজীবের আদেশানুসারে এই সিংহের প্রতিমূর্ত্তি ধ্বংশ হইয়া থাকিবে। কিন্তু সম্প্রতি পেশোয়ারের একটি ক্ষেত্র চাষ করিতে করিতে সিংহের প্রতিমূর্ত্তি-খোদিত ফলকখণ্ড প্রস্তর বাহির হইয়া পড়িয়াছে—স্পষ্টই

দেখা যাইতেছে ইহা সেই নেপালের ভানুপ্রতিমূর্ত্তির অবশিষ্টাংশ, নাহলে ইহার কোনি অর্থই থাকেনা! অতএব দেখা যাইতেছে ভানুসিংহের বাসস্থান নেপালে থাকা কিছু আশ্চর্য্য নয়, বরঞ্চ সম্পূর্ণ সম্ভব। তবে তিনি কার্য্যগতিকে নেপাল হইতে পেষোয়ারে যাতায়াত করিতেন কি না সে কথা পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন। এবং স্নান-উপলক্ষে মাঝে মাঝে ত্রিন্‌কমলীর কূপে যাওয়াও কিছু আশ্চর্য্য নহে। ভানুসিংহের বাসস্থান সম্বন্ধে অভ্রান্ত বুদ্ধি সূক্ষ্মদর্শী অপ্রকাশ চন্দ্র বাবু যে তর্ক করেন তাহা নিতান্ত বাতুলের প্রলাপ বলিয়া বোধ হয়। তিনি ভানুসিংহের স্বহস্তে-লিখিত পাণ্ডুলিপির একপার্শ্বে কলিকাতা সহরের নাম দেখিয়াছেন। ইহার সত্যতা আমরা অবিশ্বাস করি না। কিন্তু অমরা স্পষ্ট প্রমাণ করিতে পারি, যে, ভানুসিংহ তাঁহার বাসস্থানের উল্লেখ সম্বন্ধে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন বটে আমি কলিকাতায় বাস করি—কিন্তু তাহাই যদি সত্য হইবে, তাহা হইলে কলিকাতায় এত কূপ আছে কোথাও কি প্রমাণ সমেত একটা প্রস্তর ফলক পাওয়া যাইত না? শব্দশাস্ত্র অনুসারে কাটমুণ্ডু ও ত্রিন্‌কমলীর অপভ্রংশে কলিকাতা লিখিত হওয়ারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যাহা হউক ভানুসিংহ যে নিজ বাসস্থানের সম্বন্ধে ভ্রমে পড়িয়াছিলেন তাহাতে আর ভ্রম রহিল না।

ভানুসিংহের জীবনের সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই। হয়ত বা অন্যান্য মতিমান্ লেখকেরা জানিতে পারেন, কিন্তু এ লেখক বিনীত ভাবে তদ্বিষয়ে অজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন। তাঁহার ব্যবসায় সম্বন্ধে কেহ বলে তাঁহার কাঠের দোকান ছিল, কেহ বলে তিনি বিশ্বেশ্বরের পূজারী ছিলেন।

ভানুসিংহের কবিতা সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিব না। ইহা মা সরস্বতীর চোরাই মাল। জনশ্রুতি এই যে, এ কবিতা গুলি স্বর্গে সরস্বতীর বীণায় বাস করিত। পাছে বিষ্ণুর কর্ণগোচর হয় ও তিনি দ্বিতীয় বার দ্রব হইয়া যান, এই ভয়ে লক্ষ্মীর অনুচরগণ এগুলি চুরি করিয়া লইয়া মর্ত্ত্যভূমে ভানুসিংহের মগজে গুঁজিয়া রাখিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে এগুলি বিদ্যাপতির অনুকরণে লিখিত, সে কথা শুনিলে হাসি আসে বিদ্যাপতি বলিয়া একব্যক্তি ছিল কি না ছিল তাহাই তাঁরা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই।

যাহা হউক, ভানুসিংহের জীবনী সম্বন্ধে সমস্তই নিঃসংশয় রূপে স্থির করা গেল। তবে, এই ভানুসিংহই যে বৈষ্ণব কবি তাহা না হইতেও পারে। হউক্ বা না হউক্ সে অতি সামান্য বিষয়, আসল কথাটা ত স্থির হইয়াগেল।

মদনপূজা।

কি দিয়ে মদন, পূজিব তোমা, অনঙ্গ তুহারি নাম !
বসন্ত সমীর, নিশোশ্বাস তোর, কুসুম লাবণ্য ঠাম !
সুবাদ্য-ঝঙ্কার, সঙ্গীত-উচ্ছাস, বচন তুহার মানি,
হিয়ার মাঝারে, প্রেমের নিঝর, তুহারি পরাণ জানি !

কেমনে মদন, পূজিব তোমায়, তুহারি ধনুর ভয়ে,
নয়ন-দিঠিতে, দিঠি জড়াইয়া, দাঁড়াই অথির হয়ে।
বলি বলি বলি, শুনি শুনি শুনি, থমকে চমকে চাই,
জাগি দিবা নিশি, তুহারি তরাসে জুড়াতে নাহিক পাই !

পূজিব কিরূপে, তোমায় মদন, তুহার পূজার প্রথা,
কেহু না জানিল, কেহু না শিখিল, সে গূঢ় রহস্য কথা !
মুনির ধেয়ানে, জ্ঞানীর জ্ঞেয়ানে, তুহার আকার-ভেদ,
সুজন প্রেমিক; আঁখিতে কেবলি, প্রকাশ তুহার বেদ !
পূজিব তুহারে, তাহারি বিধানে, না জানি না মানি আন্,
"একমেব" বাণী, বদনে উচারি, তুয়া পদে দিব প্রাণ।
পূজিব তুহারে, বিহানে মধ্যাহ্নে, পূজিব সাঁজের্ ই বেলা,
ইন্দ্রিয়-কাননে, আঁধার ডুবাতে, প্রেমের জোছনা খেলা !

পূজিব তুহারে— চরণে বিথারি, জীবন-জাহ্নবী-জল,
পূজিব তুহারে— মানস ব্রহ্মাণ্ড, করিয়া তীরথ-স্থল !
তুহারি পূজাতে, কুল পদ মান, অবনী উৎসর্গ দিয়া,
দেখিব আনন্দে, তুয়া ধ্যান ধরি, হিয়াতে প্রতিমা নিয়া !

সে দেহ গঠনে, মুরতি গঠিব, সে ছুঁহ নয়নে আঁখি,
তেমতি সুটানে, ভুরুযুগে টান, দেখিব মানসে আঁকি।
বসন চলন, কটি উরুদেশ, সকলি তেমতি ঠাম,
দিব সাজাইয়া, অনঙ্গ তুহারে, সেহ নামে তুয়া নাম।
চাঁদের আলোক, আরতি করিব, পরাব বাস-। ফুল,
অনঙ্গ তুহারি, বদন হেরিব, নিখিলে নাহিক তুল!
পূজা পাঠাবধি, এই সে তুহার, একহি প্রেমিকে জানে,
নাহি কালাকাল, দেশ পরদেশ তুয়া বেদ এহি মানে।

"কি দিয়ে পূজিব, মদন তোমায়"— আর না আনিব মুখে,
শিখিনু শিখাব, তুয়া পূজাবিধি, কিয়া সুখ কিয়া দুখে!
এ বিধি-বিধানে, যে জানে পূজিতে তুয়া দরশনে তেঁহ,
কঁছু নাহি জানে, কি তাহে প্রভেদ, নিশি, দিবা, বন, গেহ!

চিনেছি এখন, মদন তোমায়— অনঙ্গ কেবলি নাম।
বসন্ত-সমীর, তুয়া নিশোআশ, কুসুম লাবণ্য ঠাম,
সুবাদ্য ঝঙ্কার, সঙ্গীত উছাস, বচন তুহারি মানি,
হিয়ার মাঝারে, প্রেমের নিঝর তুহারি পরাণ জানি;—
অবহি পূজিব, অনঙ্গ তুহারে, তুহ সে পরম প্রাণী।

নবজীবন।

১ম ভাগ। ভাদ্র। ১২৯১। ২য় সংখ্যা।

সমাজ-শরীর।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

১।

এক্ষণে অন্তত তর্কের অনুরোধে স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক, যে সমাজকে শরীরী পদার্থ মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে। স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক যে সমাজ শরীরী পদার্থের ন্যায় নিজ নিয়মে পরিচালিত, উৎপন্ন, বর্দ্ধিত ও বিনষ্ট হইতেছে। স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক, যে যদিও মনুষ্যই সমাজ-শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অবয়ব বটে, তথাপি সমাজকে মনুষ্য সমষ্টি বলা যায় না। স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক যে, শরীরী পদার্থ যে সমস্ত নিয়মে পরিচালিত হয়, মনুষ্য সমাজও প্রায় সেইরূপ নিয়মেই পরিচালিত হইয়া থাকে। যদি মনুষ্য মাত্রেই পূর্ব্বোক্ত স্বীকার্য্যমালা অনুসারে কার্য্য করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সংসারের কিরূপ ইষ্টানিষ্ট সম্ভাবিত হইতে পারে, এক্ষণে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে শ্রেণীগত বিদ্বেষ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। সাধারণ প্রজারা উচ্চবংশীয়দের উচ্ছেদ কামনা করিতেছে। নির্ধনেরা ধনীর ধন-লুণ্ঠনের প্রয়াস পাইতেছে। প্রজারা ভূম্যধিকারী হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছে। শ্রমজীবীরা বেতনবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। চতুর্দ্দিকে ইউরোপীয় সমাজে আশঙ্কা, ভীতি, বিদ্বেষ, কলহ, কোলাহল, প্রভৃতি নিত্যই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। বন্দুক, ডাইন্যামাইট, ছোরা, ছুরি প্রভৃতির সাহায্যে পৃথিবীতে সাম্যসংস্থাপন করিবার আয়োজন করা হইতেছে। রুসিয়ায় Nihilists, ফ্রান্সে Communists, জর্ম্মনিতে Social Democrat, স্পেনে Black Hand, ইটালিতে Internationalist, আয়র্লণ্ডে Fenian ও Avenger, ইংলণ্ডে Land League প্রভৃতি বিপ্লবকারীগণ লোমহর্ষণ ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড

দ্বারা পৃথিবীকে কলঙ্কিত করিতেছে। আমেরিকা এই দস্যুদিগকে স্থলবিশেষে প্রোৎসাহিত করিতেছে। এই নৃশংস দস্যুদিগের একজন নেতা আমেরিকায় বক্তৃতা করিতে করিতে বলিতেছেন—"আর তিন বৎসরের মধ্যে আমরা আয়র্লণ্ডকে স্বাধীনতা প্রদান করিব। আমি এই কথা বলিতেছি বলিয়া হয়ত আমাকে অনেকে নির্ব্বোধ ও পাগল বলিয়া তিরস্কার করিবে। আমি নির্ব্বোধ নহি, কিন্তু আমি স্বীকার করিতেছি যে আমি পাগল। এক্ষণে সকল আয়র্লণ্ড-বাসীকেই পাগল হইতে হইবে। ইংলণ্ডে আমাদের স্বদেশীয়েরা (আইরিশেরা) ডাইন্যামাইট ব্যবহার করিতেছে। আমি ঐ ব্যবহারের অনুমোদন করি। আমরা যদি আমাদের স্বদেশীয়দিগকে অর্থদ্বারা সাহায্য করি, তাহা হইলে তিন বৎসরের মধ্যে লণ্ডন নগরী ধূলিরাশিতে পরিণত হইবে। আইস আমরা সকলে মিলিয়া ইংলণ্ডের নগরীমালাকে চূর্ণীকৃত করি, সকলে মিলিয়া ইংরেজ-দিগকে হত করি। এক্ষণে প্রকাশ্য যুদ্ধের সময় আসিয়াছে। এক্ষণে হত্যা করিলে, লুণ্ঠন করিলে, আমাদের কোনরূপ পাপ হইবে না। কি মনুষ্য, কি ঈশ্বর কেহই আমাদিগকে প্রত্যবায়গ্রস্ত করিতে পারিবে না।" এই নৃশংস রাক্ষসদিগের আর একজন নেতা ইংলণ্ডে বক্তৃতা করিতে করিতে বলিতেছেন —"বাইবেলে লিখিত আছে—'যে পরিশ্রম না করিবে সে খাইতে পাইবে না।' ইহাই ঈশ্বর-নিয়ম। কিন্তু এই যে সৌধমালা চতুর্দ্দিকে বিরাজিত রহিয়াছে ইহাতে কাহারা বাস করে? ইহাতে কি শ্রমজীবীরা বাস করে? না। যাহারা পরিশ্রম করে না তাহারাই ইহাতে বাস করে। যাহাতে এই বিসদৃশ প্রথার উন্মূলন হয়, আমাদের সকলেরই সেই চেষ্টা করা উচিত।" এইরূপে নানা স্থলে প্রকাশ্যভাবে নৃশংসতার প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে। বোধ হয়, এমন এক দিন আসিবে যখন ইউরোপে এই রাক্ষসেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিবে।

সেই দুর্দ্দিনে কে এই সংসারকে ইহাদের করালকবল হইতে রক্ষা করিবে? যখন এই দুর্দ্দান্ত দস্যুরা সমগ্র সংসার উপপ্লবের জন্য ধূমকেতুর ন্যায় উদিত হইবে, তখন কে উহাদিগকে নিবারিত করিবে? পূর্ব্বে ঈশ্বরভয়ে, পরকাল-ভয়ে, নরকভয়ে এই সমস্ত নৃশংসতা নিবারিত হইত। কিন্তু য়ুরোপ হইতে পূর্ব্বোক্ত সংস্কার সকল দিন দিন তিরোহিত হইতেছে। তবে এক্ষণে সংসার রক্ষার উপায় কি? আমাদের বোধহয় যে, সমাজ-শরীরতত্ত্ব প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলে, এবং চতুর্দ্দিকে সমাজ-শরীরতত্ত্বের প্রচার করিলে পূর্ব্বোক্ত নৃশংসতার স্থলমাত্রও সংসারে থাকিবে না। যদি বলা যায়, যে সকল মনুষ্যই সুখভোগে

সমান অধিকারী, যদি বলা যায় যে সুখান্বেষণই মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা হইলে মনুষ্যমাত্রেই স্বার্থপর পিশাচের ন্যায় কার্য্য করিবে এবং ঐরূপ কার্য্য দ্বারা তাহারা সংসার বিনষ্ট করিবে ও আপনারাও বিনষ্ট হইবে। কিন্তু যদি সমাজ-শরীরতত্ত্ব প্রকৃত হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের অধিকার ও মনুষ্যের উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয়ের নূতনরূপ অর্থ করিতে হয়। শরীরী পদার্থ স্বাভাবিক নিয়মবলে নানাবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিভাজিত হইয়া থাকে। কোন অঙ্গ মস্তক হয় এবং মস্তকের যে কর্ত্তব্য কার্য্য তাহাই করে, কোন অঙ্গ বা উদর নামে কথিত হইয়া উদরের কার্য্য করে, কোন অঙ্গ বা হস্তাকারে পরিণত হইয়া হস্তের উচিত কার্য্য করে। এক্ষণে যদি মস্তক মস্তকের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া হস্ত পদাদির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চায়, তাহা হইলে শরীরী পদার্থের উচ্ছেদ শীঘ্রই সম্পাদিত হয়। কিন্তু যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ কার্য্য করে তাহা হইলে সমস্ত অঙ্গের ও তজ্জন্য সমস্ত শরীরের পুষ্টি ও কান্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। সেইরূপ, স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সমাজ-শরীরের কোন অঙ্গ মস্তকরূপে, কোন অঙ্গ উদর রূপে, কোন অঙ্গ হস্তপদাদিরূপে পরিগণিত হইয়াছে। যদি সম-সম্পত্তি-বাদীগণ সমাজকে বিধ্বস্ত করে, তাহা হইলেও আবার ঐ স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই পুনরায় সমাজ-শরীর মস্তক, উদর ও হস্তপদাদি অঙ্গে পুনরায় বিভাজিত হইবে। তবে এক্ষণে কি করা উচিত? ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উচিত যে তাহারা আপন আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করে। "We have no rights ; we have duties." এটি বুঝা চাই, যে আমাদের কিছুতেই কোনরূপ স্বত্ব নাই, কিন্তু সকল বিষয়েই আমাদের একটা না একটা কর্ত্তব্য আছে। যাঁহারা সমাজের মস্তক স্বরূপ তাহারা চক্ষুকর্ণের সদ্ব্যবহারে মস্তিষ্কের পরিমিত সঞ্চালন করিতে থাকুন। যাঁহারা সমাজের চরণ স্বরূপ তাঁহারাও নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য করুন। যিনি মস্তক তিনি মস্তকের কার্য্য করিলে তাঁহার জীবন সার্থক হইবে। যিনি চরণ তিনি চরণের কার্য্য করুন, তাঁহার জীবন তাহাতেই সার্থকতা লাভ করিবে। এইরূপে বিদ্বেষশূন্য হইয়া কার্য্য করিলে, ধরণী শান্তিময়ী হইবে ; এবং সমগ্র মানবমণ্ডলী পরমসুখে সংসার যাত্রা সংসাধিত করিবেন।

কেহ হয়ত বলিবেন, যে "যিনি হর্ম্ম্যতলে উপবেশন করিয়া সঘৃতান্ন ভোজন করেন, দুগ্ধ-ফেণ-নিভ শয্যায় শয়ন করেন, দাস দাসীতে যাঁহার গৃহ কল-কলায়মান, তিনি ঐশ্বর্য্যের মনোরম দোলায় দোদুল্যমান হইয়া ঐ ব্যবস্থা

করিতে পারেন। কিন্তু যে কৃষক অহোরাত্র গর্দ্দভের ন্যায় পরিশ্রম করিয়া পরিবারের জন্য দুইবার চারিটি অন্ন যোগাইতে পারে না, সে আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট হইবে কেন? আমি নিজে এ কথার কোন উত্তর দিতে চাহি না। কিন্তু ইংলণ্ডের এক জন শ্রমজীবীর কথা আমি এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। "There was never a time, when men engaged in the assertion of their rights, were in so much danger of neglecting their duties. The partisan cries of the rights of capital, the rights of labour, the rights of land-holders, the rights of those who have no land, are for ever ringing in our ears, but of duties we are told little or nothing.······We see in men the dangers which beset the tendency to make more interest in rights than duties and its brutalising results." অনেকে মনে করেন যে যাহাকে কায়িক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার ন্যায় নীচকর্ম্মা এবং অসুখী মানব, বোধ হয়, আর কেহই নাই। কিন্তু এই ইংলণ্ডের শ্রমজীবী এতৎসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা চিরস্মরণীয়। "It is only by culture that men and women can be brought to realise the full GLORY and HONOUR of manual labour." যে শিক্ষাপ্রভাবে ব্রাহ্মণ সমাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াও পার্থিব সুখমাত্র বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। যে শিক্ষাপ্রভাবে শূদ্র দাসানুদাস হইয়াও কখনও ব্রাহ্মণের প্রতি অভক্তি বা বিদ্বেষ প্রকাশ করে নাই। এক্ষণে সমাজ রক্ষার জন্য সেই ধর্ম্মশিক্ষার, সেই নীতিশিক্ষার প্রয়োজন। আমাদের বোধ হয়, যে সমাজ-শরীর-তত্ত্ব সেই ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার প্রধান সহায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

কিন্তু বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিলেই যে সমাজের সম্পূর্ণতা হইবে তাহাও নহে। সমাজস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গগণকে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিতে হইবে। অর্থাৎ যতই আমাদের সভ্যতা বৃদ্ধি হইবে, ততই আমরা পরস্পরকে বিদ্বেষ না করিয়া পরস্পর পরস্পরের উন্নতি কামনা করিব। সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে ধনী ধনগৌরবে অন্ধ হইয়া দরিদ্রের প্রতি অবমাননা প্রকাশ করিবেন না এবং দরিদ্রও ধনীর ঐশ্বর্য্যের প্রতিহিংসা করিবেন না। সমাজের অসভ্য অবস্থায় অনৈক্য, অশান্তি ও কলহ থাকিতে পারে। কিন্তু সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, অর্থাৎ সমাজের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঐক্য ও সখ্য সংস্থাপিত হইবে।

কিন্তু এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে যদি ঐক্যই আয়তন বৃদ্ধির ফল হয়, তবে এক্ষণে বৃহৎ বৃহৎ সমাজে অনৈক্য এবং অপ্রীতি দেখা

যায় কেন? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে চাই, যে যেমন শরীরী পদার্থ মধ্যে মধ্যে রোগাক্রান্ত হয়, তেমনি মনুষ্য সমাজও মধ্যে মধ্যে রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। ফরাসিস্ রাজবিদ্রোহের সময় সমাজ মধ্যে যে ব্যাধির সঞ্চার হইয়াছিল, আজিও সে ব্যাধির উপশম হয় নাই। ঐ সময়ে সাম্য, স্বাধীনতা প্রভৃতি যে সমস্ত ভয়ঙ্কর ও ভ্রমসঙ্কুল মত প্রচলিত হইয়াছিল, যে সমস্ত উন্মাদক দ্রব্য সেবনে মনুষ্যসমাজ তৎকালে উন্মাদিত ও পশুভাবাপন্ন হইয়াছিল, আজিও সে সমস্ত মতের উৎপাটন হয় নাই, আজিও মনুষ্যের সেই উন্মত্ততা বিদূরিত হয় নাই। উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে, অর্থাৎ সদ্‌যুক্তি, সন্নীতি ও সুধর্ম্ম প্রচারে মনুষ্যসমাজ পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে, কিন্তু যদি এই উৎকট ব্যাধির সময় মনুষ্য-সমাজ যথেচ্ছ ব্যবহার করে, যদি ভাবি ইষ্টানিষ্ট না বুঝিয়া মনুষ্যসমাজ বর্ত্তমান সুখের জন্য কোনরূপ অহিতাচার করে, তাহা হইলে ইহা অকালে কালকবলে নিপতিত হইবে। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস এই যে বর্ত্তমান সময়ে সমাজ-শরীরে যে ঘোর ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে সমাজশরীর-তত্ত্বজ্ঞানই সে ব্যাধির পরম ঔষধ।

২।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে যদি মনুষ্য-সমাজ স্বাভাবিক নিয়মে পরিচালিত হইতেছে, তাহা হইলে মনুষ্য নিজ ইচ্ছায় তাহার পরিবর্ত্তন কিরূপে করিতে পারে? যদি সমাজকে শরীরী বলিয়া গণ্য করিতে হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের স্বাধীনচেষ্টা বা স্বাধীনইচ্ছা অথবা স্বাধীনকার্য্যের স্থল থাকে না।

মনুষ্য-সমাজকে শরীরী পদার্থ বলিলে মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার বা কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা হয় না। ভিন্ন ভিন্ন শরীরী পদার্থের অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন গুণে মণ্ডিত। বৃক্ষের অঙ্গে যেসমস্ত গুণ পরিলক্ষিত হয়, প্রাণীর অঙ্গে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ও উৎকৃষ্ট গুণ পরিলক্ষিত হইতে পারে। মনুষ্য-সমাজ নামক শরীরী পদার্থের অঙ্গে (অর্থাৎ মনুষ্যে) স্বাধীন ইচ্ছা থাকিতে পারে। তাহাতে সমাজের শরীরীভাবের কোনরূপ ব্যাঘাত হইতেছে না। কিন্তু মনুষ্য স্বাভাবিক নিয়মের বা কার্য্যের বিরুদ্ধে কতদূর ও কি পরিমাণে কার্য্য করিতে পারে, ইহা অপেক্ষাকৃত গুরুতর প্রশ্ন। মনুষ্য-সমাজ স্বাভাবিক নিয়মবলে এক দিকে প্রধাবিত হইতেছে। মনুষ্য নিজ চেষ্টায় ঐ গতির প্রতিরোধ বা বৈপরীত্য সঙ্ঘটন করিতে পারে কি না? মনুষ্য যে

স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে ইচ্ছা করিতে পারে, ইহা আমরা প্রত্যহই নিজের ও অন্যের জীবনে উপলব্ধি করিতে পারি। যাহার সঙ্গীতশক্তি নাই, সে স্বাভাবিক নিয়মবলে গান করিতে অক্ষম। কিন্তু সে যে উৎকৃষ্টরূপে গান করিবার জন্য ইচ্ছা করিতে পারে, ইহা আমরা প্রত্যহই দেখিতেছি। যে স্বভাবত ক্রোধী, সে অক্রোধ হইবার ইচ্ছা করিতে পারে। যে স্বভাবত লোভী সে নির্লোভ হইবার জন্য ইচ্ছা করিতে পারে। আর শুদ্ধ ইচ্ছাই বা কেন বলি? সে চেষ্টাও করিতে পারে। লোভী লোভসংবরণের চেষ্টা করিতে পারে, ক্রোধী ক্রোধসংবরণের চেষ্টা করিতে পারে। তবে এক্ষণে দেখিতে হইবে যে এরূপ ইচ্ছায় বা চেষ্টায় কোন ফল হয় কি না? মহা-বলবান্ প্রকাণ্ড, অচিন্তনীয়, অননুমেয় স্বভাবশক্তির বিরুদ্ধে, দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ মনুষ্যশক্তি কতক্ষণ বা কি পরিমাণে যুদ্ধ করিতে পারে?

আমাদের বোধহয় যে মনুষ্য স্বাভাবিকশক্তি ও স্বভাবনিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া উহাদের উপর আপন ইচ্ছায় আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে। স্বভাব নানাবিধ নিয়মে, নানাবিধ শক্তির পরিচালনে কার্য্য করিতেছে। মনুষ্য এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন নিয়মের মধ্যে একটার সাহায্য অবলম্বন করিয়া অন্যটিকে পরাজয় করিতে পারে। রসিকচন্দ্র রায় তাঁহার একটি সঙ্গীতের এক স্থলে গাহিয়াছেন—

"বারে বারে রণে তুমি দৈত্য জয়ী, একবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ী,
রসিকচন্দ্র বলে, মা তোমারি বলে, জিনিব তোমাকে।"

রসিকচন্দ্র ভবানীকে যেরূপ সম্ভাষণ করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক সেইরূপ প্রকৃতি দেবীকে সম্ভাষণ করেন। বৈজ্ঞানিক বলেন "হে মাতঃ! আমি পিপীলিকা হইতেও অধম। কিন্তু আমি তোমার সাহায্যেই তোমাকে পরাজিত করিতে পারি। তোমার এই বিশ্বমন্দিরে নানা নিয়ম নানা দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। আমি ইহাদের একটির সাহায্যে অন্যটিকে পরাজিত করি। যখন স্বাভাবিক নিয়ম বলে তোমার প্রবল সমুদ্রে তোমার প্রবল ঝটিকা উত্থিত হয় তখন আমি ঐ সমুদ্রোপরি তোমার তৈল নিক্ষেপ করিয়া ঐ ঝটিকার শান্তি করি। আমি অনেক বিষয়ে এখনও তোমার সাহায্য অবলম্বন করিতে শিখি নাই। কিন্তু আশা আছে যে আমি তোমার সাহায্যে তোমার গতি নিয়মিত করিয়া আমার নিজের মঙ্গল সাধন করিয়া তোমার কামনা পূর্ণ করিব।" ফলত যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে

যে আমরা অনেক স্থলেই স্বভাবের সাহায্যে স্বভাবকে পরাজিত করিয়া থাকি। স্বভাবস্থ ঔষধ লইয়া স্বভাবজাত রোগের নিবারণ করি। স্বভাবজাত বৃক্ষপত্র বা লতা পাতাদি লইয়া স্বভাবজাত শীতাতপাদির নিবারণ করি। মহামতি কোম্‌ত এতৎ সম্বন্ধে যে নিয়ম উদ্ভাবন করিয়াছেন, সে নিয়ম সকলের বুঝিয়া রাখা আবশ্যক। তিনি বলেন, যে নিয়মগুলি অমিশ্র (Simple) সেগুলির আমরা কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারি না। দুইয়ে দুইয়ে যোগ করিলে চারি হয়, ইহা স্বাভাবিক অমিশ্র নিয়ম। ত্রিভুজের দুই বাহুর যোগফল অন্য বাহু হইতে বৃহৎ ইহাও স্বাভাবিক অমিশ্র নিয়ম। মনুষ্য ইচ্ছা করিলে এই সমস্ত অমিশ্র নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। অর্থাৎ মনুষ্য ইচ্ছা করিলে দুইয়ে দুইয়ে পাঁচ করিতে পারে না। মনুষ্য ইচ্ছা করিলে ত্রিভুজের দুই বাহুর যোগফলকে অন্য বাহু অপেক্ষা ক্ষুদ্র করিতে পারে না। কিন্তু স্বভাবের যে নিয়ম গুলি মিশ্র (Complex) অর্থাৎ যেসমস্ত স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে দুই বা ততোধিক নিয়ম কার্য্য করে, মনুষ্য ইচ্ছা করিলে সেগুলির পরিবর্ত্তন করিতে পারে। পিতা মাতার যেরূপ আকার ও স্বভাব, পুত্রের আকার ও স্বভাব সেইরূপই হইবে, ইহা একটি স্বাভাবিক মিশ্র নিয়ম। কারণ এই স্বাভাবিক নিয়মের সহিত অন্য অনেকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম মুখ্য বা গৌণভাবে সংশ্লিষ্ট আছে। পুত্রের স্বভাব পিতা মাতার স্বভাবের ন্যায় হইবে, জাতীয় স্বভাবের অনুরূপ হইবে, দেশের জলবায়ু অনুসারে ঐ স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে, বন্ধুবান্ধবের দৃষ্টান্তের দ্বারা ঐ স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে, সুশিক্ষা ও কুশিক্ষার গুণে ঐ স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে, সময়ের গতি অনুসারে (যুগধর্ম্ম অনুসারে) ঐ স্বভাবের ব্যত্যয় হইবে,—এইরূপ নানাবিধ স্বাভাবিক নিয়মের কার্য্য দ্বারা পুত্রের চরিত্র সংঘটিত হইবে। এক্ষণে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে কতকগুলির বলাধান ও অন্য কতকগুলির বলহানি করিয়া মনুষ্য ইচ্ছাবলে ও চেষ্টা দ্বারা পুত্রের স্বভাবের নানাবিধ বৈচিত্র সম্পাদন করিতে পারে। এইরূপে যে স্থলে যত মিশ্র স্বাভাবিক নিয়ম কার্য্য করে, অর্থাৎ যে স্থলে যত অধিক স্বাভাবিক নিয়ম কার্য্য করিবে, সেইস্থলে মনুষ্য তত অধিক পরিমাণে নিজ ইচ্ছা ও চেষ্টার সাফল্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

সামাজিক সমস্ত ব্যাপারেই স্বাভাবিক নিয়ম বিমিশ্রভাবে কার্য্য করে অর্থাৎ সামাজিক প্রত্যেক ব্যাপারেই অনেকগুলি করিয়া স্বাভাবিক নিয়ম

একত্র কার্য্য করে। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে মনুষ্য সামাজিক ব্যাপারে নিজ ইচ্ছা ও চেষ্টা দ্বারা নানাবিধ পরিবর্ত্তন সম্পাদিত করিতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা স্পষ্টীকৃত করিতে চেষ্টা করিতেছি।

যখন কোন এক সমাজ অন্য সমাজ দ্বারা বিজিত হয়, তখন স্বাভাবিক নিয়মবলে জেতারা সমাজের প্রধান অঙ্গ ও বিজিতেরা নিকৃষ্ট অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়। স্পার্টানদের মধ্যে হেলট্, মুসলমানদের মধ্যে ক্রীতদাস, রোমানদের মধ্যে ক্লায়েণ্ট, ইংলণ্ডীয়দের মধ্যে সর্ফ, হিন্দুদের মধ্যে শূদ্র, প্রভৃতি বহুতর দৃষ্টান্ত ঐ স্বাভাবিক নিয়মের সাক্ষ্য দান করিতেছে। কাল-সহকারে সমাজের ঐ দুই অঙ্গ পূর্ণাবয়বতা প্রাপ্ত হয়। তখন উভয়ের মধ্যে প্রাধান্য প্রাপ্তির নিমিত্ত ঘোরতর কলহ উপস্থিত হয়। প্রধানেরা ঘৃণা, গর্ব্ব, জাত্যভিমান প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সমাজস্থ নবোদ্গত অঙ্গের বিনাশ চেষ্টাকরে। নবোদ্ভূত নিকৃষ্ট অঙ্গও নব বলে বলীয়ান্ হইয়া পূর্ব্ব প্রভুর গৌরব হানির যথাসাধ্য চেষ্টা করে। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতিরও আয়োজন হয়। কিন্তু মনুষ্য, অন্ধ মনুষ্য স্বাভাবিক নিয়মের কার্য্য না বুঝিয়া নিজ নিজ ক্ষণিক সুখভোগের অভিলাষে সমাজ-শরীরে প্রবল কুঠারাঘাত করে। যে সমাজে বুদ্ধিমান পরিচালক থাকেন, সে সমাজে প্রধান ও নিকৃষ্ট এ উভয়ের মধ্যে অল্পে অল্পে সখ্য সংস্থাপিত হইয়া সমাজ শরীরের পুষ্টিসম্পাদন হয়। রোমে প্রধান ব্যক্তিরা অল্পে অল্পে নিকৃষ্টের সহিত একীকৃত হইয়া সমাজ-শরীরের অতীব বলাধান করিয়াছিল। স্পার্টাতেও হেলটেরা স্পার্টানদের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে সর্ফগণ ভূম্যধিকারীর দলে উত্থিত হইতে পারিয়াছে।

কিন্তু যে সমাজে নির্ব্বোধ বা স্বার্থপর পরিচালক থাকে সে সমাজে এইরূপ সম্মিলন হয় না। আথেন্সে পেরিক্লিস্ অন্যদেশের অর্থ স্বদেশের কার্য্যে ব্যয়িত করিয়া আথেন্সের ভাবি সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কৃত করিলেন। ফ্রান্সে চতুর্দ্দশ-লুই প্রধানদিগের সম্মাননা ও নিকৃষ্টদিগের অবমাননা করিয়া রাষ্ট্রবিপ্লবের সূত্রপাত করিলেন। এই সমস্ত এবং অন্য অন্য দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, যে প্রত্যেক সমাজেই কাল সহকারে প্রধান ও নিকৃষ্ট এই দুই শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। এবং ইহাও দেখা যাইবে যে যেখানেই প্রধান ও নিকৃষ্ট ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইতে পারিয়াছে, সেখানে সমাজের গৌরব, বল ও শ্রী বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু আবার ইহাও দেখা যাইবে যে, যেখানেই প্রধান নিকৃষ্টকে

পদদলিত করিয়াছে, সেইখানেই হয় কিয়ৎকাল পরে নিকৃষ্ট প্রধানের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছে, নয় নিকৃষ্ট-প্রধানের সহিত সমস্ত সমাজ একেবারেই বিনষ্ট ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। স্বাভাবিক নিয়মবলে ইংরাজেরা এদেশে প্রকৃষ্ট শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। যদি এই সমস্ত প্রকৃষ্ট শ্রেণীর ইংরাজেরা নিকৃষ্টদের সহিত সখ্য সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে স্বাভাবিক নিয়মবলে প্রকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট এক সমাজভুক্ত হইয়া যাইবে। ভারতবর্ষীয় সমাজ অভূতপূর্ব্ব বলে বলীয়ান্ হইবে। কিন্তু যদি এতদ্দেশীয় ইংরাজেরা নিকৃষ্ট শ্রেণীস্থ ভারতবাসীদিগকে পদদলিত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ঐ স্বাভাবিক নিয়ম বলেই হয় নিকৃষ্টেরা তাঁহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে, নয় নিকৃষ্ট ও প্রকৃষ্ট উভয়েই অন্য সমাজ দ্বারা পরাজিত হইয়া কাল-কবলে নিপতিত হইবেন। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে চারিটি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হয়। যথা—

১ম। স্বাভাবিক নিয়মবলে সমাজমধ্যে নিকৃষ্ট ও প্রকৃষ্ট—এই দুই শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

২য়। স্বাভাবিক নিয়মবলে ঐ দুই শ্রেণীর মধ্যে সখ্যভাব সংস্থাপিত হইবার প্রবৃত্তি ও চেষ্টা হইয়া থাকে।

৩য়। মনুষ্য ইচ্ছা করিয়া এই স্বাভাবিক সম্প্রীতির পরিপোষণ বা সঙ্কোচন করিতে পারেন।

৪র্থ। যেখানে স্বাভাবিক সম্প্রীতির পরিপোষণ না হয়, সেখানে প্রকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট কিয়ৎকাল সংগ্রাম করিয়া উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর যেখানে পরিপোষণ ক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতে পায়, সেখানে সমাজও নিত্য নিত্য নব নব ভাবে বিকশিত হইতে থাকে। অচিরেই ঐ সমাজ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া নিজের ও অন্যের প্রভূত মঙ্গল সম্পাদন করিতে পারে।

সামাজিক ব্যাপারে মনুষ্য কিরূপে নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতার ব্যবহার করিতে পারে, এবং কিরূপে ঐ ইচ্ছা ও ক্ষমতার দ্বারা স্বাভাবিক নিয়মের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহা বোধ হয় এক্ষণে কতক পরিমাণে বুঝা যাইবে।

৩।

শরীরী পদার্থমাত্রই বার্দ্ধক্যাবস্থায় উপনীত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। যদি সমাজ শরীরী পদার্থ হয়, তাহা হইলে সমাজও বার্দ্ধক্যাবস্থায় উপনীত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে সমাজের উন্নতির

জন্য বৃথা চেষ্টা করার প্রয়োজন কি? যাহার অবনতি ও মৃত্যু অবধারিত তাহার জন্য অনর্থক পরিশ্রম করায় লাভ কি?

অতি সহজেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। মনুষ্যের জরা বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু অবধারিত। তথাপি মনুষ্য স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়াস করে কেন? তথাপি মনুষ্য শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য লালায়িত হয় কেন? সেইরূপ যদিও মনুষ্য-সমাজের মৃত্যু একরূপ নিশ্চিত,তথাপি মনুষ্য-সমাজ সম্বন্ধেও সকলেই উহার উন্নতির কামনা করিয়া থাকে। নিজ জীবন রক্ষাকরা প্রাণিমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সেইরূপে নিজ সমাজ রক্ষা করাও মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তদ্ভিন্ন সমাজ নামক শরীরী পদার্থেরও নিজ শরীর রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

৪।

সমাজ ও সমাজান্তর্গত মনুষ্য—এ উভয়ের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ থাকা উচিত, এক্ষণে তাহার বিচার করা যাউক। স্পেনসরের মতে সমাজের উচিত, যে সমাজ ব্যক্তিদিগের প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করেন। কিন্তু সমাজ নামক স্বতন্ত্র শরীরী পদার্থ কোথাও স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত নাই। সমাজ শরীরী পদার্থের ন্যায় কতকগুলি শারীর নিয়মে পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং সমাজ কিরূপে এ চেষ্টা করিবে? বরং অন্যদিকে ব্যক্তিমাত্রেরই সমাজপুষ্টির চেষ্টা করা উচিত। ব্যক্তিমাত্রেরই মনে আত্মহিতকরী ও সমাজহিতকরী উভয় প্রকার প্রবৃত্তিই বিদ্যমান আছে। সমাজহিতকরী প্রবৃত্তির পুষ্টিসাধন করা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য কার্য্য। স্বাভাবিকী প্রবৃত্তিবলে মনুষ্য স্বতই আত্মহিতকর কার্য্য করিয়া থাকে। তাহার ঐ প্রবৃত্তি স্বভাবতই প্রবলা। ঐ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় না দিয়া যাহাতে সমাজহিতকরী প্রবৃত্তির পরিপোষণ হয়, শিক্ষক মাত্রেরই সেই চেষ্টা করা উচিত। সমস্ত সমাজের উন্নতি হইলে কাজেকাজেই ব্যক্তিমাত্রেরও উন্নতি হইবে। এইরূপ বিচার করিলে মনুষ্যের কর্ত্তব্যকার্য্য সম্বন্ধে তিনটি সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। যথা—

১ম। তোমার সমাজমধ্যে তোমার স্থল কোথায় এবং তুমি কোন্ শ্রেণীভুক্ত, অগ্রে নিঃস্বার্থ ভাবে, আত্মাভিমানশূন্য হইয়া তাহার নির্দ্ধারণ কর।

২য়। তোমার শ্রেণীর ও তোমার পদের লোকের নিকট সমাজ কি বি বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা ধীরভাবে বুঝিয়া দেখ।

৩য়। পরে যথাসাধ্য সমাজের পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে চেষ্টা কর

যদি মনুষ্যমাত্রেই "আমার স্বত্ব" "আমার অধিকার" প্রভৃতি স্বার্থপর বিষয়ের অনুসন্ধান না করিয়া নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে মনুষ্যে মনুষ্যে কলহ না হইয়া উহাদের মধ্যে আন্তরিক হৃদ্যতা জন্মিবে। লোকে কায়িক বা মানসিক পরিশ্রমকে ঘৃণা না করিয়া পরিশ্রমকে মহত্ত্বের প্রধান পরিচায়ক বলিয়া গণ্য করিবে। যে ব্যক্তি সমাজ জন্য যত কার্য্য করিবে, যত পরিশ্রম করিবে, লোকে তাহাকে সেই পরিমাণে শ্রদ্ধা করিবে। যিনি ধনী, তিনি আলস্যপরায়ণতাকে কাপুরুষতা বলিয়া মনে করিবেন। যিনি দরিদ্র তিনি পরিশ্রমের গৌরবে সম্মানিত হইয়া নিজের নিকট ও অন্যের নিকট শ্রদ্ধেয় হইবেন।

কি মনোহর দৃশ্য! এই দুঃখদিগ্ধ জগৎ সেই সুদিনে পবিত্র অমরাবতীর ন্যায় শোভান্বিত হইবে। মনুষ্যমাত্রেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছে, কেহ কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করিতেছে না। জাতি জাতির প্রতি লোভ-কটাক্ষ করিতেছে না। চতুর্দ্দিকে শান্তি, পরিশ্রম, সুখ, সচ্ছন্দতা। হে মনুষ্য! জগতে যাহাতে এই শুভদিন আসিতে পারে সেই চেষ্টা কর। কবিবর টেনিসন ভবিষ্যতের জন্য যে সমস্ত আশা করিয়াছেন, আইস আমরাও প্রকৃতি দেবীর নিকট সেই সমস্ত বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করি।

"ঐ বাজে হোরা, দিয়ে অশ্রুধারা, প্রাচীনে বিদায় দেও।
বাজে সুখ-হোরা, আনি আম্রঝারা, নূতনে ডাকিয়ে নেও॥
গত আয়ু-প্রায়, গত-বর্ষ যায়, যাক্—দেও গত হতে।
হৃদয়-মন্দিরে, অসত্যে নিবারি, শিখহ পূজিতে সত্যে॥
হোরা বাজে ঘন, ধনাঢ্য-নির্ধন, কলহ করহ দূর।
ধরণীর শেল, দৌরাত্ম্য আচার, ভাঙ্গিয়ে করহ চুর॥
ধরণীর বিষ, পরহিংসা দ্বেষ, পর দুঃখে কর খেদ।
ঐ বাজে হোরা, পুরাতনে সরা ঘুচারে অবনী-ক্লেদ॥
সহস্র বৎসর, উৎকট বিগ্রহ, উত্তাপে ধরণী জরা।
সহস্র বৎসর, শান্তির সলিলে, শীতল হউক ধরা॥"

(বঙ্গদর্শন।)

মনুষ্য-সমাজের ন্যায় অন্য অন্য কি কি পদার্থকে শরীরী বলা যায়, তৎসম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

মনুষ্যত্ব।

প্রথম কথা।

গুরু। কেমন, হিন্দুধর্ম্মের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা শুনিতে প্রস্তুত আছ?

শিষ্য। না। ধর্ম্মের ব্যাখ্যাই এখনও ভাল করিয়া বুঝি নাই। আপনি যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাত প্রচলিত ধর্ম্ম সকলের প্রতি খাটিতেছে না। সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য পারকালিক মঙ্গল, কিন্তু পরকালের সঙ্গে ত আপনার এ ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ দেখি না।

গুরু। বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। এ আপত্তি তোমার সহজে খণ্ডন করিতে পারিব। আর আর আপত্তি যাহা হইতে পারে, তাহাও খণ্ডন করিব। কিন্তু তাহার আগে এই ব্যাখ্যাটি ভাল করিয়া বোঝ। সে দিন যাহা বলিয়াছি, তাহা মোটকথা মাত্র। মোটকথা এই যে, ধর্ম্ম সুখের উপায়। সুখ, মানুষের বৃত্তিগুলির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি বা পরিণতি, ও পরিতৃপ্তি। পরিতৃপ্তি কথাটা আপাতত ছাড়িয়া দিতে পারি। কেন না, সম্যক্ পরিতৃপ্তি সম্যক্ পরিণতির ফল। যাহার পিপাসা নাই, সে জল পানের সুখ জানে না। যে শিশুর দাঁত উঠে নাই, সে দুগ্ধ ভিন্ন অন্য খাদ্যের আস্বাদনে অক্ষম। বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি আগে—চরিতার্থতা পরে। এই সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি কি তাই আগে বুঝিতে হইবে।

শিষ্য। মনুষ্যের বৃত্তিগুলি লইয়াই মনুষ্য মনুষ্য। অতএব যে অবস্থায় মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলি সম্যক্ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থাকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বলুন না কেন? ধর্ম্ম বলা অনাবশ্যক বোধ হইতেছে না।

গুরু। সে অবস্থাকে আমি ধর্ম্ম বলিতেছি না। ধর্ম্ম যাহা বুঝাইয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। সুখের উপায় ধর্ম্ম। সুখের দুই ভাগ, প্রথম বৃত্তির পরিণতাবস্থা; দ্বিতীয় সে সকলের চরিতার্থতা। ঐ প্রথমটিকে তুমি প্রকৃত মনুষ্যত্ব বলিতেছ। ভাল তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু স্মরণ থাকে যেন যে উহা ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম যাহার উপায়, তাহারই একটি উপাদান মাত্র। কিন্তু উহাই প্রধান উপাদান। কেন না বৃত্তিগুলি পরিণত হইলে চরিতার্থতা অনায়াস-লভ্য হয়। যেমন কতকগুলি বৃত্তির স্ফূরণে আমরা সুখ

ভোগে সক্ষম হই, তেমনি আর কতকগুলি বৃত্তির স্ফূরণে সেই সুখের অর্জ্জনে ক্ষমবান হই। যেব্যক্তি দয়াদি বৃত্তির পরিণতি জন্য দানকর্ম্মে সুখী হইতে সক্ষম হইয়াছে, সে অন্যান্য বৃত্তির পরিণতি জন্য দেয় বস্তুর উপার্জ্জনেও সক্ষম হইয়াছে। মূর্খ দান করিয়াও সুখী হয় না, দিবার জন্য ধন উপার্জ্জন করিতেও পারে না। অতএব এই মনুষ্যত্বই সুখের প্রধান উপাদান। এই মনুষ্যত্ব বুঝিলে ধর্ম্ম সহজে বুঝিতে পারিবে। তাই আগে মনুষ্যত্ব বুঝাইতেছি। মনুষ্যত্ব বুঝিবার আগে বৃক্ষত্ব বুঝ। এই একটি ঘাস দেখিতেছ, আর এই বট গাছ দেখিতেছ—ছুইটিই কি এক জাতীয়?

শিষ্য। হাঁ এক হিসাবে এক জাতীয়। উভয়েই উদ্ভিদ?

গুরু। ছুইটিকেই কি বৃক্ষ বলিবে?

শিষ্য। না, বটকেই বৃক্ষ বলিব—ওটি তৃণ মাত্র।

গুরু। এ প্রভেদ কেন?

শিষ্য। কাণ্ড, শাখা, পল্লব, ফুল, ফল এই লইয়া বৃক্ষ। বটের এসব আছে, ঘাসের এসব নাই।

গুরু। ঘাসেরও সব আছে—তবে ক্ষুদ্র, অপরিণত। ঘাসকে বৃক্ষ বলিবে না?

শিষ্য। ঘাস আবার বৃক্ষ?

গুরু। যদি ঘাসকে বৃক্ষ না বল, তবে যে মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলি স্ফূরিত এবং মার্জ্জিত হয় নাই, তাহাকেও মনুষ্য বলিতে পারা যায় না। ঘাসের যেমন উদ্ভিত্ব আছে, একজন হটেণ্টট্ বা চিপেবারও সেরূপ মনুষ্যত্ব আছে। কিন্তু যে উদ্ভিত্বকে বৃক্ষত্ব বলি, সে যেমন ঘাসের নাই, তেমনি যে মনুষ্যত্ব ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, হটেণ্টট বা চিপেবার সে মনুষ্যত্ব নাই। বৃক্ষত্বের উদাহরণ ছাড়িও না তাহা হইলেই বুঝিবে। ঐ বাঁশঝাড় দেখিতেছ—উহাকে বৃক্ষ বলিবে?

শিষ্য। বোধ হয় বলিব না। উহার কাণ্ড, শাখা, ও পল্লব আছে কিন্তু কৈ? উহার ফুল ফল হয় না; উহার সার্ব্বাঙ্গীন পরিণতি নাই; উহাকে বৃক্ষ বলিব না।

গুরু। তুমি অনভিজ্ঞ। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পরে, এক একবার বাঁশের ফুল হয়। ফুল হইয়া, ফল হয়, তাহা চালের মত। চালের মত, তাহাতে ভাতও হয়।

হরি। তবে বাঁশকে বৃক্ষ বলিব।

আচার্য্য। অথচ বাঁশ তৃণ মাত্র। একটি ঘাস উপড়াইয়া লইয়া গিয়া বাঁশের সহিত তুলনা করিয়া দেখ—মিলিবে। উদ্ভিত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও বাঁশকে তৃণ শ্রেণী মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। অতএব দেখ, স্ফূর্ত্তিগুণে তৃণে তৃণে কত তফাৎ। অথচ বাঁশের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি নাই। যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি।

শিষ্য। এরূপ পরিণতি কি ধর্ম্মের আয়ত্ত ?

গুরু। উদ্ভিদের এইরূপ উৎকর্ষে পরিণতি, কতকগুলি চেষ্টার ফল, লৌকিক কথায় তাহাকে কর্ষণ বা পাট বলে। এই কর্ষণ কোথাও মনুষ্য কর্ত্তৃক হইতেছে, কোথাও প্রকৃতির দ্বারা হইতেছে। একটা সামান্য উদাহরণে বুঝাইব। তোমাকে যদি কোন দেবতা আসিয়া বলেন, যে বৃক্ষ, আর ঘাস, এই দুইই একত্র পৃথিবীতে রাখিব না। হয় সব বৃক্ষ নষ্ট করিব, নয় সব তৃণ নষ্ট করিব। তাহা হইলে তুমি কি চাহিবে ? বৃক্ষ রাখিতে চাহিবে, না ঘাস রাখিতে চাহিবে ?

শিষ্য। বৃক্ষ রাখিব, তাহাতে সন্দেহ কি ? ঘাস না থাকিলে ছাগল গোরুর কিছু কষ্ট হইবে, কিন্তু বৃক্ষ না থাকিলে আম, কাঁটাল, নারিকেল, প্রভৃতি উপাদেয় ফলে বঞ্চিত হইব।

আচার্য্য। মূর্খ! তৃণ জাতি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইলে অন্নাভাবে মারা যাইবে যে ? জান না, যে ধানও তৃণজাতীয় ? ঐ যে ভাঁটুই দেখিতেছি, উহা ভাল করিয়া দেখিয়া আইস। ধানের পাট আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ধানও ঐরূপ ছিল। কেবল কর্ষণে, ধান্য জীবনদায়িনী লক্ষ্মীর তুল্য হইয়াছে। গমও ঐরূপ। যে ফুলকপি দিয়া অন্নের রাশি সংহার কর, তাহাও আদিম অবস্থায় সমুদ্র তীরবাসী তিক্তস্বাদ কদর্য্য উদ্ভিদ ছিল—কর্ষণে এই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মনুষ্যের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলির অনুশীলন তাই। এইজন্য ইংরেজিতে উভয়েরই এক নাম, CULTURE! এই জন্য কথিত হইয়াছে যে "The Substance of Religion is Culture. "মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম্ম।"

দ্বিতীয় কথা।

শিষ্য। কাল যাহা বলিয়াছেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই—মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি কাহাকে বলে ?

গুরু। অঙ্কুরের পরিণাম, মহামহীরুহ। মাটি খোঁজ, হয় ত একটি অতি ক্ষুদ্র প্রায় অদৃশ্য, অঙ্কুর দেখিতে পাইবে। পরিণামে সেই অঙ্কুর এই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের মত বৃক্ষ হইবে। কিন্তু তজ্জন্য ইহার কর্ষণ—কৃষিরা যাহাকে গাছের পাট বলে, তাহা চাই। সরস মাটি চাই—জল না পাইলে হইবে না। রৌদ্র চাই, আওতায় থাকিলে হইবে না। যে সামগ্রী বৃক্ষ শরীরের পোষণজন্য প্রয়োজনীয়, তাহা মৃত্তিকায় থাকা চাই—বৃক্ষের জাতি বিশেষে মাটি সার দেওয়া চাই। ঘেরা চাই। ইত্যাদি। তাহা হইলে অঙ্কুর বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্যেরও এইরূপ। যে শিশু দেখিতেছ, ইহা মনুষ্যের অঙ্কুর; বিহিত কর্ষণে অর্থাৎ অনুশীলনে উহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে, সর্ব্ব গুণযুক্ত, সর্ব্ব-সুখ-সম্পন্ন মনুষ্য হইবে। ইহাই মনুষ্যের পরিণতি।

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। সর্ব্বরূপ, সর্ব্বগুণযুক্ত,—কি সকল মনুষ্য হইতে পারে?

গুরু। কখন হইতে পারিবে কিনা, সে কথা এখন তুলিয়া কাজ নাই। সে অনেক বিচার,। তবে ইহা স্বীকার করিব, যে এপর্য্যন্ত কেহ কখন হয় নাই। আর সহসা কেহ হইবারও সম্ভাবনা নাই। তবে আমি যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত, তাহার বিহিত অবলম্বনে ইহাই হইবে, যে লোকে সর্ব্ব গুণ অর্জ্জনের যত্নে বহুগুণ সম্পন্ন হইতে পারিবে; সর্ব্বসুখ লাভের চেষ্টায় বহু সুখলাভ করিতে পারিবে।

শিষ্য। আমাকে ক্ষমা করুন—মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি কাহাকে বলে, তাহা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। চেষ্টা কর। মনুষ্যের দুইটি অঙ্গ; এক শরীর, আর এক মন। শরীরের আবার কতকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে, যথা,—হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়; মস্তিষ্ক, হৃৎ, স্নায়ু কোষ, অন্ত্র প্রভৃতি জীবন-সঞ্চালক প্রত্যঙ্গ; অস্থি মজ্জা মেদ মাংস শোণিত প্রভৃতি শারীরিক উপাদান, এবং ক্ষুৎ পিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি। এসকলের বিহিত পরিণতি চাই। আর মনেরও কতকগুলি প্রত্যঙ্গ—

শিষ্য। মনের কথা পশ্চাৎ শুনিব; এখন শারীরিক পরিণতি ভাল করিয়া বুঝান। শারীরিক প্রত্যঙ্গ সকলের কি প্রকারে পরিণতি সাধিত হইবে? শিশুর এই ক্ষুদ্র দুর্ব্বল বাহু বয়োগুণে আপনিই বর্দ্ধিত, ও বলশালী হইবে। তাহা ছাড়া আবার কি চাই?

গুরু। তুমি যে স্বাভাবিক পরিণতির কথা বলিতেছ, তাহারও দুইটি কারণ। আমিও সেই দুইটির উপর নির্ভর করিতেছি। সেই দুইটি কারণ পোষণ ও অভ্যাস। তুমি কোন শিশুর একটি বাহু, কাঁধের কাছে, দৃঢ় বন্ধনীর দ্বারা বাঁধিয়া রাখ, বাহুতে আর রক্ত না যাইতে পারে, তাহা হইলে, ঐ বাহু আর বাড়িবে না, হয় ত অবশ, নয় দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। কেন না, যে শোণিতে বাহুর পুষ্টি হইত, তাহা আর পাইবে না। আবার, বাঁধিয়া কাজ নাই, কিন্তু এমন কোন বন্দোবস্ত কর, যে শিশু কখনও আর হাত নাড়িতে না পারে। তাহা হইলে ঐ হাত অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে, অন্তত হস্ত সঞ্চালনে যে ক্ষিপ্রকারিতা জৈবকার্য্যে প্রয়োজনীয়, তাহা কখনও হইবে না। ঊর্দ্ধবাহুদিগের বাহু দেখিয়াছ ত ?

শিষ্য। বুঝিলাম, অনুশীলন গুণে শিশুর কোমল ক্ষুদ্র বাহু পরিণত বয়স্ক মানুষের বাহুর বিস্তার, বল, ও ক্ষিপ্রকারিতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এত সকলেরই সহজেই হয়। আর কি চাই ?

গুরু। তোমার বাহুর সঙ্গে এই বাগানের মালীর বাহু তুলনা করিয়া দেখ। তুমি, তোমার বাহুস্থিত অঙ্গুলিগুলিকে অনুশীলনে এরূপ পরিণত করিয়াছ, যে এখনই পাঁচ মিনিটে তুমি দুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিয়া ফেলিবে, কিন্তু ঐ মালী দশ দিন চেষ্টা করিয়া তোমার মত একটি "ক" লিখিতে পারিবে না। তুমি যে, না ভাবিয়া না যত্ন করিয়া অবহেলায় যেখানে যে আকারের যে অক্ষরের প্রয়োজন তাহা লিখিয়া যাইতেছ, ইহা উহার পক্ষে অতিশয় বিস্ময়কর, ভাবিয়া সে কিছু বুঝিতে পারে না। সচরাচর অনেকেই লিখিতে জানে, এই জন্য সভ্যসমাজে লিপিবিদ্যা বিস্ময়কর অভ্যাস বলিয়া লোকের বোধ হয় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই লিপিবিদ্যা ভোজবাজির অপেক্ষা আশ্চর্য্য অভ্যাস-ফল। দেখ, একটি শব্দ লিখিতে গেলে, মনে কর এই 'অভ্যাস' শব্দ লিখিতে গেলে,—প্রথমে এই শব্দটির বিশ্লেষণ করিয়া উহার উপাদানভূত বর্ণগুলি স্থির করিতে হইবে—বিশ্লেষণে পাইতে হইবে, অ, ভ, ই, আ, স। ইহা প্রথমে কেবল কর্ণে, তাহার পর প্রত্যেকের চাক্ষুষ দ্রষ্টব্য অবয়ব ভাবিয়া মনে আনিতে হইবে। এক একটি অবয়ব মনে পড়িবে, আবার এক একটি কাগজে আঁকিতে হইবে। অথচ তুমি এত শীঘ্র লিখিবে, যে তাহাতে বুঝাইবে যে তুমি কোন প্রকার মানসিক চিন্তা করিতেছে না। অথচ অনুশীলন গুণে অনেকেই এই অসাধারণ কৌশলে কুশলী।

অনুশীলন-জনিত আরও প্রভেদ এই মালীর তুলনাতেই দেখ। তুমি যেমন পাঁচ মিনিটে দুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিবে, মালী তেমনি পাঁচ মিনিটে এক কাটা জমীতে কোদালি দিবে। তুমি দুই ঘণ্টায়, হয়ত দুই প্রহরেও তাহা পারিয়া উঠিবে না। এ বিষয়ে তোমার বাহু উপযুক্ত রূপে চালিত অর্থাৎ অনুশীলিত হয় নাই, সমুচিত পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তোমার ও মালীর উভয়েরই বাহু কিয়দংশে অপরিণত; সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। আবার এক জন শিক্ষিত গায়কের সঙ্গে তোমার নিজের তুলনা করিয়া দেখ। হয়ত, শৈশবে তোমার কণ্ঠ ও গায়কের কণ্ঠে বিশেষ তারতম্য ছিল না; অনেক গায়ক সচরাচর সুকণ্ঠ নহে। কিন্তু অনুশীলন গুণে গায়ক সুকণ্ঠ হইয়াছে, তাহার কণ্ঠের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হইয়াছে। আবার দেখ,—বল দেখি, তুমি কয় ক্রোশ পথ হাঁটিতে পার?

শিষ্য। আমি বড় হাঁটিতে পারি না; বড় জোর এক ক্রোশ।

গুরু। তোমার পদদ্বয়ের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হয় নাই। দেখ তোমার হাত, পা, গলা, তিনেরই সহজ পুষ্টি ও পরিণতি হইয়াছে—কিন্তু একেরও সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হয় নাই। এইরূপ আর সকল শারীরিক প্রত্যঙ্গের বিষয়ে দেখিবে। শারীরিক প্রত্যঙ্গ মাত্রেরই সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি না হইলে শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হইয়াছে বলা যায় না; কেন না ভগ্নাংশ গুলির পূর্ণতাই ষোল আনার পূর্ণতা। এক আনায় আধ পয়সা কম হইলে, পূরা টাকাটাতেই কম্‌তি হয়।

যেমন শরীর সম্বন্ধে বুঝাইলাম, এমনই মন সম্বন্ধে জানিবে। মনেরও অনেক গুলি প্রত্যঙ্গ আছে সে গুলিকে বৃত্তি বলে। কতকগুলির কাজ জ্ঞানার্জ্জন ও বিচার। কেহ কেহ এই গুলিকে বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়াছেন। কতকগুলির কাজ কার্য্যে প্রবৃত্তি দেওয়া—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। কেহ কেহ ইহাদিগকে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বলেন। আর কতকগুলির কাজ জগতের সৌন্দর্য্য হৃদয়ে গ্রহণ, রসগ্রহণ, চিত্তবিনোদন। পাশ্চাত্যেরা এগুলিকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করেন, তাঁহাদের বিবেচনায় Æsthetic faculties গুলি Intellectual faculties মধ্যে গণ্য। এই ত্রিবিধ বৃত্তিগুলির সকলের পুষ্টি ও সম্পূর্ণ বিকাশই মানসিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি।

শিষ্য। অর্থাৎ জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্য্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্ম্মাত্মতা, এবং সুরসে রসিকতা, এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্ব্বাঙ্গীন

পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি আছে অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ, এবং সর্ব্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই। কৃষ্ণার্জ্জুন আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভিন্ন আর কেহ কখন এরূপ হইয়াছিল কিনা, তাহা শুনি নাই।

গুরু। যাহারা মনুষ্য জাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাহারা চেষ্টা করিলে যে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না, এমত কথা স্বীকার করা যায় না। আমার এমনও ভরসা আছে, যুগান্তরে যখন মনুষ্য জাতি প্রকৃত উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনুষ্যই এই আদর্শানুযায়ী হইবে। সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজাগণের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায়,সেই রাজগণ সম্পূর্ণরূপে এই মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে বর্ণনাগুলি যে অনেকটা লেখকদিগের কপোলকল্পিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ রাজগুণ বর্ণনা যেস্থলে সাধারণ, সেস্থলে, ইহাই অনুমেয় যে এইরূপ একটা আদর্শ সে কালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়দিগের সম্মুখে ছিল। আমিও সেইরূপ আদর্শ তোমার সম্মুখে স্থাপন করিতেছি। যে যাহা হইতে চায়, তাহার সম্মুখে তাহার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ চাই। সে ঠিক আদর্শানুরূপ না হউক, তাহার নিকটবর্ত্তী হইবে। ষোল আনা কি, তাহা না জানিলে, আট আনা পাইবার কেহ কামনা করে না। যে শিশু টাকায় ষোল আনা ইহা বুঝে না, সে টাকার মূল্য স্বরূপ চারিটি পয়সা লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে।

শিষ্য। এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মনুষ্য ত দেখি না।

গুরু। এই জন্য ঈশ্বরোপসনার প্রয়োজন। ঈশ্বরই সর্ব্বগুণের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। এইজন্য বেদান্তের নির্গুণ ঈশ্বরে, ধর্ম্ম সম্যক্ ধর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হয় না, কেননা যিনি নির্গুণ তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈতবাদীদিগের একমেবাদ্বিতীয় চৈতন্য অথবা যাহাকে হর্বর্ট স্পেনসর "Inscrutable Power in Nature" বলিয়া ঈশ্বরস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন—অর্থাৎ যিনি কেবল দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনায় ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের পুরাণেতিহাসে কথিত বা খ্রীষ্টিয়ানের ধর্ম্ম পুস্তকে কথিত সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্ম্মের মূল, কেন না তিনিই আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। যাঁহাকে "Impersonal God" বলি, তাঁহার উপাসনা নিষ্ফল, যাঁহাকে "Personal God" বলি, তাঁহার উপাসনাই সফল।

শিষ্য। মানিলাম সগুণ ঈশ্বরকে আদর্শ স্বরূপ মানিতে হইবে। কিন্তু উপাসনার প্রয়োজন কি?

গুরু। ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া, চলিব, সে সম্ভাবনা নাই। কেবল তাঁহাকে মনে ভাবিতে পারি। সেই ভাবাই উপাসনা। তবে বেগার টালা রকম ভাবিলে কোন ফল নাই। সন্ধ্যা কেবল আওড়াইলে কোন ফল নাই। তাঁহার সর্ব্বগুণ সম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে। প্রীতির সহিত হৃদয়কে তাঁহার সম্মুখীন করিতে হইবে। তাঁহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ ব্রত দৃঢ় করিতে হইবে;—তাহা হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতি আমাদিগের চরিত্রে পড়িবে। তাঁহার গুণের মত গুণ, তাঁহার নির্ম্মলতার মত নির্ম্মলতা, তাঁহার শক্তির অনুকারী সর্ব্বত্র-মঙ্গলময় শক্তি কামনা করিতে হইবে। তাঁহাকে সর্ব্বদা নিকটে দেখিতে হইবে, তাঁহার স্বভাবের সঙ্গে একস্বভাব হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহার সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য কামনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব। আর্য্য ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন, যে তাহা হইলে আমরা ক্রমে সারূপ্য ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হইব,—ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরেই লীন হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়, ঐশ্বরিক আদর্শ-নীত ঈশ্বরানুকৃত স্বভাব প্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।

শিষ্য। আমি এত দিন বুঝিতাম, ঈশ্বর একটা সমুদ্র, আমি এক ফোঁটা জল, তাহাতে গিয়া মিশিব।

গুরু। হিন্দু ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম না বুঝাই, এসব বানরামির কারণ। উপাসনা-তত্ত্বের সার মর্ম্ম হিন্দুরা যেমন বুঝিয়া ছিলেন, এমন আর কোন জাতিই বুঝে নাই। এখন সে পরম রমণীয় ও সুসার উপাসনা পদ্ধতি এক দিকে আত্মপীড়নে, আর এক দিকে রঙ্গদারিতে পরিণত হইয়াছে। যখন তোমাকে হিন্দুর উপাসনা-তত্ত্ব বুঝাইব, তখন এসব কথা জানিতে পারিবে।

শিষ্য। এখন আমাকে আর একটা কথা বুঝান। মনুষ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের, অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন স্বভাবের আদর্শ নাই, এজন্য ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি। আমরা ক্ষুদ্রপ্রকৃতি। তাঁহার গুণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, সম্প্রসারণেও অনন্ত। যে ক্ষুদ্র, অনন্ত

তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে চাঁদোয়া খাটান যায়?

গুরু। এই জন্য ধর্ম্মেতিহাসের প্রয়োজন। ধর্ম্মেতিহাসের প্রকৃত আদর্শ নিউটেষ্টেমেণ্টের, এবং আমাদের পুরাণেতিহাসের প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে সারভাগ। ধর্ম্মেতিহাসে (Religious History) প্রকৃত ধার্ম্মিকদিগের চরিত্র ব্যাখ্যাত থাকে। অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্য যীশুখৃষ্ট, খৃষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্তু এরূপ ধর্ম্মপরিবর্দ্ধক আদর্শ যেমন হিন্দু শাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্ম্মপুস্তকে নাই—কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর, শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ, আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ। খৃষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্ম্মম ধর্ম্মবেত্তা। কিন্তু ইঁহারা তা নয়। ইঁহারা সর্ব্বগুণবিশিষ্ট—ইঁহাদিগেতেই সর্ব্ববৃত্তি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। ইঁহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কার্ম্মুক হস্তেও ধর্ম্মবেত্তা; রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শক্তিমান হইয়াও সর্ব্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর, হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়—যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জ্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহার অংশমাত্র; যাঁহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন মনুষ্য ভাষায় কীর্ত্তিত হয় নাই। আইস আজ তোমাকে কৃষ্ণোপাসনায় দীক্ষিত করি।

শিষ্য। সেকি? কৃষ্ণ!

গুরু। তোমরা কেবল জয়দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার কৃষ্ণ চেন—তাই শিহরিতেছ। তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝ না। তাহার পিছনে, ঈশ্বরের সর্ব্বগুণসম্পন্ন যে কৃষ্ণচরিত্র কীর্ত্তিত আছে তাহার কিছুই জান না। * তাঁহার শারী-

* কৃষ্ণচরিত্রে যে সকল দোষ আরোপিত হইয়াছে, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি। সে বিষয়ে লোকের কিছু কিছু ভ্রম আছে। এমন কি স্বয়ং ভাগবত কর্ত্তাও ভ্রমশূন্য নহেন। সময়ান্তরে সকল কথার আলোচনা করা যাইবে।

রিক বৃত্তি সকল সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া অননুভবনীয় সৌন্দর্য্যে এবং অপরিমেয় বলে পরিণত; তাঁহার মানসিক বৃত্তি সকল সেইরূপ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য্যে এবং জ্ঞানে পরিণত, এবং আন্তরিক বৃত্তি সকলের তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্ব্বলোকের সর্ব্বহিতে রত। তাই তিনি বলিয়াছেন

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

যিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন,জ্ঞানবলে অপূর্ব্ব নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন*, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্কাম হইয়া এই সকল মনুষ্যের দুষ্কর কাজ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে সর্ব্বজয়ী এবং পরের সাম্রাজ্য স্থাপনের কর্ত্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া ক্ষমাগুণ প্রচার করিয়া, তার পর কেবল দণ্ডপ্রণেতৃত্ব প্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদ প্রবল সময়ে, বলিয়াছিলেন, "বেদে ধর্ম্ম নহে—ধর্ম্ম লোকহিতে" —তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র; যিনি সর্ব্ববলাধার, সর্ব্বগুণাধার, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, সর্ব্বত্র-প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।

নমোনমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ,
পুনশ্চ ভূয়োপি নমোনমস্তে।

তুমিও বল, নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শিষ্য। নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

গুরু। তোমার আজ **নবজীবন** হইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

* কৃষ্ণ ভগবদ্গীতার প্রণেতা নহেন, কিন্তু নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রণেতা বটেন। তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

সিংহল যাত্রা।

১২৯০ সালের ২৯ শে মাঘ—সিংহলের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলে বহু-যোজন-বিস্তৃত নারিকেল-বন। এক প্রকার ক্ষুদ্রাকার পাণ্ডুবর্ণ নারিকেল আছে, তাহাকে রাজ-নারিকেল (King-cocoanut) বলে। তাহার জল মিশ্রির পানার ন্যায় সুমিষ্ট। নারিকেল পাড়ার সময় এক গাছ হইতে অপর গাছে রশ্মি বাঁধিয়া দেয়; তাহা অবলম্বন করিয়া সমস্ত বাগান বিচরণ করা যায়; মাটিতে পা দিতে হয় না। নারিকেল তৈল ও নারিকেলের দড়ি ও কাছি প্রস্তুত করার জন্য এখানে অনেক কল আছে। এ দেশে তৃষিত হইয়া অনেকে জলপান না করিয়া নারিকেলোদক পান করে। দরিদ্র সিংহলীরা নারিকেল পাতায় ঘর ছাইয়া থাকে। উলু খড় নাই, এবং বিচালী অতি দুষ্প্রাপ্য। প্রায় সকলেই নারিকেল তৈলে পাক করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নারিকেলই আদিম সিংহলীদের অর্থাগমের প্রধান উপায়; এই বাক্যে কিছু মাত্র অত্যুক্তি নাই।

কাফির চাস প্রায় অভ্যাগত ইংরাজেরাই করিয়া থাকেন। ইংরেজ ও ওলন্দাজ বংশোদ্ভব ঔপনিবেশিকগণ বর্গার (Burghers) নামে খ্যাত; তাঁহাদের বহুপুরুষানুক্রমিক জন্মভূমি সিংহলদ্বীপ; তাঁহারা অনেকেই ওকালতি, চাকুরি, নারিকেল আবাদ ও সামান্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। তাঁহাদের এবং আদিম সিংহলীদের কাফির চাস অল্প; কারণ অধিক মূলধন না থাকিলে কাফির চাসে বড় সুবিধা নাই। আরব হাজিগণ আপনাদের দেশ হইতে কাফির বীজ আনিয়া কাফির চাসের সূত্রপাত করেন;* কিন্তু প্রথমত অনেকে কাফির ব্যবহার জানিত না; কেবল ঐ গাছের পত্র পুষ্প দ্বারা বুদ্ধ-মন্দির সুশোভিত করিত। ইংরেজেরা ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে কাফির আবাদ আরম্ভ করেন; ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আবাদের তাদৃশ বিস্তার হয়

---

* সিরেন্দিব (সিংহলদ্বীপ) মুসলমানদের একটি প্রধান তীর্থ। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, মানবজাতির আদিপুরুষ আদম বেহেস্ত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া সিংহলের প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আদমগিরির অধিত্যকায় বসতি করিতেন। আমরা যাহাকে রামের সেতু বলি, মুসলমান ও ইয়ুরোপীয়গণ তাহাকে আদমের সেতু বলেন। আরবদের মধ্যে এই শ্রুতি আছে যে ঐ সেতুদ্বারা আদম সমুদ্র পার হইয়াছিলেন।

নাই। এই আবাদের প্রধান ফলভোগী ইংলণ্ডের মূলধনীগণ। তাঁহাদের পদধূলি সিংহলের কোথাও পড়ে নাই; কিন্তু তাঁহারা ৫৫ বৎসরে নয় কোটী টাকা নগদ, খরচ খরচা বাদ, লাভ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ৩ কোটী টাকার বাগান বিষয় করিয়াছেন। ইউরোপীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরা ও তামিল কুলিরা কতক টাকা বেতন ও ভৃতি স্বরূপ পাইয়াছে বটে এবং সিংহলের গবর্ণমেণ্ট রপ্তানি শুল্ক বলিয়া কিঞ্চিৎ রাজস্বও পাইয়াছেন; কিন্তু অবশিষ্ট অর্থের শ্রাদ্ধ ইংলণ্ডেই হইয়া থাকে। মিষ্টর জন্ ফর্গুসন্ লিখিয়াছেন "যদি এই টাকা সিংহলে থাকিত, সিংহলের কত শ্রীবৃদ্ধি হইত! কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পের কত বিস্তার হইত! কিন্তু তাহা না হইয়া কেবল তেলা মাথায় তেল পড়িল, ঐশ্বর্য্যশালী ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইল।" * কি সিংহলে, কি ভারতবর্ষে, সর্ব্বত্র একপ্রকার রোদন। দেশের টাকা দেশে না থাকিয়া পরদেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিল।

কাফির আবাদে যত কুলি নিযুক্ত আছে, তাহারা সকলেই ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রদেশ বাসী। সিংহলীরা কাফির আবাদে সূত্রধর ও স্থপতির কার্য্য করে, এবং গো শকট চালায়; কিন্তু কদাচ কুলির কার্য্য করে না। হতভাগ্য ভারতবর্ষ! সিংহল, মরিস্‌স্, ট্রিনিডড্, জ্যামেকা, গাইএনা, যেখানে কুলির প্রয়োজন, সেখানেই তোমার দরিদ্র সন্তানগণ দৌড়ায়। যে কার্য্য কাফ্রিরাও করিতে চাহে না, সে কার্য্য ভারতবর্ষীয়েরা করিতে প্রস্তুত।

৯লা ফাল্গুন—সিংহলের মুক্তা ভুবন বিখ্যাত। অন্যান্য রত্নের মধ্যে পদ্মরাগ মণি, বৈদূর্য্য, ইন্দ্রনীল, গোমেদ ও প্রবাল প্রসিদ্ধ; মরকত বড় ভাল

---

* Ceylon in fact is a sort of incubator to which capitalists send their eggs to be hatched, and whence they receive from time to time an abundant brood leaving us but the shells for our local portion. Money has been sent here to fell our forests and plant them with coffee and it has been returned in the shape of copious harvests to the home capitalist, leaving us in many cases the bare hill-sides from whence the harvests were drawn. Had the profits from our abundant coffee-crops in the past been located here and invested in the country and its soil, what a fund of local wealth would not exist, what manufactures might now have been flourishing! ... ... Most likely the lands now waste would have been flourishing farms. Where is now the fruit of these wasted lands? Are they not, we may ask, absorbed in the splendid mansions and still more magnificent institutions of the mother country swelling the plethora of its wealth and luxury?

Ceylon in 1883 *by John Ferguson.* PP. 77—79.

পাওয়া যায় না। আগে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে সিংহলের উত্তর পশ্চিমে আরিপো নামক জনপদের নিকট সমুদ্রে মুক্তাফলদ কস্তুরী তোলা হইত। গবর্ণমেণ্টের ১২।১৪ লক্ষ টাকা লাভ থাকিত। অনেক ছোট কস্তুরী নষ্ট হওয়ায় ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে কয়েক বৎসর কস্তুরী ধরা বন্ধ ছিল। এক্ষণে ৪ বৎসর অন্তর মুক্তান্বেষণ হইয়া থাকে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে মুক্তান্বেষণ হইবার কথা আছে; কেহ বলেন এই বৎসরেই হইবে। সাত বৎসরের কস্তুরীতে ভাল মুক্তা পাওয়া যায়; অষ্টম বৎসরে কস্তুরী প্রায় মরিয়া যায়, মুক্তাও নষ্ট হয়।

সমুদ্রে যে পুঁটী, ট্যাঙ্গরা, ও মৌরলা মাছ পাওয়া যায়, আমি আগে তাহা জানিতাম না। কলম্বোর তরঙ্গরোধ মধ্যে এই তিন জাতীয় মৎস্য পাওয়া যায়; তন্মধ্যে মৌরলাগুলি পুষ্করিণীর মৌরলা অপেক্ষা অনেক বড়, আর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এক একটা কর্কট কচ্ছপের সমান। আমি সিংহলে যত প্রকার সাগর-জাত মৎস্য খাইয়াছি, তন্মধ্যে আরেকোলা মৎস্যই সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু। ইলিসগুলি গঙ্গার গোদা ইলিসের ন্যায়; তবে ঋতু ভেদে স্বাদের ভেদ হইতে পারে। সিংহলের পার্শ্বস্থ সমুদ্রে বৃহৎ বৃহৎ হিংস্র জলচর আছে। কলম্বোর চিত্রশালিকায় একটি ১৪ হাত দীর্ঘ তরবারি মীন আছে, এবং মরাতুয়া নামক জনপদের নিকট ধৃত একটি ২৩ ফুট হাঙ্গর আছে। ইহার উদর একটা বৃহৎ মহিষের উদর অপেক্ষা স্থূল। সিংহলীরা তরবারি মৎস্যও (Sword-fish) খায়। সিংহলের বনে যত প্রকার কাষ্ঠ আছে, তন্মধ্যে আবলুষ ও সাটীন কাষ্ঠই প্রসিদ্ধ। সিংহলে আবলুষ কাঠের উপর কচ্ছপের খোলার কাজ করা অতি সুন্দর বাক্স নির্ম্মিত হয়।

২রা ফাল্গুন—অধিবাসী সিংহলীদের বর্ণ বাঙ্গালীদের বর্ণের ন্যায়; তাহারা যে বাঙ্গালী অপেক্ষা বলবান তাহাও বোধ হয় না। কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলেই দীর্ঘকেশী। পুরুষে চিরুণী মাথায় দেয়; স্ত্রী পুরুষের পরিচ্ছদ প্রায়ই এক প্রকার। পুরুষে কাছা দেয় না; গোঁপ দাড়ী না থাকিলে স্ত্রী হইতে পুরুষ চেনা কঠিন। স্ত্রীলোকে পীরাণ গায়ে দেয়, মাথায় কাপড় দেয় না; কিন্তু চিরুণী না পরিয়া মাথায় কাঁটা পরে। সিংহলীরা বৌদ্ধ। তাহারা যে ভারতবর্ষের আর্য্যাবর্ত্ত হইতে আসিয়া সিংহলে বসতি করিতেছে, তাহা তাহাদের ভাষাতে প্রকাশ।

সিংহলী শব্দ			বাঙ্গালা অর্থ ;—
মম	...	...	আমি
উম্ব, তমুসে, তমুন্নান্‌সে		...	তুই, তুমি, আপনি,
ও, উন্নেহে	...	...	ও; উনি, তিনি,
অশ্বয়	...	...	অশ্ব,
আত	...	...	হাত,
গেদার, গে,	...	...	গৃহ, গেহ,
গম	...	...	গ্রাম,
নুবর	...	...	নগর,
পিয়া	...	...	পিতা,
অম্মা, মা	...	...	অম্বা, মা,
হিমুল গাহা	...	...	শীমুল গাছ
তাম্বুলি গাহা	...	...	তাম্বুল গাছ,
মহত্ময়া	...	...	মহাত্মা, মহাশয়,
পোতা	...	...	পুতি, পুস্তক,
পয়	...	...	পা,
হাল	...	...	চাউল,
বেলালী	...	...	বিড়ালী,
নম	...	...	নাম,
দোর	...	...	দোর, দ্বার,
বাত	...	...	ভাত,
কিরি	...	...	ক্ষীর, দুগ্ধ,
অদ	...	...	অদ্য,
কম	...	...	কাম, কর্ম্ম,
স্ত্রী	...	...	স্ত্রী।

বস্তুত যাহারা আদিম সিংহলী বলিয়া খ্যাত তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তাহাদের মধ্যে কতক সিংহল-জেতা বিজয়বাহুর সহচর বর্গের বংশোদ্ভব; কতক মগধ, কোশল, কুশী-নগর, জেতবন, রাজগৃহ, বারাণসী প্রভৃতি স্থানের নির্বাসিত বৌদ্ধদিগের সন্তান।

সিংহলবাসী তামিলরা শৈব। তাহারা আদিম সিংহলীদের অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ ও বলবান্। প্রায় ২১০০ বৎসর হইল ইব্বল নামে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের এক রাজা সিংহলের উত্তর অংশ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত অনেক তামিল গিয়া উত্তর সিংহলে বসতি করিয়াছিল। এক্ষণে উত্তর সিংহলের অধিকাংশে তামিলদের বাস। প্রায় ১০০০বৎসর কাল ভারতবাসী তামিলেরা উত্তর সিংহলে বারম্বার উপদ্রব করিয়াছিল। উত্তর সিংহলের তামিল নাম য়ল্পনম্পট্টনম্, ইংরেজী নাম জাফ্না। উত্তর সিংহলে ধান ও তামাকুর চাস ও শিবের মন্দির দেখিয়া তাহা ভারতবর্ষের অংশ বলিয়াই বোধ হয়। কলম্বো নগরে সী-ষ্ট্রীট নামক রাস্তা আছে, তাহার ধারে অনেক তামিল শেঠীর বসতি। সেখানে দুইটি শিবের মন্দির আছে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, শেঠীরা প্রাতঃকালে শিব মন্দির হইতে বিভূতি মাখিয়া আসিয়া মুখে হর হর বলিতেছেন, এবং গ্রাম্য কুক্কুটের দর করিতেছেন। * সী-ষ্ট্রীটে শশীবাবুর চাউলের কুঠি। সেখানে অনেক শেঠী আসিয়া থাকেন। শশী বাবু ও রঘুপতি বাবু মৎস্য খান, অথচ মুর্গী খান না, ইহা শুনিয়া অনেক শেঠী বিস্ময়াপন্ন হন। তাঁহারা বলেন "আমাদের ব্রাহ্মণেরা মৎস্য কি কোন প্রকার মাংস খান না; তাঁহারা যে মুর্গী খান না, আমরা বুঝিতে পারি; কিন্তু আপনারা মৎস্য খান, মুর্গী খান না কেন?" আমি মান্দ্রাজে এক জন ব্রাহ্মণের বাটীতে খাইয়াছিলাম। তিনি খিচুড়ী পাক করিয়া পিণ্ড পাকাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। বিক্রয় করার সময় যদি কোন শূদ্র তাঁহাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে যে তিনি রাগ করেন এমন বোধ হয় না; কিন্তু মৎস্য মাংসের নাম করিলে তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন। যাহা হউক মান্দ্রাজ প্রদেশে এবং সিংহলে ব্রাহ্মণের বিলক্ষণ সম্মান। ব্রাহ্মণেরা কটকি পেড়ে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া খড়ম পায় দিয়া উড়িয়া ব্রাহ্মণদের ন্যায় মস্তক মুণ্ডন করিয়া সী-ষ্ট্রীট দিয়া চলিতেছেন, সকলেই তাঁহাদিগকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিতেছে; কেহ কেহ 'স্বামীজি, স্বামীজি' বলিয়া গলবস্ত্র হইয়া তাঁহাদের অনুগমন করিতেছে। এবার শিবরাত্রি কবে হইবে তাহা

* রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের এক নবতিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে ভরদ্বাজঋষি ভরতের সৈনিকদিগকে ছাগ, মৃগ, বরাহ, ও কুক্কুট মাংস দিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। বন্য কুক্কুটের মাংস নিষিদ্ধ নহে। গ্রাম্য কুক্কুট, ছত্রক, গৃঞ্জন, ও পলাণ্ডু ভোজনে একই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত।

জানিবার জন্য কয়জন ব্রাহ্মণ রঘুপতি বাবুর নিকট আসিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার পঞ্জিকার উপর নির্ভর না করিয়া তাঁহারা নাগপট্টনম্ (Negapatam) ও মদুরায় টেলিগ্রাফ করিলেন। তাহাতে স্থির হইল যে বাঙ্গালা পঞ্জিকাকারেরা যে দিন ধার্য্য করিয়াছেন, তাহারি পর দিনে শিবরাত্রি হইবে।

যে সকল তামিল সিংহলে হাজার বৎসরের অধিক কাল বসতি করিয়াছেন, তাঁহারাও সিংহলী বলিয়া পরিচয় দেন না। তাঁহারা শৈব বলিয়া মনে করেন যে ভারতবর্ষই তাঁহাদের প্রকৃত দেশ। বাঙ্গালীর [illegible] এ কথা বড় বিস্ময়জনক হইবে না; কারণ বাঙ্গালার মুসলমানদের অধিকাংশই বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন। মৈথিলী ও কনোজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও রজপুত, যাঁহারা দশ পুরুষ বাঙ্গালায় বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বাঙ্গালী বলিলে তাঁহারা খড়্গ হস্ত হন। ভারতবাসীদের প্রকৃত স্বদেশানুরাগ জন্মিবার অনেক বিঘ্ন আছে। সিংহলে তদ্রূপ বিঘ্ন কতকটা আছে। আদিম সিংহলীদের ভাষার কতক শব্দ বুঝিতে পারা যায়। তামিলদের ভাষার এক বর্ণও বুঝা যায় না। আমি কলম্বোর বাজারে পাকা আম কিনিতে গিয়া দুইটি তামিল কথা শিখিয়াছি। 'মাং কাই,'—কাঁচা আম; 'মাং পাড়ম্.'—পাকা আম। ইংরেজী 'Mango' শব্দ, তামিল 'ম্যাঙ্গ' শব্দের বিকৃতি মাত্র।

৩রা ফাল্গুন—বিধাতা যে কি অপূর্ব্ব রত্নে সিংহল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? সিংহলে দুর্ভিক্ষ নাই। দারুণ দারিদ্র্যও নাই। যে তামিলরা এদেশে কুলীর কার্য্য করে, তাহারা ভারতবর্ষ হইতে অভ্যাগত তামিল। অধিবাসী তামিলরা আদিম সিংহলীদের ন্যায় সম্পন্ন। সর এডোয়ার্ড ক্রিসী লিখিয়াছেন, "লণ্ডন নগরে শীতঋতুতে আমি এক দিনে যত মানবের দুঃখ দেখিয়াছি, সিংহলে নয় বৎসরে তেমন দেখি নাই" *। তবে শীতপ্রধান দেশের দারিদ্র্য ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের দারিদ্রে পার্থক্য এই যে, শেষোক্ত দেশে যৎসামান্য বস্ত্রে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয়, মৃদঙ্গারের প্রয়োজন নাই; দরিদ্রের কুটীর না থাকিলে সে বৃক্ষতলে বর্ষা ব্যতীত সকল ঋতুতে থাকিতে পারে। আমি কলম্বো নগরে যত ভিক্ষুক দেখিয়াছি, তাহাদের অধিকাংশই ভারতের দাক্ষিণাত্য বাসী তামিল। যে ৫।৭ জন অধিবাসী ভিক্ষুক আছে, তাহারা মদ্যপায়ী হইয়া দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে।

---

* "I have seen more human misery in a single winter's day in London, than I have seen during my nine year's stay in Ceylon."

Sir Edward Creasy, History of England.

সিংহল বঙ্গাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী; কিন্তু বঙ্গের রাজধানী কলিকাতায় যেমন বাণিজ্য, সিংহলের রাজধানী কলম্বো নগরে তেমন বাণিজ্য নাই; তবে কলিকাতা, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন, সিংহপুর, চীন, যাবা, যাপান, অষ্ট্রেলিয়া, ও নিউজিলণ্ড গমনার্থী সমস্ত পোত কলম্বো নগরে লাগায়; ইহাতে কলম্বোকে মান্দ্রাজ অপেক্ষা বড় বন্দর বলিয়া বোধ হয়। কলম্বোর কোন অংশ, আমাদের সৌধমালামণ্ডিত চৌরঙ্গীর ন্যায় নহে; গবর্ণর সাহেবের বাটী আমাদের সেক্রেটেরী সাহেবের বাটী অপেক্ষা ভাল নহে। বলিতে কি কলম্বো নগরে চিত্রশালিকা বাটী ব্যতীত প্রকৃত প্রস্তাবে সুন্দর হর্ম্ম্য নাই বলিলেই হয়। কিন্তু কলম্বোর দক্ষিণ পূর্ব্ব মহল্লার বৃক্ষবাটিকাগুলি * অতি সুন্দর; বহুবিধ বৃক্ষলতায় ভূষিত; যেন এক একটি ক্ষুদ্রায়তন বেল ঘরিয়ার উদ্যান-বাটী। ক্রমশ।

বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

পূর্ব্বসংখ্যার ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা প্রবন্ধে বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন, "অন্যের কথা দূরে থাকুক, শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, কি চৈতন্য—তাঁহারাও ধর্ম্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন এমত স্বীকার করিতে পারি না।" স্বয়ং বৌদ্ধদেব বা চৈতন্য প্রভু ধর্ম্মের ধারণা করিতে যখন অসমর্থ, তখন আমরা ধর্ম্মের ভাব কতদূর বুঝিয়াছি, তাহা অবশ্য সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। আমরাও স্থচনায় সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি। "ধর্ম্মের বিশোদর ভাব যে আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, সে ভ্রম বা স্পর্দ্ধা আমাদের নাই। নিয়মিত রূপে সাময়িক পত্রে এই বিষয়ের চর্চ্চা করিয়া আমরা আপনারাও বুঝিব এবং সাধারণকে বুঝাইব, এ আশা আমাদের হৃদয়ে আছে।" বুঝিবার বুঝাইবার আশা আছে বলিয়াই, আজি বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম্মের আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রথমেই বলিয়া দেওয়া ভাল, পাঠক যেন একটা দিগ্‌গজ গবেষণার, উদ্ভট উদ্ভাবনার প্রত্যাশা করিয়া আপনা আপনি প্রতারিত না হন।

---

* কোষকারেরা বলেন "গণিকা" "অমাত্য" প্রভৃতি বৃক্ষবাটিকার অঙ্গ। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিনিয়সের জীবনবৃত্তে 'বৃক্ষবাটিকা' শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিলাম।

বাঙ্গালির বৈষ্ণবধর্ম্ম বড়ই বিড়ম্বনার বিষয়। বিশেষ এই চসমা-চক্ষু,চপল চিত্ত, চটুলবৃত্ত যুবক দলের রাজত্ব কালে। এই কোপ্তা, কোর্ম্মা, করি, কটলেট প্রভৃতি ককারাদি ব্যঞ্জনের দিনে, যে ধর্ম্মে মাংসাহার নিষেধ করে, বিলাতী ব্যাণ্ডের বেণু বীণা বাদনের বদলে, যে ধর্ম্মের উপাসকেরা খোল করতালে বিষম খচমচ করিয়া তুলে, কণ্ঠে ত্রিভাঁজ কলরের স্থানে যে ধর্ম্মযাজকেরা তুলসীর ত্রিকণ্ঠী ধারণ করে,—সে ধর্ম্ম যে এখনকার দিনে বিষম বিড়ম্বনা, তাহাও কি আর বুঝাইতে হইবে? যাত্রাতে যাহার আশ্রয়, ভিক্ষাতে যাহার প্রশ্রয়,—মধুর রসেই যাহার রঙ্গ, প্রেম যাহার প্রধান অঙ্গ, "কুরুচি" যাহার চিরসঙ্গ—গুপ্তপ্রণয়িণী গোপিনী যে ধর্ম্মের আলম্বন এবং শঠ লম্পট কপট শ্রীকৃষ্ণ যাহার অবলম্বন,—সে ধর্ম্ম যে বঙ্গের বিড়ম্বনা, তাহাও কি আবার বলিতে হয়? না,—সাহেবে যাহা সাহেবিআনায় বুঝাইয়াছেন, তাহা আর বাঙ্গালিকে বুঝাইতে নাই; তবে এই অধম জাতির ঐ অপকৃষ্ণ ধর্ম্ম, যদি এই অধমদিগের বুদ্ধিবলেই কিছু বুঝা যায়, তাহার চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি?

ধর্ম্মের নানা ভাব, ধর্ম্মের নানা মূর্ত্তি। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, সমগ্র ধর্ম্মের বিশাল বিশ্বোদর ভাব শ্রেষ্ঠ মানবেও ধারণা করিতে পারেন না। এই জন্য ধর্ম্ম বিষয়ে, নানা দেশে নানা মত আছে; এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত হইয়াছে। কেহ বলেন, ধর্ম্মের প্রাণ—ভয়; ঈশ্বর ভয়, পরকাল ভয়, বা কর্ম্মফল ভয়, যাহার হৃদয়ে জীবন্ত নহে, তাহার ধর্ম্মজ্ঞান নাই। কেহ বলেন, ধর্ম্মের প্রাণ—ভক্তি। ভগবান ভক্তের; ভক্তিতেই ভগবান মিলেন। কেহ বলেন, ধর্ম্মের প্রাণ—কর্ম্ম। যে যেমন কর্ম্ম করে, সে তেমনই ফল পায়—কঠোর কর্ত্তব্য সাধনই ধর্ম্ম যাজন। কেহ কেহ এই মতের বিপরীত বাদী। তাঁহারা বলেন, কর্ম্মে বিরতিই—প্রকৃত ধর্ম্ম চর্চ্চা। তবেই ধর্ম্মের প্রধান সাধন কিরূপ, এবং ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্যই বা কি,—ইত্যাদি বিষয়ে নানা মত প্রচলিত আছে।

ধর্ম্মের উপজীব্য—ভগবানের সেই জন্য নানা মূর্ত্তি হইয়াছে। উপনিষৎ একবার বলিতেছে—তিনি 'শান্তং শিবমদ্বৈতং' আর একবার বলিতেছে, 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং।' তন্ত্র এক মুখে একই নিশ্বাসে একেবারে বলিতেছে, 'করালবদনাং' অথচ 'স্মিতাননাং।' কোথাও শুনিবে,—তাঁহার দ্বিভুজ-মুরলীধর সুবঙ্কিম নটবর বেশ,—কোথাও শুনিবে তিনি শর-কার্ম্মুক-ধারী বীরশ্রেষ্ঠ বীরাসনে উপবিষ্ট। বাইবলে বলে, তিনি কঠোর ন্যায়পর, অথচ

দয়ার অগাধ সাগর। যীশুখ্রীষ্ট বলেন, তিনি পরম পিতা পরমেশ্বর; ভক্ত বলেন, তিনি করুণাময়ী জগদম্ব। যাঁহারা বালক গোপালের সেবক, তাঁহারা ভগবানকে অপত্যভাবে ধুয়াইয়া পুঁছাইয়া দুগ্ধদানে সেবা করিতেছে, আবার বামাচারী শক্তিভক্ত, নরকপালে মহামাংস মদ্য দিয়া ভগবতীর মহাভোগের আয়োজন করিতেছে। সম্প্রদায় বিশেষের পূজার পদ্ধতির কথা শুনিলে সন্ত্রাসে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়, হৃৎপদ্ম কাঁপিতে থাকে, মন স্তব্ধ হয়;—আবার আর এক সম্প্রদায়ের পূজা পীঠের নিকটে গেলে, সুছন্দ আয়োজন দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত হয়, পবিত্র বাদিত্রে শ্রবণ জুড়ায়, এবং সুগন্ধে অন্ধীভূত হইতে হয়।

সনাতন ধর্ম্মের সার কথা এই যে, প্রকরণ পদ্ধতি—ধ্যান, ধারণা—আলম্বন, বিভাবন—পৃথক হইলেও সকল শ্রেণীর ঐশ্বরিক সাধনাই ধর্ম্ম। দেশ, কাল, পাত্র—জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা—প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, রুচিভেদে—ধর্ম্মের তারতম্য হয় মাত্র। কোন ধর্ম্মের হিংসা করিতে নাই, কোন ধর্ম্মযাজককে ঘৃণা করিতে নাই। যে, যে পথে পার ধর্ম্মের উজ্জ্বল, বিমল, বিমানব্যাপী পতাকা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও। এইসকল সনাতন ধর্ম্মের সার কথা।

নগণ্য বাঙ্গালির সামান্য বৈষ্ণব ধর্ম্মে, যাঁহারা ঘৃণা করিতে এখনও অভ্যস্ত হন নাই, বৈষ্ণব ধর্ম্মকে জঘন্য ভিক্ষুকবৃত্তি (nasty Beggarism) বা পাশব বিলাসের প্রস্থান (system of carnality) বলিয়া নাসিকার আকুঞ্চন প্রসারণ করিতে যাঁহারা এখনও শিক্ষিত হন নাই, তাঁহাদেরই সঙ্গে একত্র হইয়া আমরা বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভাব ভঙ্গি বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বৈষ্ণবের প্রধান সাধন প্রেম-ভক্তি। বৈষ্ণবের মতে ভগবানে প্রেমভক্তিই সদ্গতির প্রধান উপায়। কেহ বলেন, ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত মহিমার বিষয় নিরন্তর স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া, সাধকে ক্রমেই আপনার ক্ষুদ্রত্ব, অণুত্ব উপলব্ধি করিবেন; এই উপলব্ধি হইলেই তাঁহার প্রকৃত বিনয় হইবে, আপনার অকিঞ্চন ভাব বুঝিতে পারিবেন। সেই বিনয়ই ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব। কেহ বলেন, ঈশ্বরের দণ্ডপ্রণেতৃত্ব ভাব হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে ধারণা করিতে পারিলেই, প্রকৃত ধর্ম্মভাবের উপলব্ধি হয়; ঈশ্বরের ভীতিই ধর্ম্মের মূল। অপরেরা বলেন, যে ভয় ত বালকের পক্ষেই কর্ম্মের নিবর্ত্তক বা প্রবর্ত্তক; পরম জ্ঞানী সাধক—তিনি ভীতি-তাড়িত থাকিবেন কেন? ঈশ্বরে শ্রদ্ধাই ধর্ম্মের মূল। ঈশ্বরকে পিতার মত শ্রদ্ধা করিতে হইবে। আর এক পক্ষ বলেন, যে পিতাকে যে শ্রদ্ধা করা যায়, তাহারও অন্তরে অন্তরে ভয় আছে; ঈশ্বরে

ভয়ের লেশ মাত্র থাকা উচিত নহে। ঈশ্বরকে মাতৃ জ্ঞানে ভক্তি করিতে হইবে। "কু পুত্র যদ্যপি হয়, কু মাতা কখনও নয়।" আমরা অকৃতি, অকৃতজ্ঞ সন্তান, তিনি করুণাময়ী। তাঁহার স্নেহময় উৎসঙ্গে লইয়া তিনি সকলকেই তাঁহার অজস্র ক্ষীর ধারায় পালন করিতেছেন। বৈষ্ণব বলেন, যে যেমন বুঝেন, তাঁহার সেই ভাবেই সাধনা করা উচিত; কিন্তু আমি বুঝি, ঈশ্বর আনন্দময় প্রেমময় নায়ক। তিনি বৈকুণ্ঠবাসী; তাঁহার কাছে সাধকের কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ নাই। বিশ্রব্ধা নায়িকার প্রেমভক্তিই আমার অবলম্বনীয় সাধন। নায়কে নায়িকার যেরূপ প্রেম-ভক্তি, ঈশ্বরে সেইরূপ ঐকান্তিকী প্রেম-ভক্তিই সদ্গতির প্রধান সাধন। এটি বড় বিষম কথা। নায়ক-নায়িকা—এই দুইটি কথা মনে আসিলেই রঙ্গরসের কথা মনে আসে, কিশোর বয়সের লীলা খেলার কথা মনে পড়ে, সেই শিরায় শিরায় তড়িৎ সঞ্চার, সেই আবেশের বিহ্বলতা, সেই বিলাসের মত্ততা, সেই আত্মতৃপ্তির স্বার্থপরতা —সকলই মনে পড়ে। যে প্রেম-ভক্তির এই সকল উপাদান, সেই প্রেম-ভক্তিই কি অনন্তজ্ঞান, অপরিমেয়-শক্তি-সম্পন্ন ঈশ্বরের উপাসনার প্রধান সাধন?—ক্রমে বড় বিষম কথা হইল! বাস্তবিক কিন্তু কথাটা তত কঠিন নয়; অথচ এখনকার দিনে উহা বিষম হইতে বিষম হইয়াছে—তাহার আর ভুল নাই। নহিলে এই সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মে লোকের দিন দিন অশ্রদ্ধা হইবে কেন?

স্বত পরত এখন আমরা দুই প্রকার নায়িকা সচরাচর দেখিয়া থাকি। এক ঘরাও নায়িকা, আর এক কেতাবী নায়িকা। শিক্ষার জোরেই হউক, আর অদৃষ্টের ফেরেই হউক, আমরা আজিকালি ঘরের নায়িকাকে হয় দাসীর দাসী, না হয়, পুতুলের পুতুল বানাইয়াছি। কাজেই অনেক সময় তাঁহারাও হয় আমাদিগকে মনিবের মনিব বলিয়া মনে করেন, না হয় পুতুলের সাজওয়ালা ভাবিয়া চির দিন অলঙ্কারের দাবি দাওয়া করেন। বৈদেশিক কাব্য নাটকে কেবল সাম্যের কঠোর প্রকৃতির ছায়া সর্ব্বত্রই উজ্জ্বল, আশ্রয় আশ্রয়ী ভাবের কোমল মূর্ত্তি প্রায় কোথাও স্ফূর্ত্তি পায় না,—কাজেই প্রেমময়ী নায়িকার যে প্রখরা অথচ কোমলা, উজ্জ্বলা অথচ স্নিগ্ধকারিণী প্রেম ভক্তি, বৈষ্ণব মতে ঈশ্বরোপাসনার প্রধান সাধন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কোনরূপ অস্পষ্ট ছবিও দেখি না, অপকৃষ্ট আদর্শও পাই না—সুতরাং ও সকল কিছু বুঝিতেও পারি না—আমি যাহা বুঝি না—তাহাই ত humbug, তাহাই ত বিড়ম্বনা। অতএব বাঙ্গালির বৈষ্ণবধর্ম্ম—এক বৃহৎ বিড়ম্বনা, a huge humbug.

বৈষ্ণব বলেন—কৈশোরের, রঙ্গরস, বয়সের লীলা খেলা,—শিরায় তড়িৎ সঞ্চার, আবেশের বিহ্বলতা, বিলাসের ভোগ সুখ, আনন্দের উচ্ছ্বাস, উৎসাহের উল্লাস, তৃপ্তির স্বার্থপরতা,—ভাই! এ সকল তোমার পক্ষে হেয়, বা অশ্রদ্ধেয় বলিয়া তুমি মনে করিও না। সাধক যদি সৎসাধনায় ঐ সকল প্রয়োগ করিতে পারেন,—তবে তাহাতেই তাঁহার সদ্গতি।

এই শোভাময়ী প্রকৃতির অঙ্কে লালিত হইয়া, এই সৌন্দর্য্যময় জগতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া—তোমাকে যে কেবল কঠোরতার অভ্যাসে ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইবে—এ কথা ভাই! তোমাকে কে বলিল? যৌবনে জলাঞ্জলি দিয়া ধর্ম্মের জন্য অকালে বৃদ্ধত্ব অবলম্বন করিতে হইবে—এ কথা তুমি কোথায় শুনিয়াছ? চিত্তবৃত্তি সকল যখন স্ফূর্ত্তি লাভ করে, ইন্দ্রিয়াদি যখন পূর্ণ পরিস্ফুট হয়, শরীরে সামর্থ, মনে একাগ্রতা, হৃদয়ে আগ্রহ যখন প্রবল থাকে, সেই যৌবন কাল, যদি কেহ বলিয়া থাকেন,—কেবল অনর্থের সময়—তবে তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনকালের কথা বলিয়াছেন, আর যৌবনের উচ্ছ্বাসে অধর্ম্ম হয়,এ শিক্ষা যদি কেহ তোমায় দিয়া থাকেন,—নিশ্চয়ই তিনি কক্ষভ্রষ্ট কুগ্রহের কথা বলিয়াছেন। প্রতি মনুষ্যের পূর্ণ বিকাশ কখনই অনর্থপাতের হেতুভূত হইতে পারে না—স্বভাবে বিড়ম্বনা আছে বটে, কিন্তু এরূপ বিশ্বব্যাপী বিড়ম্বনা কোথাও নাই; যৌবন সুলভ প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও স্ফূর্ত্তি মানবের বিড়ম্বনা নহে। ঈশ্বর প্রেমে সেইরূপ শিরায় শিরায় তড়িৎ সঞ্চারিত কর, সেই প্রেমময়ের ভাবে সেইরূপ বিভোর হও, অনন্ত আনন্দের বিলাসে সেইরূপ বিহ্বল হও, যৌবনের সেই উচ্ছ্বাস, সেই উল্লাস, তৃপ্তির সেই স্বার্থপরতা, ঈশ্বরে প্রয়োগ করিতে শিক্ষা কর, দেখিবে নায়িকার মত ঐকান্তিকী প্রেম-ভক্তিই ঈশ্বরোপাসনার উৎকৃষ্ট সাধন, সোৎসাহ মাধুর্য্য রসই সাধনার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন এবং বৈষ্ণবের ধর্ম্ম—সাধকের চরিত্র দোষে এখন যতই বিড়ম্বিত হউক না কেন,—প্রেম-ভক্তির ধর্ম্ম উপেক্ষা বা ঘৃণার বিষয় নহে, বুঝিবার ও শিখিবার সামগ্রী; নায়িকার প্রখরা অথচ কোমলা, উজ্জ্বলা অথচ স্নিগ্ধকারিণী প্রেমভক্তির অস্পষ্ট ছবিও আজিকালি আমরা দেখি না বটে, অসম্পূর্ণ আদর্শও পাই না বটে, কিন্তু বৈষ্ণবের পদাবলীতে, বৈষ্ণবের গ্রন্থাবলীতে সেই আদর্শের পৌনঃপুনিক উল্লেখ আছে। সনক, সনাতন, ধ্রুব, প্রহ্লাদ,—নন্দ, যশোদা,—শ্রীদাম, সুবল,—সকলেই সাধকের আদর্শ—কিন্তু প্রেম-ভক্তির পূর্ণ আদর্শ—**শ্রীমতী প্রেমময়ী রাধিকা।**

বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ক্রমেই বিষম হইতে বিষমতর হইতেছে; বৃন্দাবনবিলাসিনী, কুলকলঙ্কিনী, বৃষভানু-নন্দিনী সাধকশ্রেষ্ঠ—বড়ই বিষম কথা হইল!

আবার একটু পিছু হটিয়া যাইতে হইতেছে; বেশ করিয়া বুঝা চাই, যে নায়িকার প্রেম-ভক্তিই সাধনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলি কেন? ভাল ঈশ্বর-ভয় যেন বালকের ভাব হইল; ঈশ্বরে পিতার মত শ্রদ্ধা, যেন একটু ভয়-জড়িত ভাব বলিলাম, সাধকের দাস্যভাবও যেন সেইরূপ ধরিলাম, কিন্তু ঈশ্বরকে মাতার মত ভক্তি করিতে পারিলে ক্ষতি কি? তাহা শিক্ষা না করিয়া, নায়কে নায়িকার প্রেম-ভক্তিই আমাদের অনুকরণীয় হইল কিরূপে? বৈষ্ণব বলেন, মাতৃভক্তিতে যে, ঈশ্বর-সাধনা হয় না, তাহা বলি না, কিন্তু আমরা যেরূপ বুঝিয়া এই পন্থা অবলম্বন করি, তাহা বলিতেছি।

শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম তিনেতেই একটি পাল্‌টি-প্রকৃতি ভাব আছে। অথচ বিনিময়ের ভাব নাই। বিনিময় যাহার লক্ষ্য—তাহার নাম ব্যবসাদারি। শ্রদ্ধা ভক্তিতে স্নেহ মিলে, প্রেমে প্রেম পাওয়া যায়, ইহারই নাম পাল্‌টি-প্রকৃতি-ভাব। পাল্‌টী প্রকৃতিভাব থাকিলেই, সাম্যভাব আসিয়া পড়ে; সাম্যের স্ফূর্ত্তিতে ঐ ভাবের প্রকৃত স্ফূর্ত্তি হয়; এই সাম্যভাব পিতাপুত্রে যত টুকু আছে; মাতাপুত্রে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী আছে; নায়ক-নায়িকা মধ্যে পূর্ণমাত্রায় আছে। পিতার কাছে সঙ্কোচ আছে, মাতার কাছেও কতকটা আছে, নায়ক-নায়িকা মধ্যে সৎকার্য্যের কোন কথারই আর সঙ্কোচ নাই। ইহাই প্রকৃত বৈকুণ্ঠভাব। সুতরাং নায়ক নায়িকার উপজীব্য অসঙ্কোচ প্রেম-ভাবই বৈষ্ণবের অবলম্বনীয়।

এখন বুঝিতে হইবে, যে নায়ক-ভাব ও নায়িকা-ভাবের মধ্যে কোন্ ভাবটি সাধক আপনাতে আনয়ন করিয়া ভগবানের সাধনা করিবেন? বাঙ্গালির নায়ক-নায়িকা-ভাব বুঝিলে ঐ প্রশ্নের একই উত্তর সম্ভব। নায়িকার মত প্রেম-ভক্তিই ঈশ্বরে প্রযুজ্য। আমাদের দেশে নায়ক-নায়িকা মধ্যে ঠিক সাম্যের পাল্‌টি-প্রকৃতি ভাব নাই। অগাধ প্রেমের সহিত সম্পূর্ণ অসঙ্কোচ ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, একটি অপূর্ব্ব আশ্রয়-আশ্রিত-ভাব আছে। যতই উদারতায় স্ত্রীপুরুষের সাম্যভাব প্রচার কর, যতই উচ্চ কণ্ঠে স্ত্রীস্বাধীনতার 'সংবাদ' বিঘোষিত কর, যতই অবারিত-বন্ধ মুক্ত-দ্বারে নারীকে রক্ষা কর, এবং অসঙ্কোচে তাঁহাকে বিচরণ করিতে দাও—তবু বাঙ্গালির কুলরমণী

সেই তমালে তরুলতা, সহকারে মাধবী। এবং পুরুষ—প্রণয়িনীর আশ্রয় ও অবলম্বন। বৈদেশিক নাটক নবেলের সেই তুলাদণ্ডের সাম্যভাব, আমাদের দেশের কোন শ্রেণীর নায়ক নায়িকায় নাই।

প্রেমে ভক্তি,—সাম্যে বৈষম্য, প্রতিগ্রহে বিনিময়,—দাসীত্বে বন্ধুতা—এইরূপ দুই দুই বিপরীত ভাব—কেবল হিন্দু নায়িকাতেই আছে। হিন্দু নায়িকা প্রেমের সখী, অথচ ভক্তির সেবিকা; সাম্যে সহধর্ম্মিণী, বৈষম্যে দাসী; রসে ইয়ার অথচ শিক্ষায় ছাত্রী। প্রেম-ভক্তির এইরূপ রাসায়নিক সংযোগ বৈষ্ণবী সাধনার প্রধান উপকরণ। যে সাধক, সে অবশ্যই ঈশ্বরকে আশ্রয় স্বরূপ, অবলম্বন স্বরূপ ভাবিবে। বৈষ্ণবও তাহাই ভাবেন, তবে তাঁহার অবলম্বনের সমীপে, তাঁহার আশ্রয়ের নিকটে, তাঁহার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নাই। তিনি ঈশ্বরকে প্রেমের চক্ষে দেখেন, মনের মানুষ, অকপটে সচ্ছন্দে মনের কথা তাঁহাকে বলেন; ভক্তির চক্ষুতে দেখেন—তিনি বিশ্ব-বিধাতা বিশ্ব-নিয়ন্তা, সাধক-শরণ এবং অনাথের অবলম্বন। প্রেম-ভক্তির এরূপ রাসায়নিক সংযোগ আর কোন ধর্ম্মে নাই। এই প্রেম-ভক্তি হয়ত কখন উপদেশে, হয়ত কখন কৃতজ্ঞতায় জন্মায়। উভয়ত্রই সেইরূপ প্রেমভক্তি—কর্ত্তব্যতার অনুসঙ্গ বা ফল। হিন্দু নারীকে শাস্ত্রে শিক্ষা দিলেন, সমাজ শত শত দৃষ্টান্ত দেখাইল, পিতা মাতা শৈশব হইতে বলিয়া দিলেন, সখী কাণে কাণে জপমন্ত্র দিল, যে স্বামীকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতে হয়, দেবতার মত ভক্তি করিতে হয়। সাধ্বী তাহাই শুনিল, তাহাই করিল,আজীবন সেই উপদেশ ক্ষণকালের জন্য ভুলিল না; কর্ত্তব্য-পন্থা হইতে কেশমাত্র বিচলিত হইল না; প্রেম-ভক্তি-ভরে চিরদিন স্বামি-সেবা ব্রত পালন করিতে লাগিল। অথবা শাস্ত্র শুনে নাই, সমাজের সুদৃষ্টান্ত দেখে নাই, পিতা মাতা তাহাকে ওরূপ কোন কথা বলেন নাই; কিন্তু জ্ঞান হইলে বুদ্ধিমতী সতী দেখিল, যে স্বামী হইতেই ভরণপোষণ, স্বামী হইতেই মান সম্ভ্রম, স্বামী হইতেই সুখ সম্ভোগ; সুতরাং কৃতজ্ঞতা ভরে স্থির করিল, যে স্বামি-সেবাই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি; স্বামীই নারীর পরম দেবতা।—এই সিদ্ধান্ত মত তিনি চিরদিনই প্রেমভক্তি সহকারে স্বামি-সেবা করিতে লাগিলেন,—তাঁহার কর্ত্তব্য-পন্থা হইতে কেশ মাত্র বিচলিত হইলেন না। অতএব প্রেম-ভক্তি কখন উপদেশে হয়, কখন কৃতজ্ঞতায় জন্মায়। সকল রূপ প্রেমভক্তিই স্বর্গীয় সামগ্রী।

কিন্তু বৈকুণ্ঠের নহে। স্বর্গ পবিত্র-পুরী, বৈকুণ্ঠ আনন্দ-ধাম। যে প্রেম-ভক্তি কর্ত্তব্যতার সহচরী, তাহা বৈষ্ণবের প্রেমভক্তি নহে। যাহা উপদেশে উঠে বা কৃতজ্ঞতায় জন্মায় তাহাও বৈষ্ণবের প্রেমভক্তি নহে। বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তি সৌন্দর্য্য-বোধের সহচরী, উপদেশে উহা উদ্ভূত হয় না, কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞানের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কর্ত্তব্য-জ্ঞানের দায়িত্ব ইহাতে নাই, সৌন্দর্য্যের আকর্ষণী আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উচ্ছ্বাস আছে। অনন্ত সুন্দরের শোভায় তাঁহার প্রতি চিত্তের যে একাগ্র গতি,—তাহাই প্রকৃত প্রেমভক্তি। আর যে রসে হৃদয় উথ্‌লে উঠে, তাহাই প্রকৃত মাধুর্য্য রস। ঐ মাধুর্য্য রসে, ঐ প্রেম-ভক্তি-ভরে বৈষ্ণব জগদীশ্বরকে দেখিল,—

রাসরসিক রসেশ্বর।

অতএব আদর্শ-সাধিকার, প্রেমময়ী রাধিকার, প্রেমভক্তি—গুরূপদেশের ফলও নহে, কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের সহচরীও নহে। তিনি ব্রজ-সুন্দরের সৌন্দর্য্যে, আনন্দময়ের আনন্দে, রসিক-শেখরের রস-লোভে কুলত্যাগিনী। যে কুলকামিনী শাস্ত্রের বিধানানুসারে, বা সমাজের সুদৃষ্টান্ত দেখিয়া, গুরুজনের উপদেশ মত, পতিপরায়ণা, পতিরতা, পতিব্রতা; স্বামীকে ইহকালের ও পরকালের পরম দেবতা বলিয়া জানেন,—তিনি নারী-চরিত্রের আদর্শ, ভারতের গৌরব, পৃথিবীর অলঙ্কার, স্বর্গের বাঞ্ছনীয় সামগ্রী। তিনি সীতা, তিনি সাবিত্রী, তিনি ধরিত্রীর পাবিত্রকারিণী। কিন্তু তাঁহার পতিভক্তি, বৈষ্ণবের অনুকরণীয়া নহে। যে ভাবে যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, যদি পিতা মাতা পরিবার পরিত্যাগ করিতে পার, তবে আমায় পাইবে, সেই ভাবে রাধিকা স্বর্ব্বত্যাগিনী হইয়া তবে শ্রীকৃষ্ণে পাইয়াছিলেন। বৈষ্ণব বলেন, যিনি শাস্ত্রের শাসনে পতিপরায়ণা, তিনি পূজনীয়া হইয়াও বালিকা; যিনি সমাজের দৃষ্টান্তে পতিরতা, তিনি মাননীয়া হইলেও গড্ডলিকা; যিনি উপকারের প্রত্যুপকার-চ্ছলে পতিসেবায় নিযুক্তা, তিনি বেণেনী; যিনি কঠোর কর্ত্তব্য-সাধনে পতিপ্রাণা, তিনি ব্রতধারিণী দেবী; কিন্তু যে প্রেমের বলে, কুল মানিল না, মান দেখিল না, লজ্জা-ভয় পাইল না, শাস্ত্র ভাবিল না, কিছুই গণনা করিল না, সর্ব্বস্ব-ত্যাগিনী হইয়া কলঙ্কিনী হইল, তিনিই যথার্থ প্রেমময়ী। তুমি ধর্ম্মধ্বজী, ইহাতে শিহরিয়া উঠিলে; তুমি হিতবাদী, শনৈঃ শনৈঃ মস্তক সঞ্চালন করিতেছ; তুমি নীতিবিৎ, তোমার মস্তক আজি বজ্রাহত হইল; তুমি সতীত্বের গৌরবাকাঙ্ক্ষী—হতাশ হইতেছ। না,

তোমরা কেহই হতাশ হইও না—প্রকৃত প্রেম-ভক্তির সহিত শাস্ত্রের দ্বন্দ্ব নাই, সমাজের বিরোধ নাই, নীতির বিবাদ নাই, কর্ত্তব্য পালনের শত্রুতা নাই। রাধিকার প্রেম ভক্তি কিছুরই বিরোধিনী নহে।

রাধিকা ক্লীবে বিবাহিতা, সুতরাং শাস্ত্রমতে অনূঢ়া। পরকীয়া হইয়া পরস্ত্রী নহেন; কুলটা হইয়াও স্বৈরিণী বা ব্যভিচারিণী নহেন। এই খানেই বাঙ্গালি বৈষ্ণবগণের আদর্শ-সৃষ্টির আশ্চর্য্য কৌশল! যিনি মহৎ হইতে মহৎ, তিনি ক্ষুদ্রকে বিস্মৃত হন না। বৈকুণ্ঠের প্রেমভক্তি পৃথিবীর রীতি, মানব ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নীতি—বিস্মৃত হন নাই। প্রেমময়ী শাস্ত্রে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, নীতির দিকে নয়ন না হেলাইয়া প্রেমময়ের দিকে একাকিনী অভিসারিণী হইয়াছেন, শাস্ত্র—ধীর পদে দূরে থাকিয়া, তাঁহার দেহ-রক্ষার্থ তদীয় অনুসরণ করিতে-ছেন, নীতি—পরিচারিকা ভাবে চামর লইয়া পশ্চাতে যাইতেছেন। বৈষ্ণব চিত্রিত এই অপূর্ব্ব ছবি বড়ই সুন্দর, সরস এবং সারময়।

প্রেমভক্তির উৎপত্তি ঐরূপ; ঐ ভক্তির বিকাশ এবং স্থিতি আরও বিস্ময়-কর। কঠোর কর্ত্তব্যের সহিত প্রেমভক্তির কোন সম্পর্ক নাই। সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্যেই উহার উৎপত্তি; এবং সেই জন্য শ্রীমতী কুলত্যাগিনী। আর প্রেমভক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভোগী অথবা লম্পট!

শ্রীমতীর মত শ্রীকৃষ্ণের যদি একগতি, একমতি তুমি দেখিতে চাও, তবে তুমি আবার সেই পালটি-প্রকৃতি খুঁজিতেছ, বিনিময় চাহিতেছ, প্রেমের বাণিজ্য করিবে মনে করিতেছ। ঈশ্বর সাধনায় সেরূপ বাণিজ্যের বাসনা, অসম্ভবের আব্দার। এই অসংখ্য সূর্য্য চন্দ্র পরিব্যাপ্ত বিশ্বমণ্ডল, যাঁহার আনন্দের উপাদান, তুমি—ধ্রুব হও, প্রহ্লাদ হও,—সনক হও, সনাতন হও, যীশু হও,—মহম্মদ হও,—শ্রীদাম হও, শ্রীমতী হও,—তিনি যে তোমাতেই তাঁহার প্রেম সীমাবদ্ধ করিবেন, এ তোমার কেমন আব্দার? তবে হৃদয়ে যদি বাস্তবিকই ভক্তি থাকে, এতটুকু আব্দার করিতে পারি বটে, যে তুমি অনন্ত হইয়াও সর্ব্বদৃক্, আমি ক্ষুদ্র হইয়াও যেন তোমার চরণে শরণ পাই।

এই জন্যই শ্রীরাধিকা বলিয়াছেন—

ভুল না, ভুল না, নাথ!
মিনতি করি আমি হে!
অন্যেরও অনেকও আছে,
আমার কেবল তুমি হে!

তোমারও অনেকও আছে,
আমার কেবল তুমি হে!

ঐ সমান্য কয়টি কথায়, প্রেম-ভক্তির কেমন মনোহর উচ্ছ্বাস, হৃদয়ের কেমন সুন্দর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়!

"অন্যেরও অনেকও আছে,"—কত লোক, কত বিষয়ের উপাসনা করিতেছে, কত বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া মনের তৃপ্তি সাধন করিতেছে। কেহ ধন-জন-মান লইয়া ব্যস্ত, কেহ রূপ-গুণ-কুল লইয়া মত্ত, কেহ রাজ সভার ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট, কেহ বা সমর-সজ্জায় মোহিত। সাধকের কিন্তু—তিনি এই মায়া-মোহময়, লীলা-খেলা-পূর্ণ, অথচ বিপজ্জাল-জড়িত সংসারেই থাকুন, আর ঘন-বিরল-বিটপি-বিন্যস্ত, স্বভাবের শস্পশোভা-শোভিত হিমালয়ের নিরালয় সানুদেশেই থাকুন,—সাধকের জগদীশ্বরই একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র গতি, জগদীশ্বরই তাঁহার অবলম্বন, এবং জীবনের জীবন। "অন্যেরও অনেকও আছে, আমার কেবল তুমি হে!" আমায় ভুলিও না। আমি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র, অণু হইতে অণু, এই অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র-পরিব্যাপ্ত সহস্র কোটি সৌর মণ্ডলের মধ্যে নিতান্ত অকিঞ্চন, তুমি সর্ব্বময় সর্ব্বাধার, "তোমারও অনেক আছে" ভুল তোমাতে সম্ভব হইলে, তুমি ভুলিলে ভুলিতে পার, কিন্তু নাথ! তাহা হইলে আমার গতি কি হইবে? আমার যে কেবল তুমি হে! অতএব মিনতি করি, নাথ। তুমি আমায় ভুলিও না। ভক্তির কি মনোরম উচ্ছাস, হৃদয়ের কি সুন্দর বিকাশ। তোমার অনেক আছে, থাকিবারই কথা। তুমি রাজ-রাজেশ্বর, অসংখ্য প্রাণী তোমার প্রজা, তুমি রসিক-শেখর ষোড়শ সহস্র গোপিনী তোমার সেবিকা, কিন্তু আমার এই আব্দার, তুমি তা বলিয়া আমাকে যেন ভুলিও না, ভুলিলে আমার গতি কি হইবে? "আমার যে কেবল তুমি হে!" অতএব মিনতি করি, তুমি আমায় ভুলিও না। প্রেম-ভক্তিময়ী সাধিকা, ভক্ত প্রধানা রাধিকার সরল প্রাণের ঐ একমাত্র কামনা। বৈষ্ণব শক্তি-সেবকের মত ধনং দেহি, মানং দেহি, বলেন না, বলিতে জানেন না; বৈষ্ণব কৃপাময়ের কৃপাকণা কখন যাচ্ঞা করেন না,—কোন দেশে এমন মূর্খ নায়িকা নাই যে 'নাথ। আমাকে কৃপা কর' বলিয়াছেন। প্রবাস-গমন-প্রয়াসী নায়কের নিকটে বাষ্প-ভর-স্পন্দিত নয়নে নায়িকা আসিয়া যেমন ধীর গম্ভীর স্বরে বলেন, "দেখ, মনে রেখ, যেন ভুল না," বৈষ্ণব চিরদিনই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারে সেইরূপ বলিয়া থাকেন 'ভুলনা,

ভুলনা, নাথ। মিনতি করি আমি হে।' বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তির ঐ এক-মাত্র প্রার্থনা।

বৃন্দাবন-পরিক্রমে প্রায়ই পথ ভুল হইয়া থাকে; আমরা প্রেম-ভক্তির পরিণাম-কুঞ্জে আসিয়াছি, পথে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আবার সেই কুঞ্জ পরিভ্রমণ করিতে হইবে। প্রেম-ভক্তির মহাযাত্রায় চন্দ্রাবলীর পালা ছাড়িতে পারা যায় না। প্রেম বৈকুণ্ঠ হইতে অবতারিত। প্রেমে কুণ্ঠা নাই, সঙ্কোচ নাই; কিন্তু পরিমিত প্রেমে অভিমান আছে; অভিমান— নায়িকার পরিমিত প্রেমের চিরসঙ্গী।

সীতা যখন শুনিলেন, রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, সস্ত্রীক হইয়া সেই যজ্ঞ করিতে হয়, তখন অভিমানের উৎকণ্ঠায় বলিলেন, 'কি বলিলে? কি বলিলে?' বর্ণনকারিণী বলিতে লাগিলেন, 'তিনি স্বর্ণসীতা নির্ম্মাণ করিয়া বামে রাখিয়াছেন'; তখন অভিমান সেই পূর্ণ প্রীতিকে পথ ছাড়িয়া দিল; প্রীতির উচ্ছ্বাস নয়নে আসিল; সীতা নয়নাঞ্চলে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া বলিলেন, "সেই ধর্ম্মব্রত মহারাজের জয় হউক।" যখন পতি-ভক্তির পূর্ণ-প্রতিমা সীতাতেই এইরূপ প্রেমাভিমান, তখন অন্য পরে কা কথা। কিন্তু নায়িকার পরিমিত প্রেমে অভিমান আছে বলিয়া, সাধকের ঈশ্বর-প্রেমেও কি অভিমান আছে? আছে। আব্‌দারের সঙ্গে সঙ্গে অভিমান না থাকিলে, প্রেম কখন বিকশিত হয় না। এই অভিমান ছিল বলিয়াই সাধক-প্রধান রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন,—"মায়ের এমনি বিচার বটে।" ভক্তিতে অভিমান ছিল বলিয়াই মহাত্মা রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন—

কোথায় আনিলে?
পথ ভুলালে।

শ্রীমতীর সেই অভিমানের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, চন্দ্রাবলীর পালায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধক-সাধিকার একমাত্র কামনা, 'নাথ। আমায় ভুলিও না।' যদি একবার মনে হয়, যে 'আমার কেবল তিনিই,' ইহা জানিয়াও তিনি আমায় ভুলিয়াছেন, তবে সাধকের আর অভিমানের ইয়ত্তা থাকে না। কিন্তু সেই অভিমানে ভক্তি শিথিল হয় না, দৃঢ় হয়। সরল ভক্তিতে অভিমানের গ্রন্থি ভক্তি আরও সুদৃঢ় করে। এই অভিমান-গ্রন্থি সকল ভক্তেই দেখিতে পাওয়া যায়। জোবে আছে, দায়ূদে আছে, সাদীতে আছে, মহম্মদে আছে, ধ্রুবে আছে, প্রহ্লাদে আছে। প্রেম-ভক্তির আদর্শ-প্রতিমা শ্রীরাধার প্রেম-বিকাশের এই অভি-

সাম্নই প্রধান উপকরণ। এই অভিমান প্রেমসাগরের মাণরজ্জু। যেখানে প্রেম যত গভীর, সেখানে মাণরজ্জু ততই বিস্তৃত। কিন্তু সাগর যেখানে অগাধ, সেখানে মাণরজ্জু হারাইয়া যায়। প্রেম অগাধ হইলে, অভিমান প্রেমে লীন হয়। তখন নায়িকা বলেন ;—

'প্রণয় মোর সাগরতুল, সে কি অনাদরে শুখাবার,
বর্ষয়ে ভানু অনল যদি, না তাতয়ে সাগর মাঝার।
সখি কত দূরে ভানু রয়, নাগর তাহে কাতর নয়,
পসারি তার অগাধ হৃদয় তবু তার পানে ধায়।

প্রভাস খণ্ডে শ্রীমতীর প্রেমভক্তির পূর্ণ বিকাশ, তখন অভিমান অতলের অতলে গিয়াছে। তখন বৃন্দাবনের সেই বিলাসিনী কেবল কৃষ্ণ সাক্ষাৎকারের জন্য উন্মাদিনী। তখন আর রুক্মিণী বা সত্যভামার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বোধ নাই।

বৈষ্ণবের প্রেমভক্তির পরমোৎকৃষ্ট আদর্শের আমরা এতক্ষণে ঐহিক চরম সীমায় আসিয়া উপনীত হইলাম। এখন ভাদ্রের সেই কুল-ভঙ্গকর স্রোতে তরঙ্গ আর নাই, এখন আশ্বিনের একটানা পড়িয়াছে; আপনার বেগে মন্দাকিনী আপনি সাগরে চলিয়াছেন; বর্ষার সেই ঘোর ঘটার বজ্র বিদ্যুৎ চলিয়া গিয়াছে, এখন শরদের মাধুর্য্যে জগৎ পরিপূরিত হইয়াছে। প্রভাসের রাধিকা শরদের সেই মন্দাকিনী; বিমল উজ্জ্বল পূর্ণ চন্দ্রের সুন্দর ছবি প্রশস্ত হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি তখন কুল-কুলস্বরে অনন্ত প্রেমের অনন্ত সাগরে মিলিতেছেন। বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তির এই চরম আদর্শ!

বোধ হয়, এতক্ষণে আমরা কতক কতক বুঝিয়াছি, যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব-স্বামী, সকলের উপাস্য বলিয়াই তিনি গোপাঙ্গনাগণের নায়ক বলিয়া বর্ণিত; এবং প্রেমভক্তি কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান, বা শাস্ত্রের অনুসরণ নয় বলিয়াই রাধিকা কুলত্যাগিনী।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক আলোচনায় বুঝিলাম, যে বৈষ্ণবের মতে যৌবনের উৎসাহময় **মাধুর্য্য রসই** সাধকের চিত্ত-বৃত্তির উৎকৃষ্ট অবস্থা; ঈশ্বরে ঐকান্তিকী **প্রেম-ভক্তিই** তাঁহার সহজ সাধনা; বৃন্দাবনের বিলাসিনী, প্রভাসের তপস্বিনী প্রেমময়ী **শ্রীমতী রাধিকাই** প্রধানা সাধিকা ও ভক্তের আদর্শ, এবং অনন্ত সুন্দর, রসশেখর **শ্রীকৃষ্ণই** অনন্ত অসংখ্য সাধকের একমাত্র আনন্দ-কেন্দ্র।

ভক্তের আধ্যাত্মিক আদর্শ রাধিকা। কিন্তু বাঙ্গালি বৈষ্ণবের একজন ঐতিহাসিক আদর্শ আছেন। তাঁহার জন্ম গ্রহণে পুণ্যভূমি ভারতের মধ্যে বাঙ্গালি প্রসিদ্ধ ভক্তিক্ষেত্র এবং পবিত্র তীর্থ। তিনি ভক্তির ঐতিহাসিক অবতার, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। স্বয়ং ভগবানের ভক্তরূপে অবতারের কথা অতি বিচিত্র। যদি ভক্তগণের কৃপায় পারি, তবে সেই বিচিত্র পবিত্র কথা বারান্তরে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

শ্যেনকপোত এবং শাইলকের কথা।

ইংরাজের কাছে, হিন্দু নানা দোষে দোষী। ইউরোপের কাছে, এসিয়া ঘোর অপরাধে অপরাধী। এসিয়ার সহিত তুলনা করিয়া ইউরোপ আপনাকে কষ্ট-সহিষ্ণু এবং উন্নতি-শীল বলিয়া প্রশংসা করে এবং এসিয়াকে বিলাস-প্রিয় এবং অবনতি-প্রবণ বলিয়া নিন্দা করে। ভারতের ইংরাজ যে ভারতের হিন্দুকে অশেষ দোষে দোষী বলিবেন, সে কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু বিদ্বান, বিচক্ষণ, পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ইউরোপও যে হিন্দুর সেইরূপ কলঙ্ক ঘোষণা করেন, ইহা একটু বিস্ময়কর। The ease-loving Oriental—এই নিন্দাবাদ শুধু ইংরেজের মুখে নয়, ফরাসী, জর্ম্মাণ, প্রভৃতি সকল ইউরোপবাসীর মুখে শুনা যায়। তবে ইংরেজের মুখে যতটা, অপর ইউরোপবাসীর মুখে ততটা শুনা যায় না। এই নিন্দাবাদ যে একেবারে অমূলক এমন কথা বলি না। ইউরোপ যাহাকে কর্ম্ম-শীলতা এবং কষ্ট-সহিষ্ণুতা বলে এসিয়ায় তাহা অধিক পরিমাণে নাই। অবিশ্রান্তভাবে পৃথিবীর দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান, শীত গ্রীষ্ম তুচ্ছ করিয়া অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ বা অগ্নিময় মরুভূমে ভ্রমণ, এক কথায় গৃহত্যাগ করিয়া দূরদেশে গমন এবং এক কথায় দূরদেশ ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন, পাহাড় কাটিয়া রেল-পথ সম্প্রসারণ, বালি কাটিয়া বরুণের রাজ্য বিস্তীর্ণ করণ—এ রকম চঞ্চলতা-সংযুক্ত শ্রমশীলতা এবং কষ্ট-সহিষ্ণুতা এসিয়ায় বড় একটা দেখা যায় না। তাই ইংরেজ এবং অপরাপর ইউরোপবাসী এসিয়া-বাসীকে ease loving Oriental বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে। কিন্তু এসিয়াবাসী কি যথার্থই ease loving, আরাম-প্রিয় বা বিলাস-প্রিয়? সমস্ত এসিয়াবাসীর সম্বন্ধে এ

প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অক্ষম। হিন্দুজাতি প্রকৃত পক্ষে আরাম-লোলুপ বা বিলাস-প্রিয় কি না, হিন্দুজাতি প্রকৃত পক্ষে শ্রমশীল এবং কষ্টসহিষ্ণু কি না, আমি শুধু এই কথার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। এবং এই প্রশ্নের মীমাংসা স্থলে আমি প্রধানত প্রাচীন হিন্দুদিগের কথা বলিব। তাহাতে কোন দোষ ঘটিবে না, কারণ ইউরোপবাসী প্রাচীন হিন্দুকেও বিলাস-প্রিয় জাতি বলিয়া নিন্দা ও ঘৃণা করিয়া থাকেন। সাহেবের বিবেচনায় যোগোপবিষ্ট, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, মুদিতাক্ষ মহাযোগী ও স্বস্তি-প্রিয় ভারতবাসী। আর এক কথা। এই প্রশ্নের মীমাংসা স্থলে আমি প্রধানত সাহিত্যের সাহায্য গ্রহণ করিব। তাহার প্রথম কারণ এই যে, প্রাচীন হিন্দুর কার্য্যকলাপ ফুরাইয়া গিয়াছে, এমন কি সে কার্য্যকলাপের মধ্যে অধিকাংশের চিহ্নমাত্র নাই, সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব। দ্বিতীয় কারণ এই যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিলেও সাহিত্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কেন না সাহিত্যে শুধু কার্য্যকলাপ বর্ণিত হয় না, প্রবৃত্তি, মেধা এবং আসক্তি, আশা আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শ, ভূত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ সকলই অঙ্কিত থাকে। জাতীয় সাহিত্যে জাতীয় ধাত্ বাঁধা থাকে, কেন না জাতীয় ধাত্ না বাঁধিলে জাতীয় সাহিত্য জন্মে না।

এ দেশের পুরাতন শিক্ষা প্রণালীর গুণে এ দেশের বালক বৃদ্ধ,বিদ্বান মূর্খ, ধনী নির্ধন, ছোট বড়, সকলেই কিছু কিছু ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা অবগত আছে। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রভৃতির স্থূল স্থূল কথা সকলেই জানে। অতএব কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, যে এ দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র দুঃখের কাহিনীতে, কষ্টের কথায়, ত্যাগ-স্বীকারের বিবরণে পরিপূর্ণ। রামের বনবাস, পঞ্চপাণ্ডবের বনবাস, অর্জ্জুনের নির্ব্বাসন, নলদময়ন্তীর কথা, শ্রীবৎসচিন্তার কথা, হরিশ্চন্দ্রের কথা, সাবিত্রীসত্যবানের কথা, জিমূতবাহনের কথা,দাতাকর্ণের কথা—এইরূপ অসংখ্য অগণ্য শোক, দুঃখ, ক্লেশ, যন্ত্রণার কথায় হিন্দুশাস্ত্র পরিপূর্ণ। বোধ হয় এত শোক এত দুঃখ এত ক্লেশ এত যন্ত্রণার কথা পৃথিবীর আর কোন শাস্ত্রে নাই। আবার যিনি সেই সকল কথা মন দিয়া পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন কি অসাধারণ ভক্তি-ভরে, কেমন প্রাণ ভরিয়া, বনবাসী বনবাসিনী সেই বনবাস যন্ত্রণা, পতিহারা পতিব্রতা সেই পতি-বিচ্ছেদ দুঃখ, সেই পতিবিয়োগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন—তিনিই জানেন, যে মহাপুরুষগণ সেই সকল শোকের দুঃখের যন্ত্রণার কথা লিখিয়াছেন, তাঁহারা সেই কথায় কত উন্মত্ত,

কত বিহ্বল, কত মুগ্ধ; যেন শোক দুঃখ যন্ত্রণাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ—মানুষের পরম ভোগবিলাসের সামগ্রী। গ্রীক্ সাহিত্যে অনেক দুঃখের কাহিনী আছে, ইংরাজী সাহিত্যেও অনেক দুংখের কাহিনী আছে। সফক্লিস, ইস্কিলস এবং সেক্ষপীয়রের মতন দুঃখ যন্ত্রণার কথা ইউরোপে অতি অল্প কবিই লিখিয়াছেন। কিন্তু সে দুঃখ যন্ত্রণা হয়, ক্ষণমাত্র স্থায়ী—যেমন গ্রীক্ নাটকে;নয়, ক্রোধ হিংসা এবং অধৈর্য্য মিশ্রিত—যেমন সেক্ষপীয়রের নাটকে। নাটক অভিনয় করিতে যে চারি পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে, গ্রীক নাটক বর্ণিত ঘটনাবলিও সেই স্বল্প কালব্যাপী। অতএব গ্রীক্ নাটকের নায়ক-নায়িকার যন্ত্রণা—ঈদিপস্, আন্তাইগনি বা ফিলক্তিতিসের যন্ত্রণা —তীক্ষ্ণতম হইলেও দণ্ড-মাত্র-স্থায়ী। ইংরাজী নাটকের ঘটনাবলি দীর্ঘকাল ব্যাপী বটে। কিন্তু ইংরাজী নাটকের নায়ক-নায়িকার যন্ত্রণা—হ্যাম্‌লেটের বা লীয়রের যন্ত্রণা—অধীর অস্থির অসহিষ্ণু লোকের যন্ত্রণা। সেক্ষপীয়র, সফক্লিস, ইস্কিলস্ সকলেই দুঃখ যন্ত্রণার চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু কেহই দুঃখ যন্ত্রণার জীবন চিত্রিত করেন নাই। পল পল করিয়া দণ্ড, দণ্ড দণ্ড করিয়া দিন, দিন দিন করিয়া মাস, মাস মাস করিয়া বৎসর, বৎসর বৎসর করিয়া জীবন—এমন একটা দুঃখ-যন্ত্রণাময় জীবন—কেহ চিত্রিত করেন নাই। ইউরোপীয় নাটকে যন্ত্রণায় কেহ আপনার চক্ষু আপনি উপাড়িয়া ফেলিতেছে, কেহ আপনার সন্তানসন্ততিকে আপনি উৎকট অভিসম্পাত করিতেছে, কেহ অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে পড়িয়া মরিতেছে। ভয়ানক দৃশ্য—যেন বিদ্যুতাগ্নিতে সহসা দশ দিক জ্বলিয়া উঠিতেছে—কিন্তু তখনি আবার সব ঘোর অন্ধকার। কেবল চকিত হইতেছি মাত্র—দেখিতেছি অতি অল্প, বুঝিতেছি অতি অল্প। অবাক হইয়া আছি।* যে যন্ত্রণা কাটিয়া কাটিয়া লুণ দেওয়ার মতন পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে, দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে, বাড়িয়া বাড়িয়া একটা জীবনকাল বা জীবনকালের একটা সুদীর্ঘ অংশ ব্যাপিয়া উঠে, অথচ যন্ত্রণাভোগী স্থির ধীর অবিচলিত, সে যন্ত্রণার চিত্র কোন প্রধান ইউরোপীয় সাহিত্যে দেখা যায় না—কেবল প্রাচীন হিন্দুর সাহিত্যে দেখা যায়।—বালিকা রাজবধূ ইচ্ছা করিয়া বনে গমন করিতেছেন। রাজ-ভোগ,রাজসম্পদ,রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া বন্ধুর,কণ্টকাকীর্ণ,বন্যজন্তু সমাকীর্ণ,

* ইউরোপীয় নাটক পাঠে মোহিত হওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষালাভ বড় বেশী হয় না।

বনপথে উপবাসে অল্পাহারে বৃক্ষমূল সার করিয়া চলিতেছেন—দিন দিন করিয়া মাস, মাস মাস করিয়া বৎসর, বৎসর বৎসর করিয়া কত কালই চলিতেছেন। এত কষ্টেও নিস্তার নাই। সেই যন্ত্রণার উপর আবার পতিপ্রাণার পতি-বিচ্ছেদ—যে পতির জন্য এত কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, সেই পতিকে ছাড়িয়া শত্রুপুরীতে বাস। শত্রু প্রতিমুহূর্ত্ত, প্রতিপ্রহর, প্রতিদিন শাসাইতেছে, তাড়না করিতেছে, অপমান করিতেছে, জ্বালার উপর জ্বালা দিতেছে। এমনি করিয়া কত দিন কাটিয়া গেল। তার পর যদি শত্রুর হাত ছাড়াইলেন, আবার পতির হাতে পড়িয়া অগ্নি-পরীক্ষা। অগ্নি-পরীক্ষা দিয়াও নিষ্কৃতি নাই। রাজ্যে গিয়া রাজসিংহাসনে বসিয়া আবার সেই বনবাস। বনবাসের পর আবার সেই নিদারুণ পরীক্ষা, আবার সেই দেবতুল্য পতিকে হারাইয়া অনন্তকালের জন্য অন্তর্ধান! যেন কষ্ট দিতে, কষ্ট সহিতে হিন্দুর কত সুখ, কত চেষ্টা। আবার দেখ,—রাজা হরিশচন্দ্রকে দুঃখ দিতে হইবে—দুঃখ দিতে হইলে দুঃখে জর্জ্জরিত না করিলে দুঃখ দেওয়াই হয় না। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র বলিয়াছেন যে এক মাসের মধ্যে তিনি বিশ্বামিত্রকে প্রতিশ্রুত দক্ষিণা দান করিবেন। এক মাসের দুঃখে মানুষ জর্জ্জরিত হয় না। তাই ভয়ানক হিন্দুকবি একটা ভীষণ স্বপ্ন দেখাইয়া এক মুহূর্ত্তের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রকে যুগ ব্যাপী যন্ত্রণাভোগ করাইলেন! তাই বলি, যন্ত্রণা ভোগ কাহাকে বলে, প্রকৃত কষ্ট-সহিষ্ণুতা কাহাকে বলে, যদি বুঝিতে হয়, তাহা হইলে হিন্দুকে বুঝিতে হইবে, ইউরোপবাসীকে বুঝিলে চলিবে না। শোকের, দুঃখের, কষ্টের-যন্ত্রণার তুষানল কাহাকে বলে, হিন্দু ভিন্ন জগতে আর কেহ জানে না।

রাজা ঔশীনর যজ্ঞ করিতেছেন। কপোতরূপী অগ্নি শ্যেনরূপী ইন্দ্র কর্তৃক তাড়িত হইয়া প্রাণ-ভয়ে রাজার ক্রোড়ে লুকাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। শ্যেন আসিয়া রাজার নিকট কপোত প্রার্থনা করিল। বিধাতা কপোতকে শ্যেনের ভক্ষ্য-বস্তু করিয়াছেন—ক্ষুধার্থ শ্যেন রাজার নিকট কপোত প্রার্থনা করিল। প্রাণভয়ে ভীত শরণাপন্ন কপোতকে দিতে রাজা অস্বীকৃত হইলেন; তিনি বলিলেন—'গো, বৃষ, বরাহ, মৃগ, মহিষ প্রভৃতি পশু আহরণ করিতে পারি, অথবা অন্য কোন বস্তুতে অভিলাষ হইলে তাহাও এইক্ষণে প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু এই শরণাগত ভীত কপোতকে কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিব না। যেরূপ কর্ম্ম করিলে তুমি এই পক্ষীরে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হও, বল, অমি এক্ষণেই উহা সম্পন্ন করিব, তথাপি এই কপোতকে

সঙ্গত; কেন না বিশ্বামিত্রের পণ যথার্থই নিষ্ঠুর, নির্ম্মম। বিশ্বামিত্রকে নিষ্ঠুর এবং নির্ম্মম ভাবে দেখাইবেন বলিয়াই হিন্দু কবি তাঁহার চিরন্তন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে কাঁদাইলেন। হরিশ্চন্দ্রকে না কাঁদাইলে বিশ্বামিত্রের উপর রাগ হয় কৈ? কিন্তু এত রাগ করিয়াও কবি বিশ্বামিত্রের কার্য্যে ত বাধা দিলেন না—পাষণ্ডের পণ ত পণ্ড করিলেন না। করিবেন কেন? তিনি যে বিশ্বাদর্শের অনুগামী। জীব যন্ত্রণা পায় বলিয়া কি বিশ্বের নিয়ম ব্যর্থ হয়? বিশ্বামিত্র যতই কেন নিষ্ঠুর হউন না, বিশ্বামিত্র পুরুষ, বিশ্বামিত্র মানুষ—পণ ছাড়িবেন কেন? হরিশ্চন্দ্র যতই কেন কাঁদুন না—তিনিও মানুষ, সত্যে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে সত্য পালন করিতেই হইবে। হিন্দু ভিন্ন কেহ বিশ্বের শোক দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে জানে না। ইউরোপ যদি শোক দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে জানিত, তাহা হইলে ইউরোপীয় সাহিত্যে শাইলকের কাহিনী কথিত হইত না, সেক্ষপীয়র কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিতেন না। হিন্দু শোক দুঃখ এবং যন্ত্রণার প্রকৃত আস্বাদ জানে বলিয়া শোক দুঃখ যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভের জন্য চিরকাল লালায়িত। যে শ্রমের মর্ম্ম বুঝে, সেই বিশ্রামের প্রার্থনা করে—সেই যথার্থ বিশ্রাম-প্রয়াসী হয়। হিন্দুর মুক্তি-কামনার তাৎপর্য্য বড় গভীর। স্বস্তি প্রয়াসী প্রাচীন জাতি বলিয়া হিন্দু মুক্তি-কামনা করেন না। যাঁহারা সেইরূপ বুঝিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে বলিয়া দেওয়া উচিত যে হিন্দু শোক দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের জন্য যত লালায়িত জগতে আর কেহ তত লালায়িত নয়। কিন্তু সেই মুক্তি লাভের জন্য হিন্দু যত কঠোর তপস্যা, কঠিন ব্রহ্মচর্য্য, নিদারুণ আত্মত্যাগ, অলৌকিক গৃহসন্ন্যাস করিয়া থাকেন, জগতে আর কেহ তত পারে না। যে এত শোক দুঃখ ভোগ করে, লোকে তাহাকে কেমন করিয়া আলস্য-লোলুপ লোক বলে বুঝিতে পারি না। অথবা বুঝি নাই বা কেন, বুঝি। ইউরোপ যাহাকে দুঃখ কষ্ট ভোগ করা বলে, হিন্দু তাহা করে না। ইউরোপ নিজে যাহা করে না, ইউরোপ তাহা বুঝিতেও পারে না। ইউরোপের এই একটি মহৎ রোগ।

ইউরোপবাসী এবং হিন্দু উভয়েই দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে পারে। কিন্তু উভয়ের সমান উদ্দেশ্য নয়। ইউরোপ বাহ্যসম্পদের নিমিত্ত দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে পারে, হিন্দু ধর্ম্মের নিমিত্ত, কর্ত্তব্যপালনের নিমিত্ত, পরোপকারের নিমিত্ত দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে পারে। ইউরোপের কষ্ট দেহের জন্য, হিন্দুর কষ্ট

আত্মার জন্য। ইউরোপের কষ্ট নিজের জন্য, হিন্দুর কষ্ট পরের জন্য। দুই প্রকার কষ্টের দ্বারাই উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু সে উন্নতি দুই রকমের। একটি বাহ্য উন্নতি, আর একটি আধ্যাত্মিক উন্নতি। হিন্দুর বাহ্য উন্নতি বড় বেশী হয় নাই, ইউরোপের আধ্যাত্মিক উন্নতিও বড় বেশী হয় নাই। ইউরোপের সামান্য লোককে এখানকার পল্লিগ্রামের বড় বড় জমিদারের অপেক্ষা সমৃদ্ধি-শালী বলিয়া বোধ হয়, এখানকর সামান্য লোকও ধর্ম্মজ্ঞানে এবং ধর্ম্মচর্য্যায় ইউরোপের প্রধান প্রধান লোকের সমকক্ষ। কোন্ উন্নতিটি উৎকৃষ্ট, পাঠক বিচার করিবেন। তবে একটা কথা আছে। কেহ কেহ বলিবেন যে হিন্দুর উন্নতি উৎকৃষ্ট হইলেও তাহার ফল মৃত্যু—উদাহরণ, ইউরোপ কর্ত্তৃক এসিয়ার বাণিজ্য হরণ এবং ইংরাজ রাজ্যে হিন্দুর দারিদ্র। একথা সত্য হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে ইউরোপের উন্নতির ফলও কি মৃত্যু নয়? একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, যে হিন্দুর উন্নতির ফল যেমন দেহের মৃত্যু, ইউরোপের উন্নতির ফল তেমনি আত্মার মৃত্যু। আবার পাঠককে বলি, কোন্ মৃত্যুটা ভাল বিচার করিবেন। আমরা একটা সার কথা বুঝি এই যে, কি এ দেশীয় শাস্ত্র, কি বিদেশীয় শাস্ত্র সকল শাস্ত্রেই বলে ধর্ম্মযুদ্ধে মরিলে অক্ষয় স্বর্গ হয়। কিন্তু আসল কথা এই যে, লোক ধর্ম্ম প্রধান হইলে যে তাহাদিগকে মরিতেই হইবে, এমন কি লেখাপড়া আছে? হিন্দুজাতি ধর্ম্মপ্রধান বলিয়া পরাধীন হয় নাই। হিন্দু মুসলমানে যখন হিন্দুস্থান লইয়া যুদ্ধ হয় তখন হিন্দুর সামরিক শক্তি প্রভূত পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। এমন হইতে পারে যে তাহার স্বদেশানুরাগ বা patriotism ছিল না, কিন্তু রাজস্থানে যে রাজ-ভক্তিকে স্বদেশানুরাগের কার্য্য করিতে দেখা গিয়াছে, সে রাজভক্তি ত প্রভূত পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। তবে কেন হিন্দু পরাধীন হইল? অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারিবে যে ধর্ম্মপ্রধান না হইয়াও এবং স্বদেশানুরাগী হইয়াও গ্রীক্ যে কারণে পরাধীন হইয়াছিল, হিন্দুও সেই কারণে পরাধীন হয়—দেশ অনেক গুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়া। আর এক কথা। ধর্ম্মপ্রধান হইলে মরিতে হয় এ কথার অর্থ এই যে ধর্ম্ম অতি মন্দ জিনিস। কিন্তু সে অর্থ কি কেহ গ্রহণ করিবেন? বোধ হয় না। তবে এমন কি লেখাপড়া আছে, যে ধর্ম্মপ্রধান হইলে আমাদিগকে মরিতে হইবে? তুমি ইউরোপকে দেখাইয়া বলিবে যে আত্মসুখান্বেষী না হইলে ইউরোপের ন্যায় চঞ্চল (active), শ্রম-শীল, অসমসাহসিক (বা adventurous) ইত্যাদি হওয়া যায় না। আমি জিজ্ঞাসা

করি, তোমাকে এ কথা কে বলিল? মানুষের ইতিহাস পড়িলে বুঝিতে পারা যায়, যে আদিম অবস্থায় মানুষ যখন কেবল আপনাকে লইয়া এবং আপনার প্রয়োজন লইয়া থাকিত, তখন মানুষ পশুর ন্যায় অতি অলস এবং অসহিষ্ণু ছিল। এবং যখন মানুষের পাঁচ জন হইল—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, ভগিনী হইল—তখনই সে চেষ্টাশীল, শ্রমশীল, কর্ম্মশীল হইতে লাগিল। অতএব ধর্ম্মই কর্ম্মের প্রকৃত মূল। তবে মানুষের এমন একটা সময় হয়, যখন সে ধর্ম্মের জন্য নয়, শুধু সম্পদের জন্য সম্পদ অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। মানুষ যখন প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ পায়, তখন তাহার ধনলোভ বা সম্পদ-লালসা জন্মে এবং তখনই মানুষের সেই সময় উপস্থিত হয়। আজ ইউ-রোপ পৃথিবীকে তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে। অতএব তুমি বোধ হয় তর্ক করিবে, যে আপনার সুখসাধন করিতে মানুষের স্বভাবত যত প্রবৃত্তি ও চেষ্টা হয়, অন্যের সুখসাধন করিতে তত হয় না। এ কথার উত্তর এই যে আপনার সুখ অপেক্ষা অন্যের সুখ বেশী প্রার্থনীয় বলিয়া, যে বুঝিতে শিখিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে এমন কথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে, যে আপনার সুখাপেক্ষা সে অন্যের সুখের নিমিত্ত স্বভাবতই বেশী উদ্যমশীল হইবে। হিন্দু সাহিত্যের ধাত্ বুঝিয়া দেখিলে অনুমিত হয়, যে প্রাচীন কালে হিন্দু ধনের নিমিত্ত নয় ধর্ম্মের নিমিত্ত, আজিকার ইউরোপের ন্যায়, আজিকার ইউরোপের প্রাণালীতে, কর্ম্ম করিতে পারিতেন। গুরুকে মনোমত দক্ষিণা দিবার জন্য শিষ্য তখন স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল ভেদ করিয়া বেড়াইত, যজ্ঞের অশ্বের অন্বেষণে সগর সন্তানেরা পৃথিবীকে খনন করিয়া সাগরের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছিল, (লেসেপস্ খানিকটা বালি কাটিয়া একটা সরু খাল কাটিয়াছেন বৈত নয়), এবং সেই ষাটি সহস্র সগর সন্তানের উদ্ধারার্থ ভগীরথ কত দুর্গম স্থানে গিয়াছিলেন এবং কত দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অতএব বোধ হয় বলা যাইতে পারে, যে প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুর যেরূপ শিক্ষা হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে তিনি স্বার্থকে অধীন করিয়া পরার্থকে প্রধান করিয়া আজিকার ইউরোপের প্রণালীতে বাহ্যোন্নতির নিমিত্ত চেষ্টাশীল এবং উদ্যমশীল হইতে পারিবেন। এবং তাহা হইলে একমাত্র হিন্দুর দেশে উন্নতি বাহ্যাভিমুখী হইয়াও সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্ম-মূলক এবং ধর্ম্মাত্মক হইবে। কিন্তু হিন্দুর যে প্রাচীন প্রকৃতি এবং প্রাচীন শিক্ষার কথা বলিতেছি, আজিও কি তাহার কিছু আছে? বোধ হয় কিছু আছে। কেন না আজিও গৃহস্থ হিন্দু

যত লোকের সুখের নিমিত্ত খাটিয়া থাকেন, গৃহস্থ ইংরাজ তত লোকের সুখের নিমিত্ত খাটেন না। অতএব আমরা প্রার্থনা করি যে ধর্ম্মচর্য্যায় প্রাচীন হিন্দুর যে অসীম উদ্যম, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিবার ক্ষমতা ছিল, আজিকার হিন্দুরও যেন তাহা থাকে। কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া বোধ হইতেছে, যে হিন্দুর মধ্যে সে ক্ষমতা অনেক হ্রাস হইয়াছে এবং যাঁহারা ইংরাজি শিখিতেছেন তাঁহাদের সে ক্ষমতা নাই বলিলেই হয়। কিন্তু দেখিয়াছি যে কষ্ট সহিষ্ণুতাতেই হিন্দুর হিন্দুত্ব, হিন্দুর হিন্দু-মহত্ত্ব, হিন্দুর ইউরোপের উপর প্রাধান্য। সে কষ্টসহিষ্ণুতা হারাইলে আমরা সব হারাইব—আমাদের বর্ত্তমান তমসাচ্ছন্ন,আমাদের ভবিষ্যৎ বিলুপ্ত হইবে।

আর একটি কথা। কষ্টেই মানুষের উন্নতি। দেখিলাম হিন্দুর যত কষ্ট-ভোগ ক্ষমতা আছে, আর কাহারো তত নাই। অতএব আমাদের ইতিহাসের এই কথাটিই আমাদের সমস্ত আশা ভরসার মূল। যদি আবার তেমনি কষ্টভোগ করিতে পারি, তবে আবার তেমনি উন্নত, তেমনি মহৎ হইব। হিন্দু আজ বুক ভরিয়া এই আশা, এই আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে। সেই আশায় সেই আকাঙ্ক্ষায় উৎসাহিত হইয়া,আমরা এখন মানুষ হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, যত্ন করিতেছি, পরিশ্রম করিতেছি। কোন্ পথে চলিলে সে চেষ্টা, সে যত্ন, সে পরিশ্রম সফল হইবে, প্রথম হইতেই তাহা ঠিক করিয়া রাখা চাই। প্রথম হইতে পথ ঠিক করা সকল কার্য্যেরই প্রকৃত পদ্ধতি এবং এরূপ গুরুতর কার্য্যে তাহা নিতান্ত আবশ্যক। সকল কার্য্যই কষ্টসাধ্য। কিন্তু কষ্ট দুই রকমের। বসিয়া বসিয়া পরিশ্রম করা এক রকম কষ্ট; ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইয়া পরিশ্রম করা আর এক রকম কষ্ট। আমরা দেখিয়াছি যে স্থির হইয়া ঘরে বসিয়া হিন্দু অনেক কষ্ট সহ্য করিতে পারেন। বহু প্রাচীন কাল হইতে হিন্দু এই প্রণালীতে কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। অতএব এমন অনুমান করা যাইতে পারে, যে এই প্রণালীতে কষ্টভোগ করা তাঁহার প্রকৃতিসঙ্গত এবং এই প্রণালীতে কষ্টভোগ করিলেই যে উদ্দেশে কষ্টভোগ, তাহাতে তিনি বেশী সফলতা লাভ করিবেন। আমি এমন কথা বলি না, যে চিরকাল ঘরে বসিয়া কষ্ট ভোগ করিয়াছেন বলিয়া হিন্দু আজ ঘরের বাহির হইয়া জ্ঞানসঞ্চয়ার্থ পৃথিবীর সকল স্থান এবং সকল পদার্থ দেখিয়া বেড়াইবেন না। জ্ঞানোপার্জ্জনার্থ আজি হইতে তাঁহাকে সেই প্রণালীতে কষ্টভোগ শিক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে বলিয়া পুরাতন

প্রকৃতিসঙ্গত প্রণালীটি যেন একেবারে উপেক্ষিত না হয়। দুইটি প্রণালীর মধ্যে সেই পুরাতন প্রণালীটিই উৎকৃষ্ট। যে হাটবাজার হইতে মাছ মাংস তরকারি প্রভৃতি আনিয়া দেয়, সে অনেকটা কাজ করে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে রন্ধনশালায় বসিয়া বসিয়া চুল্লীর উত্তাপে দগ্ধ হইয়া গাঢ় ধূমে রুদ্ধশ্বাস হইয়া আহরিত দ্রব্যাদি রন্ধন করিয়া মানবের পুষ্টিসাধনার্থ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দেয়, তাহার শ্রমের মূল্য নাই, তাহার পদ বড়ই শ্রেষ্ঠ। সামান্য লোকের দ্বারা হাটবাজার হয়; প্রকৃত ওস্তাদ নহিলে রন্ধনকার্য্য হয় না। হিন্দু! যে ক্ষমতা থাকিলে মানুষ রন্ধনকার্য্যে কৃতকার্য্য হয়, অতি প্রাচীনকাল হইতে সে ক্ষমতা বোধ হয় তোমারই আছে। আজিকার নূতন প্রণালীতে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে শিক্ষা কর। তাহা না করিলে আজিকার দিনে চলিবে না। কিন্তু তোমার অনন্ত ইতিহাসে তোমার যে অলৌকিক চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, মনে থাকে যেন সে রকম চিত্র আর কাহারো ইতিহাস-পটে অঙ্কিত নাই। মনে রাখিয়া, এই চেষ্টা করিও যেন বিজ্ঞানের বিশাল রন্ধন-শালার প্রধান রাঁধুনীর পদ তোমারই হয়—যেন অপর সমস্ত জাতি জগতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে তোমার রন্ধনার্থ দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিয়া দেয়। তোমার ইতিহাস বলিতেছে, যে ইহাই তোমার প্রধান এবং প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত—লক্ষ্যান্তর অনুসরণ করিলে বোধ হয় তুমি দিশাহারার ন্যায় সকল দিক হারাইবে! সেই লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া চলিলে অতীত যুগে তুমি যেমন পৃথিবীর আচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলে, ভবিষ্যযুগেও তেমনি সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কথায় প্রত্যয় না হয়, একটা প্রমাণ গ্রহণ কর। এত অধম, এত অবনত, এত অবসন্ন হইয়াও যে আজিকার নরবীর ইংরাজকে বিদ্যার পরীক্ষায় পরাজয় করিয়া পৃথিবীতে ডঙ্কা বাজাইতে পারিতেছ, সে কেবল তোমার পবিত্র পিতৃপুরুষের সেই অলৌকিক এবং অসাধারণ কষ্টভোগ শক্তির কণামাত্র এখনও তোমাতে আছে বলিয়া। লোকে আজ তোমার যে শক্তি দেখিয়া তোমাকে উপহাস করিতেছে, সে শক্তি না থাকিলে উন্নতি হয় না এবং সে শক্তি বাড়াইতে পারিলে লোকে একদিন অবশ্যই তোমাকে পৃথিবীর আর্য্য বলিয়া আবার পূজা করিবে।

নবজীবন্।

(অশোকাষ্টমী নিশি—নদীতীরে—পিতৃ মাতৃ
শ্মশানস্থ শিবালয় সম্মুখে।)

১

জুড়াইল—
এত দিনে জুড়াইল হৃদয় আমার!
যে দারুণ পিপাসায়,
অর্দ্ধেক জীবন হায়,
দহিয়াছে অনিবার হৃদয় আমার;
মধ্যম জীবনে প্রাণে,
বিধুমিত সে শ্মশানে,
আজি শান্তি বারি আহা হইল সঞ্চার,
জুড়াইল এত দিনে জীবন আমার!

২

বেড়াইনু কত তীর্থে—পিপাসা আকুল!
বঙ্গ সাগরের তীরে,
"চন্দ্র শেখরের" শিরে
স্বভাবের অভ্র-ভেদী সে বেদী অতুল!
ভূতলে হৃদয় রাখি,
দেখিছি, অচল আঁখি,
স্বভাবের শান্তি রাজ্য ব্যাপি গিরিমূল;
দেখিয়াছি শান্তিময় নীলাম্বু অকূল।

৩

নীলাম্বুর অন্য তীরে
যথা সুদর্শন শিরে
শোভিছে মন্দিরে—বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ—
বিকট মুরতিময়,
বিশ্বকর্ম্মা গুণত্রয়,
এক "ক্ষেত্রে" সমাবেশ—বিষ্ণু ভগবান!
দেখিয়াছি জগন্নাথ ত্রিনীতি নিদান।

৪

দেখেছি "ভুবনেশ্বরে" ভুবন ঈশ্বর;
মহাশক্তি ক্রীড়ান্বিতা,
সৃজয়িত্রী সৃজয়িতা
সৃজন সঙ্গমে রত, সৃষ্টি—চরাচর!
প্রকৃতি ও পুরুষের
অবিশ্রান্ত সঙ্গমের
মহামূর্ত্তি শিলাখণ্ড! গভীর কেমন,
অশ্রান্ত সে ক্রীড়া, আর অশ্রান্ত সৃজন।

৫

'বিরজার ক্ষেত্রে' সত্ত্ব, 'অর্ক ক্ষেত্রে' রজ,
তম মূর্ত্তি "যম ক্ষেত্রে,"
দেখিয়াছি জ্ঞান নেত্রে;
'শিব ক্ষেত্রে' সৃষ্টি—সত্ত্ব রজের সঙ্গমে;
"বিষ্ণু ক্ষেত্রে" স্থিতি তত্ত্ব,
তিনের মিলনে নিত্য
রহিয়াছে প্রকটিত; কি তত্ত্ব মহান্!
উৎকলের পঞ্চ ক্ষেত্রে আছে মূর্ত্তিমান!

৬

জাতীয় জীবন বাহী জাহ্নবীর তীরে
দেখিয়াছি বারাণসী,
শরতের অর্দ্ধ শশী
ভাসমান ভাগিরথী বক্ষে মনোহর।
অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর
দেখিয়াছি কি সুন্দর,
সৃজন পালন মূর্ত্তি—কাশী পুণ্য ধাম!
কিন্তু কই, তাহে নাহি যুড়াইল প্রাণ।

৭

বসি বিন্ধ্যাচল শিরে,
গঙ্গার নির্ম্মল নীরে,
দেখেছি নির্ম্মলতার মূরতি সুন্দর।
প্রয়াগে সঙ্গম স্থলে,
শারদ গগন তলে,
দেখিয়াছি প্রকৃতির নিষ্কাম মিলন।
কি মাহাত্ম্য একতার করিছে কীর্ত্তন!

৮

অমর—অমৃত—নাই কে বলে ধরায়?
মথুরায় বৃন্দাবনে
দেখেছি অতৃপ্ত মনে,
অমর মানব রূপ—নর নারায়ণ!
পদ পরশনে যার,
যমুনা অমৃতাসার
বহিছে অনন্ত কাল; হয়েছে কেমন
অমৃত মণ্ডিত ক্ষুদ্র গিরি গোবর্দ্ধন।

৯

"রাজগৃহে" পঞ্চ গিরি প্রতিধ্বনি তুলি,
কি গভীরে যুগশত,
ঘোষিতেছে অবিরত—
"অমর মানব!" যার পুণ্য পদধূলি,
অর্দ্ধাধিক নরজাতি,
লভেছে মস্তক পাতি,
যাহার অমৃতময় মহাসাম্য গীত,
সমগ্র পৃথিবী আজি করিছে প্লাবিত।

১০

গঙ্গা সাগরের সেই অতুল সঙ্গম!
মহাসিন্ধু মহাকাল!
কি মূরতি সুবিশাল!
পবিত্রা জাহ্নবী—আর্য্য জাতীয় জীবন—
করিতেছে সিন্ধু সহ,
কত ক্রীড়া অহরহ,—
কি উচ্ছ্বাস, কি নিশ্বাস,
কি তরঙ্গ, অট্টহাস,
কি উত্থান, কি পতন, কি শান্তি, কি ঝড়!
আর্য্য অদৃষ্টের কিবা চিত্র ভয়ঙ্কর!

১১

এই ক্ষুদ্র নদী তীরে, এ ত্রিপাদ ভূমে,
পাতিয়া তাপিত বুক,
পাইলাম যেই সুখ,
যেই শান্তি, যেই প্রীতি, তৃপ্তি পিপাসার—
জুড়াইল এতদিনে হৃদয় আমার!

১২

এই মম মহাতীর্থ, ত্রিদিব আমার!
এত দিনে বুঝিলাম,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, ধরাধাম,
হইল না কেন ত্রিপাদের পরিমাণ।
তিন পদ কোন্ ছার,
একটি ধূলি ইহার,
ত্রিভুবনে পরিমিত হবে না কখন—
স্নেহের উপমা নাই, স্নেহ অতুলন!

১৩

এই মম মহাতীর্থ, ত্রিদিব আমার!
জনক জননী মম,—
জাহ্নবী যমুনা সম,
এক অঙ্গে পরিণত যুগল জীবন,
এখানে অনন্ত সহ হইল মিলন।

১৪

হায় মাত বসুন্ধরে! খুলিয়া হৃদয়,
দেখাও যুগল মুখ,
সেই স্নেহ ভরা বুক,
সেই সরলতা, পর-দুঃখ কাতরতা,
সেই চির কোমলতা,
সেই চিত্ত মধুরতা,
সেই চিরপ্রসন্নতা, প্রীতি পারাবার,
সেই দেব, সেই দেবী, উপাস্য আমার!

১৫

পাপী আমি! হায় মাতঃ দুরদৃষ্ট বশে
ছিলাম বিদেশে পড়ি
দুরাকাজ্ক্ষা ভর করি
আমার সে রবি শশী ডুবিল যখন।
বারেক জীবন তবে,
দেখিনি নয়ন ভ'রে
সেই মুখ; সেই বুকে—স্নেহের দর্পণ—
বারেক রাখিনি মুখ জন্মের মতন।
সে অভাব হৃদে সহি,
সে পিপাসা হৃদে বহি,
কত তীর্থ তীর্থান্তরে করিনু ভ্রমণ;
কই সে পিপাসা মম হলো না পূরণ!

১৬

উঠ বাবা, ত্যজ নিদ্রা, উঠ একবার!
বলিত যে এ সংসার,—
"স্নেহে তুমি মা আমার,"
উঠ সেই স্নেহমুখ দেখি একবার!
ষোড়শ বৎসর পরে,
ভ্রমি দেশ দেশান্তরে,
আসিয়াছি গৃহে মুখ দেখিতে তোমার
ত্যজ নিদ্রা, উঠ বাবা, উঠ মা আমার!

১৭

'রোপিয়াছি আশালতা' বলিতে মায়েরে
দেখিলে না একবার
তব সে আশা লতার,
ফলিয়াছে কোন্ ফল? বিফল সকল,
একটিও পাইল না তব পদতল।

১৮

এই পরিতাপে হায় তাহার জীবন
হইয়াছে বিষময় ;
আহা ! প্রাণে নাহি সয়,—
একটি তণ্ডুল নাহি করিনু অর্পণ,
তোমাদের পদতলে,
পরিতাপে প্রাণ জ্বলে ;
কার তরে এ দাসত্ব করিনু বহন,
সহিলাম এত ঝড়, এত নির্যাতন ?

১৯

একে একে ভেসে গেল স্নেহের পুতুল।
দূর শূর নদী তীরে,
নিদ্রা যায় একটি রে !
দ্বিতীয় আমার চির-দুঃখ নিবারণ—
নিদ্রা যায় স্বর্গ দ্বারে,
অনন্ত জলধি পারে ;
সেই তীরজাত ক্ষুদ্র নীরেন্দ্র প্রসূন,
পদ্মায় ভাসিয়া গেল পবিত্র কুসুম।

২০

উঠ বাবা, স্নেহময়ী উঠ মা আমার,
বুলায়ে কোমল কর,
আমার হৃদয় পর,
জুড়াও জলন্ত এই স্নেহের শ্মশান,
সংসারের শত অস্ত্রে ক্ষত এই প্রাণ।

২১

না না—এই ভূমি খণ্ড, ক্ষুদ্র পরিসর,
সে অনন্ত দয়া, সেই প্রশস্ত হৃদয়,
কভু কি ধরিতে পারে ?
শুক্তি ধরে পারাবারে ?
অনন্তে অনন্ত আহা ! হয়েছে বিলীন !
অশোক অষ্টমী নিশি,
হাসিতেছে দশ দিশি,
বাসন্তী চন্দ্রিকা করে ; হাসিছে সুন্দর
বাসন্তী চন্দ্রিকা স্নাত অনন্ত অম্বর।

২২

অনন্ত অম্বর পটে শত চন্দ্রোজ্জ্বল,
কিবা হর গৌরী রূপ,
শোভিতেছে অপরূপ,
জনক জননী মম একাঙ্গ সুন্দর !
কিবা সুপ্রসন্ন হাসি,
কি অনন্ত স্নেহরাশি,
ভাসিছে অধরে নেত্রে ! কি স্বর্গ সঞ্চার
করিতেছে ওই দৃষ্টি হৃদয়ে আমার !

২৩

শোভিতেছে অঙ্কে পঞ্চ প্রতিমা সুন্দর !
কি সুখে সে স্বর্গোপর,
বিরাজিছে বাছা মোর,
গলায় গলায় সেই যুগ্ম প্রতিমার !
ক্ষুদ্র পুষ্প সে বদন
চুম্বিছেন দুইজন

কি আদরে অঙ্কস্থিত পুত্র কন্যাগণ
কি আদরে সেই ফুল করিছে চুম্বন!

২৪

তোমাদের স্নেহ-সাধ মিটেনি ভূতলে।
তাই এই ফুলগুলি,
একে একে নিলে তুলি;
শূন্য করি অপবিত্র অঙ্ক আমাদের
নিলে ওই ফুল মোর—
বড় ভাগ্য বাছা তোর,
যেই স্নেহামৃত তুই করিস্ রে পান,
তার পিপাসায় দহে আমাদের প্রাণ।

২৫

আর কাঁদিব না। যেই অনন্তের সনে
মিশিয়াছ, সেই মহা অনন্ত স্বরূপ,—
অশোক অষ্টমী আজি,
ভক্তির তরঙ্গ রাজি
করিয়াছে মুহূর্ত্তেক অশোক অন্তর—
স্থাপিলাম সেই মূর্ত্তি শ্মশান উপর।

২৬

স্থাপিলাম "গোপীশ্বর"—প্রকৃতি ঈশ্বর।
কাংস্য ঘণ্টা শঙ্খ ধ্বনি,
কি পবিত্র স্রোতস্বিনী
বহে হুলুধ্বনি সহ রহিয়া রহিয়া!
কিবা ধ্যান সুধাময়,
সমীরণ পৃষ্ঠে বয়,
অগুরু চন্দন গন্ধে মাখিয়া শরীর,
—অনন্তের কিবা মূর্ত্তি, কি চিন্তা গভীর!

(ধ্যান)

"নমোঽনন্ত স্বরূপাখ্যং নিষ্কলং
গুণগুম্ফিতম্।
"বিদ্যুৎপুঞ্জ সহস্রার্কং দ্বিভুজং
কান্তবিগ্রহম্।
"আদ্যন্ত মধ্য রহিতং ব্যাঘ্রাজিনাবৃত
কটিম্।
"কুপ্যদ্ভুজঙ্গ কোটীশং বরদাভয়
পাণিকম্।
"সাধকাভীষ্ট দাতারং কোটি
ব্রহ্মাদিভিস্তুতম্।
"নানারূপ ধরঞ্চোগ্রং ধ্যায়েচ্ছঙ্কর-
মব্যয়ম্।

২৭

অনন্ত—স্বরূপ, আখ্যা, উভয় তোমার।
কলহীন গুণান্বিত;—
যদি হয় অলক্ষিত
জ্ঞানের নয়নে, তবে দেখাও তোমার
বিদ্যুৎপুঞ্জ ঝলসিত,
সহস্রার্ক প্রজ্বলিত,
সে ভীষণরূপ; তাহে ত্রাসিলে অন্তর,
দেখাও কৌমুদী মাখা মূরতি সুন্দর।

২৮

সৌন্দর্য্যে মোহিত যদি,দেখাও তখন—
আদি নাই, অন্ত নাই,
মধ্য কোথা নাহি পাই,

কি মহা বিরাট মূর্ত্তি নর জ্ঞানাতীত !
ভাবি তুমি বিশ্বপতি;
ব্যাঘ্রজিনাবৃত কটি
নিষ্কাম উদাসরূপ দেখাও তখন।
যাই যদি পাপ পথে,
দেখি আকাশের পটে
কুপিত-ভুজঙ্গ-কোটি-ঈশ্বর নির্দ্দয়;
পুণ্য পথে—দুই ভুজ বরদ অভয় !

২৯

ব্রহ্মাদি-দেবতা-কোটি-পূজিত দেখিয়া,
যদি ক্ষুদ্র নর ভ্রমে,
দূরলভ্য ভাবি মনে,
দেখি তুমি ইষ্টদাতা সর্ব্ব সাধকের;
তাহে হ'লে অহঙ্কার,
ধর নানা উগ্রাকার—
রোগ, শোক. ঝড়, বজ্র; হইলে কাতর,
দেখি পূর্ণ শিবরূপ, অব্যয় শঙ্কর !

৩০

জুড়াইল—
এই ধ্যানে, পিতৃদেব, পূজিয়া তোমায়
কি যে শান্তি লভিলাম,
কি **জীবন** পাইলাম,
কি অমৃতে পরিপূর্ণ হইল হৃদয় !
হৃদয়ের ক্ষত যত,
শান্ত তারাগণ মত;
হৃদয় তেমতি ওই সুনীল গগন—
শান্ত, স্থির, লভিলাম কি **নবজীবন** !

৩১

গাইছে জগত নবজীবনের গান।
জীমূতের পৃষ্ঠে চড়ি,
বিদ্যুৎ সাপটি ধরি,
ছুটেছে অনন্ত গর্ব্বে, গতি অবিশ্রাম;
হৃদয়েতে কি উচ্ছ্বাস,
কি ঝটিকা পূর্ব্ব-শ্বাস,
দুই পার্শ্বে দুই সখী—দর্শন বিজ্ঞান—
গাইছে পুরিয়া শূন্যে কি গভীর গান !

৩২

গাইছে ভারত নবজীবনের গান।
মহা নিদ্রা অবসান,
সঞ্জীবনী সুধাদান
করিতেছে মহাকাল বসিয়া শিবিরে।
মহা নিদ্রা অবসান,
ধীরে ধীরে এক প্রাণ
করিতেছে ধীরে অম্বু-প্রাণিত শরীর
নবজীবনের শ্বাস বহিতেছে ধীর।

৩৩

পিতৃদেব !
শিখাও আমারে নব জীবনের গান।
অমর অক্ষরে লেখা,
দেখাও কর্ত্তব্য রেখা
আঁকিয়া আকাশ পটে; কর শক্তি দান
সেই রেখা অনুসারি-
চরণে যাইতে পারি,
অন্তিমে চরণে তব পাই যেন স্থান,
পিতৃদেব !
শিখাও আমারে **নবজীবনের গান** !

নবীন।

কুঞ্জ সরকার।

সকলেই বলিতেছেন কুঞ্জ সরকার ফুটিতেছে না, আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই ভরাভাদ্রের দুর্দ্দিনের দুর্যোগ সময়ে, তুমি কোন্ কুঞ্জে কয়টা ফুল ফুটন্ত দেখিতে পাও? কৃষ্ণকলি জলপ্রপাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, দোপাটির চারা ডাঁটাসার, পাপড়িগুলা মাটিতে পোঁত পড়িয়াছে; রজনীগন্ধ নববিধবার মত বিষণ্ণ শুভ্রচ্ছদে নতমুখে চোখের জলে মাটি ভিজাইতেছে; গোলাপের বৃন্তগুলি আছে, পাপড়ি নাই; রাশীকৃত কুন্দ কাদামাখা হইয়া অনাদরে তলা বিছাইয়া পড়িয়া আছে।

আমাদের কুঞ্জ সরকারের সময়, রাঢ় অঞ্চলে এমনই দুর্য্যোগ; এমনই দুর্দ্দিন। তখন ললাটী, কপালী, নাক-কাটী, বিশালী, চোরচণ্ডী, রণঝণ্ডী, রঙ্কিণী, শঙ্কিনী প্রভৃতি দেবী মূর্ত্তি সকল দস্যুকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিতা হইয়া জাগ্রত-ভাবে শীধু-মাংস-পশু-প্রিয়া নামের সার্থকতা করিতেছেন। তখন বাগ্দী ডোম চৌকিদারে দিনে দুপরে দীঘীর পাড়ে, হত্যা করে; দারোগার জমাদারের বক্সির নায়েব হিসাব করিয়া আপনার এবং উপরওয়ালার মাসোয়ারা গণ্ডা দস্যুদের স্থানে বুঝিয়া লয়। বিষ্ণুপুররাজের তিনশত ষাট শিবমন্দিরে তখন দস্যু দলই নিত্য অতিথি। তখন মন্দিরের পূজারি দস্যু, সেবক দস্যু, কায়দার দস্যু, ভাণ্ডারী দস্যু। সরকার বাহাদুর শিপাহী পাঠাইয়া এই দস্যুতা নিবারণের উদ্যোগী হইয়াছেন। ক্রমে বিষ্ণুপুরের উপর তাঁহাদের শুভদৃষ্টি পড়িয়াছে। ঘাটওয়ালি জমা একে একে বাজেয়াপ্ত হইতেছে; বিষ্ণুপুরকে বনবিষ্ণুপুর করিয়া মদনমোহন বাগবাজার আশ্রয় লইলেন। তাঁহার গুপ্ত বৃন্দাবন এরণ্ডবন হইতে লাগিল।

রাঢ়ের এমনই দুর্দ্দিনে কুঞ্জ সরকারের আবির্ভাব বা স্থিতিভাব। তখন লাঠির জোরে রাঢ় অঞ্চলে যে ফুল যে ভাবে ফুটিয়াছিল, তাহার নাম গন্ধ আমাদের কুঞ্জ সরকারে নাই। আর তোমরা যাহাকে 'ফুটন্ত' বল তাহাও কুঞ্জ সরকারে নাই। যদি অলৌকিক শক্তির হঠাৎ আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া বিস্ময় রসে চক্ষু বিস্ফারিত করাই সহজ সাহিত্য পাঠের চরম আনন্দ বলিয়া তোমার ধারণা থাকে, তবে আমাদের কুঞ্জ সরকারে তাহা পাইবে না। তথাপি বলিয়া রাখি কুঞ্জ সরকার এক সময়ের এক অঞ্চলের প্রসিদ্ধ লোক।

কুঞ্জ সরকার ক্ষণজন্মা বলিয়া একব্রতী কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না, লোকে তাহাই বলিত; কিন্তু এত টুকু বলিতে পারি যে তিনি একব্রতী বলিয়াই প্রসিদ্ধ। শাসনের সহিত শিক্ষাদানই কুঞ্জ সরকারের এক কার্য্য, এক ব্রত, এবং সমস্ত জীবন। তবে জীবন ধারণের জন্য দুই চারিটি নিত্য কর্ম্ম ছিল বটে।

দিবা দ্বিপ্রহরের পর কুঞ্জ মহাশয় দরিয়া দীঘীতে স্নান করিতেন। স্নানের পর একবার, সেই ত্রিভাঁজ শরীর বক্র করিয়া সূর্য্য প্রণাম করিতেন; সেই তাঁহার একমাত্র প্রকাশ্য আহ্নিক। দিনান্তে একবারও সূর্য্যদেব দেখা দিলেন না, এমন হইলে, পাঠশালা বন্ধ থাকিত; কুঞ্জ মহাশয় সে দিন আহার করিতেন না। সেই জন্য লোকে আরও বিশ্বাস করিত, যে কুঞ্জ মহাশয় সূর্য্যোপাসক। স্নানের পর রন্ধন। পড়োরা যে দিন যাহা জোগাড় করিয়া দিবে, কুঞ্জ মহাশয় সে দিন তাহাই রন্ধন করিবেন। আহারের সঞ্চয় ভাণ্ড বা ভাণ্ডার কুঞ্জ মহাশয়ের ছিল না। তবে হাঁড়িতে দুটি পর্য্যুষিত অন্ন এবং তিজেলে একটু তেঁতুলের চাঁচি, বার মাসই তাঁহার থাকিত। আহারের পর তাঁহার 'কেলোকে' দুই থাবা অন্ন দিতেই হইবে। কেলো কুকুর, তাঁহার পুষ্যি পড়ো। কেলো কসিতে বা বুঝিতে পারিত না বটে। কিন্তু মহাশয় তাঁহার সেই মহাভ্রূ একটু কাঁপাইয়া, সেই অধরোষ্ঠের দক্ষিণ কোণ একটু প্রসারণ করিয়া—একটু যেন গর্ব্বে, একটু যেন আহ্লাদে, বলিতেন "কেলো তরিবতে অনেক পড়োর চেয়ে ভাল।"

'নীতি' বা 'শিক্ষা' এই দুইটি কথা, [illegible] চাণক্য শ্লোক পড়ানর সময় ছাড়া বোধ হয়, আর কখনই মুখে আনিতেন না। তিনি বলিতেনও তরিবৎ; বুঝিতেনও তরিবৎ। পড়োর তরিবৎ ভাল হইলেই, সে মহাশয়ের পরম প্রিয় হইত। যখন এরূপ কোন ছাত্রকে তিরস্কার করিতেন, তখন বলিতেন 'সোদর গাধা!' যাদের তরিবৎ হয় নাই, তাহাদের বলিতেন "বাঁদর গাধা।" যে সকল সরস্ক ছাত্র তরিবতে তাঁহার প্রিয়, তাহাদিগকে বামে লইয়া বসিতেন এবং উহাদের সহিত তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। নৌকা আঁকিয়া কাঁড়ে দাঁড়ের মাপ বুঝাইতেন, 'ছাঁদে যত, বাঁধে তত' কথার অর্থ বলিয়া দিতেন। রাস মণ্ডলের চারিধারে থাকে থাকে ষোলশ গোপিনী সাজাইয়া মধ্যে শ্রীমতীকে রাখিতেন। তাহার মধ্য হইতে থাক বদলাইয়া শ্রীকৃষ্ণ দুইশত গোপিনী লইয়া নিধুবনে গেলেন, অথচ শ্রীমতী দেখিতেছেন,

যে সেই ষোলশ গোপিনী তাঁহার সম্মুখেই আছে। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রেম-রহস্যের গণিত-রহস্য কুঞ্জ মহাশয় ধীরে ধীরে ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিতেন। সেই সময়, ছোট্ট ছোট ছেলেরা একদিকে দাঁড়াইয়া 'কুঞ্জ খেলার' আর্য্যা বলিত।

দেখ, শ্রীরাস মণ্ডলে ছিল, ষোলশ গোপিনী।
মদনমোহন মাঝে, বামে বিনোদিনী॥
হেথা দুই শত সখী তার পাইয়া ইঙ্গিত,
তমাল কুঞ্জের আড়ে সার আচম্বিত।
রাইকে, মদনমোহন বলে বচন মধুর,
ডেকেছে আমারে মধু মঙ্গল ঠাকুর।
আমি, ঝটিতি আসিব ফিরে সাঙ্গাতি শুনিয়ে,
যেখানেতে যত সখী দেখহ গণিয়ে।
তখন, দলে দলে রাখি সখী রাধিকা গণিল,
চৌদিকে চৌশত দেখি ষোলশ বুঝিল।
হেথা বুঝিয়া লইল রাই সব সখীগণে;
দুই শত লয়ে কানু গেল নিধুবনে।
হোথা কুঞ্জ খেলে গোপীচুরি লীলা চমৎকার।
কুঞ্জ খেলা ভেঙ্গে দিল কুঞ্জ সরকার॥

এখনও তোমরা বেশ মুচ্কি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিতেছ,—কুঞ্জ সরকার ফুটিল না,—তবে তোমাদেরই জিজ্ঞাসা করি, কি ভাবে, কোন্ ছাঁদে, কোন্ ভাবায় কুঞ্জ-সরকারকে ফুটাই বল দেখি?

কুঞ্জ সরকার, সরোবরের কমলিনী নহে; যে ধীর-মলয়-সমীর-সঞ্চারে, গুঞ্জমত্ত-মধুব্রতের ঝঙ্কারে, প্রভাত অরুণের তরুণ কিরণে, ধীরে, ধীরে, তাহাকে ফুটাইতে থাকিব; সরোবরের ঘাটও নহে;—যে আগ্রীব-নিমজ্জিতা অর্দ্ধাবগুণ্ঠন-গুণ্ঠিতা, দ্বাদশী, চতুর্দ্দশী, ষোড়শী, পূর্ণিমা বা অমাবস্যার চাঁদের হাট ঘাটে আনিয়া বাপীকুল প্রস্ফুটিত করিব। জল ছাড়িয়া স্থলে চল;—কুঞ্জ সরকার বেলি চামেলি নহে; যে শ্বেত শোভায় হাসিতে হাসিতে সন্ধ্যা-সমীরণে দুলিতে দুলিতে,—ফুটিয়া উঠিবে। রাজ পথের ধারের দ্বিতল ভবনের বিস্তৃত গবাক্ষ নহে; যে কোলের ছেলে ফেলিয়া রাখিয়া, উনুনের হাঁড়ি আধ-সিদ্ধ নামাইয়া, মুক্ত-বেণী, যুক্ত-বেণী, যুবতীগণকে ঘোমটা খুলিয়া, লজ্জা উড়াইয়া,

দলে দলে আনিয়া দিব; আর শতদলে উৎপল ফুটিতে থাকিবে। স্থল ছাড়িয়া অন্তরীক্ষে। কুঞ্জ সরকার আকাশের রাঙ্গা মেঘে ভাঙ্গা রোদের খেলা নহে; যে পশ্চিম দিক পরিব্যাপ্ত করিয়া রাশি রাশি শিমুল, পারুল ফুটাইব। সাগরতীরের সন্ধ্যাকালের নক্ষত্র নহে, যে একটি করিয়া মিটি মিটি, সরমের দিঠির মত, সেজুতির দেউটির মত, নীরবে ফুটিতে থাকিবে। কুঞ্জ সরকার সীতাকুণ্ডের জল নয়, যে টগ্‌বগ্‌ করিয়া,—তুবড়ির বাজী নহে, যে, ফর্‌ ফর্‌ করিয়া,—ফুটিয়া উঠিবে।

কিন্তু মানুষত ফুটিয়া উঠে? কুঞ্জ সরকার কেন সেই রূপেই ফুটুক না? তাহাও অসম্ভব। কুঞ্জ সরকার স্বামী সমীপে প্রথম সমাগতা, নব-বিবাহিতা তরুণী নহে; যে দুরু দুরু বুকে, অবনত মুখে, ধীরে ধীরে বসিয়া, লীলা হেলায় বস্ত্রাঞ্চল টানিতে টানিতে, সরমের আঁখি, মরমের সখার দিকে উন্মীলিত করিতে করিতে, বনান্তরালের বন-মল্লিকার মত মৃদু মৃদু ফুটিতে থাকিবে। কুঞ্জ সরকার বাগ্বিদ্যাবিশারদ বাগ্মী নহে; যে বঙ্গবাসিনী ব্যভিচারিণীর উপর সমাজের বিপুল যাতনা বর্ণন করিয়া, হিন্দু জাতির তুষানল ব্যবস্থা করত, হিন্দু শাস্ত্র সকলকে কলিকাতার কসাই টোলার চীনাম্যানদের বিপণিতে উপানতের আবরণ উপকরণে পরিণত করিয়া, চোগা দোলাইয়া, বক্ষ ফুলাইয়া, দক্ষিণে হেলিয়া, ঊর্দ্ধ হস্তে, লম্বকণ্ঠে, বালক যুবকের খর করতালে, দুলিতে দুলিতে উৎকট বিকট ভাবে ফুটিতে থাকিবে। না কুঞ্জ সরকারকে নীরবে, সরবে, গৌরবে, সৌরভে—কোন রূপেই ফুটাইতে পারিতেছি না।

ব্যক্তিবিশেষও বায়ুবিশেষে ফুটিয়া থাকে। ডফ্‌ ফুটিলেন, হেমনাথ বসুর পালায়; ফীয়ার ফুটিলেন, কালী বন্দ্যোর জালায়। বীডন ফুটিলেন, মহামারীর কটকে; ইডেন ফুটিলেন, পাদরিণীর চটকে। নরেশ ফুটিলেন, শালগ্রামে; রমেশ ফুটিলেন গুণগ্রামে। যতীন্দ্র ফুটিলেন ৯ আইনে; সুরেন্দ্র ফুটিলেন বে-আইনে। শিবপ্রসাদ ফুটিলেন কৃতাঞ্জলিতে; ভূদেব ফুটিলেন পুষ্পাঞ্জলিতে। টম্‌সন্‌ ফুটিলেন ফিরিঙ্গি নাটে; রীপণ ফুটিলেন, কঙ্করডাটে। কিন্তু এরূপ ফুটনও ত কুঞ্জ সরকারের ঘটিবে না।

আর ফুটাইবার যে ব্রহ্মাস্ত্র, ব্রহ্মার বরেই হউক, আর দুর্ব্বাসার শাপেই হউক, ঐ দুইটার মধ্যে একটা কারণ অবশ্য হইবে, কুঞ্জ সরকারে তাহা খাটে না। ফুটনকারিণী রমণীগণের সহিত কুঞ্জ সরকারের চির বিরোধ, স্থায়ী বিরোধ; এবং সুমেরু কুমেরু ভেদ। অভাগা কুঞ্জ মহাশয়কে ফুটান

মহাশয়। রূপ থাকুক, আর নাই থাকুক, যদি একজন যেমন তেমনও যুবতী সরকারিণী—আনিয়া অর্দ্ধ রাত্রে বীজনী হস্তে কুঞ্জ সরকারের পাশে বসাইয়া, বলাইতাম "তুমিত রহিলে পড়োর পাল লয়ে, এখন মেয়ের বিয়ের কি হবে বল দেখি, শত্রুর মুখে ছাই দিয়া, বিরাজকে যে আর রাখা যায় না;" আর আমরা সেই সময়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পট তুলিতে পারিতাম, তবে দেখিতে কুঞ্জ সরকার ফুটিত কি না ফুটিত?

তাও না হইয়া যদি মহাশয়কে, কলির সত্যবান করিয়া একজন সাবিত্রী আনিয়া প্রান্তরস্থিত ভাঙ্গা ঘরে আধুনিক পশুপতি সংবাদ যাত্রার সাবিত্রী চতুর্দ্দশীর পালার উদ্যোগ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে, ফুটুক আর না ফুটুক, ফুটিবার বাতাস ত লাগিত। যদি সেদিকের পন্থা থাকিত, তবে ঐ বৃহৎ রাঢ় অঞ্চলে, তেমন ডাঁট থাট না হউক, একটা ভাঙ্গাচুরা গিরিজায়া আনিয়াও কি সেই কোমল হস্তের সাময়িক সম্মার্জ্জনীর অবতারণা করিয়া কুঞ্জ সরকারকে একরূপ দিগ্বিজয় ফুটন ফুটাইতে পারিতাম না? না, সে দক্ষিণ দিকের মলয় বাতাসের পন্থা গুরু মহাশয়ের আটচালায় নাই। আমাদের কুঞ্জ সরকার ফুটিবে না, নাই ফুটিল। তোমরা কিছু সত্য সত্য বয়সের দায়ে সলমনের কীর্ত্তি প্রয়াসী নহ, তবে আধ-ফুটন্ত তাচ্ছিল্য করিবে কেন?

হনুমান চরিত।

বৃন্দাবন মথুরার যমুনা কিনারে
দলে দলে ফিরে হনুমান;
ঘাটে ঘাটে থানা দিয়া, থাকে পথ আগুলিয়া
বাহির করিয়া দন্ত বিকট আকারে,
দেখি ভয়ে উড়ে যায় প্রাণ।

তুলিয়া লাঙ্গুল কেহ ভ্রমে ইতস্তত
শান্ত শিষ্ট বিজ্ঞের মতন;
নষ্টবুদ্ধি দুষ্ট খল, যুবক শাবক দল,
মারামারি কিলোকিলি করে অবিরত;
নাহি ডরে না মানে বারণ।

পাগল করিয়া তোলে তীর্থ-যাত্রিগণে,
হাতের সামগ্রী কাড়ি খায় ;
লয়ে ছাতা জুতা ছড়ি, গাছের উপরে চড়ি,
করে কত রঙ্গ ভঙ্গ যাত্রিদের সনে ;
ব্যস্ত সবে বানরের দায়।

তাহাদের অত্যাচার করি দরশন,
মথুরার রক্ষ সৈন্য যত
ব্রহ্মাস্ত্রে পূরিয়া গুলি, মারিল কতক গুলি,
কাহার লাঙ্গুল কাণ করিল কর্ত্তন ;
ধরে লয়ে গেল শত শত।

উঠিল তাহাতে গোল, ক্রন্দনের মহারোল ;
হাহাকার বানর সমাজে ;
কেহবা রাগের ভরে, দন্ত কিড়ি মিড়ি করে,
কেহ লম্ফ দেয় মাঝে মাঝে।

সবে মিলে গালি পাড়ে, বকে আর মাথা নাড়ে,
রাগে যেন পাগলের প্রায় ;
হুঙ্কার গর্জ্জন করি, ভীম গদা হাতে ধরি,
মার মার রবে কেহ ধায়।

ফুলাইয়া বীর দেহ, চেঁচাইয়া বলে কেহ,
"কার সাধ্য আমাদের মারে !
সাজ সবে সাজ রণে, মার রক্ষ সৈন্য গণে,
তাড়াইয়া দেও সিন্ধু পারে।

কেন পর অধিকারে, আসে তারা বারে বারে,
কেন করে গুলি বরষণ ?
আমরা রামের চর, নহি পরাধীন নর,
রাক্ষসের মানি না শাসন।"

শুনি তার মুখে জ্বলন্ত বচন
উঠিল জ্বলিয়া শাখামৃগগণ,

ঘোর আস্ফালন, মহা আন্দোলন,
কোলাহলে কর্ণ ফাটে;
জয় জয় রাম বলিয়া সকলে,
বাহির হইল সাজি দলে বলে,
জ্বলি ক্রোধানলে, নানা কথা বলে,
বসি যমুনার ঘাটে।

এমন সময় জনেক সুধীর,
অঙ্গদ নামেতে কোন মহাবীর
কহে মৃদু স্বরে, কৃতাঞ্জলি করে,
দাঁড়াইয়া সভাস্থলে;
"শুন ভাই সবে, ক্ষান্ত হও রণে,
করিও না দ্বন্দ্ব রাক্ষসের সনে,
মোরা রাম ভক্ত, ধর্ম্ম অনুরক্ত
জানে সবে ভূমণ্ডলে।

পরম ভকত পবন-নন্দন
যাঁহার প্রতাপে কাঁপিত ভুবন,
আমরা বানর, তাঁরি বংশধর,
নাহি জানি হিংসা দ্বেষ;
ফলাহার পুণ্যে কাটি মায়াজাল
ধর্ম্মপথে সুখে রব চির কাল,
হয়ে ক্ষমাশীল, প্রেমিক সুশীল,
করিব জীবন শেষ।"

জাম্বুবান নামে যুবক জনেক লম্ব-লেজ দন্তমান;
তাহার বচন শুনিয়া অমনি হইল দণ্ডায়মান।
করি বক্র গ্রীবা প্রসারিত বক্ষ, খাড়া করি দুই কাণ;
কহে রোষভরে তুলি দুই বাহু আছাড়ি লাঙ্গুল খান।
"কেন হব মোরা রাক্ষস-অধীন পরিহরি আত্মাদর;
কিসের ভাবনা? কারে এত ভয়? নহি মোরা ভীরু নর?
আমাদের কুলে লইয়া জনম রাক্ষস হইল যারা;
বৃদ্ধ পিতামহ আত্মীয় স্বজনে নাহি মানে এবে তারা।
বানর পুরাণে ডারুইন ঋষি লিখিয়াছে যে বারতা;
হায় রে কপাল! হবে কি সে সব, কেবল কথার কথা।

বনের বানর হইয়া আমরা রহিব কি চিরকাল?
যারা আমাদের নাতিপুতি জাতি তারা হবে মহীপাল?
স্বজাতির দুঃখ করিব মোচন রাক্ষসে করিব দূর;
ত্রেতার মতন সাগর লঙ্ঘিয়া যাব আমি লঙ্কাপুর।
বিভীষণে গিয়া বিনয়ে জানাব রাক্ষস-রীতির কথা;
তিনি রামভক্ত ন্যায়-অনুরক্ত অবশ্য ঘুচাবে ব্যথা।”
এতেক কহিয়া বাহিরিল যুবা সাহসে করিয়া ভর;
উত্তরিল গিয়া সেতুবন্ধ পারে সেই সিংহল নগর।
স্বর্ণপুরী শোভা দেউল দেউটি দেখিয়া হরিল জ্ঞান,
ভুলি বৃন্দাবন আপন ভাবনা ভাবিল করিল ধ্যান।
কালা মুখে চুণ মাখিয়া নিপুণ ঢাকিল বানর ছাঁদ,
রাক্ষসের বিদ্যা শিখিতে লাগিল ঘুচাতে বানর-বাদ।
শিখিয়া তথায় রাক্ষসের ঠাট বাঁধিলেক চূড়া ধড়া;
রাক্ষসি ভোজনে রাক্ষসি বসনে হইল মেজাজ চড়া।
খেতো পাতালতা ছোলা কলা শশা জাতির প্রথার মত;
ছাড়িয়া সে সব হইল এখন মদিরা গোমাংসে রত।
স্বদেশের রীতি স্বদেশের নীতি রহিল না কিছু আর;
সকলি ফিরিল, কিন্তু কোন মতে ফিরিল না মতি তার।
ধরি নববেশ নবীন আকার দেশে এল জাম্বুবান;
নাহি আর ভয়, বানর সমাজ পাইবে এবার ত্রাণ।
আসি বৃন্দাবনে লাগিল ছাড়িতে নব নব উপদেশ;
বানর বানরী ভয়ে সুশঙ্কিত দেখি তার নব বেশ।
রাক্ষস মতন আকার প্রকার করি সবে দরশন;
ভাবিল মনেতে করিবে আবার গোলাগুলি বরিষণ।
বানর কটক তুলিয়া লাঙ্গুল পলাইল উভরড়ে;
সেই গণ্ডগোলে পশিল রাক্ষস হাহাকার ধ্বনি পড়ে।
হেরে জাম্বুবানে বানর-রাক্ষস রাক্ষসের হর্ষ অতি,
শিকলে বাঁধিল মঞ্চে বসাইল জাম্বুবান হৃষ্ট মতি।
বানর-রচিত বানর চরিত বানরে শুনিল যবে,
হাসে খিলি খিলি, করে কিলোকিলি বানরে বানরে তবে।

নবজীবন।

১ম ভাগ। } আশ্বিন। ১২৯১। { ৩য় সংখ্যা।

ব্রততত্ত্ব।

ব্রত শব্দের অর্থ নিয়ম। অর্থাৎ যে রূপ নিয়ম স্বেচ্ছাক্রমে ব্যক্তি কর্ত্তৃক অবলম্বিত হয়। রাজাজ্ঞা, গুরুজনের আদেশ কিম্বা নৈসর্গিক নিয়ম, ব্রত পদে বাচ্য নহে। এই সকল নিয়মও ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে স্বেচ্ছা কি স্বানুবর্ত্তিতার স্থল নাই; এই নিমিত্তে তাহাতে স্বভাবত কোন ব্রত পালন হয় না। এই প্রবন্ধে কোন ব্রত বিশেষের কথা নাই; নির্দ্দিষ্ট কালব্যাপী হউক কিম্বা জীবনব্যাপী হউক সকলব্রতেরই সাধারণ লক্ষণ কএকটির সমালোচনা করা যাইবে। ভরসা করি ঐ সকল লক্ষণ অনুসারে শাস্ত্রোক্ত বিধানের সারবত্তাও হৃদয়ঙ্গম হইবে।

কি উদ্দেশে ব্রত করা কর্ত্তব্য, করিলে কি ফলোদয় হইতে পারে এবং ইহার জন্য কি কি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক এই সকল কথা, সমাজ, সুখ এবং নিয়ম নামক তিনটি বিভাগে প্রদর্শিত হইবে। প্রথমত পাঠক দেখিবেন যে সমাজ সংক্রান্ত নৈসর্গিক নিয়মানুসারে মনুষ্যের কর্ত্তব্য নির্ব্বাহের একটি নিয়ম, পরার্থপরতা। দ্বিতীয়ত দেখিবেন যে ব্যক্তিগত ধর্ম্মানুসারে সুখ সাধনের নিয়ম বিভিন্ন; ব্যক্তিগণ পরার্থপরতা বিহীন না হইয়াও অপেক্ষাকৃত প্রবলতররূপে স্বার্থপরতারই বশবর্ত্তী হন। অনন্তর এই প্রশ্নের উদয় হইতেছে যে এই স্বাভাবিক বৈষম্য নিবারণের সদুপায় কি? পরিশেষে প্রদর্শিত হইবে যে প্রস্তাবিত সদুপায় অর্থাৎ কর্ত্তব্যপালন ও সুখ সাধন বিধির একমাত্র সমবায়ী ব্যবস্থা—ব্রত। হিন্দুধর্ম্মানুসারে প্রথমত যাগ—পরে যোগ, অনন্তর পূজা, ধ্যান ও জপের বিধান করিয়া সর্ব্বশেষে ব্রতের নিয়ম

প্রচলিত হইয়াছে। অতএব ব্রতগুলি ঘৃণিত অবলাগণেরই উপযুক্ত মনে না করিয়া উহার সার মর্ম্ম উপলব্ধি করাই যুক্তি সঙ্গত।

৯। সমাজ।

মানুষ লোকালয়ে ভিন্ন বাস করিতে পারে না; করিলে মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় না। লোকালয়, কেবল লোক এবং আলয়ের সংযোগ নহে। আলয় শব্দ গৃহ, নগর, রাজ্য, পৃথিবী আদি নানা জড় পদার্থের বাচ্য বটে; এবং লোক শব্দও মনুষ্যের বহুত্ব জ্ঞাপক বটে। কিন্তু লোকালয়ে লোকের আলয় ছাড়া আর কতকগুলি বিষয় দৃষ্ট হইবে। লোকালয়ে মনুষ্য পরম্পরার সম্বন্ধ বিশেষ, এবং সম্বন্ধ মনুষ্যাদির সহিত আলয় বিশেষের সংযোগ—এই অতিরিক্ত বিষয় গুলি উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলত একাধিক মনুষ্যের অসম্বন্ধ অবস্থা কিরূপ তাহা মনে না করিলে তদিতর সমাজ নামক সম্বদ্ধ-মনুষ্য জ্ঞাপক পদার্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে না। এখানে অগত্যা কেবল সম্বদ্ধ মনুষ্যের আলয়েরই আলোচনা করা যাইবে; অসম্বদ্ধ মনুষ্য সমূহের আলয় কিরূপ হইতে পারে তাহা, পাঠক মনে মনে চিন্তা করিয়া বুঝিবেন।

উপরে লোকালয় শব্দে সম্বন্ধ বিশিষ্ট বহু ব্যক্তির আলয় বলিয়া ব্যক্ত করা গিয়াছে। বস্তুত ইহাতে আরো কএকটি কথা লক্ষিত হইবে। একাধিক ব্যক্তির সম্বন্ধ-বিশেষ দ্বারা পরিবার সৃজন হয়, লোকালয় আবার সেইরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট পরিবার সমূহের সমাবেশ। সমিতি নামক সম্বদ্ধ বক্তিগণ সমাজ পদে বাচ্য বটে কিন্তু কেবল সমিতি হইতে লোকালয় সংস্থাপন হয় না। লোকালয় বুঝিবার জন্য পরিবার নামক পদার্থ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক এবং পরিবার কাহাকে বলে তাহা বুঝিবার জন্য বিবাহিত এবং অবিবাহিত দম্পতি আদি সমাজ-শরীরের নমুনা পর্য্যবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

জীব জড়পদার্থ হইতে বিভিন্ন; জীবের বর্দ্ধন, ক্ষয় ও মৃত্যু আছে, জড় পদার্থের তাহা নাই। তদ্ভিন্ন জীবমিথুন হইতে জীবের উদ্ভব এবং সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই স্থলেই প্রথমত সংযুক্ত জীবের সূচনা দৃষ্ট হইতেছে। সন্ধিনী * শব্দ সচরাচর প্রচলিত নাই কিন্তু উহাতে জীবমিথুনের সংযোগ

---

* সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে কৃষ্ণ জ্ঞান মানি। ইত্যাদি।
চৈতন্য চরিতামৃত। মধ্যম খণ্ড। ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এবং গর্ভ ও ভ্রূণের সংযোগ—এই দ্বিবিধ সন্ধির শক্তি ব্যক্ত করে। এই শক্তি ব্যতিত জীবের সত্তা থাকে না। কিন্তু সন্ধিনীশক্তির ক্রিয়াদ্বয় উভয়ই জীবধর্ম্মাক্রান্ত অর্থাৎ মনুষ্যধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন। গর্ভস্থ সন্তান জীবধর্ম্মানুসারে মাতৃদেহ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশ পৃথক ভাব অবলম্বন করিতে থাকে। কিন্তু মনুষ্য এই পার্থক্য সত্ত্বেও অন্যান্য কারণ সহযোগে মাতার সহিত ক্রমশ বরং দৃঢ়তর সম্বন্ধেই সংযুক্ত হইয়া থাকেন, এমন কি জগদীশ্বরীর সহিত যথা-যোগ্য সামীপ্য প্রকাশ স্থলে তাঁহার প্রতি মাতৃ সম্বোধন অপেক্ষা আর কিছুই উপযুক্ত মনে হয় না। ইহাতে বুঝা যাইবে, জীবমিথুন যে জীবধর্ম্ম পালন করে, মনুষ্য তাহার উপরে অন্যবিধ গ্রন্থি স্থাপন দ্বারাই এক অপূর্ব্ব ভাবের সূত্রপাত করেন।

ফলত দম্পতির স্থায়ী সম্বন্ধ হইতেই পতি-পত্নীর সমাজ, আর সন্তান ও জননীর স্থায়ী সম্বন্ধের উপর জনয়িতার সংগ্রহ হইলেই পরিবারের সৃষ্টি হয়। স্ত্রী-পুরুষ যে সংকল্প করিয়া এই সকল সম্বন্ধ সংঘটন করেন, তাহারই নাম বিবাহ। পরিবারে জীবধর্ম্ম সমস্তই বিদ্যমান থাকে কিন্তু তদতিরিক্ত নানাবিধ উৎকৃষ্ট নিয়ম আশ্রয় করে; এবং সেই সকল নিয়ম এমন মনুষ্যত্বজনক, যে তাহা সমগ্র জীবধর্ম্মকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিতে পারে। বানপ্রস্থ তাপস তাপসী বিবাহ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতেন। পোষ্যপুত্র দত্তক গ্রহীতার সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে জীবধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া ঔরস-পুত্রের অভাব মোচন করেন। এতদ্ভিন্ন একটি অভিনব ইউরোপীয় মত প্রচার হইয়াছে তদনুসারে যাঁহারা রোগ বা দৈন্য হেতু সন্তান উৎপাদনের অযোগ্য তাঁহারাও চির ব্রহ্মচর্য্য সংকল্প করিয়া বিবাহ করিতে পারেন, এবং পোষ্যপুত্র বা পোষ্য পুত্রীর দ্বারা এমন পরিবার রচনা করিতে পারেন যে, তাহাতে জীব-ধর্ম্মের সংস্পর্শ এককালে অন্তর্হিত না হউক, নিতান্ত সংকীর্ণ হইয়া যাইবে। এই সকল কথা সবিস্তর চিন্তা করিলে জীবমিথুন এবং নরপরিবারের মধ্যে ইতর বিশেষ কি তাহা ব্যক্ত হইবে। যাঁহারা পারিবারিক বিধান মধ্যে এই বিভিন্ন লক্ষণ কিছুমাত্র দেখেন নাই কিম্বা তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ লক্ষণের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই; তাঁহাদিগের সমীপে বেশি কথা বলা বিফল।

অনন্তর পাঠক দেখিবেন, যে কেবল স্ত্রী-পুরুষ এবং সন্তান এই তিন বস্তু লইয়াই পরিবারের সংগঠন হয় না। আমি এখানে একান্নবর্ত্তী পরিবার বা সপিণ্ডবর্গের কথা তুলিব না। কিন্তু প্রতি পরিবার মধ্যে

একটি বংশানুক্রম আছে,- তাহা বিভিন্ন বিষয়। যে কোন পরিবার বল তাহার একজন আদিপুরুষ ধরিয়া বংশনাশ হইবার সীমা পর্য্যন্ত গণনা করিলে যতগুলি মনুষ্য হয় তাহাদিগেরও এক সম্বন্ধ অবস্থা আছে। এই সম্বন্ধ অবস্থা একবস্তু, এবং তাহার অন্তর্গত পুরুষ পর্য্যায় অপর একবস্তু; আর যে প্রণালি দ্বারা এই দ্বিবিধ বস্তুর ক্রমসাধন হয়, যাহা দ্বারা ঐ সকল পুরুষ পরম্পরার সম্বন্ধ প্রতিপালিত হয়, তাহা আর এক পদার্থ। আমি সেই প্রণালিকে বংশানুক্রম বলিতেছি। পরিবারস্থিত ব্যক্তিগণ জীবিতাবস্থাতে যে সম্বন্ধ ধারণ করেন, আর তাঁহাদিগের পুরুষানুক্রম দ্বারা যে সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়, এই দুটি বিভিন্ন সম্বন্ধ। ইহার মধ্যে বিস্তর বৈলক্ষণ্য আছে। একটিতে মনুষ্যের জমাট ভাব জন্মে আর একটি প্রণালি দ্বারা জমাট মানুষ কাল প্রবাহে সন্তরণ করে। করিয়া, আর এক প্রকার সংযুক্ত রূপ ধারণ করে। একটি সম্বন্ধ মৃত্যু পর্য্যন্ত থাকে, আর একটির দ্বারা মনুষ্য মৃত্যুকে পরাজয় করে। পরিবারাশ্রিত জমাট-ব্যক্তিগণের বিয়োগ দ্বারা পরিবার বিনষ্ট হয় না; কেন না এক পুরুষের পরে পুরুষান্তর আবির্ভূত হয়। কেবল বংশাভাব হইলে পরিবারের জীবন বিলুপ্ত হয়। অতএব পরিবারের জীবন অতি দীর্ঘকাল ব্যাপী বটে। আর পোষ্য পুত্রের প্রকরণ অবলম্বন স্থলে উহা অনন্তব্যাপী বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সমাজ-জীবনে এই নিয়ম অপেক্ষাকৃত প্রগাঢ় রূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে।

জন্ম, বর্দ্ধন, জনন,ক্ষয়, মৃত্যু এই কএকটি বিষয় মধ্যে জীবধর্ম্ম এবং মনুষ্য ধর্ম্মের যে ভেদ আছে তাহা প্রদর্শিত হইল। পরিবার-শরীরে তদ্ভিন্ন আরও কএকটি বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হইবে। নরমিথুন জীবধর্ম্ম পালনান্তেও যে সংযুক্ত থাকে তাহার মহৎ উদ্দেশ্য পরস্পরের সাহায্য। ইহাই সমাজ-শরীরের মূলীভূত কথা। এবং ইহাতেই আবার সামীপ্য সাযুজ্য আদি গুরুতর কথার সূচনা হইয়া থাকে। মনুষ্য জীবের ন্যায় আহার করে, কিন্তু সকল জীব মনুষ্যের ন্যায় খাদ্য আহরণ করে না। মনুষ্যের আর একটি বিশেষ ধর্ম্ম এই যে দেহ আচ্ছাদনের উপায় না করিলে চলে না। আর কেবল গ্রাসাচ্ছাদন নহে; দিবা রাত্রি এবং ঋতুপরিবর্ত্তন বিষয়ক সমস্ত নৈসর্গিক নিয়মের জ্ঞানার্জ্জন এবং সেই জ্ঞানের উপযোগী ব্যবস্থা করাই মনুষ্যবর্গের প্রধান কার্য্য। পরিবার রূপ সমাজ এই সকল কার্য্যের অনুরোধে আবদ্ধ থাকিয়া গৃহ

সংস্থাপন করে। কিন্তু কেবল গৃহদ্বারা সকল প্রয়োজন সুসিদ্ধ হয় না। এইজন্য নানা পরিবার একত্রিত হইয়া নগর ও রাজ্য ইত্যাদি লোকালয় সংস্থাপন করে। অতএব পাঠক এখন বুঝিতে পারিবেন যে সম্বন্ধ মনুষ্য, জীব এবং ব্যক্তি হইতে কত বিভিন্ন। এই সকল পদার্থের পর্য্যায়গুলি উত্তম রূপে উপলব্ধ না হইলে ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য বিধান নির্ণয় করা অসাধ্য।

ইদানিন্তন সমাজ-তত্বের আলোচনা হেতু নগর রাজ্যাদি সংক্রান্ত নানা কথাতে বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রণালি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রণালীতে সর্ব্বাগ্রে পারিবারিক সমাজের মর্ম্মগ্রহ হওয়া আবশ্যক। তদ্ভিন্ন নগর রাজ্যাদি বৃহত্তর সমাজের বিধান হৃদয়ঙ্গম করা অসাধ্য। মনুষ্য যদি কেবল পারিবারিক সমাজ দ্বারা স্বকীয় কার্য্য সমস্ত উদ্ধার করিতে পারিত, তাহা হইলে নগর বা রাজ্যের আবশ্যকতা থাকিত না। ফলত প্রথমত পারিবারিক নিয়মে সমাজ স্থাপন করিতে গিয়াই একান্নবর্ত্তী পরিবার, সপিণ্ড, জ্ঞাতি, গোত্র এবং গ্রাম আদি সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমশ অন্যান্য সামাজিক অভাব ব্যক্ত হইয়া অন্যবিধ সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে। এসকল বিষয়ে সম্যক আলোচনার স্থান নাই। তবে চিন্তার সন্ধি প্রদর্শনার্থ কএকটি কথার উল্লেখ করা যাইতেছে। বংশবৃদ্ধি সহকারে পরিবারের ভেদ ও সাধারণত আজ্ঞাদাতা আজ্ঞাকারীর সম্বন্ধ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট এবং সমান এই ত্রিবিধ অঙ্গ স্থাপিত হয়। তদ্ভিন্ন ঐ সূত্রে ভাষার উৎপত্তি হইয়া থাকে, আবার ভাষার বিস্তার হেতু বিভিন্ন পরিবারের সমাগম হয়। চতুর্থত মনুষ্য পরম্পরার সহযোগ হেতু উপজীবিকার প্রভেদ হইয়া থাকে। আদিম অবস্থায় কখন মৃগয়া কখন পশুপালন এবং কখন বা সামান্য কৃষি কার্য্য দ্বারা নর সমাজের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অগ্রে বল পূর্ব্বক অপহরণ এবং তদনন্তর শ্রমই মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন হয়। আর কৃষিজাত দ্রব্য সংগ্রহ করিতে শিখিলে পরে শ্রমজাত শিল্পাদির উদ্ভব এবং বাণিজ্যের সৃষ্টি হয়। সমাজ শরীরের পরিবর্দ্ধন বলিতে প্রধানত উল্লিখিত ভেদ ও পরিবর্ত্তন সমূহ বুঝিতে হইবে। নতুবা পারিবারিক ধর্ম্মের উচ্ছৃঙ্খলতা হেতু মনুষ্য জাতির মধ্যে যে বংশ বৃদ্ধি হয় তাহা দ্বারা সমাজশরীরের প্রকৃত পরিবর্দ্ধন হয় না। সে যাহা হউক, আর একটি পদার্থ দ্বারা সমাজশরীর পারিবারিক সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া লোকালয় নামে অবতীর্ণ হন। সেই পদার্থ—গমনাগমনের উপায় বিশিষ্ট

ধরা-পৃষ্ঠ—অর্থাৎ নগর। নগর ব্যতীত প্রকৃত লোকালয়ের উৎপত্তি হয় না; ঊর্দ্ধপক্ষে উহা কেবল বৃহদাকার পরিবার মাত্র হইয়া থাকে। যেমন ভাষা দ্বারা মনুষ্যগণ পরস্পরের মন আয়ত্ত করে, সেইরূপ নদী এবং বর্ত্মাদির দ্বারা বিভিন্ন পরিবারের সমাগম সুসিদ্ধ হয়। আর ভাষা দ্বারা এবং শ্রমশোভিত আলয় সংযোগে মনুষ্যের জমাট ভাব পরিবর্দ্ধিত হইয়া সেই উপায় দ্বারাই আবার সমাজশরীর অবিচ্ছিন্নরূপে কালব্যাপী হইতে থাকে। অনন্তর এই সঙ্গে রেলরোড ও তাড়িত বার্ত্তাবহের কথা চিন্তা করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, লোকালয়ে পরস্পরের সামীপ্য সাধন কি মহৎ কার্য্য এবং উহার সহিত সমাজশরীরের পরিবর্দ্ধন আর সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি কেমন সংসৃষ্ট।

এত বাহুল্য কথাতে কেবল এইমাত্র প্রদর্শন করিলাম যে, অন্য জীব এবং মনুষ্য মধ্যে যেমন তারতম্য আছে, মনুষ্য এবং সমাজ মধ্যে আর সমাজান্তর্গত পরিবার, নগর এবং রাজ্য মধ্যেও তদনুরূপ ইতরবিশেষ মানিতে হইবে। (কেহ কেহ এপর্য্যন্তও বলেন যে রাজ্য পরম্পরা কোন প্রকারে সুসম্বদ্ধ হইলে ভবিষ্যতে সমগ্র মনুষ্যবর্গের একত্ব সংস্থাপন হইতে পারিবে।) ফলত প্রাগুক্ত বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন নিয়ম অবগত হওয়া আবশ্যক, তদ্ভিন্ন ব্যক্তিগণ কি কি নিয়মের বশবর্ত্তী তাহা বোধগম্য হইতে পারে না। পরন্তু নানাবিধ সমাজের স্ব স্ব ধর্ম্ম যেরূপ হউক সর্ব্বসমাজের মূলীভূত ব্যবস্থা একমাত্র পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কি পারিবারিক, কি নাগরিক, কি রাজ্যব্যাপী, যে কোন সমাজ হউক সর্ব্বত্র সকলকেই পরস্পরের সাহায্য প্রতীক্ষা করিতে হয় *। কিন্তু আমাদিগের হিন্দুসমাজে ইহার বিরোধী কতকগুলি কথা প্রচলিত আছে। তাহার বিস্তারিত সমালোচনা করিবার অভিপ্রায় নাই, কেবল তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। বানপ্রস্থ তপস্বীগণ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক দেশ দেশান্তরে বিচরণ করিতেন, তদ্দ্বারা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সম্বন্ধ

---

* বিচার শৃঙ্খলার বিচ্ছেদ হইবে বলিয়া পারিবারিকধর্ম্ম বিহীন কতকগুলি সমাজের উদাহরণ দিতে পারি নাই কিন্তু তাহার পর্য্যবেক্ষণ না করিলে প্রস্তাবিত বিষয়ের মর্ম্ম বিশদরূপে ব্যক্ত হইবে না বলিয়া বলিতেছি যে কোম্পানি, সমিতি, আখড়া, পার্লিয়ামেণ্ট, সেনা ইত্যাদি সমাজ সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহা পরিবার লক্ষণ প্রসূত নহে। কি পারিবারিক ধর্ম্ম বিশিষ্ট সমাজ কি তদ্বহির্ভূত সমাজ সর্ব্বত্রই পরস্পরের সাহায্য বিদ্যমান থাকে।

সংস্থাপন হইত। কিন্তু অনুমান হয় যে এক সময়ে এই নিগূঢ় অভিসন্ধি কোন প্রকারে বিলুপ্ত হইয়া যতিধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকিবে; হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম, আশ্রম পর্য্যায় মধ্যে চতুর্থ পদ হইতে স্থান ভ্রষ্ট হইয়াছে। বোধহয়, সেই অবধিই যতিধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সচরাচর এইরূপে ব্যক্ত হইয়া আসিতেছে,যে ব্যক্তিগণের সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন হইতে চেষ্টা করাই বিধেয়। তপস্যা ও কৃচ্ছ্রব্রত অবলম্বন করিলে পরিবার, লোকালয়, অর্থ, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, কিছুরই প্রয়োজন থাকিবে না এবং যতি স্বাধীনভাবে জীবন ধারণ পূর্ব্বক অনন্যচিত্তে ঈশ্বরারাধনাতে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন। এই কথাতে কোথাও এরূপ বিন্দুমাত্র প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না যে, যতিধর্ম্মের উন্নতি সাধনার্থ গৃহস্থ-ধর্ম্মের ক্ষয়সাধন করা বিধেয়। ঐ দ্বিবিধ ধর্ম্ম-সক্রান্ত যে সকল গূঢ় কথা আছে তাহা প্রকাশ করিবার স্থল নাই তথাচ এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুধর্ম্মানুসারে গৃহস্থ-ধর্ম্ম কখনই অবজ্ঞার যোগ্য নহে। প্রত্যুত উল্লিখিত সমাজ বিষয়ক নৈসর্গিক নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিলে ব্যক্ত হইবে যে, গৃহস্থাশ্রমই সমাজের প্রধান অবলম্বন। এবং শাস্ত্রেও এই কথার উল্লেখ দেখা যায়। অতএব যতিধর্ম্মের যদি কোন মাহাত্ম্য থাকে তাহা প্রাগুক্ত আশ্রমের শাখা স্বরূপ মাত্র। সেই শাখা বিশেষের প্রতি যতই সমাদর কর তাহার নিমিত্তে পারিবারিক, নাগরিক, রাজ্যব্যাপী কিম্বা জগৎ-ব্যাপী নরধর্ম্মের বিঘ্ন সাধন করা নিতান্তই অকর্ত্তব্য। যেখানে এই নরধর্ম্মের সহিত যতিধর্ম্মের ঐক্য না হইবে সেখানে শেষোক্ত ধর্ম্মকেই ভুল বলিতে হইবে,এবং অন্যান্য ধর্ম্মের প্রাধান্য সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করিতে হইবে। কেননা যেমন দ্রব্যজাতের রাসায়নিক ধর্ম্ম অভাবে জীবধর্ম্ম প্রতিপালিত হইতে পারে না এবং যেমন জীব ধর্ম্মাশ্রিত বংশ পালনাদিকার্য্য ব্যতীত সমাজধর্ম্মের প্রয়োগ হইতে পারে না, সেইরূপ বুঝিতে হইবে যে ভৌতিক নিয়ম, জীবধর্ম্ম এবং সমাজ ধর্ম্ম এই সমস্ত গুলি সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করা আবশ্যক, তদনন্তর যদি কর্ত্তব্য হয় তবে যতিগণের আচরণ বিষয়ক নিয়ম করা যাইতে পারে। ফলত যতিগণ যতই বলুন, মনুষ্য লোকালয়ে ভিন্ন কখনই বাস করিতে পারে না, লোকালয় বিনষ্ট হইলে মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় না। লোকালয়ের নিয়ম পরস্পরের সাহায্য। অর্থাৎ লোকালয়ে, জীবন পরের দ্বারা যাপন করিতে হয়। যে ব্রহ্মচারী মনে করেন আমি অঋণী, আমার জীবন যাপনার্থ কাহারো সাহায্য গ্রহণ করি নাই, করিব না, তিনি নিতান্ত মোহান্ধ।

সমাজের নিয়ম এই বুঝা গেল যে, জীবন পরের দ্বারা যাপন করিতে হয়। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞার অব্যবহিত ফল এই যে, জীবন পরের জন্যে যাপন করা আবশ্যক। কেননা উহ্য বিষয়—অহং পদার্থ—কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে আশ্রয় করিতেছে না। যে পর সেই অহং বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

এখন পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে সমাজতত্ত্ব হইতে কি এক উৎকট কথা উদ্ধার করা গেল। ইহা সুসাধ্য হউক, দুঃসাধ্য হউক কিম্বা এককালীন অসাধ্য হউক এই নিয়ম হইতে অব্যাহতি নাই। ইহা সুখপ্রদ হউক বা ধর্ম্মশাস্ত্রানুগত হউক অথবা উভয়ের বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত হউক কোন মতেই ইহার প্রতি উপেক্ষা করা যায় না। এই কথার প্রতি যদি সন্দেহ জন্মে তবে আমার তর্ক সোপানের প্রধান প্রধান আরোহণস্থল গুলিতে পুনরায় পদার্পণ করিতে পার। করিলে দেখিবে যে মনুষ্য জীবধর্ম্ম অতিক্রম পূর্ব্বক নানাবিধ সমাজধর্ম্মের বশবর্ত্তী হয়েন। সমাজ কেবল জীবিত মনুষ্যবর্গের উপর নির্ভর করে না। পুরুষপরম্পরা এবং পুরুষানুক্রম-আশ্রিত ভাষা, নগর ও লোকালয়ের নৈসর্গিক নিয়ম, তাবৎ ব্যক্তিকেই অবলম্বন করিতে হয়। যতিগণ যাহাই বলুন ঐ সকল নিয়মের অন্যথা করিতে পারিবেন না। জীবন পরের দ্বারা ভিন্ন কখনই চলে না। সুতরাং তুমি যদি পরের জন্যে আপনার জীবন যাপন করিতে অনিচ্ছুক হও, তাহা হইলে কেবল কৃমিগণের ন্যায় পরভাগ্যোপজীবী হইয়া জীবনধারণ করিবে। তাহাতে তোমার দেহ রক্ষা হইতে পারে বটে এবং তোমার বাহ্যিক অবয়বও মনুষ্যের ন্যায় থাকিতে পারে, কিন্তু তোমার মনুষ্যত্ব থাকিবে না, তুমি নিতান্তই পশুত্ব প্রাপ্ত হইবে। তুমি বাল্য বা যৌবনোপার্জ্জিত জ্ঞানরত্নের সাহায্যে যদিও কোন প্রকারে মনুষ্যত্ব রাখিতে পার তথাচ তোমার সেই জ্ঞানরত্ন কখনই নরধর্ম্মানুসারে পরিবর্দ্ধিত হইবে না। বিশেষত সেই জ্ঞান-রত্নই তোমার ভ্রম প্রমাণের স্থল হইয়া থাকিবে। কেননা সেই জ্ঞানরত্ন যে পরের নিকট পাইয়াছ তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না। অতএব তোমার জ্ঞান প্রসূত যতিধর্ম্মই তোমার পরাধীনতার প্রমাণ হইতেছে। আর তুমি অগ্রে সমাজের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া যদি এখন তাহা বিস্মৃত হইবার চেষ্টা কর তবে ইহাই তোমার মনুষ্যত্ব-হীনতার পরিচায়ক হইবে।

ফলত যতিধর্ম্মের সামাজিক উদ্দেশ্য আছে। যতিদিগের নির্ম্মল চরিত্র প্রত্যক্ষ করিলে সকলেই বিদ্যাভ্যাস অভাবেও সদাচার শিক্ষা করিতে পারে।

বস্তুত কেবল গ্রন্থপাঠে বিদ্যাভ্যাস হয় না। গ্রন্থোক্ত সদাচার পরায়ণ হওয়া আবশ্যক এবং তাহার নিমিত্ত আদর্শের প্রয়োজন আছে। যতি স্বশরীরে নারায়ণত্বের আদর্শ হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। যে যতি তাহা ভুলিয়া যান, তিনি কখনই যতি নামে বাচ্য নহেন। সে যাঁহা হউক এই বিভাগের উপসংহার স্থলের কথা পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে—জীবন পরের দ্বারা যাপন করিতে হয়—অতএব উহা পরের জন্যে যাপন করণ বিষয়ে গত্যন্তর নাই। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, লোকালয়ে পরস্পরের সাহায্য করিতেই হইবে; সজ্ঞানে কর, মনুষ্যত্ব রক্ষা হইবে; ইচ্ছা পূর্ব্বক কর সুখ লাভ করিতে পারিবে। অনিচ্ছা পূর্ব্বক কর, আজীবন কষ্ট পাইবে আর সমাজ উচ্ছৃঙ্খলিত হইবে। যে দিকে দেখ সমাজ এবং পরস্পরের সাহায্য বিচ্যুত হইলে নরদেহধারী ব্যক্তি মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে পারে না। ক্রমশঃ কেবল পশুত্বই প্রাপ্ত হয়। তীর্থ অর্থাৎ তপস্যাস্থানে পাপ সংস্পৃষ্ট হইলে আর কোথাও মুক্তিলাভ হইতে পারে না। একথা নিতান্ত অপ্রামাণিক নহে।

অনুশীলন।

প্রথম কথা। স্থূল বৃত্তান্ত।

শিষ্য। অদ্য অবশিষ্ট কথা শ্রবণের বাসনা করি।

গুরু। সকল কথাই অবশিষ্টের মধ্যে। এখন আমরা পাইয়াছি কেবল দুইটা কথা। (১) মানুষের সুখ, মনুষ্যত্বে; (২) এই মনুষ্যত্ব, সকল বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের সাপেক্ষ। এক্ষণে, এই বৃত্তি গুলি কি প্রকার তাহার কিছু পর্য্যালোচনার প্রয়োজন।

বৃত্তিগুলিকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) শারীরিক, ও (২) মানসিক। মানসিক বৃত্তি গুলির মধ্যে কতকগুলির উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জ্জন ও চরিতার্থতাও জ্ঞানার্জ্জনে হয়। যথা,—ধারণা, কল্পনা, স্মৃতি ইত্যাদি। আমি সেই গুলিকে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি বলিব। অথবা যে কথা এক বার ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই যদি তোমার মতে প্রচলিত রাখা উচিত হয়, তবে সেই গুলিকে তুমি বুদ্ধিবৃত্তি বলিতে পার। আর কতকগুলি বৃত্তি আছে। সেগুলির কাজ, কার্য্যে প্রবৃত্তি দেওয়া যথা,—স্নেহ, দয়া, ভক্তি। সে গুলিকে

কার্য্যকারিণী বৃত্তি বলিতে পারি। ইহাদের সম্বন্ধে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নাম পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াছে। *

শিষ্য। Æsthetic কিসের ভিতর পড়িল ?

গুরু। হিসাব মত কার্য্যকারিণীর ভিতর পড়ে। আবার জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি গুলির সঙ্গে সে গুলির এমন সাদৃশ্য আছে, যে সে গুলি হইতে এগুলিকে বিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করে না। যাহাহউক, আমরা অধ্যাত্ম শাস্ত্রের বা কোন দর্শনের অবতারণা করিতেছি না—বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতায় আমাদের কিছুই প্রয়োজন নাই। আমাদের উদ্দেশ্য,—কি হইলে মনুষ্যত্ব লাভ করিব, তাহাই নিরূপণ করা। অতএব যাহাতে সকলে সহজে সে তত্ত্ব বুঝিতে পারি, সেইরূপ নামকরণই আমাদের উচিত, বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতায় আমাদের প্রয়োজন নাই। যদি এই শেষোক্ত বৃত্তিগুলির পৃথক নাম দিলে মনুষ্যত্ব তত্ত্ব বুঝিতে আমাদের সুবিধা হয়, তবে পৃথক নামই দিব। তুমিই না হয়, একটি নাম দাও।

শিষ্য। আমি নামকরণ করিতে গেলে ওগুলিকে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি বলিব।

গুরু। আপত্তি নাই। বুঝিলেই হইল। এখন মানুষের সমুদয় শক্তি-গুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল। (১) শারীরিকী (২) জ্ঞানার্জ্জনী (৩) কার্য্যকারিণী (৪) চিত্তরঞ্জিনী। এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব।

শিষ্য। ক্রোধাদি কার্য্যকারিণী বৃত্তি, এবং কামাদি শারীরিকী বৃত্তি। এগুলিরও সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি মনুষ্যত্বের উপাদান ?

গুরু। এই চারি প্রকার বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া সে আপত্তির মীমাংসা করিতেছি।

শিষ্য। কিন্তু অন্য প্রকার আপত্তিও আছে। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে ত নূতন কিছু পাইলাম না। সকলেই বলে, ব্যায়ামাদির দ্বারা শারীরিকী বৃত্তিগুলির পুষ্টি কর। অনেকেই তাহা করে। আর যাহারা সক্ষম, তাহারা পোষ্যগণকে সুশিক্ষা দিয়া জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির স্ফূর্ত্তির জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়া থাকে—তাই সভ্য জগতে এত বিদ্যালয়। তৃতীয়ত কার্য্যকারিণী

* এই বিভাগ বিলাতি পণ্ডিতদিগের মতানুসারী নহে, আমি জানি। অনেক স্থলে তাঁহাদের মতানুসারী না হওয়াই ভাল।

বৃত্তির রীতিমত অনুশীলন যদিও তাদৃশ ঘটিয়া উঠে না বটে, তবু তাহার ঔচিত্য সকলেই স্বীকার করে। চতুর্থত, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্ফূরণও কথঞ্চিৎ বাঞ্ছনীয় বলিয়া লোকের যে জ্ঞান আছে, তাহার প্রমাণ সাহিত্য ও সূক্ষ্ম শিল্পের অনুশীলন। নূতন আমাকে কি শিখাইলেন ?

গুরু। এ সংসারে নূতন কথা বড় অল্পই আছে। বিশেষ আমি, যে কোন নূতন সম্বাদ লইয়া স্বর্গ হইতে সদ্য নামিয়া আসি নাই, ইহা তুমি এক প্রকার মনে স্থির করিয়া রাখিতে পার। আমার সব কথাই পুরাতন। নূতনে আমার নিজের বড় অবিশ্বাস। বিশেষ, আমি ধর্ম্মব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত। ধর্ম্ম পুরাতন, নূতন নহে। আমি নূতন ধর্ম্ম কোথায় পাইব ?

শিষ্য। তবে শিক্ষাকে যে আপনি ধর্ম্মের অংশ বলিয়া খাড়া করিতেছেন ইহাই দেখিতেছি, নূতন।

গুরু। তাহাও নূতন নহে। শিক্ষা যে ধর্ম্মের অংশ, ইহা চিরকাল হিন্দু ধর্ম্মে আছে। এই জন্য সকল হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রেই শিক্ষা প্রণালী বিশেষপ্রকারে বিহিত হইয়াছে। হিন্দুর ব্রাহ্মচর্য্যাশ্রমের বিধি,কেবল পাঠাবস্থার শিক্ষার বিধি। কত বৎসর ধরিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে,কি প্রণালীতে অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি অধ্যয়ন করিতে হইবে, গুরুর প্রতি কি রূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার বিস্তারিত বিধান হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে। ব্রাহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থাশ্রমও শিক্ষানবিশী মাত্র। ব্রাহ্মচর্য্যে জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তি সকলের অনুশীলন; গার্হস্থ্যে কার্য্যকারিণীবৃত্তির অনুশীলন। এই দ্বিবিধ শিক্ষার বিধি সংস্থাপনের জন্য হিন্দু শাস্ত্রকারেরা ব্যস্ত। আমিও সেই আর্য্য ঋষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যান পূর্ব্বক, তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি। তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে ঠিক সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া চালাইতে পারা যায় না। সেই ঋষিরা যদি আজ ভারতবর্ষে বর্ত্তমান থাকিতেন, তবে তাঁহারাই বলিতেন, "না, তাহা চলিবে না। আমাদিগের বিধিগুলির সর্ব্বাঙ্গ বজায় রাখিয়া এখন যদি চল, তবে আমাদের প্রচারিত ধর্ম্মের মর্ম্মের বিপরীতাচরণ হইবে।" হিন্দুধর্ম্মের সেই মর্ম্ম ভাগ, অমর; চিরকাল চলিবে, চিরকাল মনুষ্যের হিত সাধন করিবে, কেন না মানব প্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি। তবে বিশেষ বিধি সকল, সকল ধর্ম্মেই সময়োচিত হয়। তাহা কাল ভেদে পরিহার্য্য বা পরিবর্ত্তনীয়। হিন্দুধর্ম্মের নব সংস্কারের এই স্থূল কথা।

শিষ্য। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, আপনি ইহার ভিতর অনেক বিলাতি কথা আনিয়া ফেলিতেছেন। শিক্ষা যে ধর্ম্মের অংশ ইহা কোম্‌তের মত।

গুরু। হইতে পারে। এখন, হিন্দুধর্ম্মের কোন অংশের সঙ্গে যদি কোম্‌ত মতের কোথাও কোন সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যবন স্পর্শ দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের সে টুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি? খ্রীষ্ট ধর্ম্মে ঈশ্বরোপাসনা আছে বলিয়া, হিন্দুদিগকে ঈশ্বরোপাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে কি? সে দিন নাইন্‌টীন্থ সেঞ্চুরিতে হর্বর্ট স্পেন্সর কোম্‌ত প্রতিবাদে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা মর্ম্মত বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ। বেদান্তের সঙ্গে হর্বর্ট স্পেন্সরের মতের সাদৃশ্য ঘটিল বলিয়া বেদান্ত টা হিন্দুয়ানির বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে কি? আমি স্পেন্সরি বলিয়া বেদান্ত ত্যাগ করিব না—বরং স্পেন্সরকে ইউরোপীয় হিন্দু বলিয়া হিন্দু মধ্যে গণ্য করিব। হিন্দুধর্ম্মের যাহা স্থূল ভাগ, এত কালের পর ইউরোপ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাহার একটু আধটু ছুঁইতে পারিতেছেন, হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার ইহা সামান্য প্রমাণ নহে।

শিষ্য। যাই হউক। গণিত বা ব্যায়াম শিক্ষা যদি ধর্ম্মের শাসনাধীন হইল, তবে ধর্ম্ম ছাড়া কি?

গুরু। কিছুই ধর্ম্ম ছাড়া নহে। ধর্ম্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্য জীবনের সর্ব্বাংশই ধর্ম্ম কর্ত্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম। অন্য ধর্ম্মে তাহা হয় না, এজন্য অন্য ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ; কেবল হিন্দুধর্ম্মে তাহা হয়, তাই হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণ ধর্ম্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম্ম। হিন্দুর কাছে, ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ সকল লইয়া ধর্ম্ম। এমন সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম্ম কি আর আছে?

দ্বিতীয় কথা।

জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তি।

শিষ্য। কালিকার কথায় শিখিলাম কি?

গুরু। শিখিলে যে চতুর্ব্বিধ মনুষ্যবৃত্তি গুলির সর্ব্বাঙ্গীন অনুশীলন, ও তাহাদিগের পরস্পর সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব। তুমি বলিতেছ, ইহা পুরাণ কথা। হইতে পারে, কিন্তু পুরাতন কথা পুনরুক্ত করায় অনেক সময়ে

উপকার আছে। আর ইহাও তুমি দেখাইতে পারিবে না, যে কথাটা ঠিক এইভাবে পূর্ব্বে কোথাও কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছিল। তবে কাহারও কোন কোন বৃত্তির অনুশীলন কর্ত্তব্য, এরূপ লোক প্রতীতি আছে বটে, এবং তদনুরূপ কার্য্য হইতেছে। এইরূপ লোক প্রতীতির ফল আধুনিক শিক্ষা প্রণালী। সেই শিক্ষা প্রণালীতে তিনটি গুরুতর দোষ আছে। এই মনুষ্যত্বতত্ত্বের প্রতি মনোযোগী হইলেই, সেই সকল দোষের আবিষ্কার ও প্রতীকার করা যায়।

শিষ্য। সে সকল দোষ কি?

গুরু। প্রথম, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির প্রতিই অধিক মনোযোগ, কার্য্য-কারিণী বা চিত্তরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ।

এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া আধুনিক শিক্ষকেরা শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেন বলিয়া, এদেশে ও ইউরোপে এত অনিষ্ট হইতেছে। এদেশে বাঙ্গালিরা অমানুষ হইতেছে; তর্ককুশল, বাগ্মী, বা সুলেখক; ইহাই বাঙ্গালির চরমোৎকর্ষের স্থান হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপের কোন প্রদেশের লোক কেবল শিল্পকুশল, অর্থগৃধ্নু, স্বার্থপর হইতেছে; কোন দেশে রণপ্রিয়, পরস্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত যুদ্ধ, দুর্ব্বলের উপর এত পীড়ন। শারীরিক বৃত্তি, কার্য্যকারিণী বৃত্তি, মনোরঞ্জিনী বৃত্তি, যতগুলি আছে, সকল গুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য যোগ্য যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন তাহাই মঙ্গলকর; সেগুলির অবহেলা, আর বুদ্ধিবৃত্তির অসঙ্গত স্ফূর্ত্তি, মঙ্গলদায়ক নহে। আমাদিগের সাধারণ লোকের ধর্ম্মসংক্রান্ত বিশ্বাস, এরূপ নহে। হিন্দুর পূজনীয় দেবতাদিগের প্রাধান্য, রূপবান কার্ত্তিকেয় বা বলবান্ পবনে নিহিত হয় নাই, বুদ্ধিমান বৃহস্পতি বা জ্ঞানী ব্রহ্মায় অর্পিত হয় নাই; রসজ্ঞ গন্ধর্ব্বরাজ বা বাগ্দেবীতে নহে; কেবল সেই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন—অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি-বিশিষ্ট ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বিষ্ণুতে নিহিত হইয়াছে। অনুশীলন নীতির স্থূল গ্রন্থি এই যে, সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি পরস্পর পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য বিশিষ্ট হইয়া অনুশীলিত হইবে, কেহ কাহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া অসঙ্গত বৃদ্ধি পাইবে না।

শিষ্য। এই গেল একটি দোষ। আর?

গুরু। আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে সকলকে এক এক

কি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ব হইতে হইবে—সকলের সকল বিষয় শিখিবার প্রয়োজন নাই। যে পারে সে ভাল করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, তাহার সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। যে পারে সে সাহিত্য উত্তম করিয়া শিখুক তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানসিক বৃত্তির সকল গুলির স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইল কৈ? সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল—আস্ত মানুষ পাইব কোথা? যে বিজ্ঞানকুশলী কিন্তু কাব্যরসাদির আস্বাদনে বঞ্চিত সে কেবল আধখানা মানুষ। অথবা যে সৌন্দর্য্যদত্তপ্রাণ, সর্ব্বসৌন্দর্য্যের রসগ্রাহী কিন্তু জগতের অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অজ্ঞ—সেও আধখানা মানুষ। উভয়েই মনুষ্যত্ব বিহীন সুতরাং ধর্ম্মে পতিত। যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধবিশারদ—কিন্তু রাজধর্ম্মে অনভিজ্ঞ—অথবা যে ক্ষত্রিয় রাজধর্ম্মে অভিজ্ঞ কিন্তু রণবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, তাহারা যেমন হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মচ্যুত, ইহারাও তেমনি ধর্ম্মচ্যুত—এই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম।

শিষ্য। আপনার ধর্ম্মব্যাখ্যা অনুসারে সকলকেই সকল শিখিতে হইবে।

গুরু। না ঠিক তা নয়। সকলকেই সকল মনোবৃত্তিগুলি সংকর্ষিত করিতে হইবে।

শিষ্য। তাই হউক—কিন্তু সকলের কি তাহা সাধ্য! সকলের সকল বৃত্তিগুলি তুল্যরূপে তেজস্বিনী নহে। কাহারও বিজ্ঞানানুশীলনী বৃত্তিগুলি অধিক তেজস্বিনী, সাহিত্যানুযায়িনী বৃত্তিগুলি সেরূপ নহে। বিজ্ঞানের অনুশীলন করিলে সে একজন বড় বৈজ্ঞানিক হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের অনুশীলনে তাহার কোন ফল হইবে না, এস্থলে সাহিত্যে বিজ্ঞানে তাহার কি তুল্যরূপ মনোযোগ করা উচিত?

গুরু। এ আপত্তির মীমাংসাও অনেক কথা, পশ্চাৎ উপযুক্ত সময়ে ইহার মীমাংসা করিব। এখন নোট করিয়া রাখ। এক্ষণে, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর তৃতীয় দোষের কথা বলি।

জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ একটি সাধারণ ভ্রম এই যে, সংকর্ষণ অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জ্জন, বৃত্তির স্ফূরণ নহে। যদি কোন বৈদ্য, রোগীকে উদর ভরিয়া পথ্য দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়েন, অথচ তাহার ক্ষুধা বৃদ্ধি বা পরিপাক শক্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করেন, তবে সেই চিকিৎসক যেরূপ ভ্রান্ত, এই প্রণালীর শিক্ষকেরাও সেইরূপ ভ্রান্ত। যেমন সেই চিকিৎসকের চিকিৎসার ফল, অজীর্ণ, রোগবৃদ্ধি,—তেমনি এই জ্ঞানার্জ্জন বাতিকগ্রস্ত

শিক্ষকদিগের শিক্ষার ফল, মানসিক অজীর্ণ—বৃত্তি সকলের অবনতি। মুখস্থ কর, মনে রাখ, জিজ্ঞাসা করিলে যেন চট্‌পট্‌ করিয়া বলিতে পার। তার পর, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইল কি শুষ্ক কাষ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে ভোঁতা হইয়া গেল, স্বশক্তি অবলম্বিনী হইল, কি প্রাচীন পুস্তকপ্রণেতা এবং সমাজের শাসনকর্ত্তারূপ বৃদ্ধ পিতামহীবর্গের আঁচল ধরিয়া চলে, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি বুড়ো খোকার মত কেবল গিলাইয়া দিলে গিলিতে পারে, কি আপনি আহারার্জ্জনে সক্ষম, সে বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিন্তা করেন না। এই সকল শিক্ষিত গর্দ্দভ জ্ঞানের ছালা পিঠে করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়—বিস্মৃতি নামে করুণাময়ী দেবী আসিয়া ভার নামাইয়া লইলে, তাহারা পালে মিশিয়া সচ্ছন্দে ঘাস্ খাইতে থাকে।

শিষ্য। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি আপনার এত কোপদৃষ্টি কেন?

গুরু। আমি কেবল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছিলাম না। এখনকার ইংরেজের শিক্ষাও এইরূপ। আমরা যে মহাপ্রভুদিগের অনুকরণ করিয়া, মনুষ্য জন্ম সার্থক করিব মনে করি, তাঁহাদিগেরও বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ, জ্ঞান পীড়াদায়ক।

শিষ্য। ইংরেজের বুদ্ধি সংকীর্ণ? আপনি ক্ষুদ্র বাঙ্গালি হইয়া এত বড় কথা বলিতে সাহস করেন? আবার জ্ঞান পীড়াদায়ক?

গুরু। একে একে বাপু। ইংরেজের বুদ্ধি সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র বাঙ্গালি হইয়াও বলি। আমি গোস্পদ বলিয়া যে ডোবাকে সমুদ্র বলিব, এমত হইতে পারে না। যে জাতি একশত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের আধিপত্য করিয়া ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে একটা কথাও বুঝিল না, তাঁহাদের অন্য লক্ষ গুণ থাকে স্বীকার করিব, কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রশস্তবুদ্ধি বলিতে পারিব না। কথাটার বেশী বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই—তিক্ত হইয়া উঠিবে। তবে ইংরেজের অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ পথে বাঙ্গালির বুদ্ধি চলিতেছে, ইহা আমি না হয় স্বীকার করিলাম। ইংরেজের শিক্ষা অপেক্ষাও আমাদের শিক্ষা যে নিকৃষ্ট তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের সেই কুশিক্ষার মূল ইংরেজের দৃষ্টান্ত। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা, হয়ত, আরও নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমান শিক্ষাকে ভাল বলিতে পারি না। একটা আপত্তি মিটিল ত?

শিষ্য। জ্ঞান পীড়াদায়ক, এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। জ্ঞান স্বাস্থ্যকর, এবং জ্ঞান পীড়াদায়ক। আহার স্বাস্থ্যকর, এবং অজীর্ণ হইলে পীড়াদায়ক। অজীর্ণ জ্ঞান পীড়াদায়ক। অর্থাৎ কতক গুলা কথা জানিয়াছি, কিন্তু যাহা যাহা জানিয়াছি সে সকলের কি সম্বন্ধ, সকল গুলির সমবায়ের ফল কি, তাহা কিছুই জানি না। গৃহে অনেক আলো জ্বলিতেছে, কেবল সিঁড়ি টুকু অন্ধকার। এই জ্ঞান পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই জ্ঞান লইয়া কি করিতে হয় তাহা জানে না। একজন ইংরেজ স্বদেশ হইতে নূতন আসিয়া একখানি বাগান কিনিয়াছিলেন। মালী বাগানের নারিকেল পাড়িয়া আনিয়া উপহার দিল। সাহেব ছোবড়া খাইয়া তাহা অস্বাদু বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। মালী উপদেশ দিল, "সাহেব! ছোবড়া খাইতে নাই—আঁটি খাইতে হয়।" তারপর আঁব আসিল। সাহেব মালীর উপদেশ বাক্য স্মরণ করিয়া ছোবড়া ফেলিয়া দিয়া আঁটি খাইলেন। দেখিলেন; এ বারও বড় রস পাওয়া গেল না। মালী বলিয়া দিল, "সাহেব, কেবল খোসা খানা ফেলিয়া দিয়া, শাঁসটা ছুরি দিয়া কাটিয়া খাইতে হয়।" সাহেব সে কথা স্মরণ রহিল। শেষ ওল আসিল। সাহেব, তাহার খোসা ছাড়াইয়া কাটিয়া খাইলেন। শেষ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মালীকে প্রহার পূর্ব্বক আধা কড়িতে বাগান বেচিয়া ফেলিলেন। অনেকের মানসক্ষেত্র, এই বাগানের মত ফলে ফুলে পরিপূর্ণ, তবে অধিকারির ভোগে হয় না। তিনি ছোবড়ার জাগায় আঁটি, আঁটির জাগায় ছোবড়া খাইয়া বসিয়া থাকেন। এরূপ জ্ঞান বিড়ম্বনা মাত্র।

শিষ্য। তবে কি জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন?

গুরু। পাগল! অস্ত্র খানা শানাইতে গেলে কি শূন্যের উপর শান দেওয়া যায়? জ্ঞেয় বস্তু ভিন্ন কিসের উপর অনুশীলন করিবে? জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞানার্জ্জন নিশ্চিত প্রয়োজন। তবে ইহাই বুঝাইতে চাই, যে জ্ঞানার্জ্জন মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, বৃত্তির বিকাশই মুখ্য উদ্দেশ্য। আর ইহাও মনে করিতে হইবে, জ্ঞানার্জ্জনই জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি গুলির পরিতৃপ্তি। অতএব চরম উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জ্জনই বটে। কিন্তু যে অনুশীলন প্রথা চলিত, তাহাতে পেট বড় না হইতে আহার ঠুসিয়া দেওয়া হইতে থাক। পাক শক্তির বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই, ক্ষুধা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই—আধার বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই—ঠুসে গেলা। যেমন কতকগুলি অবোধ

মাতা এইরূপ করিয়া শিশুর শারীরিক অবনতি সংসাধিত করে, তেমন্ এক্ষণকার পিতা ও শিক্ষকেরা পুত্র ও ছাত্রগণের অবনতি সংসাধিত করেন।

জ্ঞানার্জ্জন ধর্ম্মের একটি প্রধান অংশ। কিন্তু সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে এই তিনটি সামাজিক পাপ, সর্ব্বদা বর্ত্তমান। ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য সমাজে গৃহীত হইলে, এই কুশিক্ষা-রূপ অধর্ম্ম সমাজ হইতে দূরীকৃত হইবে।

তৃতীয় কথা।

নিকৃষ্ট কার্য্যকারিণী বৃত্তি।

শিষ্য। এখন কোন্ বৃত্তির কিরূপ অনুশীলন পদ্ধতি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। সে কথা ধর্ম্মব্যাখ্যার অন্তর্গত বটে, কেন না ধর্ম্ম জীবনের সর্ব্বাংশব্যাপী। কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ এই কথোপকথনের ভিতর সমাবেশ করা যায় না। এখন কেবল আমি দুই একটা স্থূল কথা বলিয়া যাইতে পারি। জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে স্থূল কথা দুই একটা বলিয়াছি—অন্যান্য বৃত্তি সম্বন্ধেও দুই একটা স্থূল কথা মাত্র বলিব। যদিও আমার মতে সকল বৃত্তি গুলির উচিত স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্যই ধর্ম্ম, তথাপি সকল ধর্ম্মবেত্তারাই কতকগুলি কার্য্যকারিণী বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্ত্তির উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, এই বৃত্তিগুলির সম্প্রসারণ শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং এই বৃত্তিগুলির অধিক সম্প্রসারণেই অন্য বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য ঘটে। সমুচিত স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য যাহাকে বলিয়াছি তাহার এমন তাৎপর্য্য নহে যে, সকল বৃত্তিগুলিই তুল্যরূপে স্ফূরিত ও বর্দ্ধিত হইবে। সকল শ্রেণীর বৃক্ষের সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্যে সুরম্য উদ্যান হয়। কিন্তু এখানে সমুচিত বৃদ্ধির এমন অর্থ নহে যে তাল ও নারিকেল বৃক্ষ যত বড় হইবে, মল্লিকা বা গোলাপের তত বড় আকার হওয়া চাই। যে বৃক্ষের যেমন সম্প্রসারণ শক্তি সে ততটা বাড়িবে। এক বৃক্ষের অধিক বৃদ্ধির জন্য যদি অন্য বৃক্ষ সমুচিত বৃদ্ধি না পায়, যদি তেঁতুলের আওতায় গোলাপের কেয়ারি শুকাইয়া যায়, তবে সামঞ্জস্যের হানি হইল। মনুষ্য চরিত্রেও সেই রূপ। কতকগুলি কার্য্য-কারিণী বৃত্তি—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়া,—ইহাদিগের সম্প্রসারণ শক্তি অন্যান্য বৃত্তির অপেক্ষা অধিক; এবং এই গুলির অধিক সম্প্রসারণই সমুচিত স্ফূর্ত্তি, ও সকল বৃত্তির সামঞ্জস্যের মূল। পক্ষান্তরে আরও

কতকগুলি বৃত্তি আছে; প্রধানতঃ কতকগুলি শারীরিক বৃত্তি,—সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণ শক্তিশালিনী। কিন্তু সেগুলির অধিক সম্প্রসারণে অন্যান্য বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্ত্তির বিঘ্ন হয়। সুতরাং সেগুলি যতদূর স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে, ততদূর স্ফূর্ত্তি পাইতে দেওয়া অকর্ত্তব্য। সেগুলি তেঁতুল গাছ, তাহার আওতায় গোলাপের কেয়ারি মরিয়া যাইতে পারে। আমি এমন বলিতেছি না, যে সেগুলি বাগান হইতে উচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়া দিবে। তাহা অকর্ত্তব্য, কেন না অম্লে প্রয়োজন আছে—নিকৃষ্ট বৃত্তিতেও প্রয়োজন আছে। সে সকল কথা সবিস্তারে বলিতেছি। তেঁতুল গাছ বাগান হইতে উচ্ছেদ করিবে না বটে, কিন্তু তাহার স্থান এক কোণে। বড় বাড়িতে না পায়—বাড়িলেই ছাঁটিয়া দিবে। দুই একখানা তেঁতুল ফলিলেই হইল—তার বেশী আর না বাড়িতে পায়। নিকৃষ্ট বৃত্তির সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধির উপযোগী স্ফূর্ত্তি হইলেই হইল—তাহার বেশী আর বৃদ্ধি যেন না পায়। ইহাকেই সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্য বলিয়াছি।

শিষ্য। তবেই বুঝিলাম যে এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে—যথা কামাদি যাহার দমনই সমুচিত স্ফূর্ত্তি।

গুরু। দমন অর্থে যদি ধ্বংস বুঝ, তবে এ কথা ঠিক নহে। কামের এক কালীন ধ্বংসে মনুষ্য জাতির এককালীন ধ্বংস ঘটিবে। সুতরাং এই অতি কদর্য্য বৃত্তিরও এককালীন ধ্বংস ধর্ম্ম নহে—অধর্ম্ম। আমাদের পরম রমণীয় হিন্দু ধর্ম্মেরও এই বিধি। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা ইহার এককালীন ধ্বংস বিহিত করেন নাই, বরং ধর্ম্মার্থ তাহার নিয়োগই বিধি করিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পুত্রোৎপাদন এবং বংশরক্ষা ধর্ম্মের অংশ! তবে ধর্ম্মের প্রয়োজনাতিরিক্ত এই বৃত্তির যে স্ফূর্ত্তি, তাহা হিন্দু শাস্ত্রানুসারেও নিষিদ্ধ—এবং তদনুগামী এই ধর্ম্ম ব্যাখ্যা যাহা তোমাকে শুনাইতেছি, তাহাতেও নিষিদ্ধ হইতেছে। কেন না বংশরক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয় তাহার অতিরিক্ত যে স্ফূর্ত্তি তাহা সামঞ্জস্যের বিঘ্নকর, এবং উচ্চতর বৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তিরোধক। যদি অনুচিত স্ফূর্ত্তিরোধকে দমন বল, তবে এ সকল বৃত্তির দমনই সমুচিত অনুশীলন। এই অর্থে ইন্দ্রিয়দমনই পরম ধর্ম্ম।

শিষ্য। এই বৃত্তিটার লোক রক্ষার্থ একটা প্রয়োজন আছে বটে, এই জন্য আপনি এ সকল কথা বলিতে পারিলেন, কিন্তু অপরাপর অপকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এ সকল কথা খাটে না।

গুরু। সকল অপকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এই কথা খাটিবে। কোন্‌টির সম্বন্ধে খাটে না?

শিষ্য। মনে করুন ক্রোধ। ক্রোধের এককালীন উচ্ছেদে আমি ত কোন অনিষ্ট দেখি না।

গুরু। ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজ রক্ষার মূল। দণ্ডনীতি—বিধিবদ্ধ সামাজিক ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে দণ্ডনীতির উচ্ছেদ হইবে। দণ্ডনীতির উচ্ছেদে সমাজের উচ্ছেদ।

শিষ্য। দণ্ডনীতি ক্রোধমূলক বলিয়া আমি স্বীকার করিতে পারিলাম না, বরং দয়ামূলক বলা ইহার অপেক্ষা ভাল হইতে পারে। কেন না সর্ব্বলোকের মঙ্গল কামনা করিয়াই, দণ্ডশাস্ত্রপ্রণেতারা দণ্ডবিধি উদ্ভূত করিয়াছেন। এবং সর্ব্বলোকের মঙ্গল কামনা করিয়াই রাজা দণ্ড প্রণয়ন করিয়া থাকেন।

গুরু। আত্মরক্ষার কথাটা বুঝিয়া দেখ। অনিষ্টকারীকে নিবারণ করিবার ইচ্ছাই ক্রোধ। সেই ক্রোধের বশীভূত হইয়াই আমরা অনিষ্টকারীর বিরোধী হই। এই বিরোধই আত্মরক্ষার চেষ্টা। হইতে পারে, যে আমরা কেবল বুদ্ধি বলেই স্থির করিতে পারি, যে অনিষ্টকারীর নিবারণ করা উচিত। কিন্তু কেবল বুদ্ধি দ্বারা কার্য্যে প্রেরিত হইলে, ক্রুদ্ধের যে ক্ষিপ্রকারিতা এবং আগ্রহ তাহা আমরা কদাচ পাইব না। তার পর যখন মনুষ্য পরকে আত্মবৎ দেখিতে চেষ্টা করে, তখন এই আত্মরক্ষা ও পররক্ষা তুল্যরূপেই ক্রোধের ফল হইয়া দাঁড়ায়। পররক্ষায় চেষ্টিত যে ক্রোধ, তাহা বিধিবদ্ধ হইলেই দণ্ডনীতি হইল।

শিষ্য। লোভে ত আমি কিছু ধর্ম্ম দেখি না।

গুরু। যে বৃত্তির অনুচিত স্ফূর্ত্তিকে লোভ বলা যায়, তাহার উচিত এবং সামঞ্জসীভূত স্ফূর্ত্তি—ধর্ম্মসঙ্গত অর্জ্জনস্পৃহা। আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, এবং আমার উপর যাহাদের রক্ষার ভার আছে, তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহার সংগ্রহ অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ পরিমিত অর্জ্জনে—কেবল ধনার্জ্জনের কথা বলিতেছি না, ভোগ্য বস্তুমাত্রেরই অর্জ্জনের কথা বলিতেছি—কোন দোষ নাই। সেই পরিমিতি মাত্রা ছাপাইয়া উঠিলেই এই সদ্বৃত্তি লোভে পরিণত হইল। অনুচিত স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল বলিয়া উহা তখন মহাপাপ হইয়া দাঁড়াইল। দুইটি কথা বুঝ। যেগুলিকে আমরা নিকৃষ্টবৃত্তি বলি, তাহাদের সকল গুলিই উচিত মাত্র

ধর্ম্ম, অনুচিত মাত্রায় অধর্ম্ম। আর এই বৃত্তিগুলি এমনই তেজস্বিনী যে, যত্ন না করিলে এগুলি সচরাচর উচিত মাত্রা অতিক্রম করিয়া উঠে, এজন্য দমনই এগুলি সম্বন্ধে প্রকৃত অনুশীলন। এই দুটি কথা বুঝিলেই তুমি অনুশীলন তত্ত্বের এ অংশ বুঝিলে। দমনইপ্রকৃত অনুশীলন, কিন্তু উচ্ছেদ নহে। মহাদেব, মন্মথের অনুচিত স্ফূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকহিতার্থ আবার তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইল *। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, কৃষ্ণের যে উপদেশ তাহাতেও ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ উপদিষ্ট হয় নাই, দমনই উপদিষ্ট হইয়াছে। সংযত হইলে সে সকল আর শান্তির বিঘ্নকর হইতে পারে না, যথা

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্
আত্মবশ্যৈর্ব্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি। ২।৬৪।

শিষ্য। যাই হৌক, এ তত্ত্ব লইয়া আর অধিক কালহরণের প্রয়োজন নাই। ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি শ্রেষ্ঠবৃত্তি সকলের অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু। এ বিষয়ে এত কথা বলিবার আমারও ইচ্ছা ছিল না। দুই কারণে বলিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম, তোমার আপত্তি খণ্ডন করিতে হইল। আজ কাল যোগধর্ম্মের বা থিওসফির একটা হুজুক উঠিয়াছে, তাহাতে কিছু বিরক্ত হইয়াছি। আমি মনুষ্যের occult শক্তিতে অবিশ্বাসী নহি। অলকট্ বা ব্লাবাট্স্কিতে অথবা ভারতছাড়া নামধারী কুতহুমী-লালসিংহে বড় বিশ্বাসী নহি, কিন্তু মহাত্মাদিগের অস্তিত্ব এবং শক্তি স্বীকার করি। স্বীকার করিয়াও আমি তাঁহাদিগের ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিতে পারি না। যোগধর্ম্মের মর্ম্ম কতকগুলি বৃত্তির এককালীন উচ্ছেদ, কতকগুলির প্রতি অমনোযোগ, এবং কতকগুলির সমধিক সম্প্রসারণ। এখন, যদি সকল বৃত্তির

---

* মন্মথ ধ্বংস হইল, অথচ রতি রহিল। অনাথা রতি হইতে জীবলোক রক্ষা পাইতে পারে না, এজন্য মন্মথের পুনর্জ্জীবন। পক্ষান্তরে, আবার রতি কর্ত্তৃক পুনর্জ্জন্মলব্ধ কাম প্রতিপালিত হইলেন। এ কথাটাও যেন মনে থাকে। অনুচিত অনুশীলনেই অনুচিত স্ফূর্ত্তি। পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির এইরূপ গূঢ় তাৎপর্য্য অনুভূত করিতে পারিলে, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম আর উপধর্ম্ম সঙ্কুল বা "silly" বলিয়া বোধ হইবে না। সময়ান্তরে দুই একটা উদাহরণ দিব।

উচিত স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য ধর্ম্ম হয়, তবে তাঁহাদিগের এই ধর্ম্ম অধর্ম্ম। বৃত্তি নিকৃষ্ট হউক বা উৎকৃষ্ট হউক, উচ্ছেদমাত্র অধর্ম্ম। লম্পট বা পেটুক অধার্ম্মিক, কেননা তাহারা আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া দুই একটির সমধিক অনুশীলনে নিযুক্ত। যোগীরাও অধার্ম্মিক, কেননা তাঁহারাও আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া, দুই একটির সমধিক অনুশীলন করেন। নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বৃত্তি ভেদে, না হয় লম্পট বা উদরম্ভরীকে নীচ শ্রেণীর অধার্ম্মিক বলিলাম এবং যোগী দিগকে উচ্চশ্রেণীর অধার্ম্মিক বলিলাম. কিন্তু উভয়কেই অধার্ম্মিক বলিব। আর আমি কোন বৃত্তিকে নিকৃষ্ট বা অনিষ্টকর বলিতে সম্মত নহি। আমাদের দোষে অনিষ্ট ঘটে বলিয়া সেগুলিকে নিকৃষ্ট কেন বলিব? জগদীশ্বর আমাদিগকে নিকৃষ্ট কিছুই দেন নাই। তাঁহার কাছে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভেদ নাই। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা স্ব স্ব কার্য্যোপযোগী করিয়াছেন। কার্য্যোপযোগী হইলেই উৎকৃষ্ট হইল। সত্য বটে জগতে অমঙ্গল আছে। কিন্তু সে অমঙ্গল, মঙ্গলের সঙ্গে এমন সম্বন্ধবিশিষ্ট যে তাহাকে মঙ্গলের অংশ বিবেচনা করাই কর্ত্তব্য। আমাদের সকল বৃত্তিগুলিই মঙ্গলময়। যখন তাহাতে অমঙ্গল হয়, সে আমাদেরই দোষে। জগতের তত্ত্ব যতই আলোচনা করা যায়, ততই বুঝিব যে আমাদের মঙ্গলের সঙ্গেই জগত সম্বদ্ধ। নিখিল বিশ্বের সর্ব্বাংশই মনুষ্যের সকল বৃত্তি গুলিরই অনুকূল—প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তিগুলিরই সহায়। তাই যুগ পরম্পরায় মনুষ্য জাতির মোটের উপর উন্নতিই হইয়াছে মোটের উপর অবনতি নাই। ধর্ম্মই এই উন্নতির কারণ। যে বৈজ্ঞানিক নাস্তিক ধর্ম্মকে উপহাস করিয়া বিজ্ঞানই এই উন্নতির কারণ বলেন, তিনি জানেন না যে তাঁহার বিজ্ঞানও এই ধর্ম্মের এক অংশ, তিনিও একজন ধর্ম্মের আচার্য্য। তিনি যখন "Law"র মহিমা কীর্ত্তন করেন, আর আমি যখন হরিনাম করি, দুইজন একই কথা বলি। দুই জনে একই বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করি। মনুষ্য মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া এত বিবাদ বিসম্বাদ কেন, আমি বুঝিতে পারি না।

ক্রমশ।

সিংহল যাত্রা।

১২৯০। ৪ঠা ফাল্গুন—কলম্বোর সুপ্রিম কোর্টে সংপ্রতি অধিক কার্য্য আছে এমন বোধ হয় না। গতকল্য আমি বেলা একটার সময় উক্ত ধর্ম্মাধিকরণ দেখিতে গিয়াছিলাম; তখন জজ সাহেবেরা উঠিয়া গিয়াছেন। তবে সেষণের সময়ে তাঁহাদের বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতে হয়। এখানকার জেলা জজদিগের সেষণ বিচারের ক্ষমতা নাই; সুতরাং সমস্ত গুরুতর অপরাধের বিচার সুপ্রিমকোর্টেই হইয়া থাকে। জেলা জজদিগের দেওয়ানী বিচারের ক্ষমতা ভারতবর্ষের সুবর্ডিনেট জজদিগের ন্যায়; কিন্তু ফৌজদারিতে তাঁহারা এক বৎসরের অধিক কাল কারাবাস এবং ২০০ টাকার অধিক অর্থ দণ্ড করিতে পারেন না। পুলিস মাজিষ্ট্রেটরা তিন মাস মাত্র কারাবাস এবং ৫০টাকা মাত্র অর্থদণ্ড করিতে পারেন। সুপ্রিমকোর্টের জজ সাহেবদিগকে সেষণের বিচার জন্য কান্দি, গাল, ট্রিনকোমালী, যাফ্‌না প্রভৃতি নগরে পরিভ্রমণ করিতে হয়। জজদিগের মধ্যে মেষ্টার ডায়াস্ আদিম সিংহলী; কিন্তু তিনি বৌদ্ধ নহেন, খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী।

ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে আমরা যাঁহাদিগকে বারিষ্টার বা কৌন্সলী বলি, সিংহলে তাঁহারা আড্‌বোকেট্ নামে অভিহিত; আমরা যাঁহাদিগকে এটর্ণী বলি, তাঁহারা এখানে প্রক্টর নামে খ্যাত। আমার কয়জন আড্‌বোকেট ও প্রক্টরের সহিত আলাপ হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ও সুপণ্ডিত। কলম্বো নগরে এরূপ প্রবাদ আছে যে, ভুতপূর্ব্ব চিফ্ জষ্টিস্ সার্ জন্ বড্ ফিয়ার্ একবার বলিয়াছিলেন যে, কলিকাতার হাইকোর্টের সামান্য উকীল, আইন সম্বন্ধে যেমন তর্ক বিতর্ক করিতে পারেন, সিংহলের বড় বড় আড্‌বোকেটও তেমন পারেন না। ফিয়ার সাহেবের ঐ উক্তি কতদূর সঙ্গত তাহা আমি বলিতে পারি না। অসার পুনরুক্তি পূর্ণ বক্তৃতায় বিরক্ত হইয়া বিচারকগণ মধ্যে মধ্যে এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন। শুনা গিয়াছে মেষ্টার জষ্টিস্ ফিল্ড্ কলিকাতা হাইকোর্টের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীলের প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন "মফস্বলের একজন সামান্য উকীল তোমার ন্যায় তর্ক করিতে লজ্জিত হয়।" আড্‌বোকেটের মধ্যে অধিকাংশই বর্গার (Burghers) অর্থাৎ ওলন্দাজ এবং ইংরেজ

বংশোদ্ভব ঔপনিবেশিক; দুই তিন জন ইংরেজ এবং ৪।৫ জন তামিল আছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, মেষ্টার ব্রাসন্ কলিকাতার বারিষ্টারদিগের নেতা। আমি বলিলাম "বোধহয় একথা ভুল; পল সাহেবই কলিকাতার কৌন্সলীবৃন্দের পুঙ্গব।" তাঁহারা আমাকে কলিকাতার উকীলদের আয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম "আমি এবিষয়ের বড় খবর রাখি না; তবে যাহা কিছু জানি বলিতেছি।" তাঁহারা আমার কথা শুনিয়া এমন ভাব প্রকাশ করিলেন যে, সিংহলে ওকালতি কার্য্যে বড় পয়সা নাই। ইলবার্ট বিলের কথা তাঁহারা আপনারাই উত্থাপন করিয়া বলিলেন "সিংহলে জাতি-বৈরিতা আছে; কিন্তু ভারতবর্ষে যে এতটা আছে, তাহা এখানকার লোকে অনুভবও করিতে পারেন না।" বস্তুত এ কথা ঠিক। সিংহলে সর্ব্বত্র দেশী মাজিষ্ট্রেটগণ ইউরোপীয়দিগকে দণ্ড বিধান করিতেছেন; কোন আপত্তি নাই। ইলবার্ট বিলের সময় অবধি ভারতবর্ষের ইংরেজগণ ইউরেসীয়দের প্রতি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সৌহার্দ্য দেখাইতেছেন; কিন্তু বস্তুত তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করেন। শ্রাদ্ধ বাটীতে ব্রাহ্মণগণ ভাটদিগকে লুচিমণ্ডা দিয়া সন্তুষ্ট করেন; কিন্তু যে ভাট সেই ভাট রহিয়া যায়। গলায় পৈতা বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিয়া কখনও পরিগণিত হয় না। ভারতবর্ষীয় ইউরেসীয়দিগের * হ্যাট্-কোট্, পেণ্টুলন, পরাই সার; তাঁহারা কখনই ইউরোপীয় বৃটিশ প্রজা বলিয়া গণ্য হইবেন না। সিংহলের ইংরেজরা বর্গারদিগের প্রতি আত্ম-নির্ব্বিশেষে ব্যবহার করেন না বটে, কিন্তু তাদৃশ অবজ্ঞা প্রদর্শনও করেন না। সর্ রিচার্ড মর্গান্ নামক বর্গার সিংহলের চিফ জষ্টিস হইয়া ছিলেন; কোন ইংরেজ তাহাতে অসন্তুষ্ট হন নাই; কিন্তু মান্যবর রমেশচন্দ্র মিত্র বাঙ্গালার

---

* "ফিরিঙ্গী" শব্দ "ফ্রাঙ্ক" শব্দের অপভ্রংশ। যখন ইউরোপীয়রা যিশুখৃষ্টের সমাধি মন্দিরের উদ্ধার জন্য মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করেন, তখন ফ্রান্সবাসী ফ্রাঙ্করা তাহাদের নেতা ছিল। এজন্য আরবেরা সমস্ত ইউরোপীয়কে 'ফরেঙ্গ,' (ফ্রাঙ্ক) বলিত। পোর্ত্তুগালবাসীরা ইউরোপীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ভারতে আসিয়াছিল। এজন্য ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণ তাহাদিগকে 'ফেরঙ্গ' বলিয়া ডাকিতেন। যদি ফরাসিস্, ইংরেজ, বা ওলন্দাজ ভারতবর্ষে প্রথমত আসিতেন, তাঁহাদেরও নাম 'ফেরঙ্গ' হইত। আমরা ইউরেসীয়দিগকে ফিরিঙ্গী বলি; কিন্তু তাঁহাদের ঐ নামে অধিকার নাই। ইউরোপ ও আসিয়ার শোণিত মিশ্রিত হইয়া যে জাতিশঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে ইউরেসীয় বলাই ভাল।

চিফ জষ্টিস হওয়ায়, ভারতের ইংরেজমণ্ডলে হুলস্থূল পড়িয়া ছিল। সিংহলের আইন সমস্ত এখনও গোলমেলে অবস্থায় আছে। কতক প্রাচীন ব্যবহার, কতক ওলন্দাজদিগের আইন, কতক ইংলণ্ডের আইন, কতক সিংহলের লেজিস্‌লেটিব্‌ কৌন্সিলের অর্ডিনান্স এই সমস্ত লইয়া খিচুড়ী হইয়াছে। ভারতবর্ষেও এইরূপ গোলযোগ কতকটা আছে। ইংলণ্ডীয় আইন কলিকাতায় কতদূর প্রচলিত, তাহা হাইকোর্টের জজগণও বলিতে পারেন না। সুপ্রিমকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন যে, রাজা কৃষ্ণনাথ কুমার কলিকাতায় আত্মঘাতী হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাহার বিষয়াধিকারী। প্রিবিকৌন্সিল তদ্বিপরীত নিষ্পত্তি করিয়া ধার্য্য করিলেন যে, ইংলণ্ডীয় আত্মহত্যা বিষয়ক বিধি কলিকাতায় প্রচলিত নাই। আবার সুরেন্দ্রবাবুর মোকদ্দমায় স্থির হইল যে, ইংলণ্ডের আদালত-অবজ্ঞার আইন কলিকাতার হাইকোর্টে প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডের বিবাহ সম্বন্ধে আইন ভারতবর্ষে কতদূর প্রচলিত তাহা কেহই বলিতে পারেন না। যাহা হউক দণ্ডবিধি এবং ফৌজদারী ও দেওয়ানীয় কার্য্য প্রণালীর আইন সমস্ত বিধিবদ্ধ হওয়ায় ভারতবর্ষে বিচার কার্য্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে। সিংহলে ততটা সুবিধা নাই। চিফ্‌জষ্টিস্‌ ফিয়ার সাহেব মফস্বল পরিভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিলেন যে, অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি ছয় মাসের অধিক কাল হাজতে আছে; তাহাদের যাহাতে শীঘ্র বিচার হয় এমন উপায় অবলম্বন করা হইতেছে না। ফিয়ার সাহেব ঐ ব্যক্তিদিগকে মুক্ত করায়, এবং সিংহলের ডিষ্ট্রীক্ট জজ ও পুলিস মাজিষ্ট্রেটদের বিচার প্রণালীর নিন্দা করায়, সিংহলের গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। এবং ঐ বিরোধ বশতই তিনি কার্য্য ত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গিয়াছেন। ফিয়ার সাহেবের প্রতি আড্‌বোকেটদিগের প্রগাঢ় ভক্তি আছে বোধ হয়; কারণ বার লাইব্রেরীতে কেবল তাঁহারই চিত্রপট দেখিতে পাইলাম। সম্প্রতি কুলীর বেতনের আইন (Cooly wage's Ordinance) লইয়া সিংহলে ভারি আন্দোলন হইতেছে। কাফি-করবর্গ এই আইনকে সিংহলের ইলবার্ট বিল বলেন। এই আইন সম্প্রতি বিধিবদ্ধ হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বিরাগ ভাজন হইয়াছেন। অনেক কাফির আবাদে কুলীদিগের ভৃতি বাকি পড়িয়াছিল; তাহাতে এই নিয়ম করা হইয়াছে যে, সমস্ত আবাদের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মাসে মাসে গবর্ণমেণ্টের নিকটে তালিকা পাঠাইয়া দিবেন। যিনি তালিকা না দিবেন,

বা মিথ্যা তালিকা দিবেন, তাঁহার অপরাধানুসারে অর্থদণ্ড বা কারাবাস দণ্ড হইবে। কুলিদিগের ভৃতি সম্বন্ধে নালিসেরও কিঞ্চিৎ সুবিধা করা হইয়াছে। এই আইনের কোন্ বিধি যে অন্যায় তাহা বুঝিতে পারি না। তবে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রবল-প্রপীড়িত দুর্ব্বলদিগকে সাহায্য করিতে গেলে প্রবল ব্যক্তিরা আর্ত্তনাদ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধি কতকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া সিংহলে শীঘ্রই প্রচলিত হইবে।

৫ই ফাল্গুন—কলম্বো নগর হইতে কালুতারা নগর পর্য্যন্ত একটি রেল পথ আছে। ঐ লৌহময় বর্ত্মের দৈর্ঘ্য ২৮ মাইল। বেলা-ভূমিতে অবস্থিত; এজন্য ইহার নাম সাগর-তট রেল। কলম্বো হইতে যাঁহারা গাল্ নগরে গিয়া থাকেন, তাঁহারা সমুদ্র পথে যাইতে পারেন; অথবা কালুতারা পর্য্যন্ত রেলে গিয়া অবশিষ্ট পথ ডাক গাড়িতে গমন করেন। রেলের পূর্ব্বদিকে সুরম্য কৃত্রিম বন, মধ্যে মধ্যে মনোহর বৃক্ষবাটিকা; পশ্চিমে মহা সমুদ্রের তরঙ্গমালা ভীষণ নাদে তটস্থ শিলার উপর আঘাত করিতেছে এবং প্রতিঘাতে ফেনময় হইতেছে; কিংহংসগণ মৎস্যাহার জন্য ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। সাগরোত্থিত সমীরণ এমন শীতল যে অদ্য গমন কালে জাগরিত থাকিবার চেষ্টা করিয়াও রেল গাড়ির মধ্যে সুষুপ্ত হইয়া পড়িলাম। অপরাহ্ণে ফিরিয়া আসিবার সময় নিদ্রার আবেশ হয় নাই; এই জন্য সিংহলের এই ভাগের সৌন্দর্য্য দেখিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। কালুতারা নগর কালু-গঙ্গা নদীর সাগর-সঙ্গমে অবস্থিত। নগরটি দেখিয়া আমার বারাকপুর মনে পড়ে; কিন্তু বারাকপুরে সমুদ্র নাই; এই নগরের শোভা মহাসাগরের ভৈরব মূর্ত্তিদ্বারা বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রত্যুত বারাকপুরে ও শ্রীরামপুরে গঙ্গার যেমন সৌন্দর্য্য, তেমন সৌন্দর্য্য কালু-গঙ্গার নাই। বারাকপুরে কএকটি সুন্দর অট্টালিকা আছে। কালু-তারায় তাহা নাই। বারাকপুরে আমাদের রাজ প্রতিনিধির অতি রমণীয় কৃত্রিম কানন আছে; কিন্তু এখানকার এক একটি উপবন মুনিদের বাঞ্ছিত তপোবন বলিয়া বোধ হয়। কলম্বো হইতে ছয় ক্রোশ দক্ষিণে সাগর-তট-রেলের ধারে মৌণ্ট-লবিনিয়া নামে একটি জনপদ আছে। ঐ জনপদের পশ্চিম প্রান্তে সাগর তীরে একটি শৈল আছে; তাহার উপর সিংহলের একজন গবর্ণর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহা হোটেল হইয়াছে। হোটেলের বারাণ্ডা হইতে সমুদ্র দর্শন ও সমুদ্রোত্থিত বায়ু সেবন যে কত সুখকর, তাহা আমি

বর্ণনা করিতে পারি না। আমার মনে হইল এই স্থানে একখানি কুটীর বাঁধিয়া ভগবানের মহিমা ধ্যান করিয়া জীবনের শেষভাগ যাপন করি।

১৩ ই ফাল্গুন—অদ্য কল্যাণীর বুদ্ধমন্দির সন্দর্শন করিলাম। কল্যাণী কল্যাণী গঙ্গার * তীরে অবস্থিত; কলম্বো হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে। কল্যাণী দেখিলে সিংহলের সাধারণ গ্রাম কিরূপ তাহা এক প্রকার বুঝিতে পারা যায়। স্থানে স্থানে নারিকেলপত্রাচ্ছাদিত কুটীর। স্থানে স্থানে ইষ্টক রচিত ভবন; সুগঠিত, কিন্তু উপরে খোলার ছাদ। রাণীগঞ্জের মৃত্তিকাতে মগরার বালি মিশ্রিত হইলে ভূমির যেমন বর্ণ হয়, এখানকার তৃণহীন ভূমির সেইরূপ বর্ণ। এখানকার নারিকেল গাছ, বাঙ্গালার নারিকেল গাছ অপেক্ষা উচ্চ; আম্র কাঁটালের গাছ আমাদের দেশের আম্র কাঁটালের গাছের দেড় গুণ উচ্চ হইবে; কিন্তু বাঙ্গালার গাছ সিংহলের গাছ অপেক্ষা উচ্চতায় ন্যূন হইলেও অপেক্ষাকৃত স্থূল। ফাল্গুন মাস গত হয় নাই; কিন্তু এখনই আম্র সুপক্ক হইয়াছে; তবে জাফনার আম্র যেমন মিষ্ট কল্যাণীর আম্র তেমন মিষ্ট নহে। এখানে পানের বরোজ দেখিতে পাইলাম না। তাম্বুল-লতা গুবাক বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া বর্দ্ধিত হয়। রম্ভা ও পনস-তালিকার (bread-fruit) অনেক উচ্চ উচ্চ গাছ আছে। ধান্য-ক্ষেত্র নাই; কিন্তু গবাদি পালন জন্য কর্ষিত তৃণ-ক্ষেত্র আছে। কল্যাণীর বুদ্ধ মন্দির মধ্যে একটি কাচাবরণ (glass-case) আছে; তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের দারুময় বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি শায়ী রহিয়াছে। মুখখানি কতকটা আমাদের জগন্নাথের মত। কিন্তু জগন্নাথের খাঁদা নাক; বুদ্ধের নাক খাঁদা নহে। জগন্নাথের মূর্ত্তির সহিত বুদ্ধ মূর্ত্তির যে কতক সাদৃশ্য আছে, তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধদেব; জগন্নাথ নামে কোন অবতারই নাই। জগন্নাথ বুদ্ধের উপাধি মাত্র। পূর্ব্বকালে চীন ও তিব্বৎ বাসী বৌদ্ধ যাত্রীরা বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে উৎকলে জগন্নাথের মন্দিরে আসিতেন। এক্ষণে জগন্নাথে ও কৃষ্ণে কিছুমাত্র ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা বলরাম ও ভগিনী সুভদ্রা জগন্নাথের ভাই ও ভগিনী হইয়াছেন। জগন্নাথ যে বুদ্ধাবতার তাহার

* সিংহলীরা নদী মাত্রকেই "গঙ্গা" বলে যথা—মহাবলি গঙ্গা, কালু গঙ্গা, কল্যাণী গঙ্গা, ইত্যাদি। ইহাতেও তাহাদের বংশের কতক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় নদী মাত্রকেই 'গাং' বলে। 'গাং' 'গঙ্গা' শব্দের বিকৃতি মাত্র।

একমাত্র চিহ্ন আছে; মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে পুরীতে বর্ণভেদ নাই। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের কি অসাধারণ হজমি শক্তি ছিল! যে শাক্যসিংহ অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ দিতেন, বেদে পশুবধের বিধি থাকায় যিনি শ্রুতি অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তিনিই আবার বেদ প্রতিপালক বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গণ্য! তিনিই এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ নির্ব্বিশেষে জগন্নাথ নামে উড়িষ্যার বুদ্ধ-মন্দিরে পূজিত। যাঁহারা চার্ব্বাক, জাবালি এবং নিরীশ্বর কপিলকে মহর্ষি বলিয়া সম্মান করেন, তাঁহারা বেদবিরোধী বুদ্ধ শাক্যমুনিকে বিষ্ণুর অবতার বলিবেন, ইহা বড় বিচিত্র নহে; বোধ হয়, তাঁহারা য়িহুদার সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম প্রয়োজকদিগের বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে তাঁহাদিগকেও মহর্ষি বলিয়া মান্য করিতেন। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যার পর নাই গুণগ্রাহী ছিলেন। যাঁহার অসাধারণ বা অলৌকিক গুণ দেখিতেন তাঁহার মতামতের বিচার না করিয়া তাঁহাকে মহা পুরুষ বা দেবাবতার বলিয়া পূজা করিতেন। এক্ষণে ইহার বিপরীত ঘটিয়াছে। গুণরাশির মধ্যে আমরা দোষানুসন্ধান করি; চন্দ্র দেখিতে গেলে আগে তাঁহার কলঙ্ক আমাদের নয়ন গোচর হয়।

কল্যাণীর বুদ্ধ মন্দিরে উপাসনার বড় আড়ম্বর নাই। উপাসকগণ বুদ্ধ মূর্ত্তির নিকট কাষ্ঠ ফলকে কেহ নারিকেল পুষ্প, কেহ মল্লিকা পুষ্প রাখিয়া যান; কেহ কেহ ধূপ ও দীপ জ্বালেন। কোন উপাসককে মন্ত্র পড়িতে শুনি নাই। বস্তুত বৌদ্ধদিগের মূলমন্ত্র অতি সংক্ষিপ্ত। নেপাল, সিকিম্, ও ভোটের প্রচলিত মন্ত্র—'ওঁ পদম্ পাণি ওঁ' *। সিংহলের বীজমন্ত্র "বুদ্ধং সরণং গচ্ছামঃ; ধম্মং সরণং গচ্ছামঃ; সঙ্গং সরণং গচ্ছামঃ।" † হিমবন্ত প্রদেশের বৌদ্ধেরা মন্ত্রোচ্চারণ পর্য্যন্ত করেন না। তাঁহাদের জপচক্রে মন্ত্র অঙ্কিত আছে; চক্র ঘুরাইলেই জপের ফল হয়। বুদ্ধ মন্দিরের পূর্ব্ব পার্শ্বে একটি দাগোচ অর্থাৎ বুদ্ধাস্থির সমাধি আছে। ঐ সমাধি মন্দির একটি অতি বৃহৎ শ্বেত গোলার্দ্ধ। উপাসকগণ সমাধির চারিপার্শ্বে দীপ জ্বালাইয়া দিয়াছেন। * *

---

* বৌদ্ধদিগের প্রণব আছে; কিন্তু আমরা ওঙ্কারের যে অর্থ করি (অ, ব্রহ্মা; উ, বিষ্ণু; ম, শিব) বৌদ্ধেরা সে অর্থ করেন না। মন্ত্রে বুদ্ধ পদ্ম-হস্ত বলিয়া বর্ণিত।

† পালি বা মাগধী ভাষায় রেফ্ নাই এবং তালব্য শ ও মূর্দ্ধন্য ষ নাই। 'সঙ্ঘ' অর্থাৎ সম্প্রদায় বা সমাজ।

* * বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের অস্থিকে ধাতু বলে। উড়িষ্যার মন্দিরে বিষ্ণুপঞ্জর

বুদ্ধ মন্দিরের পশ্চিমে একটি অতি যত্নে রক্ষিত অশ্বত্থ বৃক্ষ। উরুবেলায় নগরে (বুদ্ধগয়ায়) একটি অশ্বত্থ বৃক্ষতলে শাক্যসিংহ তপস্যা ও পুণ্যবলে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হওয়ায়, অশ্বত্থের নাম বোধিদ্রুম হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বোধিদ্রুম কেবল অশ্বত্থেরই নাম নহে। শাক্যসিংহের পূর্ব্বে দীপাঙ্কর হইতে কশ্যপ পর্য্যন্ত ২৪ জন মহাপুরুষ বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পৃথক পৃথক বোধিদ্রুমআছে।—কাহারও বট, কাহারও শিরীষ, কাহারও চম্পক, ইত্যাদি। কশ্যপ বুদ্ধ ন্যগ্রোধতলে সিদ্ধার্থ হইয়াছিলেন।

বোধিদ্রুমের পশ্চিমে পানশাল (পর্ণশালা) অর্থাৎ বৌদ্ধ যাজকদিগের আশ্রম। ঐ পর্ণশালা তৃণপত্রাচ্ছাদিত কুটীর নহে। ইহা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ; কেবল তাহার বারাণ্ডায় একটি চাল আছে। পানশালের মধ্যে অনেকগুলি বুদ্ধ-ধর্ম্ম-শাস্ত্রের গ্রন্থ আছে। অধিকাংশই তালপত্রে লিখিত; কয়েক খানি মরকত পদ্মরাগাদি মণিদ্বারা খচিত। বৌদ্ধ পানশাল প্রকৃত শান্তিনিকেতন। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেই বোধ হয় কোন শান্তস্বভাব ভট্টাচার্য্যের টোলে আসিয়াছি।

পীতাম্বর, মুণ্ডিত-শির, বৌদ্ধ যাজকগণ যখন তালপত্রে লিখিত ত্রিপিটক গ্রন্থ পাঠ করেন, তখন বোধ হয় যেন আমাদের ভট্টাচার্য্যেরা গীতা পাঠ করিতেছেন। তাঁহারা যখন ভিক্ষা-পাত্র হস্তে করিয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হন, তখন তাঁহাদের কেবল ভূমির প্রতি দৃষ্টি থাকে, এ দিক্ ওদিক্ দৃষ্টিপাত করেন না এবং মুখেও কিছু যাচ্ঞা করেন না। যাহার যে ইচ্ছা তাহাই দেয়; অনেকে সিদ্ধান্ন ও ব্যঞ্জন দিয়া থাকে। সর্ব্বপ্রধান যাজককে মহাথেরো বলে। কল্যাণীর মহাথেরো সংস্কৃত জানেন। আমি তাঁহার সহিত ভাঙ্গা সংস্কৃতে আলাপ করিলাম। তাঁহার কথার ভুল ধরিতে পারি নাই; কিন্তু আমি নিজে 'ভারতবর্ষাৎ আগতোঽস্মি' বলিতে গিয়া 'ভারতবর্ষাৎ আগতাস্মি' বলিলাম। ভারতবর্ষ কোন্ দেশকে বলে মহাথেরো জানেন না। আমি বুঝাইয়া বলিলাম 'যস্মিন্ দেশে শাক্যসিংহস্ত জন্মভূমি।' মহাথেরো বলিলেন 'জম্বুদ্বীপাৎ।' তাঁহার সংস্কার এই যে লঙ্কাদ্বীপ জম্বুদ্বীপের বাহিরে। আলাপের সময় আপন দেশকে লঙ্কা বলিয়াই পরিচয় দিলেন। সিংহল কি তম্রপর্ণী নামের উল্লেখ করেন নাই। পরে মগধের অশোক

বলিয়া যে ধাতু অতি যত্নে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা বুদ্ধাস্থি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

রাজা, সিংহলের দেবানাম্-পিয়তিস্‌স রাজা, ধর্ম্মপ্রচারক মহেন্দো (মহেন্দ্র), ধর্ম্ম প্রচারিকা সঙ্গমিত্তা (সঙ্গমিত্রা) ও অনুরাধপুরের বোধিদ্রুম সম্বন্ধে দুই চারি কথা হইবার পর আমি কম্বো নগরে ফিরিয়া আসিলাম। কল্যাণীতে এত গাছ, কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বর নাই। সাগরোত্থিত বায়ুতে ম্যালেরিয়া দূর করিয়া দেয়, বোধ হয়।

ক্রমশ।

নবজীবনে শক্তিসাধনা।

১

কারে জাগাইছ ভাই। জীবন সঁপিয়ে ?
আনন্দে, অধীর প্রাণে,
এক মনে, এক ধ্যানে,
বাল বৃদ্ধ শিশু যুবা নর নারী নিয়ে ;
শঙ্খ ঘণ্টা ঘটারবে,
পূরিয়া আকাশ ভবে,
সর্জ্জরস-ধূম গন্ধে ভুবন ভরিয়ে,
কারে জাগাইছ ভাই ! যতন করিয়ে ?

২

কারে জাগাইতে চাও, জান কি সাধনা ?
মনে আছে মূল মন্ত্র ?
দেখেছ পুরাণ তন্ত্র ?
কি উদ্দেশ্য বোধনের, কিবা সে কামনা ?
ভূমণ্ডলে কে বা বল,
এই প্রথা প্রচারিল ;
কি ফল লভিলা তিনি তুমি কি জাননা ?
ভুলেছ পুরাণ কথা পুরাণ ভাবনা !

৩

সে ত ভুলিবার নয় অপূর্ব্ব কাহিনী—
ত্রেতায়, করিয়া ভক্তি,
জাগাইয়ে মহাশক্তি,
জানকী উদ্ধার করে রাম রঘুমণি।
নীলোৎপল বিনিময়ে,
নীল আঁখি উপাড়িয়ে
উদ্যত উৎসর্গ দিতে ; অভয়া অমনি
দিলা বর, রাম নামে পূরিল ধরণী।

৪

রাঘবের মহাব্রত ভারত ভিতরে
আজিও রয়েছে লেখা
মুছিবে না সেই রেখা,
তন্ত্রে মন্ত্রে হৃদে হৃদে অনল অক্ষরে।
আজিও কলির শেষে,
দীন হীন শীর্ণ বেশে,
শূন্য গেহে, শূন্যদেহে, অশক্ত অন্তরে,
অশক্ত বাঙ্গালি শক্তি পূজে ঘরে ঘরে।

৫

বাঙ্গালি অধম জাতি ঘুচায়ে সকল;
ছাড়ে নাই সেই ব্রত,
ডাকিতেছে অবিরত—
"আয়াহি বরদে দেবি" দেহে দাও বল;
তোমার চরণে মতি
রেখে, যেন পাই গতি,
এ দুর্দ্দিনে তোমা বিনে নাহি মা সম্বল;
তোমারি কৃপায় কার্য্য হইবে সফল।

৬

জানকী হারায়ে রাম করিলা সাধনা।
সর্ব্বস্ব হারায়ে মোরা,
ডাকি সেই সারাৎসারা—
"উঠ জাগ জগদম্বা ঘুমালে হবে না;
সাধুপদ চিহ্ন ধরি,
দেহ প্রাণ পণ করি,
অধম যাচিছে তব অপার করুণা;
"যথৈব রামেণ,' যেন পূরে মা কামনা।"

৭

বার বার বর্ষে বর্ষে যুগ যুগ ধরি,
মানসে তোমার পূজা,
করিলাম দশভূজা;
হৃদয়ের প্রীতিপুষ্পে দিয়ে অশ্রুবারি।
কৈ মা পাষাণ সুতে!
অশ্রুধারা মুছাইতে,
এখনো অভয় কর দিলে না প্রসারি!
সন্তাপ নাশিনী নামে কলঙ্ক শঙ্করি!

৮

পূজিয়াছি বার বার তবু কি ছাড়িব
শিরায় শোণিত কণা
থাকিতে ত ছাড়িব না;
কঙ্কালাস্থি-সার-দেহে চরণ পূজিব
শ্মশান এ বঙ্গালয়ে,
শ্মশান হৃদয় ল'য়ে,
শ্মশানবাসিনী পদে পুষ্পাঞ্জলি দিব,
শ্মশানে চন্দন কভু শোভে কি দেখিব।

৯

যুগে যুগে তব পূজা হইল প্রচার।
আজি নব যুগ বঙ্গে,
নব জীবনের রঙ্গে,
নিনাদে অবনী ব্যোম করিয়া বিদার;
কাঁপাইয়া সিন্ধুবারি,
কাঁপাইয়া দিক চারি,
কোটি কণ্ঠে করপুটে ডাকিব আবার—
"উঠ জাগ জগদম্বে ঘুমায়ো না আর।"

১০

উঠ রবি-শশী-বহ্নি—ত্রিচক্ষু ধারিণী!
রবিনেত্র প্রকাশিয়ে,
আঁধারে আলোক দিয়ে,
আঁধার আঁধার পুরে পোহাও রজনী।
ডুবুক্ কুগ্রহ তারা,
উঠ শীঘ্র শিবদারা,
তরুণ অরুণ-করে হাসুক ধরণী;
ফুটুক সরসী কোলে কনক নলিনী।

১১

"অর্দ্ধেন্দু শেখরা"জাগ ইন্দু আঁখি মেলি,
অমার আঁধার রাশি,
সুধা বরিষণে নাশি,
হাসুক্ শরতশশী দিগন্ত উজলি।
এস এস শারদীয়ে!
প্রাবৃটে বিদায় দিয়ে,
প্রকৃতি-নয়ন-অশ্রু ঝরিছে উথলি;
মুছি ধারা, কর দূর কাল মেঘাবলী।

১২

তৃতীয় নয়ন মাতঃ তেজোরূপী তোর।
তেজোহীন এই ভূমি,
তেজদৃষ্টি দেহ তুমি,
নিস্তেজ সন্তান দল নিদ্রায় বিভোর।
তুমি আঁখি মেল দুর্গে,
জাগুক্ ভকতবর্গে,
দেখুক্ নিদ্রিতপুরে পশিয়াছে চোর;
সর্ব্বস্ব হ'রেছে পাপী অবিশ্বাসী ঘোর।

১৩

জাগিয়া সগণে এস দরিদ্রের পুরে।
কমলা কমলাসীনা,—
বাগ্‌বাণী করে বীণা,
চির সহচরী তব দুপাশে বিহরে।
সুত গুহ গজানন
দৈত্য-বিঘ্ন বিনাশন,
দানব দলনী তুমি শিব কান্ত শিরে;
কেশরী বাহনে নাশ অসুরে অচিরে।

১৪

আজি নব যুগোৎসাহে, নবীন তরঙ্গে
মাতায়ে পাগল প্রাণে,
নব জীবনের গানে,
নবমন্ত্রে মহাশক্তি আরাধিব রঙ্গে।
কে আছ পরম ভক্ত—
ব্রতপর ঘোর শাক্ত;—
দুর্গা নামে তুলি ডঙ্কা মাতাইয়া বঙ্গে
এস হে সঁপিবে প্রাণ সাধন প্রসঙ্গে।

১৫

বুঝেছি সাত্ত্বিক ভাবে শক্তি আরাধনে
সফল হবে না ব্রত,
সঙ্কল্প হইবে হত,
আতপ তণ্ডুলে কিবা কুসুম চন্দনে,
মোদকে, পায়সে, ফলে,
পঞ্চামৃতে, গঙ্গাজলে,
তুষিতে নারিবে শক্তি বিনা বলিদানে;
আত্ম বলিদান চাই শকতি প্রাঙ্গণে।

১৬

বাজা ঢাক ঢোল কাড়া দুন্দুভি বাজনা!
বাজা বলি-বাদ্য-বোল;
দেশে দেশে উতরোল,
কেন্দ্রে কেন্দ্রে গ্রহে গ্রহে পড়ুক ঝঞ্ঝনা;
জয় মা জয় মা রবে,
উন্মত্ত সাধক সবে,
উৎসাহ-পাগল প্রাণে প্রাঙ্গণে নাচ না;
'ও মা দিগম্বরি' বোলে মাতিয়ে গাহ না।

১৭

খরধার তরবার লও রে ত্বরিতে।
পশুরক্তে বসুন্ধরা
আজিরে হইবে ভরা ;
দুর্গার শোণিত তৃষা হবে নিবারিতে।
রুধির বহিবে খরে,
রুধিরাক্ত কলেবরে,
বলি-প্রিয়া পদে সবে হবে নিবেদিতে ;
"হয় মা বিজয় দাও, নতুবা মরিতে।"

১৮

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন"—
এই পণ রাখি মনে,
মহাশক্তি আরাধনে,
অবশ্য হইবে জয় সঙ্কল্প সাধন।
তখন আরতি রবে,
ভুবন মোহিত হবে ;
ভুবন মোহিনী কান্তি সহস্র কিরণে !
হাসাইবে, জুড়াইব চামর ব্যজনে।

১৯

প্রতিজ্ঞা অনল দীপ্ত জ্বালিয়া মানসে,
হোমকার্য্য সম্পাদিব,
কুমতি আহুতি দিব—
শোক মোহ ভয় পাপ অজ্ঞান কল্মষে।
পুষ্পাঞ্জলি অতঃপর,—
পাদ পদ্মে দিয়ে কর,
বলিব "রেখো মা নিত্য ও পদ পরশে,
আর যেন তোমা হারা হই না অলসে।"

২০

এইরূপে মহাযজ্ঞ সমাধা হইলে ;
বর্ষে বর্ষে প্রতিমায়,
পূজি সর্ব্ব মঙ্গলায়,
শক্তি সাধনার তত্ত্ব বুঝিবে সকলে।
হৃদয় মন্দির হতে,
কিন্তু যেন কোন মতে,
ডুবায়ো না শক্তিমূর্ত্তি বিস্মৃতির জলে।
ভবের ভরসা পুন দিও না অতলে !

ষোড়শোপচারে পূজা।

দেহ এবং মন দুইটি পৃথক পদার্থ কি না, দেহ এবং মনের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে, তাহা কি নিয়মে নির্দ্ধারিত, এ সকল কথার আমি আলোচনা করিব না, আলোচনা করিবার প্রয়োজনও নাই। দেহ এবং মন দুই রকমের বস্তু। একটা ভাব বা চিন্তা যে রকম জিনিস, এক খণ্ড মাংস বা এক ফোঁটা রক্ত, সে রকম জিনিস নয়। গোড়ায় দুই রকম জিনিস এক কি না বলিতে পারি না, এবং সে কথার মীমাংসাও এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু গোড়ায় যাহাই হউক, আমরা যে আকারে দেখি বা অনুভব করি, সে আকারে দুইটি জিনিস যে দুই রকমের, সে বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ অসম্ভব। দুইটি জিনিস মানুষের কাছে দুই রকমের বোধ হয় বলিয়া, মানুষের মধ্যে ধর্ম্ম, ঈশ্বর, পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি গুরুতর বিষয় লইয়া অনেক মতভেদ, অনেক বিরোধ, বিতণ্ডা হইয়াছে এবং হইতেছে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয় যে, সেই সকল মতভেদ এবং বিরোধবিতণ্ডা নিতান্তই অমূলক ও অন্যায়।

দেহ এবং মন, জড়জগৎ এবং আত্মা, দুইটি ভিন্ন রকম জিনিস বলিয়া অনুভূত হইলেও এমনি জড়িত, এমনি একটি সম্পর্কবদ্ধ, যে একটি অপরটিকে ছাড়িতে পারে না, একটির পূর্ণতা অপরটি নহিলে হয় না, একটির চরিতার্থতা অপরটিতে। দেহ—মনের আকাঙ্ক্ষার বস্তু—দেহকে পাইলে তবে মনের পরিতৃপ্তি হয়। সন্তান জননীর হৃদয়ের নিধি—কিন্তু সন্তানকে কোলে করিলে তবে জননী-হৃদয়ের পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়। বন্ধুত্ব মনে মনে, হৃদয়ে হৃদয়ে; কিন্তু সেই মনে মনে, সেই হৃদয়ে হৃদয়ে যত মিল, যত মিশামিশি, দেহে দেহে আলিঙ্গন তত ঘন ঘন, তত গাঢ়, তত মিষ্ট। যত দিন মনের মিল, হৃদয়ের মিশামিশি অসম্পূর্ণ, তত দিন কেবল কথাবার্ত্তা; যখন সেই মিল, সেই মিশামিশি ষোলকলায় সম্পূর্ণ, তখন একাসনে বসিয়া এক পাত্রে ভোজন। মনের চরম স্ফূর্ত্তি—দেহ। মন যখন বড় মাতিয়া উঠে, দেহ তখন তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে, মন আর ফাটিয়া যাইতে পারে না। জড় জগৎ অন্তর্জগতের চরম মূর্ত্তি এবং চরমকালের জীবন। ভগ্নপ্রাণা জননী মৃত্যুকালে পুত্রের মুখ দেখিতে

পাইলে পূর্ণপ্রাণে মরিয়া যায়; অভিমানিনীর হৃদয়ের অসহনীয় তুফান-রাশি একটি ক্ষুদ্র চুম্বনে মিলাইয়া যায়। আবার মন— দেহের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। মনকে পাইলে তবে দেহের পরিতৃপ্তি হয়। সুসন্তানকে কোলে করিয়া জননীর কোল যত পরিতৃপ্ত, কুসন্তানকে কোলে করিয়া তত নয়। সুন্দর দেহে সুন্দর মন না দেখিতে পাইলে সুন্দর দেহ বুকে করিয়া দেহের সুখ হয় না। অন্তর্জগৎ জড়জগতের জীবন ও চরমমূর্ত্তি। অতএব প্রকৃত তত্ত্বদর্শীর কাছে জগতে দুইটি জগৎ নাই—জগতে একটি মাত্র জগৎ।

দেহ এবং মনের, জড়জগৎ এবং আধ্যাত্মিক জগতের বিমিশ্র ভাব এত গাঢ়, তাহাদের পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল, তাহাদের পরস্পরের পরিণতি এত অনিবার্য্য বলিয়াই মানুষের মনের ভাব কেবল মনে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, শুধু মানসিক আকারে থাকিয়া পরিতৃপ্ত হয় না এবং পূর্ণতা লাভ করে না। প্রণয়ী প্রণয়িনীকে শুধু মনে ভাবিয়া পরিতৃপ্ত হয় না, প্রণয়িনীর হস্তাক্ষর বা প্রতিমূর্ত্তি বা অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করে। পুত্র স্বর্গীয় পিতাকে শুধু মনে মনে স্মরণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয় না, পিতার নামে দেবালয় স্থাপন বা সরোবর খনন করিয়া কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হয়। জাতীয় ভাব মনে সীমাবদ্ধ, জাতীয় পতাকায় উচ্ছলিত। ফরাসী "জাকবিণ" গণ tri-colour flag দেখিলে ক্ষেপিয়া উঠিত। সমরক্ষেত্রে সৈন্যদল সামরিক ধ্বজদণ্ড দেখিতে পাইলে সিংহবিক্রমে সংগ্রাম করে। Fatherland বলিলে স্বদেশাভিমানী, স্বদেশ-গৌরব-গর্ব্বিত জর্ম্মাণের মনে যে অপূর্ব্ব ভাব উদয় হয়, সেইভাব সে দিন বার্লিন নগরে এক অপূর্ব্ব ধাতু-নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিল। মহাকবি দান্তের সম্বন্ধে ফ্লুরেন্সবাসীর হৃদয় সেই প্রকারে ফোটে নাই বলিয়া মহাকবি বাইরণ ফ্লুরেন্সবাসীকে হৃদয়শূন্য বলিয়া তিরস্কার করিলেন। অন্তর্জগতের চরম মূর্ত্তি এবং শেষ পরিণতি বহির্জগৎ। তাই এথেন্সবাসীর তত সুন্দর পার্থিনন, পালমায়রার তত গর্ব্বের সূর্য্য-মন্দির, শলোমনের তত যত্নের ঈশ্বরাবাস, পোপদিগের অনুপম শিল্পরত্ন-শোভিত মাইকেল এঞ্জেলোর অপূর্ব্ব প্রতিভাপ্রসূত সেণ্টপিটার্স, মুসলমান বাদশাহের মতি-মসজীদ, আর হিন্দুর সেই অপূর্ব্ব অলৌকিক অলোকসামান্য ষোড়শোপচারে পূজা। তাই ফিদিয়সের 'জুপিতর', রোমান ক্যাথলিকের 'মেদনা', আর হিন্দুর দেব দেবীর প্রতিমা। ইহার কোনটিই তুচ্ছ নয়— সকলগুলিই সত্য, সকল গুলিই মনুষ্যত্ব, সকলগুলিই মানব-প্রকৃতির এবং জগৎ-প্রকৃতির গূঢ় রহস্য এবং চরম

উক্তি।• স্বয়ং ভগবানই জড়জগতে ব্যক্ত হইয়া মহিমাময় বা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন।

মহ্যাদির্মহিমা তব।

পৃথিবী প্রভৃতি তোমার ঐশ্বর্য্য। (রঘুবংশ—১০ম সর্গ।)

জড়জগতই অন্তর্জগতের ঐশ্বর্য্য। হৃদয়ের প্রতিমা বিনা হৃদয় যথার্থই শক্তিহীন, যথার্থই দরিদ্র, যথার্থই মরুভূমি; সে মরুভূমে ফুলও ফোটে না, জলও ছোটে না, গাছও গজায় না, পাখীও গায় না, মেঘও খেলে না, বারিও বর্ষে না! পিপাসায় হৃদয় ফাটিয়া গেলেও সে বিকট মরুভূমে একটা অলীক মৃগতৃষ্ণিকা বই আর কিছুই জুটে না।

পৌত্তলিকতার মূল এবং উৎপত্তি মানব প্রকৃতিতে,জগৎ প্রকৃতিতে, ঈশ্বর প্রকৃতিতে। এখন পৌত্তলিকতার আবশ্যকতা এবং উপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

আদিম অবস্থায় মনুষ্যের ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপ এবং দেবতা কি রকম, ঠিক করিয়া বলা বড় সহজ নয়; আদিম মনুষ্যের ভাষা অতি অসম্পূর্ণ, তাহাতে সভ্য মনুষ্য প্রায়ই সে ভাষা বুঝিতে পারে না। অনেক স্থলে অসভ্য মনুষ্যের কার্য্য দেখিয়াই তাহার মনের ভাব অনুমান করিতে হয়, তাহাতে কত ভুল ভ্রান্তি হওয়া সম্ভব,—বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝিতে পারেন। তাই খ্যাত-নামা পুরাতত্ত্ববিদেরা ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না যে, যে অসভ্য মনুষ্য বৃক্ষ পূজা করে, সে বৃক্ষটাকেই পূজা করে, কি বৃক্ষস্থিত কোন কল্পিত দেব-তাকে পূজা করে *। এই প্রসঙ্গে আমরা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি তাহা হইতে মোটামুটি এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, প্রথমে বৃক্ষটাই পূজিত হয়, তাহার পরে বৃক্ষে একটি স্বতন্ত্র দেবতা কল্পিত হইয়া সেই দেবতা পূজিত হন। একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষকে একটা প্রকাণ্ড শক্তি মনে করিতে যতটুকু মানসিক শক্তি ও শিক্ষা আবশ্যক, বৃক্ষস্থিত অথচ বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র একটি শক্তি কল্পনা করিতে তদপেক্ষা বেশী মানসিক শক্তি ও শিক্ষা আবশ্যক। কারণ প্রথম ক্রিয়াটি মানসিক বিশ্লেষণ ব্যতীত সম্পন্ন হয়, দ্বিতীয়টি হয় না। কিন্তু বৃক্ষপূজায় বৃক্ষই পূজিত হউক বা বৃক্ষস্থিত কল্পিত দেবতাই পূজিত হউন, সে পূজা ঠিক পৌত্তলিকতা নয়। পৌত্তলিকতা প্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত হয় না এবং প্রকৃত পৌত্তলিকতায় প্রতিমূর্ত্তি মানব মূর্ত্তির

* Sir John Lubbock's *Origin of Civilisation* নামক গ্রন্থ দেখ।

অনুকরণে নির্ম্মিত হয় *। অর্থাৎ পৌত্তলিকতায় দেবতা একটা অপরিস্ফুট মানসিক ভাবের ন্যায় একটি কাষ্ঠখণ্ড বা প্রস্তরখণ্ড না হইয়া, একটি পরিষ্কার পরিস্ফুট ভাবের একটা পরিষ্কার পরিস্ফুট মূর্ত্তি। প্রথমত পরিস্ফুটে এবং অপরিস্ফুটে কত প্রভেদ, মানসিক শিক্ষা এবং শক্তির কত বেশীকম, তাহা বুঝিয়া দেখিতে হইবে। বুঝিয়া দেখিলে, আদিম জড়-পূজা অপেক্ষা পৌত্তলিকতা কত উৎকৃষ্ট এবং উন্নত তাহা জানা যাইবে। দ্বিতীয়ত পরিস্ফুট মনের ভাবকে পরিস্ফুট মূর্ত্তিতে ব্যক্ত করিতে আরও কত শিক্ষা, আরও কত উন্নতি আবশ্যক তাহা বুঝিয়া দেখিতে হইবে। মনের ভাবকে দেহের ভঙ্গি বা মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিতে হইলে, দেহ এবং মন উভয়কেই কত ভক্তিভাবে, কত প্রেমভরে, কত তদ্গতচিত্তে, কত বিচারশক্তি সহকারে অধ্যয়ন করা আবশ্যক এবং মানসিক শক্তি এবং শিক্ষা কত বেশী হইলে সে রকম অধ্যয়ন সম্ভব হয়, তাহা বুঝিয়া দেখিতে হইবে। বুঝিয়া দেখিলে তবে জানিতে পারিবে যে, পৌত্তলিকতা মানুষের অবনতি-ব্যঞ্জক নয়, প্রভূত এবং প্রকৃত উন্নতিব্যঞ্জক। এই জন্য খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ পৌত্তলিকতা-বিদ্বেষী হইয়াও এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন যে, পৌত্তলিকতা মানুষের অধম অবস্থার ধর্ম্ম নয়।†

ফল কথা, মনের শক্তি বা গুণ জড়-মূর্ত্তিতে প্রকাশ করার নাম পৌত্তলিকতা বা idolatry। শুধু তাই নয়। যে মানসিক শক্তি বা গুণ পৌত্তলিকতায় জড়-মূর্ত্তিতে প্রকাশ করা হয়, সে শক্তি বা গুণ, চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় এমন, কোন একটি ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষে অবস্থিত নয়। সে শক্তি বা গুণ পৌত্তলিক নিজ মনে নিজ মানসিক শক্তি দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। কিন্তু সেইরূপ উপলব্ধি করার নাম idealisation বা ভাবাভিনয়ন। অতএব idolatry বা পৌত্তলিকতার অর্থ artistic idealisation বা শিল্পব্যক্ত ভাবাভিনয়ন। এখন দেখিতে হইবে যে, পৌত্তলিকতা যদি artistic idealisation বা শিল্পব্যক্ত ভাবাভিনয়নই হয়, তবে ধর্ম্মোন্নতির

* "The idol usually assumes the human form"—Sir John Lubbock's *Origin of Civilisation* নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ২৫৯ পৃষ্ঠা।

† "The worship of Idols characterises a somewhat higher stage of human development. We find no traces of it among the lowest races of men." Sir John Lubbock's *Origin of Civilisation* নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ২৫৬ পৃষ্ঠা।

নির্মিত্ত মানুষের পৌত্তলিকতার আবশ্যক আছে কি না। বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সর্ব্বপ্রকার মানসিক শিক্ষা এবং সকল শিক্ষা অপেক্ষা হৃদয়ের শিক্ষা, idealisation বা ভাবাভিনয়ন দ্বারা যত সাধিত হয়, তত আর কিছুরই দ্বারা হয় না। উচ্চ কাব্য পড়িয়া হৃদয়ের যে শিক্ষা হয়, দর্শন বা নীতিশাস্ত্র পড়িয়া তাহার এক শতাংশও হয় না। দর্শন বা নীতি শাস্ত্রের কার্য্য বুদ্ধিবৃত্তির উপর। কাব্যের কার্য্য হৃদয়ের উপর। দর্শন বা নীতিশাস্ত্র—বিচার করার, তর্ক করার, বুঝিবার ও বুঝাইবার শক্তি দেয়। কাব্য হাসায়, কাঁদায়, আহ্লাদে উৎফুল্ল করে, শোকে অভিভূত করে, দুঃখে গলাইয়া দেয়, রাগে আগুন করিয়া তুলে। যা করিতে পারিলে মানুষের প্রবৃত্তি প্রবল হয় এবং মানুষ প্রবৃত্তির অনুযায়ী কার্য্যের দিকে প্রধাবিত হয়, কাব্য তাহাই করে; নীতি বা দর্শনশাস্ত্র তাহা করিতে পারে না। ইতিহাস কিয়ৎ পরিমাণে পারে, কিন্তু কাব্য যত, তত নয়। তাই সাহিত্যে কাব্যের পদ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাই বাল্মীকির রামায়ণ, বেদ ব্যাসের মহাভারত, দান্তের ইন্‌ফার্ণো, সেক্ষপীয়রের নাটক, শেলির গীতি, বিদ্যাপতির পদাবলী সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান রত্ন। তাই অর্ফিয়সের সঙ্গীত, ফিদিয়সের প্রস্তর-মূর্ত্তি, টর্ণর, টিশিয়ান বা রাফেলের চিত্র মানুষের মানসিক সম্পত্তির মধ্যে এবং উন্নতির উপাদানের মধ্যে এতই অমূল্য। অতএব যে idealisation বা ভাবাভিনয়নের গুণে কাব্য, চিত্র এবং সঙ্গীত এত মহিমাময় এবং শিক্ষোপযোগী, সেই idealisation বা ভাবাভিনয়নের গুণে পৌত্তলিকতাই বা কেন মহিমাময় বা শিক্ষোপযোগী না হইবে? একটু খুলিয়া বলি। পতিভক্তি বা পাতিব্রত্য যে জিনিস, সকলেরই তাহার এক রকম না হয় আর এক রকম জ্ঞান বা সংস্কার (idea) আছে। কিন্তু সকলের সংস্কার সমানও নয় এবং সম্পূর্ণও নয়। কেহ মনে করেন আপনি না খাইয়া পতিকে খাওয়ান পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা; কেহ মনে করেন প্রতিদিন পতির চরণামৃত পান করা পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা। কিন্তু পতিভক্তির আর একটি চিত্র দেখাই দেখ দেখি। পতির জন্য সীতাদেবী কত কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, কত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। অবশেষে যখন পরীক্ষার পর পরীক্ষার নিমিত্ত দেবীকে রামচন্দ্রের সেই প্রজামণ্ডলী-পরিবেষ্টিত বিরাট সভায় আনয়ন করা হইল, তখন দেবীর মুখে একটি কথা নাই—রাগের, ক্ষোভের বা অভিমানের শব্দটিমাত্র নাই।

তখন দেবীর—

কাষায়পরিবীতেন স্বপদার্পিতচক্ষুষা।
অন্বমীয়ত শুদ্ধেতি শান্তেন বপুষৈব সা॥ (রঘুবংশ ১৫ সর্গ)

রক্তবস্ত্রে তাঁহার শরীর আচ্ছাদিত, নিজপদে দৃষ্টিসংলগ্ন, তিনি যে পবিত্র-স্বভাবা তাহা তাঁহার সেই শান্ত মূর্ত্তিতেই প্রকাশ পাইতে লাগিল।

তাঁহার শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া উপস্থিত প্রজামণ্ডলী আপনাদের প্রচারিত নিন্দাবাদের কথা মনে করিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিল। মহর্ষি বাল্মীকি প্রজাগণের সন্দেহ নিরাকৃত করিতে দেবীকে অনুমতি করিলেন। কোমলতাময়ী কামিনী আর কত সহ্য করিবে! দেবী কহিলেন—'যদি আমি কায়মনোবাক্যে পতি হইতে বিচলিত হইয়া না থাকি তবে দেবি বিশ্বম্ভরে! আমাকে অন্তর্হিত কর।' পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া গেল, ভিতর হইতে বিদ্যুৎ-প্রভা উথলিয়া উঠিল। সেই প্রভারাশির মধ্যে এক অপূর্ব্ব সিংহাসনোপরি স্বয়ং দেবী বসুন্ধরা উপবিষ্টা। দেবী বসুন্ধরা দুঃখিনী সীতাকে কোলে করিয়া অন্তর্হিত হইতেছেন। তখন সীতা কি করিতেছেন?

সা সীতামঙ্কমারোপ্য ভর্ত্তৃপ্রণিহিতেক্ষণাম্।
মামেতি ব্যাহরত্যেব তস্মিন্ পাতালমভ্যগাৎ॥

তখন সীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত, বসুন্ধরা সীতাকে ক্রোড়ে লইলেন, এবং রাম, "না" "না" ইহা বলিতে না বলিতেই রসাতলে প্রবেশ করিলেন।

তখনও সীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত!—বল দেখি, পতিভক্তির এমন চিত্র, পতিভক্তির এমন ভাব আমাদের কার মনে আছে? এ কি কম শিক্ষা? এ শিক্ষার তেজে একটা মানুষ কি আর একটা মানুষ হইয়া যায় না? প্রতিভা কি মানুষ গড়ে না? আবার বল দেখি, প্রতিভাশালী কবি যে চিত্র আঁকিলেন, প্রতিভাশালী চিত্রকর যদি সেই চিত্র, পটে ফুটাইতে পারেন, তাহা হইলে সে পটেই বা কি অপরূপ অপূর্ব্ব কাব্য হইয়া পড়ে, সে পটেই বা কত অমূল্য শিক্ষালাভ হয়! কাব্য অপেক্ষা চিত্র অনেক সময়ে, অনেক স্থলে এবং অনেকের পক্ষে শিক্ষাসম্বন্ধে বেশী উপযোগী। কেন না কাব্য শব্দরচিত; শব্দ সঙ্কেত মাত্র, অতএব কাব্য বুঝিয়া লইতে হয়; চিত্র শরীরী, অতএব চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই হয়। কাব্যে অনেক জিনিস বুঝান যায় না, বা বুঝান সহজ নয়,—যেমন হৃদয়ের অবস্থাবিশেষে দেহের

মূর্ত্তিবিশেষ; চিত্রে তাহা সহজেই বুঝান যায়। কবি বলিয়া দিলেন—তখনও সীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত। ইহাতে পতিভক্তির তুমি একটি অপূর্ব্ব আভাস পাইলে। কিন্তু তখন সীতার সেই মুখের, সেই নয়নের কিরূপ ভাব তাহা কবি ফুটাইয়া দিতে অক্ষম, কিন্তু তাহা চিত্রিত দেখিলে পতিভক্তির মানসিক মূর্ত্তি কত গাঢ়তর, কত বেশী মুগ্ধকর হইয়া উঠে, বল দেখি? তুমি আমি কবির কথা কয়টি পড়িয়া সে মুখের, সে নয়নের, সে দৃষ্টির সম্যক চিত্র কি মনে ফুটাইতে পারি? কিন্তু রাফেলের সমতুল্য কোন হিন্দু চিত্রকর যদি সেই মুখের, সেই নয়নের, সেই দৃষ্টির অভিব্যক্তি চিত্রপটে আঁকিয়া দেখান, তাহা হইলে পতিভক্তির মানসিক মূর্ত্তি কেমন অলৌকিক ভাবে ফুটিয়া মনকে মজাইয়া তুলে! এখন বোধ হয় বুঝা যাইতেছে যে, হৃদয়ের শিক্ষা এবং উন্নতি সম্বন্ধে কাব্য বল, চিত্র বল, প্রতিমা বল, যাহাতে idealisation বা ভাবাভিনয়ন আছে, তাহাই মানুষের নিতান্ত আবশ্যক, উপযোগী ও উপকারী। আবার শুধু আবশ্যক, উপযোগী ও উপকারী নয়—অপূর্ব্ব মহিমাময়। জ্ঞান বল, বুদ্ধি বল, যাহাই বল, প্রতিভার ন্যায় মহৎ কেহই নয়। পৃথিবীতে স্বর্গ দেখাইবার নিমিত্ত প্রতিভার আবির্ভাব হয়। স্বর্গ কেমন? যেমন রামায়ণে সীতা, ভারতে ভীষ্ম, সেক্ষপীয়রে দিস্‌দেমনা, শিলরে থেক্‌লা, সফক্লিসে অন্তাইগনি। আবার ভাবাভিনয়ন সেই প্রতিভার একচেটিয়া বস্তু। তবেই দেখ ভাবাভিনয়নমূলক কাব্য বা চিত্র বা প্রস্তরমূর্ত্তি কিরূপ স্বর্গীয় বস্তু—কিরূপ মহিমাময়! তাই বলি যদি শিল্পব্যক্ত ভাবাভিনয়ন এতই মহিমাময় হয়, আর হৃদয়ের অপরাপর ভাব পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধনার্থ এতই আবশ্যক, উপযোগী এবং উপকারী হয়, তবে ধর্ম্মের বেলা কেনই বা মহিমাশূন্য হইবে এবং হৃদয়ের ঈশ্বর-ভাব বা ধর্ম্মভাব পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধন বিষয়ে অনাবশ্যক, অনুপযোগী এবং অপকারী হইবে? মানবের গুণ আমি নিজে যেমন বুঝিয়া উঠিতে পারি, প্রতিভা যদি আমাকে তদপেক্ষা বেশী বুঝাইয়া দিতে পারে, তবে ঈশ্বরের গুণ আমি নিজে যেমন বুঝিয়া উঠিতে পারি, প্রতিভা কেন আমাকে তদপেক্ষা বেশী বুঝাইতে পারিবে না? আর প্রতিভা যদি তাহাই পারে—কাব্যে হউক, চিত্রে হউক, প্রস্তরপ্রতিমাতে হউক—প্রতিভা যদি তাহাই পারে, তবে কি জন্য আমি প্রতিভার কাছে তাহা বুঝিয়া না লইব—কি জন্য আমি আপনাকে সে শিক্ষায় বঞ্চিত করিব? মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে প্রতিভার কাছে শিক্ষা গ্রহণ

না করিলে, আমি যেমন পাপগ্রস্ত হই, ঈশ্বর-প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রতিভার কাছে শিক্ষা গ্রহণ না করিলে আমি কি তেমনি পাপগ্রস্ত হইব না? কাব্য বল, চিত্র বল, প্রতিমা বল, সকলই idealisation বা ভাবাভিনয়ন—হৃদয়ের শিক্ষার প্রধান উপায়। ঈশ্বর-ভাব উপলব্ধি করা হৃদয়ের কাজ। ঈশ্বর সম্বন্ধে হৃদয়ের শিক্ষার প্রকৃত উপায় জ্ঞান বা বিচার নহে, ভাবাভিনয়নই প্রকৃত উপায়। আবার যদি ভাবিয়া দেখা যায় যে, জ্ঞান-পথ অপেক্ষা ভাবাভিনয়ন-পথ শ্রেষ্ঠ এবং সেই জন্য মনুষ্য-সমাজে কবি চিরকালই দার্শনিক, ইতিহাসবেত্তা প্রভৃতি সকলের অপেক্ষা বড়;—হোমর আরিষ্টটেল অপেক্ষা বড়, বর্জিল লিবি অপেক্ষা বড়, সেক্ষপীয়র বর্কলি, হিউম, স্পেন্সর অপেক্ষা বড়, বনিয়ন জেরমি টেলর অপেক্ষা বড়, বাল্মীকি কপিল গৌতম অপেক্ষা বড়;—তাহা হইলে প্রতিভা-প্রসূত-ভাবময়-কীর্ত্তি-অধ্যয়নই যে ঈশ্বর-ভাব পরিপোষণ এবং পরিস্ফোটনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বাপেক্ষা মহিমাময় পথ বা প্রণালী, ইহা বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। অর্থাৎ জ্ঞান-পথ অপেক্ষা কল্পনা-পথ শ্লাঘনীয়। অতএব ঈশ্বর-ভাব * ফুটাইতে ভাব বা কল্পনা পথ অনুসরণ করা, জ্ঞান-পথ অনুসরণাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় এবং বেশী গৌরবের কার্য্য।

তাই বলি পৌত্তলিকতা অপরিহার্য্য, পৌত্তলিকতা নহিলে মানুষের চলে না এবং চলিবে না, পৌত্তলিকতা ব্যতীত ঈশ্বর-জ্ঞান হয় না—হৃদয়ের ঈশ্বর-ভাব পরিপুষ্ট এবং পরিবর্দ্ধিত হয় না—মানুষের ধর্ম্মশিক্ষা সুকঠিন। সেই জন্যই যেখানে ঈশ্বরের মূর্ত্তি গড়া নাই, সেখানে হয় যীশুখ্রীষ্ট, নয় মহম্মদ। আর যেখানে তাহাও নাই, সেখানে হয় কিছুই নাই নয় আপনিই সর্ব্বস্ব। কিন্তু প্রকৃত পৌত্তলিক এখনও জন্মে নাই; যে প্রতিভা অনন্তের অনন্ত গুণ কথঞ্চিৎ মঠে পটে ফুটাইয়া দেখাইবে, সে অসাধারণ প্রতিভার আবির্ভাব এখনও হয় নাই। কিন্তু হইবে। রস্কিণ (Ruskin) বলিতেছেন† :—"Sacred art, so far from being exhausted, has yet to attain the development of its highest branches; and the task, or privilege, yet remains for mankind, to produce an art which shall be at once entirely skilful and entirely *sincere.* * * * Religious art, at once complete and sincere, never yet has existed. *It will exist.*" তাই বলি, পৌত্তলিকতার গৌরবের দিন এখনও আসে নাই—উন্নত ধর্ম্মশিক্ষা এখনও

* ঈশ্বর-জ্ঞান নয়। † *Modern Painters* গ্রন্থের ৩ বালম ৫৯।৬০ পৃষ্ঠা।

হয় নাই—ঈশ্বর-ভাব বা ঈশ্বর-মূর্ত্তি মানব-হৃদয়ে ভাল করিয়া এখনও ফোটে নাই। সে শুভ দিনের এখনও কিছু বিলম্ব আছে। পৌত্তলিকতার পূর্ণ মহিমা ভবিষ্যতে বিকশিত হইবে। মানুষের অদৃষ্টে এখনও অপূর্ব্ব সুখ-সৌভাগ্য সঞ্চিত রহিয়াছে।

কেহ কেহ বলিবেন, জড়বস্তু দ্বারা সকলেরই প্রতিমূর্ত্তি গড়িতে পারি, ঈশ্বরের কেমন করিয়া গড়িব? ঈশ্বর চিন্ময়—বড়ই উত্তম, বড়ই পবিত্র; পুত্তলিকা জড়—বড়ই অধম, বড়ই অপবিত্র। ইহার প্রথম উত্তর- যেমন করিয়াই ঈশ্বরের ধ্যান কর, মনে মনেই কর, আর পট পুতুল দেখিয়াই কর, তাঁহাকে আকার বিশিষ্ট না করিলে ত চলে না। আত্মাপ্রধান মহাযোগীরা যোগে তাঁহাকে মূর্ত্তিময় দেখেন।

অভ্যাস নিগৃহীতেন মনসা হৃদয়াশ্রয়ম্।

জ্যোতির্ম্ময়ং বিচিন্বন্তি যোগিনস্ত্বাং বিমুক্তয়ে॥ (রঘু—১০ম সর্গ)

যোগিগণ মোক্ষ-কামনায় অভ্যাস দ্বারা চিত্ত সংযম করিয়া, হৃদয় মধ্যে তদীয় জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ভাবনা করিয়া থাকেন।

অতএব যদি মূর্ত্তিই গড়িতে হইল, তবে মনে মনে গড়িলেই বা ন্যায্য কেন, জড়বস্তু দ্বারা গড়িলেই বা অন্যায্য কেন? দ্বিতীয় উত্তর এই যে, ঈশ্বরের জড়মূর্ত্তি গড়িলে কেমন করিয়া তাঁহার অবমাননা করা হয় এবং কেমন করিয়া অপকর্ম্ম করা হয়, বুঝিতে পারি না। দেহ এবং মনে, আত্মায় এবং জড়ে যে অপূর্ব্ব সম্বন্ধ থাকার কথা প্রথমেই বলিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, অর্থাৎ জড় যদি আত্মার আকাঙ্ক্ষা এবং চরম মূর্ত্তি হয়, তবে জড়ের সাহায্যে আত্মা চিত্রিত করিলে কেমন করিয়া আত্মার অবমাননা করা হয় বুঝিতে পারি না। তুমি মুখে বল জড় অতি অপকৃষ্ট এবং অপবিত্র। কিন্তু তোমার আত্মা ত জড়ের আকাঙ্ক্ষা করে, জড়ে পরিণত হইয়া চরিতার্থ হয়। তোমার আত্মার কাছে জড় ত তাহা হইলে অপকৃষ্ট এবং অপবিত্র নয়। তবে কেন জড়ের দ্বারা আত্মার মূর্ত্তি গঠিত হইবে না? আরো এক কথা। তুমি কেমন করিয়া বল যে জড় অপবিত্র এবং অপকৃষ্ট? জড় জগতে জগদীশ্বরের কত যত্ন, কত প্রেম, কত শক্তি-সঞ্চার তাহা কি দেখিতেছ না? একটি গাছের পাতা কত যত্নে, কত প্রেমভরে, কত শক্তি সহকারে রচিত বল দেখি? ভাল, তুমি যে গাছের পাতাটাকে অপকৃষ্ট জড় বলিয়া ঈশ্বর পূজায় ঈশ্বর পদে অর্পণ করিতে ঘৃণা বোধ কর, তুমিই সেই রকম একটা গাছের পাতা গড় দেখি। আচ্ছা,

পাতা ত বড় জিনিস—একটি বালির কণা গড় দেখি। তুমি কি বুঝ না, যে অনন্ত শক্তি হইতে আত্মা উদ্ভূত হয়, সেই অনন্ত শক্তির কণামাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হইলে একটি বালির কণাও গঠিত হইতে পারে না? তবে কেন আত্মা অপেক্ষা জড়কে এত নিকৃষ্ট দেখ? যে জড়ের কণামাত্র নির্ম্মাণ করিতে অনন্ত পুরুষের অনন্ত শক্তির প্রয়োজন, তুমি আমি কে, যে সেই জড়কে নিকৃষ্ট বা অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিব? তুমি আমি মানুষ। মানুষের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহারা কি করেন, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। বাল্মীকি, সেক্ষপীয়র, কালিদাস, দান্তে, হোমর, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ—সকলেই নর-দেবতা। কিন্তু সকলেই আজীবন জড়জগৎ অধ্যয়ন করিয়া অসীম যত্ন সহকারে এবং প্রীতিভরে জড়জগৎ চিত্রিত করিয়া আপন আপন জীবন চরিতার্থ এবং অসাধারণ প্রতিভা অতুল মহিমায় মণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। আজিও নরশিরোমণিরা—টিনডাল, হক্সলি, ডারবিণ, প্রভৃতি পণ্ডিতেরা—জড়জগৎ অধ্যয়ন করিয়া পবিত্র হইয়া যাইতেছেন! যে জড় অধ্যয়নে নরদেবতাদিগের এত যত্ন, আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা এবং স্পর্দ্ধা, যে জড় অধ্যয়ন করিয়া নরদেবতাগণ এত মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, কি বলিয়া তুমি সেই জড়কে অপকৃষ্ট এবং অপবিত্র বলিয়া তুচ্ছ কর? কি বলিয়া তুমি সেই জড়ের সাহায্যে ঈশ্বরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে ঘৃণা বোধ কর? আমি এ কথা স্বীকার করি, যে ঈশ্বর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সেই মূর্ত্তিটিকে পূজা করা কর্ত্তব্য নয়, সেই মূর্ত্তিতে যে ঈশ্বর-গুণ ব্যক্ত থাকে তাহাই পূজা করা কর্ত্তব্য। সকল উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপুস্তকের শিক্ষাও তাই। এমন কি বাইবেলেও তাই বলে। বাইবেলে প্রকৃত পক্ষে পৌত্তলিকতা নিষিদ্ধ নয়। বাইবেলে বলে—পৌত্তলিকদিগের সহিত সংস্রব রাখিও না, কারণ তাহা হইলে "they will turn away thy sons from following thee, that they may serve *other* gods." (দিউতারনমি, ৭,৪) প্রতিমূর্ত্তিতে ঈশ্বর ভুলিয়া অন্য দেবতার পূজা করাই দোষ। ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে ঈশ্বরকে পূজা করা দোষ নয়। ইস্‌রায়েলের ঈশ্বর আপনাকে *jealous* দেবতা বলিয়া (এক্সোদস্, ২০—৫) পরিচয় দিয়া ইস্‌রায়েলকে প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি কেবল অন্য দেবতার ভয়ে পৌত্তলিকতা নিষেধ করিয়াছিলেন। পাছে দুর্ব্বল-মতি ইসরায়েল সোণারূপার প্রতিমূর্ত্তি পাইয়া সোণারূপায় মজিয়া সোণারূপাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে, সেই ভয়ে ঈশ্বর ইস্‌রায়েলকে সোণারূপার প্রতিমূর্ত্তি পোড়াইয়া

ফেলিতে অনুমতি করেন।' সোণারূপায় না মজিলে, সোণারূপার মূর্ত্তি গড়িয়া ঈশ্বর পূজা করিতে কোন দোষ নাই। যে দুর্ব্বল, সেই মূর্ত্তি-ব্যক্ত ভাবে না মজিয়া, মূর্ত্তিতে মজে। মূর্ত্তি পূজা বা পৌত্তলিকতা দূষণীয় নয়, তবে শিক্ষিত, সংযতচিত্ত, উন্নত মনুষ্যের পক্ষেই বিহিত।

তাই বলি, ভাই, জড়ে আত্মায় ইতরবিশেষ করিও না। যে জড়ে—যে ফুলে—যে বৃক্ষপত্রে—যে বৃক্ষফলে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত, প্রেমভরে বিরাজিত, তাহাকে অপবিত্র বা অপকৃষ্ট বলিয়া ঘৃণা করিও না। সে সকলই ঈশ্বরের বস্তু, ঈশ্বরের স্ফূর্ত্তি, ঈশ্বরের অভিব্যক্তি, ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি। অতএব আইস ঐ পুণ্যপুরী জগন্নাথক্ষেত্রে—যেখানে সম্মুখে ঈশ্বরের মহাসমুদ্র, পশ্চাতে ঈশ্বরের মহাগিরি, উপরে ঈশ্বরের মহাকাশ—তাহে নানা বর্ণের নানা কণ্ঠের ঈশ্বরের সঙ্গীতস্রাবী পক্ষী,—যেখানে চারিদিকে ঈশ্বরের গাছ, ঈশ্বরের পাতা, ঈশ্বরের ফুল, ঈশ্বরের ফল—আইস ঐ পুণ্যক্ষেত্র মাঝে, অপূর্ব্ব অলৌকিক কবি প্রতিভা-নির্ম্মিত ঈশ্বরের অনন্ত সুন্দর অনন্ত-প্রেমময় মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে গলদশ্রু নয়নে ঈশ্বরের ফুল, ঈশ্বরের ফল, ঈশ্বরের পাতা, ঈশ্বরের লতা, ঈশ্বরের ধূপ, ঈশ্বরের দীপ, অনন্ত ঈশ্বরের অগণ্য নিধি,—আর ঐ মহাসমুদ্র, মহাগিরি, মহাকাশ, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ফুল, ফল, গ্রহ, নক্ষত্র সমস্তই হৃদয় ভরিয়া অঞ্জলি পুরিয়া উপহার দিয়া অনন্ত ঈশ্বরের ষোড়শোপচারে পূজা করি! অথবা আইস আজি বঙ্গের শুভদিনে অনন্ত পুরুষের অনন্ত শক্তিরূপিণী দশভূজার পদে অনন্ত শক্তি হইতে উদ্ভূত ফুল, ফল, ধূপ, দীপ, অন্ন, জল, বস্ত্র সকলই উৎসর্গ করিয়া অনন্তের ষোড়শোপচারে পূজা করি!

ষোড়শপচারে পূজা আমাদের হিন্দু পিতৃ পুরুষগণ ব্যতীত আর কেহ কখনও করে নাই। ষোড়শোপচারে পূজা প্রকাণ্ড হিন্দুর একটা প্রকাণ্ড কার্য্য—প্রকাণ্ড হিন্দুর একটা প্রকাণ্ড কথা। কাল, প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাণ্ডত্বব্যঞ্জক একটা প্রকাণ্ড কথা শুনিয়াছিলাম—তুষানল। আজ প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাণ্ডত্ব-ব্যঞ্জক আর একটা প্রকাণ্ড কথা শুনিলাম—ষোড়শোপচারে পূজা। আইস, তুষানলে এবং ষোড়শোপচার পূজায়, আবার সেই প্রকাণ্ড হিন্দুর সেই অলৌকিক অলোক-সামান্য প্রকাণ্ডত্ব পুনর্লাভ করি।

হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজ।

ধর্ম্মের সহিত সমাজের নিগূঢ় সম্বন্ধ। ধর্ম্ম বন্ধনই সমাজ বন্ধনের মূল। সমাজের ধর্ম্মবন্ধন শিথিল হইলে, সমাজ শোচনীয় দশাগ্রস্ত হয়, অনাচার যথেচ্ছাচার তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে। যে সমাজে ধর্ম্ম শাসন নাই, সে সমাজের লোকের আচার ব্যবহারের কোন প্রকার নিয়ম থাকে না। যাহার যেরূপ ইচ্ছা সে সেই ভাবে সমাজ মধ্যে বিচরণ করে, কিসে সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল হইবে, এ চিন্তা তাহাদিগের মনে স্থান পায় না। কোন্ কার্য্যে সমাজের ইষ্ট হইবে, কিসেই বা অনিষ্ট ঘটিবে, ইহা কেহ ভাবিতে চেষ্টা করে না। সকলেই আপনার সুবিধা ও ইচ্ছানুসারে কার্য্য করে। ধর্ম্মনিয়মে সমাজ-বদ্ধ থাকিলে এইরূপ যথেচ্ছাচার ঘটে না। সকলেই একই নিয়মে কার্য্য করে, একই ভাবে সমাজে বিচরণ করে, সেই একতায় সমাজের বল বৃদ্ধি হইতে থাকে ও তদ্দ্বারা সমাজের অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়।

ধর্ম্মদ্বারা সমাজকে বাঁধিলে সমাজের উন্নতি ও মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী বটে, কিন্তু সেই ধর্ম্মবিধি যদি সমাজের অবস্থার উপযোগী না হয়, তাহা হইলে সমাজকে/সে নিয়ম দ্বারা অনুশাসিত করা সুকঠিন। কালের অনতিক্রমণীয় শক্তির অধীন হইয়া সমাজস্থ জনগণ সমাজকে যে ভাবে পরিচালিত করিতে চাহেন, সমাজের ধর্ম্ম যদি তাহার অনুকূল না হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে বিষম ফল উৎপন্ন হইতে থাকে। সমাজের প্রচলিত ধর্ম্ম অপেক্ষা সমাজস্থ ব্যক্তিগণের বল যদি অধিক হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম সে সমাজকে শাসন করিতে পারে না। দুর্ব্বল ধর্ম্ম, বলবান সমাজবাসীগণের নিকটে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়ে। এই জন্য দেখা যায়, সমাজ যেরূপ অবস্থাপন্ন ধর্ম্মও ঠিক তাহার অনুরূপ হইয়া থাকে। ধর্ম্ম এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল হওয়াতে ধর্ম্মের মূল নষ্ট হয় না। ধর্ম্মে যে সকল অবিসম্বাদী সত্য আছে, তাহা সৃষ্টিকাল হইতে সমভাবে চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তাহা থাকিবে। তবে ধর্ম্মের আনুসঙ্গিক যে সকল অবান্তরধর্ম্মনিয়ম থাকে, সমাজের অবস্থানুসারে তাহারই পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। আমার

বক্তব্য বিষয়টি আরও একটু বিশদ করিয়া বলিতেছি। জগতের বাল্যাবস্থাতে মনুষ্যের ধর্ম্মের অবস্থা যেরূপ ছিল, আজ উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা তাহার কোন নিদর্শনই পাই না। কিন্তু সেই সময়ে ধর্ম্মের যে মূল ভাব ছিল, আজিও যে সেই ভাব বর্ত্তমান আছে, এ কথা বলিলে বোধ হয় কেহই আশ্চর্য্য হইবেন না। পূর্ব্বে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ এই আশ্চর্য্য কৌশল রচিত ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া যেমন প্রত্যেক পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন, আজ আমরা ঠিক সেই ভাবে ঈশ্বরের পূজা করি না। কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে যে মহাশক্তির অবস্থান দেখিয়া সেই বাহ্য বস্তুতে মহাশক্তির পূজা করিয়াছিলেন, আমরাও আজ সেই মহাশক্তির পূজা করিতেছি। ইহাতে ধর্ম্মভাবের মূলগত একতা দেখা যাইতেছে। অথচ সৃষ্টিকাল হইতে এই অবিনশ্বর একমাত্র ধর্ম্ম, সমাজের অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদে প্রকাশিত হইতেছে। সমাজের অবস্থানুসারে ধর্ম্মের বাহ্যিক প্রকৃতির যে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আর্য্য ঋষিদিগের সময় হইতে ভারতে এক হিন্দুধর্ম্ম কত প্রকার পরিচ্ছদে প্রকাশমান হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত যে হিন্দু-সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় প্রচলিত হইয়াছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের বাহ্যিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন যে কেবল ভারতেই ঘটিয়াছে, তাহা নহে। জগতের সর্ব্বত্রই একই নিয়মে কার্য্য হইয়া আসিতেছে। ঊনিশ শত বৎসর মাত্র যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সেই খ্রীষ্টান ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন-শীলতার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে বিশেষ রূপে প্রতীতি হইবে যে, সমাজের অবস্থা ও গতি অনুসারে ধর্ম্ম নিয়মিত হইয়া থাকে। যে অবস্থায় রোমান ক্যাথলিক মত চলিয়াছিল, সে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে বলিয়াই প্রোটেষ্টাণ্ট মতের আবির্ভাব হয়। আবার যে অবস্থায় প্রোটেষ্টাণ্ট মতের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে অবস্থার ব্যত্যয় ঘটিতেছে বলিয়া ক্রমে প্রোটেষ্টাণ্ট মত পুনঃসংস্কৃত হইতেছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ধর্ম্মের বাহ্যিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ধর্ম্মের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত প্রচলিত হওয়ার পর হইতে সমাজের অবস্থা অনুযায়ী ধর্ম্ম আর

প্রচলিত হয় নাই। চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই। ইহার কারণ এই যে, চৈতন্যদেব ঠিক ধর্ম্মসংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত হন নাই, তিনি ভক্তিবিপ্লব সাধন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। সমাজের সকল তত্ত্বের গূঢ় ভাব ঠিক সেই সময়ে বুঝিতে পারেন নাই, তাহাতেই সমগ্র হিন্দুসমাজ তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হন নাই। তথাপি তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম-অনেক পরিমাণে যে হিন্দুসমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহার কারণ এই যে, সে সময়ে হিন্দু সমাজ এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। অধ্যাপকদিগের মুখে নীরস জ্ঞানমূলক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী অনেক পণ্ডিতগণের মধ্যে নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, যাজক ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মাপেক্ষা অর্থলিপ্সা অধিক দেখিয়া, লোকের মন বিরক্ত হইয়া উঠে। ঠিক সেই সময়ে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া প্রেমমূলক বৈষম্য-বিরোধী ধর্ম্মমত প্রচার করিলেন। জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত-গণ তাঁহাদিগের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয় দেখিয়া তাঁহারা চৈতন্যদেবকে অপদস্থ করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু তথাপি তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দলে দলে লোক চৈতন্যদেবের ধর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিল। যাঁহারা আত্মীয় বন্ধুগণের ভয়ে প্রকাশ্যে যোগ দিতে পারিলেন না, তাঁহারা গোপনে যোগ দিতে লাগিলেন। হিন্দুসমাজ টলমল করিতে লাগিল। পণ্ডিতেরা প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। সমাজস্থ লোকের হৃদয় যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, চৈতন্যদেবের ধর্ম্মমত অনেক পরিমাণে তাহার উপযোগী হইয়াছিল বলিয়াই সকলে হিন্দুধর্ম্মের কঠোর শাসনকে উপেক্ষা করিয়া এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। হিন্দুসমাজের নেতাগণ দেখিলেন যে, সমাজের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে লোককে ধর্ম্মশাসনে শাসিত করা দুরূহ ব্যাপার। তাঁহারা সমাজবন্ধন শিথিল করিয়া দিলেন, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ধর্ম্মশাস্ত্রের নূতন টীকা করিলেন, সমাজবাসীগণকে সময়োপযোগী স্বাধীনতা দিলেন, সুতরাং সমাজে আবার শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। সেই সময়ে রঘুনন্দন যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের নূতন টীকা সমাজের অবস্থা বুঝিয়া প্রণয়ন না করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই হিন্দু সমাজে একটি বিষমতর বিপ্লব উপস্থিত হইত।

ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, সমাজের অবস্থানুসারে উপধর্ম্মবিধি পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। এক্ষণে হিন্দুসমাজের যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে,

তাহাতে পূর্ব্ব প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম যে সমাজের উপযোগী নহে, ইহা গোঁড়াগণ ব্যতীত সকলেই স্বীকার করিবেন। পূর্ব্বপ্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম যদি সমাজের উপযোগী হইত, ইহার বিধিব্যবস্থা যদি সমাজস্থ ব্যক্তিবৃন্দের অনুমোদনীয় হইত, তাহা হইলে সমাজ হইতে দলে দলে লোক বাহির হইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিত না। খৃষ্টধর্ম্ম এ দেশে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইবামাত্র, যে লোকে বিমুগ্ধ হইয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য ধাবমান হইতে লাগিল, ইহার অভ্যন্তরে কি কোন কারণ নাই? খৃষ্টধর্ম্মের নীতি কি হিন্দুধর্ম্মনীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, যে সেই জন্য লোকে সে ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। পূর্ব্বপ্রচলিত হিন্দু উপধর্ম্মের অপেক্ষা খৃষ্টধর্ম্মের বাহ্য উদারতা দেখিয়াই যে লোকে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এ কথা বলিবার প্রয়োজন করে না। ঠিক এই সময়ে রাজা রামমোহন রায় বঙ্গ সমাজক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। হিন্দুসমাজের লোকের হৃদয়ের গতি কোন্ দিকে তিনি তাহা বুঝিলেন, বুঝিয়া তিনি তদুপযোগী ধর্ম্মমত হিন্দুশাস্ত্র হইতেই প্রচার করিলেন। একটি দুইটি করিয়া ক্রমে ক্রমে বহু লোক তাঁহার প্রচারিত মত গ্রহণ করিতে লাগিল। কেহ প্রকাশ্যে, কেহ অপ্রকাশ্যে সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশের সকল স্থানের লোকই খ্রীষ্ট ধর্ম্মেবীতশ্রদ্ধ হইলেন।

ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, এক্ষণে যে সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে লোকের মন সরল ও উদারভাব-পূর্ণ ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। যেরূপ ধর্ম্মের দ্বারা হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন হইতে পারে, যে ধর্ম্মের সাধনপ্রণালী সহজে আয়ত্ত হইতে পারে, যাহাতে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে, যাহাতে জ্ঞানের বিকাশ সাধিত হইতে পারে, যে ধর্ম্ম সংসারকে উপেক্ষা করিয়া যখন তখন বনে গমন করিতে উপদেশ প্রদান করেন না, অথবা সংসারীর জন্য স্বতন্ত্র প্রকার শিথিল বিধি নির্দ্দেশ করেন না,—এইরূপ ধর্ম্মের প্রতি সাধারণের চিত্ত প্রধাবিত হইয়াছে। পূর্ব্বপ্রচলিত হিন্দু উপধর্ম্ম হিন্দু সন্তানদিগের চিত্তের এই সকল বাসনা মিটাইতেছেন না, সুতরাং পূর্ব্বপ্রচলিত হিন্দু উপধর্ম্মের প্রতি সাধারণের অনুরাগ ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম যদি হিন্দু সন্তানদিগের হৃদয়ের এই আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধনে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ক্রমে যে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা

হ্রাস হইবে, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অনেকে বলেন হিন্দুধর্ম্মের নীতি যেরূপ উচ্চ, তাহাতে এ ধর্ম্ম চিরদিন জগতে মস্তকোত্তলন করিয়া থাকিবে। আমরা এইরূপ মতাবলম্বীদিগের মতের প্রতিবাদ করিতে চাহি না। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যে এই ধর্ম্মের নীতি খুব উচ্চ, ইহার উপদেশ খুব গভীর ভাবপূর্ণ, একথা জানিয়া বা শুনিয়া কি ধর্ম্ম পিপাসুর হৃদয় তৃপ্তিলাভ করিতে পারে? শাস্ত্রোক্ত বাক্য বা উপদেশের মর্ম্ম আপনার জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে, কোন ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তি শান্তিলাভ করিতে পারেন না। এইখানে কথা এই, হিন্দুর উপধর্ম্ম কি হিন্দুসন্তানদিগের এইরূপ পিপাসা মিটাইতে সমর্থ হইতেছেন? হিন্দুসন্তান কি শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া ধর্ম্মামৃত পানে পরিতৃপ্ত হইতে সমর্থ হইতেছেন?—ঐ যে হিন্দুসন্তান ভাগ্য দোষে শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, উহার ঐ সাগর মন্থনে কি অধিকার আছে? ঐ ব্যক্তি যদি সাহস করিয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে ঐ মুণ্ডিত-মস্তক, কুঞ্চিত-ললাট শিখা-ধারী, যজ্ঞসূত্র-অধিকারী হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক, উহাকে পাষণ্ড অভিধানে অভিহিত করিয়া নরকে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন। হতভাগ্য শূদ্র যজ্ঞসূত্রধারী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধিতে যদিও সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন, তথাপি তাঁহার শাস্ত্র চর্চ্চার অধিকার নাই, তাঁহাকে ঐ হস্তিমূর্খ ব্রাহ্মণের পদসেবা করিয়া মুক্তির পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। ইহাতে কি তাহার পিপাসা শান্তি হইতে পারে? এইজন্যই বলিতেছি, পূর্ব্বপ্রচলিত হিন্দুর উপধর্ম্ম বর্ত্তমান সময়ের লোকদিগের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে অসমর্থ। এখন হিন্দুর উপধর্ম্ম যদি এই কার্য্য সাধনে অক্ষম হন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিদায় দিয়া যে ধর্ম্মে আমাদিগের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে, তাহারি অনুসরণ করিতে হইবে। এইস্থানে একবার একটু চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন হইতেছে। "পূর্ব্ব প্রচলিত" হিন্দুর উপধর্ম্ম সমগ্র হিন্দুসন্তানের ধর্ম্ম-পিপাসা মিটাইতে অক্ষম, কিন্তু প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম ইহাতে অসমর্থ কি না, তাহা একবার ভাবিয়া চিন্তিয়া হিন্দুধর্ম্মের নিকট হইতে চিরবিদায় লইলে ভাল হয়।

বাঙ্গালির দুর্গোৎসব।

বাঙ্গালির দুর্গোৎসব বড়ই বৃহদ্ব্যাপার। বালক কাল হইতে বর্ষে বর্ষে নিত্য ক্রিয়ার মত, দিবাকরের উদয়াস্তের মত এই দুর্গোৎসব আমরা দেখিয়া আসিতেছি, তাহাতেই দুর্গোৎসবের প্রকৃত গৌরব আমরা দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝি না। শারদীয়া মহাপূজার প্রতিমায় সর্ব্বকালিক উপাস্য দেবতার মূর্ত্তি সমষ্টি আছে, পদ্ধতিতে সকল সম্প্রদায়ের প্রণালী অন্তর্নিবিষ্ট আছে, এবং মানব কালে কালে যত প্রকার উপকরণের আয়োজনে দেব ভক্তি পরিপোষণের চেষ্টা করিয়াছে, দুর্গোৎসবের উপকরণে তাহার সকল গুলিরই প্রয়োজন হয়। বাঙ্গালির দুর্গোৎসব সকল কালের সকল প্রকার পূজার সংকলন বা (Synthesis)। শারদীয়া পূজা—প্রকৃতই মহাপূজা। এরূপ পূজা আর কোন দেশে নাই; ইহা পূজার কল্পদ্রুম বা (Encyclopædia)। স্বার্থ-চালিত জুবর্ট সাহেবের প্ররোচনায় যেমন জন কতক সাহেব শুভো কলিকাতার গড়ের মাঠে নানা দেশের শিল্প সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেরূপ ভাবে জন কতক মুনিঋষির খেয়ালে, বা জন কতক স্বার্থপর পুরোহিতের প্ররোচনায় এক সময়ে একেবারে এই মহানুষ্ঠান সঙ্গৃহীত নয় নাই। যে ভাবে মহাকাল এই বিশাল ধরণী পৃষ্ঠে স্তরের পর স্তর সংগ্রহ করিয়াছেন, যে ভাবে কাল মাহাত্ম্যে হিন্দুধর্ম্মে স্তরের উপর স্তর উঠিয়াছে, সেই ভাবে বাঙ্গালির দুর্গোৎসবে নানা রূপ উপাসনা এবং নানারূপ উপকরণ উদ্ভূত হইয়াছে; অতীত-ভক্ত বঙ্গবাসী অতীত সাক্ষীর পরামর্শমত সেই সকল সংগ্রহ করিয়াছেন। যে বিবর্ত্তন-বিকাশ জড়-জীব-জগতের মূল নিয়ম, সেই নিয়ম বলেই, সেই বৈদিক কালের শক্তিরূপা অতসী বর্ণময়ী উজ্জ্বলা অনল-শিখা, আজি এই অধঃপতনের দুর্দ্দিনে সর্ব্বদেব-পরিবেষ্টিতা মহাশক্তিতে চণ্ডীমণ্ডপ মণ্ডিত করিতেছেন। বেদের সেই দীপ্তি-শক্তি, উপনিষদের শব্দ-শক্তি, পুরাণের দেব-শক্তি, কাব্যের শোভা-শক্তি, তন্ত্রের মাতৃ-শক্তি, বাঙ্গালির কন্যা-শক্তি, আর কত কালের কতরূপ শক্তি, আজি ইতিহাসের মহা রাসায়নিক সংযোগে দ্রবীভূত, অথচ বিবর্ত্তনে বিকশিত হইয়া দুর্গোৎসবের কেন্দ্রীভূতা মহাশক্তি

রূপে বিরাজ করিতেছেন। ধনশক্তি, জ্ঞানশক্তি—গণ-শক্তি, রণ-শক্তি— পাশব শক্তি, দানবশক্তি—বৃক্ষঃশক্তি, শিলাশক্তি—অগণিত দেবশক্তি—সেই মহা কেন্দ্রের মহাবৃত্ত ভাবে মহাশক্তির শক্তিপোষণ, শোভাময়ীর শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। এমন দার্শনভরা ঠাকুর, এমন হৃদয়ভরা প্রতিমা, এমন কালভরা পদ্ধতি, এমন জগতভরা উপকরণ, এমন মানসভরা পূজা, এমন প্রবৃত্তিভরা উৎসব—আর কোন দেশে নাই। বাঙ্গালির দুর্গোৎসব মানবের হৃদয়োৎসবের চরমোৎকর্ষ এবং বাঙ্গালির পরম গৌরবের পরিচয়।

নিতান্ত অসভ্য মানবমণ্ডলী হইতে,পরিস্ফুট-চিত্তবৃত্তি সভ্য জাতি পর্য্যন্ত সকল জাতিই সকল সময়ে সকল দেশে বিশেষ বিশেষ শক্তিকে বা একটি বিশেষশক্তিকে জড় জগতের জীবন বলিয়া মনে করিয়া,—ভয়,ভক্তি—সান্ত্বনা, রঞ্জনা,—আরাধনা, উপাসনা করিয়া থাকে। প্রথমে মানবের কিরূপে শক্তি-জ্ঞান হয়, প্রথমে কোন্ শক্তির আরাধনা করিতে আরম্ভ করে, পরে ক্রমেই বা কোন্ শক্তির স্বত্তা মনুষ্য উপলব্ধি করে, এ সকল কথার আলোচনা করায় আমাদের অদ্য কোন প্রয়োজনই নাই; মানবহৃদয়ে দেবোপাসনার ক্রমবিকাশের ইতিহাস চর্চ্চায় অদ্য আমরা প্রবৃত্ত নহি। উপাসকগণ সময়ে সময়ে যে যে পদার্থে যে ভাবে জগজ্জীবনী শক্তি উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং যে ভাবে সেই শক্তির উপাসনা করিয়াছেন, তাহারই কতক কতক বুঝা অদ্য আমাদের আবশ্যক।

সকল দেশেই বোধহয় উপাসনার প্রথম অঙ্কুর ভীতি-জড়িত। ভূত, প্রেত —দৈত্য, দানব,—সিংহ, শার্দ্দূল,—শস্ত্র, সর্প—এই সকল সেই সময়ের উপাস্য দেবতা অথবা দেবতার জীবন্ত প্রতিমা। এরূপ দেবতার রঞ্জনা বা সান্ত্বনা করাই সেই সময়ের উপাসনা। শারদীয়া মহাপূজায় এই ভীতিভর উপাসনার সকল রূপ উপাস্যই আছেন, সকল রূপ আলম্বনই ইহাতে বিদ্যমান। আর সেই অসভ্য কালের উপাসনাই কি আমরা ছাড়িতে পারিয়াছি? এই বিশাল শ্মশান ক্ষেত্রে অগণিত ভূত-প্রেত আজিও বীভৎস ভাবে, বিকট মূর্তিতে আমাদের অজ্ঞানতার ঘোরতর অন্ধকার মধ্যে স্বেচ্ছা বিচরণ করিতেছে, এবং স্থানে স্থানে চিতাবহ্নির ধূসর আলোক প্রতিফলিত হওয়ায় ভীষণকে আরও ভীষণতর বোধ হইতেছে। প্রেতগণের বিকটমূর্ত্তি, অট্টহাস্য বীভৎসলীলা, পৈশাচিক ব্যবহারে আমরা সকলেই ভীত, স্তব্ধ, স্পন্দ-রহিত। কাজেই ভয়-জড়িত হৃদয়ে নিতান্ত অসভ্যের মত আমরা সেই প্রেতগণেরই

উপাসনা করিতেছি। তাহার উপর, ঐ সকল দৈত্য দানবের দারুণ দলন, সিংহ শার্দ্দূলের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন, এবং রক্ত মাংস লোভে নিয়ত পরিভ্রমণ, বিরাট অস্ত্র সকলের প্রতিনিয়ত রক্তলালসার ঝঞ্চনা, আর ঐ তীব্রচক্ষু কণ্টক-জিহ্ব খল সর্পের কালকূট বিস্তারণা। কাজেই আমরা পিশাচ-পীড়িত, দৈত্য-দলিত, সিংহ-হিংসিত, শস্ত্র-শাসিত, এবং সর্প-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া ভীতিভরে গলবস্ত্রে গলদশ্র হইয়া এই প্রেত-পশু-দানব-সর্প-শক্তির নিয়ত উপাসনা করিতেছি। অসভ্যের দেবপূজা আমাদের নিত্যক্রিয়া হইয়া উঠিয়াছে।

এক সময়ে একটু উন্নত মনে মানব পর্ব্বত, বৃক্ষ, নদ নদীর উপাসক। বাল্য-ক্রীড়ারত অপোগণ্ড মানব দেখিল—সম্মুখে মহান্ হিমালয়, উত্তুঙ্গ শৃঙ্গসহস্র লইয়া অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান। সূর্য্যরশ্মিতে মস্তকের কিরীটিপুঞ্জ ঝকমক করিতেছে। মেঘের পর মেঘ আসিয়া বিশাল স্কন্ধদেশে আশ্রয় লইতেছে; পর্ব্বতের বিরাগ নাই, বিকম্প নাই। সহসা পর্ব্বত ভ্রূকুটি করিল, স্ফুলিঙ্গ ছুটিল, পরক্ষণেই ভীষণ গর্জ্জন। গুড়্ গুড়্ শব্দে আকাশ পাতাল সেই গর্জ্জনে প্রতিধ্বনি করিতেছে। মানব তখন বুঝিল,—পর্ব্বত রাগে, পর্ব্বত গর্জ্জায়, পর্ব্বত হাসে, পর্ব্বত কাঁদে। পর্ব্বত তাহারই মত। তবে তাহা অপেক্ষা প্রভূত বলশালী এবং বিশাল আয়ত। মানব বলিল ঐ দেবতা। প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ,—ঝঞ্ঝার সময় আশ্রয় দেয়, রৌদ্রে ছায়া দান করে, কত পাখী ডাকিয়া আনিয়া গান শোনায়, কত জটা ঝুলাইয়া দিয়া দোল খাওয়ায়; মানব বুঝিল এই এক দেবতা। নদী—তৃষ্ণার সময় শান্তিদায়িনী,—রৌদ্রের সময় অবগাহনে স্নিগ্ধকারিণী, কিন্তু রাগিলে খরস্রোতে কূলপ্লাবনে সর্ব্বস্ব ভাসাইয়া লইয়া যায়,—মানবের চক্ষে নদী আর এক দেবতা।

আর একটু সভ্য হইলে মানব শস্য পূজা করে। যাহা জীবনের অবলম্বন, তাহাই উপাসনার সামগ্রী। ক্রমে সকল বৃক্ষেরই উপকারিতা মনুষ্য উপলব্ধি করিতে থাকে, কাজেই উদ্ভিদুপাসক হয়। দুর্গোৎসবে ইহার সকলগুলিই আছে। দুর্গোৎসবে পর্ব্বতের প্রতিনিধি রূপে শিলাখণ্ডের পূজা করিতে হয়; নদ নদীর পূজা করিতে হয়; বিশেষ করিয়া শস্যের পূজা করিতে হয়, এবং সাধারণ ভাবে সমস্ত উদ্ভিদ্ জাতির প্রতিনিধি লইয়া উদ্ভিদের উপাসনা করিতে হয়। ইহারই নাম নবপত্রিকা পূজা।

রম্ভা, কচী, হরিদ্রাচ, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িমৌ,
অশোকো, মানকশ্চৈব, ধান্যঞ্চ, নবপত্রিকা।

নবপত্রিকার এই পরিচয় শুনিলে মনে হয়, যে এত গাছ পালা থাকিতে এই নয়টিরই বা কেন পূজা হয়?

ঐ প্রশ্নের তিন প্রকার উত্তর আছে। ঐতিহাসিক, বৈষয়িক, এবং আধ্যাত্মিক। ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, কালে কালে মানব যত প্রকার উদ্ভিদের পূজা করিয়াছে, তাহার সকল প্রকার ঐ নয়টিতে আছে। বৈষয়িক ব্যাখ্যা এই যে, যে যে কার্য্যে মানবের উদ্ভিদের প্রয়োজন হয়, তাহার সকল কার্য্যের উপযোগী এক এক উদ্ভিদ্ নমুনার মত ঐ নয়টিতে আছে। অন্নের জন্য ধান্য আছে; তরকারির জন্য কচ্বী আছে; মসলার জন্য হরিদ্রা আছে; মণ্ডের জন্য মাণ আছে; মিষ্টের জন্য রম্ভা আছে; অম্লের জন্য দাড়িম্ব আছে; ঔষধের জন্য বিল্ব আছে; শোভার জন্য অশোক আছে; উৎসবের জন্য জয়ন্তী আছে। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অন্যরূপ। এক এক প্রকার উদ্ভিদ্ দর্শনে মনে এক এক রূপ ভাবের উদয় হয়; উদ্ভিদ্ অবলম্বনে মনে যে কয়প্রকার ভাবের উদয় হইতে পারে, নবপত্রিকায় তাহার সকলগুলিই হয়। গ্রন্থে আছে, রম্ভা শান্তি-প্রদায়িনী। আমাদের সত্য সত্যই বোধ হয়, কলা গাছগুলির বড়ই ঠাণ্ডা মূর্ত্তি। কেমন জল ভরা ভাব, সুগোল বলন, মসৃণ ত্বচ্, শীতল স্পর্শ; ঠাণ্ডা-সবুজ চৌড়া পাতাগুলি—যেন চিরদিনই ধীরে ধীরে দূরস্থিত আর্ত্তজনগণকে বীজন করিতেছে; কোথাও যেন রুক্ষ ভাবের একটু ছায়াও নাই, যথার্থ শান্তমূর্ত্তি। জয়ন্তীর জয়শ্রীভাব। কদলীর শান্তিময়ী শোভা জয়ন্তীতে এক বিন্দু নাই; অথচ জয়ন্তীতে শোভার অভাব নাই; ছোট ছোট পাতাগুলি কেমন সাজান গোছান, অল্প বাতাসে কেমন ফুর ফুর করিয়া উড়িতেছে; তাহার সকলগুলিই চঞ্চল, সকলগুলিই উল্লসিত। জয়শ্রী এমনই বটে। অশোকে শোকশান্তি হয়। সেই যে ফুলের ভরে, বৃক্ষ নত হইয়াছে, শোভা ধরে না, তবু অহঙ্কার নাই, দর্প নাই—তাহাতে শোকার্ত্তের শোকশান্তি হয় কি না, আমরা জানি না, কিন্তু প্রাচীনেরা ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। শাস্ত্রের সকল ব্যাখ্যার অনুশীলন করিবার স্পর্দ্ধা আমাদের নাই, কিন্তু আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে চাই, যে এইরূপে দুর্গোৎসব পর্য্যালোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, যে বাঙ্গালির দুর্গোৎসবে নানা বিষয়ের সমষ্টি নানা ভাবে বিন্যস্ত আছে।

মনুষ্য আবার সময় বিশেষে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদির উপাসক। এমনও অনেকে অনুমান করেন, যে এক সময়ে পৃথিবীর সভ্য স্থানের সর্ব্বত্র

সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল। আসিরি, মিসর, যুনানী, রোমক সর্ব্বত্রই সূর্য্যোপাসনা ছিল; আসিয়ার আর্য্যগণের মধ্যে বিশেষ রূপেই ছিল। অতি প্রাচীন কালে, আর্য্যঋষিগণ হিমালয়ের সানুদেশে দণ্ডায়মান হইয়া উষারঞ্জিত নভোপটে নয়নক্ষেপ করিয়া সূর্য্যাগমন প্রতীক্ষায়,ভূর্ভুবস্ব রবে দিক্ পরিপূরিত করত সূর্য্য-স্তোত্র পাঠ করিয়াছেন; মধ্যকালে তনুমিশ্র স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়াও সূর্য্য মহিমা ভুলিতে পারেন নাই; দিল্লীর নিকটস্থ যমুনা পুলিনে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া ভৈরবরাগে সূর্য্যবন্দনা করিয়াছেন।* ইদানীন্তন কালে ফরাসী দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বল্‌টেয়ার নাস্তিক বলিয়াই প্রসিদ্ধ। মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই বল্‌টেয়ার একবার সূর্য্যপানে চাহিয়া দেখিলেন, সেই জগচ্চক্ষুঃ জ্যোতিতে তাঁহার চক্ষু ধাঁদিয়া গেল; তাঁহার মানস ভরিয়া উঠিল; হৃদয় গলিল; বল্‌টেয়ার ধীরে ধীরে বলিলেন, "যদি জগদীশ্বর থাকেন, তবে ঐ তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি; আমি ঐ মূর্ত্তিকে নমস্কার করি।" এইরূপে দেখাযায়, যে জগচ্ছবির উজ্জ্বল শোভাকেন্দ্র চিরদিনই কোন না কোন মনুষ্যের উপাসনীয়। নবগ্রহ পূজা দুর্গোৎসবের অন্তর্গত। ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন; পূজার পদ্ধতি ভিন্ন, উপকরণ স্বতন্ত্র। এরূপ বিভেদেরও ঐতিহাসিক, বৈষয়িক, এবং আধ্যাত্মিক কোন যুক্তি আছে কি না, তাহা আমাদের বুঝিবার কথা, ভাবিবার কথা। প্রত্ন-তত্ত্বের গবেষণা, যাঁহাদের পণ্ডশ্রম বলিয়া ধারণা নাই, তাঁহারা যদি এইরূপ সকল বিষয়ে, আপনার বুদ্ধিবিবেচনার ব্যায়াম করেন, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি, যে বাঙ্গালির এই বিষম ব্যাপার দুর্গোৎসব বাস্তবিক কি প্রকাণ্ড কাণ্ড। আপাতত ভাসা ভাসা আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাই পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছি। যদি আমাদিগের এই ক্ষীণ চেষ্টায়, এই উৎসবের প্রকৃত গৌরব বাঙ্গালি হৃদয়ে কিছুমাত্র প্রতিভাত হয়, তাহা হইলেই আমাদের যত্ন সফল হইবে।*

তানসেনের গান ;—

প্রভাকর ভাস্কর, দিনকর দিবাকর, ভানু প্রঘট বিহান।
তেরি উদয়িতে, পাপতাপ ছুটে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম নি(য়)ম হোয়, গুরুজ্ঞান ধ্যান॥
ঝকমকায়ত জগতপর, জগচক্ষু জ্যোতিরূপ,
কশ্যপসুত, জগতেকি প্রাণ।
কহে তানসেন, প্রভু, জগত-কবাট খুলত,
দিবে বিদ্যা দান॥

মনুষ্য কর্তৃক মনুষ্যপূজা দুই প্রকারের। অবতারে মনুষ্য পূজা; কুমারীতে নারী পূজা। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ মধ্যে মধ্যে অবনীতে অবতীর্ণ হন। পুণ্যভূমি ভারতক্ষেত্রে এমন অনেক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারাই নরজাতির আদর্শ। এই সকল আদর্শ চরিত্রে ভারতভূমি উজ্জ্বলীকৃত আছে। এই সকল অবতার মূর্ত্তি দুর্গোৎসবের চালচিত্রে চিত্রিত থাকে, এবং তাঁহাদের পূজা হয়।

আমাদের তন্ত্রে নারী পূজা। বিদেশের কোম্‌তে নারী পূজা। নারীই সাক্ষাৎ মূর্ত্তিতে প্রকৃতি-শক্তি, প্রবৃত্তি-শক্তি এবং নিবৃত্তি-শক্তি। নারী জন্মদাত্রী, পালয়িত্রী, জগদ্ধাত্রী, গৃহকর্ত্রী। নারী ভবসাগরের তরণী, জীবনের বন্ধনী। নারী হইতেই হৃদয়ের শিক্ষা এবং মনের বল। নারী ইহলোকে সাক্ষাৎ দেবতা-স্বরূপা। নারীর মধ্যে কুমারী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। কুমারী শান্তির প্রতিমা, সরলতার ছবি, পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী। অনন্ত কোটি মানবের প্রসবিনী শক্তি কুমারীতে অন্তর্নিহিত; কুমারী জগদম্বা-শক্তি। কুমারী সরমের সরলতা, আদরের কোমলতা। কুমারী লজ্জাশক্তি, দয়া শক্তি, শ্রদ্ধারূপা, ভক্তিরূপা। কুমারী পূজা, কুমারী ভোজন দুর্গোৎসবের অঙ্গ। সেইরূপ মাতৃকা পূজা দুর্গোৎসবের অঙ্গ। সকলরূপ পূজাই দুর্গোৎসবে আছে।

সকল দেবতার পূজাও দুর্গোৎসবে আছে। ঈশ্বরের সৃজন-পালন-সংহরণ মূর্ত্তিতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। এবং ধনশক্তি, জ্ঞানশক্তি, রণশক্তি, গণশক্তি, ইঁহাদের সকলেরই পৃথক চিত্র বা মূর্ত্তি আছে। পৃথক পূজা হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী, সাবিত্রী, গায়ত্রী ত্রিসন্ধ্যা প্রভৃতি সকলেরই স্থান আছে, ধ্যান আছে, অর্চ্চনা আছে, আরাধনা আছে। আর সকল শক্তির সমষ্টিভাবে কেন্দ্রীভূতা মহাশক্তির মহাপূজা আছে।

মহাশক্তি অনন্ত মূর্ত্তিতে অনন্ত সংসারে বিরাজিতা; গ্রন্থকারেরা তাঁহার কথঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন—

"সা বাণী সা চ সাবিত্রী বিপ্রাধিষ্ঠাতৃ দেবতা।
বহ্নৌ সা দাহিকা শক্তিঃ প্রভাশক্তিশ্চ ভাস্করে॥
শোভাশক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিশ্চ শীতলা।
শস্য প্রসূতিশক্তিশ্চ ধারণা চ ধরাসু সা॥
ব্রাহ্মণ্য শক্তির্বিপ্রেষু দেবশক্তিঃ সুরেষু সা।
তপস্বিনাং তপস্যা সা গৃহীণাং গৃহদেবতা॥

মুক্তিশক্তিশ্চ মুক্তানাং মায়া সাংসারিকস্য সা।
মদ্ভক্তানাং ভক্তি-শক্তি ময়ি ভক্তিপ্রদা সদা॥
নৃপানাং রাজলক্ষ্মীশ্চ বণিজাং লভ্যরূপিণী।
পারে সংসার সিন্ধূনাং ত্রয়ী দুস্তারতারিণী॥
সৎসু সুবুদ্ধিরূপাচ মেধাশক্তি স্বরূপিণী।
ব্যাখ্যাশক্তি শ্রুতৌশাস্ত্রে দাতৃশক্তিশ্চ দাতৃষু॥
ক্ষত্রাদিনাং বিপ্রভক্তিঃ পতিভক্তি সতীষু চ।
এবং রূপাচ যা শক্তি ময়া দত্তা শিবায় সা॥"

এইরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি সমষ্টির সহিত সমগ্র জড়শক্তি এবং দৈবশক্তি মিলিত হইলে তবে দুর্গা প্রতিমা হয়। জড় জগতের দৈত্য দানব,—ভূত প্রেত, —সিংহ শার্দ্দূল,—শস্ত্র সর্প,—ময়ূর মূষিক,—বৃক্ষ গুল্ম,—নদ নদী,—শিলা-মৃত্তি,—গ্রহ নক্ষত্র,—চন্দ্র তারকা প্রভৃতি—আর আধ্যাত্মিক জগতের প্রভা, শোভা,—ধন, পণ,—জ্ঞান, মান,—বিদ্যা, বুদ্ধি,—ধৃতি, ক্ষমা,—দয়া, লজ্জা,—শৌর্য্য বীর্য্য, স্থৈর্য্য গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি। আর দেবজগতের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি। দুর্গোৎসবের প্রতিমায় এই ত্রিজগতের জাজ্জল্য মতী মহামূর্ত্তি। দুর্গোৎসব বিশ্বপূজা।

এখন আবার ভাবিয়া দেখ দেখি, এই ক্ষুদ্র বাঙ্গালি তাহার অণুমাণ হৃদয়ে কি মহতী কল্পনার ধারণা করিয়াছে! অন্য কোন দেশের কোন কবি, কোন দার্শনিক, কোন শাস্ত্রকার এরূপ ত্রিজগতের সমষ্টিতে জগজ্জীবনের পূজা কখন কল্পনাতেও আনিয়াছেন কি? সকল দেশেইত ধর্ম্মোপাসনায় যুগের পর যুগান্তর হইয়াছে। স্তবের পর স্তব উঠিয়াছে, পড়িয়াছে। পশুপূজা, বৃক্ষপূজা, নরপূজা, দেবপূজা সকল দেশেই ত হইয়াছে,—কিন্তু দুর্গোৎসবের মত এমন অতুল্য Museum এবং অমূল্য Laboratory আর কোথাও আছে কি? বঙ্গবাসী মহাকালের সাহায্য লইয়া ঐ অপূর্ব্ব যাদুঘরে, জগতের ধর্ম্মোপাসনার সকল স্তরগুলি একত্র করিয়াছে; আপনার প্রতিভাময়ী কল্পনার রাসায়নিক দাহনে তাহার অনেকগুলি গলাইয়াছে; গলাইয়া, এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি গড়িয়াছে, যেগুলি গলে নাই, সেগুলিকে সেই মূর্ত্তির অলঙ্কাররূপে বড়ই মুন্সিয়ানায় সাজাইয়াছে। ধন্য বলি, এই বিশ্বময়ী ধারণা; আর ধন্য বলি, এই বিশ্বময়ী কল্পনা।

যেমন বিশ্বময়ী কল্পনাপ্রসূতা ঐ বিশ্বময়ী মূর্ত্তি; পূজার প্রকরণ পদ্ধতিও

তদুপযোগিনী। ঘট পট গঠনে মূর্ত্তির কল্পনা; জ্ঞানে, ধ্যানে, মননে ধারণা। মহাপূজা 'চতুষ্কর্ম্মময়ী' এবং ত্রিবিধা। সাত্ত্বিকী, রাজসী চৈব তামসী চেতি বিশ্রুতিঃ। সকল ভাবেই দেবীর পূজা হইতে পারে;—

লিঙ্গস্থাং পূজয়েদ্দেবী মণ্ডলস্থাং তথৈবচ।
পুস্তকস্থাং মহাদেবীং পাবকে প্রতিমাস্থচ।
চিত্রে চ বিশিখে খড়্গে জলস্থাঞ্চাপি পূজয়েৎ॥

সর্ব্বকালেই দেবীর পূজা হইবে।

যাবদ্ভূর্বায়ুরাকাশং জলং বহ্নি শশিগ্রহাঃ।
তাবচ্চ চণ্ডিকাপূজা ভবিষ্যতি সদা ভুবি॥'

পূজায় সকল প্রকরণই আছে;—শুদ্ধি, সিদ্ধি,—আচমন, প্রাণায়াম,—মুদ্রা, মন্ত্র,—বলি, হোম সকলই আবশ্যক। অধিবাস, অধিষ্ঠান,—আরাত্রিক, আরাধনা, সকলই করিতে হয়। ধূপ জ্বাল, দীপমাল সকলই অনুসঙ্গ। বিশ্বপূজার উপকরণ বিশ্ব সংগ্রহ,—ফলজল,—পত্রপুষ্প,—স্বস্তিক সিন্দুর,—গন্ধ চন্দন,—কষায় ওষধি,—শস্য গব্য,—মণি রত্ন,—ভোজ্য ভোগ,—নৈবেদ্য শীতল,—সকল পূজার সকল উপকরণ আহরণ করিতে হয়; মালির মালঞ্চ, বণিকের বিপণী, মণিহারীর মণিহার, গোলদারের গোলা, আহরণ করিলে তবে দুর্গোৎসব হয়। বিশ্বভাণ্ডারের নমুনা লইয়া বিশ্ব প্রচলিত পদ্ধতিমত বিশ্বশক্তিরপূজা।—

হা ভগবান আমার দরিদ্রের অদৃষ্টে তবে কি তোমার বিশ্বশক্তি মূর্ত্তির পূজা হইবে না? না, এমন কখন হইতে পারে না, আমাদের শাস্ত্র ত পক্ষপাতের শাস্ত্র নহে। শাস্ত্রের বিধান বড়ই উদার;—

সম্যক্ কল্পোদিতাং পূজাং যদি কর্ত্তুং ন শক্যতে,
উপচারাং তদা দাতুং পঞ্চৈতান্ বিতরেত্তদা।

কি কি?— গন্ধং পুষ্পঞ্চ ধূপঞ্চ দীপং নৈবেদ্যমেবচ।

তাও যদি না জুটে। অভাবে গন্ধপুষ্পাভ্যাং

তাও যদি আহরণ করিতে না পারি,—তদভাবে ভক্তিতঃ।

এমন কল্পনাও কখন হবে না; এমন উদার শাস্ত্রও আর কোথাও পাব না।—কিছু না পারি আজি শুভদিনে—আইস ভাই, একবার ভক্তিভরে বিশ্বশক্তি ব্রহ্মময়ীর ধ্যান করি।

হুতোম প্যাঁচার গান।

সহর বন্দনা।

কলির সহর কল্‌কাতাটীর পায়ে নমস্কার!
যার জাঁক্‌জমকে ভাগীরথীর দু-ধার গুল্‌জার,
যার কোলের কাছে ঘাসের মাঠে হাওয়া খাবার স্থান,
যার মাঠের ধারে বাড়ীর বাহার দেখ্‌লে জুড়োয় প্রাণ,
যার পাথর-ইটে পথ বাঁধানো "ফুটপাথ" দোধারি,
যার পথের গায়ে মাঠের মাঝে গাছের কত সারি,
যার তিনদিকে জল সহর ঘেরা— উত্তরে বাহালি
আহা বাগবাজারের খালের সীমা, অগ্নিকোণে কালী,
আর অজ্‌দখীণে আদিগঙ্গা টালির নালা হালি!
যার মাথার দিকে পাইকপাড়া খুরে খিদিরপুর,
যার পূব্ব্‌ ঘেঁসে সুঁড়ো টালি ঘোঁজে আলিপুর,
যার ইটদালানে খোলার চালে ঠেকাঠেকি গায়,
যার গির্জ্জে মসীদ ঠাকুর বাড়ীর চূড়োয় আকাশ ছায়,
যার বাজার গলি বিঠ্ঠেনলি বাইরে জ্বলে ঝাড়,
যার বুকের ওপোর বেশ্যাপাড়া, মেথর হাঁকায় ষাঁড়!
যার টাউন্‌ যোড়া পল্লী দুটী সাহেব নেটিব পাড়া,
যার চৌরঙ্গী সোণার থালা সহর ধূলোর হাঁড়া!
যার গ্যাসের আলো রাত্রিকালে চক্ষে লাগায় ধাঁধা,
যার কোলে দোলে লোহার সাঁকো এদিক ওদিক বাঁধা!
যার রাস্তা ঘরে সহরজুঁড়ে কলের পানি ছোটে,
যার দুধের কেঁড়েয় খাঁটি পানি তিন্‌পো ছেড়ে ওঠে!
যার দেশের ছেলে মিথ্যেবাদী সাহেব রাজাই সাঁচা,
যার লম্বাটে গোচ চেহারাটা ফজ্‌লি আমের টাঁচা;
আহা ভাগীরথীর দুকূলযোড়া রূপের ছটা যার,
কলির সহর কল্‌কাতা তোর পায়ে নমস্কার!

তোর পায়ে নমস্কার!
তুই— রাজার নগর আজব সহর
ভারত-ভূমির হার!
তোতে—মুক্তপলা কতই আছে
শালুক্‌ শোলা আর!
আজ্‌ ভুলে তুলে দেখ্‌বো খুলে
চিকণ্‌ তা কি কার!

দেখবো রে তোর ভোজের বাজী,
দেখবো রে তোর ফুলের সাজী,
দেখবো রে তোর রাংতা-মারা চাল্‌খানির বাহার!
কলির সহর কল্‌কাতা তোর পায়ে নমস্কার!!

তোর গুণে নমস্কার—ও তোর গুণে নমস্কার!

	কলির সহর	কল্‌কাতা	তোর গুণে নমস্কার!!
তোর	সভ্যগায়ের	বাতাসে হয়	দ্বিপদ অবতার;
তোর	কোলে পীঠে	সাদা কালো	মহাবীরের মেলা,
যেন	কলির মাঝে	আবার ফিরে	ত্রেতাযুগের খেলা!
তোর	কড়ির গুণে	শৃগাল সাজে	সিংহ বাঘের ছালে;
তোর	ভক্তি গুণে	ভাগীরথী	"পেশাব"-নলে চলে!
তোর	বাজার হাটে	শোভা করে	সকল ফুলের সাজি;
তোর	রাজপসারে	সমাজমাঝে	সদাই দড়াবাজি!
তোর	এলেমগোলা	ইংরিজিতে	ঘোচে গায়ের ময়লা;
তোর	হালের রীতি	গরু খাওয়া	ব্যারার ভাষা বলা!
তোর	জলের গুণে	জাত-পিরিলি	ধুয়ে মুছে খারা;
তোর	মাটীর গুণে	দাস্ কৈবৎ	বেণে সমাজ সেরা;
তোর	ভজন্-গুণে	ভোজন-কালে	সব হাঁড়ী সমান—
ও তোর	খেষ্ট ভজা	বেহ্মাচাচা	হিঁদু মুসলমান!
তোর	নব্য কেতা	দাড়ি-রাখা	সভ্য প্রথা জারি;
তোর	ফুল বাবুদের	ঘাড়ে ছাঁটা	সদরে কেয়ারি!
তোর	তুড়ীর জোরে	রায়বাহাদুর—কুস্তিগিরি ভাঁজা;	
তোর	নেকনজরে	আঁস্তেকুড়ে	আস্কেগোণা রাজা!
তোর	সভ্যমুখে	বাংলা বুলি	ঠনঠনে পয়জার!
ওরে	কলির সহর	কল্‌কাতা	তোর গুণে নমস্কার!
	তুই	রাজার নগর	আজব সহর

ভারত ভূমির হার!

তোতে মুক্ত-পলা কতই আছে
শালুক শোলা আর!
আজ তুলে তুলে দেখবো খুলে
চিকণ্‌তা কি কার!
দেখবো রে তোর রাংতা হালি,
দেখবো রে তোর কক্কা চালি,

দেখবো রে তোর চিত্রিকরা পুতুলগুলি আর ;
একবার—একে একে এগিয়ে এসো আসরে যে যার ॥

আসর বর্ণন ।

এসো এসো সবার আগে ঠাকুর বাড়ীর চাঁই,
বুল্‌বুলি পাগ্‌ শিরে বাঁধা তালপাতা-সেপাই।
পাথর ঘাটায় রাজগী জারি "সার" মহারাজ নাম,
মুন্সী আনায় জেঁকে গেছে ছ্যাতলা ধরা থাম।
সিঁতির মাঠে কুঞ্জবিহার দীপ্ত মরকত,
কুঞ্জমাঝে "গ্রেটো" গহ্বর মাটীতে পর্ব্বত !
বংশ যশে "লেজিস লেটিভ" রংমহলে চড়ে
রাজ-মহারাজ নাগরা পিটে মাথার পগ্‌গ নেড়ে !
মিষ্টবোলে মিছরি ঘোটা সরটুকু সে ছাঁকা ;
যার অভ্যুদয়ের ছায়া লেগে সহর খানা ঢাকা !
এসো এসো ভারত-মাঝী কসে ধরে হাল,
বিলিতি বাতাসে ভ্যালা উড়ায়েছ পাল !!

এসো এসো দাদার পরে গলায় পরে হার,
অদ্বিতীয় ধরা মাঝে "মিউজিক্‌-ডাক্তার" !
"অর্ডার্‌ অফ্‌ সি আই ই অ্যাণ্ড রাজা-কম্‌ ;"
"অর্ডার্‌ অফ্‌ লিওপোল্ড কিংডম্‌ বেলজিয়ম,"
"অর্ডার অফ ফ্রাঁসে জোসেফ এম্পাইয়ার অষ্ট্রিয়া,"
"অর্ডার অফ ডনার ব্রোগ্‌" ডেন্‌মার্ক নিয়া,
"অর্ডার অফ অ্যালবার্ট অ্যাণ্ড স্যাক্‌সনী ;
"অর্ডার অফ মেলুসাইন্‌ মেরি লুসিগনানী ,"
"অর্ডার অফ মলটা-রোড্‌স ফ্রাঙ্ক সিভেলার,"
"অর্ডার ডিউ টেম্পেল ডিউ সেণ্ট সেপূলকার,"
"ইম্পিরিয়েল অর্ডার অফ পাউ সিং" চাইনার,"
"সেকেন্‌ কেলাস ইম্পিরিয়েল লাইয়ন অ্যাণ্ড সন্‌,"
"সেকেন কেলাস্‌ ইম্পিরিয়েল মেহেদিজি সুলতান,"
"অর্ডার অফ রয়েল ক্রাইষ্ট" রাজ্য পর্ত্তুগাল,
"অর্ডার অফ" গুর্খা-তারা দিয়েছে নেপাল,

শ্যামদেশের	বসবামালা	পারস্য সা-জাদা ;
এর ওপরে	আরো কত	এট্‌সেটেরা গাদা !!!
সত্যই এ	সকল গুলি	রাজশ্রীর হার ;
সাক্ষী দেখো	সব কেতাবের	মলাটে বিস্তার ॥
এখন সরো সরো	ছোটো বড়	রাজা মহাশয়,
আসর নিতে	"আউআর কজিন"	হচ্চেন উদয় !

এসো এসো দেব অংশ এসো শীঘ্র করে,
তুমি না আসিলে শোভা হয় কি আসরে ?
স্বয়ংসিদ্ধ মহারাজা—সহর শোভন ;
যথা গিরি গোবর্দ্ধন গোকুলের ধন !
তোমার তুলনা দেব তুমিই আপনি ;
গঙ্গার উপমা আহা গঙ্গাই যেমনি !
সভাস্থলে টাউন্‌হলে বক্তৃতার চোটে,
ভাহুরে নদীর জলে ফেণা যেন ফোটে !
সেকেলে কেষ্টের মত ধড়া পরা ঠিক্,
খালি সে চুড়োটী নাই—তিলক কৌলিক !
মাথার চুলের ভাঁজে খেলে জোয়ার ভাঁটা,
সমুখে বাগানো তেড়ি ঘাড়ে দেখি ছাঁটা !
শ্রীহরি শ্রীহরি স্মরি ঠাওরে না পাই,
কাশী মক্কা পাশাপাশি—কোন্ দিকে তাকাই !
এসো এসো মহারাজ—আরো ঘেঁসে যাও ;
আতর-গোলাপ-পান্—লে-আও লে-আও !

এসোতো বণিকপতি এসোতো এবার,
করতো জাঁকায়ে বসে আসর গুল্‌জার !
নেটিবের সদাগর, বেণেদের নাক্,
কমলার কল্‌কাটী, সোণার মৌচাক !
দেশ-কুল-মুখোজ্জ্বল ব্যাপারে হুজুরি,
বাজারে যাহার হালে বড়ই জাহিরি !
বড় "লকী" জাহুগীর দাঁত বাঁধা "চ্যাপ",
হানা-বাড়ী হাতে নিলে হয় সোণাচাপ !
এর কাছে আর যত ঝুটো পোখ্‌রাজ,
গিল্টি-সোণা দাগী-চুনি ঝকে মারে লাজ্ !
সহরে সবার কাছে শুনি এঁর নাম,
আক্‌বরী আস্‌রফী যেন দরে চুনো দাম !

অল্পভাষী "নোভো হোমো" কাঁচামিঠে ঝাঁঝ,
গরমে পচেনি আজো টাট্‌কা আছে গাজ ॥
তারি মত ছোট ভাই গায়ে নাহি তাং;
সাবাস ত্রিমূর্ত্তি লাহা—কেয়াবাং কেয়াবাং!

তার পর গুড়ি গুড়ি এসো বুড়ো শিব,
গঙ্গার ওপারে বাড়ী—অদ্ভুত "নসীব"!
জমিদারি মিণ্টে ঢালা আদোৎ "মডেল,"
বাঙ্গালার কাদাহোড়ে পাথুরে পাটকেল!
বয়েসে অনাদি লিঙ্গ "জরাসিন্ধ" বলে;
দাপোটে এখনো যার হুগলি জেলা টলে ॥
মাল্-আইনে তোদর-মল, রোখে হাইদর আলী,
কৌশলে চাণক্য দ্বিজ, বিদ্যাদানে বলি!
গুষ্টী বহু, বাস্তুভূমি যেন লঙ্কাপুরী,
ইন্দ্রজিৎ সম পুত্র কৌন্সলে মুহুরি!
দিগ্বিজয়ী দণ্ডধর রাষ্ট্র যুড়ে নাম,
ইহাগচ্ছ—ইহাগচ্ছ, চরণে প্রণাম!

এই ত গেলো কল্‌কাতা তোর কল্কা পরার দল,
দেখবো এবার গোটা কত দিকপাল আসল!
দেখবো এবার আসর মাঝে মনের রাজা যারা,
সব আসরে যাদের শিরে জ্বলে সোণার তারা!
তফাৎ সরো তফাৎ সরো ফড়িং ফিঙ্গের পাল,
আসর নিতে আসছে এবে বাজ-পাখী "রয়াল"।

আসছে দেখো সবার আগে বুদ্ধি সুগভীর,
বিদ্যের সাগর খ্যাতি, জ্ঞানের মিহির!
বঙ্গের সাহিত্যগুরু শিষ্ট সদালাপী,
দীক্ষাপথে বুদ্ধঠাকুর স্নেহে জ্ঞান ব্যাপী!
উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দ্রাঢ্য শালকড়ি,
কাঙাল-বিধবা-বন্ধু অনাথের নড়ি!
প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম, দাতা কর্ণ দানে,
স্বাতন্ত্রে শেঁকুল কাটা—পারিজাত ঘ্রাণে!
ইংরিজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত "ডিস্",
টোল-স্কুলী-অধ্যাপক দুয়েরেই "ফিনিস"।

এসো হে দ্বিজের চূড়া বঙ্গ অলঙ্কার,
"দিক্‌পাল" তোমার মত দেশে নাই আর!
দেখাও দেখি সাহেব-চাটা সহুরে রাজায়,
কার শোভাতে জলুস বেশী আসর যুড়ে যায়।

কার শোভাতে জলুস বেশী আসর যুড়ে যায়?
পাঁও লাগে বাচস্পতি এ সাতো সভায়!
জীবন্ত ভাষার কোষ, পাণিনির মই,
শাস্ত্রেতে সুপক্ক রুই—নহে টুলো কই!
স্মৃতি-দরশনে-দৃষ্টি তর্কের মাজ্জার,
"মোক্ষমূলর্" "ল্যাসেনের" মুণ্ডের টোপর!
ব্যাকরণে গোপীদেব-ভ্রাতর মামাতো,
সংস্কৃত বিদ্যা দাঁড়ে হর্‌বোলা কাকাতো;
শিক্ষাধারী খর্ব্বদেহ দর্শনে দুর্ব্বাসা,
আলাপে তালের শাঁস কিম্বা ক্ষীরে সঁসা!
পাত্য পেতে ছানা ক্ষীর দিতে সাধ যায়;
এসো এসো বাচস্পতি—পাঁও লাগে পায়!
অনেকে তো নৈবিদ্যির ভাগ সাতে জড়,
বলো তো জলুস কার সভার মাঝে বড়?

বলো তো সভার শোভা এবার কেমন,
নমস্কার নমস্কার ন্যায়ের রতন!
ফুটেছ ব্রাহ্মণকুলে আপনার বাসে,
বুকেতে বেঁধেছো "চাপ" প্রকৃতির "পাসে"!"
থানের-চাদর-পরা থান-ধুতি মোটা,
কালোমুখে জ্বলে আলো—প্রতিভার ছটা!
নিজ গুণে নিজ পণে রাঢ়ে বঙ্গে মান,
পৈতৃক মকরধ্বজে নহ অনুপান!
সাহেব করেছো বশ বিদ্যারসে তাজা,
বাসে তব ভাসে কত "ফেল্লার"-ধারী রাজা!
স্বভাবে মিঠেন প্রাণ মিঠেন বচন,
গুমোরে গৃহিণী পাশে করো না গর্জ্জন!
মুখে মিঠে বুকে কটু নহ নিন্দাভাষী,
উপদেশে পরজনে প্রকৃত বিশ্বাসী॥
মজলিসেতে বাবুর পোষাক্—ঐটি কেলেঙ্কার,
তবু হ্যাদে খাঁটি বাসে তুল্য কে তোমার?

এসো এসো তাহার পরে রেভারেণ্ড সাজ,
বন্দ্যকুল-চূড়ামণি "মানোআরী" জাহাজ!
শুভ্র ভুরু, শুভ্র কেশ, শুভ্র দাড়ি চেরা.
গিরীক্-ল্যাটিন-হিব্রু-ইংরিজি-ফোয়ারা!
মাকাল-বনের-মাঝে পাকা আম্র ফল,
স্বধর্ম্ম তেয়াগী তবু স্বজাতীর দল!
মিষ্টভাষী বঙ্গযষ্ঠি হৃদে মাখা চিনি,
বয়েস খুঁজিতে গেলে চক্ষে ধরে ঝিনি!
দ্বাপরে ভূষুণ্ডী বুড়ো সবেতে মহৎ;
বাঙ্গালীর মাঝে যেন ধবলা পর্ব্বত!
রাংতা-জরি-চাকতি-পরা নকিব ফুকার
বলোতো এমন আলো তোমাদের কার?

পথ ছাড়ো—পথ ছাড়ো আসিছে এবার,
গদাধর-পাদপদ্মে মতি গতি যার!
তাল-পত্র, তাম্রপত্র. পুথিপত্র থোকা.
বগলে পুঁটলি বাঁধা কেতাবের পোকা।
এসো মিত্র লালেলাল মজলিস জাঁকাও,
কেদারা দৈসান দিয়ে মোড়াসা হেলাও।
প্রত্নতত্ত্ব তল্লাসিতে দীগ্‌গজ মসনদ,
খড়ি মাড় নাই থাপে—আধোয়া গরদ।
আচার, আমের সত্ব, কলকটো ভাঁজ,
যখন যে দিকে হাত তাতে ধড়িবাজ।
বাক্‌যুদ্ধে, বাগ্মীতায় লেখার লড়ায়ে,
রাজনীতি. রচনায়. স্বর বাজগেঁয়ে!
ইংরিজি-বিদ্যা-বাগানে "ফাষ্টরেট" মালী,
ইউরোপের কালীঘাটে পড়ে যার ডালি।
সকল বিদ্যার খই—বুদ্ধি ভাজাখোলা,
বিধি বিড়ম্বনে আজ কাণে গোঁজা শোলা!
অহংত্ব বড় বেশী নহিলে হাজার
রাজার মাথার চুড়ো—তুল্য কে উহার?

আসর জাঁকায়ে বসো তুমি অতঃপর,
গালজোড়া ফাঁসা গোঁপ—বুড়ো প্যাগম্বর!
চুঁচুড়ার কিনারায় যার পীঠস্থান,
হৃদয় ক্ষীরের খনি—আকারে পাঠান্!

হাঁসারঙা খাসা বুড়ো মাথা-জ্ঞান-গুড়ে,
নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের ঝাড়ে!
ইংরিজি শিক্ষার ফুল বাঙালি-শিকড়ে
স্বতেজে উঠেছে উচ্চ শিখরের চূড়ে!
তর্কেতে তর্কক যেন, তেজে তেজপাতা,
শিক্ষাব্রতে সিদ্ধকাম শিক্ষকের মাথা!
বচন বটের ফল ধীরে ধীরে পড়ে,
দেশের দোছোট বটো—মোদ্দা কথা গড়ে।
ধনে মানে কুলে যশে পদে পাকা-তাল
সেকেলের মাঝে এক সুন্দর প্রবাল!
নবগ্রহ পূজাকালে আগে যার ভাগ,
দেখো হে পুতুলরাজা—বাঙালীর বাঘ!

তুমিও আসরে এসে বসো একবার,
কলিতে কাঁসারী কলে প্রভা জ্বলে যার!
কণ্ঠে তুলসীর মালা দীনহীন বেশ,
কাঁধেতে চাদর ফেলা—পোষাকের শেষ!
সহরের দীনদুঃখী দরিদ্র অনাথ
আনন্দে দু'হাত তোলে যখনি সাক্ষাৎ;
চাহিয়া তোমার দিকে তাকায় আকাশে—
শিশুর চক্ষুর ধারা মুছে চীরবাসে।
ভয় নাই এসো তুমি আছে অধিকার
বসিতে এদের পাশে "ছাড়্" বিধাতার;
কি হবে কোমর পেটী, কে চায় চাপ্‌রাস্!
অনাথ-তারক নামে পেয়েছো যে "পাস্",
তরে যাবে তারি গুণে সকল দুয়ার!—
আসর বর্ণনা আজ 'ষ্টপ' আমার ॥
বড় বড় বুড়োধুড়ো চুনে নিমু কটা,
ফিরে আবার আসর নেবো মাথায় বেধে ফ্যাটা ॥
গাইব তখন আবার শুনো শুনটী যেমন যার;
আল্লা গৌর বলো এখন বেলা দুপুর পার!
শ্রীপাঠ কলকাতা তত্ত্বে অধ্যায় প্রথম,
হুতোম্ প্যাঁচার গান নরম গরম!!

নবজীবন।

১ম ভাগ। } কার্ত্তিক ১২৯১। { ৪র্থ সংখ্যা।

ব্রততত্ত্ব।

২। সুখ।

ব্রততত্ত্বের প্রথম বিভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে যে সমাজির মূলীভূত নিয়ম, জীবন পরের দ্বারা যাপন করিতে হয়, আর এই প্রতীজ্ঞাটীর অব্যবহিত ফল এই যে, জীবন পরের জন্যে যাপন করিতে হইবে। কিন্তু শেষোক্ত নিয়মটি মনে করিলেই এত অসাধ্য বলিয়া বোধ হয় যে কেহই উহাকে প্রশস্ত নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না। বস্তুত নিয়মটি কোন কারণ বশত ব্যক্তিগত চৈতন্যের নিতান্ত বিরোধী। সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে যে, ব্যক্তিগণের নিকট উহা গ্রাহ্য হইবার উপায় কি? সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া পশ্চিমে অস্তগত হন; এই বিষয় সকলেরই প্রত্যক্ষ মনে হয় অথচ কথাটী ভ্রম বটে। সূর্য্য চলেন না; পৃথিবী ঘুরেন। ব্যক্তিগণের এই ভ্রমটী অপনয়ন করিবার জন্য নানাবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে হয়। তাহাতেও সূর্য্যের গতিবিষয়ক জনসাধারণের এই কুসংস্কারটী সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে বলা যায় না। ইহার তুলনায় আমি যে নিয়মের কথা বলিয়াছি তদ্বিষয়ক ভ্রম দূরীকরণ করা নিতান্ত কঠিন গণ্য হইবে। জীবন পরের জন্যে যাপন করিতে হইবে এই নিয়মটী সমাজতত্ত্ব হইতে উদ্ভাবিত বটে কিন্তু সমাজতত্ত্ব এখনও জ্যোতিষতত্ত্বের ন্যায় বিশ্বাসভাজন হয় নাই। বিশেষত সমাজতত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য উহা নানা বিজ্ঞান-

শাস্ত্রের সহিত একত্রে পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। জ্যোতিষতত্ত্ব অতি কঠিন হইলেও সমাজতত্ত্বের ন্যায় জটিল নহে। আমি এই নিমিত্ত অনেক বাহুল্য উক্তি করিয়াছি বটে তথাচ প্রস্তাবিত নিয়মটি বৈজ্ঞানিক দৃঢ়তা সম্পন্ন হইল বলিয়া মনে করিতে সাহস হয় না। কিন্তু বাস্তবিক ঐ নিয়মের সত্ত্বা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক নিয়মের সহিত নিতান্ত অনুরূপ বটে। এবং তাহাতে পাঠকের সম্যক বিশ্বাস হওয়া আবশ্যক। সূর্য্যের গতিবিষয়ক কুসংস্কার দূরীকরণের নিমিত্ত কেবল পৃথিবীর দৈনিক গতির কথা শুনিলেই যথেষ্ট হয় না, তাহার বিষয় হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক। সেইরূপ সমাজতত্ত্ব অনুযায়ী পরার্থপরতা বিষয়ক নিয়ম জানিলেই হইবে না; তাহা এমন করিয়া বুঝা আবশ্যক যে ব্যক্তিগণের মতি ও তদনুরূপ হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ্য পাঠকের নিজের চেষ্টা ব্যতীত তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে না।

অনন্তর বিবেচনা করা যাউক যে কি জন্য নিয়মটি এত উৎকট বলিয়া মনে হয়। ইহার এক কারণ এই যে, লোকে সহসা বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে পারে না; আমাদিগের স্ব স্ব মনের গতি অনুসারে ইন্দ্রিয় গোচর বিষয়মাত্রেরই নানাবিধ বিভিন্ন চৈতন্য জন্মিতে পারে। আমি যে নিয়মটির কথা বলিয়াছি তাহা যদি প্রত্যেকের চিত্তবৃত্তির ক্রিয়াজাত হইত কিম্বা প্রকৃষ্টরূপে ঐ ক্রিয়া সংসৃষ্ট হইত, তাহা হইলে সকলেই অনায়াসে উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত। কিন্তু যেখানে প্রথমত নানা বস্তুগত ব্যাপার বুদ্ধিবৃত্তির আয়ত্ত করিতে হয়, যেখানে চিত্তবৃত্তি সঞ্চালনের তাদৃশ স্থল নাই সেখানে ঐ সকল বিভিন্ন ব্যাপারের শৃঙ্খলাবিশিষ্ট সংস্কার উদ্দীপন করণার্থে বিশেষ যত্ন অথবা ব্যাপক কাল আবশ্যক হয়, তাহা ব্যতীত ব্যাপার গুলির সম্বন্ধে যথাযোগ্য বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি হয় না। এতদ্ভিন্ন প্রস্তাবিত ব্যাঘাতের আর একটি কারণ আছে। ব্যক্তিগত চরিত্রে এরূপ একটী নিয়ম আছে যে তাহা প্রাগুক্তসমাজ উদ্ধারিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে এবং কোন বিশিষ্ট কারণ বশত সেই ব্যক্তিগত নিয়ম আবার অপেক্ষাকৃত বলবৎ চৈতন্য-প্রদায়কও হইয়া থাকে। বিরুদ্ধ নিয়মটি মনুষ্যের সুখসম্বন্ধীয়, এবং তাহা ব্যক্তিগণের চিত্তবৃত্তিমূলক বলিয়া অনায়াসে উপলব্ধ হয়; যেন কি, ব্যক্তিবর্গ আপনাপন মনের অপরিজ্ঞাত রূপে ঐ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। এক্ষণ সেই সুখোৎপত্তি সম্বন্ধীয় নিয়মটি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। স্থূল কথা এই যে, সমাজতত্ত্ব হইতে উদ্ধারিত কর্ত্তব্য বিধানটি মনুষ্যের সুখপ্রদ

মনে হয় না। কিন্তু কিসে কর্ত্তব্যবিধান ও সুখসাধনবিধানের সমবায়ী ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইতে পারে তাহাই আমাদিগের অনুসন্ধানের স্থল। এতদর্থে আমরা এখন সুখ বিধানের লক্ষণ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সুখ ব্যক্তিগত ব্যাপার বটে কিন্তু উহা আবার জীবধর্ম্মেরও নিতান্ত অনুবর্ত্তী। যদি জীবধর্ম্মানুযায়ী সুখের নিয়মাদ জীবতত্ত্ব হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে স্থিরীকৃত হইত তাহা হইলে আমাদিগের পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইতে পারিত। কিন্তু জীবধর্ম্মানুযায়ী সুখবিষয়ক নিয়মের কথা দূরে থাকুক, আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থামতে ঐ সুখের সহিত ব্যক্তিগত ও সমাজগত সুখের বিভেদ আছে বলিয়া সহজে বোধগম্য হয় না।

ক্ষুধাজনিত যন্ত্রণা এবং উহার পরিতোষজনিত সুখ জীবধর্ম্মাক্রান্ত। ব্রত পূর্ব্বক উপবাস করিলে যে সুখ লাভ হয় তাহা ব্যক্তিগত। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির যন্ত্রণা মোচন জনিত সুখ সমাজ সঙ্গত এবং ব্যক্তিগত। আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত একত্রে আহার করিলে যে সুখ হয়, তাহাও বোধ হয় ঐরূপ বিবিধশ্রেণিভুক্ত। কিন্তু আমরা শ্রাদ্ধ বিবাহাদি উপলক্ষে বহু আয়াস দ্বারা কোন দল গ্রাম বা পল্লিস্থিত শত্রুমিত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিষ্কণ্টকে ভোজন করাইয়া যে সুখলাভ করিয়া থাকি, তাহা সমাজব্যাপী নিয়ম বিশেষের ফল। ইহাতে ব্যক্তিগত সুখ নাই বলিলেও হয়। যে কএকটি উদাহরণ দেওয়া গেল ভরসা করি, তাহাতে নানাবিধ সুখের বিভেদ কতদূর স্পষ্টাকারে ব্যক্ত হইবে, কিন্তু অনেক স্থলে সুখবিশেষ নিতান্ত জটিলভাবে একাধিক শ্রেণিভুক্ত হইয়া থাকে, এবং তাদৃশ স্থল সুখ বিধানের ঋজুজ্ঞান লাভ করা অতি কঠিন ব্যাপার। অতএব পাঠক মনে রাখিবেন যে, আমরা সর্ব্বপ্রকার সুখের আলোচনা করিতেছি না, যাহা কেবল ব্যক্তিগত বিধানের অনুবর্ত্তী তাহারই আলোচনা করিতেছি।

ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, চিত্তবৃত্তির চালনা ও অবরোধের ফল। কিন্তু চিত্তবৃত্তি গুলি নির্ব্বাচন করা কঠিন কার্য্য। যদি কখন Phrenology ফ্রেনলজি শাস্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে বোধ করি, নরমস্তিষ্কের লক্ষণাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়া এই বিষয়ের সহজ উপায় আশ্রয় করা যাইতে পারিবে। কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্রের বর্ত্তমান অবস্থাতে বুদ্ধিবৃত্তির ও চিত্তবৃত্তির বিভিন্নতা উপলব্ধ করাও দুষ্কর; নরমস্তিষ্কের অঙ্গভেদ এবং চিত্তবৃত্তি সমূহের ভেদাভেদের কথা আর কি বলিব। অতএব চিত্তবৃত্তির বিভেদ ব্যক্ত করিবার জন্য আমরা বস্তুগত

ব্যাপারের পরিবর্ত্তে প্রজ্ঞাগত ব্যাপার সংক্রান্ত বিচার প্রণালি অবলম্বন করিতেছি। প্রথমত পাঠক দেখিবেন যে, ব্যক্তিগণ সকলেই স্বকীয় বুদ্ধিমত্তে অহং-পর দুটী বিষয়ের ভেদ সততই করিয়া থাকে। আর কোন কোন চিত্তবৃত্তি সঞ্চালিত হইলে অহং পদার্থ সুখী হয়। এ কথার প্রমাণ বস্তুগত ব্যাপারেও দৃষ্ট হইয়া থাকে বটে কিন্তু আমরা প্রজ্ঞাগত প্রণালি মতে ইহার পক্ষে এই মাত্র বলিব যে সকলেই আপন মনে বুঝিতে পারেন এই স্থলে অহং পদার্থ সুখী হইল এবং এই সুখের হেতু, অমুক চিত্তবৃত্তির চালনা। সকলেই যে এরূপ স্থলে চিত্তবৃত্তিটীর লক্ষণ বিষয়ে একবাক্য হইবেন তাহা বলিতেছি না। কিন্তু কোন একটী চিত্তবৃত্তি সঞ্চালিত হইল এবং তাহা হইতে অহং পদার্থ সুখী হইল, এই দুটী বিকাশ সময়ে সময়ে সকলেরই প্রজ্ঞাধীন হইয়া থাকে। অতএব এই শ্রেণীস্থ চিত্তবৃত্তি ও সুখগুলিকে স্বার্থপর বলিয়া আখ্যায়িত করা যাউক। অহং পদার্থের সহিত "পর" পদবাচ্য মনুষ্য বা জীব শ্রেণীর ভেদ সম্যক পরিমাণে অনাবৃত। অতএব এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে মনুষ্যের পরার্থপর চিত্তবৃত্তি আছে কি না অর্থাৎ সকল ব্যক্তিরচিত্তে এমন কোন বৃত্তি আছে কিনা যে তাহা সঞ্চালন স্থলে প্রধান কল্পে পরের সুখ কামনা হয় এবং সেই কামনা পরিতোষ হেতু গৌণ কল্পে স্বকীয় সুখোৎপত্তি হয়। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে মনুষ্যের দয়াবৃত্তি স্বভাবসিদ্ধ বটে। এইরূপে চিত্তবৃত্তি মধ্যে স্বার্থপর পরার্থপর নামক দুটী শ্রেণী সহজেই স্থিরীকৃত হইতেছে।

সমাজতত্ত্ব অনুসারে যে কর্ত্তব্য বিধান উদ্ধার করা গিয়াছে, তাহা প্রতিপালন দ্বারা ব্যক্তিগণের পরার্থপর চিত্তবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইতে পারে কিন্তু স্বার্থপর চিত্তবৃত্তিগুলি প্রাগুক্ত বিধানের নিতান্ত বিরোধী। অতএব কর্ত্তব্য বিধান ব্যক্তিগত ব্যাপারে নিয়োজিত করণ পক্ষে এই এক মহাসঙ্কট স্থল উপস্থিত হইতেছে। সমাজতত্ত্ব মতে পরার্থপর কার্য্যগুলি নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্যক্তিগত নিয়ম মতে তাহা সকল সময়ে সুখপ্রদ হয় না। সমাজগত সুখ এবং ব্যক্তিগত সুখ মধ্যে স্বাভাবিক ঐক্য নাই। এই সঙ্কট আবার আর একটী কারণে বিলক্ষণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া আছে। স্বার্থপর চিত্তবৃত্তিগুলি স্বভাবত পরার্থপর বৃত্তি অপেক্ষা প্রবল। এবং এই প্রবলতা এত গাঢ় যে, ব্যক্তিগত পরার্থপরতা যতই পরিবর্দ্ধিত হউক কিছুতেই ঐ শ্রেণিস্থ স্বার্থপরতাকে পরাজয় করিতে পারে না। তৃতীয়ত ঐ স্বার্থপরতার আধিক্যই আবার জীবধর্ম্ম

রক্ষার উপযোগী। সুতরাং আমরা সর্ব্ব প্রকারেই স্বার্থপরতা পাশে অতি দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ হইয়া আছি। সূর্য্যের গতি বিষয়ক কুসংস্কার দূরীকরণের তুলনাতে সমাজ উদ্ধারিত কর্ত্তব্য বিধানটী হৃদয়ঙ্গম করা কত দুঃসাধ্য তাহা এখন অনুভূত হইতে পারিবে।

পাঠক যদি এ পর্য্যন্ত সম্যকরূপে অনুধাবন করিয়া থাকেন, তবে বুঝিতে পারিবেন যে, আমি কি বিষম সঙ্কটের কথা ব্যক্ত করিয়াছি। কিন্তু এই সঙ্কট অভিনব কিম্বা অজ্ঞাত নহে। ফলত জগতে পাপের ছড়াছড়ি যথেষ্টই রহিয়াছে; আর পুণ্যাত্মাগণের চেষ্টা এবং উৎকণ্ঠাও বিরল নহে। তথাচ পাপ পুণ্যের বৈষম্য চিরকালই আছে। সুতরাং সমাজতত্ত্ব ও ব্যক্তিতত্ত্ব হইতে যে পরস্পর বিরুদ্ধ নিয়ম প্রদর্শন করা গেল, তাহা এই চিরপ্রসিদ্ধ বৈষম্যের সাক্ষী মাত্র। বরং এই বৈষম্য দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করাই অসঙ্গত। যদি এইরূপ সঙ্কট না থাকিবে তবে পাপ পুণ্যের বিরোধ এত প্রগাঢ় কেন হইবে? জগতে পাপের আতিশয্য এবং পুণ্যের সঙ্কুচিত অবস্থা মনে করিলে উল্লিখিত বিরুদ্ধ নিয়মাদির সত্তা সম্যক রূপেই সাব্যস্ত হইবে। সুতরাং সমাজধর্ম্মানুযায়ী পরার্থপরতার বিধান ও ব্যক্তিগত ধর্ম্মানুযায়ী সুখসাধন বিধান, এই বিধানদ্বয়ের বৈষম্য বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া উভয়ের সমবায়ী ব্যবস্থা অন্বেষণ করিতে হইতেছে।

সুখ বিধান বিভাগের উপসংহার করিবার পূর্ব্বে আর কতিপয় নিয়মের উল্লেখ করা আবশ্যক। এগুলি আপাততঃ উপরোক্ত কথার সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া বোধ হইবে না কিন্তু পরে যে সকল কথা বলিতে হইবে তাহার জন্য অত্যাবশ্যক। ব্যক্তিগত সুখ ত্রিবিধ। তাহার মধ্যে দ্বিবিধ সুখের উল্লেখ করা গিয়াছে; যথা স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা জনিত সুখ। তৃতীয় শ্রেণীস্থ সুখ, ক্রিয়াজনিত। অর্থাৎ বিবিধ চিত্তবৃত্তির পরিতোষ হেতু যে সুখোৎপত্তি হয় তাহা ব্যতীত আর এক প্রকার সুখ আছে। আমাদিগের চিত্ত বা বুদ্ধি সংক্রান্ত মনোবৃত্তির কথা বল কিম্বা বহিরিন্দ্রিয়ের কথা বল, কেবল ইহাদিগের সঞ্চালন হইতেই এক প্রকার সুখ হইয়া থাকে। যৌবন ও বাল্যাবস্থায় যে সকল সুখলাভ করিয়াছ তাহা স্মরণ করিলে বুঝিতে পারিবে যে উৎসাহ পূর্ব্বক যে কোন বিষয়ে উদ্যম কর তাহাতেই সুখোৎপত্তি হয়। কিন্তু ঐ সুখ কোন চিত্তবৃত্তি পরিতোষের ফল নহে। মৃগয়ার সুখ মৃগলাভ সুখের দ্বারা পরিমিত হয় না; উভয় এক শ্রেণিস্থ বলিয়াও গণ্য নহে। যে কোন উদ্যম

বল তাহা ভঙ্গ হইলে যেরূপ দুঃখ হইয়া থাকে এবং তাহার অনুসরণ কালে যে সুখলাভ হয়, তাহার সহিত উদ্দিষ্ট বিষয়ের লাভালাভ জনিত সুখ দুঃখের তুলনা করাও কঠিন। বাস্তবিক সুখ যে এত দুর্লভ বস্তু তাহার প্রধান কারণ এই যে ইহা প্রধানত উদ্দেশ্যানুসরণেরই অঙ্গ, নিরুদ্যম হইয়া স্বকীয় মানসিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে সুখের চৈতন্য প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। আর নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে তদ্বিষয়ক স্মৃতিমাত্র উপলব্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ সুখের সত্তা, সুখ অতীত হইলেই বুঝা যায় অস্তিত্বকালে তদ্বিষয়ক চৈতন্য লাভ করা অতীব দুষ্কর। এই কথার একটি পোষক প্রমাণ হিন্দু মাত্রেরই স্মরণ হইবে, কেননা শাস্ত্রমতে আত্যন্তিক সুখবোধ মোহস্বরূপ বলিয়া গণ্য। যে চেতনা যথাকালে লক্ষিত হয় না, যাহা কেবল স্মৃতি মধ্যে অবস্থান করে, তাহা স্বপ্নবৎ এবং মোহ-নিদ্রা জনিত ভিন্ন আর কি হইবে? বস্তুতঃ এই শাস্ত্রোক্ত কথার সূক্ষ্মতত্ত্ব কেবল উল্লিখিত ভেদজ্ঞান মূলক। চিত্তবৃত্তির পরিতোষ হইতে এক শ্রেণীর সুখ হয় আর সেই সুখ লাভের জন্য নানাবিধ কামনা মনে উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু যে কোন কামনা মনে স্থান পায় তাহার অনুসরণদ্বারাই আর এক প্রকার সুখলাভ হইবে। এমন কি দুঃখ লাভের কামনা অভাবনীয় বিষয় নহে। সর্ব্বপ্রকার কৃচ্ছ্রব্রতেই এই কামনা দৃষ্ট হয়। এবং এই সূত্রে দুঃখভোগও সুখপ্রদ হইয়া থাকে। এইরূপ সুখ, যত্নদ্বারা লব্ধ দুঃখের সহিত অভিন্ন নহে। উহা দুঃখরূপ কামনা বিশেষ অনুসরণ করিবার ফলমাত্র।

আর একটি কথা এই যে জীবমাত্র সাধারণতঃ এবং ব্যক্তিগণ বিশিষ্টরূপে অভ্যাসের বশবর্ত্তী। যেসকল মনোবৃত্তি সঞ্চালিত হয় তাহা অভ্যাস সংস্কারে তেজস্বী হইয়া থাকে এবং যাহা উপর্য্যুপরি অবরুদ্ধ হয় তাহাও ঐ কারণে হীনতেজ হইয়া উঠে। অতএব অভ্যাস প্রক্রিয়া দ্বারা প্রমত্ত অনুসরণ মূলক সুখোদয় হইয়া থাকে, আর তদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ চিত্তবৃত্তির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া তত্তৎ বিষয়ক পরিতোষ জনিত সুখের তারতম্য হয়। এই নিয়মগুলি স্বতঃসিদ্ধ নহে, কিন্তু যে সকল ব্যাপার হইতে উহা উদ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে সর্ব্বসাধারণেরই অভিজ্ঞতা আছে। সকলেই স্ব স্ব অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান করিলে এই সকল নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন, এবং স্বীকার করিলে উহা অবলম্বন করিতে আপত্তি করিতে পারিবেন না।

অতএব দেখা গেল যে ব্যক্তিগত ব্যাপারে সুখ-সাধন বিষয়ক স্বতন্ত্র

নিয়ম আছে। তাহার সহিত সমাজগত নিয়মানুযায়ি কর্ত্তব্য বিধান বিভিন্ন। এই বৈষম্য দূরীকরণ করা আবশ্যক। এতদর্থে আর কতিপয় নিয়ম অবলম্বন করা যাইতে পারে। প্রথমত ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা বিষয়ক ভেদজ্ঞান. দ্বিতীয়ত অভ্যাসের ফলাফল তৃতীয়ত এই সকল বিষয়ের কোন সমবায়ী নিয়ম। আর চতুর্থতঃ অনুসরণ পথ বিষয়ক নিয়ম। আগামী বিভাগে উপরোক্ত তৃতীয় বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে। ব্যক্তিগণ এই সকল কথা বুঝিয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্বন্ধে সমবায়ী নিয়ম করিলেই সকল দিক রক্ষা হইতে পারে। তদ্ভিন্ন লোকালয়ের বিশৃঙ্খলা বিমোচন হইবে না।

অন্ধকার ক্রোড়ে।

গভীরেণান্ধকারেণ প্রচ্ছন্নে হৃদয়ে হি যৎ।

তমসি তমসি ত্যক্ত্বা বাচো ব্যাহরণৈ মুহুঃ।

এই অন্ধকারেই নির্গুণ ঈশ্বর। গুণাধার হইয়াও কেবল সত্তারূপে প্রকাশিত।

৺ কেশবচন্দ্র সেন।

কাল রজনি! মহা নিশি! ঢাল, ঢাল, আরও ঢাল; অন্ধকারের উপর অন্ধকার আরও ঢাল; নিবিড় কালিমাময় দিগন্ত-ব্যাপী অতুল্য অনন্ত অন্ধকার। মরি কি সুন্দর, কি ভয়ানক, ভয়ানকের ভয়ানক, আত্মা-স্পর্শী এই মহান্ দৃশ্য!! তরঙ্গের উপর তরঙ্গ; তরঙ্গায়িত, প্লাবিত, পৃথিবী আজ অন্ধকারে; গাঢ় গম্ভীর সর্ব্বগ্রাসী ভীম অন্ধকারে; বামে দক্ষিণে, উচ্চে, নিম্নে, সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বদেশে ছুটিতেছে ভ্রূকুটি করিয়া ওই অন্ধকার;—ছুটিতেছে, নাচিতেছে, প্রবাহিত হইতেছে—গাঢ় অন্ধকার স্রোত। ধরে না, যামিনি! আর ধরে না এই পৃথিবীতে তোমার অক্ষয় তিমির রাশি। জগৎ প্লাবিত হইয়াছে, প্রবেশ করিয়াছে প্রত্যেক পরমাণুতে ঐ ঘোর অন্ধকার;—নিবিড় নীরদ জালে জড়িত নক্ষত্র বিরহিত আকাশ মণ্ডল,—উদ্ভাসিত হইতেছে অন্ধকারে; তবুও ঢালিতেছে, অবিশ্রান্ত অবিরত মুষল ধারে ঢালিতেছে,—তিমির রাশির উপরে তিমির রাশি! ঢাল, ঢাল, কালরাত্রি

আরও ঢাল তোমার অক্ষয় অনন্ত সম্পদ! মনুষ্য! তোমার কি দুর্ব্বুদ্ধি; তুমি এই অসীম অন্ধকার রাশি আলোকিত করিতে চাও। ইহার কোন্ অংশ তুমি আলোকিত করিবে? ইহার একটি পরমাণুকেও উজ্জ্বল করিবার ক্ষমতা ত তোমার নাই। তোমার এই "দেওয়ালী" উৎসব বালকের ক্রীড়া; উচ্চ অট্টালিকা-নিচয় দীপ মালায় সুশোভিত করিয়াছ, রাজ পথে, বিপণি স্থলে, দীপপুঞ্জ সংস্থাপিত করিয়াছ; ক্ষণেকের জন্য অতি সুন্দর দেখিলাম, একটি, দুইটি, তিনটি, ভাই! তোমার প্রদত্ত সমস্ত দীপ নিবিল; রাজপথে, অট্টালিকা পরে, বিপণি স্থলে সংস্থাপিত দীপ-পুঞ্জ অন্ধকারে গ্রাস করিয়াছে। দুই একটি নিভৃত কক্ষ হইতে বাতায়ন পথে মৃদু আলোকের এক আধটা ক্ষীণ রশ্মি দৃষ্টি গোচর হইতেছিল, তাহাও ক্রমে অদৃশ্য প্রায়। হায়! এইরূপ, মনুষ্যের ক্রিয়া মাত্রই ক্ষণস্থায়ী বাল্য ক্রীড়া। দুই মিনিট মধ্যে তাহার দীপালোক নির্ব্বাপিত হইল; দুই ঘণ্টা পরে তাহার জীবনালোক নিবিবে; দুই দিন পরে তাহার নাম মাত্রও পৃথিবীতে রহিবে না; অখণ্ড পূর্ণ অন্ধকারে তাহার অস্তিত্ব মিশিয়া যাইবে!

ভীম, নিবিড়, দুর্জ্জয়, অন্ধকার-রাশির মধ্যে আমি একাকী। নিস্তব্ধ, নীরব, সুপ্ত, মৃতপ্রায় প্রাণী জগৎ, ওই যে কি শব্দ। অন্ধকারের শব্দ! ডাকিতেছে, গর্জ্জিতেছে অন্ধকার!! এক দিকে ভীষণ, আতঙ্কময়, অনন্ত তিমির পারাবার, অপর দিকে একটি পতঙ্গ, কীটাণুকীট, ক্ষুদ্র পরমাণুর পরমাণু কণা মনুষ্যাধম আমি। কি বিসদৃশ অবস্থা!! কোনও মনুষ্যের জীবনে এরূপ অবস্থা ক্ষণেকের জন্যও হয় নাই!

আমি এই নিবিড় অন্ধকার স্রোতে ভাসিয়া যাইব—আলোক চাই না; আলোক চঞ্চল; অন্ধকার অচঞ্চল; আমি অচঞ্চল ভালবাসি; অন্ধকার ভালবাসি। প্রিয়তম সুন্দর অন্ধকার! আমি তোমাতে ভাসিয়া যাই, তোমার উপর সন্তরণ করি, আইস তোমাকে অনুভব করি স্পর্শ করি, চুম্বন করি, আলিঙ্গন করি। আমাকে তোমার অনন্ত স্রোতে অন্ধকার! ভাসাইয়া লইয়া চল অনন্তের দিকে; আমি আর ফিরিব না;—অনন্তের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অনন্তে যাইয়া মিলিব। ঈশ্বর অনন্ত, অন্ধকারও অনন্ত, আমি অন্ধকারের সঙ্গে সেই অনন্ত বিধাতার দিকে কি যাইতে পারিবনা? কিন্তু হায়। আমি যে ডুবিতেছি; এই গভীর তিমির রাশির অতল গর্ভে আমি যে ডুবিতেছি,—শরীর ডুবিল, মন ডুবিল; আত্মা আচ্ছন্ন আতঙ্কময়, অন্ধকারে! হায় একি আমার সত্ত

নাই, অস্তিত্ব নাই? সমস্ত ডুবিল যে অন্ধকারে; আমি তবে অন্ধকারের এক অংশ; আমিও কি তবে অন্ধকার? তা বই কি? মনুষ্য জীবন অন্ধকার বই আর কি? পূর্ব্বে অন্ধকার, পরে অন্ধকার, মধ্য ভাগে অন্ধকারের সহিত কঠিন সংগ্রাম। সংগ্রামে কে জয়ী? মনুষ্য? না, অন্ধকার জয়ী। কিন্তু যামিনি প্রিয়তমে, আমাকে ডুবাইও না; গভীর আঁধার রাশিতে আমি ডুবিব না; আমি তোমার আধার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অনন্তের দিকে যাইব; যামিনি আমাকে লইয়া চল। তাই বা কেন? আমি ডুবিব। যদি না ডুবিলাম, তাহা হইলে ত কেবল ভাসিতেই থাকিলাম। ভিতরের সকল রহস্য লুকানই রহিল। ডুবিলাম না, বাহিরের স্রোতের উপর ভাসিতে থাকিলাম! তা নয়, ডুবিব অন্ধকারের মধ্যে,—অনন্তের মধ্যে ডুব দিব; গভীর হইতে গভীরতর গর্ভে প্রবেশ করিব; তথায় যাইয়া প্রাণ-ভরে অনন্ত অনুভব করিব, স্পর্শ করিব, অনন্তের সহিত আলাপ করিব, অনন্তে হৃদয় মিশাইব। আহা অনন্তে হৃদয় মিশান কি আরাম, কি শান্তি, কি সুখপ্রদ; স্বর্গীয় শান্তি, পবিত্র আরাম, অপার্থিব সুখ! অন্ধকার মধ্যে হৃদয় পূর্ণ, বিমোহিত, প্রফুল্ল, উদ্বেলিত, অন্ধকার উপলব্ধি করিয়া! অন্ধকারের ঢেউ আসিয়া হৃদয়ে লাগিল; হৃদয় উথলিল, সংসাররূপ বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া হৃদয় শত মুখে, সহস্র ধারায় ধাবিত হইল; উচ্ছ্বাসের উপর উচ্ছ্বাস, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, হৃদয়ের তরঙ্গ যাইয়া অন্ধকারের তরঙ্গে ঠেকিল, উভয়ে একত্র হইয়া অনন্তের দিকে ছুটিল।

অন্ধকার হৃদয়-স্পর্শী; অন্ধকারে হৃদয় উথলে, হৃদয় তন্ত্রী বিধূনিত হয়, আত্মা জাগরিত হয়, জড় জগতের দুর্গন্ধময় বায়ু পারাবার ভেদ করিয়া আত্মা অনন্তের দিকে অগ্রসর হয়; আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে; আত্মায় আত্মায় সাক্ষাৎ হয়; আত্মায় পরমাত্মায় সম্মিলন হয়। হায় এত রহস্য অন্ধকার মধ্যে। এত ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণ অন্ধকারের! এক মিনিট পূর্ব্বে যে হৃদয় নীচতার সুগভীর, সংকীর্ণ পঙ্কিল কূপের পঙ্কিলতম স্থানে নিপতিত হইয়া সহস্র কদর্য্য পৈশাচিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর ছিল, মলিনতার উপর মলিনতা উদ্গীর্ণ হইতে ছিল যে হৃদয় হইতে, মুহূর্ত্ত মধ্যে সে হৃদয়ের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল! নিবিড় গভীর অন্ধকার হৃদয়কে টানিয়া আনিল মলিনতা হইতে নির্ম্মলতায়, নীচতা হইতে মহত্বভাবে, সংকীর্ণতা হইতে অনন্তে টানিয়া আনিল হৃদয়কে অন্ধকার! হৃদয় সংসারের কুহক ভুলিল; অন্ধকার মধ্যে অবাক হইয়া অনন্তের ধ্যানে নিমগ্ন হইল!!

আতঙ্কময় ভয়ানক, ভয়ানকের ভয়ানক অন্ধকার! কোন্ হৃদয়, কোন্ মনুষ্য-হৃদয় অন্ধকাররাশি দেখিয়া, তাহার প্রাণস্পর্শী শব্দ শুনিয়া আতঙ্কে ব্যাকুলিত না হয়? কেন এ আতঙ্ক, কেন এ ব্যাকুলতা? নিশীথ নরহন্তা তস্কর বা দুর্বৃত্তদিগের কথা বলিতেছি না, কুসংস্কারাপন্ন ভীরুপ্রাণ কাপুরুষদিগের কথাও বলিতেছি না; তাহাদের ত্রাস মলিনতা-জনিত ও অজ্ঞানতা-নিবন্ধন, তাহাদের আশঙ্কা দুর্বৃত্ততা-মূলক, অতএব তাহাদের কথাও বলিতেছি না কিন্তু কুসংস্কার, বিহীন, নির্ম্মলস্বভাব, সাহসী, বলশালী, বীরশ্রেষ্ঠ মনুষ্য-প্রবরও কেন অন্ধকার দর্শনে সঙ্কোচিত হন? কেন তাঁহার হৃদয় এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আতঙ্কে আলোড়িত হয়? কেন তিনি ক্ষণকালের জন্যও চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান হন ও স্থির অথচ বিস্মিতনেত্রে নিবিড় অন্ধকার রাশির প্রতি সভয়ে দৃষ্টিপাত করেন? কোন নির্দ্দিষ্ট ভয়ে তিনি ভীত নন, তাঁহার ত্রাস,—ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়গত নহে; অন্ধকারের করাল মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের যে অবস্থা সম্পাদিত হয় তাহা সামান্য ভয় বা ত্রাস বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না; সে অবস্থা সাধারণ ভয় বা ত্রাসের উচ্চতর গ্রামে স্থিত; তাহা অসীম অনির্দ্দিষ্ট আতঙ্ক—ইহাই অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন করে, মনপ্রাণ ব্যাকুল করে। কিন্তু অন্ধকার দেখিয়া কেন এই হৃদয়-বিকম্পনকর আতঙ্ক উপস্থিত হয়? অন্ধকার মধ্যে এমন কি দ্রব্য আছে, যে মনুষ্য তাহা সহ্য করিতে পারে না, ধারণ করিতে পারে না? যাহা হইতে মনুষ্যহৃদয় বিকম্পিত হইয়া, ব্যাকুলিত হইয়া, দূরে পলায়ন করিতে চায়, সে পদার্থ কি? অন্ধকার মধ্যে এমন কি পদার্থ আছে, যদ্দ্বারা এবম্ভূত আতঙ্ক সমুৎপাদিত হয়? বোধ হয়, তাহা সেই হৃদয়-বিশ্লথকর পদার্থ, সেই ভয়দ বস্তু—অনন্ত। নিবিড় অন্ধকার-নিহিত অনন্তের গম্ভীর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া মনুষ্য অজ্ঞাতসারে নিজের ক্ষুদ্রতা, উপায়হীনতা উপলব্ধি করে, তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, সে আপনার পদশব্দে আপনিই চমকিত হয়। "অকূল অনন্ত অন্ধকার পারাবারে আমি উপায়হীন, আমি একাকী আমি একটি ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর পরমাণুবৎ; আমার বলবীর্য্য, বুদ্ধিমত্তা—হায়! এ সকল কিছুই নয়, সমুদ্র মধ্যে জলবিন্দুবৎ" ইত্যাকার চিন্তা তাড়িত গতিতে মনুষ্য-হৃদয়ে উদিত হইয়া ক্ষণেকের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়, মনুষ্য তখন ভয়ে বিহ্বল হয়। নিজের সংকীর্ণ শক্তি বা শক্তিহীনতা ক্ষণেকের জন্যও সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিয়া সে অন্য "কিছুর" প্রতি নির্ভর করিতে ব্যগ্র হয়। কিন্তু সে অন্য "কিছু" কি, আর মনুষ্য

তুমিই বা কি? কবি কহেন তুমি "a worm—a god" যথার্থই তুমি তাই; তোমাকে পর্য্যালোচনা করিলে তোমাকে চক্ষু মেলিয়া দেখিলে বোধ হয় তুমি উভয়ই "a worm—a god." তোমাতে নির্ম্মল দেবভাব ও নারকীয় কীটত্ব উভয়ই বর্ত্তমান। স্বর্গের দেবতা ও নরকের কীট, তুমি একাধারে উভয়ই। মনুষ্য! তোমার জীবন, তোমার প্রকৃতি, এক অপূর্ব্ব অজ্ঞেয় রহস্য। তুমি কি তাহা জানি না। হায়! তবে কে বলিবে, তিনি কি, যিনি তোমাকে সৃজন করিয়াছেন। তুমি যাঁহার সৃষ্টি, প্রতি পদক্ষেপে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানেই হউক, তুমি যাঁহার প্রতি নির্ভর না করিয়া থাকিতে পার না, তিনি কি!!!

তিনি জ্যোতি না অন্ধকার! হায়—ক্ষুদ্র অধম মনুষ্য, তুমি কিরূপে জানিবে তিনি কি? তিনি তোমার বুদ্ধির, জ্ঞানের, কল্পনারও অতীত। তিনি তিনিই। তুমি তোমার নিজের রঙে তাঁহাকে রঞ্জিত করিতে ক্ষান্ত হও। তাঁহার বলিয়া তোমার নিজের ছবি আর জগতে দেখাইও না।

হৃদয়ের অন্তস্তল-স্পর্শী সৌন্দর্য্য অন্ধকারের আছে। ঐ দেখ আঁধারের কালিমা রাশি হইতে সৌন্দর্য্য ছটা কেমন উছলিয়া পড়িতেছে, আঁধারের এই অতুল মাধুরী যে নিরীক্ষণ না করিয়াছে, সে সৌন্দর্য্যের এক অংশ দেখে নাই। সৌন্দর্য্যের যে অংশে নিবিড়তা, যে অংশে গাম্ভীর্য্য, সে অংশে সে অন্ধ। মনুষ্য! অন্ধকারের রূপরাশি একটি বার নয়ন ভরিয়া, হৃদয় ভরিয়া দেখ—আর ভুলিবে না, ভুলিতে পারিবে না।

শুন, ঐ শব্দ শুন—আঁধার ডাকিতেছে,—কি ভয়ানক মর্ম্মস্পর্শী শব্দ! আঁধার ডাকিতেছে, বলিতেছে—মনুষ্য সাবধান!—আলোকের পর অন্ধকার, জন্মের পর মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুর পর কি? অন্ধকার বলিল—আমাতে ডুব, তবে জানিবে। হায়! অন্ধকারে ডুবিব, তবে জানিতে পাইব, মৃত্যুর পর কি? মৃত্যু হইবে তবে জানিব মৃত্যুর পর কি, আর মৃত্যুই বা কি? ইহার পূর্ব্বে জানিতে পাইব না, জানার অধিকার নাই? ভাল আলোকের পর যেমন অন্ধকার, অন্ধকারের পরেও ত তেমনি আলোক। জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পরেও কি তেমনি জন্ম?—জন্মমৃত্যু চক্র-প্রায় কি তবে ঘুরিতেছ? হায়! অন্ধকারের সেই একই শব্দ—"আমাতে ডুব, তবে জানিবে"। হায় অন্ধকার! তোমার পূর্ণতায় নিমগ্ন হইলে প্রাণী কি আর তোমার সীমা পার হইতে পারে?

মর্ম্ম কথা।

প্রায় আটশত বৎসর হতভাগ্য ভারত কঠিন অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব হইতেই ভারতবাসীগণ ক্রমে ক্রমে হীনবীর্য্য হইয়া আসিতেছিল, নতুবা যে দেশ বিজয়-মদোন্মত্ত সেকেন্দর সাহের প্রচণ্ড আক্রমণও অটলভাবে সহিয়াছিল, সে দেশ অপেক্ষাকৃত অসভ্য ধর্ম্মোন্মত্ত ইসলাম্‌দিগের আক্রমণ কেন প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না? বৈদিক সময়ের সারল্য ও ওজস্বিতা, মহাভারত ও রামায়ণের সময়ের বীরত্ব ও মহিমা, দর্শন ও পুরাণ স্ফূর্ত্তির সময়ের মানসিক পূর্ণবিকাশ, পরে বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি রাজাগণের সময়ের গৌরব ও কীর্ত্তিপ্রচার,—পুরু ও সেকেন্দরের যুদ্ধ হইতেই ক্রমে ক্রমে অস্তমিত হইয়া আসিতেছিল। তাহার পর থানেশ্বর ক্ষেত্রে স্বাধীনতার সহিত আমাদের মনুষ্যত্ব ও আমাদের সমস্ত পূর্ব্ব-গৌরব একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এই আট শত বৎসরের অধীনতায় আমাদের যেরূপ দুর্দ্দশা ও যেরূপ অবনতি হইয়াছে, তাহাতে আমরা যে আর কখন আমাদের অবস্থার উন্নতি বা পরীবর্ত্তন করিতে পারিব, তাহা সহজে আমাদের উপলব্ধি হয় না। আবার এই সময়ের মধ্যে রাজ পরিবর্ত্তনে—মুসলমানের পর ইংরেজদের অধীনতায়,—আমাদের অবস্থায় অনেক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

যখন এদেশ মুসলমানদিগের অধিকারে ছিল, তখন এদেশের একরূপ অবস্থা হইয়া আসিতেছিল। মুসলমানদিগের স্বতন্ত্র দেশ ছিল না; তাঁহারা ভারতবর্ষকেই তাঁহাদের স্বদেশ বলিয়া মনে করিতেন। তাহার পর বহুদিন একত্রে থাকায় পরস্পর পরস্পরের সংঘর্ষে উভয় জাতির মধ্যে কতকটা সম্মিলন হইয়া আসিতেছিল। পশ্চিমেই মুসলমানদিগের প্রভাব অধিক ছিল, বাঙ্গালায় তাঁহারা ততদূর আধিপত্য করেন নাই; সেই জন্যই পশ্চিম দেশীয় হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার বাঙ্গালীদিগের হইতে পৃথক্ ও অনেকটা মুসলমানদিগের অনুরূপ। তথায় হিন্দু মুসলমানে বিবাহ পর্য্যন্তও চলিয়া গিয়াছিল। এতদূর মিলন হইলেও আমরা চিরকাল মুসলমানদিগের অধীনে থাকিয়া তাহাদের সহিত কখনই একজাতি হইয়া যাইতাম না। মহারাষ্ট্রীয়গণ তখন যেরূপ রণজিৎ সিংহের তেজে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে-

ছিল—রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়, ও শিখ্ জাতি মধ্যে আর্য্যবীর্য্যের যে স্ফুলিঙ্গ মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তাহা কালসহকারে ক্রমে প্রজ্বলিত হইয়া যেরূপে বিস্তৃত হইতেছিল, তাহাতেই মুসলমান রাজত্বের আহুতি হইত। ডাক্তার হন্টার সাহেব বলিয়াছেন যে হিন্দুস্থানে ইংরাজের অধিকার স্থাপনের পূর্ব্বেই মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ হইয়াছিল। ভারত রাজ্য সংস্থাপনের জন্য দিল্লীর বাদসাহ বা কোন মুসলমান শাসনকর্ত্তার সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ করিতে হয় নাই। কেবল মহারাষ্ট্রীয় ও শিখ জাতির সহিত বহুদিন ধরিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। বাস্তবিক কেবল হিন্দুরাই ইংরজেদিগের ভারত জয়ে বাধা দিয়াছিল।' সে যাহা হউক, মুসলমান রাজগণ ঐতিহাসিক পরিণামের কোন চিহ্ন রাখিবার পূর্ব্বেই কালের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেলেন—ইংরাজেরা আসিয়া এদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। মুসলমানদিগের ন্যায় ইংরাজের ভারতাধিকার অন্য জাতি কর্ত্তৃক বিচ্যুত হইবে না এই ধারণা করিলেও, ইংরাজাধিকারে আমাদের কি পরিণাম হইবে সমগ্র ইতিহাস শাস্ত্র মন্থন করিয়াও এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। ভারতের ভবিষ্যৎ অতি ভয়ানক। বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞগণ অতীতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া আমাদের হতভাগ্য দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার কল্পনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে আমাদের যেরূপ অবস্থাই থাকুক না কেন, এক্ষণে যে আমাদের অবস্থা—বিশেষত আধিভৌতিক অবস্থা—বিশেষ অবনত এবং ধন, সমৃদ্ধি, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে আমরা ইংরাজের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অনুন্নত, তাহা আর প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার আবশ্যক নাই। এখন কেবল ভাবিবার কথা আমাদের পরিণাম কি?

যদি জেতৃ-জিত-ভাব চিরদিন থাকা সম্ভব না হয়—যদি এক জাতি আর এক জাতির চিরদিন অধীন থাকা সম্ভব না হয় যদি এক জাতির চিরদিন আর এক জাতির অধীন থাকা ঐতিহাসিক সত্য-সঙ্গত না হয়, তবে এই হতভাগ্য ভারতের কি পরিণাম হইবে? ভারতবাসীরা কি পরিণামে ধ্বংস হইবে? —আমরা কি কালসহকারে ভূপৃষ্ঠ হইতে একেবারে উন্মূলিত হইব? তাহা হইব না। যদি আমরা একেবারে অসভ্য বর্ব্বর হইতাম—যদি আমরা এত উন্নত জাতি না হইতাম—অথবা যদি আমরা কালচক্রের পরিবর্ত্তনের সহিত, অবস্থা

বিশেষের বিপর্য্যয়ের সহিত, আপন অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে না পারিতাম—যদি আমাদের সমাজ এত দৃঢ়বদ্ধ না হইত—তাহা হইলে আমরা শত শত বৎসরের [illegible] এতদিন কোথায় ভাসিয়া যাইতাম। অন্ততঃ এতদিনে আমাদের ভবিষ্যৎ [illegible] হইত। হিন্দুসমাজ অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ—ইহাদের অন্তর্ভূত শক্তিও অত্যন্ত প্রবল। বুদ্ধদেব হইতে চৈতন্য পর্য্যন্ত কত কত ধর্ম্মসংস্কারক ও সমাজ সংস্কারকগণের এত চেষ্টা ও যত্ন সত্ত্বেও হিন্দুসমাজের উপর তাঁহারা কেহই কোন বিশেষ দাগ বসাইতে পারেন নাই। মুসলমানের তেজ ও বীর্য্য, কোরাণ ও তরবারি—এ সমাজকে বড় অধিক বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত করিতে পারে নাই। এখন ইংরেজের বিজ্ঞান, ইংরাজিশিক্ষা, ইংরেজের স্বার্থপর রাজনীতি ও ইংরাজের খৃষ্টানধর্ম্ম এত পরিবর্ত্তন করিয়াও হিন্দুসমাজে কোন গভীর চিহ্নই অঙ্কিত করিতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সভ্য ও উন্নত হিন্দুসমাজ অনুন্নত বা স্বীয় অবস্থা পরিবর্ত্তনে অসমর্থ নহে। এদেশের অন্তর্ভূত শক্তি অত্যন্ত অধিক—এখানে আধিভৌতিক (বৈষয়িক) উন্নতি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতি বা মনের উৎকর্ষতা অধিক স্বাভাবিক

যাহারা সামান্য তর্কে পরাস্ত হইয়া বহুকাল পোষিত মত পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, * তাহারা যে অবস্থা পরিবর্ত্তনে অসমর্থ একথা বড়ই ভ্রমাত্মক। তবে সাধারণত বৈষয়িক উন্নতিতে হিন্দুসমাজকে অনেকটা বীতরাগ দেখা যায়। হিন্দুসমাজ অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া স্থিতিশীলতা বশতই হউক, আর যে কারণেই হউক, উন্নত অবস্থা অথবা উন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থা হইতে সহজে নিম্নতর অবস্থায় যাইতে পারে না;—এই জন্যই এপর্যন্ত হিন্দুসমাজের রক্ষা হইয়াছে। মুসলমানেরা ত আমাদের তুলনায় কিয়ৎপরিমাণে অসভ্যজাতি ছিল তাহারা ত পাশব-বলেই আমাদের দেশ অধিকার করিয়াছিল। অভস্য মুসলমান-দিগের আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক কোন উন্নতিই ছিল না। এ অবস্থায় যদি উন্নত আর্য্যজাতি কতকটা স্থিতিশীল না হইত—যদি তাহার অন্তর্ভূত বল অধিক না থাকিত—তাহা হইলে হিন্দুসমাজের বড়ই দুরবস্থা হইত। সেইরূপ বর্ত্তমান ইংরাজাধিকারেও এই স্থিতিশীলতা গুণেই হিন্দুসমাজ এখনও এত অটলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। আমরা অবশ্য বৈষয়িক অথবা আধি-

* শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়ের দ্বারা স্বীয় মত প্রচার করিয়া হিন্দুধর্ম্মের নূতন আবরণ দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ভৌতিক বিষয়ে ইংরাজদিগের অপেক্ষা অনেক অবনত কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি এখনও আমাদের যাহা আছে, সে বিষয়ে ইংরাজদিগের অপেক্ষা অন্তত আমরা কোন অংশে ন্যূন নহি। এ অবস্থায় হিন্দুসমাজ অধিকতর পরিবর্ত্তনশীল হইলে বড় সুফল ফলিত না। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, আমাদের আধিভৌতিক উন্নতি না হইলে—শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয় ইংরাজদের অপেক্ষা অনুন্নত আছে, তাহার উন্নতি না হইলে—এ সময়ে আর আমাদের ভদ্রস্থতা নাই। সে যাহা হউক হিন্দুসমাজ একেবারে মৃত নহে কিম্বা একেবারে অতীতের ভূস্তরে পরিণত হয় নাই, যে সে দিকে আমাদের উন্নতি হইবে না। এখনই সে পথে শিক্ষিত যুবকদল অগ্রসর হইতেছেন এবং শীঘ্রই যে আমাদের সে দিকে উন্নতি হইবে তাহার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

অসভ্যজাতির সামান্য পাশববলের দ্বারা সভ্যজাতির উচ্ছেদ হয়। তবে যে জাতির অন্তর্ভূত শক্তি অত্যন্ত প্রবল, তাহাকে পাশব-বল একেবারে নষ্ট করিতে পারে না। চীনকে মহা অত্যাচারী তুর্কীরাও বিনষ্ট করিতে পারে নাই—হুন প্রভৃতি প্রবল অসভ্যজাতিরা রোমের একেবারে সমূলোচ্ছেদ করিতে পারে নাই। দুর্দ্দান্ত মুসলমানেরাও হিন্দুসমাজের কোন বিশেষ অপকার করিতে পারে নাই। একেত বর্ত্তমান উন্নত সময়ে পাশববলের আধিপত্য অধিক নাই—আবার দৃঢ়বদ্ধ হিন্দুজাতির পাশব-বল হইতে বিশেষ কোন আশঙ্কাও নাই। এই সকল কারণে ভবিষ্যতে হিন্দুজাতির উচ্ছেদ কখনই সম্ভব নহে।

হিন্দুজাতির অন্তর্নিহিত শক্তি অত্যন্ত অধিক বলিয়াই আর্য্যনামের এখনও এত সম্মান রহিয়াছে। ব্যক্তি বিশেষই হউক, আর জাতি বিশেষই হউক, শক্তিই তাহাদের মহত্ত্ব—তাহাদের উৎকর্ষতা পরিমাণ করিবার একমাত্র উপায়। যে পরিমাণে শক্তির বিকাশ হয় অথবা যে পরিমাণে তাহার ফল উৎপন্ন হয়, তদনুসারে সে শক্তির পরিমাণ বা তাহার গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। তবে যখন কোন শক্তি অন্য কোন শক্তির বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়, তখন বিরুদ্ধ শক্তি যে পরিমাণে হীনবীর্য্য হয়, তাহা দ্বারাই সেই শক্তির প্রকৃত ক্ষমতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই রূপে ব্যক্তি বা জাতি বিশেষের শক্তির পরিমাণ করিয়াই তাহাদের মহত্ত্ব—তাহাদের উপযোগিতা নির্ণয় করা যুক্তিসঙ্গত। আর্য্যজাতির শক্তি অসীম ছিল, তাহার পূর্ণ-

বিকাশও হইয়াছিল। তাঁহারাই প্রথমে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, জ্যোতিষ, গণিত, রাসায়ন, চিকিৎসা রাজনীতি সমাজনীতি, সাহিত্য, কাব্য, প্রভৃতি বিষয়ে সমগ্র মানবজাতির আদিগুরু এবং এসিয়ার এক সীমা হইতে ইউরোপের সীমান্তর পর্য্যন্ত সকল জাতিরই শিক্ষক ছিলেন। প্রাচীন রোম বা গ্রীস এত অধিক শক্তির বিকাশ করিতে পারে নাই। এই কারণেই হিন্দুজাতির সমতুল্য মহৎ বা উন্নত জাতি আর নাই। প্রাচীন আর্য্যগণ যে অনন্ত শক্তিবলে জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতিমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, তাহার ফলও অনন্ত;—কারণ শক্তি অনন্ত, তাহার বিনাশ নাই—তাহার ফল অনন্তকাল পর্য্যন্ত ফলিতে থাকিবে। তবে ভিন্ন সময়ে ফল ভিন্ন হইবে অথবা শক্তির বেগ প্রতিরুদ্ধ হইবেমাত্র।*—আর্য্যশক্তি প্রধানত সমগ্র পৃথিবীকে এই উন্নতির অবস্থায় আনিয়াছে। নদী যখন সামান্য নির্ঝরিণী হইতে প্রবাহিত হইয়া ক্রমে অন্য স্রোতস্বতীর সহিত মিলিতে মিলিতে—তাহার তেজ ও তাহার আয়তন বিস্তার করিতে করিতে, বেগবতী হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করে—তখন সেই নির্ঝরণীর প্রতি কেহই দৃষ্টিপাত করে না,—কিন্তু তখনও সেই নির্ঝরণীই এই বেগবতী প্রবাহিণীর প্রাণস্বরূপ প্রবাহিত হইতে থাকে। সেইরূপ পৃথিবীর সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত তাহার জনয়িত্রী হিন্দুজাতির অনন্ত চিরপ্রবাহিনী শক্তির দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করে না। কিন্তু এখনও যদি আমরা মানবজাতির এই সভ্যতা—এই উন্নতির মূল

---

* শক্তির অনন্ত ফলোৎপাদিকাগুণ সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বড় সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যদি একটি সামান্য লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা যায় তবে সেই লোষ্ট্র ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া পৃথিবীকে আকর্ষণ করিবে—সেই আকর্ষণ বলানুসারে পৃথিবী একটু ঊর্দ্ধে উঠিবে এবং তাহার কেন্দ্রও তদনুসারে একটু স্থানচ্যুত হইবে। পৃথিবী কেন্দ্রচ্যুত হইয়া আকর্ষণ বলে সূর্য্য ও তাহার সহিত অন্য গ্রহগণকেও কেন্দ্রচ্যুত করিবে। এই রূপে সৌর জগৎ কেন্দ্রচ্যুত হইয়া ক্রমে ক্রমে একটি একটি করিয়া নাক্ষত্রিক জগৎকে স্থানচ্যুত করিতে থাকিবে। যদিও লোষ্ট্রনিক্ষেপে এই অনন্ত জগৎকে স্থানভ্রষ্ট করা এত সামান্য যে, কোন যন্ত্রের দ্বারা এমন কি কল্পনা দ্বারাও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না—তথাপি সত্য সত্যই এই ফল ফলিয়া থাকে। যাঁহারা আকর্ষণের স্বরূপ এবং Laws of motion বুঝেন তাঁহাদিগকে ইহা বুঝাইতে হইবে না। এইরূপ শক্তির অনন্ত ফলোৎপাদিকতাগুণ সম্বন্ধে, Conservation ও Transformation of energy বুঝিলে এবং জড়জগতে ও জীব জগতে শক্তির ক্রিয়া বুঝিলে, আর কিছুই বুঝাইতে হইবে না।

অনুসন্ধান করি, তবে প্রাচীন হিন্দু জাতির দিকেই আমাদের দৃষ্টি পড়িবে। এক্ষণে আধুনিক ইউরোপ বাহ্যিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে বিভোর রহিয়াছে বলিয়া প্রাচীন আর্য্যশক্তির প্রভাব তাহাদের উপলব্ধি হয় না। সেই শক্তির সংস্কার-মাত্র রহিয়া গিয়াছে। আবার যখন আধিভৌতিক উন্নতির পর আধ্যাত্মিক উন্নতির সময় আসিবে, তখনই আর্য্যগৌরব পুনর্ব্বার জগতে প্রভাসিত হইবে।

অতএব যদি ভবিষ্যতে হিন্দুজাতির উচ্ছেদ হওয়া সম্ভব না হয় তবে, কি কখন তাহারা জেতৃজাতির সহিত মিলিত হইবে?—কখন কি এই উভয় জাতি মিলিয়া এক অভিনব জাতির সৃষ্টি হইতে পারিবে? তাহাও সম্ভব নহে। জেতৃ-জিত-জাতির পরস্পর মিলনের যে কয়েকটি কারণ দেখা যায়, তাহার কোন কারণই এস্থানে লক্ষিত হয় না। এখানে জেতা ও জিত জাতির মধ্যে প্রভেদ অত্যন্ত অধিক। পরস্পরের ভাষা, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিক ও আধি-ভৌতিক উন্নতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উভয়ের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক প্রভেদও অত্যন্ত অধিক। আবার উভয় দেশের দূরতা এত অধিক যে একদেশ হইতে অন্য দেশে যাতায়াত করিতে একমাসেরও অধিক সময় লাগে; সুতরাং এই দুই দেশের মধ্যে এক প্রকার কোন সংস্রবই নাই বলিতে হইবে। আবার জেতৃ-জিত-জাতির মধ্যে বিদ্বেষভাব এত অধিক ও দৃঢ়সম্বদ্ধ যে তাহা কখন অপনীত হইবে, এরূপ বোধ হয় না। পূর্ব্বে অনেকের ধারণা ছিল যে বহুদিন সহবাসে উভয় জাতির বিদ্বেষভাব লাঘব হইয়া আসিবে। কিন্তু সম্প্রতি রাজনৈতিক আন্দোলনে যেরূপ মহা হুলুস্থূল পড়িয়াছিল—পর-স্পরের প্রতি পরস্পরের বিদ্বেষভাব যেরূপ স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাতে সকলেরই পূর্ব্ব সংস্কার ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। পরস্পরের রীতি নীতি, ও ধর্ম্মগত পার্থক্যহেতু উভয় জাতি মধ্যে যে বিজাতীয় ঘৃণা বদ্ধমূল রহিয়াছে,—পরস্পরের অবস্থার পার্থক্য, জেতা ও জিতের অধিকারের বিভিন্নতা ও আমরা আর্য্য বলিয়া ম্লেচ্ছদের প্রতি আমাদের যে ঘৃণা, এবং আমরা জিত ও অসভ্য বিশ্বাসে আমাদের প্রতি তাঁহাদের যে ঘৃণা—যেরূপ দৃঢ়সম্বদ্ধ রহিয়াছে—তাহাতে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের এরূপ বিদ্বেষভাব কখন দূর হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার পর ইংরাজেরা কেহই এদেশের অধিবাসী হইবেন না; ইংরাজেরা এদেশকে তাঁহাদের অধীন দেশ মনে করেন, এজন্য তাঁহারা কেহই এই পদানত দেশের অধিবাসী হইতে ইচ্ছা করেন না। বিশেষত ইংলণ্ডের উপনিবেশ গুলির

যেরূপ অধিকার—যতটুকু স্বাধীনতা আছে, এদেশে বাস করিলে অন্তত সে অধিকার, সে স্বাধীনতা, পাইবেন না; আবার "ব্ল্যাক আক্ট" বা "জুরিসডিক্সান্ আক্ট" দ্বারা এস্থানে যেরূপ মধ্যে মধ্যে উৎপীড়িত হইতে হয়—তাহাতে তাঁহারা এদেশে বাস করা এক প্রকার নীচতা বা অপমান বোধ করেন। যদি তাঁহাদের সহিত আমাদের বিদ্বেষভাব এত দৃঢ়সম্বদ্ধ হয়—যদি পরস্পরের সম্মিলন সম্বন্ধে বিভিন্ন সমাজিক সঙ্গঠন, বিভিন্ন রীতি, নীতি ভাষা বা ধর্ম্ম বিশেষ অন্তরায় হয়, তবে উভয় জাতির একত্র মিলন কখনই সম্ভবপর নহে। যদি কখনও ইংরাজেরা এদেশে বাস করিতেন, তাহা হইলেও কালক্রমে ইংলণ্ড তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইলে অথবা অন্য কোন কারণে ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও, কোন কালে বরং উভয় জাতির সম্মিলন সম্ভব হইতে পারিত;—অন্তত, মুসলমানেরা আমাদের সহিত যতটুকু মিশিয়াছিলেন, ততটুকু মিশিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় উভয়জাতির পরস্পর সম্মিলিত হইবার কোন কারণই লক্ষিত হয় না। অনেকে মনে করেন যে ইংরাজী শিক্ষার অধিক বিস্তার হইলে,—ইংরাজী বিজ্ঞানের অধিকতর আদর হইলে—আমরা শিক্ষা, ব্যবসা, বাণিজ্য করিতে শিখিলে ও ক্রমে ক্রমে এইরূপে ইংরাজের সমকক্ষ হইলে—পরস্পরের বিদ্বেষভাব হ্রাস হইয়া আসিবে এবং কালসহকারে সম্ভবত উভয়জাতি একত্র সংমিলিত হইবে। কিন্তু এই বিশ্বাস বড়ই ভ্রমাত্মক। প্রথমত, উভয়জাতির বিদ্বেষের কারণ স্বতন্ত্র। আমাদের সমাজের এইরূপ উন্নতিতে পরস্পরের বিদ্বেষভাব অপনীত না হইয়া বরং ঘনীভূত হইবে। দ্বিতীয়ত, যখন আমাদের সমাজের এইরূপ আধিভৌতিক উন্নতি হইবে—তখন পরস্পরের সম্মিলন অপেক্ষা আমাদের অবস্থান্তর প্রাপ্তিরই অধিকতর সম্ভাবনা।

অতএব যখন ঐতিহাসিক নিয়মানুসারে হিন্দুজাতির কখন বিনাশ নাই —অন্তত বিনষ্ট হইবার এখন পর্য্যন্ত কোন চিহ্নই দেখা যায় নাই, এবং যখন তাহারা বিজেতাদের সহিত মিলিয়া কখন এক সমাজভুক্ত হইতে পারেন না—তখন অখণ্ডনীয় যুক্তির দ্বারা এইমাত্র সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে হিন্দুগণ আবার স্বাধীন হইয়া তাঁহাদের পূর্ব্বগৌরব পুনর্ব্বার উদ্ভাসিত করিবেন—তাঁহারা আবার শ্রেষ্ঠজাতি হইয়া অন্তত আধ্যাত্মিক বিষয়ে সমস্ত পৃথিবীর শিক্ষক হইবেন।

সর্ টমাস্ রোর দৌত্য।

বাণিজ্যজীবী ইংরাজ বহুকাল হইতেই বাণিজ্য সম্বন্ধে ভারতের সহিত বিশেষ সংশ্লিষ্ট। এই বাণিজ্য-লক্ষ্মীর সাধ্যমত উপাসনা করিয়াই অদ্য তাঁহারা এই ভারত সাম্রাজ্যের অধিকারিত্ব গ্রহণ, ও শাসনকার্য্যে সক্ষম হইয়াছেন। মহাত্মা আকবরের সময় হইতে এমন কি তাহার কিছু পূর্ব্বেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরেজেরা ভারতের সহিত প্রথম বাণিজ্য কার্য্যে ব্রতী হন। যে সাধনার সিদ্ধি লাভের জন্য ইংরাজ ভারতের সহিত বাণিজ্যে প্রথম প্রবৃত্ত হন, ঐকান্তিক যত্ন ও অসাধারণ অধ্যবসায় প্রভাবে তাঁহারা আজ সেই মহৎ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। যে মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাঁহারা ভারতে বাণিজ্য কার্য্যে প্রথমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যাহার সাধনার জন্য তাঁহারা সহযোগী ইউরোপীয় বণিকদিগের হিংসাপূর্ণ প্রতিযোগিতা, মোগল সুবাদার ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের অসহনীয় অত্যাচার, মোগল সম্রাট্‌দিগের কর্ত্তৃক বাণিজ্য উচ্ছেদের ভয় প্রদর্শন ও অন্যান্য নানাবিধ উৎপীড়ন অকাতরে সহ্য করিয়াছিলেন, আজ সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া তাঁহারা পূর্ব্বানুভূত কষ্টের যথেষ্ট পুরস্কার পাইয়াছেন। আমরা ঐতিহাসিক প্রণালীতে অদ্য তাঁহাদের সেই বাণিজ্যের প্রথম অবস্থা ও তদানুষঙ্গিক কষ্ট সমূহ এবং সুবিখ্যাত সর্ টমাস্ রোর দৌত্যকার্য্য ও তাহার ফল এবং তৎকালীন মোগল সাম্রাজ্যের কয়েকটি চিত্র যথাক্রমে পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরিব।

সর্ টমাস্ রো সাহেব ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে এসেক্স (Essex) এর অন্তঃপাতী লোলেটন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সুবিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ম্যাগডেলেন কালেজে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা হয়। টমাস্ রো'র প্রকৃতি অতি মধুর ছিল। আমরা এই প্রবন্ধে যতই অগ্রসর হইতে থাকিব, ততই আমরা তাঁহার চতুরতা, অসম সাহসিকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, স্বদেশহিতৈষিতা ও কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতি বিশেষ আসক্তি প্রভৃতি গুণ পরম্পরায় যথেষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হইতে থাকিব। অত্যাচারী, অসাধারণ ক্ষমতাশালী, যথেচ্ছাচার বাদসাহ জাহাঙ্গীরের রাজসভায় আসিয়া অশেষ বাধাবিপত্তি

উত্তীর্ণ হইয়া, যে ব্যক্তি স্বদেশের কার্য্যসাধন, ও সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহ-ভাজন হইয়া গিয়াছেন, তিনি কখন সামান্য ব্যক্তি নহেন। যদি যথার্থ বলিতে হয়, তাহা হইলে টমাস্ রো সাহেবই ভারতে ইংরাজ রাজ্য সংস্থাপন ও তদ্দ্বারা ইংলণ্ডের সৌভাগ্য সংসাধনের মূল কারণ।

হকিন্স্ সাহেব (Hawkins) যদিও জাহাঁঙ্গীরের সময়ে রো'র পূর্ব্বে আসিয়া ভারতে ইংরাজ বাণিজ্যের সুবিধা সংস্থাপনে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, যদিও তাঁহার নিকট রাজা জেম্সের স্বাক্ষরিত অনুরোধ লিপি ছিল, যদিও তিনি বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া শীঘ্রই তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি মূল কার্য্যের কিছুই সুবিধা করিতে পারেন নাই। রো সাহেবের ন্যায় তিনিও সম্রাটের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন ও যাহাতে ইংরাজ বাণিজ্য চিরস্থায়ী হয়, তাহা সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, অষ্ট প্রহর সম্রাট্সদনে উপস্থিত থাকিতেন, তথাচ, তদ্দ্বারা কোন উপকার না হইয়া বরং অপকারই সমুৎপন্ন হইয়াছিল। কি প্রকারে হকিন্সের সেই চিরসঞ্চিত আশা একেবারে বিধ্বস্ত হইয়াগেল, তদ্বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের এই প্রবন্ধের সহিত তাহার বিশেষ সংস্রব আছে বলিয়াই আমরা পূর্ব্ব ঘটনার অনুসরণে বাধ্য হইলাম।

হকিন্স্ সাহেব যখন প্রথম ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, তখন গুজরাটের শাসনকর্ত্তা মীর মোকারাব খাঁ বাহাদুর তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতে যান। তিনি সেই বাণিজ্য পোত হইতে কতকগুলি দ্রব্যজাত লইয়া আদতে তাহার মূল্য দান করেন নাই। ইহা ভিন্ন হকিন্সের প্রতি অন্যান্য কুব্যবহার করাতে ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে দুরপনেয় মনোমালিন্য সংঘটিত হয়। সময়ক্রমে হকিন্স্ আগরায় গিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণে বিশেষ কৃতকার্য্য হন। উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া হকিন্স্ মোকারাব খাঁ বাহাদুরের অত্যাচারগুলি সম্রাটের কর্ণগোচর করেন। সম্রাট্ বিদেশীয়-দিগের প্রতি এই প্রকার অমানুষিক অত্যাচার শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া মীর মোকারাবকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করেন। কার সাধ্য মোগল সম্রাটের অনুজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করে? সম্রাট যাহা বলিলেন মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা সম্পাদিত হইল। মীর সাহেব পদচ্যুত, অবমানিত ও যথাসর্ব্বস্ব হীন হইয়া মনে মনে প্রতিহিংসা লইবার কল গড়িতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইল, মীর মোকারাবের ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি পুনরায় প্রসন্ননয়নে চাহিয়া দেখিলেন। তিনি উৎকোচ প্রদানেই হউক, বা সম্রাটের দয়াবলেই হউক, পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া হৃত মান ও ধনরাশির উদ্ধারে কৃতকার্য্য হইলেন। অনেকগুলি প্রধান প্রধান আমীর ওমরাও তাঁহার সহায় হইয়া উঠিলেন। সকলেই ইংরাজের প্রতি সমান অনাদর প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেবল হকিন্স্ (Hawkins) যে তাঁহাদের বিষনয়নে পতিত হইলেন, এমন নহে—সমস্ত ইংরাজ জাতির প্রতিই তাঁহাদের বিদ্বেষপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। সকলেই একবাক্যে ইংরাজবাণিজ্য লোপের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সকলেই জানেন যে, জাহাঙ্গীর অতিশয় অলস ছিলেন। তিনি বড় লোকের মুখে যখন যাহা শুনিতেন তখনই তাহাতে ধ্রুব বিশ্বাস করিয়া বসিয়া থাকিতেন। সত্যাসত্য পর্য্যবেক্ষণের কিছুমাত্র নিজে চেষ্টা করিতেন না। জাহাঙ্গীরের এই প্রকার অলস প্রকৃতি উপরোক্ত ইংরাজ দ্বেষীদিগের বাসনা সিদ্ধির পক্ষে নিতান্ত অনুকূল হইল। তাঁহারা সকলে মীর সাহেবের সহিত মিলিয়া সম্রাটের কর্ণগোচর করিলেন যে, ইংরাজদিগের প্রশ্রয়ে সম্রাটের বিশেষ অনিষ্ট সংসাধন হইতেছে। তাঁহারা একটি আশ্রয়স্থান (কেল্লা) নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন ও তজ্জন্য অনেক গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র ও কামানাদি আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাদিগকে অবাধে বাণিজ্য করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলে, ইহারা হয় ত কালক্রমে সম্রাটের প্রতিযোগী অন্যান্য বিদেশীয় শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইবেন। অতএব যত শীঘ্র মোগলরাজ্যে ইংরাজবাণিজ্যের লোপ হয়, সম্রাটের পক্ষে ততই মঙ্গল। এই প্রকার অনুযোগ বস্তুত বিশেষ ফলোপধায়ক হইল, সম্রাট সত্যাসত্য কিছুই অনুসন্ধান করিলেন না। যখন তাঁহার মঙ্গলকারীগণের মুখ হইতে এই বাক্য উচ্চারিত হইয়াছে, তখন যে ইহা যথার্থ তাহার আর সন্দেহ নাই। তিনি হকিন্সের প্রতি সমস্ত অনুরাগ ভুলিয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ জলদগম্ভীরস্বরে বিঘোষিত হইল "ইংরাজ আর মোগল-রাজ্যের কোন স্থানে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিতে পারিবেন না।" ইহাতে মোকারেবের অভীষ্ট ও বৈরসাধন প্রবৃত্তি সম্যক্‌রূপে চরিতার্থ হইল, ইংরাজ বাণিজ্যের মূলে অসহনীয় আঘাত পড়িল, হকিন্সের স্বদেশে মান ও প্রতিপত্তি লাভের আশা লোপ হইল এবং তিনিও বিফল মনোরথ হইয়া আগরা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।*

* Vide Hawkin's Letters to the East India Company.

যখন এই সংবাদ বিলাতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ণগোচর হইল, তখন তাঁহারা সাতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ভারতের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহাদের প্রচুর লাভ হইতেছিল এবং এই বাণিজ্য ক্রমে আরও বর্দ্ধিত ও দৃঢ়মূল হইলে তাঁহাদের অর্থাগম যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, এই আশায় তাঁহারা প্রফুল্লচিত্তে কালযাপন করিতে ছিলেন। কিন্তু এ সংবাদে তাঁহাদের সে মোহ অপনীত হইল ও তাঁহারা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। মধ্যে মধ্যে আরও অত্যাচারের কথা ভারত হইতে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল ও তাঁহারাও ব্যস্তসমস্ত হইয়া আশু প্রতীকারের কোন উপায়ানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দের প্রথমে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথম স্থাপিত হয় ও তাহার কিছুকাল পর হইতেই এই কোম্পানি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতের সহিত বাণিজ্য কার্য্যে লিপ্ত হন। বাণিজ্যে তাঁহাদের বিশেষ ধনাগম হইতে লাগিল। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, যদি ভারতের সহিত তাঁহারা অব্যাহত বাণিজ্য চালাইতে পারেন, তাহা হইলে অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য তাঁহাদের না করিলেও চলিবে। কিন্তু ভারতে যে ঘটনা উপস্থিত, তাহাতে বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ আকাশ নিতান্ত অন্ধকারময় বলিয়া তাঁহাদের উপলব্ধি হইতেলাগিল। কালে যে এই মেঘরাশি একত্রিত হইয়া ভীষণ ঝটিকা উত্থিত করিবে, তাঁহারা ইহা দিব্য চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে ভারত হইতে বিবিধ প্রকারের অত্যাচারের কথা সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল। এই সমস্ত দুর্ঘটনার প্রতিবিধানার্থে তাঁহারা একটি উপযুক্ত লোক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সর্ টমাস্ রো ঠিক সেই সময়ে আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছেন। রো সাহেবের ভ্রমণ-প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল ছিল, এক্ষণে আমেরিকা ভ্রমণে তাহা শতগুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে—তিনিও ভ্রমণের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। বহুকাল হইতে মোগল-রাজের (Great Mogul) ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির বিষয় তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভারত ভ্রমণের ইচ্ছা সাতিশয় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। ভারত-সম্রাটের স্বর্ণময় স্তম্ভ, মণিখচিত ছাদ, বহুমূল্য বস্ত্র মণ্ডিত গৃহাদি ও নানাবিধ বহুমূল্য মণিখচিত, স্বর্ণমণ্ডিত দ্যুতিময় সিংহাসন ও অন্যান্য নানাপ্রকার ভারতীয় ঐশ্বর্য্যাদি তখন আরব্য উপন্যাসের গল্পের ন্যায় ইংল-

গীত জন সাধারণের মনোরঞ্জক ছিল। রো সাহেব হকিন্স প্রচারিত লিপিগুলি ও পুস্তকাবলী পাঠে সাতিশয় কৌতূহল পরবশ হইয়া সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও এই মহৎ কার্য্যের উপযুক্ত অন্য কোন লোক না পাইয়া রো কেই সম্মানের সহিত আহ্বান করিলেন। রো সাহেবও বুদ্ধিমানের ন্যায় "উপস্থিত পরিত্যাগ করিতে নাই" ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

বর্ণনীয় বিষয় ছাড়িয়া আমরা ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দুই একটি কথা বলিব। তখন ইংরাজগণ ভারতে কি প্রকার অত্যাচার সহ্য করিতেন ও তাহাতে তাঁহাদের কতদূর অসুবিধা হইত, এতৎ সম্বন্ধে পাঠক মহোদয়কে দুই একটি কথা বলিব। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম স্থাপনাবধিই যে ভারতের সহিত তাঁহারা বাণিজ্য কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। স্থানীয় শাসনকর্ত্তা ও সম্রাটের অনুমতি লইয়া সাধ্যমতে তাঁহারা তৎকালে সমুদ্রের উপকূলে দুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণিজ্যাবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু সুরাট নগর তৎকালে সমগ্র ভারত মধ্যে প্রধান বন্দর ছিল। সুরাটের সমৃদ্ধিও যে তৎকালীন অন্যান্য নগরী অপেক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইংরাজ এই সুরাটে প্রধান আড্ডা স্থাপন করিলেন। সুরাট সম্রাটের অধিকৃত ও সমুদ্রের বিশেষ সুবিধা-জনক স্থানে সংস্থাপিত বলিয়া সকল জাতীয় বণিকেরাই এইখানে বাণিজ্য দ্রব্যাদি অবতরণ করাইয়া বিক্রয় করিতেন। এই সুরাটে সম্রাটের এত অধিক ধনাগম হইত, যে প্রতি বৎসর নবাব সাহেব ও অন্যান্য রাজকীয় কর্ম্মচারীর যথেষ্ট লাভ হইয়াও রাজ সরকারে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা প্রেরিত হইত। ইংরাজের বাণিজ্য দ্রব্য তথায় অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত। আজও যেমন ইংরাজ ছুরী কাঁচি প্রভৃতি চাকচিক্যময় দ্রব্যাদি দিয়া ভারতের বক্ষশোণিত করত ধনরত্নাদি লইয়া যাইতেছেন, প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও তাঁহারা ঠিক সেইরূপ করিতেন। জাহাজ ভরিয়া বন্দুক, তরবারি, ছুরী, কাঁচি ও অন্যান্য নানাবিধ চাকচিক্যময় অস্ত্রশস্ত্রাদি দেশীয় মহাজনদিগকে প্রদান করিয়া তদ্বিনিময়ে তাল তাল অপরিষ্কৃত স্বর্ণ, হীরক, মুক্তা, রেশমীবস্ত্র, রেশম, ও নানাবর্ণের বহুমূল্য প্রস্তরাদি লইয়া যাইতেন। ইংলণ্ডে গিয়া এই সকল দ্রব্য দ্বিগুণ মূল্যে লর্ড প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়দিগের নিকট ও রাজার নিকট বিক্রয়

করিতেন। তৎকালে ইংরাজের তৈয়ারি দ্রব্যাদিরও ভারতে বিশেষ আদর ছিল। নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবহার তখন সাধারণের মধ্যে বিশেষ-রূপ প্রচলিত ছিল; তখন সাধারণ লোকের আত্মরক্ষার্থ অনেক সময়ে অস্ত্রাদি রাখিবার প্রয়োজন হইত। এখনকার ন্যায় তখন কিছু অস্ত্রের আইন প্রচলিত ছিল না। সুতরাং ইংরাজদের এই সকল অস্ত্র শস্ত্র দেশীয় মহাজনেরা কিনিয়া লইয়া উচিত মূল্যে বিক্রয় করিত এবং মধ্যে মধ্যে উৎকৃষ্ট অস্ত্রাবলী বাছিয়া বাছিয়া সম্রাট্‌কে বিক্রয় করা হইত। যদিও তখন সম্রাটের অস্ত্রাদি নির্ম্মাণের উপযুক্ত কারখানা ছিল তথাপি তাহাতে কেবল তাঁহার ব্যবহার্য্য দ্রব্য সমূহই প্রস্তুত হইত এবং যাহা উদ্বৃত্ত হইত তাহাতে সকলের কুলাইত না। কাজেই ইংরাজের অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রথমত চাক-চিক্যতার গুণে, দ্বিতীয়ত মূল্যের স্বল্পতায় অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইত। কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহারা (East India Company) এই প্রকারে বাণিজ্য করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু মীর মোকারেবের সহিত হকিন্সের বিবাদের সূত্রপাত হওয়াতে ইংরাজের আর শ্রেয় রহিল না। যথোপযুক্ত শুল্ক প্রদান করিয়া যে তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইতেন এমত নহে, কখন কখনও বা ইচ্ছা পূর্ব্বক অযথা শুল্ক দাবি করা হইত এবং তাহা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া না পাইলে নবাবের কর্ম্মচারীরা দ্রব্যাদি নামাইতে দিতেন না। এবং কখনও জাহাজ আসিয়া বন্দরে লাগিলে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা (নবাব) দলবল লইয়া জাহা-জস্থ দ্রব্যাদি পরিদর্শন করিতে যাইতেন ও নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া তাঁহাদের ইংরাজ প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতেন। কোন দ্রব্য সেই প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার চক্ষে সুন্দর লাগিলে তিনি হয়ত বলপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিতেন, না হয় "মূল্য দিব" এই কথা বলিয়া লইয়া যাইতেন। পরে হয় ত মূল্য দিবার নামও মুখাগ্রে আনিতেন না। যদিও নিতান্ত ভদ্রতার অনুরোধে মূল্য দিতেন, তাহাতে বণিকদিগের লাভ না হইয়া সম্যক্‌-রূপে লোকসান হইত। ইংরাজ কর্ম্মচারীরা অনুনয় বিনয় করিলে তিনি তাহাতে বধির হইয়া থাকিতেন। অত্যাচার-পীড়িতদিগের অভিযোগ করিবার উপায় ছিল না। কাহার কাছে অভিযোগ করিবেন, যিনি রক্ষক তিনিই ভক্ষক; আবার সম্রাটের কাছে গিয়া সাক্ষাৎ লাভ করা বড় দুরূহ ব্যাপার ছিল। ভাগ্যক্রমে সাক্ষাৎকার হইলেও তিনি অভি-যোগে কর্ণপাতও করিতেন না। আবার কখন কখনও বা বাণিজ্য

দ্রব্যাদি নগর হইতে নগরান্তরে লইয়া যাইবার জন্য অতিরিক্ত শুল্ক দিতে হইত। ইহাতে তাঁহাদিগকে সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত ও উৎপীড়িত হইতে হইত। তখনকার এই নিয়ম ছিল যে সমুদ্রে যদি কোন বাণিজ্য জাহাজ মগ্ন হইত, তাহা হইলে তাহার দ্রব্যজাত সম্রাট্ সরকারে নীত হইত। যদি কোন ইংরাজ বণিকের জাহাজ উপকূলে বা সমুদ্রে মগ্ন হইত, তবে দুর্ভাগ্য বশত এই নিয়মের অধীন হইয়া সেই হতভাগ্য বণিকের সর্ব্বস্ব সমুদ্রোদ্ধৃত হইয়া সম্রাট্ সরকারে নীত হইত। এই প্রকার নানাবিধ অত্যাচার চতুর্দ্দিকে তাহাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল। এই প্রকার অসহনীয় অত্যাচারে পীড়িত হইয়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী টমাস রোকে ভারতবর্ষে মোগল সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সামান্য কোম্পানীর নামে দূত পাঠাইলে হয় ত সম্রাট গ্রাহ্য করিবেন না, এই ভাবিয়া তাঁহারা রাজা জেম্স্‌কে অনুরোধ করিয়া তাঁহার নিজ নামে দূত পাঠাইতে অনুরোধ করাতে রাজা জেম্স্ সম্মতি প্রদান করিলেন। ভারতের ইংরাজদিগের উপর যে সমস্ত অত্যাচার হয়, তাহা বিধিবদ্ধ করিয়া তাহার প্রতিবিধানের জন্য রাজা একখানি অনুরোধ পত্র সাক্ষরিত করিয়া দিলেন। শুভদিনে ইংলণ্ডাধিপের প্রধান দূত (Lord Ambassador) মোগল সম্রাটের নামে অনুরোধ পত্র ও তাঁহার জন্য নানাবিধ বিলাতি উপঢৌকন, লইয়া বিশেষ সমারোহের সহিত সুরাট বন্দরে —১৬১৫ খৃঃ অব্দে উপস্থিত হন।

সুরাটে অতি সমারোহের সহিত ইংলণ্ডীয় রাজ-দূত অবতরণ করিলেন। নদীতে যে সমস্ত জাহাজ ছিল, ক্ষুদ্র পতাকাদি ও পুষ্পমালায় তাঁহার সম্মানার্থে তাহা অধিকারীদিগের দ্বারা সুসজ্জিত হইল। তাঁহার সম্মানার্থ ঘন ঘন তোপধ্বনি হইতে লাগিল। এবং সাধারণ সদাগর, কাপ্তেন ও প্রায় অশীতি জন অস্ত্রধারী পুরুষ শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিল। নবাবের কর্ম্মচারীরা ইংলণ্ডীয় রাজদূতকে প্রকাশ্য সভায় সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। রোর সমভিব্যাহারী লোকদিগের দ্রব্যাদিও এমন কি সম্রাটের উপঢৌকনাদি পর্য্যন্ত মোগল-কর্ম্মচারীরা পূর্ব্ব প্রথানুসারে খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা রোর নিষেধ বাক্য গ্রাহ্য করিলেন না।

রো সাহেবের থাকিবার জন্য সুরাট নগরে একটি বিস্তৃত ভবন স্থির করিয়া দেওয়া হইল। সর্ টমাস্ রো প্রায় একমাস ধরিয়া সুরাটে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বাদসাহ এই সময়ে বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য আজমীরে অবস্থান করিতেছিলেন, সুতরাং রাজধানী আগরা হইতে আজমীরে উঠিয়া আসিয়াছিল। এই সংবাদ রো'র কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি বিমল আনন্দনীরে মগ্ন হইলেন। আগ্রায় গিয়া সমস্ত বাধা বিপত্তি, অতিক্রম করত সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করা যে অতিশয় দুরূহ ব্যাপার, ইহা তিনি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। মোগল কর্ম্মচারিরা তাঁহার যাত্রার সমস্ত উদ্যোগ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত থাকাতে রো এতদিন তাঁহাদের অপেক্ষায় কালযাপন করিতেছিলেন। কিন্তু এক মাসকাল বৃথা গত হইয়া যাওয়াতে, ও তাহারা তাঁহার সাহায্যে শিথিল প্রযত্ন হওয়াতে, তিনি অতিশয় চিন্তিত হইলেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়া সেই কর্ম্মচারিদিগকে পুন পুন এই বিষয়ে উত্যক্ত করাতে, তাহারা তাঁহার আজমীর গমনের জন্য যানবাহনাদি সংগ্রহ করিয়া দিল—রো-উপযুক্ত সময়ে যাত্রা করিলেন।

এই সময়ের বুরহানপুর সম্রাটের প্রধান সেনানিবেশ স্থান ছিল। কুমার পারবেজ এই সমস্ত সেনার অধিনায়ক হইয়া এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতেছিলেন। সুরাট হইতে দুই শত পঞ্চাশ ক্রোশ পথ নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া রোঁ-সাহেব, বুরহানপুরে উপস্থিত হইলে—কুমার পারবেজের সহিত তাঁহার সাক্ষাতেচ্ছা সবিশেষ প্রবল হইয়া উঠিল। রো—উপযুক্ত অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বুরহানপুরে উপস্থিত হইলে—একজন কোতোয়াল আসিয়া কুমার পারবেজের অনুজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে কহিল, যে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষী। রো এই সংবাদে অনতিবিলম্বে পারবেজের সভায় যাইবার নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। উপঢৌকনাদি প্রদান দ্বারা তাঁহাকে অনুকূলে আনিতে পারিলে, তাঁহার আজ-মীর গমনের ও কোম্পানীর বাণিজ্য কার্য্যের অশেষ সুবিধা হইবে—ভাবিয়া তিনি কতকগুলি উপহার দ্রব্য সঙ্গে লইয়া কুমারের সভাগৃহ উদ্দেশে চলিলেন। তাঁহার সম্মানের জন্য পথ পার্শ্বে, একদল অশ্বারোহী অবস্থান করিতেছিল। রো-সভাভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে (পারবেজ) যথাবিহিত অভিবাদন করিয়া তৎকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া অদূরে উপবিষ্ট হইলেন।

তাঁহাদের মধ্যে দ্বিভাষীর সাহায্যে নানাবিধ কথোপকথন চলিতে লাগিল। কুমার অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বুরহানপুরে ইংরাজ বাণিজ্য বিস্তার করিবার অনুমতি দিলেন ও রো'র শরীর ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য ও তাঁহাকে আজমীরে লইয়া যাইবার জন্য বিংশতি জন শরীররক্ষক প্রদান করিয়া ইংলণ্ডীয় রাজদূতকে সম্মানে বিদায় দিলেন।

এক মাসের পর—সেই দুরধিগম্য ও বিপজ্জনক পথ অতিবাহন করিয়া রো সাহেব, ১৬১৫ খৃঃ অব্দ ২৩শে ডিসেম্বর নির্ব্বিঘ্নে আজমীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি পর বৎসর ১০ই জানুয়ারিতে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ লাভার্থ প্রথম গমন করেন।

রো'র অদৃষ্ট নিতান্ত সুপ্রসন্ন বলিয়া তিনি প্রথম সন্দর্শনেই সম্রাটের করুণা-নয়নে পতিত হন। রো সাহসে বুক বাঁধিয়া দলবল পরিবেষ্টিত হইয়া সম্রাট্ দরবারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সুপ্রশস্ত সভা ভবনের উচ্চতম স্থলে ভারতবর্ষের সম্রাট্ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। নানাবিধ মণি-খচিত, মুক্তা-বিনির্ম্মিত সিংহাসন, বহুমূল্য পারস্য দেশীয় গালিচার উপর সংস্থাপিত হইয়া সম্রাটের ভার বহন করিতেছে। সিংহাসনের চতুর্দ্দিক হইতে উত্থিত চারিটি স্বুবর্ণ দণ্ডের উপর, মণিখচিত চন্দ্রাতপ ঝকমক করিয়া দোদুল্যমান হইতেছে। সম্রাটের দুই পার্শ্বে সেই উন্নত স্থানের (Plat form) উপরে রাজপুত্র ও উচ্চপদস্থ নৃপতিগণ বহুমূল্য বসনে শোভিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাহার দুই হাত নীচে আমীর ওমরাহগণ সুন্দর-রূপে সজ্জিত হইয়া সম্রাট্ সদনে উপস্থিত রহিয়াছেন। তাহার দুই হস্ত নীচে রাজ্যস্থ বর্দ্ধিষ্ণু ও ক্ষমতাশীল প্রজাবর্গের নির্দ্দিষ্ট স্থান। তন্নিম্নে সাধারণ প্রজাবর্গ অবস্থান করিতেছে। রো এই দৃশ্য দেখিয়া অতিশয় মোহিত ও স্তম্ভিত হইলেন। উক্ত দিবস (১০ই জানুয়ারি ১৬১৬ খৃ) তিনি বিলাতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে লিখিত আছে যে—"মোগল রাজের সভাকে লণ্ডনস্থ একটি সর্ব্বপ্রধান নাট্যশালার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সম্রাট্ যেস্থলে বসিয়াছেন তাহাকে রঙ্গমঞ্চ বলা যাইতে পারে। আমীর ওমরাহ ও বাদসাহ যেন বহুমূল্য পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া অভিনয় করিতেছেন, এবং সর্ব্বনিম্নস্থ সাধারণ প্রজাবর্গ যেন দর্শক মণ্ডলী-রূপে অবস্থান করিতেছে। ইংলণ্ডের রাজা নাট্যশালায় গমন করিলে সেইদিন যেমন তাহার শোভা হইয়া থাকে, মোগল সভার শোভা চিরকালই সেইরূপ।"

রো সাহেব প্রচলিত নিয়মানুসারে, সম্রাটকে তিনবার অভিবাদন করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব কথিত উচ্চ ও নিম্নস্থলগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিরোহণী দ্বারা সংযুক্ত ছিল। রো, প্রত্যেক অধিরোহণীর নিকট উপস্থিত হইয়া মস্তকাবনত করিয়া সম্রাটকে সম্মান-প্রদর্শন করিলেন। অদূরে তাঁহার বসিবার জন্য স্থল নির্দ্দিষ্ট হইল। দ্বিভাষীর দ্বারা তাঁহাদের নানাবিধ কথোপকথন চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে রো উপঢৌকন দ্রব্যগুলি সযত্নে সম্রাট্ সমক্ষে রক্ষা করিলেন। সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে পিয়ানোর ন্যায় যে বাদ্য যন্ত্র ছিল—তাহা সম্রাটের আদেশ ক্রমে, তাঁহার কৌতূহল নিবারণার্থ রো সাহেবের একজন সঙ্গী বাজাইতে লাগিলেন। বিলাতি শকটখানি, বিলাস-প্রিয় সম্রাট, নিজে উঠিয়া গিয়া দেখিয়া আসিতে অসম্মত হইয়া একজন পার্শ্বচরকে দেখিতে বলিলেন, সে আসিয়া, তাঁহার নিকট যথাযথ বর্ণন করিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন করিল। যদিও সম্রাট্ এই সকল দ্রব্য পাইয়া ইংলণ্ডাধিপের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, যদিও রো সাহেবকে তিনি যতদূর সন্তোষ দেখাইতে পারা যায়, তাহা দেখাইয়াছিলেন, তথাপি ইংলণ্ডাধিপ, মণিমুক্তাদি প্রেরণ করেন নাই বলিয়া একজন সভাসদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর জানিতেন না যে ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোথাও এমন মণিমুক্তা জন্মে না। আর মণিমুক্তাদি ভারত হইতে রপ্তানির জিনিশ ভারতে, আমদানির জিনিশ নহে।

রো সাহেব প্রথম দিবসেই সম্রাটকে রাজা জেম্‌সের অনুরোধ পত্র ও লিপি প্রদান করিয়াছিলেন। সেই ইংরাজী লিপির অনুবাদও তাহার সহিত সংযুক্ত ছিল। জাহাঙ্গীর দ্রব্যাদি পাইয়া যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এই লিপি দৃষ্টেও তদ্রূপ সুখী হইলেন। বিদেশীয় দূত, এইরূপে জাহাঙ্গীরের সভায় যতদূর সম্মান লাভ করিতে হয় তাহা করিয়াছিলেন। ভারত সম্রাট্ রো'কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে "আপনার ন্যায় কোন বৈদেশিক রাজদূত এতদূর আদৃত ও সম্মানিত হন নাই'। রো সেই দিবসের মত অসুস্থতা নিবন্ধন সভা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অসুস্থতা শুনিয়া আরোগ্য লাভ পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিজ প্রাসাদে থাকিতে সম্রাট্ অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু রো নম্রতার সহিত সে অনুরোধ কাটাইয়া দেন।

এক্ষণে টমাস্ রোর কথিত কাহিনীর, অনুসরণ করিয়া—রাজপ্রাসাদের কতিপয় চিত্র আমরা পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরিব।

সম্রাটের প্রাসাদ চারিদিকে অত্যুচ্চ প্রাচীর মালা দ্বারা বিশেষরূপ পরিবেষ্টিত ছিল। দ্বার অতিক্রম করিয়া সভাভবনে উপস্থিত হইলে— তাহার দক্ষিণ দিকে একটি দ্বার পরিদৃশ্যমান হয়। এই দ্বার দিয়া গোসল খানা (স্নানাগার) যাইবার পথ। গোসলখানা ঠিক সভাগৃহের পার্শ্বেই স্থাপিত। এই স্থানে একটি বহুমূল্য প্রস্তর রচিত সুন্দর স্নানাগার আছে। গোসলখানা যে কেবল স্নানের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা নহে। প্রতিদিবস রাত্রে, রাজকার্য্যাবসানের পর সম্রাট্ নগরস্থ সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহ ও সভাসদগণকে নিমন্ত্রণ করেন। একটি নিয়মিত সময়ে তাঁহারা এইস্থানে উপস্থিত হইলে মদ্যপান আরম্ভ হইয়া থাকে। আকবরের জীবিতাবস্থায় কেহই এই গোসলখানার ভিতর মদ্যের নাম পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন না—এই নিয়ম বস্তুত বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীর নিতান্ত স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্ত্তী হইয়া অধিকাংশ সময় এ নিয়ম মানিতেন না। রো সাহেব তাঁহার পুস্তকের একস্থলে লিখিয়াছেন—"একদিন সমস্ত আমীর ওমরাই এই গোসলখানায় সমবেত হইয়াছেন, সম্রাট অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। "মদ্যপান আরম্ভ হউক" সকলেই আনন্দে বিহ্বল হইয়া মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিলেন; পরক্ষণেই সম্রাট মদিরা তেজে উন্মত্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "কে মদ্যপানের আজ্ঞা দিল—" বলিয়া উচ্চপদস্থ আমীর ওমরাহদিগকে অপমান বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; আমি তাহা দেখিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলাম"। রো প্রতি রজনীতেই এই গোসলখানায় উপস্থিত হইতেন; এই স্থলে সম্রাটের সহিত তাঁহায় নানা বিষয়ে কথোপকথন হইত। রাজসভায় যে সকল বিষয়ে মনোভাব ব্যক্ত করা অসম্ভব সম্রাট সেই সকল বিষয়ে টমাস রোকে এই স্থানে জিজ্ঞাসা করিতেন। যে উদ্দেশ্য সাধনার্থ রো সাহেব, মোগলরাজের এত উপাসনা করিতেছিলেন, সে বিষয়ের কোন প্রসঙ্গই সম্রাট কর্ত্তৃক উত্থাপিত হইত না। এক দিন কথাক্রমে বিলাতি ঘোটকের কথা মনে হওয়াতে সম্রাট্ রোকে তাঁহার জন্য ইংলণ্ডজাত কয়েকটি ঘোটক আনাইতে অনুরোধ করেন। রো তদ্বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন—যে স্থল-পথে আনিতে গেলে বড় অসুবিধা—কারণ ইউরোপে এখন ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে—এবং জলপথে যদিও উপায় আছে, তথাপি তাহা অনায়াস সাধ্য নহে, কারণ ইউরোপ হইতে ভারতে আসিতে অনেক বিলম্ব ও ঝটিকা ভোগ করিতে হইবে সুতরাং এই পথেও ঘোটক

আনা অসম্ভব। সম্রাট নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন—তিনি বলিলেন 'তোমরা পাঁচ ছয়টি ঘোড়া একাবারে পাঠাইও। তাহাদের মধ্যে একটি যদি জীবিত থাকে, ত আমি তাহাকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইব।' রো সম্রাটের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া স্বদেশে এইজন্য পত্র লেখেন। এই প্রকারে তাঁহার সহিত অন্যান্য নানা বিষয়ে কথা উপস্থিত হইত, কিন্তু কাজের কথা ভ্রমেও উত্থিত হইত না। রো নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন, তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। অন্য সময়ে সম্রাটের সহিত তাঁহার সুবিধামত সাক্ষাৎ হইত না।—প্রাতে সম্রাট্, বাতায়নে বসিতেন, এই স্থানে বসিয়া তিনি নিম্নস্থ সমস্ত কার্য্য ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেন। বাতায়নের অদূরে—নিম্নে প্রশস্ত ক্ষেত্রে, প্রজাবর্গ উপস্থিত হইয়া প্রতিদিন তাঁহাকে আবেদন ও অভিযোগপত্র দিতেন ও সময়ে সময়ে আমীর ওমরাহগণ উপহার দ্রব্য দিয়া সম্রাটকে দর্শন করিতেন। সাধারণের পক্ষে রাজসন্দর্শনের এই প্রধান ও সুবিধাজনক সময়। প্রজাদিগের সহিত কার্য্য শেষ হইলে সৈন্যদিগের সমাবেশ-শিক্ষা (Parade) ও হস্তী অশ্ব প্রভৃতির সমাবেশ শিক্ষা দেখিতেন। নয়টা বা দশটার সময় প্রাতরাশ শেষ করিয়া বেগম মহলে প্রবেশ করত তাঁহাদের দ্বারা পরিসেবিত হইয়া একটু নিদ্রা দিতেন। একদিন বাতায়নে রো সাহেব দুইটি বেগম সাহেবকে দেখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পত্রে লিখিয়াছেন—যে "এ প্রকার রূপমাধুরী আমি কখনও নিরীক্ষণ করি নাই। একদিন আমি বাতায়নপথে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎলাভ মানসে গিয়াছিলাম, দুইটি অসূর্য্যম্পশ্যরূপা রূপসী বাতায়ন নিকটে পার্শ্বস্থ পরদা ছিন্ন করিয়া আমাকে কৌতুহলের সহিত দেখিতেছিলেন। হঠাৎ বাতাসে সেই পরদা ঈষৎ দোদুল্যামান হওয়াতে—আমি তাঁহাদের মুখমণ্ডল দেখিতে পাইয়াছিলাম—তাঁহাদের বর্ণ অতি গৌরবর্ণ ও এক কথায় তাঁহারা দেখিতে অতি সুন্দরী। মস্তকের উপর, সেই ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাজির উপর অনেকগুলি হীরকখণ্ড শোভিতেছে—কর্ণে নানাবিধ অলঙ্কার দুলিতেছে। বহুমূল্য বসনে তাঁহাদের মস্তকের অর্দ্ধভাগ আবৃত রহিয়াছে। তাঁহারা বোধ হয়, আমাকে দেখিতে সম্রাটের অনুমতি পাইয়াছিলেন—আমার বোধ হয় এই দুইটির মধ্যে একটি নূরমহল। সম্রাট বাতায়ন ত্যাগ করিবামাত্র সেইটি তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইল।"

মধ্যাহ্নকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া আসিয়া জাহাঙ্গীর জানালায় বসিয়া

সিংহ ব্যাঘাদির ক্রীড়া দেখিতেন। এবং বেলা ৩।৪ ঘটিকার সময় সভায় উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্য করিতেন। এ-সময়ে কাজের এত ভিড় হইত, যে কোন কথা পাড়িবার যো ছিল না। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া রো বিলাতে আর কতকগুলি উপঢৌকন পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিলেন। জাহাঙ্গীরকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে সুরা অধিক পরিমাণে চাই সুতরাং তিনি এই বলিয়া বিলাতে পত্র লেখেন—"There is nothing more welcome here, nor did I ever see men so fond of drinking as the king and the princes are of red wine. * * * the king has ever since solicited for more, I think four or five casks of that wine will be more welcome than the richest jewels in Cheapside. * রো'র অভিমত দ্রব্যাবলি আসিয়া উপস্থিত হইল। রো' এই দীর্ঘ কাল অপেক্ষা করিয়া উপযুক্ত সময়ে সম্রাট্‌কে সেই নূতন উপঢৌকনগুলি প্রদান করিলেম। এবার কার উপঢৌকন মধ্যে অনেকগুলি চিত্র ছিল। সেই চিত্রগুলির মধ্যে এক খানি চিত্র দেখিয়া সম্রাট অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে সান্তনা করা দায় হইয়া উঠিল। তিনি রো'র প্রতি ঘন ঘন রোষপূর্ণ কটাক্ষ পাত করিতে লাগিলেন। রো' স্তম্ভিত ও ভীত হইয়া কি উপায়ে পরিত্রাণ পাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এই চিত্রে একটি সুন্দরী রমণী মূর্ত্তি একটা বিকটাকার দৈত্যকে নাকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল—ইহা চিত্রিত ছিল। সেই সুন্দরী মূর্ত্তি গ্রীসীয় দেবী, সৌন্দর্য্যের ঈশ্বরীকে লক্ষ্য করিয়া চিত্রিত হইয়াছিল,—রো জানিতেন না যে, এই সামান্য চিত্র হইতে এত বিভ্রাট ঘটিবে। সম্রাট বলিলেন এ চিত্র আমাকে লক্ষ্য করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তিতে আমাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ও ঐ সুন্দরী মূর্ত্তি নূরজাহান। আমি নূরজাহানকে অত্যন্ত ভালবাসি ও তাহার বাধ্য বলিয়া, আমার প্রতি এইরূপ লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিছুতেই রো, সম্রাটকে বুঝাইতে পারিলেন না যে এই চিত্রে কোন দুষ্যভাব নাই। অবশেষে রো নিরুপায় হইয়া সেদিনকার মত প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পর দিবস অন্যান্য সভাসদবর্গের সাহায্যে সম্রাটকে এই প্রকার অযথা অনু-

* Vide—Row's Letters to the E. I Company and also G. W. Clene's Papers on the Court of Jehangir or The Great Mogul.

স্থান হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া অধিক পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়েন। এই প্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া রো যতশীঘ্র কার্য্যসিদ্ধ করিয়া মোগল-রাজ-সভা হইতে অবসর পাইতে পারেন, এইরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিন দরবারে সম্রাটকে তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতি বাণিজ্যের অনুরোধ-পত্র দিবার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করিলেন। সম্রাট্ ও ফারমানের সমস্ত আয়োজন করিয়া কি প্রকারে অনুরোধপত্র ও ফারমান প্রস্তুত হইবে ও কি প্রকরে সন্ধি করিতে রো'র ইচ্ছা—এই বিষয়ে টমাস্ রো'র মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। রো সাহেব কোম্পানীর দিকে সম্পূর্ণ টানিয়া এক সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিলেন। ইংরাজদ্বেষী আসফ্ খাঁ, কুমার সাহজাহান ও অন্যান্য সভাসদ্‌বর্গ তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়াতে রো সেইবার অকৃতকার্য্য হয়েন। তৎপরে আসফ্‌খাঁকে এক বহুমূল্য হীরক উপহার প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া ও পাকেপ্রকারে কুমার সাহজাহানকে বশে আনিয়া রো সন্ধিপত্র প্রস্তুত করেন। সুবিধামত সম্রাট তাহাতে শীল-মোহর করিয়া দিলেন। সন্ধির প্রধান চুক্তিগুলির মধ্যে (১) ইংরাজদিগকে নিরাপদে, বাঙ্গলায় ও মোগলরাজ্যের সুবিধাজনক স্থানে বাণিজ্যাদি করিতে দেওয়া হইবে—(২) তাঁহাদের প্রতি কোন শাসনকর্ত্তা অযথা পীড়ন করিতে পারিবেন না—(৩) তাঁহাদিগকে দ্রব্যাদি স্থানান্তর করিবার শুল্ক দিতে হইবে না—(৪) যে সকল শাসনকর্ত্তা তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিবেন তাঁহারা সম্রাট্ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবেন—ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রধান ছিল। এই প্রকার অনেক বাধা বিপত্তি সহ্য করিয়া স্বীয় চতুরতা ও কার্য্যকুশলতা গুণে টমাস্ রো কোম্পানির কার্য্য সিদ্ধিকরত রাজা জেমসের পত্রের উত্তর লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। স্বদেশে সম্মানের সহিত চিরকাল তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। "আমরা আবশ্যক বিবেচনায় সম্রাট্ রাজা জেমসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশের সার মর্ম্ম পাঠক মহাশয়দের জন্য তুলিয়া দিতেছি। "যখন মহারাজ এই পত্র, পাঠার্থ প্রথম খুলিবেন, আশা করি, আপনার অন্তঃকরণ ইহার মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া নিতান্ত প্রফুল্লিত হইবে। আপনার সম্মান ও ক্ষমতা শতগুণে বৃদ্ধি হউক, শত শত বিদেশীয় রাজা আপনার পদানত হউন, আপনার দ্বারা খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বহুল প্রচার হউক, ও সমস্ত পার্শ্ববর্ত্তী সহযোগী রাজন্য বিপদে সম্পদে আপনার উপদেশ গ্রহণে ব্যগ্র হউন। আপনি টমাস্ রোকে

উপযুক্ত রূপেই নির্ব্বাচিত করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন—ইহাঁর ব্যবহারে আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি—আপনার শ্রদ্ধা ও প্রণয়চিহ্ন স্বরূপ উপহার দ্রব্য গুলি বড়ই সুন্দর—আমি তাহা দেখিতে সর্ব্বদাই বাসনা করি।”

আমরা টমাস রোর কথিত ও দৃষ্ট সমস্ত ঘটনা এস্থলে বিবৃত করিলাম না। তাহা করিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, সুতরাং সারগুলি এইস্থলে গ্রথিত হইয়াছে।

তেত্রিশকোটি দেবতা।

জগৎ এবং জগদীশ্বর এই দুয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ এ বিষয়ে মনুষ্য মধ্যে প্রধানত দুইটি মত আছে। একটি মত এই যে জগৎ জগদীশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট এবং সেই জন্য জগদীশ্বর হইতে পৃথক। মুসলমান এবং খৃষ্টীয়ানের এই মত। আর একটি মত এই যে জগৎ জগদীশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট নয়, জগদীশ্বরের রূপ, বিকার, বা বিকাশ মাত্র, অতএব জগদীশ্বর হইতে পৃথক্ নয়। হিন্দুর এই মত। হিন্দু যে সৃষ্টির কথা একেবারেই মানেন না এমন নয় এবং খৃষ্টীয়ান যে জগদীশ্বরকে জগৎ বলিয়া বুঝেন না তাও নয়। হিন্দু যখন বলেন—‘সকলই তিনি করিয়াছেন’—তখন তিনি জগদীশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া মনে করেন বৈ কি; এবং খৃষ্টীয়ান যখন বলেন—‘In Him we live and move and have our being’—তখন তিনি জগৎকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবেন বৈ কি। ফল কথা, জগদীশ্বর সম্বন্ধে সকলেই সকল মানিয়া থাকেন এবং বলিয়া থাকেন। জগদীশ্বর যথার্থ ই এমনি সর্ব্বময়, এমনি সর্ব্বরূপ, এমনি সর্ব্বত্র যে তাঁহাকে সকল সংজ্ঞাই অর্পণ করা যায় এবং সকল রকমেই ভাবা যায়। তথাচ এক একটি জাতি বা সম্প্রদায় জগদীশ্বর সম্বন্ধে এক একটি ভাব বা প্রণালীকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন। তাই বলিতেছি যে হিন্দু প্রধানত জগৎকে জগদীশ্বর হইতে পৃথক মনে করেন না, খৃষ্টীয়ান করেন। কোন্ মতটি ভাল কোন্‌টি মন্দ, তাহা এস্থলে মীমাংসা করা যাইতে পারে না এবং মীমাংসা করিবার বড় আবশ্যকও নাই। এখানে কেবল ইহাই বুঝিয়া দেখিতে হইবে, মত দ্বয়ের বিভিন্নতার সহিত পৌত্তলিক-

তার কি সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ বেশ পরিষ্কার বলিয়া বোধ হয়। যিনি জগৎকে জগদীশ্বর হইতে পৃথক্ মনে করেন না জগৎ তাঁহার কাছে নীচ বা অধম জিনিস নয় এবং কাজেই তিনি জড়ের সাহায্যে জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাকে অপকর্ম্ম মনে করেন না। তাই হিন্দুর কাছে পৌত্তলিকতা দোষশূন্য। এ কথা যিনি বুঝেন, হিন্দু জড়ের দ্বারা জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন বলিয়া তিনি কখনই হিন্দুকে নিন্দা করিতে পারেন না। কিন্তু যিনি জগৎকে জগদীশ্বর হইতে পৃথক মনে করেন, জগৎ তাঁহার পক্ষে অধম জিনিস বলিয়া বোধ হওয়া সম্ভব এবং সেই জন্য তিনি জড়ের দ্বারা জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাকে দুষ্কর্ম্ম মনে করেন। তাই খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকে পৌত্তলিকতা প্রকৃত পক্ষে নিষিদ্ধ না হইলে ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপ পৌত্তলিকতার বিরোধী। তাই ইউরোপ মনে করে যে নিকৃষ্ট জড়েরদ্বারা উৎকৃষ্ট জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা অতি গর্হিত কার্য্য। কিন্তু আমার সামান্য বুদ্ধিতে বোধ হয় যেন এ সংস্কার বড় ভাল নয়। জগদীশ্বরের সহিত কিছুরই তুলনা হয় না, অতএব জগতেরও তাঁহার সহিত তুলনা হয় না। সেইজন্য হিন্দুও জগৎকে জগদীশ্বর বলিয়া বুঝিয়াও উহা জগদীশ্বরের ক্ষণিক মায়াজ্ঞানে অতি অসার বলিয়া জগন্মুক্ত হইতে কামনা করেন। কিন্তু জগৎ সৃষ্ট পদার্থ বশত স্রষ্টা জগদীশ্বরের সহিত তাহার তুলনা হয় না বলিয়া জগৎ যে অধম জিনিস এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ কি? ম্যাকবেথ সেক্ষপীয়রের সৃষ্টি, কুমার কালিদাসের সৃষ্টি। তাই বলিয়া সেক্ষপীয়র এবং কালিদাসকে উৎকৃষ্ট পদার্থ মধ্যে গণ্য করিয়া ম্যাকবেথ এবং কুমারকে কি অপকৃষ্ট পদার্থ বলিতে হইবে? তা যদি না হয় তবে জগৎ সৃষ্ট পদার্থ বলিয়া কেন অপকৃষ্ট হইবে? এবং জগৎ যদি অপকৃষ্ট না হয় তবে জগতের দ্বারা জগদীশ্বর কেনই না প্রকাশিত বা বিজ্ঞাপিত হইবেন? জগদীশ্বরের সহিত তুলনায় জগৎ অতি ক্ষুদ্র জিনিস বটে; জগদীশ্বর এই জগতের মতন কোটি কোটি জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু ক্ষুদ্র বা সামান্য বলিয়া জগৎ কি জন্য জগদীশ্বরের পরিচয় প্রদানে অসমর্থ বা অযোগ্য হইবে? আমরা সহজে আয়ত্ত করিতে পারি, এমন একটি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে নামিয়া দেখ দেখি। সেক্ষপীয়র ৩৭ খানি নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় যে মনে করিলে তিনি আরো ৩৭ খানি নাটক লিখিতে পারিতেন। ইহা হইতেই তাঁহার মানসিক শক্তি এবং প্রতিভার পরিমাণ বুঝিয়া লও। কিন্তু সেক্ষপীয়র এতগুলি নাটক লিখিয়াছিলেন বলিয়া বা আরো এতগুলি লিখিতে

সক্ষম ছিলেন বলিয়া তাঁহার কোন এক খানি নাটক—ম্যাকেবেথ বা হ্যামলেট বা ওথেলো—কি তাঁহার পরিচয় প্রদানে অযোগ্য? তাঁহার এক খানি নাটক তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদানে অসমর্থ বটে। কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদানে অসমর্থ বলিয়া এক খানি নাটক তাঁহার যতটুকু পরিচয় প্রদান করিতে পারে, ততটুকু পরিচয় প্রদান করিতেও কি অযোগ্য? শক্তিপ্রসূত পদার্থ শক্তি অপেক্ষা কি এতই নিকৃষ্ট জিনিস যে সে শক্তির পরিচয় দিতে একেবারেই অযোগ্য? যদি তাহাই হয়, তবে মানুষ কেমন করিয়া মানুষের কার্য্য বা কীর্ত্তিকে মানুষের প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে? কেমন করিয়া রণলব্ধ তরবারি বা পতাকা রণজয়ীর প্রতিনিধিরূপে প্রদর্শিত হয়? কেমন করিয়া মহাকবির স্মরণার্থ মহোৎসবে মহাকবির মহাকাব্য তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত, পূজিত এবং প্রদর্শিত হয়? কথায় বলে 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।' কীর্ত্তিতেই মানুষ জীবিত। এখন বল দেখি, মানুষের সৃষ্ট পদার্থ যদি সৃষ্ট বলিয়া অপকৃষ্ট এবং মানুষের পরিচয়ার্থ ব্যবহৃত হইবার অযোগ্য না হয়, তবে জগদীশ্বরের সৃষ্ট জগৎ সৃষ্ট বলিয়া কেন অপকৃষ্ট হইবে এবং জগদীশ্বরের পরিচয়ার্থ ব্যবহৃত হইবার কেন অযোগ্য হইবে? অতএব জড় সৃষ্ট পদার্থ বলিয়া অতি অপকৃষ্ট এবং সেই জন্য জড়ের সাহায্যে জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা মহাপাপ বা অপকর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপের এই সংস্কার নিতান্তই ভ্রান্ত। এবং যে সকল এ দেশীয় লোক এই ভ্রান্ত সংস্কারের দ্বারা আপনাদিগকে সংস্কৃত মনে করিয়া এ দেশের পৌত্তলিকতাকে মহাপাপ বলিয়া ঘৃণা ও নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহারা আরো ভ্রান্ত। কেন না তাঁহারা আপনাদের সত্যকে ভ্রান্তি বলিয়া পরিত্যাগ করত অপরের ভ্রান্তিকে সত্য বলিয়া সম্মান করিতেছেন।

অতএব হিন্দুর ন্যায় জড়জগৎকে জগদীশ্বর বলিয়াই ভাব বা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় জড়জগৎকে জগদীশ্বর হইতে পৃথক বলিয়াই ভাব, কোন প্রণালীতেই জড়ের সাহায্যে জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ দূষণীয় নয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে—জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ যদি প্রসিদ্ধ কাজই হইল তবে তাঁহার কিরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য? এ প্রশ্নের উত্তর বড় কঠিন নয়। মানুষের সম্বন্ধে জগতেই জগদীশ্বরের বিকাশ। জগৎ না থাকিলে মানুষের জগদীশ্বরও থাকেন না। অতএব জগদীশ্বর কি, বুঝিতে হইলে জগৎ বুঝিতে হইবে।

খৃষ্টধর্ম্মে জগদীশ্বরের স্বরূপ গ্রন্থে নির্ণীত আছে। তথাপি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা জগতে জগদীশ্বরের অন্বেষণ অবৈধ কাজ মনে করেন না এবং তাই Natural Theology তাঁহাদিগের মধ্যে একটি অমূল্য এবং উৎকৃষ্ট শাস্ত্র বলিয়া গণ্য। 'ফল কথা, জগৎ দেখিয়াই জগদীশ্বরের রূপ বল, গুণ বল সকলই নিরূপণ করিতে হয়। অর্থাৎ জগতের রূপই জগদীশ্বরের রূপ, জগতের গুণই জগদীশ্বরের গুণ। কিন্তু বল দেখি জগতের রূপ কি? জগতের গুণ কি? জগতের কি একটি রূপ? কেমন করিয়া তা হবে? বল দেখি একটি প্রজাপতির কয়টি রূপ? প্রজাপতি প্রথমে এক রকম, তার পর আর এক রকম, তার পর আর এক রকম—প্রাতে এক রকম, মধ্যাহ্নে আর এক রকম, অপরাহ্নে আর এক রকম—অন্ধকারে এক রকম, আলোতে আর এক রকম—খেলাবার সময় এক রকম, খাইবার সময় আর এক রকম, আবার ক্ষুধার্ত্ত পক্ষী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া যখন তাহার ঠোঁঠের ভিতর থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে তখন আর এক রকম। অতএব যদি প্রজাপতির মূর্ত্তি বুঝিতে হয় তবে কতগুলি মূর্ত্তি দেখিতে ও বুঝিতে হইবে! বল দেখি একটি মানুষের মূর্ত্তি বুঝিতে হইলে কতগুলি মূর্ত্তি দেখিতে হইবে? মানুষ শৈশবে এক রকম, বাল্যে আর এক রকম, যৌবনে আর এক রকম, প্রৌঢ়াবস্থায় আর এক রকম, বার্দ্ধক্যে আর এক রকম, মৃত্যুকালে আর এক রকম। মানুষের রাগে এক রূপ, শোকে আর এক রূপ, ঘৃণায় আর এক রূপ, ঈর্ষায় আর এক রূপ, স্নেহে আর এক রূপ, আরো কত অবস্থায় আরো কত রকম রূপ। অতএব একটি মানুষ বুঝিতে হইলে কতই মূর্ত্তি দেখিতে হইবে, কতই মূর্ত্তি বুঝিতে হইবে! বল দেখি, একখানি মেঘের, একটি নদীর কয়টি রূপ? কয়টি, তা কি ঠিক করিয়া বলা যায়? তবে অনন্ত জগতে অনন্ত জগদীশ্বরের কয়টি রূপ কেমন করিয়া বলা যাইবে? অনন্ত জগতে অনন্ত জগদীশ্বরের কয়টি গুণ কেমন করিয়া বলা যাইবে? এই ক্ষুদ্র পৃথিবীরই কত রূপ তাহা কে নির্ণয় করিবে? প্রাতে এক রূপ, মধ্যাহ্নে আর এক রূপ, রাত্রে আর এক রূপ—সমুদ্রে এক রূপ, পর্ব্বতে আর এক রূপ, মরুভূমিতে আর এক রূপ—স্থির বায়ুতে এক রূপ, ঝড়ে আর এক রূপ, ঝঞ্ঝাবাতে আর এক রূপ—অশেষ, অনন্ত, অগণ্য রূপ। পৃথিবী যখন জলময় ছিল তখন তাহার এক রূপ, যখন অরণ্যময় তখন আর এক রূপ, যখন হিমময় তখন আর এক রূপ, যখন ভীষণ অসীমকায় ম্যামথ ম্যাস্তদনে পরিপূর্ণ তখন আর এক রূপ, যখন বিকটদর্শন

বিষমায়তন সরীসৃপে পরিবৃত্ত তখন আর এক রূপ, যখন মানবপূর্ণ তখন আর এক রূপ—অশেষ, অনন্ত, অগণ্য রূপ। আর রূপ ভেদে গুণ ভেদ এবং গুণ ভেদে রূপ ভেদ হয় বলিয়া পৃথিবীর অশেষ, অনন্ত, অগণ্য রূপের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর গুণ অশেষ, অনন্ত, অগণ্য। অতএব জগতে জগদীশ্বরের রূপ এবং গুণ দুইই অশেষ, অনন্ত, অগণ্য। জগতের জগদীশ্বর যথার্থই দয়ালু, নিষ্ঠুর, সুন্দর, ভীষণ, উগ্র, শান্ত, উৎকট, কমনীয়—সর্ব্বরূপ সম্পন্ন, সর্ব্বগুণ সম্পূর্ন। তাই সূক্ষ্মদর্শী হিন্দু জগদীশ্বরকে নির্গুণ এবং নিরাকার বলিয়া প্রখ্যাত করিয়াছেন। যাঁহার রূপ বা আকার সর্ব্ব রকম, অর্থাৎ যাঁহার রূপের বা আকারের স্থির নির্দ্দেশ হয় না তিনি প্রকৃত পক্ষে নিরাকার; এবং যাঁহার সকল গুণই আছে, অর্থাৎ যাঁহার গুণের স্থির নির্দ্দেশ হয় না তিনি প্রকৃত পক্ষে নির্গুণ।

জগতের জগদীশ্বরের রূপ এবং গুণ যখন অসংখ্য হইতেছে, তখন জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হইলে অসংখ্য মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তাহা না করিলে অসীমকে সসীম করা হইবে, অনন্তকে সান্ত করা হইবে, এবং জগদীশ্বরের মূর্ত্তি খর্ব্ব এবং অসম্পূর্ণ হইয়া থাকিবে। অতএব প্রকৃত পৌত্তলিকতায় জগদীশ্বর অসংখ্য মূর্ত্তিতে প্রকাশিত—অনন্ত পুরুষ অনন্ত আকার বিশিষ্ট। তাই হিন্দুর ব্রহ্মারূপ, বিষ্ণুরূপ, রুদ্ররূপ, গণেশরূপ, কৃষ্ণরূপ, বরাহরূপ, কূর্ম্মরূপ, মৎস্যরূপ, কালীরূপ, জগদ্ধাত্রীরূপ, তারারূপ, ছিন্নমস্তারূপ—অনন্ত অগণ্য রূপ। তাই হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা। মানুষের দেবতা-জ্ঞান পূর্ণ না হইলে, অনন্ত পুরুষ কাহাকে বলে মানুষ তাহা প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে মানুষের তেত্রিশ কোটি দেবতা হয় না। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার অর্থ এই যে পৃথিবীর অসংখ্য মনুষ্য জাতির মধ্যে একমাত্র হিন্দুর মনে অনন্ত পুরুষের অনন্তত্ব প্রকৃষ্টরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল—সে অনন্তত্ব আর কাহারো মনে প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি হয় নাই। হিন্দুর মন যেমন পূর্ণায়তন তেমন পূর্ণায়তন মন পৃথিবীতে আর কেহ কখন পায় নাই। আর হিন্দুর মনের উপলব্ধি শক্তি (power of comprehensive realisation) যেমন পূর্ণায়তন, তেমন পূর্ণায়তন উপলব্ধি শক্তি আর কাহারো মনে কখন লক্ষিত হয় নাই।

তেত্রিশ কোটি দেবতা একটি অমোঘ অমূল্য সত্য, তেত্রিশ কোটি দেবতা অত্যুৎকৃষ্ট মানব প্রকৃতির অনিবার্য্য ফল। যেখানেই মানুষ অনন্ত

জগদীশ্বরের অনন্তত্ব বুঝিয়াছে সেইখানেই মানুষ অসংখ্য জগদীশ্বর, কোটি কোটি দেবতা নির্ম্মাণ করিয়াছে। এ কথার একটি চমৎকার প্রমাণ আছে। খৃষ্টধর্ম্মে ঈশ্বর এক এবং সে ঈশ্বর একটি নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতিসম্পন্ন। সে প্রকৃতি বাইবলে কসামাজা, সীমাসা-সহর্দ্ধ বিশিষ্ট। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীকে সেই সীমাসাসহর্দ্ধ বিশিষ্ট এক ঈশ্বরকে অতিক্রম করিতে দেয় না। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র এক, মানবপ্রকৃতি আর। ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্কীর্ণ হইলে মানবপ্রকৃতি তাহাতে আবদ্ধ থাকিবে কেন? খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বলিল, সৃষ্টি-কর্ত্তা বই সৃষ্টপদার্থের কাছে পূজার্থ প্রণত হইও না। কোলরিজ উচ্চ মণ্ট-ব্লাঙ্ক গিরি দেখিয়া তাহার সম্মুখে প্রণত হইলেন।

'Thou too again, stupendous Mountain! thou
That as I raise my head, awhile bow'd low
In adoration, upward from thy base. *"

খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বলিল জগতের একমাত্র দেবতা এবং সে দেবতা জগৎ হইতে পৃথক, জগৎ অপেক্ষা অনন্তগুণে উচ্চ। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মহাপুরুষ সে কথা মানিলেন না। তিনি সেই উচ্চ দেবতাকে নীচে নামাইলেন, সেই এক দেবতাকে অসংখ্য করিয়া তুলিলেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর সাহিত্য দেখ। কোলরিজ একটি কাব্যে † বলিতেছেন—

"O what a goodly scene; Here the bleak Mount,
The bare bleak mountain speckled thin with sheep;
Grey clouds, that shadowing spot the sunny fields;
And River, now with bushy rocks o'erbrow'd,
Now winding bright and full, with naked banks;
And Seats, and Lawns, the Abbey, and the Wood,
And Cots, and Hamlets, and faint City-spire:
The Channel there, the Islands and white Sails,
Dim Coasts, and cloud-like Hills, and shoreless Ocean—
It seem'd like Omnipresence! God, methought,
Had built him there a Temple; the whole world
Seem'd imaged in its vast circumference."

---

* Hymn before Sun-rise in the Vale of Chamouny নামক কাব্য দেখ।

† Reflections on having left a Place of Retirement নামক কাব্য দেখ।

উচ্চ স্বর্গের ঈশ্বর নিম্নে পৃথিবীতে নামিলেন! যে ঈশ্বর পৃথিবী হইতে পৃথক্ এবং সেইজন্য পৃথিবী অপেক্ষা অনন্তগুণে উচ্চ, সেই ঈশ্বর পৃথিবীতে নামিলেন— যে জড়ের দ্বারা মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইলে তিনি খৃষ্টীয়ানের মতে অপমানিত হন, সেই জড়-নির্ম্মিত পৃথিবীতে নামিলেন। নামিয়া তাঁহার একত্ব পরিত্যাগ করিয়া বহুত্ব প্রাপ্ত হইলেন:—

———"Fair the vernal Mead,
Fair the high Grove, the Sea, the Sun, the Stars,
True Impress each of their creating Sire! *"

স্বর্গের এক ঈশ্বর পৃথিবীতে নামিলেন। নামিয়া শুধু অসংখ্য হইলেন তা নয়। তখন সমস্ত পৃথিবী ঈশ্বর হইল, পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থ ঈশ্বর হইলঃ —

———"Early had he learned
To reverence the volume that displays
The mystery, the life which cannot die;
But in the mountains did he *feel* his faith.
All things, responsive to the writing, † there
Breathed immortality, revolving life,
And greatness still revolving; infinite:
There littleness was not; the least of things
Seemed infinite; and there his spirit shaped
Her prospects, nor did he believe,—he *saw*." ‡

পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থই ঈশ্বর—অসীম, অনন্ত। আবার পৃথিবীতে নামিয়া ঈশ্বর শুধু সংখ্যায় অসংখ্য নন। পৃথিবীতে তাঁহার রূপও অসীম। বাইরণ সমুদ্র দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে তাহাতে ঈশ্বরের রূপ দেখিতে পাইলেন। আহা! কতই রূপ!—

"Thou glorious mirror, where the Almighty's form
Glasses itself in tempests; in all time,—
Calm or convulsed, in breeze, or gale, or storm,
Icing the pole, or in the torrid clime

* Coleridge-এর Religious Musings নামক কবিতা দেখ।

† সাংখ্য দর্শনে বেদের দোহাই যেমন, এখানে বাইবলের দোহাইও তেমনি।

‡ Wordsworth এর Excursion নামক কাব্যের প্রথম সর্গ দেখ।

Dark-heaving—boundless, endless, and sublime,
The image of eternity, the throne
Of the Invisible."

আর কত উদাহরণ দিব ? ইংরাজি সাহিত্যজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে ইংরাজ কবির বাহ্য জগৎ বর্ণনা জগদীশ্বরের কথায় পরিপূর্ণ থাকে, ইংরাজ কবি বাহ্য জগতের প্রত্যেক পদার্থে জগদীশ্বর দেখিয়া থাকেন—প্রত্যেক পদার্থে জগদীশ্বর খুঁজিয়া থাকেন, ইংরাজ কবির দেবতা একটি নয়, দেবতা তেত্রিশ কোটি। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীকে একটি বই দেবতা দেয় না বলিয়া, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী কাব্যে কোটি কোটি দেবতার সৃষ্টি করেন। যে ধর্ম্ম মানুষকে কোটি কোটি দেবতা দেয় সে ধর্ম্মের সেবক বাহ্য জগতে ঈশ্বর দেখে না, ঈশ্বর খোঁজে না, কাব্যে কোটি কোটি দেবতা সৃষ্টি করে না। হিন্দুর ন্যায় ঈশ্বরপ্রিয়, ঈশ্বরভক্ত, ঈশ্বরোন্মত্ত জাতি আর কখনও কোথাও হয় নাই। কিন্তু হিন্দুর সাহিত্যে দেখ—কোথাও দেখিবে না হিন্দু কবি ইউরোপীয় কবির ন্যায় বাহ্য জগতে ঈশ্বর দেখিতেছে, ঈশ্বর খুঁজিতেছে, কোটি কোটি ঈশ্বর পূজিতেছে। হিন্দু কবি বাহ্য জগৎ বর্ণনা করিতে বড়ই ভাল বাসেন এবং তিনি যেমন বাহ্য জগৎ বর্ণনা করিয়াছেন তেমন আর কেহ কোথাও করিয়াছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু তাঁহার বাহ্য জগৎ বর্ণনায় ঈশ্বরের নাম গন্ধও নাই। বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি শ্রীহর্ষ, ভারবি সকলেই বাহ্য জগৎ লইয়া উন্মত্ত, বাহ্য জগতের মোহে মুগ্ধ, বাহ্য জগতের প্রাণে গাঢ় প্রবিষ্ট। সকলেই বাহ্য জগতকে যত রকমে দেখিতে হয় তত রকমে দেখিয়াছেন, যত রকমে বুঝিতে হয় তত রকমে বুঝিয়াছেন। সকলেই বাহ্য জগতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, জীবন, মন, প্রাণ, হৃদয়, আত্মা, সকলই দেখিয়াছেন। কিন্তু কেহই বাহ্য জগতে ঈশ্বর দেখেন নাই, ঈশ্বর খোঁজেন নাই, কোটি কোটি দেবতা প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। সকলেই বাহ্য জগতের বৃহত্তম হইতে ক্ষুদ্রতম পদার্থ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই কিছুতে ঈশ্বর দেখেন নাই, ঈশ্বর খোঁজেন নাই, কোটি কোটি দেবতা প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। সকল পদার্থের কথা এখন বলিতে পারিব না—বলিবার স্থান নাই। কেবল দুইটী পদার্থের কথা বলিব। জগতের পর্ব্বত এবং সমুদ্র দেখিলে জগদীশ্বরের কথা যেমন মনে পড়ে, আর কিছু দেখিলে সে কথা তেমন মনে পড়ে না। ইউরোপে মহাকবি

বাইরণ সমুদ্রে জগদীশ্বরের কি পরিষ্কার এবং অপূর্ব্ব মূর্ত্তিই দেখিলেন! কিন্তু ভারতে কবিগুরু বাল্মীকি সমুদ্রে জগদীশ্বরের চিহ্নমাত্রও দেখিলেন না। অগাধ অসীম সমুদ্র দেখিয়া তাঁহার মনে ঈশ্বর-প্রেম, ঈশ্বর-ভক্তি উথলিয়া উঠিল না। রাম বানর সৈন্য লইয়া সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইয়াছেন—

সা মহার্ণবমাসাদ্য হৃষ্টা বানরবাহিনী।
বায়ুবেগসমাধূতং পশ্যমানা মহার্ণবম্॥
দূরপারমসম্বাধং রক্ষোগণনিষেবিতম্।
পশ্যন্তো বরুণাবাসং নিষেদুর্হরিযূথপাঃ॥
চণ্ডনক্রগ্রাহঘোরং ক্ষপাদৌ দিবসক্ষয়ে।
হসন্তমিব ফেনৌঘৈর্নৃত্যন্তমিব চোর্মিভিঃ॥
চন্দ্রোদয়ে সমুদ্ভূতং প্রতিচন্দ্রসমাকুলম্।
চণ্ডানিল মহাগ্রাহৈঃ কীর্ণন্তিমিতিমিঙ্গিলৈঃ॥
দীপ্তভোগৈরিবাকীর্ণং ভুজঙ্গৈর্বরুণালয়ম্।
অবগাঢ়ং মহাসত্ত্বৈর্নানাশৈলসমাকুলম্॥
সুদুর্গং দুর্গমার্গং তমগাধমসুরালয়ম্।
মকরৈর্নাগভোগৈশ্চ বিগাঢ়া বাতলোলিতাঃ॥
উৎপেতুশ্চ নিপেতুশ্চ প্রহৃষ্টা জলরাশয়ঃ।
অগ্নিচূর্ণমিবাবিদ্ধং ভাস্বরাম্বুমহোরগম্॥
সুরারিনিলয়ং ঘোরং পাতালবিষয়ং সদা।
সাগরঞ্চাম্বরপ্রখ্যমম্বরং সাগরোপমম্॥
সাগরঞ্চাম্বরঞ্চেতি নির্বিশেষমদৃশ্যত।
সম্পৃক্তং নভসাপ্যম্ভঃ সম্পৃক্তঞ্চ নভোঽম্ভসা॥
তাদৃগ্রূপে স্ম দৃশ্যেতে তারারত্নসমাকুলে।
সমুৎপতিতমেঘস্য বীচিমালাকুলস্য চ॥
বিশেষো ন দ্বয়োরাসীৎ সাগরস্যাম্বরস্য চ।
অন্যোঽন্যৈরাহতাঃ সক্তাঃ সস্বনুর্ভীমনিঃস্বনাঃ॥
ঊর্ময়ঃ সিন্ধুরাজস্য মহাভের্য্য ইবাম্বরে।
রত্নৌঘজলসন্নাদং বিষক্তমিব বায়ুনা॥
উৎপতন্তমিব ক্রুদ্ধং যাদোগণসমাকুলম্।
দদৃশুস্তে মহাত্মানো বাতাহতজলাশয়ম্॥
অনিলোদ্ধূতমাকাশে প্রলপন্তমিবোর্মিভিঃ॥ (যুদ্ধ কাণ্ড, ৪র্থ সর্গ।

"উহাদের সম্মুখে বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে। উহার কোথাও উদ্দেশ নাই, চতুর্দ্দিক অবাধে প্রসারিত হইয়া আছে। উহা ঘোর জলজন্তুগণে পূর্ণ; প্রদোষকালে অনবরত ফেন উদ্গার পূর্ব্বক যেন হাস্য করিতেছে এবং তরঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন পূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতেছে।, তৎকালে চন্দ্র উদিত হওয়াতে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং প্রতিবিম্বিত চন্দ্র উহার বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে। সমুদ্র পাতালের ন্যায় ঘোর ও গভীর দর্শন; উহার ইতস্ততঃ তিমি তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলজন্তু সকল প্রচণ্ড বেগে সঞ্চরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল; উহা অতলস্পর্শ; ভীম অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে। উহাদের দেহ জ্যোতির্ম্ময়, সাগরবক্ষে যেন অগ্নিচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রের জলরাশি নিরবচ্ছিন্ন উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সমুদ্র আকাশতুল্য এবং আকাশ সমুদ্রতুল্য; উভয়ের কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; আকাশে তারকাবলী এবং সমুদ্রে মুক্তাস্তবক; আকাশে ঘনরাজি এবং সমুদ্রে তরঙ্গজাল; আকাশে সমুদ্র ও সমুদ্রে আকাশ মিশিয়াছে। প্রবল তরঙ্গের পরস্পর সজ্ঘর্ষ নিবন্ধন মহাকাশে মহাভেরীর ন্যায় অনবরত ভীমরব শ্রুত হইতেছে। সমুদ্র যেন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ; উহা রোষভরে যেন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে এবং উহার ভীম গম্ভীর রব বায়ুতে মিশ্রিত হইতেছে।"

(হেমচন্দ্রের অনুবাদ)

জর্ম্মনির ফ্রেদরিকা ব্রুণ, ইংলণ্ডের কোল্‌রিজ ক্ষুদ্র মণ্ট্ ব্লঙ্ক শৃঙ্গে জগদীশ্বর দেখিয়া নতশিরে তাঁহার স্তুতি গান করিলেন। ভারতের কালিদাস গিরিশ্রেষ্ঠ হিমাচল দেখিয়াও একবার জগদীশ্বরের নামও করিলেন না। কুমারে হিমালয় বর্ণনা অতিশয় দীর্ঘ, অতএব এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। পাঠক পড়িয়া দেখিবেন সে বর্ণনা অতুল কবিত্বে পরিপূর্ণ, কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরপ্রেম, ঈশ্বরভক্তি, ঈশ্বরমোহের চিহ্ন মাত্র নাই। সংস্কৃত কবির সকল জগদ্বর্ণনাই এইরূপ। তাহাতে সবই আছে, কেবল ঈশ্বর নাই। সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রই এ কথা জানেন।

এ আশ্চর্য্য প্রভেদ কেন হয়? এ আশ্চর্য্য প্রভেদের অর্থ কি? হিন্দু কি ইউরোপবাসীর অপেক্ষা কম ঈশ্বরপ্রিয়? এবং সেইজন্যই কি হিন্দুর জগদ্বর্ণনায় ঈশ্বর দেখিতে পাওয়া যায় না? তাহা ত নয়। হিন্দু যে ইউরোপবাসী অপেক্ষা শতগুণে ঈশ্বরপ্রিয়। তবে এ আশ্চর্য্য প্রভেদের অর্থ

কি? ইহার অর্থ এই। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপবাসীর ধর্ম্মশাস্ত্র অনন্ত পুরুষকে নির্দ্দিষ্ট সীমানা-সরহদ্দের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ইউরোপবাসীর হৃদয়-স্থিত অনন্তের-ভাব চাপিয়া রাখে বলিয়া এবং ইউরোপবাসীর ঈশ্বর-পিপাসা মিটায় না বলিয়া ইউরোপবাসী বাহ্য জগতে, প্রত্যেক বাহ্য পদার্থে—সমুদ্রে, সরোবরে, প্রস্তরে, পর্ব্বতে, গাছে, পাতায়, লতায়, ফুলে, ফলে—ঈশ্বর খোঁজেন, ঈশ্বর দেখেন, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করেন, ঈশ্বর পূজা করেন। আর হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র অনন্তপুরুষকে অসংখ্য মূর্ত্তিতে দেখাইয়া হিন্দুর হৃদয়স্থিত অনন্তের-ভাব ভরাইয়া তুলে বলিয়া এবং হিন্দুর ঈশ্বর-পিপাসা মিটাইয়া দেয় বলিয়া হিন্দুর বাহ্য জগতে—সমুদ্রে, সরোবরে, প্রস্তরে, পর্ব্বতে, গাছে, পাতায়, লতায় ফলে, ফুলে—ঈশ্বর খুঁজিবার, ঈশ্বর দেখিবার, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করিবার, ঈশ্বর পূজা করিবার প্রয়োজন হয় না। ইউরোপীয় কবির জগদ্বর্ণনা এবং হিন্দু কবির জগদ্বর্ণনার মধ্যে যে আশ্চর্য্য প্রভেদ লক্ষিত হয় তাহার গূঢ় মর্ম্ম এই যে মানুষ ধর্ম্মশাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবতা না পাইলে, কাব্যে তেত্রিশ কোটি দেবতার সৃষ্টি করে। সে কথার অর্থ এই যে, যেমন করিয়াই হউক মানুষের তেত্রিশ কোটি দেবতা না হইলে চলে না। মানুষ এক অনন্ত পুরুষ ধারণা করিতে পারে না। তাই এক অনন্ত পুরুষকে কোটি কোটি পুরুষে বিভক্ত করিয়া অনন্ত পুরুষের অনন্তত্ব উপলব্ধি করে। একে অনন্ত—এ বড় বিষম ধারণা, এক অনন্তেরই আয়ত্তাধীন। অনেকে অনন্ত অথবা অনন্তে অনন্ত—এ কিছু সহজ ধারণা, মানুষের আয়ত্তাধীন। মানুষ সংখ্যার দ্বারাই পরিমাণ বুঝিয়া থাকে। দুইখানি সমতেজ-সম্পন্ন বাষ্পীয় যন্ত্রের মধ্যে যদি একখানি অল্প সংখ্যক গাড়ি টানিয়া লইয়া যায়, আর একখানি অধিক সংখ্যক গাড়ি টানিয়া লইয়া যায় তবে প্রথমোক্ত খানিকে দ্বিতীয়োক্তাপেক্ষা কমতেজসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়। সেক্ষপীয়র যদি দুই খানি মাত্র নাটক লিখিয়া যাইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে এত বড় মনে হইত না। পৃথিবীতে অনেক পদার্থ, আকাশে অনেক নক্ষত্র না থাকিলে মানুষের মনে অনন্তের ভাব উদয় হইত কি না বলিতে পারি না। বোধ হয় যেন জগৎ অনেক না হইলে, জগতে অনেক না থাকিলে মানুষের মনে অনন্তের ভাব উঠিত না। সেই অনেকে-অনন্তের, সেই অনন্তে-অনন্তের নামই তেত্রিশ কোটি দেবতা। তাই হিন্দুর পৌত্তলিকতায় তেত্রিশ কোটি দেবতা। মনে করিও না, সে তেত্রিশ কোটি দেবতা তেত্রিশ কোটি ভিন্ন ভিন্ন দেবতা—সকলে

সেই এক অনন্তপুরুষ নয়। যে হিন্দু প্রত্যেক দেবতাকে বলেন—'তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই বিষ্ণু, তুমিই মহেশ্বর, তুমিই দিবা, তুমিই রাত্রি, তুমিই সন্ধ্যা, ইত্যাদি—সে হিন্দুর তেত্রিশকোটি দেবতার প্রত্যেক দেবতাই সেই এক অনাদি অনন্ত জগদীশ্বর।

অতএব প্রকৃত পৌত্তলিকতায় অনন্ত পুরুষের এক মূর্ত্তি নয়, দুই মূর্ত্তি নয়, দশ মূর্ত্তি নয়—কোটি কোটি মূর্ত্তি, তেত্রিশ কোটি মূর্ত্তি গড়িতে হয়। অতএব, আইস, তেত্রিশ কোটি দেবমূর্ত্তি গড়িয়া অনন্তের অনন্তত্ব উপলব্ধি করিয়া আবার সেই অপূর্ব্ব হিন্দু নামের অধিকারী হই।

জগদীশ্বরের জগৎ দেখিয়া তাঁহার তেত্রিশ কোটি মূর্ত্তি গড়িলে অনেকগুলি মূর্ত্তি যে ভীষণ, অনেকগুলি যে বিকট, অনেকগুলি যে উগ্র হইবে? হইলই বা। তাহাতে ক্ষতি কি? দোষ কি? তুমি বলিবে, জগদীশ্বর যে প্রেমময়, অতএব কেবল শান্ত এবং সুন্দর, তাঁহাকে ভীষণ বা বিকটদর্শন করা বড়ই গর্হিত কার্য্য হইবে। আমি বলি, তিনি প্রেমময় বটে, কিন্তু আমি যে তাঁহাকে অনেক সময় ভীষণ দেখি। প্রেমময়কে ভীষণমূর্ত্তি দেখিলে আমার মন যে এক অপরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। আমি কি সে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ভোগ করিয়া আমার ঈশ্বর-পিপাসা মিটাইব না? প্রেম কি শুধুই হাসায়, প্রেম কি ভয় দেখায় না? ক্ষুদ্র শিশুকে কেন তবে জননী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভয় দেখান? আচ্ছা বল দেখি, সে কুঞ্চিত ভ্রূ কি কেবলই ভীষণ, সুন্দর নয়? আহা! সে কুঞ্চিত ভ্রূ বড়ই সুন্দর, কেন না বড়ই স্নেহে সে ভ্রূ কুঞ্চিত। জগদীশ্বরও তাই। তিনি প্রেমে ভীষণ; কেন তাঁহাকে ভীষণ ভাবিয়া ভজিব না? প্রেমের ভীষণ ভাব কি বড়ই সুন্দর নয়? আর যদি তাঁহাকে সকল সময়ে প্রেমময় বলিয়া নাই বুঝিতে পারি, যদি তাঁহাকে কখনও কেবল ভীষণ বলিয়াই বুঝি, তাহা হইলে কেনই না তাঁহাকে ভীষণ ভাবিয়া ভজিব? তিনি যদি আমাদের আদরের সামগ্রী হন, তবে তাঁহাকে ভীষণ ভাবিয়া ভজিলেও কি আমাদের আনন্দ হইবে না? স্নেহের এবং আদরের জিনিসের গুণ ভাবিতে যত সুখ হয়, দোষ ভাবিতে যে তদপেক্ষা বেশী সুখ হয়। জান না কি মানুষ আপন আপন পিতা পিতামহের বিষম রাগের কথা বা অহঙ্কারের কথা কহিতে কত ভাল বাসে? আর ভীষণ ভাবিয়া তাঁহাকে না ভজিলেই বা তাঁহার ধ্যান সম্পূর্ণ হইবে কেন? অনন্তত্ব এবং ভীষণত্ব যে একই জিনিস। অতএব তাঁহার যে মূর্ত্তি তুমি বুঝিতে পার না সে মূর্ত্তি আর

দিয়া তাঁহাকে দেখিলে তোমার দেখা ত পূর্ণ দেখা হইবে না। আর পূর্ণ দেখা না হইলে দেখিয়া সুখ কি?

আরো এক কথা। এমন হইতে পারে যে তুমি পৃথিবীকে কেবল সুন্দর ও সুখময় দেখিতেছ। অতএব জগদীশ্বরকে কেবল সুন্দরই মনে কর এবং সুন্দর দেখিতেই ভালবাস। তুমি আজিকার পৃথিবীতে বাস করিতেছ বলিয়া এইরূপ ভাবিতে পারিতেছ। আজিকার পৃথিবীতে মানুষ সর্ব্বপ্রধান—স্বয়ং প্রকৃতিই অনেকাংশে আজ মানুষের অধীন। মানুষ আজ পৃথিবীতে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত—মানুষের আজ অতুল সম্পদ। অতএব মানুষ আজ জগদীশ্বরকে কেবল সুন্দর ও প্রেমময় দেখিবে ইহা বড় আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে যখন পৃথিবী অরণ্যময় ছিল, অরণ্য বৃহদাকার হিংস্র পশুতে পরিপূর্ণ, মনুষ্য বস্ত্রহীন, অস্ত্রহীন, আবাসহীন, সংখ্যায় দুই চারিটি, তখনও কি মানুষ পৃথিবীকে কেবল সুন্দর ও সুখময় এবং পৃথিবীর পতি জগদীশ্বরকে কেবল সুন্দর ও প্রেমময় দেখিয়াছিল? তখন কি মানুষ জগদীশ্বরকে নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, ভীষণ দেখে নাই? আর জগদীশ্বরের সে মূর্ত্তি কি আমাদের সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে না? মনুষ্য জাতির জাতীয়-জীবনের শৈশবে জগদীশ্বরের যে মূর্ত্তি ছিল সে মূর্ত্তি ভুলিলে, সে মূর্ত্তি ছাড়িলে, মনুষ্য জাতির-জাতীয় জগদীশ্বরের মূর্ত্তি কেমন করিয়া সম্পূর্ণ হইবে? অথচ সেই জাতীয়-জগদীশ্বরের মূর্ত্তি অক্ষুণ্ণভাবে দেখিতে না পাইলে ত জগদীশ্বরের প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না, বুঝিতে পারা যায় না। যে পৃথিবীতে মানুষ একদিন হিংস্র জন্তুর ভয়ে, অস্ত্রাভাবে, বস্ত্রাভাবে, গৃহাভাবে, খাদ্যাভাবে, অশেষ অভাবে যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া গিয়াছে সেই পৃথিবীতে মানুষ আজ রাজা, রাজসম্পদের অধিকারী। বল দেখি জগদীশ্বরের কি পৃথিবী কি হইয়া উঠিয়াছে, আবার যুগযুগান্তর পরে আরো কত চমৎকার হইয়া উঠিবে। জগতের এই অপরূপ ক্রমোন্নতি—নরকতুল্য অবস্থা হইতে স্বর্গতুল্য অবস্থায় পরিণতি—দেখিলে জগদীশ্বরের প্রেমের এবং সৌন্দর্য্যের যে ভাব মনে উদয় হয়, জগতের একটি মাত্র অবস্থা দেখিলে সে ভাব হৃদয়ে উদয় হয় না। ঐতিহাসিক জগদীশ্বরকে না দেখিলে, মানব জাতির জগদীশ্বরকে না দেখিলে, জগদীশ্বরের প্রেম মাহাত্ম্য এবং সৌন্দর্য্যের কিছুই দেখা হয় না, কিছুই বুঝা হয় না। তাই বলি জগদীশ্বরের কোন মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিও না। কেন না তাহা হইলে জগদীশ্বরকে দেখা হইবে

না। আর জগদীশ্বরকে না দেখিলে জগদীশ্বরের পূজা করিয়াও সুখ হইবে না। হিন্দু জগদীশ্বরের এত মূর্ত্তি দেখে বলিয়া জগদীশ্বরের পূজায় এত পাগল।

অতএব, আইস, জগদীশ্বরের সকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া—নিষ্ঠুর, ভীষণ শান্ত, সুন্দর, প্রেমময়—তেত্রিশকোটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তেত্রিশকোটি দেবতাতে অনন্তের পূজা পূর্ণ করি। তেত্রিশকোটি দেবতার পূজা হিন্দু বই আর কেহ কখনও করে নাই। অনন্তের অনন্তত্ব হিন্দু বই আর কেহ কখনও প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করে নাই। অনন্তের অনন্ত পূজার পত্তন হিন্দু বই আর কাহারও কর্ত্তৃক কোথাও স্থাপিত হয় নাই। পরশ্ব প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাণ্ডত্ব ব্যঞ্জক একটা প্রকাণ্ড কথা শুনিয়াছিলাম—তুষানল। কাল প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাণ্ডত্ব ব্যঞ্জক আর একটা প্রকাণ্ড কথা শুনিয়াছি—ষোড়শোপচারে পূজা। আজ প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাণ্ডত্ব ব্যঞ্জক আর একটা প্রকাণ্ড কথা শুনিলাম—তেত্রিশকোটী দেবতা। আইস, আমাদের আজিকার দুর্দ্দিনের তুষানলসম যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তেত্রিশকোটি দেবতার পূজা করিয়া আবার সেই প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাণ্ড নাম এবং প্রবল সম্পদ পুনঃ সঞ্চয় করি।

সুখ।

গুরু। এক্ষণে নিকৃষ্ট কার্য্যকারিণী বৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিয়া যাহাকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বল, সে সকলের কথা বলি শুন।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, কতকগুলি কার্য্যকারিণী বৃত্তি যথা ভক্ত্যাদি অধিক সম্প্রসারণে সক্ষম, এবং তাহাদিগের অধিক সম্প্রসারণেই সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য। আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, যথা কামাদি, সে গুলিও অধিক সম্প্রসারণের সক্ষম, সে গুলির অধিক সম্প্রসারণে সামঞ্জস্যের ধ্বংস। কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্য সামঞ্জস্য, কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্যে অসামঞ্জস্য, এমন ঘটে কেন, তাহা বুঝান নাই। আপনি বলিয়াছেন, যে কামাদির অধিক স্ফূরণে, অন্যান্য বৃত্তি, যথা ভক্তিপ্রীতি দয়া,

এসকলের উত্তম স্ফূর্ত্তি হয় না, এইজন্য অসামঞ্জস্য ঘটে। কিন্তু ভক্তি-প্রীতি দয়াদির অধিক স্ফূরণেও কাম ক্রোধাদির উত্তম স্ফূর্ত্তি হয় না; ইহাতে অসামঞ্জস্য ঘটে না কেন?

গুরু। যেগুলি শারীরিক বৃত্তি বা পাশব বৃত্তি, যাহা পশুদিগেরও আছে এবং আমাদিগেরও আছে, সেগুলি জীবন রক্ষা বা বংশ রক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইহাতেই সহজেই বুঝা যায়, যে সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত, অনুশীলন সাপেক্ষ নহে। আমাদিগকে অনুশীলন করিয়া ক্ষুধা আনিতে হয় না, অনুশীলন করিয়া ঘুমাইবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হয় না। দেখিও, স্বতঃস্ফূর্ত্তে ও সহজে গোল করিও না। যাহা আমাদের সঙ্গে জন্মিয়াছে তাহা সহজ। সকল বৃত্তিই সহজ। কিন্তু সকল বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত তাহা অন্য বৃত্তির অনুশীলনে বিলুপ্ত হইতে পারে না।

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে, তাহাই বা অন্য বৃত্তির অনুশীলনে বিলুপ্ত হইবে কেন?

গুরু। অনুশীলন জন্য তিনটি সামগ্রী প্রয়োজনীয়। (১) সময়, (২) শক্তি (Energy) (৩) যাহা লইয়া বৃত্তির অনুশীলন করিব—অনুশীলনের উপাদান (object)। এখন, আমাদিগের সময় ও শক্তি উভয়ই সঙ্কীর্ণ। মনুষ্যজীবন কয়েক বৎসর মাত্র পরিমিত। জীবিকানির্ব্বাহের কার্য্যের পর বৃত্তির অনুশীলন জন্য যে সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহার কিছুমাত্র অপব্যয় হইলে সকল বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের উপযোগী সময় পাওয়া যাইবে না। অপব্যয় না হয়, তাহার জন্য এই নিয়ম করিতে হয়, যে যে বৃত্তি অনুশীলন সাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তাহার অনুশীলন জন্য সময় দিব না; যাহা অনুশীলন সাপেক্ষ তাহার অনুশীলনে, সকল সময় টুকু দিব। যদি তাহা না করিয়া, স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তির অনাবশ্যক অনুশীলনে সময় হরণ করি, তবে সময়াভাবে অন্য বৃত্তি গুলির উপযুক্ত অনুশীলন হইবে না। কাজেই সে সকলের খর্ব্বতা বা বিলোপ ঘটিবে। দ্বিতীয়ত, শক্তি সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। আমাদের কাজ করিবার মোট যে শক্তি টুকু আছে, তাহাও পরিমিত। জীবিকা নির্ব্বাহের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তির অনুশীলনে নিয়োগ করিলে, অন্য বৃত্তির অনুশীলন জন্য বড় কিছু থাকে না। বিশেষ পাশব বৃত্তির সমধিক অনুশীলন, শক্তিক্ষয়কারী। তৃতীয়ত স্বতঃস্ফূর্ত্ত পাশব বৃত্তির অনুশীলনের উপাদান ও মানসিক বৃত্তির

অনুশীলনের উপাদান পরস্পর বড় বিরোধী। যেখানে ওগুলি থাকে, সেখানে এগুলি থাকিতে পায় না। বিলাসিনী মণ্ডলমধ্যবর্ত্তীর হৃদয়ে ঈশ্বরের বিকাশ অসম্ভব এবং ক্রুদ্ধ অস্ত্রধারীর নিকট ভিক্ষার্থীর সমাগম অসম্ভব। আর শেষ কথা এই যে, পাশব বৃত্তিগুলি, শরীর ও জাতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া, পুরুষ পরম্পরাগত স্ফূর্ত্তি জন্যই হউক, বা জীব রক্ষাভিলাষী ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই হউক, এমন বলবতী, যে অনুশীলনে তাহারা সমস্ত হৃদয় পরিব্যাপ্ত করে, আর কোন বৃত্তিরই স্থান হয় না।

পক্ষান্তরে, যে বৃত্তিগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে তাহার অনুশীলনে আমাদের সমস্ত অবসর ও জীবিকানির্ব্বাহাবশিষ্ট শক্তির নিয়োগ করিলে, স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তির আবশ্যকীয় স্ফূর্ত্তির কোন বিঘ্ন হয় না। কেন না, সে গুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত। কিন্তু উপাদান বিরোধ হেতু, তাহাদের দমন হইতে পারে বটে। কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে যে এ সকলের দমনই যথার্থ অনুশীলন।

শিষ্য। কিন্তু যোগীরা অন্য বৃত্তির সম্প্রসারণ দ্বারা—কিম্বা উপায়ান্তরের দ্বারা, পাশব বৃত্তি গুলির এককালীন ধ্বংস করিয়া থাকেন, এ কথা কি সত্য নয়?

গুরু। চেষ্টা করিলে যে কামাদির উচ্ছেদ করা যায় না, এমত নহে। কিন্তু সে ব্যবস্থা অনুশীলন ধর্ম্মের নহে, সন্ন্যাস ধর্ম্মের। সন্ন্যাসকে আমি ধর্ম্ম বলি না—অন্তত সম্পূর্ণ ধর্ম্ম বলি না। অনুশীলন প্রবৃত্তিমার্গ—সন্ন্যাস নিবৃত্তিমার্গ। সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম। ভগবান স্বয়ং কর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অনুশীলন কর্ম্মাত্মক।

শিষ্য। যাক্। তবে আপনার সামঞ্জস্য তত্ত্বের স্থূল নিয়ম একটা এই বুঝিলাম, যে যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত তাহা বাড়িতে দিব না, যে বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে, তাহা বাড়িতে দিতে পারি। কিন্তু ইহাতে একটা গোলযোগ ঘটে। প্রতিভা (Genius) কি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে? প্রতিভা একটি কোন বিশেষ বৃত্তি নহে, তাহা আমি জানি। কিন্তু কোন বিশেষ মানসিক বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্তিমতী হইলেই তাহাকে প্রতিভা বলা যাইতে পারে। এখন প্রতিভা স্বতঃস্ফূর্ত্তিমতী বলিয়া তাহাকে কি বাড়িতে দিব না? তাহার অপেক্ষা আত্মহত্যা ভাল।

গুরু। ইহা যথার্থ।

শিষ্য। ইহা যদি যথার্থ হয়, তবে এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন লক্ষণ দেখিয়া নির্ব্বাচন

করিব? কোন্ কষ্টি পাতরে ঘসিয়া ঠিক করিব, যে এইটি সোনা, এইটি পিতল।

গুরু। আমি বলিয়াছি যে সুখের উপায় ধর্ম্ম, আর সুখেরই উপাদান মনুষ্যত্ব। অতএব সুখই সেই কষ্টি পাতর।

শিষ্য। বড় ভয়ানক কথা! আমি যদি বলি, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু। তাহা বলিতে পার না। কেন না সুখ কি তাহা বুঝাইয়াছি। আমাদের সমুদায় বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য, এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ।

শিষ্য। সে কথাটা এখনও আমার ভাল করিয়া বুঝা হয় নাই। সকল বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তির সমবায় সুখ? না প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু। সমবায়ই সুখ। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তি সুখের অংশ মাত্র।

শিষ্য। তবে কষ্টি পাতর কোন্‌টা? সমবায় না অংশ?

গুরু। সমবায়ই কষ্টি পাতর।

শিষ্য। এত বুঝিতে পারিতেছি না। মনে করুন আমি ছবি আঁকিতে পারি। কতকগুলি বৃত্তি বিশেষের পরিমার্জ্জনে এ শক্তি জন্মে। কথাটা এই যে সেই বৃত্তিগুলির সমধিক সম্প্রসারণ আমার কর্ত্তব্য কি না। আপনাকে এ প্রশ্ন করিলে আপনি বলিবেন "সকল বৃত্তির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও চরিতার্থতার সমবায় যে সুখ তাহার কোন বিঘ্ন হইবে কি না, এ কথা বুঝিয়া তবে চিত্র বিদ্যার অনুশীলন কর।" অর্থাৎ আমার তুলি ধরিবার আগে আমাকে গণনা করিয়া দেখিতে হইবে, যে ইহাতে আমার মাংসপেশীর বল, শিরা ধমনীর স্বাস্থ্য, চক্ষের দৃষ্টি, শ্রবণের শ্রুতি—আমার ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, দীনে দয়া, সত্যে অনুরাগ—আমার অপত্যে স্নেহ, শত্রুতে ক্রোধ,—আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, দার্শনিক ধৃতি,—আমার কাব্যের কল্পনা, সাহিত্যের সমালোচনা—কোন দিকে কিছুর কোন বিঘ্ন হয় কি না। ইহাও কি সাধ্য?

গুরু। কঠিন বটে নিশ্চিত জানিও। ধর্ম্মাচরণ ছেলে খেলা নহে। ধর্ম্মাচরণ অতি দুরূহ ব্যাপার। প্রকৃত ধার্ম্মিক যে পৃথিবীতে এত বিরল তাহার কারণই তাই। ধর্ম্ম সুখের উপায় বটে, কিন্তু সুখ বড় আয়াস-লভ্য, সাধনা অতি দুরূহ। দুরূহ, কিন্তু অসাধ্য নহে।

শিষ্য। কিন্তু ধর্ম্ম ত সর্ব্ব সাধারণের উপযোগী হওয়াই উচিত।

গুরু। ধর্ম্ম, যদি তোমার আমার গড়িবার সামগ্রী হইত, তা না হয়, তুমি যাহাকে সাধারণের উপযোগী বলিতেছ, সেইরূপ করিয়া গড়িতাম। করমায়েস মত, সখের জিনিস গড়িয়া দিতাম। কিন্তু ধর্ম্ম তোমার আমার গড়িবার নহে। ধর্ম্ম ঐশিক নিয়মাধীন। যিনি ধর্ম্মের প্রণেতা, তিনি ইহাকে যেরূপ করিয়াছেন সেইরূপই আমাকে বুঝাইতে হইবে। তবে ধর্ম্মকে সাধারণের অনুপযোগীও বলা উচিত নহে। চেষ্টা করিলে, অর্থাৎ অনুশীলনের দ্বারা সকলেই ধার্ম্মিক হইতে পারে। আমার বিশ্বাস যে এক সময়ে সকল মনুষ্যই ধার্ম্মিক হইবে। যত দিন তাহা না হয়, ততদিন তাহারা আদর্শের অনুসরণ করুক। আদর্শ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। তাহা হইলেই তোমার এ আপত্তি খণ্ডিত হইবে।

শিষ্য। আমি যদি বলি যে আপনার ওরূপ একটা পারিভাষিক এবং দুষ্প্রাপ্য সুখ মানি না, আমার ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু। তাহা হইলে আমি বলিব, সুখের উপায় ধর্ম্ম নহে, সুখের উপায় অধর্ম্ম।

শিষ্য। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি কি সুখ নহে? উহাও বৃত্তির স্ফূরণ ও চরিতার্থতা বটে। আমি ইন্দ্রিয়গণকে খর্ব্ব করিয়া, কেন দয়া দাক্ষিণ্যাদির সমধিক অনুশীলন করিব, আপনি তাহার উপযুক্ত কোন কারণ দেখান নাই। আপনি ইহা বুঝাইয়াছেন বটে, যে ইন্দ্রিয়াদির অধিক অনুশীলনে দয়া দাক্ষিণ্যাদির ধ্বংসের সম্ভাবনা—কিন্তু তদুত্তরে আমি যদি বলি যে ধ্বংস হয় হউক, আমি ইন্দ্রিয় সুখে বঞ্চিত হই কেন?

গুরু। তাহা হইলে আমি বলিব, তুমি কিস্কিন্ধ্যা হইতে পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়াছ। যাহা হউক, তোমার কথার আমি উত্তর দিব। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি সুখ? ভাল, তাই হউক। অমি তোমাকে অবাধে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে অনুমতি দিতেছি। আমি খত লিখিয়া দিতেছি যে, এই ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে কখন কেহ কোন বাধা দিবে না, কেহ নিন্দা করিবে না,—যদি কেহ করে আমি গুণাগারি দিব। কিন্তু তোমাকেও একখানি খত লিখিয়া দিতে হইবে। তুমি লিখিয়া দিবে, যে "আর ইহাতে সুখ নাই" বলিয়া তুমি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি ছাড়িয়া দিবে না। শ্রান্তি, ক্লান্তি, রোগ, মনস্তাপ, আয়ুক্ষয়, পশুত্বে অধঃপতন প্রভৃতি কোন রূপ ওজর আপত্তি করিয়া ইহা কখন ছাড়িতে পারিবে না। কেমন রাজি আছ?

শিষ্য। দোহাই মহাশয়ের! আমি নই। কিন্তু এমন লোক কি সর্ব্বদা দেখা যায় না, যাহারা যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই সার করে? অনেক লোকই ত এইরূপ?

গুরু। আমরা মনে করি বটে, এমন লোক অনেক। কিন্তু ভিতরের খবর রাখি না। ভিতরের খবর এই—যাহাদিগকে যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয় পরায়ণ দেখি, তাহাদিগের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির চেষ্টা বড় প্রবল বটে, কিন্তু তেমন পরিতৃপ্তি ঘটে নাই। যেরূপ তৃপ্তি ঘটিলে ইন্দ্রিয় পরায়ণতার দুঃখটা বুঝা যায়, সে তৃপ্তি ঘটে নাই। তৃপ্তি ঘটে নাই বলিয়াই চেষ্টা এত প্রবল। অনুশীলনের দোষে, হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়াছে,—দাহ নিবারণের জন্য তারা জল খুঁজিয়া বেড়ায়; জানে না যে অগ্নি দগ্ধের ঔষধ জল নয়।

শিষ্য। কিন্তু এমনও দেখি যে অনেক লোক অবাধে অনুক্ষণ ইন্দ্রিয় বিশেষ চরিতার্থ করিতেছে, বিরাগও নাই। মদ্যপ ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। অনেক মাতাল আছে, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মদ খায়, কেবল নিদ্রিত অবস্থায় ক্ষান্ত। কই, তাহারা ত মদ ছাড়ে না—ছাড়িতে চায় না

গুরু। একে একে বাপু। আগে "ছাড়ে না" কথাটাই বুঝ। ছাড়ে না, তাহার কারণ আছে। ছাড়িতে পারে না। ছাড়িতে পারে না, কেন না এটি ইন্দ্রিয় তৃপ্তির লালসা মাত্র নহে—এ একটি পীড়া। ডাক্তারেরা ইহাকে Dipsomania বলেন। ইহার ঔষধ আছে—চিকিৎসা আছে। রোগী মনে করিলেই রোগ ছাড়িতে পারে না। সেটা চিকিৎসকের হাত। চিকিৎসা নিস্ফল হইলে রোগের যে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তাহা ঘটে;—মৃত্যু আসিয়া রোগ হইতে মুক্ত করে। ছাড়ে না, তাহার কারণ এই। "ছাড়িতে চায় না"—এ কথা সত্য নয়। যে মুখে যাহা বলুক, তুমি যে শ্রেণীর মাতালের কথা বলিলে, তাহাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই, যে মদ্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মনে মনে অত্যন্ত কাতর নহে। যে মাতাল সপ্তাহে একদিন মদ খায়, সেই আজিও বলে "মদ ছাড়িব কেন?" তাহার মদ্য পানের আকাঙ্ক্ষা আজিও পরিতৃপ্ত হয় নাই—তৃষ্ণা বলবতী আছে। কিন্তু যাহার মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, সে জানে যে পৃথিবীতে যত দুঃখ আছে, মদ্যপানের অপেক্ষা বড় দুঃখ বুঝি আর নাই।

এ সকল কথা মদ্যপ সম্বন্ধেই যে খাটে, এমত নহে। সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-পরায়ণের পক্ষে খাটে। কামুকের অনুচিত অনুশীলনের ফলও একটি রোগ। তাহারও চিকিৎসা আছে এবং পরিণামে অকাল মৃত্যু আছে। এইরূপ একটি রোগীর কথা আমি আমার কোন চিকিৎসক বন্ধুর কাছে এইরূপ শুনিয়াছিলাম যে, তাহাকে হাসপাতালে লইয়া গিয়া তাহার হাত পা বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল, এবং সে ইচ্ছামত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে না পারে, এ জন্য লাইকরলিটি দিয়া তাহার অঙ্গের স্থানে স্থানে ঘা করিয়া দিতে হইয়াছিল। ঔদরিকের কথা সকলেই জানে। আমার নিকট একজন ঔদরিক বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি ঔদরিকতার অনুচিত অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তি জন্য গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি বেশ জানিতেন যে দুষ্পচনীয় দ্রব্য আহার করিলেই, তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হইবে। সে জন্য লোভ সম্বরণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য যে তিনি অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। বাপু হে! এই সকল কি সুখ? ইহার আবার প্রমাণ প্রয়োগ চাই?

শিষ্য। এখন বোধ হয়, আপনি যাহাকে সুখ বলিতেছেন তাহা বুঝিয়াছি। ক্ষণিক যে সুখ তাহা সুখ নহে।

গুরু। কেন নহে? আমি জীবনের মধ্যে যদি একবার একটি গোলাপ ফুল দেখি, কি একটি গান শুনি, আর পরক্ষণেই সব ভুলিয়া যাই, তবে সে সুখ বড় ক্ষণিক সুখ, কিন্তু সে সুখ কি সুখ নহে? তাহা সত্যই সুখ।

শিষ্য। যে সুখ ক্ষণিক অথচ যাহার পরিণাম স্থায়ী দুঃখ তাহা সুখ নহে, দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। এখন বুঝিয়াছি কি?

গুরু। এখন পথে আসিয়াছ। কিন্তু এ ব্যাখ্যা ত ব্যতিরেকী। কেবল ব্যতিরেকী ব্যাখ্যায় সব টুকু পাওয়া যাইবে না। সুখ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে (১) স্থায়ী, (২) ক্ষণিক। ইহার মধ্যে—

শিষ্য। স্থায়ী কাহাকে বলেন? মনে করুন কোন ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি পাঁচ বৎসর ধরিয়া ইন্দ্রিয় সুখভোগ করিতেছে। কথাটা নিতান্ত অসম্ভব নহে। তাহার সুখ কি ক্ষণিক?

গুরু। প্রথমত, সমগ্র জীবনের তুলনায় পাঁচ বৎসর মুহূর্ত্ত মাত্র। তুমি পরকাল মান, না মান, আমি মানি। অনন্ত কালের তুলনায় পাঁচ বৎসর

কতক্ষণ? কিন্তু আমি পরকালের ভয় দেখাইয়া কাহাকেও ধার্ম্মিক করিতে চাহি না। কেন না অনেক লোক পরকাল মানে না—মুখে মানে ত হৃদয়ের ভিতর মানে না, মনে করে ছেলেদের জুজুর ভয়ের মত মানুষকে শান্ত করিবার একটা প্রাচীন কথা মাত্র। তাই আজিকালি অনেক লোক পরকালের ভয়ে ভয় পায় না। পরকালের দুঃখের ভয়ের উপর যে ধর্ম্মের ভিত্তি, তাহা এই জন্য সাধারণ লোকের হৃদয়ে সর্ব্বত্র বলবান্ হয় না। আজিকার দিনে বলিতেছি, কেন না এক সময়ে এদেশে সে ধর্ম্ম বড় বলবানই ছিল বটে। এক সময়ে, ইউরোপেও বড় বলবান ছিল বটে, কিন্তু এখন বিজ্ঞানময়ী ঊনবিংশ শতাব্দী। সেই রক্ত-মাংস-পূতিগন্ধ-শালিনী, কামান-গোলা-বারুদ-ব্রীচ্‌লোডর-টর্পীডো প্রভৃতিতে শোভিতা রাক্ষসী,—এক হাতে শিল্পীর কল চালাইতেছে, আর এক হাতে ঝাঁটা ধরিয়া, যাহা প্রাচীন, যাহা পবিত্র, যাহা সহস্র সহস্র বৎসরের যত্নের ধন, তাহা ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিতেছে। সেই পোড়ার মুখী, এদেশে আসিয়াও কালা মুখ দেখাইতেছে। তাহার কুহকে পড়িয়া, তোমার মত সহস্র সহস্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত, এবং অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী পরকাল আর মানে না। তাই আমি এই ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় যত পারি পরকালকে বাদ দিতেছি। তাহার কারণ এই যে, যাহা তোমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে নাই, তাহার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া আমি ধর্ম্মের মন্দির গড়িতে পারিব না। আর আমার বিবেচনায়, পরকাল বাদ দিলেই ধর্ম্ম-ভিত্তিশূন্য হইল না। কেন না, ইহলোকের সুখও কেবল ধর্ম্মমূলক, ইহ-কালের দুঃখও কেবল অধর্ম্মমূলক। এখন, ইহকালের দুঃখকে সকলেই ভয় করে, ইহকালের সুখ সকলেই কামনা করে। এজন্য ইহকালের সুখ দুঃখের উপরও ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইতে পারে। এই দুই কারণে, অর্থাৎ ইহকাল সর্ব্ববাদী সম্মত, এবং পরকাল সর্ব্ববাদী সম্মত নহে বলিয়া, আমি কেবল ইহকালের উপরই ধর্ম্মের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছি। কিন্তু "স্থায়ী সুখ কি?" যখন এ প্রশ্ন উঠিল, তখন ইহার প্রথম উত্তরে অবশ্য বলিতে হয়, যে অনন্তকাল স্থায়ী যে সুখ, ইহকাল পরকাল উভয় কালব্যাপী যে সুখ, সেই সুখ স্থায়ী সুখ। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে।

শিষ্য। দ্বিতীয় উত্তর পরে শুনিব, এক্ষণে আর একটা কথার মীমাংসা করুন। মনে করুন, বিচারার্থ পরকাল স্বীকার করিলাম। কিন্তু ইহকালে যাহা সুখ, পরকালেও কি তাই সুখ? ইহকালে যাহা দুঃখ, পরকালেও কি

তাই দুঃখ? আপনি বলিতেছেন, ইহকাল পরকালব্যাপী যে সুখ, তাহাই সুখ—এক জাতীয় সুখ কি উভয়কালব্যাপী হইতে পারে?

গুরু। অন্য প্রকার বিবেচনা করিবার কোন কারণ আমি অবগত নহি। যখন পরকাল স্বীকার করিলে তখন দুইটি কথা স্বীকার করিলে;—প্রথম, এই শরীর থাকিবে না, সুতরাং শারীরিকী বৃত্তি নিচয় জনিত যে সকল সুখ দুঃখ তাহা পরকালে থাকিবে না। দ্বিতীয়, শরীর ব্যতিরিক্ত যাহা তাহা থাকিবে, অর্থাৎ ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে, সুতরাং মানসিক বৃত্তিজনিত যে সকল সুখ দুঃখ তাহা পরকালেও থাকিবে। পরকালে এইরূপ সুখের আধিক্যকে আমি স্বর্গ বলি, এইরূপ দুঃখের আধিক্যকে নরক বলি। অন্য প্রকার স্বর্গ নরক আমি মানি না।

শিষ্য। কিন্তু যদি পরকাল থাকে, তবে ইহা ধর্ম্মব্যাখ্যার অতি প্রধান উপাদান হওয়াই উচিত। তজ্জন্য অন্যান্য ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় ইহাই প্রধানত্ব লাভ করিয়াছে। আপনি পরকাল মানিয়াও যে উহা ধর্ম্মব্যাখ্যায় বর্জ্জিত করিয়াছেন, ইহাতে আপনার ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত হইয়াছে বিবেচনা করি।

গুরু। অসম্পূর্ণ হইতে পারে। সে কথাতেও কিছু সন্দেহ আছে। অসম্পূর্ণ হউক বা না হউক কিন্তু ভ্রান্ত নহে। কেন না সুখের উপায় যদি ধর্ম্ম হইল, আর ইহকালের যে সুখ, পরকালেও যদি সেই সুখই সুখ হইল, তবে ইহকালেরও যে ধর্ম্ম, পরকালেরও সেই ধর্ম্ম। পরকাল নাই মান, কেবল ইহকালকে সার করিয়াও সম্পূর্ণরূপে ধার্ম্মিক হওয়া যায়। ধর্ম্ম নিত্য। ধর্ম্ম ইহকালেও সুখপ্রদ, পরকালেও সুখপ্রদ। তুমি পরকাল মান আর না মান ধর্ম্মাচরণ করিও, তাহা হইলে ইহকালেও সুখী হইবে, পরকালেও সুখী হইবে।

শিষ্য। আপনি নিজে পরকাল মানেন—কিছু প্রমাণ আছে বলিয়া মানেন, না, কেবল মানিতে ভাল লাগে তাই মানেন?

গুরু। যাহার প্রমাণাভাব, তাহা আমি মানি না। পরকালের প্রমাণ আছে বলিয়াই পরকাল মানি।

শিষ্য। যদি পরকালের প্রমাণ আছে, যদি আপনি নিজে পরকালে বিশ্বাসী তবে আমাকে তাহা মানিতে উপদেশ দিতেছেন না কেন? আমাকে সে সকল প্রমাণ বুঝাইতেছেন না কেন?

গুরু। আমাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে সে সকল প্রমাণ গুলি

বিবাদের স্থল। প্রমাণ গুলিরত এমন কোন দোষ নাই, যে সে সকল বিবাদের সুমীমাংসা হয় না, বা হয় নাই। তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের কুসংস্কার বশত বিবাদ মিটে না। বিবাদের ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। এবং প্রয়োজনও নাই। প্রয়োজন নাই, এইজন্য বলিতেছি, যে আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, যে পবিত্র হও, শুদ্ধচিত্ত হও, ধর্ম্মাত্মা হও। ইহাই যথেষ্ট। আমরা এই ধর্ম্ম ব্যাখ্যার ভিতর যত প্রবেশ করিব, ততই দেখিব, যে এক্ষণে যাহাকে সমুদয় চিত্তবৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি বলিতেছি, তাহার শেষ ফল পবিত্রতা—চিত্তশুদ্ধি *। তুমি পরকাল যদি নাও মান, তথাপি শুদ্ধচিত্ত ও পবিত্রাত্মা হইলে নিশ্চয়ই তুমি পরকালে সুখী হইবে। যদি চিত্ত শুদ্ধ হইল, তবে ইহলোকই স্বর্গ হইল, তখন পর লোকে স্বর্গের প্রতি আর সন্দেহ কি? যদি তাই হইল, তবে, পরকাল মানা না মানাতে বড় আসিয়া গেল না। যাহারা পরকাল মানে না, ইহাতে ধর্ম্ম তাহাদের পক্ষে সহজ হইল; যে ধর্ম্ম তাহারা পরকালমূলক বলিয়া এত দিন অগ্রাহ্য করিত, তাহারা এখন সেই ধর্ম্মকে ইহকালমূলক বলিয়া অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবে। আর যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে, তাহাদের বিশ্বাসের সঙ্গে এ ব্যাখ্যার কোন বিবাদ নাই। তাহাদের বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তর হউক, বরং ইহাই আমি কামনা করি।

শিষ্য। এক্ষণে, আমরা স্থূল কথা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কথাটা হইতেছিল, স্থায়ী সুখ কি? তাহার প্রথম উত্তরে আপনি বলিয়াছেন, যে ইহকালে ও পরকালে চিরস্থায়ী যে সুখ, তাহাই স্থায়ী সুখ। ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে বলিয়াছেন। দ্বিতীয় উত্তর কি?

গুরু। দ্বিতীয় উত্তর যাহারা পরকাল মানে না, তাহাদের জন্য। ইহ জীবনই যদি সব হইল, মৃত্যুই যদি জীবনের অন্ত হইল, তাহা হইলে, যে সুখ সেই অন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে, তাহাই স্থায়ী সুখ। যদি পরকাল না থাকে, তবে ইহ জীবনে যাহা চিরকাল থাকে, তাহাই স্থায়ী সুখ। তুমি বলিতেছিলে, পাঁচ সাত দশ বৎসর ধরিয়া কেহ কেহ ইন্দ্রিয় সুখে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু পাঁচ সাত দশ বৎসর কিছু চিরজীবন নহে। যে পাঁচ সাত দশ বৎসর ধরিয়া ইন্দ্রিয় পরিতর্পণে নিযুক্ত আছে, তাহারও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সে সুখ থাকিবে না। তিনটির এক না একটি কারণে অবশ্য, অবশ্য, তাহার সে

* সকল কথা ক্রমে পরিস্ফুট হইবে।

সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। (১) অতিভোগ জনিত গ্লানি বা বিরাগ—অতিতৃপ্তি; কিম্বা (২) ইন্দ্রিয়াসক্তি জনিত অবশ্যম্ভাবী রোগ বা অসামর্থ্য অথবা (৩) বয়োবৃদ্ধি। অতএব এসকল সুখের ক্ষণিকত্ব আছেই আছে।

শিষ্য। আর যে সকল বৃত্তিগুলিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বলা যায়, সে গুলির অনুশীলনে যে সুখ, তাহা কি ইহ জীবনে চিরস্থায়ী?

গুরু। তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। একটা সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাই। মনে কর, দয়া বৃত্তির কথা হইতেছে। পরোপকারে ইহার অনুশীলন ও চরিতার্থতা। এ বৃত্তির দোষ এই যে, যে ইহার অনুশীলন আরম্ভ করে নাই, সে ইহার অনুশীলনের সুখ বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু ইহা যে অনুশীলিত করিয়াছে, সে জানে দয়ার অনুশীলন ও চরিতার্থতায়, অর্থাৎ পরোপকারে, এমন তীব্র সুখ আছে, যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর ঐন্দ্রিয়িকেরা সর্ব্বলোকসুন্দরীগণের সমাগমেও সেরূপ তীব্র সুখ অনুভূত করিতে পারে না। এ বৃত্তি যত অনুশীলিত করিবে, ততই ইহার সুখজনকতা বাড়িবে। নিকৃষ্ট বৃত্তির ন্যায়, ইহাতে গ্লানি জন্মে না, অতিতৃপ্তিজনিত বিরাগ জন্মে না, বৃত্তির অসামর্থ্য বা দৌর্ব্বল্য জন্মে না, বল ও সামর্থ্য বরং বাড়িতে থাকে। ইহার নিয়ত অনুশীলন পক্ষে কোন ব্যাঘাত নাই। ঔদরিক দিবসে দুইবার, তিনবার, না হয় চারিবার আহার করিতে পারে। অন্যান্য ঐন্দ্রিয়িকের ভোগেরও সেইরূপ সীমা আছে। কিন্তু পরোপকার দণ্ডে দণ্ডে, পলকে পলকে করা যায়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার অনুশীলন চলে। অনেক লোক মরণ কালেও একটি কথা বা একটি ইঙ্গিতের দ্বারা লোকের উপকার করিয়া গিয়াছেন। আডিসন মৃত্যুকালেও কুপথাবলম্বী যুবাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ, ধার্ম্মিক (Christian) কেমন সুখে মরে!"

তার পর পরকালের কথা বলি, মান না মান সেটাও শুনিয়া রাখ। আমার বিশ্বাস যে পরকালেও আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে, সুতরাং এ দয়াবৃত্তিটিও থাকিবে। আমি ইহাকে যেরূপ অবস্থায় লইয়া যাইব, পারলৌকিক প্রথমাবস্থায় ইহার সেই অবস্থায় থাকা সম্ভব, কেন না হঠাৎ অবস্থান্তরের উপযুক্ত কোন কারণ দেখা যায় না। আমি যদি ইহা উত্তমরূপে অনুশীলিত ও সুখপ্রদ অবস্থায় লইয়া যাই, তবে উহা পরলোকেও আমার পক্ষে সুখপ্রদ হইবে। আমার বিশ্বাস আছে যে সেখানে আমি ইহা অনুশীলিত ও চরিতার্থ করিয়া ইহলোকের অপেক্ষা অধিকতর সুখী হইব।

শিষ্য। এ সকল সুখ-স্বপ্ন মাত্র—অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। দয়ার অনুশীলন ও চরিতার্থতা কর্ম্মাধীন। পরোপকার কর্ম্মমাত্র। আমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি, আমি শরীরের সঙ্গে এখানে রাখিয়া গেলাম, সেখানে কিসের দ্বারা কর্ম্ম করিব?

গুরু। কথাটা কিছু নির্ব্বোধের মত বলিলে। আমরা ইহাই জানি যে যে চৈতন্য শরীরবদ্ধ, সেই চৈতন্যের কর্ম্ম—কর্ম্মেন্দ্রিয়সাধ্য। কিন্তু যে চৈতন্য শরীরে বদ্ধ নহে, তাহারও কর্ম্ম যে কর্ম্মেন্দ্রিয় সাপেক্ষ, এমত বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে।

শিষ্য। ইহাই যুক্তিসঙ্গত। অন্যথা-সিদ্ধি-শূন্যস্য নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা কারণত্বং। কর্ম্ম অন্যথা-সিদ্ধি-শূন্য। কোথাও আমরা দেখি নাই যে কর্ম্মেন্দ্রিয়শূন্য যে, সে কর্ম্ম করিয়াছে।

গুরু। ঈশ্বরে দেখিতেছ। যদি বল ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে আমার বিচার ফুরাইল। আমি পরকাল হইতে ধর্ম্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ঈশ্বর হইতে ধর্ম্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত নহি। আর যদি বল, ঈশ্বর সাকার, তিনি শিল্পকারের মত হাতে করিয়া জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা হইলেও তোমার সঙ্গে বিচার ফুরাইল। কিন্তু ভরসা করি, তুমি ঈশ্বর মান এবং ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াও স্বীকার কর। যদি তাহা কর, তবে কর্ম্মেন্দ্রিয়শূন্য নিরাকারের কর্ম্মকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে। কেন না ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বস্রষ্টা।

পরলোকে (conditions of Existence) জীবনের অবস্থা স্বতন্ত্র। অতএব প্রয়োজনও স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন না হওয়াই সম্ভব।

শিষ্য। হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ সকল আন্দাজি কথা। আন্দাজি কথার প্রয়োজন নাই।

গুরু। আন্দাজি কথা ইহা আমি স্বীকার করি। বিশ্বাস করা, না করার পক্ষে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, ইহাও আমি স্বীকার করি। আমি যে দেখিয়া আসি নাই, ইহা বোধ করি বলা বাহুল্য। কিন্তু এ সকল আন্দাজি কথার একটু মূল্য আছে। যদি পরকাল থাকে, আর যদি Law of Continuity অর্থাৎ মানসিক অবস্থার ক্রমান্বয় ভাব সত্য হয়, তবে পরকাল সম্বন্ধে যে অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পার, আমি এমন পথ দেখিতেছি না। এই ক্রমান্বয় ভাবটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবে। হিন্দু, খৃষ্টীয়, বা ইস্‌লামী যে স্বর্গনরক, তাহা এই নিয়মের বিরুদ্ধ। যদি পরকাল থাকে, তবে

পরকাল আমার বর্ণনানুরূপ হওয়াই সম্ভব। আন্দাজি কথাটির দাম এই। বিশ্বাস কর, না কর, তোমার প্রবৃত্তি।

শিষ্য। যদি পরকাল মানিতে পারি তবে, এটুকুও না হয় মানিয়া লইব। যদি হাতিটা গিলিতে পারি, তবে হাতির কাণের ভিতর যে মশাটা ঢুকিয়াছে, তাহা গলায় বাধিবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ পরকালের শাসন কর্ত্তৃত্ব কই ?

গুরু। যাহারা (Tyrant of Heavens) স্বর্গের বজ্রধর গড়িয়াছে, তাহারা পরকালের শাসকতা গড়িয়াছে। আমি কিছুই গড়িতে বসি নাই। আমি মনুষ্য জীবনের সমালোচনা করিয়া, ধর্ম্মের যে স্থূল মর্ম্ম বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাকে বুঝাইতেছি। কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখায় ক্ষতি নাই। যে পাঠশালায় পড়িয়াছে, সে যে দিন পাঠশালা ছাড়িল, সেই দিনই একটা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতে পরিণত হইল না। কিন্তু সে কালক্রমে একটা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতে পরিণত হইতে পারে, এমত সম্ভাবনা রহিল। আর যে একেবারে পাঠশালায় পড়ে নাই, জনষ্টুয়ার্ট মিলের মত পৈতৃক পাঠশালাতেও পড়ে নাই, সে পণ্ডিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহলোককে আমি তেমনি একটি পাঠশালা মনে করি। যে এখান হইতে সদ্বৃত্তিগুলি মার্জ্জিত ও অনুশীলিত করিয়া লইয়া যাইবে, তাহার সেই বৃত্তিগুলি ইহলোকের কল্পনাতীত স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া তাহার অনন্ত সুখের কারণ হইবে, এমন সম্ভব। আর যে স্বদ্বৃত্তি-গুলির অনুশীলন অভাবে অপক্কাবস্থায় পরলোকে লইয়া যাইবে, তাহার পরলোকে কোন সুখেরই সম্ভাবনা নাই। আর যে কেবল অসদ্বৃত্তিগুলি স্ফূরিত করিয়া পরলোকে যাইবে, তাহার অনন্ত দুঃখ। আমি এইরূপ স্বর্গ নরক মানি। কৃমি-কীট-সঙ্কুল বিষ্ঠামূত্রের হ্রদরূপ নরক, বা অপ্সরোকণ্ঠ-নিনাদ-মধুরিত, উর্ব্বসী মেনকা রম্ভাদির নৃত্যসমাকুলিত, নন্দন-কানন-কুসুম-সুবাস-সমুল্লাসিত স্বর্গ মানি না। হিন্দুধর্ম্ম মানি, হিন্দুধর্ম্মের "বখামি" গুলা মানি না। আমার শিষ্যদিগেরও মানিতে নিষেধ করি।

শিষ্য। আমার মত শিষ্যের মানিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। সম্প্রতি পরকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া, ইহকাল লইয়া সুখের যে ব্যাখ্যা করিতে-ছিলেন, তাহার সূত্র পুনর্গ্রহণ করুন।

গুরু। বোধ হয় এতক্ষণে বুঝাইয়া থাকিব, যে পরকাল বাদ দিয়া কথা

কহিলেও, কোন কোন সুখকে স্থায়ী, আর কোন কোন সুখের স্থায়িত্বাভাবে তাহাকে ক্ষণিক বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। বোধ হয় কথাটা এখনও বুঝি নাই। আমি একটা টপ্পা শুনিয়া আসিলাম, কি একখানা নাটকের অভিনয় দেখিয়া আসিলাম। তাহাতে কিছু আনন্দ লাভও করিলাম। সে সুখ স্থায়ী না ক্ষণিক?

গুরু। যে আনন্দের কথা তুমি মনে ভাবিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি, তাহা ক্ষণিক বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের যে ফল, তাহা স্থায়ী সুখ। সেই স্থায়ী সুখের অংশ, বা উপাদান বলিয়া, ঐ আনন্দ টুকুকে স্থায়ী সুখের মধ্যে ধরিয়া লইতে হইবে। সুখ যে বৃত্তির অনুশীলনের ফল, এ কথাটা যেন মনে থাকে। এখন বলিয়াছি, যে কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন জনিত যে সুখ, তাহা স্থায়ী, আর কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন জনিত যে সুখ, তাহা অস্থায়ী। শেষোক্ত সুখও আবার দ্বিবিধ; (১) যাহার পরিণামে দুঃখ, (২) যাহা ক্ষণিক হইলেও পরিণামে দুঃখ শূন্য। ইন্দ্রিয়াদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে ইহা অবশ্য বুঝিয়াছ, যে এই বৃত্তি গুলির পরিমিত অনুশীলনে দুঃখ শূন্য সুখ, এবং এই সকলের অসমুচিত অনুশীলনে যে সুখ, তাহারই পরিণাম দুঃখ। অতএব সুখ ত্রিবিধ।

(১) স্থায়ী।

(২) ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখ শূন্য।

(৩) ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখের কারণ।

শেষোক্ত সুখকে সুখ বলা অবিধেয়,—উহা দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। সুখ তবে, (১) হয় যাহা স্থায়ী (২) নয়, যাহা অস্থায়ী অথচ পরিণামে দুঃখ শূন্য। আমি যখন বলিয়াছি, যে সুখের উপায় ধর্ম্ম, তখন এই অর্থেই সুখশব্দ ব্যবহার করিয়াছি। এই ব্যবহারই এই শব্দের যথার্থ ব্যবহার, কেন না যাহা বস্তুত দুঃখের প্রথমাবস্থা, তাহা ভ্রান্ত বা পশুবৃত্তদিগের মতাবলম্বী হইয়া সুখের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। যে জলে পড়িয়া ডুবিয়া মরে, জলের স্নিগ্ধতা বশত তাহার প্রথম নিমজ্জন কালে কিছু সুখোপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু বস্তুত সে অবস্থা তাহার সুখের অবস্থা নহে, নিমজ্জন দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। তেমনি দুঃখপরিণাম সুখও দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। নিশ্চয়ই তাহা সুখ নহে।

এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শোন। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে,

"এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন্ লক্ষণ দেখিয়া নির্ব্বাচন করিব? কোন্ কষ্টি পাতরে ঘসিয়া ঠিক করিব, যে এইটি সোনা, এইটি পিতল?" এই প্রশ্নের উত্তর এখন পাওয়া গেল। যে বৃত্তিগুলির অনুশীলনে স্থায়ী সুখ, তাহাকে অধিক বাড়িতে দেওয়াই কর্ত্তব্য—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর যে গুলির অনুশীলনে ক্ষণিক সুখ তাহা বাড়িতে দেওয়া অকর্ত্তব্য, কেন না এ সকল বৃত্তির অধিক অনুশীলনের পরিণাম দুঃখ, সুখ নহে। যতক্ষণ ইহাদের অনুশীলন পরিমিত, ততক্ষণ ইহা অবিধেয় নহে—কেন না তাহাতে পরিণামে দুঃখ নাই। তার পর আর নহে। অনুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ; যে রূপ অনুশীলনে সুখ জন্মে, দুঃখ নাই, তাহাই বিহিত। অতএব **সুখই** সেই কষ্টি পাতর।

বৈষ্ণব কবির গান।

মর্ত্ত্যের সীমানা।

এক স্থানে মর্ত্ত্যের প্রান্তদেশ আছে, সেখানে দাঁড়াইলে মর্ত্ত্যের পর পার কিছু কিছু যেন দেখা যায়। সে স্থানটা এমন সঙ্কট স্থানে অবস্থিত, যে উহাকে মর্ত্ত্যের প্রান্ত বলিব, কি স্বর্গের প্রান্ত বলিব, ঠিক করিয়া উঠা যায় না—অর্থাৎ উহাকে দুইই বলা যায়। সেই প্রান্তভূমি কোথায়! পৃথিবীর আপিসের কাজে শ্রান্ত হইলে, আমরা কোথায় সেই স্বর্গের বায়ু সেবন করিতে যাই।

স্বর্গের সামগ্রী।

স্বর্গ কি, আগে তাহাই দেখিতে হয়। যেখানে যে কেহ স্বর্গ কল্পনা করিয়াছে, সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে স্বর্গকে সৌন্দর্য্যের সার বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। আমার স্বর্গ আমার সৌন্দর্য্য কল্পনার চরম তীর্থ। পৃথিবীতে কত কি আছে, কিন্তু সৌন্দর্য্য ছাড়া এখানে মানুষ এমন আর কিছু দেখে নাই, যে তাহা দিয়া সে তাহার স্বর্গ গঠন করিতে পারে। সৌন্দর্য্য যেন স্বর্গের জিনিষ পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে, এই জন্য পৃথিবী হইতে স্বর্গে কিছু পাঠাইতে হইলে, সৌন্দর্য্যকেই পাঠাইতে হয়। এই জন্য সুন্দর জিনিষ যখন ধ্বংশ হইয়া যায়, তখন কবিরা কল্পনা করেন—দেবতারা স্বর্গের

অভাব দূর করিবার জন্য উহাকে পৃথিবী হইতে চুরি করিয়া লইয়া গেলেন। এই জন্য পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ দেখিলে উহাকে স্বর্গচ্যুত বলিয়া গোঁজা মিলন দিয়া না লইলে যেন হিসাব মিলে না। এই জন্য, অজ ও ইন্দুমতী সুরলোকবাসী, পৃথিবীতে নির্ব্বাসিত।

মিলন।

তাই মনে হইতেছে, পৃথিবীর যে প্রান্তে স্বর্গের আরম্ভ, সেই প্রান্তটিই যেন সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য মাঝে না থাকিলে যেন স্বর্গে মর্ত্ত্যে চিরবিচ্ছেদ হইত। সৌন্দর্য্যে স্বর্গে মর্ত্ত্যে উত্তর প্রত্যুত্তর চলে—সৌন্দর্য্যের মাহাত্ম্যই তাই, নহিলে সৌন্দর্য্য কিছুই নয়।

স্বর্গের গান।

শঙ্খকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেও সে সমুদ্রের গান ভুলিতে পারে না। উহা কাণের কাছে ধর, উহা হইতে অবিশ্রাম সমুদ্রের ধ্বনি শুনিতে পাইবে। পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের মর্ম্মস্থলে তেমনি স্বর্গের গান বাজিতে থাকে। কেবল বধির তাহা শুনিতে পায় না। পৃথিবীর পাখীর গানে পাখীর গানের অতীত আরেকটি গান শুনা যায়, প্রভাতের আলোকে প্রভাতের আলোক অতিক্রম করিয়া আরেকটি আলোক দেখিতে পাই, সুন্দর কবিতায় কবিতার অতীত আরেকটি সৌন্দর্য্য-মহাদেশের তীরভূমি চোখের সম্মুখে রেখার মত পড়ে।

মর্ত্ত্যের বাতায়ন।

এই অনেকটা দেখা যায় বলিয়া আমরা সৌন্দর্য্যকে এত ভালবাসি। পৃথিবীর চারিদিকে দেয়াল, সৌন্দর্য্য তাহার বাতায়ন। পৃথিবীর আর সকলই তাহাদের নিজ নিজ দেহ লইয়া আমাদের চোখের সম্মুখে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, সৌন্দর্য্য তাহা করে না—সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া আমরা অনন্ত রঙ্গভূমি দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য্য-বাতায়নে বসিয়া আমরা সুদূর আকাশের নীলিমা দেখি, সুদূর কাননের সমীরণ স্পর্শ করি, সুদূর পুষ্পের গন্ধ পাই, স্বর্গের সূর্য্য-কিরণ সেইখান হইতে আমাদের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে। আমাদের গৃহের স্বাভাবিক অন্ধকার দূর হইয়া যায়, আমাদের হৃদয়ের সঙ্কোচ চলিয়া যায়, সেই আলোকে পরস্পরের মুখ দেখিয়া আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিতে পারি। এই বাতায়নে বসিয়া অনন্ত আকাশের জন্য আমাদের প্রাণ যেন হা হা করিতে থাকে, দুই বাহু তুলিয়া সূর্য্যকিরণে উড়িতে ইচ্ছা যায়, এই সৌন্দর্য্যের শেষ কোথায় অথবা এই সৌন্দর্য্যের

আরম্ভ কোথায়, তাহারই অন্বেষণে ঐ সুদূর দিগন্তের অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে, ঘরে যেন আর মন টেঁকে না। বাঁশীর শব্দ শুনিলে তাই মন উদাস হইয়া যায়, দক্ষিণা বাতাসে তাই মনটাকে টানিয়া কোথায় বাহির করিয়া লইয়া যায়। সৌন্দর্য্যচ্ছবিতে তাই আমাদের মনে এক অসীম আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করিয়া দেয়।

সাড়া।

স্বর্গে মর্ত্ত্যে এমনি করিয়াই কথাবার্ত্তা হয়। সৌন্দর্য্যের প্রভাবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে একটি ব্যাকুলতা উঠে, পৃথিবীর কিছুতেই সে যেন তৃপ্তি পায় না। আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে যে একটি আকুল আকাঙ্ক্ষার গান উঠে, স্বর্গ হইতে তাহার যেন সাড়া পাওয়া যায়।

সৌন্দর্য্যের ধৈর্য্য।

যাহার এমন হয় না, তাহার আজ যদি বা না হয়, কাল হইবেই। আর সকলে বলের দ্বারা অবিলম্বে নিজের ক্ষমতা বিস্তার করিতে চায়, সৌন্দর্য্য কেবল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে আর কিছুই করে না। সৌন্দর্য্যের কি অসামান্য ধৈর্য্য! এমন কতকাল ধরিয়া প্রভাতের পরে প্রভাত আসিয়াছে, পাখীর পরে পাখী গাহিয়াছে, ফুলের পরে ফুল ফুটিয়াছে, কেহ দেখে নাই, শোনে নাই। যাহাদের ইন্দ্রিয় ছিল, কিন্তু অতীন্দ্রিয় ছিল না, তাহাদের সম্মুখেও জগতের সৌন্দর্য্য উপেক্ষিত হইয়াও প্রতিদিন হাসিমুখে আবির্ভূত হইত। তাহারা গানের শব্দ শুনিত মাত্র, ফুলের ফোটা দেখিত মাত্র। সমস্তই তাহাদের নিকটে ঘটনা মাত্র ছিল। কিন্তু প্রতিদিন অবিশ্রাম দেখিতে দেখিতে, অবিশ্রাম শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাহাদের চক্ষুর পশ্চাতে আরেক চক্ষু বিকশিত হইল, তাহাদের কর্ণের পশ্চাতে আরেক কর্ণ উদ্‌ঘাটিত হইল। ক্রমে তাহারা ফুল দেখিতে পাইল, গান শুনিতে পাইল। ধৈর্য্যই সৌন্দর্য্যের অস্ত্র। পুরুষদের ক্ষমতা আছে, তাই এতকাল ধরিয়া রমণীদের উপরে অনিয়ন্ত্রিত কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিল। রমণীরা আর কিছুই করে নাই, প্রতিদিন তাহাদের সৌন্দর্য্য খানি লইয়া ধৈর্য্য সহকারে সহিয়া আসিতেছিল। অতি ধীরে ধীরে প্রতিদিন সেই সৌন্দর্য্য জয়ী হইতে লাগিল। এখন দানব-বল সৌন্দর্য্য-সীতার গায়ে হাত তুলিতে শিহরিয়া উঠে। সভ্যতা যখন বহুদূর অগ্রসর হইবে, তখন বর্ব্বরেরা কেবলমাত্র শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা মাত্রের পূজা করিবে না। তখন এই স্নেহপূর্ণ ধৈর্য্য, এই আত্ম-বিসর্জ্জন, এই

মধুর সৌন্দর্য্য, বিনা উপদ্রবে মনুষ্য হৃদয়ে আপন সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লইবে। তখন বিষ্ণুদেবের গদার কাজ ফুরাইবে, পদ্ম ফুটিয়া উঠিবে।

জ্ঞানদাসের গান।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে স্বর্গের বার্ত্তা আনিতেছে। যে বধির, ক্রমশ তাহার বধিরতা দূর হইতেছে। বৈষ্ণব জ্ঞানদাসের একটি গান পাইয়াছি, তাহাই ভাল করিয়া বুঝিতে গিয়া আমার এত কথা মনে পড়িল।

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ।
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে আমার নাম॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা শব্দে নাচে ময়ূরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এক কালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুলে ফলে॥
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায়॥
জ্ঞানদাস কহে হাসি হাসি।
"রাধে মোর" বোল বাজিবেক বাঁশী॥

বাঁশীর স্বর।

সৌন্দর্য্য-স্বরূপের হাতে সমস্ত জগতই একটি বাঁশী। ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তিনি নিশ্বাস পূরিতেছেন ও ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে নূতন নূতন সুর উঠিতেছে। মানুষের মন আর কি ঘরে থাকে? তাই সে ব্যাকুল হইয়া বাহির হইতে চায়। সৌন্দর্য্যই তাঁহার আহ্বান গান। সৌন্দর্য্যই সেই দৈববাণী। কদম্ব ফুল তাঁহার বাঁশির স্বর, বসন্ত ঋতু তাঁহার বাঁশির স্বর, কোকিলের পঞ্চম তান তাঁহার বাঁশির স্বর। সে বাঁশির স্বর কি বলিতেছে! জ্ঞানদাস হাসিয়া বুঝাইলেন, সে কেবল বলিতেছে "রাধে, তুমি আমার"—আর কিছুই না। আমরা শুনিতেছি, সেই অসীম সৌন্দর্য্য অব্যক্ত কণ্ঠে আমাদেরই নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—"তুমি আমার, তুমি আমার কাছে আইস!" এই জন্য, আমাদের চরিদিকে যখন সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া উঠে, তখন আমরা যেন একজন-কাহার বিরহে কাতর হই, যেন একজন-

কাহার সহিত মিলনের জন্য উৎসুক হই—সংসারে আর যাহারই প্রতি মন দিই, মনের পিপাসা যেন দূর হয় না। এই জন্য সংসারে থাকিয়া আমরা যেন চির বিরহে কাল কাটাই। কাণে একটি বাঁশির শব্দ আসিতেছে, মন উদাস হইয়া যাইতেছে, অথচ এ সংসারের অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহির হইতে পারি না। কে বাঁশী বাজাইয়া আমাদের মন হরণ করিল, তাহাকে দেখিতে পাই না; সংসারের ঘরে ঘরে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াই। অন্য যাহারই সহিত মিলন হউক্ না কেন, সেই মিলনের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী বিরহের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে।

এই বাঁশির ডাক শুনিয়াই বলিতেছিলাম সৌন্দর্য্যে স্বর্গ মর্ত্ত্যের উত্তর প্রত্যুত্তর হয়।

বিপরীত।

আবার এক এক দিন বিপরীত দেখা যায়। জগৎ জগৎপতিকে বাঁশী বাজাইয়া ডাকে। তাঁহার বাঁশী লইয়া তাঁহাকেই ডাকে।

আজ্ কে গো মুরলী বাজায়!
এ ত কভু নহে শ্যামরায়,
ইহার গৌর বরণে করে আলো,
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল,
ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী,
নীল উয়লি নীলমণি॥

বিবাহ।

জগতের সৌন্দর্য্য অসীম সৌন্দর্য্যকে ডাকিতেছে। তিনি পাশে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। জগতের সৌন্দর্য্যে তিনি যেন জগতের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছেন। তাই আজ জগতের বিচিত্র গান, বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র গন্ধ, বিচিত্র শোভার মধ্যে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি। তাই আজ জগতের সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর দেখিতেছি। আমাদের হৃদয়ও যদি সুন্দর না হয়, তবে তিনি কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিবেন?

অসীম ও সসীম এই সৌন্দর্য্যের মালা লইয়া মালা বদল করিয়াছে। তিনি তাঁহার নিজের সৌন্দর্য্য ইহার গলায় পরাইয়াছেন, এ আবার সেই সৌন্দর্য্য লইয়া তাঁহার গলায় তুলিয়া দিতেছে। সৌন্দর্য্য স্বর্গ মর্ত্ত্যের বিবাহ নিবন্ধন।

নবজীবন।

১ম ভাগ } অগ্রহায়ণ ১২৯১। { ৫ম সংখ্যা।

ব্রততত্ত্ব।

৩। নিয়ম।

জগৎ নিয়মাধীন। দিন রাত্রি অপ্রতিহত নিয়মে ফিরিতেছে; জল বায়ু অগ্নি আদি পদার্থের মধ্যে নিয়মের কখনই কোন ব্যত্যয় হয় না; এই সমস্ত পদার্থের পরমাণু সকল আবার আর এক প্রকার—যথা রাসায়নিক—নিয়মের বশবর্ত্তী। ফলত যে দিকে দেখ, মনুষ্য ব্যতীত, কোথাও স্বেচ্ছাচারিতার চিহ্ন মাত্রও পাইবে না। আমাদিগের দেশে বিজ্ঞান শাস্ত্রের সম্যক্ চালনা হয় নাই বটে; আমরা জলের শক্তি আয়ত্ত করিয়া কখন দমকল বা হাইড্রলিক প্রেস রচনা করিতে পারি নাই, বাষ্পের নিয়ম জানিয়া কখন কোন রথ বা পোত নির্ম্মাণ করিতে পারি নাই; এবং আলোক বা তড়িতের সাহায্যেও কখন কোন অমানুষিক চিত্রকর কি বার্ত্তাবহ নিয়োগ করিতে পারি নাই। তথাচ এতদ্দেশীয় ন্যায়শাস্ত্রে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ উপলক্ষে বিজ্ঞান শাস্ত্রের মূলীভূত কথাটি চিরপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে। "কারণ" বলিতে "অন্যথা সিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিতা" ভিন্ন আর কিছুই গণ্য হয় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে উহা কেবল নিয়মেরই লক্ষণ এবং নিয়মের কারণ কি তাহা মনুষ্যের জ্ঞানাতীত। হিন্দুশাস্ত্র মতে কার্য্যকারণ সমস্তই নিয়মানুবর্ত্তী। এতদ্দেশে নানা প্রকার ঐশ্বর্য্য স্বীকৃত হয় বটে কিন্তু পাশ্চাত্য ঐশ্বর্য্যের সহিত সে গুলির অনেক বিভেদ। আমাদিগের স্বীকৃত ঐশ্বর্য্য যতই

অনৈসর্গিক হউক তাহার বিন্দুমাত্রও নিয়ম বহিভূর্ত নহে। স্বয়ং নারায়ণও নিয়মাধীন। শিহ্লন বলিতেছেন।—

নমস্যামো দেবান্ ননু হতবিধেস্তেঽপি বশগাঃ
বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়ত কর্ম্মৈক ফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি॥

দেবতাদিগকে নমস্কার! উঁহু! তাঁহারাও হতবিধির অধীন। তবে বিধিই বন্দনার পাত্র?—বিধাতাও কেবল কর্ম্মের নিয়মিত ফল প্রদান করিতে সক্ষম! ফল? উহাও কর্ম্মায়ত্ত! তবে অমরগণই কি আর বিধিই বা কি এত! আমি সেই কর্ম্মকেই নমস্কার করি, যাঁহার প্রভাব স্বয়ং বিধিও অতিক্রম করিতে অক্ষম!

অতএব হিন্দু হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি উপেক্ষা করা অবিধেয়। গ্রহচক্র সমভিব্যাহারে স্বয়ং বসুন্ধরা নিয়মাধীন। ভূতময় পদার্থ সমূহ এবং পদার্থের পরমাণুগুলিও তদনুরূপ, সকলেরই নিয়ম আছে। উদ্ভিদ এবং চেতন পদার্থ ঘটিত জীববিজ্ঞান, আবার আর এক শ্রেণীস্থ নিয়মের পরিচায়ক। ইহাতে এইমাত্র মতভেদ দেখা যায় যে কেহ কেহ—অর্থাৎ যোগ বা থিয়সফি বাদীরা—বলেন, মনুষ্যের জীবন স্বেচ্ছাধীন করা যাইতে পারে। কিন্তু এ কথাটা এখন এক পাশে ফেলিলে বড় ক্ষতি হইবে না। এতদ্ভিন্ন আর কতকগুলি বস্তু নিয়মাধীন বলিয়া অতি অল্প কাল মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল নিয়মাবলির ভেদ লক্ষ্য করিয়া এক এক শ্রেণীস্থ নিয়মের অধীন বস্তুগুলিরও বিভিন্নতা স্বীকৃত হয়। নতুবা বস্তুর বস্তুত্ব ও পার্থক্য লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে। যে অভিনব আবিষ্কৃত নিয়মাবলির কথা বলিয়াছি তাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; এবং তৎসংসৃষ্ট পদার্থ—সমাজ এবং ব্যক্তি। আপাততঃ ব্যক্তি জীব হইতে পৃথক বোধ হয় না. আর সমাজ নামক পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মনে করাই কঠিন। কিন্তু এরূপ সন্দেহ এখন কেবল বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করে মাত্র। এইসকল বিভিন্ন বিষয়ের পৃথক পৃথক নিয়ম সমস্তই অলঙ্ঘনীয়। এমন কি ঐ সকল নিয়ম আবিষ্কার ও সপ্রমাণিত করিবার নিয়মও জগতের অলঙ্ঘনীয় নিয়মের মধ্যে পরিগণিত হইতেছে। শেষোক্ত নিয়ম ত্রিবিধ,—যথা ঈক্ষণ (observation), পরীক্ষণ (experiment) এবং পর্য্যবেক্ষণ (comparison)। এই ত্রিবিধ প্রণালীতে যেসকল নিয়ম নির্দ্ধারিত হয় তাহা সকলের পক্ষেই প্রামাণ্য। উহা ঈশ্বর প্রণীত কি না তাহার মীমাংসা করা দূরে থাকুক এরূপ আলোচনাই অপ্র-

সিদ্ধ হইয়াছে; কেন না কার্য্যের কারণ বলিলে ঈক্ষিত ঘটনা সমূহের মধ্যে নিয়ম মাত্র উপলক্ষিত হয়; সেই নিয়মের কারণ জানিবার উপায় ঈক্ষণাদি ত্রিবিধ ক্রিয়ার বহির্ভূত। ফলত ঈশ্বর বিষয়ক কোন স্বতন্ত্র জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারিলেও তদ্দ্বারা প্রাগুক্ত নিয়মের কিম্বা নিয়মিত ঘটনার রূপান্তর করিবার প্রত্যাশা কোন বিবেচক ব্যক্তিই করেন না।

নিয়ম কেমন অব্যর্থ তাহার যৎকিঞ্চিৎ উপরিভাগে ব্যক্ত করা গেল। কিন্তু নিয়ম মানিলেই যে অদৃষ্ট মানিতে হয় তাহা নহে। কিছুই মনুষ্যের স্বেচ্ছাধীন হইতে পারে না, কিন্তু স্বস্ব কার্য্যের উপরে স্বেচ্ছার যথেষ্টই স্থল আছে। কূপ হইতে জল আমার হাতে আসিবে না; কিন্তু আমি জল তুলিতে পারি এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে তুলিতে পারি। দড়ি দিয়া, কপিকল দিয়া এবং হাপিস করিয়া তুলিতে পারি। ফলত শিহ্লনের প্রমাণ পরিত্যাগ করিলেও বৈজ্ঞানিক এবং বিধিনির্দ্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ অনায়াসে উপলব্ধ হইবে। প্রথমত বিধিনির্দ্দিষ্ট নিয়ম আবিষ্কার ও সপ্রমাণ করিবার কোন নিয়ম নাই। আর স্বেচ্ছাচার বিবর্জ্জিত শক্তিকে ঐশী শক্তি বলিলে আর কোন ক্ষতি না হউক, সংজ্ঞা প্রয়োগের বিশৃঙ্খলা হয়। এ দিকে,জ্যোতিষের নিয়ম মানিলে স্বয়ং জগদীশ্বরকেই উপেক্ষা করিতে হয়। আর গ্রহগণের পূজাদ্বারা যদি কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা থাকে, তবে জ্যোতিষের অব্যর্থ নিয়ম স্বেচ্ছানুবর্ত্তী গ্রহগণের অনুপযোগী,এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত বৈজ্ঞানিক নিয়ম কেবল মনুষ্য বুদ্ধির সহিত সম্মিলিত; মনুষ্য ব্যতীত আর কেহ উক্ত নিয়মাবলী স্বীকার করিবে কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। মনুষ্য উল্লিখিত ত্রিবিধ বিচার প্রণালী দ্বারা যেখানে অন্যথা সিদ্ধিশূন্য নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা দেখিতে পান, সেইখানেই নিয়ম অবধারিত করেন। মনুষ্য মাত্রেই এক জাতীয় জীব এবং এক শ্রেণীস্থ নিয়মের বশবর্ত্তী; সেই জন্যই এই সকল নিয়ম সর্ব্ব-বাদী সম্মত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন বিজ্ঞান শাস্ত্রে একবাক্যতা জন্মিবার আর কোন হেতু নাই। আর এই সকল নিয়ম যে মনুষ্য পরম্পরায় গ্রাহ্য হইয়া থাকে অথচ অন্য জীবের গ্রাহ্য এ কথা বলা যায় না,তাহার হেতু এই যে, মনুষ্য-গণ ভাষা এবং দ্বিভাষীর সাহায্যে মনোগত অভিপ্রায় পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিতে ও অবগত হইতে সক্ষম; কিন্তু অন্যান্য জীবগণের সহিত এতাদৃশ সম্বন্ধ স্থাপন হইতে পারে না। স্থূল কথা এই যে মনুষ্য মাত্রেই এক বুদ্ধি ও এক ধর্ম্ম বিশিষ্ট; আর সেই বুদ্ধি ও ধর্ম্মানুসারে যে সকল বৈজ্ঞানিক নিয়ম

অবধারিত হয়, তাহা কেবল প্রাগুক্ত মানবী একতার পরিচায়ক মাত্র। ইহাতে বিধি, বিধাতা কি অন্য কাহারও সংশ্রব নাই। কিন্তু যাহাকে অদৃষ্টাধীন নিয়ম বলা যায়, তাহা কোন অমানুষিক অপরিজ্ঞাত শক্তির প্রাধান্য প্রদর্শন করে এবং সর্ব্বভূতের উপরে তুল্যরূপে বিস্তার করে। এইরূপ বিধি জানিতে কিম্বা আয়ত্ত করিতে পারিলে অনেক সুবিধা হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু আয়ত্ত করা দূরে থাকুক, অদৃষ্টের অব্যর্থ বিধি আছে কি না তাহারই স্থিরতা নাই। সে যাহা হউক, তৃতীয় স্থলে বৈজ্ঞানিক এবং অদৃষ্টাধীন নিয়মের মধ্যে প্রধান বিভেদ এই যে, প্রথমোক্ত নিয়ম বহুবিধ, শেষোক্ত নিয়ম একায়ত্ত। যে যে স্থলে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক নিয়মের বিরোধ দৃষ্ট হয়, সেখানে ঐ সকল নিয়ম অদ্বিতীয় বিধাতার শক্তিজাত বলিয়া বিশ্বাস হইতে পারে না। সুতরাং অদৃষ্ট মানিলে, প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক নিয়ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দৃষ্টি বহির্ভূত নিয়ম (বা অনিয়ম!) লক্ষ্য করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে হয়। প্রাক্তনের উপরে নির্ভর করিলে যে পুরুষকারকে এককালীন বিদায় দিতে হয়, ইহা সহজেই উপলব্ধ হইবে। বৈজ্ঞানিক নিয়ম বহুবিধ এবং পুরুষকারের অধীন। অতএব, উহার সমবায়ী একত্ব স্থাপন করিবার অভিলাষ করিলে পুরুষকার প্রবর্ত্তন করাই বিধেয়; স্বভাবজাত ঘটনাবলির উপরে নির্ভর করা সঙ্গত নহে।

তরল পদার্থ স্বধর্ম্ম এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভাবে সমতল-পৃষ্ঠ হইয়া থাকে। আর অন্যান্য নিয়মানুসারে ভূপৃষ্ঠে খাত প্রণালী আদি নির্ম্মাণ করা যায়। এই সকল বিভিন্ন নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক মনুষ্য পুরুষকার দ্বারা জলাশয় ও জলপ্রণালী সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। এস্থলে যাহারা অদৃষ্টাধীন থাকিয়া জলকষ্ট ভোগ করিত, তাহারা পুরুষকারের সাহায্যে দুর্ব্বিসহ শুষ্কতা হইতে অব্যাহতি পায়। ইতিপূর্ব্বে কূপ হইতে জল তুলিবার উদাহরণেও এই কথা বলা হইয়াছে। এই সকল দৃষ্টান্তানুযায়ী অগণ্য ঘটনাবলি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এই একটি অপূর্ব্ব নিয়ম স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে প্রাকৃতিক নিয়ম অলঙ্ঘনীয় বটে কিন্তু তাহা পুরুষকার দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। তবে জানা আবশ্যক যে, যে পুরুষকার দ্বারা উল্লিখিত নৈসর্গিক ব্যবস্থার রূপান্তর সিদ্ধি হয়, তাহাও নিয়মানুবর্ত্তী। নিগূঢ় কথা, নিয়মগুলি বিভিন্ন; মনুষ্য কেবল এক প্রকার নিয়ম দ্বারা অন্য নিয়ম জাত ঘটনার ব্যত্যয় করিতে পারেন।

অতএব এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত সমাজ-উদ্ধারিত

কর্ত্তব্য সাধনের নিয়ম এবং ব্যক্তি ধর্ম্মানুযায়ী সুখসাধনের নিয়ম—এই নিয়ম দ্বয়ের বিরুদ্ধ ভাব মোচনার্থ পুরুষকার জনিত অন্য কোন নিয়ম অবলম্বন করা যাইতে পারে কি না। পুরুষকার দ্বারা নিয়ম জাত ঘটনার ব্যত্যয় হয় বটে কিন্তু নিয়ম অন্যথা করিবার বাসনা কখনই পুরুষকারের পরিচায়ক নহে। এক নিয়ম দ্বারা নিয়মান্তরের ব্যত্যয় হইতে পারে, কিন্তু অনিয়ম কার্য্য বা যথেচ্ছাচারের দ্বারা কখনই কোন উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব নৈসর্গিক নিয়মহইতে কোন সঙ্কট উপস্থিত হইলে তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য অন্য নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে। নিয়মের নিয়ামক হইবার জন্য নিরন্তর বিনীত ভাবে নিয়মাশ্রয় করাই বিধেয়। পুরুষকার বলিলে নিয়ম লঙ্ঘনকারী যথেচ্ছাচার বুঝায় না। পুরুষকার কেবল প্রগাঢ় বিনয়ই—বিশিষ্ট নিয়ম পালনই—ব্যক্ত করে। কর্ত্তব্য ও সুখসাধন বিধানের মধ্যে যে সঙ্কট প্রদর্শিত হইয়াছে, এইরূপ বিনীত ভাব ব্যতীত, তাহা হইতে বিমুক্ত হওয়া কখনই সম্ভবে না।

সমাজধর্ম্মানুসারে জীবন পরের নিমিত্ত যাপন করিতে হইবে অর্থাৎ ব্যক্তিগণের স্বকীয় স্বার্থপর বৃত্তি অপেক্ষা পরার্থপর বৃত্তিকে অগ্রগণ্য করিতে হইবে। সুখসাধন বিধান মতে চিত্তবৃত্তি অবরোধ করিলেই দুঃখ এবং চরিতার্থ করিলেই সুখ উদয় হয়। সমাজ ধর্ম্ম সুখসাধন বিধানের বিপরীত নহে। কিন্তু অনন্যরূপে সুখসাধন বিধানের উপাসনা করিলে সমাজ ধর্ম্ম রক্ষা করা দুষ্কর হয়। অতএব স্বার্থপর চিত্তবৃত্তিকে দমন এবং পরার্থপর চিত্ত-বৃত্তিকে চরিতার্থও পরিবর্দ্ধিত করাই পুরুষকারের লক্ষ্য স্থল হওয়া উচিত।

উল্লিখিত ব্যবস্থা অভিনিবেশ পূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। ইহাতে প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ হইলে কখনই কার্য্যোদ্ধার হইবে না। এবং প্রাকৃতিক নিয়ম যে ভঙ্গ হইবে না, তাহা সপ্রমাণিত না হইলে, এই নিয়ম কখনই সর্ব্ব-সাধারণের গ্রাহ্য হইবে না। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে পরার্থপর চিত্তবৃত্তি মনুষ্যের প্রকৃতিগত বটে, কিন্তু তাহা স্বার্থপর চিত্তবৃত্তি অপেক্ষা হীনবল। অতএব দেখা যাইতেছে যে যদি সমাজ-ধর্ম্মানুগত কর্ত্তব্যবিধান পালন করা যায়, তবে স্বার্থপর চিত্তবৃত্তির ব্যাঘাত হয় বটে, কিন্তু পরার্থপর বৃত্তি সন্তৃপ্ত হয়। আর যদি ব্যক্তিগত ধর্ম্মানুসারে স্বার্থপরতাকে অগ্রগণ্য করা যায়, তবে তাহার প্রবলতা নিবন্ধন পরার্থপর চিত্তবৃত্তি এবং সমাজ ধর্ম্ম উভয়েরই ব্যাঘাত হয়। যে দিকে যাও একটা নিয়মকে সংকীর্ণ করিতেই হইবে। মনুষ্য

ব্যক্তিগত ধর্ম্ম এবং আভ্যাসিক নিয়মানুসারে স্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতা উভয়কেই সঙ্কীর্ণ করিতে পারেন বটে কিন্তু সমগ্র সমাজ ব্যতীত সমাজাশ্রিত নিয়মের অন্যথা কেহই করিতে পারে না। পক্ষান্তরে সমাজগত পরার্থপরতা খর্ব্ব হইলে সমাজের, আত্মরক্ষারও ব্যাঘাত হয়; সেই হেতু সমাজ-দ্রোহী স্বার্থপর ব্যক্তি অবশ্যই সমাজ কর্ত্তৃক শাসিত হন। অতএব দেখা যাইতেছে যে ব্যক্তিগত সুখাভিলাষ, পরার্থপরতা নিয়মের অধীন হইলেই উভয় কূল রক্ষা হয়; ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা চরিতার্থ হয় এবং সমাজও সন্তুষ্ট থাকেন।

সমাজগত নিয়মানুসারে পরস্পরের যে হিতসাধন হয়, তাহাতে সচরাচর ব্যক্তিগত সংকল্প দৃষ্ট হয় না। লোকে অর্থলালসা প্রযুক্ত শ্রম করে, এবং সেই শ্রম নিবন্ধন অন্যের মঙ্গল সাধন হইয়া থাকে। ইহাতে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা এবং সমাজগত পরার্থপরতা সুসিদ্ধ হয়। কিন্তু যদি এতদ্বিষয়ক নিগূঢ় চৈতন্য লাভ হইলে শ্রমসাধ্য পরোপকারই মুখ্যকল্পে লক্ষিত হয়, তবে বেতন সম্বন্ধীয় স্বার্থসাধন, পরিশ্রমকারীর গৌণ চেষ্টা বলিয়া গণ্য হইবে। ইহাতে স্বার্থপর সুখের কিছু কিছু বিঘ্ন হইতে পারে বটে কিন্তু ব্যক্তিগত বিধানে দ্বিবিধ সুখই কিয়ৎ পরিমাণে লব্ধ হইবে এবং সামাজিক নিয়মটিও রক্ষিত হইবে। ও দিকে স্বার্থপরতাকে অগ্রগণ্য করিলে, অর্থলোলুপ শ্রমকারী নানা কুকার্য্যে রত হইতে পারে। শ্রমসাধ্য কার্য্যে চাতুরি করিতে পারে; অন্য শ্রমকারীর প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও ক্ষতি করিতে পারে এবং শ্রমলব্ধ অর্থ দ্বারাও অনেক কুৎসিত স্বার্থপর কার্য্য করিতে পারে। এইজন্য বলা গিয়াছে যে পরার্থপর সুখাভিলাষকে অগ্রগণ্য করিলে উভয় কূল রক্ষা হইতে পারে।

উল্লিখিত ব্যবস্থার পোষক বলিয়া একটি গূঢ়তত্ত্ব এখানে ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগত ধর্ম্মে পরার্থপর চিত্তবৃত্তি চরিতার্থ হইলে, তদনন্তর স্বার্থপর বৃত্তি পরিতোষেরও যথেষ্ট স্থল থাকে; কিন্তু বিপরীত বিধানে পরার্থপরতার স্থল প্রায় থাকে না বলিলেই হয়। তোমার উদরপূর্ত্তি না হইলে, তুমি তোমার পরিবার পোষণ করিবে না, এরূপ সংকল্প স্থলে, আপনার উপযোগী খাদ্য আহরণের পরে তোমার পরিশ্রম করিবার বাসনা নিতান্ত খর্ব্ব হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু পরিবারবর্গের উদরপূর্ত্তি করিবার পর তোমার আত্ম ক্ষুধা তৃপ্তির কোন বাধা দৃষ্ট হয় না। স্বার্থপরতার আতিশয্য বশত শেষোক্ত গৌণ কল্পটি প্রতিনিয়ত সুসিদ্ধ হয়, এবং মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে তাদৃশ শৈথিল্য জন্মিতে পারে না। আর এই প্রণালিতে পুরুষকার এবং

সমাজের হিত উভয়েরই যথেষ্ট পথ থাকে। ফলত এই গূঢ়তত্ত্ব এমন বিচিত্র, যে গৌণভাবে সর্ব্ব প্রকার স্বার্থপর চিত্তবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইতে পারে। অথচ তাহার অতি বৃদ্ধি হইতে পারে না, অথচ পরার্থপরতার যথাযোগ্য পরিবর্দ্ধন হইতে থাকে। কিন্তু মুখ্য কল্পে স্বার্থপরতার পরিপোষণ হইলে নানা বিপ্লব উপস্থিত হয়। যতিগণ কেবল মোক্ষ সাধন বিষয়ে স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া পরার্থপরতাকে জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন, কিন্তু গৃহস্থ সমাজধর্ম্মমতে পরার্থপরতা আশ্রয় করিলে আপন পরিবার এবং যতি উভয়কেই আশ্রয় দান করেন। ইহার উপরে গৃহস্থ যদি যতির আদর্শ মতে স্বার্থপর সুখে বিরাগী হন অথচ পরার্থপরতার সংকল্প বলবৎ রাখিতে পারেন, তবে তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইবে; হইলে পুণ্য এবং সুখ উভয় বিষয় সঞ্চয় করিবার অপূর্ব্ব ক্ষমতা জন্মিবে। অতএব সুখাভিলাষ সমাজগত পরার্থপরতার অধীন করাই বিধেয়, ইহা স্থির করা গেল। কিন্তু এই নিয়ম কে প্রচলিত করিবে, কিসের বলে উহা প্রতিপালিত হইবে?

কতকদূর পর্য্যন্ত সমাজ স্বয়ং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এই কার্য্য সুসিদ্ধ করিয়া থাকেন। গুরু পদার্থ যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বশত নিম্ন স্থান অধিকার করে, সমাজও সেইরূপ স্বীয় বলদ্বারা ব্যক্তিগণের গুরুতর স্বার্থপরতা নিবারণ করিয়া রাখেন। জগতে ধর্ম্মশাসন থাকুক আর নাই থাকুক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানুক আর না মানুক, মনুষ্যকে সমাজে থাকিতেই হইবে এবং থাকিয়া সমাজ শাসনের অধীন হইতেই হইবে। দস্যু, প্রবঞ্চক, ব্যভিচারী ব্যক্তিরা সকল সমাজেই দণ্ডার্হ হয়।

মনুষ্য ব্যক্তিভাবে স্বানুবর্ত্তী এবং সমাজাধীন বলিয়া পরানুবর্ত্তী হয়। যে পরের বুদ্ধিকে আপন বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া পরানুবর্ত্তী হয়, তাহার দ্বারা সমাজের জমাট ভাব পরিবর্দ্ধিত হয়; তাহার কার্য্যগতিতে ব্যক্তিরূপ পরমাণু সকল পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অতএব এতাদৃশ ব্যক্তিকে সুবোধ বলিয়া মানিতে হইবে। যে আপন বুদ্ধির ন্যূনাতিরেক বিচার করিতে অক্ষম, সে ইচ্ছাক্রমে হউক আর অনিচ্ছাক্রমেই হউক, অগত্যা পরানুবর্ত্তী হইয়া থাকে। তাহার চিত্তে স্বার্থপর বৃত্তির উদ্রেক হইলে সে আপন যূথপতিকে আশ্রয় করে। নতুবা তাহার স্বার্থপরতা হেতু গৃহধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম উভয়ই উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে। এতাদৃশ ব্যক্তির গুরুতর দোষগুলি সমাজ কর্ত্তৃক অবাধে নিবৃত্ত হয়। বিশেষ অত্যাচার করিলে ইহারা সমাজ কর্ত্তৃক নানাবিধ উপায়ে উৎপীড়িত হইয়া

থাকে। অতএব সমাজ শাসন দ্বারা প্রবল স্বার্থপরতা স্বভাবতই খর্ব্বীকৃত হইয়া থাকে।

কিন্তু ব্যক্তিগণের সামান্য দোষ বহুতর। সমাজ তাহা স্বীয় পরার্থপরতা গুণেই সহ্য করিয়া থাকেন। সমাজ তস্করকে শাসনে রাখেন কিন্তু পরভাগ্যোপজীবি কৃমিগণের কিছুই করেন না। ব্যভিচারী গৃহস্থকে আক্রমণ করিলে সকলেই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, কিন্তু লম্পট ও বেশ্যার উৎপাত দেখিয়া চুপ করিয়া থাকে। সমাজ এইরূপ নানা অপরাধ ক্ষুব্ধ চিত্তে সহ্য করিয়া থাকেন্। সহ্য করেন বটে কিন্তু কেবল কালের উন্নতি সাপেক্ষ হইয়াই এইরূপে সহ্য করেন। এই সকল কীটগণের দংশন হেতু সমাজ কেবল আত্ম দেহ কণ্ডূয়নেই ব্যাপৃত থাকেন এবং এইরূপ পীড়া না হইলে যে সমস্ত মহৎকার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেন, তাহার প্রতি নিরুদ্যম হইয়া পড়েন। সুতরাং এই সকল কারণ বশত সমাজ শরীরের ক্রমোন্নতি কেবল মন্দগামী হইয়া উঠে।

সমাজের কার্য্য এবং ব্যক্তির কার্য্য মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। ইতিপূর্ব্বে হীনবুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা বলা গিয়াছে, অতঃপর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তির আচরণ বিবেচনা কর। এতাদৃশ ব্যক্তি স্বার্থপর হইলে ছলে বলে অন্যের উপরে কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করে। কিন্তু তাহার পরেও যদি তাহার স্বার্থপরতা পূর্ব্ববৎ প্রবল থাকে, তবে তাহার অধীন ব্যক্তিরা নিরাশ্রয় হইয়া তাহার বৈরসাধন করিতে চেষ্টা করে; সুতরাং প্রধান এবং অধীন মধ্যে পরস্পরের জমাটভাব চূর্ণ হইয়া যায় এবং অন্য ব্যক্তি প্রভুত্ব স্থাপন করিবার পথ দেখিতে থাকে। আর যদি সেইব্যক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী স্বার্থপরতা দমন করিয়া আশ্রিতবর্গের পালন করিতে থাকে, তবে তাহার প্রাথমিক দোষের অনেক অপনয়ন হইয়া যায়। সচরাচর এইরূপ ঘটনাই দৃষ্ট হয়; সমাজের নিয়মই এই যে শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃত্ব লাভ করিবার পরে সতত শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমন করিয়া থাকেন। এই ব্যাপারে মনুষ্য ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা নিবন্ধনই প্রথমত প্রবৃত্ত হন, অনন্তর সমাজ ধর্ম্মানুসারে পরার্থপর আচরণে ব্যাপৃত হন। এই সকল মনুষ্যের ব্যক্তিগত প্রকৃতি পরার্থপর হইলে মঙ্গলের পরিসীমা থাকে না। তাঁহাদিগের বিশিষ্ট পরার্থপর প্রভুত্ব হইতে সাধুগণের পরিত্রাণ ও অসাধুগণের বিনাশ সাধন হয় এবং তাঁহারা সত্য সত্যই নারায়ণের অবতার স্বরূপ হইয়া উঠেন। অতএব প্রভুভাবে হউক অথবা ভৃত্যভাবে হউক

উভয় স্থলেই ব্যক্তিগত গুরুতর অত্যাচার সমাজ কর্ত্তৃক নিবারিত হয় এবং উভয় স্থলেই সামাজিক পরার্থপরতা দ্বারা জগতের মঙ্গল হয়; হীনবুদ্ধি ব্যক্তি, যুথপতির অনুবর্ত্তী হইয়া এবং স্বানুবর্ত্তী প্রভু, বিপ্লবের আশঙ্কা বশত আশ্রিত পালন করেন। তাহাতেই সমাজ রক্ষা পায়। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রকৃতির উন্নতি অর্থাৎ স্বানুবর্ত্তিতার পরিবর্দ্ধন সহকারে কথন স্বার্থপরতা কথন বা পরার্থপরতার শ্রীবৃদ্ধি হয়। তবে সুখসাধন বিধান মতে স্বানুবর্ত্তী ব্যক্তিকে যে স্বার্থপর বা যথেচ্ছাচারী হইতেই হইবে এমত নহে। আমার ব্যক্তিগত প্রকৃতি সমাজধর্ম্মানুসারে উন্নতি লাভ করুক এই অভিপ্রায় হইলে স্বানুবর্ত্তী ব্যক্তিকে স্বভাবতই নিয়মানুবর্ত্তী হইতে হইবে। কেন না তদ্ভিন্ন হয় ব্যক্তিগত সুখসাধনের ব্যাঘাত, নচেৎ ব্যক্তি ও সমাজ বিধানানুযায়ী পরার্থপরতার পথ রোধ হইবে।

ব্যক্তিগণের স্বধর্ম্মই স্বানুবর্ত্তিতা। স্বানুবর্ত্তিতা ব্যতীত সুখ সাধন হয় না। কিন্তু স্বানুবর্ত্তী ব্যক্তি সমাজের নিকট এবং সমগ্র প্রাকৃতিক নিয়মের নিকট বিনয়াবনত না হইলে কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ করিতে পারেন না। আর তিনি নিয়মানুসারে পরচ্ছন্দানুবর্ত্তী না হইলে সমাজ ও ব্যক্তিবর্গের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন হইতে পারে না। অতএব বিবেচ্য এই যে স্বানুবর্ত্তী ব্যক্তির পক্ষে নিয়ম কি? স্বানুবর্ত্তী ব্যক্তির নিয়মও স্বানুবর্ত্তিতা; কেবল নূতন কথা এই যে স্বানুবর্ত্তী ব্যক্তি পরার্থপর হইলেই পুরুষকার সুসিদ্ধ হয়। তাদৃশ ব্যক্তির নিয়ম স্বকৃত, স্বীয় মনোবৃত্তির ফল, এবং যাবতীয় বৈজ্ঞানিক নিয়মের অনুবর্ত্তী। পরানুবর্ত্তী ব্যক্তি অগত্যা পরার্থপর হইয়া থাকে। তাঁহার পক্ষে এতদ্বিষয়ক চৈতন্য লাভই স্বানুবর্ত্তীতার পরিসীমা। আমার দ্বারা পরের মঙ্গল সাধন হইতেছে, এইরূপ চৈতন্য স্থলে পরের দাসত্ব সত্ত্বেও স্বানুবর্ত্তিতা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। অতএব কি স্বানুবর্ত্তী কি পরানুবর্ত্তী উভয়ের স্বকৃত বা স্বীকৃত পরার্থপর নিয়ম অবলম্বন দ্বারাই কর্ত্তব্যসাধন ও সুখসাধনের সমবায়ী ব্যবস্থা সুসিদ্ধ হয়। এরূপ প্রতি-ব্যক্তি-কৃত স্বীয় জীবনব্যাপী নিয়মই জীবনের মহাব্রত। এই ব্রত রচনা করিবার বিধান-কেই ব্রততত্ত্ব নামে ব্যক্ত করিয়াছি। ইহাতে জগতের সকল নিয়ম স্বীকার করিতে হয়। আবার স্বীয় পুরুষকারের উপরে নির্ভর করিয়া ঐ সকল নিয়মের রূপান্তর করিতে হয়। পুরুষকারের তারতম্য অনুসারে ব্যক্তিকৃত মঙ্গলের ন্যূনাতিরেক হয়। কিন্তু ব্রত ব্যতীত পুরুষকারের স্থল কুত্রাপি থাকে না।

ব্রত শব্দের অর্থ নিয়ম; এবং সমস্ত জগৎও নিয়মের অধীন। উভয়ের মধ্যে

ভেদ এই যে নৈসর্গিক নিয়ম মনুষ্যের আবিষ্কার; ব্রত ব্যক্তির স্বকৃত আত্ম সম্বন্ধীয় নিয়ম। জ্ঞান, নৈসর্গিক নিয়মের দর্শন স্বরূপ। ব্রত, দূরদৃষ্টি এবং পরিণামদর্শিতার পরিচায়ক। পরার্থপরতা, জীবন ব্রত; আর ধর্ম্মোপাসনা তাহার অবান্তর ব্রত। যেরূপ দর্শন, যেরূপ জ্ঞান এবং জীবনব্রত যেরূপ, তদনুসারে সেই সকল অবান্তর ব্রত অবলম্বন করিতে হয়। অভ্যাস-সহকারে সেই সকল ব্রত নিবন্ধন ব্যক্তিগণ অন্যান্য বস্তুর ন্যায় নিয়মাধীন হইয়া উঠেন।

নিয়ম ধরিলে তাহার অনুসরণ কার্য্যই অবিরোধী-জীবনযাত্রা-পদে বাচ্য হয়। কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতে থাকিলেই ক্রিয়াগত সুখের উদ্দীপন হয়। স্বার্থপরতা পদে পদে অন্যের নিকট ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয়; সুতরাং স্বার্থপর ব্যক্তির নির্ব্বিরোধী কার্য্য এবং তজ্জনিত সুখ অসম্ভাবিত। নিজের নিয়ম নিজে করিলেই তাহাকে ব্রত বলে। স্বকৃত নিয়মে একবারে স্বার্থপরতা থাকিবে না, এরূপ মনে করা ভুল; কিন্তু সঙ্কল্পস্থলে পরার্থপরতাকে অগ্রগণ্য করাই ব্রতের বিধান, আর পরার্থপরতাকে অগ্রগণ্য করিবার জন্য স্বার্থপরতাকে সতত দমন করিবার চেষ্টাই পুরুষকারের প্রধান অঙ্গ। ব্রত স্বকৃত এবং স্বীকৃত হইলেই সতত ক্রিয়াসুখের উদ্দীপন করিয়া থাকে। আর উহার উদযাপন স্থলে নানাবিধ কাম্যসুখেরও উৎপত্তি হয়। অতএব স্বার্থপরতা দমন ব্রত হইতে যেমন ক্রিয়াগত সুখের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ আবার অভ্যাস দ্বারা ঐ বিষয়ে যত সিদ্ধি লাভ হয়, ততই পরার্থপরতার প্রভাব এবং কর্ত্তব্য বিধানের উন্নতি হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তবৃত্তি পরিতোষের সুখলাভ হয়। এতদ্ভিন্ন ব্রত পরার্থপর হইলে ব্যক্তিগত এবং সমাজগত নিয়ম, সমস্তই প্রতিপালিত হয়। ব্রতের সংকল্প কালে সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। সুতরাং ইহার জন্য সর্ব্বপ্রকার নিয়ম পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

অতএব জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি ব্যক্তিচরিত্রের এই ত্রিবিধ শক্তিই ব্রতের দ্বারা সঞ্চালিত হয়। কেবল সঞ্চালিত হয় তাহা নহে। ব্যক্তিচরিত্র ব্রতনিষ্ঠ হইলে তাহাতে অল্পাধিক পরিমাণে ঐকান্তিক ভাব নিবর্ত্তিত হয়। সেই একাগ্রতা হেতু উল্লিখিত ত্রিবিধ শক্তি একত্রিত হইয়া উঠে। জগতের নিয়ম বহুবিধ। তাহা কেবল ব্যক্তির মনেই একত্রিত হইতে পারে কিন্তু এতাদৃশ একত্ব কেবল চৈতন্যের আকারে পরিণত হইলে ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তির সঞ্চালন অথবা পুরুষকারের স্থল থাকে না।

প্রাগুক্ত সর্ব্বব্যাপার বিস্তৃত চৈতন্য, ব্যক্তি চরিত্রে ব্রতাকারে পরিণত হইলে একপ্রকার অদ্বৈত ভাবের সঞ্চার হয়। ফলত কেবল এই উপায় দ্বারাই ব্যক্তি ও সমাজের অদ্বৈত ভাব স্বতন্ত্র এবং অভিন্ন ভাবে বিকাশিত হইতে পারে। এবং বিচার করিলে প্রকাশ হইবে যে এইরূপ উপায় ব্যতীত নিশ্চয়াত্মক অদ্বৈত ভাব কখনই চৈতন্য গোচর হইতে পারে না।

এখন একবার ব্যক্তিকৃত ব্রত, অর্থাৎ সমাজধর্ম্মোচিত কর্ত্তব্যতা ও ব্যক্তিগত সুখসাধন এতদ্বয়ের সমবায়ী নিয়ম, এবং ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য নিয়ম, এই দ্বিবিধ নিয়ম মধ্যে সংক্ষিপ্ত তুলনা করিয়া দেখ। দেখিয়া বিবেচনা কর যে উভয়ের মধ্যে যথাযোগ্য ঐক্য সংস্থাপিত হইল কি না; এবং তাহাতে হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী ব্রত সমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব কি অসাধারণ প্রতিভা ব্যক্ত করিতেছে।

আমরা বস্তুর বস্তুত্ব কি, তাহা জানি না, কেবল phenomena, ফিনমিনা, অর্থাৎ গোচর বিষয় উপলব্ধ করিতে পারি; 'গোচর' বলিতে যাহা ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে তাহাই বুঝায়; বস্তুর বস্তুত্ব ইন্দ্রিয়ের অগোচর। নিয়ম কেবল সেই গোচর বিষয়ের মধ্যে অন্যথাবিহীন পূর্ব্ববর্ত্তিতা ব্যক্ত করে। এইরূপ নিয়মই বিজ্ঞান শাস্ত্রের একমাত্র সম্বল। পরন্তু বস্তু কি, তাহার বিষয় কোন স্থিরবুদ্ধি করিতে হইলে, আমরা কেবল বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক প্রতি নিয়মাবলীর আধেয় ভাবিয়া এক একটি বস্তু কল্পনা করিয়া লইতে পারি। কিন্তু নানা নিয়মাবলীর মধ্যে এত বিভেদ যে এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার অদ্বৈত আধেয় কল্পনা করিতে পারেন নাই। কেহই এরূপ কল্পনা করিতে কৃতকার্য্য হন নাই যে অমুক অমুক নিয়মগুলি একটি বস্তুতে একত্র বিদ্যমান আছে এবং কেবল তাহা হইতেই অবস্থা ভেদে অন্যান্য সমস্ত নিয়মের সঞ্চালন হয়। এই প্রণালী মতে তত্ত্বানুসন্ধান যারপর নাই সংক্ষেপ করিয়া আনিলেও, মনুষ্য এবং বহির্জ্জগত বিষয়ক, দ্বিবিধ নিয়মাবলী এবং তাহার আধেয় দ্বিবিধ বস্তু, বলিয়া এক প্রকার দ্বৈতবাদ স্বীকার করিতে হয়। এই দুই মহাবস্তু ঘটিত দ্বৈতবাদ হইতে অব্যাহতি দেখা যায় না। অদ্বৈতবাদ কেবল মনুষ্যের অন্তরেন্দ্রিয় মধ্যে বিরাজ করে। মনুষ্য, বহির্জ্জগতের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারেন না কিন্তু সেই সকল নিয়ম জানিয়া বহির্জ্জগতের উপরেও প্রভুত্ব করেন। মনুষ্যের উপরে বহির্জ্জগতের প্রভুত্ব একেবারে অপ্রতিহত হইলে পুরুষ-কারের স্থল থাকিত না।

বহির্জ্জগতে গণিত এবং পদার্থ বিষয়ক দ্বিবিধ নিয়মাবলী। এক একটি নিয়মাবলী ধরিয়া একটি এক শাস্ত্র। গণিত শাস্ত্র ত্রিবিধ, যথা;—সংখ্যা গণিত, ক্ষেত্র গণিত এবং গতি-গণিত। পদার্থ শাস্ত্রের দ্বিবিধআধেয়—নভোদেশ এবং পৃথিবী। পার্থিব পদার্থ আবার দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। তন্মধ্যে এক শ্রেণির নিয়মাবলিতে মনুষ্যের চেতনা ভেদে তৌল, তাপ, শব্দ, আলোক এবং তড়িৎ এইরূপ অবান্তর বিভাগ দৃষ্ট হয়। এতদ্বিষয়ক শাস্ত্রগুলির একত্রিত নাম ভূতবিজ্ঞান (Physics proper)। পার্থিব পদার্থের দ্বিতীয় শ্রেণিস্থ নিয়ম রসায়ন শাস্ত্রের অন্তর্গত। আপাতত রাসায়নিক নিয়মের সহিত জীবতত্ত্বের বিশেষ নৈকট্য অনুমান হয়। কিন্তু জীবন অতি বিচিত্র বিষয়। রাসায়নিক নিয়মে কখন যে উদ্ভিদ কি প্রাণীর জীবন বিষয়ক মূলতত্ত্ব ব্যাখাত হইবে, এতাদৃশ প্রত্যাশা করা ভুল। এইজন্য দ্বিবিধ মহা বস্তুর মধ্যে সমগ্র জড় বিভাগ একত্রিত করা গিয়াছে; এবং সর্ব্ব-প্রকার সজীব পদার্থ দ্বিতীয় সংখ্যাতে মানবী শাস্ত্র নামে গণ্য করাই বিধেয়।

এই মানবী শাস্ত্র নামক শ্রেণিতে প্রথমত উদ্ভিদ ও প্রাণি সম্মিলিত জীবতত্ত্ব, দ্বিতীয়ত নরপুঞ্জাবলী বা রাজ্য উপলক্ষে সমাজতত্ত্ব, এবং সর্ব্ব শেষে ব্যক্তিতত্ত্ব, এই ত্রিবিধ শাস্ত্রের নিয়মাবলি দৃষ্ট হইবে। এই সমস্ত নিয়মাবলি বা তাহার আধেয় বস্তুর পর্য্যায় পর্য্যবেক্ষণ করিলে উপলব্ধি হইবে যে, ভূতবিজ্ঞা-নের সহিত রসায়ন শাস্ত্রের যেরূপ সম্বন্ধ, সমাজ বিষয়ক নিয়মের সহিত ব্যক্তি বিষয়ক ব্রতের সম্বন্ধও তদনুরূপ। ভূত বিজ্ঞানোক্ত তৌল তাপাদি বিষয়ক নিয়ম, সমস্ত পদার্থেই বিদ্যমান, কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্ত্তন তদনুসারে সুসিদ্ধ হয় না। রাসায়নিক নিয়মে কেবল পদার্থের পরমাণু সমস্ত পরস্পরের সহিত সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয়। আর মানবী শাস্ত্রাদি মধ্যেও দৃষ্ট হইবে যে ব্যক্তি-গণ পরমাণুর সদৃশ। সমাজ, সেই ব্যক্তিরূপ পরমাণুর জমাট অবস্থা, আর তাহা ভৌতিক পদার্থের ন্যায় বিভিন্ন নিয়মের দ্বারা সঞ্চালিত হয়। ব্যক্তিগণের নিয়মই ব্রততত্ত্ব এবং উহা রাসায়নিক নিয়মের ন্যায় অতীব সূক্ষ্ম। ব্যক্তিগণ প্রধানত স্বকৃত এবং স্বীকৃত ব্রত দ্বারা সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করে। সেই সকল নিয়ম বা ব্রত সুপ্রণালি বিশিষ্ট হইলে সমাজের যেরূপ রমণীয় ভাব উদয় হয়, কুপ্রণালী বিশিষ্ট হইলে তাহা কোন মতেই সম্ভবে না। সমাজ স্বকীয় নিয়মানুসারে কালস্রোতে, প্রবাহিত হয়। সমাজের নিয়ম ভূত-বিজ্ঞানের অনুরূপ। এতদ্বারা ব্যক্তিরূপ পরমাণ, ইচ্ছাপূর্ব্বক হউক বা

অনিচ্ছাপূর্ব্বক হউক, নিরন্তর শাসিত হয়। এবং যেমন উহার আদর্শ তাপ তৌলাদির নিয়ম, রসায়ন শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া সর্ব্ববিধ পরমাণু সমষ্টিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে; সেইরূপ জমাট-সমাজের নিয়ম পরমাণুরূপ ব্যক্তি সংক্রান্ত নিয়মকেও অতিক্রম করে। তুমি যদি জল ও দ্রাবক একত্র করিয়া দমকল চালাইতে চেষ্টা কর, তবে তাহার প্রক্রিয়া নিবারিত হইবে না বটে কিন্তু যন্ত্রটি অবিলম্বে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। সমাজেও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। সমাজে বিভিন্নব্রত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও বাহ্যত একত্রিত কার্য্য করিতে পারে। এবং একত্র থাকিয়া স্ব স্ব ব্রত মতে এবং পরার্থপর কার্য্য ও স্বকীয় সুখসাধন উভয়ই নির্ব্বাহ করে বটে, কিন্তু ব্রতের বিশৃঙ্খলতা হেতু এই ফলোদয় হয় যে যুগে যুগে সমাজ যন্ত্র বিকল হইয়া নানা উৎপাত ঘটিয়া থাকে। এই কথা কেবল কাব্যালঙ্কার স্বরূপ নহে। ইঁহার প্রমাণস্থল সমগ্র জগতের পুরাবৃত্তে বিদ্যমান।

ফিনিসিয়া ও কার্থেজ দেশের সমাজ উপরোক্ত কারণে বিনষ্ট হইয়াছে। গ্রীসের সমাজ, ফিনিসিয়া এবং মিশর দেশের গুণগ্রাম স্বায়ত্ত করিয়া আপন শরীরে বুদ্ধিবৃত্তির অসাধারণ উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু রোম আবার গ্রীসের চিন্তামার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রিয়ামার্গে প্রবিষ্ট হন। অনন্তর রোমের যুদ্ধ ও শাসন প্রণালী ইদানিন্তন ইউরোপীয় রাজ্য সমূহ অধিকার করিয়াছে। ইহাতে গ্রীসের বুদ্ধি এবং রোমের চেষ্টা, উভয়ই প্রকারান্তরে সজীব রহিয়াছে। ফিনিসিয়া ও কার্থেজ নির্ব্বংশ হইয়াছে; কিন্তু রোম ও গ্রীস দেশস্থ সমাজের জীবন বিনষ্ট হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। ঊর্দ্ধ সংখ্যা বলিতে পার যে গ্রীস এবং রোম গুটিপোকার ন্যায় রূপান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাপতি হইয়া সমগ্র ইউরোপে বিচরণ করিতেছে। ফলত আদ্যোপান্ত লক্ষ্য করিলে মানিতে হইবে যে, মিসর হউক, কিঁ ফিনিসিয়া হউক, এইরূপ কোন বীজসম্ভূত হইয়া ইউরোপ প্রথমত এথেন্স গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, করিয়া এখন এত দিগন্তব্যাপী হইয়াছেন। ইউরোপের মাহাত্ম্য ইউরোপীয় দিগের ব্যক্তিগত চরিত্র ভিন্ন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সেই চরিত্রে কার্য্য কুশলতা এবং ক্রিয়া বিষয়ে ব্যক্তিগত ব্রতের অনুষ্ঠান ও পালন দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ইউরোপের জীবনযাত্রা সবিস্তরে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে, মধ্যকালীন ও বর্ত্তমান ইউরোপের পুরাবৃত্তে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে এবং তাহাতেও এতদ্বিষয়ক আলোচনা সমাপ্ত হইবে না। কেন না ইউরোপের

এখন পূর্ণবয়স। তথাকার ভাবী অবস্থা বিষয়ে নিশ্চিত কথা কাহারো বলিবার সাধ্য নাই। এবং ইউরোপের ভাবী অবস্থা কল্পনা করিয়া তথাকার বর্ত্তমান ক্রিয়া কলাপ হইতে উপদেশ গ্রহণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। যদি ইউ-রোপের জীবন ক্ষয় হয় তবে এরূপ উপদেশ বৃথা হইবে। সুতরাং ইউরো-পের পথে চলিলেই সমাজ শরীরের সর্ব্বাধিক দেহ পুষ্টি হইবে, একথা অবধারণ করাও অসাধ্য।

জড়পদার্থে জীবনের সংস্রব নাই। সজীব পদার্থের জীবনান্তে দেহ ক্ষয় হয়। কিন্তু সমাজের জীবন আর এক প্রকার। উহা কখন সজীব বস্তুর ন্যায় বিলুপ্ত হয়, কখন গুটিপোকার ন্যায় পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নানা অবস্থা ধারণ করে এবং কখন বা নিতান্তই অমরতা বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। ফলত যে কারণে সমাজে ব্যক্তিগত দোষ সমূহ প্রশ্রয় পায়, তাহাই সমাজের গুণগ্রামের বিঘ্নকারক এবং তাহাতেই সমাজদেহ ক্ষত,লুপ্ত অথবা বিনষ্ট হইয়া যায়। ইউরোপ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিতে অপূর্ব্ব গুণসম্পন্ন হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি কেহ মনে করেন যে ইউরোপেই সভ্যতার সীমা শেষ হইয়াছে, ইউরোপের প্রকৃতিতে দোষ নাই, ইহাই জগদ্বিস্তীর্ণ হইয়া নরচরিত্রের আকাঙ্ক্ষিত অমরতা লাভ করিবে, তবে তাঁহার ভ্রম হইয়াছে। আর যে কোন বিষয়ে দ্বিধা থাকুক, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, গ্রীসে প্রথমত ইউরোপ ও এসিয়া উভয় মধ্যে যে ভয়ানক যুদ্ধকাণ্ড প্রজ্বলিত হইয়াছে, উহা কখনই সর্ব্বতোভাবে মাঙ্গলিক নহে এবং আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি, সেই বৈরভাব এপর্য্যন্ত নির্ব্বাপিত হইল না। ঐ যুদ্ধে এসিয়ার দোষ স্বীকার করিতে সম্মত আছি। ঐ যুদ্ধ না হইলে হয় তো গ্রীস বিনষ্ট হইয়া এসিয়ার কুচরিত্র ইউরোপ ব্যাপী হইতে পারিত। কিন্তু গ্রীসের গুণে তাহা হইতে পারে নাই বলিয়া যে আলেকজন্দর ও সিলিউকসের মদগর্ব্বের এখনও প্রশংসা করিতে হইবে, এবং গ্রীসের নানাবিধ মহদ্গুণ ছিল বলিয়া যে সেই সমরানল অধুনাতন ইউরোপীয় বাণিজ্যের অঙ্গ হইয়া উঠিবে, ইহা কখনই জগতের মঙ্গলজনক হইতে পারে না। ইউরোপ যদি একথা বুঝিতে পারেন তবে তদ্দেশের সমাজ শরীরে আর একবার গুরুতর পরিবর্ত্তন হইবে। এবং অন্তত সেই পরিবর্ত্তনের প্রতীক্ষাতে ইউরোপের অনুকরণ কার্য্যে আমাদিগের কিছুদিন বিরত থাকা আবশ্যক হইতেছে। সে যাহা হউক যে পর্য্যন্ত বলা গেল তাহাতে বুঝা

যাইবে যে, ব্যক্তিগত চরিত্রের দোষগুণ দ্বারা অর্থাৎ ব্রতের ফলাফল অনুসারে, সমাজ-জীবনের কত অবস্থান্তর হয়। তাহা পাশ্চাত্য পুরাবৃত্তে ব্যক্ত হইয়া আছে।

অনন্তর এসিয়ার প্রতিদৃষ্টি করা যাউক। এসিয়ার কথা বলিলে আমাদিগের ভারতের কথাই মনে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ইউরোপের কুচরিত্র দেখিয়া অনেকে ব্রাহ্মণের ঔদার্য্য ভুলিয়া যান; এমন কি, ব্রাহ্মণের পৌরুষ ব্যক্ত করিবার জন্য আর্য্যজাতিকে ইউরোপীয়ের ন্যায় জিগীষা পরবশ না মনে করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। এরূপ কথার প্রতিবাদ করাও কঠিন। ভারতে যে প্রণালীতে সমাজ জীবন সঞ্চালিত হইয়াছে, বর্ত্তমান অবস্থাতে তাহার বিচার করা দুর্ঘট, কেন না আমাদিগের দেশের পুরাবৃত্ত নাই। এমন কি যে প্রণালিতে সামাজিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে ক্রমশ পুরাবৃত্তের উদয় হয়, হইয়া সমাজতত্ত্ব রচনা করিবার পথ গঠিত হয়, সেই প্রকার record রিকার্ড করিবার প্রণালিও এতদ্দেশে পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। ফলত এ কথাতে বোধ করি কেহই দ্বিরুক্তি করিবেন না, যে আমরা যদি সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইতাম তবে ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদিগের তপ-কামনার প্রতি এত হন্তারক হইতেন না, ব্রাহ্মণ বৌদ্ধের বিরোধ এত প্রবল হইত না, এবং ব্রাহ্মণ শিক্ষিত রাজধর্ম্মাবলম্বীরাও এত অকর্ম্মণ্য হইতেন না। ইদানিন্তন সুশিক্ষিত মহাশয়েরা আর্য্যজাতির কল্পিত জিগীষার বৃথা আন্দোলনে ব্যাপৃত না হইয়া যদি হিন্দু ও রোমক উপদেশগুলি একত্রিত করিতে চেষ্টা করেন, এবং যদি এইরূপ সংযুক্ত প্রণালীতে ধর্ম্মাত্মিক সমাজ শাসন সংস্থাপন করিতে অনুরক্ত হন, তাহা হইলে যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অমরতা পাইতে পারিবে। আমার স্থূল কথা এই যে ব্যক্তিচরিত্র নিবন্ধন ইউরোপীয় বা রোমক শাসনে ধর্ম্ম করে নাই, হিন্দুদিগের ধর্ম্মে রাজ্য শাসনের সুকৌশল উদ্ভাবিত হয় নাই। হিন্দুদিগের এই দোষ হেতু এসিয়ার সমাজে রাজ্য ও রাজ্যের মধ্যে সুকৌশল সম্পন্ন প্রীতি জন্মে নাই। এসিয়ার কথা দূরে থাকুক, এই দোষেই ভারত মধ্যে এত রাজভেদের আতিশয্য এবং বঙ্গবাসী হিন্দু মুসলমান উভয়ে এক কর্ত্তার অধীনতা স্বীকার করিতে পারেন না। ফলত দুহাজার বৎসর পূর্ব্বে সেই সেলামিসের (Salamis) সংগ্রামে গ্রীস যে পারসিক নবাড়া ধ্বংশ করিয়াছেন, সেই অবধি আমাদিগের রাজধর্ম্মের হীনতা স্বীকার করিতে হইবে। আমরা যতই প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের গর্ব্ব করি, সেই শাস্ত্র যখন রক্ষা করিতে পারি

নাই—যখন আজি ইংরাজের নিকট ঋণ স্বীকার পূর্ব্বক সেই শাস্ত্রের দোষ গুণ বিচার করিতে বসিয়াছি, তখন আর রাজ-গর্ব্ব আমাদিগের শোভা পায় না। প্রস্তাবিত দোষ আমাদিগের ব্যক্তিগত চরিত্রে সর্ব্বত্র ব্যক্ত রহিয়াছে। রাজায় রাজায় যেমন; জ্ঞাতিবর্গ, গ্রাম্যদল এবং একান্নবর্ত্তী পরিবার মধ্যে সর্ব্বত্রই সেইরূপ আত্মবিচ্ছেদ। সর্ব্বত্রই এক প্রণালীর দূষিত শাসন।

এই ভারতের মাহাত্ম্য কিসে উৎপন্ন হইয়াছে? ভারত ব্রাহ্মণের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াই এত বড় হইয়াছিলেন। তাহার একটি প্রধান অঙ্গ বৈরাগ্য। আর হিন্দুগণের বৈরাগ্য মধ্যে সার কথা ব্রততত্ত্ব। আমরা কোন ব্রত করিলে তাহার উদ্যাপন না হওয়া পর্য্যন্ত অনন্যচিত্তে সেই ব্রত পালন করিতে পারি। ব্রতের মর্ম্ম বুঝি না। বালিকাগণ শৈশবকালে সাঁজতি পূজার ব্রত করে; পতি শোকাতুরা বিধবা ব্রহ্মচর্য্য বা সহমরণ ব্রত করেন এবং পরমহংসেরা জিহ্বা হইতে দোষ বিশিষ্ট কথা নিষ্ক্রান্ত করিলেই অমনি মৌন ব্রত করিয়া স্বস্ব চরিত্র সংস্কার করেন। ব্রতের তত্ত্ব যেরূপ হউক আমরা ব্রত করিতে বিলক্ষণ শিখিয়াছি তাহার সন্দেহ নাই। এবং এই নিমিত্ত ভারত বা এসিয়ার ব্যক্তি চরিত্র এমন মনোহর। অন্তত আমাদিগের চক্ষে এমন চিত্তরঞ্জক দেখায়, যে তাহার ধ্বংশ কদাচ সম্ভাবিত মনে হয় না। হিন্দুগণ নির্ব্বংশ হইতে পারেন কিন্তু তাঁহারা ব্যক্তি জীবনের নিমিত্ত যে অপূর্ব্ব ধর্ম্ম এবং যে সমস্ত পুণ্যগর্ভ ব্রত পদ্ধতি সংস্থাপিত করিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম বিলুপ্ত হইবার নহে। নরসমাজের অমরতা নিবন্ধন এই অপূর্ব্ব ধর্ম্ম কৌশল চিরস্থায়ী হইবে। নবদ্বীপ, ভাটপাড়া এবং বারাণসির যতি, দণ্ডি এবং অধ্যাপক মহাশয়েরা এ বিষয়ে স্তম্ভিত চিত্ত হইতে পারেন। তাঁহারা আর্য্য বংশ কলঙ্কিত করিয়া আপনাদিগের শাস্ত্র সমর বাণিজ্যোন্মত্ত ইউরোপের নিকট বিক্রয় করিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রের মর্ম্ম বিনষ্ট হইবে না; একান্ত পক্ষে ভারত ঋষিগণ দেশান্তরে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন, করিয়া জগদ্বিস্তীর্ণ নরসমাজের হৃদয়ে চিরকাল বিরাজ করিবেন। বলিতে দুঃখ হয় যে ব্রতের এই সকল মাহাত্ম্য একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের নিকট বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু বুঝি আর নাই বুঝি, যাঁহারা এই প্রাচীন দেশে ব্রতের নিয়ম উদ্ভাবন করেন তাঁহাদিগের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি বিলুপ্ত হইবার বস্তু নহে। উহা দ্বারা ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পূর্ণরূপে মার্জ্জিত না হউক, উহা হিন্দুসমাজকে আশ্রয় করিয়াছে বলিতে হইবে। এবং আমরা যদি হিন্দু রক্ত ও হিন্দুধর্ম্ম শরীরে ধারণ

করি তবে আর অর্ব্বাচীনের মত হিন্দু শাস্ত্রাবলিকে পুত্তলির ন্যায় সোহাগ করিতে প্রবৃত্ত হইব। কিসে এসিয়া, ইউরোপীয় ধর্ম্ম স্বায়ত্ত করিতে পারেন সেই চেষ্টাতে ব্যগ্র হইব না। কিসে ইউরোপ এসিয়ার মাহাত্ম্য চিনিতে পারেন তাহার সহায়তা করিব এবং কিসে ইউরোপ এবং এসিয়া উভয়ে সমবেত হইয়া, কিসে হিন্দু বৌদ্ধ, মুসলমান খ্রীষ্টান সকলে সমবেত হইয়া নিষ্কণ্টকে সমগ্র নর সমাজের দেহ পুষ্টি করিতে সক্ষম হন, সেই চেষ্টা করিব।

সিংহল যাত্রা।

১২৯০।১৪ই ফাল্গুন—গত কল্য কল্যাণীর বুদ্ধমন্দির দেখিয়া আসিয়া আমার দৈনিকে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিয়াছি। সিংহলে শৈব, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প; বৌদ্ধদের সংখ্যাই অধিক। এজন্য বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ লিখিলে অনধিকার চর্চ্চা হয় না।

(১) বৌদ্ধদের ধর্ম্মশাস্ত্র তিন কাণ্ডে; এজন্য তাহা পিটকত্তয় (ত্রিপিটক) নামে খ্যাত। এই তিন কাণ্ডের নাম সুত্ত (সূত্র), বিনয় ও অভিধম্মো (অভিধর্ম্ম)। সূত্রে গৌতমের অর্থাৎ শাক্যসিংহের বচন প্রকটিত থাকায়, সূত্রই ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল গ্রন্থ বলিয়া মান্য হইয়াছে। সূত্র ও বিনয় ধর্ম্মোপদেশ পূর্ণ। অভিধর্ম্ম বৌদ্ধদিগের দর্শন বলিলে বলা যায়। অভিধর্ম্মকার পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ব্রহ্মা অথবা ঈশ্বর * জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। স্বভাব হইতে বিশ্বের উৎপত্তি, স্বভাবে তাহার স্থিতি এবং স্বভাবেই তাহার লয় হইয়া কল্পান্তরে পুনর্ব্বার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইবে। বুদ্ধই পুরুষোত্তম, বুদ্ধ হইতে উচ্চতর কেহ নাই। অভিধর্ম্মের মতই বৌদ্ধদিগের অধিকাংশের মত; এজন্য অনেকেই বৌদ্ধদিগকে নাস্তিক বলেন। তাঁহারা যে নিরীশ্বর তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহারা পরলোক ও কর্ম্মফল মানে, যাহাদের

* অভিধর্ম্মে "শিব" অর্থে "ঈশ্বর" শব্দের প্রয়োগ আছে। বৌদ্ধদের মঙ্গলসূত্র অভিধর্ম্মের ন্যায় নিরীশ্বর।

মতে 'মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ', যাহাদের ধর্ম্মনীতি অত্যুৎকৃষ্ট, তাহারা নিরীশ্বর হইলেও তাহাদিগকে নাস্তিক বলা উচিত নহে।

যাহারা চার্ব্বাক, যাহারা পরলোক ও কর্ম্মফল মানে না, যাহাদের মতে ইন্দ্রিয় সুখই পরম পুরুষার্থ, তাহারাই প্রকৃত নাস্তিক। কপিল, শাক্যমুনি ও অগস্ত্ কোম্ৎ নিরীশ্বর হইয়াও নাস্তিক নহেন।

অধিকাংশ বৌদ্ধ নিরীশ্বর বটে; কিন্তু নেপালে একটি সম্প্রদায় আছে তাহারা আদি বুদ্ধ মানে। তাহাদের মতে আদি বুদ্ধ দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। আমাদের ঈশ্বরে এবং হিমবন্ত প্রদেশের আদি বুদ্ধে কোন ভেদ নাই। বৌদ্ধরা মানব শাক্যমুনিকে দেবতাদের অপেক্ষা মহান্ বলিয়া মান্য করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা দেবতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে মর্ত্ত্যলোকের উপর দেবলোক, তদুপরি ব্রহ্মলোক, তদুপরি অরূপ ব্রহ্মলোক, সর্ব্বোপরি নির্ব্বাণ। ললিতবিস্তরের সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মায়াদেবী প্রসূতী হইলে, ব্রহ্মা এবং দেবরাজ শক্র নবজাত শাক্যকে গন্ধোদক দ্বারা স্নান করাইলেন। * সূত্তপিটকে ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বরুণ ও বিশ্বকর্ম্মা দেবতাদের এবং যক্ষরাজ কুবেরের উল্লেখ আছে। স্থানবিশেষে ব্রহ্মা পিতামহ নামে; বিষ্ণু নারায়ণ, জনার্দ্দন ও উপেন্দ্র নামে; শিব, শঙ্কর নামে এবং ইন্দ্র, সচীপতি নামে উক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা যে মাননীয় এ কথা সূত্তপিটকে স্বীকৃত আছে; কিন্তু বুদ্ধই কেবল পরম পূজনীয়। যাঁহারা স্বভাব হইতে সৃষ্টি হইয়াছে স্বীকার না করিয়া ব্রহ্মা বা ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলেন, অভিধর্ম্মকার তাহাদের উপর বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু অভিধর্ম্মে ব্রহ্মা বা ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রূপ নাই।

বৌদ্ধদের বিশ্বাস এই যে, শাক্যমুনি প্রথম বা একমাত্র বুদ্ধ নহেন। প্রতি মহাকল্পে এক বা তদধিক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা তপস্যা ও পুণ্যবলে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁদের সকলেরই জন্ম জম্বুদ্বীপে, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়কুলে। সকলেই উরুবিল্ব বা উরুবেলার জনপদে (বুদ্ধ গয়ায়) এক একটি বৃক্ষতলে সিদ্ধার্থ হইয়াছিলেন। যিনি যে বৃক্ষতলে

* গগনতলে হি স্থিত্বা ব্রহ্মোত্তমঃ শক্র দেবোত্তমঃ
সুচিরুচির প্রসন্ন গন্ধোদকৈর্বিস্নপী বিনায়কম্।

ললিতবিস্তর, ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্করণ, ১০৬ পৃষ্ঠা। আমরা গণেশকে এবং গুরুকে বিনায়ক বলি, বৌদ্ধরা বুদ্ধকেই বিনায়ক বলেন।

বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার বোধিদ্রুম। গৌতম অর্থাৎ শাক্যসিংহের পূর্ব্বে ২৪ জন বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার পরে মিত্তেয় (মৈত্রেয়) নামে এক মহাপুরুষ বুদ্ধ হইবেন।

শকাব্দা প্রারম্ভের ৭০১ বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন মঙ্গলবারে শাক্যসিংহ কপিলবস্তু নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন ললিতবিস্তর গ্রন্থে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; কিন্তু বস্তুত তিনি সামান্য রাজা ছিলেন বোধ হয়। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থোক্ত অনেক সসাগরা ধরণীর অধিপতির রাজ্য কুচবিহার অপেক্ষা বড় বিস্তৃত ছিল না। রাজা দশরথ প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন; কিন্তু রামচন্দ্র বনবাসিত হইয়া প্রথম রাত্রি তমসাতীরে থাকিয়া, পরদিন বেদশ্রুতি পার হইলেন। তাহার পরদিন কোশলের অন্ত্যসীমা অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের পুরে উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র দ্রুতগামী রথারোহণে বনগমন করিয়াছিলেন বটে, তথাপি অযোধ্যাকাণ্ডের ৪৮,৪৯ এবং ৫০ সর্গ পাঠ করিলে, তাঁহার পিতার কোশল রাজ্য অতি বিস্তৃত ছিল বলিয়া প্রতীত হয় না। শুদ্ধোদন দূরে থাকুন, ভারত, রঘু, যুধিষ্ঠির ও অশোক ব্যতীত কেহই ভারতবর্ষে রাজ-চক্রবর্ত্তী হইতে পারেন নাই।

পুরাকালে মহাসমারোহে লাঙ্গলোৎসব হইত। উৎসবের দিন রাজা স্বহস্তে হল ধারণ করিতেন। কথিত আছে যে শুদ্ধোদন রাজা বালশাক্যকে উৎসব দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। শিশু নিরাধার আকাশমার্গে উঠিয়া আপন অতিমানুষী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে এই অলৌকিক ক্রিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থকারদিগের রচনা মাত্র। কৈশোর গত যশোধরা গোপা নাম্নী একটি রূপসীর সহিত শাক্যের বিবাহ হইল; শাক্য কিছুকাল আমোদ প্রমোদে রত রহিলেন। পরে একজন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, একজন কুষ্ঠ-রোগী, একটি শব ও একজন সন্যাসী দেখিয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্যোদয় হইল এবং তিনি তপস্বী হইবার সঙ্কল্প করিলেন। শাক্যের রাহুল নামে একটি পুত্র জন্মিবার পর আষাঢ় মাসে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে, তিনি গৃহত্যাগী হইলেন। কয়েকটি তাপস ও তাপসীর আশ্রম দর্শন করিয়া এবং বৈশালী নগরে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া, তিনি মগধের রাজধানী রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার সমভিব্যাহারে তাঁহার পিতৃব্য পুত্র আনন্দ ছিলেন। পরে এই আনন্দ শাক্যের একজন প্রধান শিষ্য হইয়াছিলেন। রাজগৃহ

এক্ষণে বিহার প্রদেশে রাজগির নামে খ্যাত। নগরে প্রবেশ করিলে, নগরবাসীরা তাঁহার রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইল। কেহ বলিল, 'ইনি কি অনঙ্গ? তবে ইহাঁর শরীরে মহেশ্বরের কোপানলের চিহ্ন কেন নাই?' কেহ বলিল, 'ইনি কি শক্র? তবে ইহার সহস্র লোচন কোথায়?' পুরবাসীরা মগধরাজ বিম্বসারের নিকট গিয়া কহিল, যে একটি অদ্ভুত পুরুষ আসিয়াছে; সে যক্ষ কি দেব, ব্রহ্মা কি বিষ্ণু, তাহা কেহই বলিতে পারে না। রাজা শাক্যকে তাপসব্রত হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। শাক্যসিংহ উরুবিল্ব বা উরুবেলার অরণ্যে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এমন কঠোর তপস্যা করিলেন, যে নিকটবর্ত্তী জনপদ বাসীরা মনে করিল যে অনশনে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইবে। ঐ সময়ে সুজাতা নাম্নী একটি ভদ্রকুলোদ্ভবা রমণী * তাঁহার নিমিত্ত পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খাওয়াইতেন; নতুবা শাক্য নিশ্চয় কালগ্রাসে পতিত হইতেন। শাক্য এমন কঠোর তপস্যাতেও সিদ্ধার্থ হইতে পারিলেন না, অর্থাৎ তাঁহার বাঞ্ছিত জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না। পরে অনশন ব্রত ত্যাগ করিয়া নদীতীরে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষতলে নূতন প্রণালীতে পুনর্ব্বার তপস্যা করিতে লাগিলেন। শাক্যের পরম শক্র বশবর্ত্তী মার নানা প্রকার উৎপীড়ন আরম্ভ করিল এবং তপস্যার বিঘ্ন জন্মাইতে যত্নবান্ রহিল। 'মার' যে কে, ইহা নিরূপণ করা সুকঠিন। পণ্ডিতবর মূলর বলেন 'মার' পাপ-প্রবৃত্তি-দাতা (tempter); অর্থাৎ যে অর্থে য়িহুদী, খৃষ্টিয়ান ও মুসলমানগণ 'সয়তান্' শব্দ প্রয়োগ করেন, প্রায় সেই অর্থে বৌদ্ধরা 'মার' শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ কোষকার অমর সিংহ বলেন "মার" কন্দর্পের একটি নাম। অমর সিংহের ব্যাখ্যাই ঠিক্ বোধ হয়; কারণ ললিত বিস্তরে লিখিত আছে, যে মার আত্মপরিচয়ে বলিয়াছিলেন,—

"কামেশ্বরোঽস্মি বসিতা ইহ সর্ব্বলোকে
দেবাশ্চদানবগণা মনুজাশ্চতীর্য্যা।"

মারকে জয় করিয়া শাক্য মারজিৎ নামে খ্যাত হইলেন। যুবা তাপসের পক্ষে ক্রোধ লোভাদি জয় অপেক্ষা কামজয় অধিকতর দুরূহ ব্যাপার।

* দয়াই রমণীকুলের পরম রমণীয় গুণ। কঠোরতপা শাক্যের শীর্ণ ও বিবর্ণ কলেবর দেখিয়া কৃষক ও গোপবালকেরা বিদ্রূপ করিত। সুজাতা ও তাঁহার কয়টি সঙ্গিনী তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

এজন্যই পুরাণে লিখিত আছে যে যোগীন্দ্র মহাদেব কর্ত্তৃক তাপসারি কামদেব ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, এবং মেনকা অপ্সরা মহাতপা বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করিয়াছিলেন। যাঁহারা ঐ সমস্ত পৌরাণিক আখ্যায়িকার নিগূঢ় তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সক্ষম, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন পুরাণের রচয়িতা মানব প্রকৃতি কেমন বুঝিতেন। বুদ্ধচরিতে মারজয়ের যে উপাখ্যান আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে শাক্যসিংহ অন্যান্য রিপু সহজে বশীভূত করিয়াছিলেন; কিন্তু কামজয় করিতে কষ্ট পাইয়াছিলেন। বস্তুত মার যে কোন পুরুষের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন সে কথা উপকথা মাত্র। পরিশেষে শাক্য তপস্যাবলে এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে সমুদায় বিষয়প্রবৃত্তি জয় করিয়া, জিন এবং শ্রেষ্ঠজ্ঞান লাভ করিয়া, বুদ্ধ হইলেন। তাঁহার বয়স তৎকালে ৪০ বৎসরের ন্যূন ছিল। তিনি বারাণসী নগরে গিয়া নগরের নিকটবর্ত্তী ঋষিপট্টন বিহারে (তাপসাশ্রমে) নির্ব্বাণ মুক্তির মার্গ প্রদর্শনাভিপ্রায়ে ধর্ম্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। ঋষিপট্টনাশ্রমে অনেক মৃগ ছিল; এ জন্য তাহার একটি নাম মৃগদাব। এক্ষণে তাহা শারনাথ নামে খ্যাত। ঐ স্থানের বিহারের প্রস্তরময় ভগ্নাবশেষ কাশী হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এমন চিন্তাশীল শিক্ষিত হিন্দু কেহই নাই, যাঁহার হৃদয়ে ঐ আশ্রমচিহ্ন দেখিয়া দুঃখের সঞ্চার না হয়। ঐ স্থলে আর্য্যকুল চূড়ামণি বুদ্ধ আপন অক্ষয় কীর্ত্তির সূত্রপাত করিয়াছিলেন। আমরাও সেই আর্য্য বংশোদ্ভব; কিন্তু আমরা প্রকৃত ধর্ম্মভ্রষ্ট, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানভ্রষ্ট, স্বাধীনতাভ্রষ্ট ও পৌরুষভ্রষ্ট হইয়া পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছি। কে আমাদিগকে শাক্যের ন্যায় শিখাইবে যে প্রকৃত ধর্ম্ম হৃদয়গত, তাহা মুখগত বা আচারগত নহে? শাক্য ৪০ বৎসরের অধিক কাল ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন। ধর্ম্মপ্রচার জন্য ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রাবস্তি প্রদেশে জেত বন বিহারেই অধিক কাল অবস্থিতি করিতেন। কোসম্বী প্রদেশে কোসম্বী নগরে ও ঘোষিতরাম বিহারে, মগধ প্রদেশে রাজগৃহ নগরে ও বেণুবন বিহারে এবং বৈশালী প্রদেশে কুশী নগরেও ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। মহাবংশ নামে সিংহলের ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে যে ভগবান গৌতম বুদ্ধ দুইবার সিংহলে গিয়াছিলেন; একবার সুমানকূট (আদমগিরি) পর্ব্বতে, আর একবার যক্ষ-রাজধানী কল্যাণী নগরে। কিন্তু ভারতবর্ষ, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ বা চীনের

কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে মহাবংশোক্ত সিংহলযাত্রার প্রমাণ নাই। শাক্যের যখন অশীতি বর্ষ বয়স তখন তিনি সশিষ্য কুশী নগরে যাত্রা করিতেছিলেন পথশ্রান্ত হইয়া তিনি একটি আম্রকাননে বিশ্রাম করিলেন। উপবনস্বামী চণ্ড তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল। শাক্য বরাহমাংস ভক্ষণ করিয়া উদরাময় রোগগ্রস্ত হইলেন। সেই রোগেই তাঁহার মৃত্যু হইল। শাক্য এমন মহাত্মা ছিলেন, যে তাঁহার মতবিরোধী হিন্দুরাও তাঁহাকে পুরুষোত্তম এবং ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মান্য করেন। (৩) স্কন্দ পুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, বিষ্ণু বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া অসুর এবং পাষণ্ডদিগের নিপাত জন্য কাশী ধামে মোহধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তাঁহার প্রভাবে দেবতারা কাশীত্যাগ করিলেন। মনোনিবৃত্তি ব্যতীত শান্তি নাই; ধর্ম্ম মনোগত, আচারগত নহে; কেবল বর্ণবিশেষের ধর্ম্মাধিকার নাই, মনুষ্য মাত্রেরই ধর্ম্মাধিকার আছে; এই সমস্ত শিক্ষা প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ, মোহধর্ম্মের শিক্ষা নহে। স্কন্ধ পুরাণের রচয়িতা ভ্রম জ্ঞানে পতিত হইয়াছেন। লোকপাল বিষ্ণু পাষণ্ডদিগকে ধর্ম্মপথে না আনিয়া তাহাদিগকে বিপথগামী করিলেন, এমন কথা বলিয়া পুরাণকার বিষ্ণুর অবমাননা করিয়াছেন। বস্তুত বৌদ্ধধর্ম্ম নিরীশ্বরতা দোষে দূষিত না হইলে প্রায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত। নিরীশ্বরতা যে গুরুতর দোষ তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু পৃথিবীর অবস্থা এমন হইয়াছে যে, সর্ব্বত্রেই লোকে মুখে ঈশ্বরের নাম লইয়া কার্য্যদ্বারা আপনাদের নিরীশ্বতার পরিচয় দেয়। যে সমস্ত আর্য্য ঋষিগণ উপনিষদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রকৃত ধর্ম্মের লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছিলেন; কিন্তু কালে আর্য্যদিগের ধর্ম্ম, উপধর্ম্ম হইয়া পড়িল। জনসাধারণের বিশ্বাস হইল যে, দেবতা বিশেষের নামোচ্চারণ, তীর্থ বিশেষ দর্শন, নদী বিশেষে অবগাহন প্রভৃতি উপায়দ্বারা পাপমুক্ত হইবে। এই সময়ে শাক্যসিংহ আবির্ভূত হইয়া লোক সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে ধর্ম্ম সঞ্চয় জন্য মনকে নিবৃত্ত ও পবিত্র করিতে হইবে, কেবল আচারে ও বাহ্যাড়ম্বরে ধর্ম্ম সঞ্চয় হয় না, আর কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী। শুদ্ধাচার অনেক সময়ে ধর্ম্মের সহায় হইয়া থাকে কিন্তু শুদ্ধাচার ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্ম হৃদয়ের ধন। তাহা বাহ্য ক্রিয়াকলাপে প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম ও ক্রিয়াকলাপ পৃথক পৃথক পদার্থ। এই সমস্ত উপদেশে এমন নূতন কথা কিছুই নাই, যাহা আর্য্য ঋষিদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। তথাপি বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য,

চৈতন্য, নানক, রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মাদিগের মধ্যে মধ্যে আবির্ভাবের বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে; নতুবা হৃদয়গত সনাতন ধর্ম্ম, মুখগত এবং আচারগত উপধর্ম্মে পরিণত হয়। জন সাধারণের চৈতন্যোদয় জন্য অনেক সময়ে পুরাতন কথা নূতন করিয়া বলিতে হয়।

শাক্য এক সময়ে প্রাচীন মার্গের দোষ দিয়া বলিয়াছিলেন—

'অজ্ঞান পূর্ব্বং কুতপঃ ঋষিভিঃ প্রতপ্তম্
ক্রোধাভিভূতমতিভির্দিবলোককামৈঃ।
তে তত্ত্বতোঽর্থরহিতাঃ পুরুষং বদন্তি
ব্যাপিং প্রদেশগতং শাশ্বতমাহুরেকে।
মূর্ত্তমমূর্ত্তমগুণং গুণিনং তথৈব
কর্ত্তা নকর্ত্তা ইতি চাপাপরে ব্রুবন্তি।'

প্রাচীন ঋষিদিগের মধ্যে অনেকেই যে কুতপা ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। বিশ্বামিত্র ক্রোধাভিভূত হইয়া বশিষ্ঠের এবং আপন সন্তানদিগের যারপরনাই অনিষ্ট করিলেন। দুর্ব্বাসা অতি সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া দেবরাজ হইতে অতি সামান্য মানুষ পর্য্যন্ত সকলকেই অভিশাপ দিতেন। জমদগ্নি রোষপরবশ হইয়া স্ত্রীহত্যা পাপে লিপ্ত হইলেন এবং আপন পুত্রকে মাতৃহন্তা করিলেন। বুদ্ধ এই সকল ঋষিদিগকে কুতপা বলিয়া তাঁহাদিগের প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন; কারণ যাঁহারা ক্রোধ বশীভূত করিতে পারেন নাই, তাঁহারা তাপস নামের অধিকারী নহেন। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তির দোষে সকলকে কুতপা বলা অন্যায়। রত্নাকর মহাপাপী ছিলেন, তপোবলে ধার্ম্মিক চূড়ামণি বাল্মীকি হইলেন। বাল্মীকির ন্যায় মহাতপা অনেক ঋষি আর্য্যভূমিকে পুণ্যভূমি করিয়া গিয়াছিলেন। নন্দনকাননশোভিত, গন্ধর্ব্বগীতনিনাদিত, অপ্সরাসেবিত স্বর্গকামনা তাপসের উচিত নহে; কিন্তু তাহা বলিয়া কি মোক্ষ কামনা, পরমাত্মায় লীন হওয়ার কামনা দূষণীয়? যখন শাক্য মুনি তপস্যারম্ভ করিলেন, তখন কি তাঁহার নির্ব্বাণ মার্গ জানিবার কামনা ছিল না? কোন কোন ঋষি ঈশ্বরকে মূর্ত্তিমান ও সগুণ বলিয়াছেন, এবং কেহ কেহ তাঁহাকে অমূর্ত্ত ও নির্গুণ বলিয়াছেন, বলিয়া বুদ্ধ স্থির করিলেন যে ঈশ্বরের বিষয়ে আমরা কিছুই জানিতে পারি না; অতএব যে তাপস তাঁহার ধ্যান করে সে কুতপা। তিনি এইরূপে অজ্ঞেয়বাদের * সৃষ্টি করি-

* Agnosticism.

লেন এবং কোমৎ, মিল ও স্পেন্সারের আদিগুরু হইলেন। অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষও ভ্রমে পতিত হয়।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে বৌদ্ধরা পরলোক মানে না। এই সংস্কার নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। বৌদ্ধমতে পাপী নিরয়ে, পশুলোকে, প্রেতলোকে, অথবা অসুরলোকে দুঃখভোগ করিয়া পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। পুণ্যবান-ব্যক্তিরা তুষিতাদি ছয় প্রকার দেবলোকে, ধ্যানাদি ষোড়শ প্রকার ব্রহ্মলোকে, অথবা চারি প্রকার অরূপ ব্রহ্মলোকে বাস করে; কিন্তু নির্ব্বাণ মুক্ত না হইলে তাহাদের মর্ত্ত্যে পুনর্জ্জন্ম হয়। বৌদ্ধদের নির্ব্বাণ যে কি, তাহার নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। অমাদের মতে পরমাত্মায় জীবাত্মা লীন হইলে জীবাত্মা নির্ব্বাণমুক্ত হয়; কিন্তু যাহারা পরমাত্মা মানে না তাহাদের নির্ব্বাণমুক্ত কি? অভিধর্ম্মমতে নির্ব্বাণ নাস্তিত্ব; কিন্তু ধর্ম্মপদের রচয়িতার মতে নির্ব্বাণ পরম শান্তি, অর্থাৎ যে অবস্থায় অস্তিত্ব মাত্র থাকে, কিন্তু চিন্তা, বাসনা ও সুখদুঃখানুভূতি থাকে না। পণ্ডিতবর মূলর বলেন, শেষোক্ত মতই শাক্য মুনির মত। তবে জার্ম্মেনীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক হেগেলের মতাবলম্বীরা বলিতে পারেন যে, নির্গুণ অস্তিত্বে ও নাস্তিত্বে কিছুই ভেদ নাই। পুনর্জ্জন্ম-জনিত দুঃখ হইতে মুক্ত করাই বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্দেশ্য। সুত্তপিটকে লিখিত আছে যে গৌতম পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অমরাবতী নগরে ব্রাহ্মণ কুমার ছিলেন, মধ্য-দেশে চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন, নাগরাজ ছিলেন, পশুরাজ সিংহ ছিলেন, যক্ষ-রাজ ছিলেন, রমাবতী নগরে ত্রিবেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইত্যাদি। দশরথজাতক নামক বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, যে বুদ্ধ পূর্ব্বজন্মে দশরথের পুত্র রামচন্দ্র ছিলেন। ললিতবিস্তরের রচয়িতা বলেন যে শাক্য মায়াদেবীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বোধিসত্ত্ব * অবস্থায় তুষিতলোকে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বৌদ্ধরা যে কেবল পরলোক মানে এমন নহে; তাহারা সাধারণ হিন্দুদের ন্যায় জীবাত্মার দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রমণ মানে।

* যে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু প্রাপ্ত হইবার কতক পরিমাণে উপযুক্ত হইয়াছে, তাহাকে বোধিসত্ত্ব বলে।

কাশীস্তোত্র।

জয় জয় কাশী অর্দ্ধচন্দ্রকায়, বেণী সুসজ্জিত অসি বরুণায়
পদতলে শোভে সুরধুনী ধার, কটিদেশে কোটি সোপানের হার।
নবদিবাকর-কিরণ-মালা, মন্দির-মুকুট-দেউলে-ঢালা।
দিব্যচক্ষে শিব-ত্রিশূল কাশী। জয় বিশ্বেশ্বরপুরী বারাণসী॥

জ্ঞানতত্ত্বময় পুরাণের ক্ষেত্র, চির-উন্মীলিত জগতের নেত্র।
আর্য্যহৃদিগত-মাধুরীতে ভরা, ত্রিযুগব্যাপক স্রোত ধারা-ধরা।
ভুবন-সংক্ষেপ ভারত-সার, ধরাতে সুধন্য মহিমা যার।
পুণ্যাত্মা পাপীতে যার প্রত্যাশী। জয় অন্নপূর্ণাপুরী জয় কাশী॥

জয় অন্নেপূর্ণা আনন্দ-অবনী, ইহ-পরকাল-দারিদ্র্য-দাশিনী।
হিন্দুহৃদিক্ষেত্র-উৎসাহের গতি, ব্রত-দান-ধর্ম্মে নিত্য স্রোতবতী।
ধনিক ধার্ম্মিক ধীরাজগণ, দেহে মিশাইতে করে আকিঞ্চন।
না থাকে পরশে পাতকরাশি। জয় বিশ্বেশ্বরপুরী জয় কাশী॥

জয় বিশ্বেশ্বরপুরী জয় কাশী।
শিবমোক্ষপুরী পরমার্থধাম, ধরাধন্য ভূমি ত্রিভুবনে নাম।
ধনী জ্ঞানী মূঢ়ে নাহি যাহে ভেদ, কোলে এসে যার সবে ভুলে খেদ।
সদা সুখময় মহাশ্মশান, মরিলে মোক্ষ তখনি দান।
ভব যার ভাবে সদা উল্লাসী। জয় বিশ্বেশ্বরপুরী জয় কাশী॥

সর্ব্ববিদ্যা, কলা, শাস্ত্র, দরশন, চিরদিন যার দেহের ভূষণ।
অতুল্য ভুবন এ মহীমণ্ডলে, জ্ঞানের কৌস্তুভ-মণি-বক্ষস্থলে।
জগতের চক্ষে জ্যোতিদায়িনী, যোগী-মহর্ষি-মানস-জননী।
ভারতের ফুল্ল প্রতিভাময়। জয় বিশ্বেশ্বরপুরী জয় জয়।

ত্রিপাতকতারা পুনর্জ্জন্মহরা, ক্ষিতি মোক্ষক্ষেত্র একদেহেধরা।
যার কোলে মিশে শূকর ব্রাহ্মণ পূর্ণদেহে ব্রহ্মহৃদে সংস্থাপন।
জীবাত্মা ঈশ্বরে যুগল যায়, শিবময়পুরী ধরণী-গায়।
ভারতভুবন যার বিলাসী। জয় কাশি জয়, জয় বারাণসী॥

জয় কাশী জয়, জয় বারাণসী॥
মহামহাপ্রাণ জীবগণ যায়, দিন-অনুদিন মিশাইছে কায়।
চির প্রজ্জলিত মহাপ্রাণশিখা, যার প্রতিরেণু-রেণুভাগে লিখা।
যে ভূমি অমৃতমন্দির সার, অনাদি অনন্ত প্রভাব যার।
মোক্ষতীর্থচূড়া ভুবন কাশী। জয় বিশ্বেশ্বরপুরী বারাণসী॥

মহাশবক্ষেত্র-মহী-ধরাতলে, এ মহিমা কোথা কার অঙ্গে জ্বলে?
কোথা মৃতদেহে দিয়ে পুষ্পজল, পূজা করে তারে মানবমণ্ডল।
অন্তরে যাহার অন্তর্জলি ছেদ, দেহমুক্ত জীব শিবে অভেদ।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তাপহারিণী। জয় জয় বিশ্বজীব-নিস্তারিণী॥

জয় মোহহরা চৈতন্যধারিণী, জ্ঞানদা সুখদা মোক্ষবিধায়িনী।
বক্ষস্থলে যার ত্রিকোটী অমর, অলক্ষ্য প্রত্যক্ষ জাগে নিরন্তর।
জগত-জননী অন্নদা আপনি, যেথানে খুলেছে আনন্দ-বিপণি।
পূর্ণব্রহ্মরূপ যাহে বিদ্যমান, শিব যেথা জীবে দেন আত্মদান।
আনন্দ যাহার সচ্চিতের হাসি। মহাকালপুরী জয় জয় কাশী
জয় কাশী জয়। জয় বারাণসী॥

মর্ম্মকথা।

২।

অতীতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে কাল সহকারে জিতজাতির তিন প্রকার মাত্র পরিণাম সম্ভব হইতে পারে।

প্রথমত, জিত জাতির একেবারে সমূলোচ্ছেদ হইয়া থাকে। যখন জেতা ও জিতজাতির মধ্যে সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক প্রভেদ থাকে, যখন জিত জাতির মধ্যে সামাজিক বন্ধন অত্যন্ত শিথিল থাকে, যখন অসভ্য জিতজাতি,— স্থিতিশীলতা বশত তাহাদের চিরন্তন প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি অধিকতর আস্থা ও পক্ষপাতিতা জন্যই হউক—অথবা প্রকৃতিগত প্রভেদবশত জেতৃ-জাতির উন্নত ও পরিবর্দ্ধমান অবস্থা বুঝিতে অসমর্থ হইয়াই হউক—অথব পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব দৃঢ়ীভূত থাকা বশতই হউক,—স্বীয় অবস্থা

উন্নতির দ্বারা জেতার সমকক্ষ হইতে না পারে, তখন স্বাভাবিক নিয়মানুসারে পরিণামে তাহারা উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হিস্পানিগণ যখন সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকা জয় করেন, তখন অসভ্য আমেরিকানগণ উৎপীড়িত, নিহত ও ক্রমে ধ্বংশ হইয়াছিল। কথিত আছে, স্পেন সেনাপতি কর্টেজ একা মেক্সিকো জয়ের সময় প্রায় চল্লিশ লক্ষ মেক্সিকোবাসীকে হত্যা করিয়াছিল। পেরু, ব্রেজিল ও আমেরিকার দ্বীপপুঞ্জ জয়ের সময় পিজারো প্রভৃতি সেনাপতিগণও অসংখ্য অসভ্য ইণ্ডিয়ানদিগকে তরবারি মুখে অর্পিত করিয়াছিল। কিন্তু ইয়ুরোপীয়গণ যদি এই হতভাগ্য দিগকে এত উৎপীড়িত ও ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট না করিত, তাহা হইলেও সভ্য জাতির সহিত সমকক্ষ হইতে না পারিয়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মানুসারে তাহারা পরিণামে ধ্বংশ হইয়া যাইত। কালের পরিবর্ত্তনে অনুন্নত ও নিজ নিজ উদরান্ন পর্য্যন্ত আহরণে অসমর্থ জাতি গুলির ধ্বংশ হইবে, নতুবা তাহারা অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া উন্নত ও অন্যান্য সন্নিহিত সভ্যজাতির সমকক্ষ হইবে,—ইহাই প্রাকৃত নিয়ম। এইরূপে আর্য্যপিতৃগণ সর্ব্ব প্রথমে এ দেশে আসিলে এতদ্দেশীয় আদিম অসভ্যজাতি সকল তাড়িত ও প্রায় বিনষ্ট হইয়াছিল। এইরূপে বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজাধিকারে কেপকলনি হইতে অসভ্য জুলু প্রভৃতি জাতিরা তাড়িত ও ধ্বংশ হইতেছে। এই নিয়মানুসারে সাক্ষণদিগের অধিকারে অসভ্য ব্রিটন জাতি কতকপরিমাণে বিনষ্ট ও পার্ব্বত্য প্রদেশে তাড়িত হইয়াছিল।

জিতজাতির উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবার আর একটি কারণ আছে। যখন অপেক্ষাকৃত অসভ্যজাতি কোন দেশ আক্রমণ করিয়া তাহা অধিকার করিয়া লয়, তখন তাহারা আপনাদের স্বীয় অধিকার ও প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এবং আপনাদের অপেক্ষা উন্নত জাতির সংস্পর্শ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবার জন্য প্রায়ই জিতজাতিকে ধ্বংশ করিয়া ফেলে। প্রাচীনকালের মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, সে সময়ে যুদ্ধে পরাজয় হইলে বিজিত জাতি প্রায়ই ধ্বংশ হইত। তখন পাশব বলই সমাজের নিয়ন্তা ছিল। পাশববলের দ্বারা অপেক্ষাকৃত শান্ত ও সভ্যজাতি পরাভূত হইলে প্রায়ই সেই সভ্যজাতিকে বিনষ্ট হইতে হইত। পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই কত উন্নত, কত সভ্য জাতি এই প্রকারে একেবারে ধ্বংশ হইয়া কেবল নামমাত্রাবশেষ হইয়াছে। এইরূপে প্রাচীন রোম অসভ্য গথ, হুন্ প্রভৃতি

জাতির পাশব বলে ছিন্নভিন্ন ও উৎসন্ন হইয়াছিল। এই নিয়মানুসারে প্রাচীন গ্রীসের অধঃপতন ও ধ্বংশ হইয়াছে। এইরূপ, অসভ্য বর্ব্বর জাতির আসুরিক আক্রমণে প্রাচীন মৈশরী, টায়রিয়, সিডনী, ফিনিসিয় প্রভৃতি মহাসমৃদ্ধিশালী জাতিরা ভূপৃষ্ঠ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন কার্থেজও এই-রূপে রোমের পাশব বলের নিকট নতশির ও সমূলে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু পাশববলও আবার কখন কখন উন্নত ও অধিকতর দৃঢ়বদ্ধ বিস্তীর্ণ জাতিকে একেবারে ধ্বংশ করিতে পারে না। যখন জগদ্বিজয়ী অসভ্য জেঙ্গিস্ খাঁ চীনদেশ অধিকার করিয়া লন, তখন সভ্যতর চীন জেঙ্গিস্ খাঁর দোর্দ্দণ্ড পাশববলেও বিনষ্ট হয় নাই। তাহার সামাজিক সংগঠন দৃঢ়তর ছিল ও তাহার অন্তর্ভূত শক্তিও প্রবলতর ছিল, সেই জন্যই দুইশত বৎসর পরেও আবার সেই চীন তুর্কদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, অধুনা মনুষ্য সামাজের উন্নতি ও মানবজাতির সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত সামান্য পাশববলের আধিপত্য একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে অসভ্যজাতির দ্বারা সভ্যতর সম্প্রদায়ের বিনাশ হইবার আর সম্ভাবনা নাই। সেইরূপ সভ্যতর ইয়ুরোপীয়দিগের দ্বারা অসভ্য আমেরিকানদিগের যেমন বিনাশ হইয়াছিল, আধুনিক উন্নত সমাজ সংগঠনে সেরূপ পাশববলের দ্বারা অসভ্যজাতির উচ্ছেদ সম্ভব নহে। এক্ষণে কেবল পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাকৃত নিয়মানুসারে জাতি বিশেষের বিলোপই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

এই প্রকারে অসভ্য জাতির বিনাশ সম্বন্ধে আর একটি কথা এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। এক্ষণে সভ্যতার উন্নতির সহিত সভ্য দেশগুলির লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে এবং সেই জন্যই ইতর শ্রমজীবিদিগের অন্নাভাবে বিশেষ কষ্ট হইতেছে। বিজ্ঞ রাজনীতিকগণের মতে উপনিবেশ সংস্থাপন ব্যতীত জনবৃদ্ধি স্রোত হ্রাস করিবার ও দেশের সাধারণ লোকদিগের অবস্থা উন্নত করিবার কোন উপায়ান্তর না থাকায়, সেই সকল ঘনসন্নিবিষ্ট জনপদ হইতে ক্রমে ক্রমে অসভ্য অল্প জনপূর্ণ দেশে উপনিবেশ স্থাপিত হইতেছে। এইরূপে অষ্ট্রেলিয়া, মরিসস্, কেপকলোনি প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছে। কালসহকারে সম্ভবত সমস্ত অসভ্য দেশগুলি এইরূপে সভ্য জাতির উপনিবেশ দ্বারা পূর্ণ হইবে। তখন সভ্য জাতির সংঘর্ষণে অসভ্য জাতির অস্তিত্ব অধিক দিন সম্ভব হইবে না। তখন যদিও অসভ্য জাতি সভ্য জাতির সামান্য পাশববল দ্বারা বিনষ্ট হইবে না, তথাপি তাহারা উন্নত

হইতে না পারিলেও ক্রমে নিজ উদরান্ন সংগ্রহে অসমর্থ হইলে কিছুদিন পরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে, আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেটে একটিও ইউরোপীয় ছিল না—সমস্ত দেশই অসভ্য আমেরিকানদিগের আবাস স্থান ছিল; কিন্তু তথায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতির উপনিবেশ সংস্থাপিত হওয়ায় আদিম অধিবাসীগণ অনেকে যুদ্ধে হত ও অধিকাংশ ক্রমে ক্রমে দেশ ত্যাগ করিয়া ঘোর অরণ্যানী আশ্রয় লইয়া পরিশেষে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া, আণ্ডামান প্রভৃতি স্থানের অসভ্য জাতির কালসহকারে এই পরিণাম হইবারই সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়ত—জেতা ও জিত উভয় জাতি কালক্রমে মিলিত হইয়া এক নূতন জাতিতে পরিণত হয়। যেখানে জেতা ও জিত জাতি মধ্যে প্রভেদ অতি অল্প থাকে অথবা বিজিত দেশ ও বিজেতার স্বদেশ মধ্যে প্রকৃতিগত প্রভেদ অধিক না থাকে—অথবা অপার সমুদ্র বা অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতাদি দুই দেশকে পরস্পর বিভক্ত না করে—অথবা যেখানে জেতৃজাতি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া জিত দেশে আসিয়া বাস করে ও সেই দেশকে কাল সহকারে আপনাদের জন্মভূমি মনে করে—অথবা জেতা ও জিত জাতির মধ্যে জাতিগত বা প্রকৃতিগত বৈষম্য বা বিদ্বেষভাব অধিক না থাকে—তাহা হইলে পরিণামে এই দুই জাতি মিলিত হইয়া এক স্বতন্ত্র অভিনব জাতির উৎপত্তি হয়। যখন নরমানেরা সাক্ষণ ইংলণ্ডকে প্রথম জয় করে তখন নরমান ও সাক্ষণদিগের মধ্যে বিদ্বেষভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল, ক্রমে নরমানদিগের স্বদেশ নর্ম্মাণ্ডি হস্তান্তর হওয়ায় ইংলণ্ডই তাহাদের স্বদেশ হইল ও অতি অল্প দিনে নরমান ও সাক্ষণ জাতি সংমিলিত হইয়া ইংরাজ জাতির উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বে ফ্রান্সের গল বা কেল্টিক জাতি যথেষ্ট উন্নত ছিল; কিন্তু অধিকতর সভ্য রোম তাহাদিগকে পরাজয় করিলে উভয় জাতির সম্মিলনে তাহাদের ভাষা পর্য্যন্ত লাটিন হইয়াছিল। তৎপরে ফ্রাঙ্ক জাতি আবার তাহাদিগকে পরাজিত করিলে ক্রমে তাহাদের সহিত ফ্রাঙ্ক জাতি মিলিত হওয়াতে ফরাসি জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ সারাসেনগণ মহম্মদের মৃত্যুর পর মরক্কো দেশ হইতে তাতারের সীমান্ত পর্য্যন্ত অধিকার করে এবং ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা সেই সমস্ত দেশের আদিম জাতির সহিত মিলিয়া যায়। তাহাদের তিন চারি শত বর্ষ রাজত্বের পর আবার তুর্কীরা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া এই সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে উভয় জাতির একরূপ সম্মিলন

হইয়া গিয়াছে। প্রায় একশত বৎসর হইল, ইয়ুরোপের পোলণ্ড দেশকে রুষিয়া, অষ্ট্রীয়া ও প্রুষিয়া, বিভক্ত করিয়া অধিকার করিয়া লইয়াছে; কিন্তু ক্ষুদ্র পোলণ্ডের রীতি নীতি সমস্তই বিজেতাদের মত। পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত কারণেই পোলণ্ড বিজেতাদের সহিত এক হইয়া যাইবে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

জেতা ও জিত উভয় জাতির এই প্রকার সম্মিলনের সাধারণ নিয়ম এই যে, যে জাতির সামাজিক সংগঠন দৃঢ়তর, যাহাদের অন্তর্ভূত শক্তি অধিকতর, এবং যাহারা বিস্তারে ও লোক সংখ্যায় বৃহত্তর, তাহারাই অপেক্ষাকৃত শিথিল-বন্ধন সমাজকে আকর্ষণ করিয়া লয়। সুতরাং অবস্থা বিশেষে কখন জেতা কখন বা জিত জাতি আসিয়া অপরের সহিত মিলিত হয়। তবে মিলনের সময় জেতা জাতিকে কতকটা ত্যাগ স্বীকার করিয়া—কতকটা অবনত হইয়া জিত জাতির সহিত মিলিতে হয়, নতুবা জিত জাতি স্বীয় অবস্থার উন্নতি দ্বারা অথবা যেরূপে হউক জেতার সমতুল্য হইলেও জেতার সহিত মিলিতে সাহস করে না। নরমান সাক্ষণদিগের মধ্যে নরমানরাই সাক্ষণদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল।

ইহা ব্যতীত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, জেতৃজাতির দ্বারা বিজিত জাতি কতক পরিমাণে ধ্বংশ হয় ও যাহারা অবশিষ্ট থাকে তাহারা অল্পে অল্পে উন্নত হইয়া সভ্য জাতির সহিত মিলিত ও তাহাদের সহিত এক জাতিভুক্ত হইয়া যায়। কারণ, কতক পরিমাণে ধ্বংশ হওয়ায় জিত জাতি হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে এবং উপায়ান্তর না থাকায় ক্রমে ক্রমে বিজেতার সহিত মিশিয়া গিয়া অন্তত তাহাদের সমাজের নিম্নস্তরভুক্ত হইয়া যায়। এইরূপে আমাদের আর্য্যপিতৃগণ এদেশীয় আদিম জাতিদিগকে তাড়িত করিয়াও একেবারে ধ্বংশ করিতে পারেন নাই। অনার্য্যগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত অত্যন্ত ঘৃণিত শূদ্রভাবে থাকিয়াও কালসহকারে আর্য্য জাতির সহিত মিলিত হইয়াছে এবং উভয়ের রীতিনীতি ও ধর্ম্ম এক হইয়া গিয়াছে। সচরাচর জেতা ও জিত উভয় জাতি এইরূপেই পরস্পরের সহিত সংমিলিত হইতে দেখা যায়।

তৃতীয়ত—কাল সহকারে জিত জাতি উন্নত হইয়া তাহাদের স্বাধীনতা পুনর্লাভ করে—যখন জিতজাতি স্বীয় অবস্থার উন্নতির দ্বারা জেতৃজাতির সমকক্ষ হইবে—যখন তাহারা নিজ বাহুবলে অন্য জাতি হইতে

আত্মরক্ষা করিয়া নিজ স্বাধীনতা বজায় করিবে—তখন নিজ বীর্য্য বলেই হউক, অথবা অন্য জাতির সহায়তা লাভেই হউক, অথবা জেতার উদারতা জন্য তাহাদের সাহায্যেই হউক, তাহারা পুনর্ব্বার স্বাধীন হইবে। অধীনতা মাত্রেই—মনের স্বাভাবিক গতি, আমাদিগের ন্যায়সঙ্গত অভিপ্রায়, ও আমাদের অভিপ্সিত কার্য্যে বাধা দেয়। সুতরাং মনুষ্যের বৈষয়িক উন্নতির সহিত মনের যে স্ফূর্ত্তি হয় ও তাহার সহিত ক্রমবর্দ্ধিত অভাব পূরণের যে ইচ্ছা হয় অধীনতাই তাহার অন্তরায়। অতএব যখন জিতজাতি উন্নত হইয়া জেতৃজাতির সমকক্ষ হইবে তখন কখনই এরূপ অধীনতা সহিবে না। পর্ব্বতে স্রোতস্বতীর বেগ রোধ হইলে কিছুপরে উহা সহস্র গুণ বেগে পর্ব্বত উলঙ্ঘন করিয়া প্রবাহিত হয়; কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থকে চাপ দিলে তাহা ক্রমে সঙ্কুচিত হয় বটে; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে অপ্রতিহত বেগে বাধা অতিক্রম করিয়া তাহার পূর্ব্ব বিস্তৃতি পুনর্লাভ করে। সেইরূপ জিতজাতি অধীনতার পেষণে প্রথমে সঙ্কুচিত হয় বটে, কিন্তু দশ বৎসর পরেই হউক অথবা সহস্র বৎসর পরেই হউক তাহাদের নষ্ট স্বাধীনতা অবশ্যই পুনরুদ্ধার করিবে। পূর্ব্বে প্রাচীন রোম অসভ্য গথ্ হুন্ প্রভৃতি জাতি দ্বারা ধ্বংশ হইয়াছিল, তথাপি রোমের যে অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল—প্রচ্ছন্নভাবে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত ছিল,—তাহাতেই রোম ধ্বংশ হইয়াও আবার রক্তবীজের মত পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া সেদিন পর্য্যন্তও সমস্ত আধ্যাত্মিক ইয়ুরোপের অভিনেতা হইয়াছিল। তাহার পর অতি অল্প দিন হইল গ্যারিবল্ডি, ম্যাট্‌সিনি, কাবুর প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী মহাপুরুষদিগের যত্ন, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগ জন্য ইটালী এক্ষণে যথেচ্ছাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। এইরূপে গ্রীকেরা তুর্কীদের নিষ্ঠুর উৎপীড়ন হইতে মুক্ত হইয়াছে। স্পেন দেশ নবম শতাব্দীতে আফ্রিকাবাসী মুর জাতির অধীনস্থ হয় এবং আট শত বৎসর ক্রমাগত তাহাদের অধীন থাকিয়া, তাহাদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া পরে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফার্দিনাণ্ডের রাজত্ব কালে মুরদিগকে একেবারে দূরীভূত করিয়াছে। একদিন সুইজারলণ্ডও অষ্ট্রীয়ার ভীষণ পদাঘাত সহ্য করিয়াছিল—কিন্তু উইলিয়ম টেলের বীর্য্যবলে তাহার সে হীনাবস্থা অধিক দিন থাকে নাই। এইরূপে রুসিয়ার রুমিলিয়া তুর্কীদের অধীনে থাকিয়া পুনর্ব্বার স্বাধীন হইয়াছে। সুইডেন অনেক দিন পরাধীনতার পরে ডেন্‌দিগের হস্ত হইতে ষোড়শ শতাব্দীতে গষ্টেবস্ বেসারের বীর্য্যবলে স্বাধীন

হইয়াছে। ইংলণ্ডও ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।. এই কারণেই বোধ হয় এক্ষণে ইয়ুরোপীয় তুরস্কে মুসলমান-দিগের অধিকারও লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। বোধ হয়, শীঘ্রই সারভিয়া, ওয়ালেসিয়া, প্রভৃতি প্রদেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিবে, অধিকাংশ ইয়ুরোপীয় নীতিজ্ঞদিগের এইরূপ বিশ্বাস। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এক জাতি কখন চিরকাল অন্যজাতির অধীন থাকিতে পারে না—ইহাই ঐতিহাসিক নিয়ম। জেতৃজিত ভাব কখন চিরদিন থাকা সম্ভব নহে। জিতজাতি হয় ধ্বংশ হইবে, না হয় জেতার সহিত মিলিত হইয়া এক জাতি হইবে, না হয় পুনর্ব্বার স্বাধীন হইবে—ইহা ব্যতীত তাহাদের আর অন্য পরিণাম নাই।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, হিন্দুজাতির বিনষ্ট হইবার বা জেতৃজাতির সহিত সম্মিলিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, অতএব আর-বারের কথা আবার বলি, এখন অখণ্ডনীয় যুক্তির দ্বারা এই মাত্র সিদ্ধান্ত হইতে পারে, যে হিন্দুরা আবার স্বাধীন হইয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরব পুনর্ব্বার উদ্ভাসিত করিবেন।

আমরা এই স্থলে প্রসিদ্ধ লেখক আর্থর আর্নল্ডের কয়েকটি সার কথা এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া আমরা আমাদের মর্ম্মকথা শেষ করিলাম।

A man may be a very sincere defender of British rule in India, he may have the strongest conviction of the benifits which that rule is conferring and has bestowed, and may yet affirm that British rule cannot be permanent over 200,000,000 of people with whom conditions of climate appear to forbid that the British race should be assimilated.

ARTHUR ARNOLD M. P.
Fortnightly, September 1884.

এক ব্যক্তি অন্তরের সহিত ভারতে বৃটীশ রাজত্বের পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন, বৃটিশ শাসনে ভারতের যত উপকার হইয়াছে, বা হইতেছে সেই সমস্ত বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় ধারণা ও বিশ্বাস থাকিতে পারে, অথচ সেই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে পারেন, যে, ভারতের জল বায়ুর অবস্থা যেরূপ তাহাতে বৃটিশ জাতি ভারতবাসীদের সহিত মিলিত হওয়া অসম্ভব; সুতরাং বিশ কোটি ভারতবাসীর উপর বৃটিশ শাসন চিরস্থায়ী না হইবারই সম্ভাবনা।

বৈষ্ণবতত্ত্ব।

প্রকৃতি ও পুরুষ।

প্রকৃত বৈষ্ণব দ্বৈত কি অদ্বৈত বাদী তাহা আমরা আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ নহি। তিনি দ্বৈতবাদী হইয়াও অদ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈত-বাদী হইয়াও দ্বৈতবাদী। তাঁহার দ্বৈতবাদ প্রকৃতি ও পুরুষ লইয়া। তাঁহার অদ্বৈতবাদ সেই প্রকৃতি ও পুরুষের একাত্মতা প্রযুক্ত। যদিও তিনি সর্ব্বতো-ভাবে প্রকৃতি ও পুরুষবাদী, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি ও পুরুষ, সাঙ্খ্যের প্রকৃতি ও পুরুষের ন্যায়, ঠিক দুই ভিন্ন জাতীয় পদার্থ নহে। আমাদের বিষয়-দূষিত-দৃষ্টিতে, এই প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন জাতীয় পদার্থ স্বরূপে অনুভূত হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে, উভয়ে এক জাতীয় পদার্থ ;—একই আত্মা। লীলার্থে দুই,—বস্তুত এক। "জলেতে যেমন মীন, রসকেলি রাত্রি দিন, দোন তনু নহে ভিন, নিত্য লীলা অকারণ।" আত্মা একই ; তন্মধ্যে চিদাধার-স্ত্রী ও চিদংশ পুরুষ।

যখন এই স্ত্রী অংশ ও পুমংশ উভয়ে একত্রে—একাত্মভাবে বিরাজিত থাকে, তখন প্রকৃতির চিদ্গত অবস্থা। আর যখন প্রকৃতির কিয়দংশ পুংসংসর্গ-বিমুখ হইয়া বিকৃত হইতে থাকে, তখন সেই কিয়দংশের চিদ্বিমুখ অবস্থা; আর অবশিষ্টাংশ চিরসংসর্গে অবিকৃত থাকে, তাহার চিদ্গত অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় অব্যাহত থাকে। পুমংশ কদাপি এরূপ কোন অব-স্থার অধীন নহে।

উপরে যে যুগল তত্ত্ব বর্ণিত হইল, তাহা অদ্বৈত তত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। একই পরমাত্মা। তাঁহার একাংশ নিত্য নির্ব্বিকার, অব্যক্ত ও চিৎ-স্বরূপ; তাঁহার অপরাংশ বিকারপ্রবণ অর্থাৎ নির্ব্বিকার অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সবিকার ভাব ধারণ করিতে পারে। তাঁহার একাংশ নিত্য প্রশান্ত, নিত্য সুস্থির, নিত্য অচল; তাঁহার অপরাংশ সেই প্রশান্ত, সুস্থির ও অচল অবস্থা হইতে পরিবর্ত্তনের স্রোতে আন্দোলিত হইতে এবং অশান্ত, অস্থির ও সচল ভাব ধারণ করিতে পারে। তাঁহার একাংশ সর্ব্বদাই সৃষ্টির অতীত; তাঁহার অপরাংশ সৃষ্টির অতীত প্রদেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া

সৃষ্টির মায়িক লীলায় অঙ্গ ঢালিতে পারে।. তাঁহার একাংশ অরূপ ও অব্যক্ত; তাঁহার অপরাংশ সেই অরূপ ও অব্যক্ত ধাম পরিত্যাগ করিয়া বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে।

বৈষ্ণব এইরূপ অদ্বৈতবাদী হইয়াও এই প্রকৃতি ও পুরুষবাদী। তাঁহার প্রকৃতি চিদ্গত অবস্থায় নিত্য নির্ম্মল পরা প্রকৃতি; তাঁহার পুরুষ সেই নিত্য নির্ম্মল আত্মগত পরা প্রকৃতি বিহারী শুদ্ধ চৈতন্য। সেই নিত্য নির্ম্মল প্রকৃতি স্বভাবত অব্যক্ত, অবিকৃত, নির্গুণ, সর্ব্বদেশ ব্যাপী, নিষ্ক্রিয়, এক এবং অখণ্ড; সেই পুরুষও নিত্য অব্যক্ত, নিত্য নির্ব্বিকার, নিত্য নির্গুণ, নিত্য নিষ্ক্রিয়, নিত্য অকাম, নিত্য প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গব্যাপী, নিত্য প্রকৃতিরমণ, নিত্য প্রকৃতিমোহন এক এবং অখণ্ড শুদ্ধ চিৎ। সেই পুরুষ যদিও প্রকৃতিরমণ ও প্রকৃতিমোহন কিন্তু এই রমণ ও মোহন ক্রিয়া কেবল মাত্র সেই প্রকৃতিতে প্রকাশ পায়,—সেই প্রকৃতিকে চিন্ময়ী, আনন্দময়ী, প্রেমময়ী, চিদানন্দময়ী করে; পুরুষের মধ্যে তাহার লেশ মাত্রও প্রকাশ পায় না,—সেই পুরুষকে তদ্দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত করিতে পারে না। তিনি তন্মধ্যে অকাম ও নিষ্ক্রিয় থাকেন। প্রকৃতি এই পুরুষ সহবাসে যখন চিন্মোহিত হইয়া ব্যাপক কাল পরমানন্দ সম্ভোগ করেন, তখন তাহার কিয়দংশ খণ্ড ও স্খলিত হইয়া চিদ্গত অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হয়; পুরুষ এই প্রকৃতি সংসর্গে তাদৃশ বা ঈদৃশ কোন প্রকার বিকারের অধীন নহেন। কিন্তু সে অবস্থায় প্রকৃতির এই যে বিকৃতি, তাহা প্রকৃতির একদেশব্যাপী মাত্র, সর্ব্বদেশব্যাপী নহে। প্রকৃতির যে অংশ যখনই চিদ্গত অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা চিদানন্দময়, প্রেমের অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সৃষ্টির মলিন ব্যাপারে পরিণত হইতে থাকে; অবশিষ্টাংশ অখণ্ডিত থাকিয়া, চিদ্গত ও চিন্মোহিত অবস্থায় পুরুষের মধুর সহবাসে চিদানন্দ সম্ভোগ করে। সৃষ্টি ব্যাপারের পূর্ব্বে সমগ্র প্রকৃতি এই চিদ্গত ও চিন্মোহিত অবস্থায় স্বভাবত প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, পুরুষ সহবাসে নিত্য রাস-মহোৎসব সম্ভোগ করিতে থাকে; সৃষ্টি ব্যাপার সাঙ্গ হইলেও সমগ্র বহির্ম্মুখী প্রকৃতি স্বধামে প্রত্যাগত হইয়া অবশিষ্টাংশের সঙ্গে অখণ্ডিতরূপে সেই মহোৎসব সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়। তখন সমগ্র প্রকৃতি পুরুষের অঙ্গগত—স্বকীয় নৈর্ম্মল্য প্রযুক্ত অঙ্গগত এবং স্বকীয় নৈর্ম্মল্য প্রযুক্ত অকাম রমণে, অকারণ লীলায় বিমোহিত। কিন্তু এই অকাম রমণ, অকারণ লীলা

সমগ্র প্রকৃতি নিত্যকাল সহ্য করিতে পারে না। তাহার কিয়দংশ তদ্দ্বারা যথাসময়ে, কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণ বশতই হউক, অথবা স্বকীয় স্বভাব বশতই হউক, সেই চিদ্গত পরম অবস্থা হইতে বিকৃত ও স্খলিত হইয়া, স্বকীয় মালিন্য হেতু চিদ্বিমুখ হইতে থাকে এবং নিত্য লীলাধাম পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টিসাধনে বা সৃষ্টি পোষণে নিয়োজিত হয়। নির্ম্মল প্রশান্ত সমুদ্র যদি প্রবল বায়ুপ্রভাবে, ব্যাপক কাল বিতাড়িত হয়, তখন যেমন রাশি রাশি ফেণা সেই সমুদ্র গর্ভ হইতে উদ্গীরিত হইয়া সমুদ্র-বক্ষ আচ্ছাদন করে, এবং স্বীয় মালিন্য ও বিকৃতি প্রযুক্ত, সমুদ্র-দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তদুপরি ভাসমান হয়; চিদঙ্গ-বিহারিণী লীলাময়ী প্রকৃতি হইতে সৃষ্টির প্রথম উপকরণ সামগ্রীর উৎপত্তিও এইরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে। যথাসময়ে সেই ফেণরাশি যেরূপ, স্বকীয় মালিন্যভাব ও বিকৃতরূপ সম্বরণ করিয়া তদীয় উপাদান কারণ—সমুদ্রদেহে বিলীন হয়; সেই সৃষ্টিসাধন প্রথম উপকরণ সামগ্রীও যথাসময়ে, স্বকীয় মালিন্য ও বিকৃতি পরিহার ও স্বকীয় চিদ্বিমুখ ভাব প্রত্যাহার করিয়া তদীয় উপাদান কারণ—পরা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে। দ্বিতীয়াদি হইতে বর্ত্তমান জগতের সপ্তম উপকরণ সামগ্রী পর্য্যন্ত এইরূপে স্বকীয় উপাদান কারণ হইতে উৎপন্ন এবং স্বকীয় উপাদান কারণে বিলীন হইয়া থাকে।

যে ধামে সৃষ্টি নাই, বিকৃতি নাই, মালিন্য নাই; যে ধামে প্রকৃতি নিরন্তর চিদ্গত, চিন্মোহিত, ও চিদঙ্গ-বিহারী; যে ধামে প্রকৃতি নিত্য চিন্ময়ী, আনন্দময়ী, প্রেমময়ী; যে ধামে চিদানন্দের অকাম, অকারণ, নিত্যলীলার নিত্য সংঘটনা; যে ধামে নিত্য রাস মহোৎসবের কস্মিন্ কালেও বিরাম হয় না; সেই ধামই আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের পরম ধাম—তুরীয়ধাম। এই স্থান তাঁহার প্রকৃতি ও পুরুষের সুগুপ্ত বিলাস ভবন, তাঁহার বহু আদরের বৃন্দাবন ধাম। ব্যোম-পরব্যোমের সুদূর উপরে, বিচিত্রা বিজয়ার সুদূর পর পারে, গোলোক ধামেরও সুদূর উপরে এই পরম বৃন্দাবন ধাম প্রতিষ্ঠিত।

এই পরমধাম-চ্যুত, প্রকৃতির মলিনাংশই সৃষ্টির প্রথম পদার্থ—চিদ্বিমুখ মায়া প্রকৃতি। সাঙ্খ্য ইহাকে মহত্তত্ত্ব নামে উল্লেখ করেন, বেদান্ত ইহার নিত্যত্ব কল্পনা করিয়া লইয়া ইহাকে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই মায়া প্রকৃতি পরা প্রকৃতির পরিত্যজ্য মলিনাংশ হইতেই সর্ব্বদা পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে, এবং স্বকীয় পরিত্যজ্য মলিনাংশ দ্বারা,

তদীয় অধস্তন প্রকৃতি—সৃষ্টির দ্বিতীয় পদার্থকে সৃজন ও পোষণ করিয়া থাকে। পরা প্রকৃতি যতকাল তাহার পরম ধামের চিদ্গত অবস্থা হইতে চিদ্বিমুখ হইতে থাকিবে ততকাল তদীয় অধস্তন মায়া প্রকৃতি পুষ্টি লাভ করিতে থাকিবে। কিন্তু পরমধামস্থ পরা প্রকৃতির এই চিদ্বিমুখ প্রচ্যুতি প্রাপ্তির একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে বা প্রকৃতির স্বভাব বশত পরা প্রকৃতির কিয়দংশ মাত্র চিদ্বিমুখ পরিণাম প্রাপ্ত হয়; অবশিষ্টাংশ চিদ্বিমুখ বিকৃতির অতীত থাকিয়া নিত্যকাল চিদ্গত অবস্থায়, তাহার পরম ধামে অচ্যুত পদে অব্যাহত থাকে। তখনই তদীয় অধস্তন এই মায়া প্রকৃতির পুষ্টিলাভ বন্ধ হয়। সে তাহার সৃষ্টিসাধক পদার্থ—তাহার দেহের উপজীবিকা আর প্রাপ্ত হয় না।

এই মায়া প্রকৃতি, তাহার চিদ্বিমুখ অবস্থা সত্ত্বেও, চিদঙ্গ-বিহারী। কিন্তু পরা প্রকৃতি তদীয় শুদ্ধ চিদঙ্গে বিহার করিয়া যে প্রকার অঙ্গ-কান্তি ও মাধুর্য্য ভাব লাভ করেন, এই মায়া প্রকৃতি স্বীয় দেহ-মালিন্য হেতু সে প্রকার নির্ম্মল অবস্থা প্রাপ্ত হন না। চিৎ-সত্তার কোন প্রকার রূপান্তর সম্ভাবনা না থাকিলেও আধারানুসারে তদীয় রূপ কল্পিত হইয়া থাকে। আধারের নৈর্ম্মল্য হেতু চিৎসত্তার নৈর্ম্মল্য, আধারের মালিন্য হেতু চিৎসত্তার মালিন্য কল্পিত হইয়া থাকে। আধার-গুণে জ্যোতিঃ-পদার্থের ঔজ্জ্বল্যও এইরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। তাড়িতে জ্যোতিঃ-পদার্থের যে ঔজ্জ্বল্য কল্পিত হয়, বাষ্পের মালিন্য প্রযুক্ত তাহাতে সে পদার্থের সে ঔজ্জ্বল্য কল্পিত হয় না। চিৎসত্তার বাস্তবিক কোন রূপ নাই, প্রকৃতির নির্ম্মল ও মলিন নানাবিধ রূপেই তাহার রূপ কল্পিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি অবিকৃতই থাকুন, আর বিকৃতই হউন; চিদ্গতই থাকুন, আর চিদ্বিমুখই হউন; চিৎসঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবার নহে। তবে পরা প্রকৃতি স্বীয় স্বরূপের নৈর্ম্মল্য হেতু চিৎ-সংসর্গে যেরূপ শুদ্ধ মাধূর্য্য-ভাব—নির্ম্মল চিদানন্দ ভাব ধারণ করিয়া থাকেন, মায়া প্রকৃতি তাহার অপেক্ষাকৃত মলিন দেহে চিৎ-সংসর্গে অপেক্ষাকৃত মলিন ভাব ধারণ করিয়া অতুল অনন্ত ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হয়েন। পরা প্রকৃতির ন্যায় মায়া প্রকৃতিরও লীলাধাম আছে। আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব তাহাকে গোলোকধাম অভিধানে অভিহিত করিয়া থাকেন। পরম ধাম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া প্রকৃতি এই ভাবে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হন। এই মায়া প্রকৃতি ও তাহার প্রসূতি পরম ধামস্থ পরা প্রকৃতির ন্যায় দ্বিবিধ অবস্থার অধীন;—

স্বকীয় চিদ্গত ও স্বকীয় চিদ্বিমুখ অবস্থা অথবা কেন্দ্রগত ও কেন্দ্রবিমুখ অবস্থা। মায়া যখন তাহার লীলাধামে থাকিয়া চিৎসংসর্গে অনন্ত ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হইয়া,অসীম সন্তোষে কালযাপন করেন এবং সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তির আশ্রয় হইয়া ঈশ্বর অভিমানে অনন্ত তৃপ্তি অনুভব করেন, তখন মায়ার স্বকীয় চিদ্গত বা কেন্দ্রগত অবস্থা। গোলোকধামে মায়ার এই অবস্থা অব্যাহত। এই ধামে সমস্ত মায়িক জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত স্ফূর্ত্তি, সমস্ত বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবের অসীম বিকাশ। কিন্তু তদীয় চিৎ-সংসর্গে এই ঐশ্বর্য্য ভোগে অসহিষ্ণু হইয়া মায়ার কিয়দংশ অপেক্ষাকৃত মলিন ও বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়া, স্বকীয় মালিন্য ও বিকৃতি প্রযুক্ত, স্বকীয় চিদ্গত বা কেন্দ্রগত অবস্থা হইতে বিচ্যুত ও অপেক্ষাকৃত চিদ্বিমুখ বা কেন্দ্রবিমুখ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নির্ম্মল ঐশ্বর্য্যের আস্পদ সেই গোলোকধামে, সেই মলিনাংশের তখন আর স্থান নাই। এই দ্বিতীয় চিদ্বিমুখ প্রকৃতিকে সাঙ্খ্য 'অহংতত্ত্ব',নামে, বেদান্ত 'অবিদ্যা' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। গোলোকধাম হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রকৃতি এবার এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত। ইহাই প্রকৃতির দ্বিতীয় বিচ্যুতি। যেরূপ মায়ার পুষ্টিসাধন পরার মলিনাংশ হইতে, এই অহংতত্ত্বেরও পুষ্টি-সাধন সেইরূপ মায়ার মলিনাংশ হইতে। পরা প্রকৃতির যেরূপ অক্ষয় ও অচ্যুত অংশ পরম ধামে নিত্যকাল অব্যাহত থাকে; মায়া প্রকৃতির সেইরূপ অক্ষয় ও অচ্যুত অংশ গোলোক ধামে সৃষ্টির প্রলয় পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই অহংতত্ত্ব বা অবিদ্যার লীলা-ধাম আছে এবং পরা ও মায়ার ন্যায় দ্বিবিধ অবস্থার অধীন;—স্বকীয় চিদ্গত বা কেন্দ্রগত এবং স্বকীয় চিদ্বিমুখ বা কেন্দ্রবিমুখ অবস্থা পরা ও মায়া যে ভাবে ও যে নিয়মে স্ব স্ব মালিন্য প্রযুক্ত চিদ্বিমুখ বা কেন্দ্রবিমুখ প্রচ্যুতি প্রাপ্ত হয়, এই অহংতত্ত্ব বা অবিদ্যা প্রকৃতি অবিকল সেই ভাবে ও সেই নিয়মে স্বধাম হইতে প্রচ্যুত হয় এবং অধস্তন প্রকৃতিকে উপাদান প্রদান করিয়া থাকে। এই অহংতত্ত্ব বা অবিদ্যা প্রকৃতি, ত্রিগুণাত্মিকা হইলেও, মায়ার ন্যায় সত্ত্ব-প্রধানা নহে, স্বকীয় মালিন্য হেতু রজঃ ও তমঃ প্রধানা। এই জন্য অজ্ঞান ও ভ্রমপ্রমাদ বিশিষ্টা এবং স্বকীয় মালিন্যের ন্যূনাধিক্য প্রযুক্ত বহু প্রকার অবস্থাপন্না। এই অহংতত্ত্ব বা অবিদ্যা স্বকীয় মলিনাংশ দ্বারা পূর্ব্ব বর্ণিত নিয়ম ও প্রণালীর অনুগত হইয়া যাহাকে উপাদান ও পুষ্টি-প্রদান করিয়া থাকে, তাহাই প্রথম তন্মাত্রা আকাশ। ইহাই চিদ্বিমুখ

প্রকৃতির তৃতীয় পরিণাম। এই আকাশের মালিনাংশ হইতে দ্বিতীয় তন্মাত্রা বায়ু পূর্ব্বানুরূপ উপাদান ও পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। ইহাই চিদ্বিমুখ প্রকৃতির চতুর্থ পরিণাম। এই বায়ুর মলিনাংশ হইতে তদ্রূপ তৃতীয় তন্মাত্রা তেজ উৎপন্ন ও পুষ্ট হয়। ইহাই চিদ্বিমুখ প্রকৃতির পঞ্চম পরিণাম। এই তেজের মলিনাংশ হইতে তদ্রূপ চতুর্থ তন্মাত্রা জল উৎপত্তি ও পুষ্টি লাভ করে। ইহাই চিদ্বিমুখ প্রকৃতির ষষ্ঠ পরিণাম। এই জলের মলিনাংশ সেইরূপ পঞ্চম বা শেষ তন্মাত্রা ক্ষিতিকে উপাদান ও পুষ্টি বিতরণ করিয়া অস্তিত্ববান্ করে। ইহাই চিদ্বিমুখ প্রকৃতির সপ্তম পরিণাম। এই ক্ষিতি স্বতন্ত্র ভাবে উপাদান ও পুষ্টি বিতরণে অন্য কোন তন্মাত্রা বা সূক্ষ্ম ভূত সৃষ্টির কারণ হয় নাই; কিন্তু অন্য চতুর্ব্বিধ তন্মাত্রার সঙ্গে মিলিত হইয়া স্থূল ভূত সকল উৎপন্ন করিয়াছে। মায়া স্বকীয় ঐশী শক্তি বলে এই স্থূল পঞ্চ হইতে এই প্রকাণ্ড বিশ্ব সৃজন করিয়া জীব জন্তুর আলয় করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাই চিদ্বিমুখ প্রকৃতির অষ্টম বা শেষ পরিণাম। এই জগতের মধ্যে প্রকৃতির নানাবিধ পরিণাম ও বিকৃতি দৃষ্ট হয় কিন্তু এই সকল পরিণাম ও বিকৃতিতে প্রকৃতি কেন্দ্রচ্যুত হইয়া আর চিদ্বিমুখ হয় না। প্রকৃতির চিদ্বিমুখ যাত্রার এখানেই বিরাম হইল।

প্রকৃতি যখন এই অষ্টম বিকৃতির অধীন তখন তাহা চিদন্ধ, তখন তাহার চিৎসত্ত্বার অনুভব যতদূর মন্দীভূত হইবার তাহা হইয়াছে সুতরাং তাহার আর অপেক্ষাকৃত চিদ্বিমুখ হইবার স্থল নাই। চিৎসংসর্গ হইতে প্রকৃতি স্বীয় মালিন্য হেতু যতদূর দূরস্থিত হইতে পারে তাহা হইয়াছে, সেই চিৎসংসর্গ এখন আর অনুভূত না হওয়াতে তাহার আর অসহ্য নহে; তাহার আর তাহা হইতে মুখ ফিরাইতে হয় না। প্রকৃতি চিদন্ধ হওয়াতে তদীয় চিদ্বিমুখ পরিণাম বন্ধ হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব মতে এই অষ্টম বিকৃতিই প্রকৃতির শেষ বিকৃতি। প্রকৃতি এই অষ্টম বিকৃতির অবস্থায় কতকাল অবস্থিত থাকিবে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। কিন্তু তিনি নিশ্চয় জানেন, যে, কোন অনির্দ্দিষ্ট নিয়মের বা স্বভাবের অনুগত হইয়া প্রকৃতি যথা সময়ে চিদভিমুখ অবস্থার অধীন হইবে। স্থূল পঞ্চ, সূক্ষ্ম পঞ্চে লয় পাইবে। ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম চিদভিমুখ আকর্ষণে স্ব স্ব উপাদান কারণে প্রবিষ্ট হইয়া লয় পাইবে। অহংতত্ত্ব বা অবিদ্যা, মহত্তত্ত্ব ও মায়াতে অনুপ্রবেশ করিবে; মায়া পরম ধামে

প্রত্যাগত হইয়া পরার নির্ম্মল অঙ্গে আত্ম বিসর্জ্জন করিবে; পরা পূর্ণাঙ্গে চিদ্গত হইয়া পূর্ব্বস্বরূপ চিন্মোহিত ভাবে বিরাজ করিতে থাকিবে। পরম ধামে প্রকৃতি প্রেমানন্দে আত্মহারা, সুতরাং তখন তাহার পরম শান্তির অবস্থা। সৃষ্টির উপক্রম হইতে যতদিন না সৃষ্টির পুষ্টিলাভ বন্ধ হয়, ততদিন তাহার চিদ্বিমুখ অবস্থা। সৃষ্টির স্থিতি কালে, যদিও প্রকৃতি কেন্দ্রগত থাকিয়া অশেষ পরিণামের অধীন থাকেন, কিন্তু তাঁহার চিদ্বিমুখ পরিণাম বন্ধ হওয়াতে তখনও তাঁহার শান্তির অবস্থা। প্রলয়ের সূত্রপাতে প্রকৃতির চিদভিমুখ অবস্থা। প্রলয় কার্য্য সমাধা হইলে প্রকৃতির আবার পরম শান্তির অবস্থা। জীবের শ্বাস বায়ু প্রকৃতির কতিপয় অবস্থার অবিকল অনুকরণ করিয়া থাকে। জীবের শ্বাসবায়ু মূলাধার বাসী অপান বায়ুতে সমান বায়ু যোগে আবদ্ধ থাকিয়া দেহাভ্যন্তরে, ফুস্ফুসের মধ্যে বাস করে। পরে স্বভাবত একবার বহির্ম্মুখ হইতেছে এবং বহির্ম্মুখে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া, আবার অন্তর্ম্মুখে দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতেছে; এবং দেহাভ্যন্তরে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া আবার বহির্ম্মুখে পুনর্যাত্রা করিতেছে। অপান বায়ুতে আবদ্ধ বলিয়া, শ্বাস বায়ু তাহার বহির্গমন কালে, দেহাভ্যন্তর হইতে সমস্ত বহির্গত হইয়া যায় না কিয়দংশ তন্মধ্যে বদ্ধ থাকে। শ্বাস বায়ু রেচক পূরক কুম্ভক ও জীবের কামনাধীন নহে। অকামে স্বভাবত সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহা প্রকৃতির গতিবিধির সম্পূর্ণ অনুরূপ। প্রকৃতিও অবিকল সেই ভাবে একবার পরম ধাম পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টিলীলায় বহির্গত হইতেছে এবং সৃষ্টিলীলায় কিয়ৎকাল যাপন করিয়া লীলা সম্বরণ পূর্ব্বক আবার স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে, এবং কিয়ৎকাল তথায় যাপন করিয়া আবার সৃষ্টিলীলায় পুনঃপ্রবৃত্ত হইতেছে।

উপরে যে অষ্টবিধ প্রকৃতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তদ্ভিন্ন কয়েকটি শাখা প্রকৃতি আছে;—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি। সাঙ্খ্যমতে ইহারা অহং পদার্থের শাখা; বেদান্ত মতে ইহারা আকাশাদি সূক্ষ্মপঞ্চ হইতে উৎপন্ন।

প্রস্তাবিত বিষয়ে আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের দার্শনিক মত সাঙ্খ্যদর্শনের অনুরূপ। কিন্তু প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে তাহা সম্পূর্ণ সাঙ্খ্য নহে, তাহাতে বেদান্তেরও ভাঁজ আছে। কপিলের সঙ্গে কয়েক স্থলে তাঁহার মতভেদও দৃষ্ট হয়। কপিলের মৌলিক প্রকৃতি এক, আত্মা অসংখ্য-অনন্ত। ইহাঁর

আত্মাও এক, প্রকৃতিও এক। সাঙ্খ্যের গণনারম্ভ দুই হইতে। ইঁহার গণনারম্ভ এক হইতে। এবিষয়ে বরং তিনি বেদান্তের সঙ্গে এক মত বেদান্তের গণনারম্ভও এক হইতে। সাঙ্খ্য তাঁহার একমাত্র মৌলিক প্রকৃতির সন্নিধানে অসংখ্য পুরুষ (আত্মা) স্থাপন করিয়া প্রকৃতির সতীত্ব লোপ করিয়াছেন। কপিল শুষ্কজ্ঞানী বা শুষ্ক দার্শনিক মাত্র। তাঁহার দার্শনিক চক্ষু—যারপর নাই সূক্ষ্ম হইলেও, তাঁহার প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে প্রেমলীলা আবিষ্কৃত করিতে পারেন নাই এবং বিশুদ্ধ প্রেমভক্তিজনিত- নির্ম্মল অনুভবের অভাবে সেই উভয়ের মধ্যে সে আত্মীয়তা ও মধুর সম্বন্ধ দেখিতে পান নাই, যাহা আমাদের আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব ভক্তি ও প্রেমযোগে উপলব্ধি করিয়া অপার আনন্দ রস আস্বাদন করেন। সাঙ্খ্যের উপলব্ধি প্রকৃতির সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণাম পর্য্যন্ত। আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব বলেন, যদি প্রকৃতি, পুরুষের কেহই নহেন, তবে ইহাঁকে সন্নিধানে পাইয়া উহাঁর সর্ব্বাঙ্গ কেন এরূপ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। বেদান্ত, হয় পরা প্রকৃতি দেখিতে পান নাই, না হয় শুদ্ধচিৎ সত্তা উপলব্ধি করেন নাই। সম্ভবত তাঁহার পরব্রহ্ম আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের চিদ্গত পরা প্রকৃতি মাত্র ; কেননা বেদান্তের পরব্রহ্ম, আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের পরা প্রকৃতির ন্যায় চিদানন্দময়। বেদান্তের পরব্রহ্ম সৃষ্টিকার্য্যার্থ এক চতুর্থাংশ মাত্র প্রদান করিয়াছেন, অবশিষ্ট তৃতীয়াংশে তুরীয় ধামে বিরাজিত। আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের পরা প্রকৃতিও তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ চিৎ সত্তাকে, এবং স্বকীয় অঙ্গের কিয়দংশকে অবিকৃত রাখিয়া অবশিষ্টাংশে সৃষ্টি ব্যাপারে নিয়োজিত। ইহাতে এরূপ অনুমিত হইতে পারে যে, বেদান্তের পরব্রহ্ম আর আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের চিৎযুক্ত প্রকৃতি একই পদার্থ। বেদান্তের এই পরব্রহ্ম সত্তাই সর্ব্বস্ব। তাঁহার এই পরব্রহ্ম-সত্তা আবার-দ্বিতীয় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের অসদ্ভাব সত্বেও, অকারণে বা কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে নিত্য ছায়াবিশিষ্ট।

এই শুদ্ধ চিৎ আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের পরম ধামের শ্রীকৃষ্ণ, এই পরা প্রকৃতি তাঁহার শ্রীরাধা। প্রকৃতির অষ্টবিধ বিকৃতি শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপ অষ্ট সখী। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বঘটে। শ্রীরাধারও সঙ্গে আছেন, সখীদেরও সঙ্গে সঙ্গে আছেন। মধ্যে পরম ধামে রাধাকৃষ্ণ বিরাজিত; সেই পরম ধামের চতুঃপার্শ্বে এই অষ্ট সখী স্ব স্ব শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া রাসচক্রে পরিক্রমণ করিতেছেন। সমগ্র সৃষ্টি সেই পরম ধামের চতুঃপার্শ্বে একটি রাসচক্রে ভ্রাম্যমান।

প্রকৃতি সৃষ্টির মধ্যে কোটী কোটী রূপ ধারণ করিয়া লীলাময়ী; শ্রীকৃষ্ণও এই কোটী কোটী রূপের সঙ্গে বিরাজিত। এ রাস কেবল অষ্ট প্রধানা সখীর সঙ্গে নহে; কোটী কোটী সখী সঙ্গেও রাসবিলাস চলিতেছে। এই মহারাসচক্রে কোটী কোটী প্রকৃতি কোটী কোটী পুরুষ সঙ্গে ভ্রাম্যমান। কিন্তু মূলে একটি প্রকৃতি ও একটি পুরুষ মাত্র—একটি শ্রীরাধা ও একটি শ্রীকৃষ্ণ মাত্র। আমাদের আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের প্রেমমার্জ্জিত নেত্র সৃষ্টির মায়িক লীলার মধ্যেও এই মহারাস দর্শন করে। কিন্তু এই বাহিরের রাসে এই বহিস্থা প্রকৃতি নিত্যকাল সন্তুষ্ট থাকিবার নহেন। চিদাভিমুখ অবস্থায় প্রকৃতি তাঁহার বাহ্যিক রাসমণ্ডল ভঙ্গ করিয়া প্রিয় সখী শ্রীরাধার নির্ম্মল অঙ্গে নির্লিপ্ত হইয়া পরমধামে শ্রীকৃষ্ণের মধুর সহবাস লাভ করিবার জন্য স্বয়ং উন্মাদিনী ও অভিসারিণী। দুর্জ্জয় মানভরে কৃষ্ণ বিমুখ হইয়া লীলা ধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন দুর্জ্জয় কৃষ্ণ প্রেমের আকর্ষণে আবার চিদাভিমুখী—কৃষ্ণাভিমুখী। কৃষ্ণকে ছাড়িয়া, মলিনাবস্থায় কৃষ্ণসখী কত কাল থাকিতে পারে? এখন হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! করিতে করিতে, পরম ধামের পরম রাসে মিলিত হইবার জন্য সৃষ্টির এই সোণার সংসার ছারখার করিয়া চলিলেন। এস, কে এই অননুকরণীয় অকারণ জাগ্রত বৈরাগ্যের অনুকরণ করিবে; এস কে এই কৃষ্ণসখীর অনুগ হইবে; এস কে উজান পথে পরম ধামে যাত্রা করিবে; এস কে পরম ধামের রাসবিলাসে সম্মিলিত হইয়া প্রেমানন্দে আত্মহারা হইবে; বৈষ্ণব তোমাকে ডাকিতেছেন।

রাজপথের কথা।

আমি রাজপথ। অহল্যা যেমন মুনির শাপে পাষাণ হইয়া পড়িয়াছিল, আমিও যেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিদ্রিত সুদীর্ঘ অজগর সর্পের ন্যায় অরণ্য পর্ব্বতের মধ্য দিয়া, বৃক্ষশ্রেণীর ছায়া দিয়া, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের বক্ষের উপর দিয়া, দেশদেশান্তর বেষ্টন করিয়া বহুদিন ধরিয়া জড়শয়নে শয়ান রহিয়াছি। অসীম ধৈর্য্যের সহিত ধূলায় লুটাইয়া শাপান্ত কালের জন্য

প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আমি চিরদিন স্থির অবিচল, চিরদিন একই ভাবে শুইয়া আছি, কিন্তু তবুও আমার এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম নাই। এতটুকু বিশ্রাম নাই যে, আমার এই কঠিন শুষ্ক শয্যার উপরে একটি মাত্র কচি স্নিগ্ধশ্যামল ঘাস উঠাইতে পারি; এতটুকু সময় নাই যে আমার শিয়রের কাছে অতি ক্ষুদ্র একটি নীলবর্ণের বনফুল ফুটাইতে পারি! কথা কহিতে পারি না, অথচ অন্ধভাবে সকলি অনুভব করিতেছি! রাত্রিদিন পদশব্দ, কেবলি পদশব্দ। আমার এই গভীর জড়নিদ্রার মধ্যে লক্ষ লক্ষ চরণের শব্দ অহর্নিশি দুঃস্বপ্নের ন্যায় আবর্ত্তিত হইতেছে। আমি চরণের স্পর্শে হৃদয় পাঠ করিতে পারি। আমি বুঝিতে পারি, কে গৃহে যাইতেছে, কে বিদেশে যাইতেছে, কে কাজে যাইতেছে, কে বিশ্রামে যাইতেছে, কে উৎসবে যাইতেছে, কে শ্মশানে যাইতেছে। যাহার সুখের সংসার আছে, স্নেহের ছায়া আছে, সে প্রতি পদক্ষেপে সুখের ছবি আঁকিয়া আঁকিয়া চলে; সে প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে আশার বীজ রোপিয়া রোপিয়া যায়, মনে হয় যেখানে যেখানে তাহার পা পড়িয়াছে, সেখানে যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে একেকটি করিয়া লতা অঙ্কুরিত পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। যাহার গৃহ নাই আশ্রয় নাই, তাহার পদক্ষেপের মধ্যে আশা নাই অর্থ নাই, তাহার পদক্ষেপের দক্ষিণ নাই বাম নাই, তাহার চরণ যেন বলিতে থাকে, আমি চলিই বা কেন থামিই বা কেন, তাহার পদক্ষেপে আমার শুষ্কধূলি যেন আরও শুকাইয়া যায়।

পৃথিবীর কোন কাহিনী আমি সম্পূর্ণ শুনিতে পাই না আজ শত শত বৎসর ধরিয়া আমি কত লক্ষ লোকের কত হাসি কত গান কত কথা শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু কেবল খানিকটা মাত্র শুনিতে পাই। বাকিটুকু শুনিবার জন্য যখন আমি কাণ পাতিয়া থাকি, তখন দেখি সে লোক আর নাই। এমন কত বৎসরের কত ভাঙ্গা কথা ভাঙ্গা গান আমার ধূলির সহিত ধূলি হইয়া গেছে, আমার ধূলির সহিত উড়িয়া বেড়ায়, তাহা কি কেহ জানিতে পায়! ঐ শুন, একজন গাহিল, "তারে বলি বলি আর বলা হল না"—আহা, একটু দাঁড়াও, গানটা শেষ করিয়া যাও, সব কথাটা শুনি! কই আর দাঁড়াইল! গাহিতে গাহিতে কোথায় চলিয়া গেল, শেষটা শোনা গেল না। ঐ একটি মাত্র পদ অর্দ্ধেক রাত্রি ধরিয়া আমার কাণে ধ্বনিত হইতে থাকিবে। মনে মনে ভাবিব, ও কে গেল! কোথায় যাইতেছে না জানি! যে কথাটা

বলা হইল না, তাহাই কি আবার বলিতে যাইতেছে! এবার যখন পথে আবার দেখা হইবে, সে যখন মুখ তুলিয়া ইঁহার মুখের দিকে চাহিবে, তখন বলি বলি করিয়া আবার যদি বলা না হয়! তখন নত শির করিয়া মুখ ফিরাইয়া অতি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিবার সময় আবার যদি গায় "তারে বলি বলি আর বলা হল না।"

সমাপ্তি ও স্থায়িত্ব হয়ত কোথাও আছে, কিন্তু আমি ত দেখিতে পাই না। একটি চরণচিহ্নও ত আমি বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি না। অবিশ্রাম চিহ্ন পড়িতেছে, আবার নূতন পদ আসিয়া অন্য পদের চিহ্ন মুছিয়া যাইতেছে। যে চলিয়া যায় সে ত পশ্চাতে কিছু রাখিয়া যায় না, যদি তাহার মাথার বোঝা হইতে কিছু পড়িয়া যায় সহস্র চরণের তলে অবিশ্রাম দলিত হইয়া কিছুক্ষণেই তাহা ধূলিতে মিশাইয়া যায়। তবে এমনও দেখিয়াছি বটে, কোন কোন মহাজনের পণ্যস্তূপের মধ্য হইতে এমন সকল অমর বীজ পড়িয়া গেছে, যাহা ধূলিতে পড়িয়া অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া আমার পার্শ্বে স্থায়ীরূপে বিরাজ করিতেছে, এবং নূতন পথিকদিগকে ছায়া দান করিতেছে।

আমি কাহারও লক্ষ্য নহি, আমি সকলের উপায় মাত্র। আমি কাহারও গৃহ নহি, আমি সকলকে গৃহে লইয়া যাই। আমার অহরহ এই শোক, আমাতে কেহ চরণ রাখে না, আমার উপরে কেহ দাঁড়াইতে চাহে না। যাহাদের গৃহ সুদূরে অবস্থিত, তাহারা আমাকেই অভিশাপ দেয়, আমি যে পরম ধৈর্য্যে তাহাদিগকে গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিই তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা কই পাই। গৃহে গিয়া বিরাম, গৃহে গিয়া আনন্দ, গৃহে গিয়া সুখসম্মিলন, আর আমার উপরে কেবল শ্রান্তির ভার, কেবল অনিচ্ছাকৃত শ্রম, কেবল বিচ্ছেদ। কেবল কি সুদূর হইতে, গৃহ-বাতায়ন হইতে মধুর হাস্যলহরী পাখা তুলিয়া সূর্য্যালোকে বাহির হইয়া আমার কাছে আসিবামাত্র সচকিতে শূন্যে মিলাইয়া যাইবে! গৃহের সেই আনন্দের কণা আমি কি একটুখানি পাইব না!

কখন কখন তাহাও পাই। বালক বালিকারা হাসিতে হাসিতে কলরব করিতে করিতে আমার কাছে আসিয়া খেলা করে। তাহাদের গৃহের আনন্দ তাহারা পথে লইয়া আসে। তাহাদের পিতার আশীর্ব্বাদ মাতার স্নেহ গৃহ হইতে বাহির হইয়া পথের মধ্যে আসিয়াও যেন গৃহ রচনা করিয়া দেয়! আমার ধূলিতে তাহারা স্নেহ দিয়া যায়। আমার ধূলিকে তাহারা রাশীকৃত

করে, ও তাহাদের ছোট ছোট হাতগুলি দিয়া সেই স্তূপকে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া পরম স্নেহে ঘুম পাড়াইতে চায়। বিমল হৃদয় লইয়া বসিয়া বসিয়া তাহার সহিত কথা কয়। হায় হায়, এত স্নেহ পাইয়াও সে তাহার উত্তর দিতে পারে না!

ছোট ছোট কোমল পা-গুলি যখন আমার উপর দিয়া চলিয়া যায়, তখন আপনাকে বড় কঠিন বলিয়া মনে হয়; মনে হয় উহাদের পায়ে বাজিতেছে! কুসুমের দলের ন্যায় কোমল হইতে সাধ যায়! রাধিকা বলিয়াছেন—

"যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চলি যাতা,
তাঁহা তাঁহা ধরণী হই এ মঝু গাতা!"

অরুণ চরণগুলি এমন কঠিন ধরণীর উপরে চলে কেন! কিন্তু তা'যদি না চলিত, তবে বোধ করি কোথাও শ্যামল তৃণ জন্মিত না!

প্রতিদিন যাহারা নিয়মিত আমার উপরে চলে, তাহাদিগকে আমি বিশেষরূপে চিনি। তাহারা জানে না তাহাদের জন্য আমি প্রতীক্ষা করিয়া থাকি! আমি মনে মনে তাহাদের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছি। বহুদিন হইল, এমনি এক জন কে, তাহার কোমল চরণ দুখানি লইয়া প্রতিদিন অপরাহ্নে বহুদূর হইতে আসিত—ছোট দুটি নূপুর রুনুঝুনু করিয়া তাহার পায়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিত। বুঝি তাহার ঠোঁট দুটি কথা কহিবার ঠোঁট নহে, বুঝি তাহার বড় বড় চোখ দুটি সন্ধ্যার আকাশের মত বড় ম্লান ভাবে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। যেখানে ঐ বাঁধান বটগাছের বামদিকে আমার একটি শাখা লোকালয়ের দিকে চলিয়া গেছে, সেখানে সে শ্রান্তদেহে গাছের তলায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। আর-এক-জন-কে দিনের কাজ সমাপন করিয়া অন্য মনে গান গাহিতে গাহিতে সেই সময়ে লোকালয়ের দিকে চলিয়া যাইত। সে বোধ করি, কোন দিকে চাহিত না, কোনখানে দাঁড়াইত না—হয় ত বা আকাশের তারার দিকে চাহিত, তাহার গৃহের দ্বারে গিয়া পূরবী গান সমাপ্ত করিত। সে চলিয়া গেলে বালিকা শ্রান্তপদে আবার যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিয়া যাইত। বালিকা যখন ফিরিত তখন জানিতাম অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে; সন্ধ্যার অন্ধকার-হিম-স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করিতে পারিতাম। তখন গোধূলীর কাকের ডাক একেবারে থামিয়া যাইত; পথিকেরা আর বড় কেহ চলিত না। সন্ধ্যার বাতাসে থাকিয়া থাকিয়া বাঁশবন ঝর্ঝর্

ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ করিয়া উঠিত। এমন কতদিন, এমন প্রতিদিন, সে ধীরে ধীরে আসিত ধীরে ধীরে যাইত। একদিন ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি অপরাহ্ণে যখন বিস্তর আম্র মুকুলের কেশর বাতাসে ঝরিয়া পড়িতেছে—তখন আর-একজন যে আসে সে আর আসিল না। সে দিন অনেক রাত্রে বালিকা বাড়িতে ফিরিয়া গেল। যেমন মাঝে মাঝে গাছ হইতে শুষ্ক পাতা ঝরিয়া পড়িতেছিল, তেমনি মাঝে মাঝে দুই এক ফোঁটা অশ্রুজল আমার নীরস তপ্ত ধূলির উপরে পড়িয়া মিলাইতেছিল। আবার তাহার পরদিন অপরাহ্ণে বালিকা সেইখানে সেই তরুতলে আসিয়া দাঁড়াইল কিন্তু সে দিনও আর-একজন আসিল না। আবার রাত্রে সে ধীরে ধীরে বাড়িমুখে ফিরিল। কিছুদূরে গিয়া আর সে চলিতে পারিল না। আমার উপরে ধূলির উপরে লুটাইয়া পড়িল। দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিল! কে গো মা, আজি এই বিজন রাত্রে আমার বক্ষেও কি কেহ আশ্রয় লইতে আসে! তুই যাহার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিলি সে কি আমার চেয়ে কঠিন! তুই যাহাকে ডাকিয়া যাহার সাড়া পাইলি না, সে কি আমার চেয়েও মূক! তুই যাহার মুখের পানে চাহিলি সে কি আমার চেয়েও অন্ধ। বালিকা উঠিল, দাঁড়াইল, চোখ মুছিল—পথ ছাড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তী বনের মধ্যে চলিয়া গেল। হয় ত সে গৃহে ফিরিয়া গেল, হয়ত এখনো সে প্রতিদিন শান্তমুখে গৃহের কাজ করে—হয় ত সে কাহাকেও কোন দুঃখের কথা বলে না; কেবল এক এক দিন সন্ধ্যাবেলায় গৃহের অঙ্গনে চাঁদের আলোতে পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকে, কেহ ডাকিলেই আবার তখনই চমকিয়া উঠিয়া ঘরে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পরদিন হইতে আজ পর্য্যন্তও আমি আর তাহার চরণস্পর্শ অনুভব করি নাই।

এমন কত পদশব্দ নীরব হইয়া গেছে, আমি কি এত মনে করিয়া রাখিতে পারি! কেবল সেই পায়ের করুণ নূপুরধ্বনি এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে! কিন্তু আমার কি আর একদণ্ড শোক করিবার অবসর আছে! শোক কাহার জন্য করিব! এমন কত আসে, কত যায়!

কি প্রখর রৌদ্র! উহু-হুহু! এক এক বার নিশ্বাস ফেলিতেছি আর তপ্তধূলা সুনীল আকাশ ধূসর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ধনী দরিদ্র, সুখী দুঃখী, জরা যৌবন, হাসিকান্না, জন্ম মৃত্যু, সমস্তই আমার উপর দিয়া একই নিশ্বাসে ধূলির স্রোতের মত উড়িয়া চলিয়াছে। এই জন্য পথের হাসিও নাই

কান্নাও নাই। গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্ত্তমানের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের আশাপথ চাহিয়া থাকে। কিন্তু পথ প্রতি বর্ত্তমান নিমেষের শত সহস্র নূতন অভ্যাগতকে লইয়াই ব্যস্ত। এমন স্থানে নিজের পদগৌরবের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত সদর্পে পদক্ষেপ করিয়া কে নিজের চির-চরণ-চিহ্ন রাখিয়া যাইতে প্রয়াস পাইতেছে! এখানকার বাতাসে যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যাইতেছ, তুমি চলিয়া গেলে কি তাহারা তোমার পশ্চাতে পড়িয়া তোমার জন্য বিলাপ করিতে থাকিবে, নূতন অতিথিদের চক্ষে অশ্রু আকর্ষণ করিয়া আনিবে? বাতাসের উপরে বাতাস কি স্থায়ী হয়? না না বৃথা চেষ্টা! আমি কিছুই পড়িয়া থাকিতে দিই না, হাসিও না, কান্নাও না। আমিই কেবল পড়িয়া আছি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রতিমা।

জগদীশ্বরের পূজায় কি জন্য প্রতিমূর্ত্তি আবশ্যক তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, বলিয়াছি যে প্রতিমূর্ত্তিতে জগদীশ্বরের রূপ এবং গুণ প্রস্ফুটিত দেখিলে মন তাঁহার পূজায় উৎসাহিত, উত্তেজিত এবং মুগ্ধ হইয়া থাকে—মানুষ ঈশ্বরে মজিয়া যায়। প্রতিমূর্ত্তির দুইটি মাত্র কার্য্য—শিক্ষা এবং উদ্বোধন। কিন্তু যে প্রকার প্রতিমূর্ত্তির কথা বলিয়াছি, অর্থাৎ প্রতিভাপ্রসূত উন্নতশিল্পসঙ্গত প্রতিমূর্ত্তি, তাহা সকল লোকে বুঝিতে পারে না, যাহারা সুশিক্ষিত তাহারাই কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারে এবং যাহারা শিল্পশাস্ত্রের সূক্ষ্ম নিয়মাদি পর্য্যন্ত অবগত তাহারাই সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে। কলিকাতার মহামেলায় অনেকগুলি ছবি প্রদর্শিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি ভাবময় এবং কতকগুলি কার্য্যজ্ঞাপক। দেখিলাম অধিকাংশ লোকেই কার্য্যজ্ঞাপক ছবিগুলি দেখিতেছে, ভাবময় ছবিগুলিকে উপেক্ষা করিয়া যাইতেছে। সাধারণ লোকে অন্তর্জগৎ সহজে বুঝিতে পারে না, বাহ্যজগৎ সহজে বুঝিতে পারে। উচ্চশিল্পসম্ভূত ভাবময় মূর্ত্তি সুশিক্ষিতের জন্য, স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিতের জন্য নয়।

পাঠক এখন বলিতে পারেন যে এদেশে দেবদেবীর মূর্ত্তি উচ্চশিল্পের নিয়মানুসারে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হয় না—যে নিয়মে এবং যেরূপ শিল্পী দ্বারা এথেন্সবাসীর জগদ্বিখ্যাত যুপিতর মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল, সেই নিয়মে এবং সেইরূপ শিল্পী দ্বারা গঠিত হয় না। অতএব এদেশের দেবদেবীর মূর্ত্তিপূজা প্রকৃত পূজা নয় এবং সেইজন্য তাহা পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু একটি কথা আছে। মনের ভাব দুই রকমে প্রকাশ করা যায়—মনের ছবি দ্বারা প্রকাশ করা যায় এবং বাহ্যবস্তুর দ্বারা প্রকাশ করা যায়। আনন্দ কি তাহা বুঝাইতে হইলে হয় একটি আনন্দোৎফুল্ল মুখ আঁকিতে হয়, নয় সুস্নিগ্ধ সুবর্ণরঞ্জিত সান্ধ্যাকাশে দুই চারিটি ক্ষুদ্র চঞ্চল-পক্ষ পক্ষী আঁকিয়া দেখাইতে হয়। শোক কি তাহা বুঝাইতে হইলে হয় একটি মলিনতামাখা মুখ আঁকিতে হয়, নয় মৃতপতির শবের পার্শ্বে করকপোললগ্ন পত্নীকে বসাইয়া দেখাইতে হয়। মনের সকল ভাবের প্রতিকৃতি বাহ্য বস্তুতে আছে। সরল অকপট অন্তঃকরণের বাহ্য প্রতিকৃতি কাচ, জল, বা স্ফটিক; ক্রূর হৃদয়ের বাহ্য প্রতিকৃতি সর্প; উদার মনের বাহ্য প্রতিকৃতি অনন্ত সমুদ্র; অপ্রণয়ের বাহ্য প্রতিকৃতি তিক্ত বস্তুর তিক্তরস; রাগের বাহ্য প্রতিকৃতি অগ্নি, ইত্যাদি। ফল কথা, বাহ্য জগৎই অন্তর্জ্জগতের সকল ক্রিয়ার এবং সকল অবস্থার মূল। সেই জন্য কবির কল্পনা-সম্ভূত কাব্যে এবং মনুষ্যের জীবন-কাব্যে অন্তর্জ্জগতের সহিত বহির্জ্জগতের এত বাঁধাবাঁধি, এত কোলাকুলি, এবং সেই জন্য কি কবি, কি কৃষক সকলেই বাহ্যবস্তুর নাম করিয়া মনের কথা বুঝায়। সাধারণ লোকে বাহ্য বস্তু যেমন বুঝিতে পারে, মনের খেলা তেমন বুঝিতে পারে না। সাধারণ লোকে মন অধ্যয়ন করে না—সেই জন্য মনের ছবিও ভাল বুঝিতে পারে না। সাধারণ লোকে বাহ্যবস্তু দেখে এবং তাহার গুণাগুণ বোঝে—সেই জন্য বাহ্যবস্তুতে মনের ছবি বুঝিতে সক্ষম হয়। মনশ্চক্ষে যে ছবি দেখিতে হয় সে ছবি সাধারণ লোকের জন্য নয়; চর্ম্ম চক্ষে যে ছবি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই সাধারণ লোকের জন্য। তাই কলিকাতার মহামেলায় লোকে ভাবময় ছবিগুলি দেখে নাই, কার্য্যজ্ঞাপক ছবিগুলিই দেখিয়াছিল। এখন বুঝিতে পারিবে যে হিন্দুর দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রণালী উচ্চশিল্পমূলক আধ্যাত্মিক বা অন্তর্ম্মুখ (Subjective) প্রণালী নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে না। হিন্দুর

দেবদেবীর মূর্ত্তি মুনিঋষির জন্য নয়; মুনিঋষি সাধারণ লোকের জন্য দেব দেবীর মূর্ত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতএব যে রকম করিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলে সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারে, হিন্দু শাস্ত্রকার সেই রকম করিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাই। জগতের এবং জগদীশ্বরের অসংখ্য রূপ। তন্মধ্যে সুখ, সম্পদ এবং সৌভাগ্য একটি রূপ। বর্ষার নদীতে, শরতের আকাশে, বসন্তের বসুন্ধরায়, গৃহস্থের গৃহ-সৌন্দর্য্যে সেই সৌভাগ্যের বিকাশ। জগদীশ্বরের সেই সৌভাগ্য-রূপের যে ভাব ভক্তের মনে থাকে তাহা দুই রকমে প্রকাশ করা যাইতে পারে। আধ্যাত্মিক বা অন্তর্মুখ (Subjective) প্রণালীতে যে মূর্ত্তি হইবে তাহা হয়ত এমন একটি সরল, সুঠাম, নিরাভরণ, সদ্‌গুণজ্ঞাপক স্ত্রী মূর্ত্তি হইবে যাহা দেখিলেই বোধ হইবে—আহা, ইহাই বুঝি সৌভাগ্য! হিন্দুর ঘরে অনেকে অনেক সময়ে এক একটি মেয়ে দেখিয়া বলিয়া থাকেন—আহা, মেয়েটি যেন লক্ষ্মী! কিন্তু মেয়েটির না আছে অলঙ্কার, না আছে বেশভূষা, আছে কেবল এক ধর্ম্মের ছাঁচে ঢালা মুখ, আর দেহের এক অনির্ব্বচনীয় কান্তি। এই মেয়ের মূর্ত্তি ভাবুকতার ভঙ্গীতে ভরাইয়া তুলিলেই বোধ হয় জগদীশ্বরের সৌভাগ্য-মূর্ত্তি হইয়া উঠে। কিন্তু কত ভাবুক, কত মনোজ্ঞ, কত অন্তর্দর্শী হইলে এ ভরা মূর্ত্তি বুঝিতে পারা যায়—এ ভরা মূর্ত্তিতে বসন্তের স্ফূর্ত্তি, গ্রীষ্মের সম্ভোগ, বর্ষার আশা, শরতের শান্তি, হেমন্তের হেমময় শস্য, শীতের সোহাগ দেখিতে পাওয়া যায়! এত গুণ, এত ক্ষমতা কি সকলের থাকে? কিন্তু বহির্মুখ (objective) প্রণালী অনুসারে সেই সৌভাগ্য-মূর্ত্তি কেমন হয় দেখ দেখি। পৌরাণিক কবি সেই মূর্ত্তি গড়িতেছেন।—

শ্রিয়ন্দেবীং প্রবক্ষ্যামি নবে বয়সি সংস্থিতাং।
সুযৌবনাং পীনগণ্ডাং রক্তোষ্ঠীং কুঞ্চিতভ্রুবং॥
পীনোন্নতস্তনতটাং মণিকুণ্ডলধারিণীং।
সুমণ্ডলংমুখং তস্যাঃ শিরঃ সীমন্তভূষিতং॥
কঞ্চুকাবদ্ধগাত্রৌ চ হারভূষৌ পয়োধরৌ॥
নাগহস্তোপমৌ বাহূ কেয়ূরকটকোজ্জ্বলৌ।
পদ্মং হস্তে চ দাতব্যং শ্রীফলং দক্ষিণে করে॥
মেখলাভরণাস্তদ্বত্তপ্তকাঞ্চনসুপ্রভাং।
নানাভরণসম্পন্নাং শোভনাম্বরধারিণীং॥

পার্শ্বে তস্যাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাশ্চামরব্যগ্রপাণয়ঃ।
পদ্মাসনোপবিষ্টাস্তু পদ্মসিংহাসনস্থিতাং॥
করিভ্যাং স্নাপ্যমানা সা ভৃঙ্গারাভ্যামনেকশঃ।
প্রতিপালয়ন্তৌ করিণৌ ভৃঙ্গারাভ্যাং তথাপরৌ॥
স্তূয়মানা চ লোকেশৈস্তথা গন্ধর্ব্বগুহ্যকৈঃ॥

(মৎস্যপুরাণ, ২৩২-২৩৫ অধ্যায় দেখ)।

লক্ষ্মী দেবীর কথা কহিতেছি ঃ—লক্ষ্মী দেবী নবযৌবনশালিনী। তাঁহার গণ্ডস্থল পীন, ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, স্তন পীনোন্নত। তাঁহার কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, মুখ সুগোল এবং শিরোদেশ সীমন্তে ভূষিত। তাঁহার স্তনদ্বয় কঞ্চুকে (কাঁচলীতে) আবদ্ধ এবং হারে মণ্ডিত। তাঁহার বাহুদ্বয় হস্তীশুণ্ডের ন্যায় সুগোল ও সুঠাম এবং কেয়ূর ও কটকে (বালায়) বিভূষিত। তাঁহার বামহস্তে পদ্ম এবং দক্ষিণ হস্তে শ্রীফল। তাঁহার কটিদেশ মেখলায় অলঙ্কৃত এবং দেহ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় সুন্দর ও উজ্জ্বল। তাঁহার অঙ্গে বিবিধ আভরণ ও পরিধেয় সুশোভন বসন। তাঁহার পার্শ্বে স্ত্রীগণ চঞ্চল করে চামর বীজন করিতেছে। তিনি পদ্মময় সিংহাসনের উপর পদ্মের আসনে আসীনা। দুইটি হস্তী শুণ্ডে স্নান-কলস ধরিয়া তাঁহাকে স্নান করাইতেছে এবং আর দুইটি হস্তী শুণ্ডে স্নান-কলস ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছে। লোকপালগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং গুহ্যকগণ তাঁহার স্তব করিতেছে।

বল দেখি যে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই, যে জগতের গূঢ় তত্ত্ব বোঝে না, যে বাহ্য সম্পদের আধ্যাত্মিক ছবি দেখিতে জানে না, যাহার মনশ্চক্ষু সুপ্রস্ফুটিত নয় সেও কি এ দৃশ্য দেখিয়া বলিবে না যে এ মেয়ে সকল সুখ, সকল সম্পদ, সকল সৌভাগ্যের অধিকারিণী, এ মেয়ে বড় ভাগ্যবানের মেয়ে? মুখে ভাবের খেলা থাকিলে সে তাহা বুঝিতে পারে না, চিনিতে পারে না, কেন না তাহার মনশ্চক্ষু নাই; কিন্তু তাহার যে দুইটি শারীরিক চক্ষু আছে তদ্দ্বারা সে সুঠাম দেহে এবং দেহের তপ্তকাঞ্চনতুল্য প্রভায় যৌবনের সুখ ও শক্তি দেখিতে পায়, মহামূল্য বস্ত্রাভরণে ঐশ্বর্য্য দেখিতে পায়, চঞ্চল চামরে সম্পদ দেখিতে পায়, করিশুণ্ডধৃত স্নান-কলসের স্বচ্ছ সলিলে শান্তি এবং স্নিগ্ধতা দেখিতে পায়, পদ্মাসনে পরমপদ দেখিতে পায়, গন্ধর্ব্ব গুহ্যক লোকপালের স্তুতিগানে সর্ব্বারাধ্য দেবতা দেখিতে পায়। তখন তাহাকে কেহ কিছু না বলিয়া দিলেও সে এই অপূর্ব্ব দৃশ্যকে জগজ্জননীর

প্রতিমা বলিয়া পূজা করিতে থাকে। হিন্দু কবির এই অপূর্ব্ব প্রতিমা বড়ই সুন্দর, বড়ই ভাবাভিনয়নমূলক (ideal)। প্রতিভা-সম্পন্ন শিল্পীকর্ত্তৃক এই প্রতিমা গঠিত হইলে মানবশিরোমণিরাও ইহাতে মনশ্চক্ষে জগদীশ্বরের মানসমূর্ত্তি দেখিতে পান। কিন্তু তেমন শিল্পীকর্ত্তৃক গঠিত না হইলেও, আজ কাল যে রকম অশিক্ষিত শিল্পী দ্বারা আমাদের প্রতিমা গঠিত হয় সেই রকম শিল্পীকর্ত্তৃক গঠিত হইলেও সাধারণ লোকে এই প্রতিমায় জগদীশ্বরের সৌভাগ্য-মূর্ত্তি দেখিতে পায়। কেন না মনুষ্যমাত্রেই চর্ম্মচক্ষে যে সকল বস্তুতে সৌভাগ্য দেখিয়া থাকে, পৌরাণিক কবি এ প্রতিমায় সেই সকল বস্তুর অপূর্ব্ব এবং অপরিমিত সমাবেশ করিয়াছেন। পুরাণে জগদীশ্বরের অপরাপর মূর্ত্তিও এই প্রণালীতে ফোটান। ভাল শিল্পী দ্বারা ফোটান হইলে মানবশিরোমণিরাও সে সকল মূর্ত্তিতে মজিতে পারেন; ভাল শিল্পী দ্বারা ফোটান না হইলে অন্তত সাধারণ লোকে তাহাতে জগদীশ্বরকে দেখিতে ও চিনিতে পারে। পৌরাণিক কবির ঈশ্বর-মূর্ত্তি গ্রীক কবির ঈশ্বর-মূর্ত্তির ন্যায় কেবল মাত্র মূর্ত্তি নয়। গ্রীক কবির ঈশ্বর-মূর্ত্তিতে কেবলমাত্র জগদীশ্বর থাকেন; পৌরাণিক কবির ঈশ্বর-মূর্ত্তিতে জগদীশ্বর থাকেন এবং জগৎও থাকে। গ্রীক কবির ঈশ্বর-মূর্ত্তিতে কেবল মূর্ত্তি বা ভাব আছে, বস্ত্র নাই, আভরণ নাই, ফুল নাই, ফল নাই, পশু নাই, পক্ষী নাই—বস্তু নাই, জগৎ নাই। পৌরাণিক কবির ঈশ্বর-মূর্ত্তিতে মূর্ত্তি আছে এবং বস্ত্র, আভরণ, ফুল, ফল, পশু, পক্ষী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, অনন্ত জগৎ, সবই আছে। অতএব, জগৎ যদি জগদীশ্বরের প্রতিমা হয় তবে অবশ্যই বলিব যে গ্রীক কবি জগদীশ্বরের শুধু মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, হিন্দু কবি জগদীশ্বরের মূর্ত্তি এবং প্রকৃত প্রতিমা দুইই গড়িয়াছেন। এবং কি গ্রীস্, কি রোম, সকল দেশ দেখ, বুঝিতে পারিবে যে হিন্দু বই পৃথিবীতে আর কেহ জগদীশ্বরের প্রতিমা গড়িতে পারে নাই—আর কেহ জগৎ দিয়া জগদীশ্বরকে দেখায় নাই। জগৎই জগদীশ্বরের প্রকৃত প্রতিমা। পদ্মপুরাণের কবি বলিতেছেন যে জগদীশ্বরের প্রতিমা দুই প্রকার, স্থাপিত প্রতিমা এবং স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমা*। শাস্ত্রোল্লিখিত নিয়মানুসারে কাষ্ঠ, মৃত্তিকা, প্রস্তর, ইত্যাদি দ্বারা যে প্রতিমা নির্ম্মিত হয় তাহা স্থাপিত প্রতিমা। আর যে কোন বস্তুতে—কাষ্ঠে বল, মৃত্তিকায় বল, বৃক্ষে বল, পর্ব্বতে বল, সমুদ্রে বল—যে

* স্থাপনঞ্চ স্বয়ংব্যক্তং দ্বিবিধং তৎপ্রকীর্ত্তিতং।

কান বস্তুতে জগদীশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমা*। হিন্দু কবি জগদীশ্বরের সেই জগৎরূপ স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমা দ্বারা জগদীশ্বরকে দেখান। হিন্দু কবির গঠিত প্রতিমা বই পৃথিবীতে জগদীশ্বরের আর প্রকৃত প্রতিমা নাই, কেন না আর কাহারো প্রতিমায় জগৎরূপ জগদীশ্বরের স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয় না। হিন্দু বই পৃথিবীতে আর কেহ জগদীশ্বরকে প্রকৃত জগন্ময় বলিয়া দেখে নাই। এবং সেই জন্য হিন্দু বই আর কেহ সমস্ত জগৎকে জগদীশ্বর বুঝায় নাই, বুঝাইবার চেষ্টাও করে নাই—সমস্ত জগৎকে জগৎ বলিয়া মানে নাই, জগৎ বলিয়া আদর করে নাই। কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, কেহই লোকসাধারণের মানসিক দুর্ব্বলতা, মানসিক অভাব বুঝিয়া তাহাদের জন্য ঈশ্বর গড়ে নাই, তাহারা বুঝিতে পারে এমন করিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বর বুঝায় নাই, তাহারা দেখিলে চিনিতে পারে এমন করিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বর দেখায় নাই। সর্ব্বত্রই শাস্ত্রকার আপনি জগদীশ্বরকে দেখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন—লোকসাধারণকে অর্থাৎ জগৎকে জগদীশ্বর দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই—লোকসাধারণের ভাবনা ভাবেন নাই—জগতে আপনি ছাড়া যে আর কেহ আছে তাহা মনেও করেন নাই—বৃহতের ব্যবস্থা যে ক্ষুদ্রের পক্ষে খাটেনা, ক্ষুদ্রের জন্য যে ক্ষুদ্রের উপযোগী ব্যবস্থা আবশ্যক তাহা একবার বিবেচনাও করেন নাই। ক্ষুদ্রকে তুচ্ছ করিয়া, আপনার আদরে আপনি গলিয়া, কেবল আপনার নিমিত্তই ব্যবস্থা করিয়াছেন, আর ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্বে ব্যথিত না হইয়া এক একবার ক্ষুদ্রকে জোর করিয়া বলিয়াছেন—আমার পথে চলিতে পারিস্‌ত চল্‌, নয় অধঃপাতে যা। কেবল মাত্র হিন্দু শাস্ত্রকার আপনি জগদীশ্বরকে দেখিয়া ক্ষান্ত হন নাই। লোকসাধারণকে অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে জগদীশ্বর দেখাইয়াছেন—জগদীশ্বরের জগৎরূপ স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমার অনুকরণে আপনার স্থাপিত প্রতিমা গড়িয়া সমস্ত জগৎকে জগদীশ্বর দেখাইয়াছেন। এক মাত্র হিন্দুই জগৎ কি তাহা বোঝেন এবং জগৎকে ভালবাসেন। এক মাত্র হিন্দুর বুদ্ধি জগৎ-গ্রাহী, দৃষ্টি জগৎ-ব্যাপী, হৃদয় জগৎ-যোড়া। এক মাত্র হিন্দু জগতের আদর্শে গঠিত—জগৎ-রূপী। হিন্দুর দেবদেবীর প্রতিমা পূর্ণ ঈশ্বর-জ্ঞান এবং প্রকৃত সামাজিকতার প্রতিমা। সমাজের সকলকে ভালবাসেন বলিয়া,

* যস্মিংস্তু নিহিতো বিষ্ণুঃ স্বয়মেব নৃণাং ভুবি। পাষাণদার্ব্বোরাত্মেশঃ স্বয়ং ব্যক্তং হি তৎ স্মৃতং॥ পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৭৩ অধ্যায়।

সমাজের শিক্ষিত অশিক্ষিত জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলের মানসিক শক্তির পরিমাণ বুঝিয়া এবং মনের কথা খুঁজিয়া দেখিয়া সকলের ভাবনা ভাবেন বলিয়া, সমাজের ক্ষুদ্রতম হইতে ক্ষুদ্রকে তুচ্ছ করিয়া ছাড়িতে পারেন না বলিয়া, হিন্দু শাস্ত্রকার তাঁহার জগৎ-রূপী প্রতিমা গড়িয়াছেন। হিন্দুর প্রতিমা বলে যে, হিন্দু একটি পূর্ণ-জগৎ।

হিন্দুর এই সর্ব্বপ্রিয়তা এবং সর্ব্বগ্রাহিতা তাঁহার অনেক কাজে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে একটি মাত্র উদাহরণ দিব। তাঁহার সাহিত্য দেখ। বেদব্যাস কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের বিবরণ লিখিতে বসিলেন। বসিয়া সে যুদ্ধের যুগযুগান্তর পূর্ব্বে যে সৃষ্টির সূত্রপাত হয় সেইখানে আরম্ভ করিয়া কত কি লিখিয়া যুদ্ধের অনেক পরে পাণ্ডবদিগকে স্বর্গে তুলিয়া দিয়া তবে ক্ষান্ত হইলেন। বাল্মীকি রাম কর্তৃক রাবণ বধ বর্ণনা করিতে বসিয়া রাম এবং রাবণ উভয়েরই চৌদ্দ পুরুষের কথা লিখিয়া রামকে লোকান্তরিত করিয়া তবে ক্ষান্ত হইলেন। প্রত্যেক পুরাণে সৃষ্টির আগে হইতে কথা আরম্ভ। ইউরোপীয় সাহিত্যে এ রকম দেখা যায় না। হোমর ট্রয়-ধ্বংসের কথা বলিতে বসিয়া সেই ধ্বংস ছাড়া আর কোন কথা বলিলেন না, আবার ধ্বংসের সকল কথাও বলিলেন না। মিল্টন শয়তানের বিদ্রোহের কথা লিখিতে বসিয়া বিদ্রোহের আগেকার একটি কথাও বলিলেন না। ফেনেলন তেলিমেকসের গল্প বলিতে গিয়া তেলিমেকসের পিতৃপুরুষের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার নিজের বাল্যকালের কথাও বলিলেন না। হিন্দু কবির এবং ইউরোপীয় কবির উপমা তুলনা করিয়া দেখ। দেখিবে হিন্দু কবি উপমেয় ও উপমানের সকল অংশের সাদৃশ্য দেখাইয়া দিতেছেন, ইউরোপীয় কবি তাহাদিগের একটি মাত্র অংশের সাদৃশ্য দেখাইতেছেন, হয়ত সাদৃশ্য নয়, সাদৃশ্যের মতন একটা কিছু দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইতেছেন। এইরূপ দেখিবে, সকল বিষয়েই হিন্দু ব্যাপকদর্শী, ইউরোপ অংশদর্শী; হিন্দু সমগ্র-গ্রাহী, ইউরোপ অংশগ্রাহী; হিন্দু সংযোজক, ইউরোপ বিযোজক; হিন্দু মহাকাব্য, ইউরোপ খণ্ডকাব্য। হিন্দুতে এবং ইউরোপবাসীতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সেই প্রভেদ বশত হিন্দু, সমাজের উন্নত এবং অবনত, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত, জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী, সকলের জন্যই ভাবেন। ইউরোপবাসীর ন্যায় তিনি একদেশদর্শী নন, ইউরোপবাসীর ন্যায় শুধু উন্নত, জ্ঞানী এবং শিক্ষিতের ভাবনা ভাবিয়া তিনি ক্ষান্ত হইতে পারেন না। ইউ-

রোপ্‌বাসীর ন্যায় তিনি আপনাকে একেশ্বর ভাবিয়া আপনার মতে, আপনার পথে সকলকে জোর করিয়া আনিতে চান না। তিনি জানেন যে মনুষ্য মধ্যে মানসিক শক্তির তারতম্য চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকিবে। কেহ যেমন কখনই দর্শন ও বিজ্ঞান বুঝিতে পারে না এবং পারিবে না, কখনই কুটীর ছাড়িয়া রাজপ্রাসাদে উঠিতে পারে না এবং পারিবে না, কেহ তেমনি কখনই প্রতিমা না দেখিয়া নিরাকার জগদীশ্বরের নিরাকার ধ্যান করিতে পারে না এবং পারিবে না। কাহারও শিক্ষার জন্য যেমন চিরকালই ছোট ছোট সহজ গ্রন্থ লিখিতে হয়, কাহারো বাসের জন্য যেমন চিরকালই কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিতে হয়, তেমনি কাহারো ঈশ্বরোপাসনার জন্য চিরকালই সহজে বুঝিতে পারা যায় এমন ঈশ্বর-প্রতিমা গড়িয়া দিতে হয়। এই ভাবিয়া হিন্দু লোকসাধারণের জন্য ঈশ্বরের প্রতিমা গড়িয়াছেন—গ্রীকের ঈশ্বর-মূর্ত্তি নয়, হিন্দুর ঈশ্বর-প্রতিমা গড়িয়াছেন। প্রশস্ত সহৃদয়তার গুণে, গভীর সামাজিক বুদ্ধি এবং সমাজাসক্তির গুণে হিন্দু জগদীশ্বরের স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমার অনুকরণে জগৎ-রূপী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হিন্দুর প্রতিমার কারণ—হিন্দুর প্রশস্ত হৃদয় এবং অলৌকিক সামাজিক-ভাব (social spirit); হিন্দুর প্রতিমার আকারের কারণ—হিন্দুর জগদ্ব্যাপী দৃষ্টি এবং জগৎগ্রাহী মন। এমন হৃদয়, এমন সামাজিকভাব, এমন দৃষ্টি, এমন মন পৃথিবীতে আর কাহারো নাই। সেই হৃদয়, সেই সামাজিক ভাব, সেই দৃষ্টি, সেই মনের স্ফোট—হিন্দুর দেবদেবীর প্রতিমা। সে প্রতিমা ভাল করিয়া গড়, ইচ্ছা হয়—আবশ্যক বুঝ, নূতন করিয়া গড়, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই উপযোগী কর, কিন্তু সে প্রতিমা ভাঙ্গিও না। প্রতিমা ভাঙ্গিলে জানিব যে হিন্দুসমাজ ভাঙ্গিল। কেন না হৃদয় না ভাঙ্গিলে প্রতিমা ভাঙ্গিবে না এবং হৃদয় না ভাঙ্গিলে সমাজও ভাঙ্গিবে না। যেখানে হৃদয় নাই সেখানে প্রতিমা নাই, আর সেখানে সমাজও নাই। সেখানে যে সমাজ দেখিতে পাও তাহা হৃদয়ের উপর স্থাপিত নয়, ঐহিক সুখ সম্পদ বা স্বার্থের উপর স্থাপিত। সে সমাজ ক্ষুদ্র কুঠারাঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়। কে জানিত যে তেমন আঁটাসাঁটা এথেন্স সমাজ দেড় শত বৎসরের মধ্যে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে? কে জানিত যে তেমন এক-প্রাণ এক-বাক্য রোমক সমাজ দশ দিনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে? আর কে না জানে যে সেই বিশাল অচল জাতিভেদপূর্ণ হিন্দুসমাজ শত বিপ্লব অতিক্রম করিয়া যুগযুগান্তেও অটল

থাকিবে ? অতএব হৃদয় মূলক প্রতিমাকে বড় সামান্য জিনিস মনে করিও না। হিন্দুর প্রতিমা পৃথিবীতে হিন্দুর একটি প্রধান পরিচয়। এমন পরিচয়টা হারাইতে ইচ্ছা হয় কি ?

পুরাণে প্রতিমা নির্ম্মাণের যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে সে নিয়মে এখন প্রায়ই প্রতিমা নির্ম্মিত হয় না। তাই দিগম্বরী কালী এবং অসুরনাশিনী কাত্যায়নীকে নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা দেখি। ইহা অজ্ঞতা এবং কুরুচির ফল। পুরাণে প্রতিমার প্রত্যেক অঙ্গের, প্রত্যেক অলঙ্কারের, প্রত্যেক দ্রব্যের অর্থ আছে। পুরাণানুসারে প্রতিমা নির্ম্মিত হইলে এখন যে সকল প্রতিমা অলঙ্কারে বিভূষিত হয় তন্মধ্যে অনেকগুলিতে অলঙ্কার থাকে না। কিন্তু যে প্রতিমায় অলঙ্কার নিষেধ সে প্রতিমা এখন অলঙ্কারে ভূষিত হওয়ার একটু বিশিষ্ট কারণ আছে, এখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকে যে তাহাকে কেবল ছেলেখেলা বলিয়া থাকেন তা নয়। দেবতা পরম বস্তু, সৌন্দর্য্যময়—যেখানে দেবতার আবির্ভাব, যেখানে সুন্দর বস্তুর আবির্ভাব মানুষ সেই খানেই সৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিয়া থাকে। শচী হিমাচলে উপস্থিত হইলেন, অমনি—

——————————আচম্বিতে তথা
নানা রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোভিল।
বিবিধ কুসুমজাল স্তবকে, স্তবকে,
বনরত্ন, মধুর সর্ব্বস্ব, স্মর ধন,
বিকশিয়া চারিদিকে হাসিতে লাগিল—
নীলনভস্তলে হাসে তারাদল যথা।

আবার এক ভক্তের কথা শুন দেখি :—

মধুকর নিকর আনন্দধ্বনি করি
মকরন্দ-লোভে অন্ধ আসি উতরিলা;
বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল
বরষিলা স্বরসুধা; মলয় মারুত—
ফুল-কুল-নায়ক প্রবর সমীরণ—
প্রতি অনুকূল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে
প্রেমের রহস্য আসি কহিতে লাগিলা;
ছুটিল সৌরভ যেন রতির নিশ্বাস,

স্বপথের মন যাবে মথেন কামিনী
পাতি প্রণয়ের ফাঁদ প্রণয়কৌতুকে
বিরলে! বিশাল তরু, ব্রতত্তীরমণ,
মঞ্জরিত ব্রততীর বাহুপাশে বাঁধা,
দাঁড়াইল চারিদিকে, বীরবৃন্দ যথা;
শত শত উৎস, রজতস্তম্ভের আকারে
উঠিয়া আকাশে, মুক্তাফল কলরবে
বরষি, আর্দ্রিল অচলের বক্ষঃস্থল। * (ইত্যাদি)
অগাধ সলিলে ভাসে বিচিত্র কানন।
পঞ্চম গায়ে ত অলি নাচে পিকগণ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে নাচে মত্ত মধুকর।
পরাগে ধূসর লতা চারু কলেবর॥
বিকশিত কুন্দবন কুসুম মালতী।
দামিনী মরুয়া ফুল ফুটে নানা জাতি॥
ফুটিছে মাধবী লতা পলাশ কাঞ্চন।
কুন্দ কুমুদ আছে বকুল রঙ্গণ॥
তাহার উপরে চন্দ্রাতপ মনোহর।
নেতের পতাকা উড়ে শ্বেত চামর॥
বিনান পাটের থোপ মুকুতার মালা।
বিচিত্র বিনোদ তাতে সুরঙ্গ প্রবালা॥
তার মাঝে বিকশিত কমল কানন।
কামিনী কমলে বসি সংহারে বারণ॥

অগাধ সমুদ্রে অপরূপ সৌন্দর্য্যের খেলা! অতল জলে অপূর্ব্ব পুষ্প কানন। "গভীর দেখি যে জল, তাহে নানা উতপল, মনোহর কমল উদ্যান।" প্রকৃত ভক্ত এইরূপই করিয়া থাকেন। তাই আজিকার বঙ্গের হিন্দু যেমন সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বুঝেন সেই অনুসারে অলঙ্কারের দ্বারা তাঁহার দেবদেবীর প্রতিমার সৌন্দর্য্যসম্পাদন করেন। তোমার সৌন্দর্য্যজ্ঞান তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয় ভালই। তুমি তোমার মনের মতন করিয়া তোমার প্রতিমা সাজাও।

---

* তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গ।

আরো একটি কথা। কিছু গূঢ় কথা। তুমি ইংরাজের কবিতা * আওড়াইয়া বলিবে যে জগদীশ্বর নিজেই সৌন্দর্য্য। যে নিজেই সুন্দর তাহাকে আবার অলঙ্কার দিয়া সুন্দর করিবে কি? গ্রীক ভাস্কর তাঁহার দেবদেবীর মূর্ত্তিকে কি সোণা রূপা দিয়া সাজাইতেন? আমি বলি যে শুধু সুন্দরকে সুন্দর করিবার নিমিত্ত মানুষ সুন্দরকে সোণা রূপা দিয়া সাজায় না। সন্তানকে সুন্দর করিবার নিমিত্ত জনক জননী সন্তানকে সোণা রূপা দিয়া সাজান না। প্রণয়িনীকে সুন্দর করিবার জন্য প্রণয়ী প্রণয়িনীকে হীরা মুক্তা দিয়া সাজান না। আদরের জিনিসকে হৃদয় সোণা রূপা দেয়—হৃদয় দেওয়ায় বলিয়া দেয়—হৃদয় না দিয়া থাকিতে পারে না বলিয়া দেয়—সুন্দর করিবার জন্য দেয় না। জননী কুৎসিত ছেলেকেও যে গহণা পরান। তিনি কি জানেন না যে, যে কুৎসিত সে কিছুতেই সুন্দর হয় না? তবে তিনি কেন কুৎসিত ছেলেকে সোণারূপায় মোড়েন? তিনি কি কিছু মনে করিয়া মোড়েন, তাঁহার হৃদয় মোড়ায়। আবার শুধু তাই কেন? আদরের জিনিস যতই কেন সুন্দর হউক না, যে আদর করিতে জানে সে মনে করে বুঝি সুন্দরকে সাজাইলে আরো সুন্দর হইবে। অতএব যেখানেই আদরের জিনিস, যেখানেই প্রতিমা, সেইখানেই সোণারূপা, সেইখানেই বসনভূষণ, সেই খানেই হীরা মুক্তা, সেই খানেই খুটি নাটি। প্রেমের বস্তুর, আদরের জিনিসের কিছু না করিতে পারিলে ভাল বাসিয়া, আদর করিয়া তৃপ্তি হয় না, সুখ হয় না। রস্কিণ বলেন যে love chiefly grows in giving। † জগদীশ্বরের সকলই আছে, কিছুরই অভাব নাই। তথাপি প্রেমের পিপাসা মিটাইবার জন্য হিন্দু তাঁহাকে কত কি দিয়া সাজান। গ্রীক ভাস্কর শিল্পের নিয়মে তাঁহার দেবদেবী মূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন—হৃদয়ের রাগে গড়েন নাই; দেবতাকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ভাবিয়া তাঁহার মূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন—ঘরের ছেলে, হৃদয়ের নিধি ভাবিয়া তাঁহার মূর্ত্তি গড়েন নাই। তাই তাঁহার দেবদেবীর মূর্ত্তি বসনভূষণহীন। গ্রীস বাসীর যেমন চক্ষু ছিল, তেমন হৃদয় ছিল না ‡ তিনি

---

* "Beauty unadorned is adorned the best."

† Modern Painters নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় বালমের ৮৮ পৃষ্ঠা।

‡ "*So far as the sight and knowledge of the human form,* of the purest race, exercised from infancy constantly, but not excessively, in all exercises of dignity, not in straining dexterities, but in natural exercises of running, casting, or riding; practised in endurance, not

কেবল চক্ষু দিয়া সৌন্দর্য্য দেখিতেন, হৃদয় দিয়া দেখিতেন না। হিন্দুর দেবতা হিন্দুর ঘরের ছেলে, হৃদয়ের ধন। তাই তিনি তাঁহাকে আদর করেন, কোলে করেন, পূজা করেন, ধম্‌কান্, হীরা মুক্তা সোণা রূপা কড় শাঁখা ঘরে যা থাকে তাই দিয়া সাজান—শুধু সুন্দর করিবার নিমিত্ত সাজান না।* হিন্দু জগদীশ্বরকে যে ভাবে দেখেন আর কেহ তাঁহাকে সে ভাবে দেখে না। তিনি জগদীশ্বরকে অচিন্ত্য অনন্ত বলিয়াও ভাবেন আবার একটি ক্ষুদ্র কোলের ছেলে বলিয়াও ভাবেন। অনন্ত জগদীশ্বরের অনন্ত রূপ। তাই অনন্তজ্ঞ হিন্দু জগদীশ্বরকে অনন্ত-বৃহৎও দেখেন, অনন্ত-ক্ষুদ্রও দেখেন। হিন্দুর মন অনন্ত-প্রসারিত, সর্ব্বগ্রাহী, ইউরোপীয়ের ন্যায় সীমানা-সর্হদ্দ-মাপ-পরিমাণ-প্রিয় নয়। সে মন প্রকৃত অনন্ত-প্রিয়, অনন্ত-বিহারী। হিন্দু কেন যে অনন্ত পুরুষের অনন্তত্বের কাছে সভয়ে সসম্ভ্রমে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হন, আবার কেনই বা সেই অনন্ত পুরুষকে কোলের ছেলে ভাবিয়া আদর করেন, ধমকান, ভয় দেখান, খোসামোদ করেন, সোণা রূপা দিয়া সাজান তাহা তিনিই জানেন। তুমি আমি কুলাঙ্গার, কেমন করিয়া জানিব? আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, চাঁচা-ছোলা, কেয়ারি-করা, টাইম-ধরা রূলে-বাঁধা, লেবেল-আঁটা ইউরোপীয়ই বা কেমন করিয়া জানিবে? হিন্দু জগদী-

---

of extraordinary hardship, for that hardens and degrades the body, but of natural hardship, vicissitudes of winter and summer, and cold and heat. yet in a climate where none of these are severe; surrounded also by a certain degree of right luxury, so as to soften and refine the forms of strength: so far as the *sight* of all this could render the mental intelligence of what is noble in human form so acute as to be able to abstract and combine, from the best examples so produced that which was most perfect in each, so far the Greek conceived and attained the ideal of humanity; and on the Greek modes of attaining it, chiefly dwell those writers whose opinions on this subject I have collected; wholly losing sight of what seems to me the most important branch of the inquiry, namely, *the influence, for good or evil, of the mind upon the bodily shape, the wreck of the mind itself, and the modes by which we may conceive of its restoration.*" রস্কিণের *Modern Painters* নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় বালমের ১০৯ ও ১১০ পৃষ্ঠা।

শ্বরের মহারণ্য-রূপী luxuriance ; ইউরোপীয় মানুষের তৈয়ারি ক্ষুদ্র বাগানের ন্যায় trimness মাত্র। অতএব পবিত্র পিতৃপুরুষের প্রতিমা ভাঙ্গিও না। সেই প্রতিমার সুপ্রতিষ্ঠা করিয়া পবিত্র পিতৃপুরুষের জগৎ-গ্রাহী ধৃতি, জগৎ-ব্যাপী দৃষ্টি, এবং জগৎ-যোড়া হৃদয়ের পরিচয় প্রদান কর।

উপসংহারে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পুজা করিলে উপাসক সেই মূর্ত্তিকেই জগদীশ্বর মনে করিতে পারে। এদেশে জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া, তাহা পূজিত হয়। আমি যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি তাহাতে এইরূপ বুঝিয়াছি যে কেহই জগদীশ্বরের মূর্ত্তিটীকে জগদীশ্বর মনে করে না। সকলেই এইরূপ বুঝে যে মূর্ত্তি হইতে জগদীশ্বর স্বতন্ত্র, মূর্ত্তিতে তাঁহার আবির্ভাব হয় মাত্র। তবে এমনও হইতে পারে যে জগদীশ্বরের মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তের মন যখন বড়ই বিভোর হইয়া উঠে, তখন সে জগদীশ্বর এবং জগদীশ্বরের মূর্ত্তির প্রভেদ ভুলিয়া গিয়া বোধ হয় যেন সেই মূর্ত্তিটীকেই জগদীশ্বর মনে করিতে থাকে। কিন্তু যেখানেই প্রকৃত উদ্বোধন হয়, হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠে, সেই-খানেই ত এইরূপ হইয়া থাকে। ওথেলো দিস্‌দেমনার কথা পড়িতে পড়িতে ওথেলো দিস্‌দেমনাকে ত কল্পনামাত্র বলিয়া মনে থাকে না, সত্যসত্যই রক্তমাংসবিশিষ্ট নরনারী মনে হয়। উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দেখিতে দেখিতে অভিনেতাদিগকে অভিনেতা বলিয়া মনে থাকে না, অভিনীত নরনারীই মনে হয়। ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখিয়া যদি তেমনি সমস্ত ভেদাভেদ বিস্মৃত হইয়া বিভোর মনে মূর্ত্তিতে কেবল ঈশ্বরই দেখি তবেইত জানিব যে মূর্ত্তি গড়া সার্থক হইয়াছে। মূর্ত্তি যদি ভেদাভেদ-জ্ঞান নষ্ট করিয়া দিতে পারে, শুধু ঈশ্বর-ভক্তিতে মন ভরাইয়া দিতে পারে, ঈশ্বর ভিন্ন আর সকল বস্তুকে ভুলাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে মূর্ত্তিকে পূজা করা ঈশ্বরকে পূজা করা বই আর কি হয়? মূর্ত্তির সম্মুখে প্রণত হওয়া ঈশ্বরের সম্মুখে প্রণত হওয়া বই আর কি হয়? কোল্‌রিজ্‌ এই যে একটা পর্ব্বতের সম্মুখে ঘাড় হেঁট করিলেন। তবেই কি পর্ব্বতটা ঈশ্বর হইয়া গেল? কিন্তু পর্ব্বতে আর গঠিত মূর্ত্তিতে প্রভেদ কি? দুইইত ঈশ্বরের প্রতিমা। তবে পর্ব্বতটা স্বয়ং ব্যক্ত প্রতিমা, গঠিত মূর্ত্তিটী স্থাপিত প্রতিমা; প্রভেদ এইটুকু। তবে কোল্‌রিজ্‌ পর্ব্বত দেখিয়া ঈশ্বর-ভক্তিতে ভোর হইয়া পর্ব্বতের সম্মুখে প্রনত হওয়ায় পর্ব্বতটা যদি ঈশ্বর হইয়া না গিয়া থাকে, তবে আমি দরিদ্র হিন্দু একটী মূর্ত্তি দেখিয়া ঈশ্বর-ভক্তিতে ভোর হইয়া

মূর্ত্তিটীর সম্মুখে প্রণত হইলে মূর্ত্তিটীই বা কেন ঈশ্বর হইয়া যাইবে? তুমি হয়ত বলিবে যে ঈশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে করিতে হয়ত তুমি নিরাকার ঈশ্বরকে যথার্থই হাত পা নাক কাণ উদর বক্ষ বিশিষ্ট মনে করিবে। এ কথায় আমি এই বলিতে পারি, যে আমি যদি ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে সহস্র বৎসর তাঁহার মূর্ত্তি পূজা করিলেও তাঁহাকে হাত পা নাক কাণ বিশিষ্ট মনে করিব না। এই যে ঈসপের গল্পের ন্যায় গল্প, প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ের ন্যায় রূপক (allegory) সাধারণ লোকে চিরকালই শুনিতেছে। কিন্তু কেহ কখন কি তাই বলিয়া এমন বুঝিয়াছে যে পাখী মানুষের মতন কথা কয়, আর কাম ক্রোধ মোহ মাৎসর্য্য প্রভৃতি হৃদয়ের ভাবগুলা এক একটা হাত-পা-ওয়ালা মানুষের মতন বক্তৃতা দিয়া বেড়ায় বা থিয়েটরে নাটকাভিনয় করে? সাকার উপাসকদিগের মধ্যে এমন লোক থাকিতে পারে যাহারা নিরাকার ঈশ্বরকে যথার্থই হাত পা বিশিষ্ট মনে করে। কিন্তু সে সব স্থলে অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় বুঝা যাইবে যে তাহারা ঈশ্বরকে কখনই প্রকৃত নিরাকার বলিয়া বুঝে নাই, তাহাদের যে রকম শিক্ষা (culture) এবং মানসিক শক্তি (calibre) তাহাতে তাহারা ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া বুঝিতে একেবারেই অক্ষম, এবং সেই জন্য মূর্ত্তি সামনে না রাখিয়া ঈশ্বরের পূজা করিলেও তাহারা বোধ হয় ঈশ্বরকে হস্ত পদ বিশিষ্ট ভাবিয়া তাঁহার পূজা করে। তাই যদি হয়, তবে তাহাদিগকে কোন মূর্ত্তি না দিয়া এবং মূর্ত্তি দেখিলে তাহারা যেরূপ ঈশ্বর-ভক্তিতে উত্তেজিত হইতে পারে, সেইরূপ উত্তেজিত হইতে না দিয়া এবং ঈশ্বর-ভক্তিতে উত্তেজিত হইয়া তাহারা যতটুকু ধর্ম্মানুরাগী হইতে পারে, তাহা-দিগকে সেই পরিমাণে ধর্ম্মানুরাগী না হইতে দিয়া লাভ কি? ঈশ্বর কি জন্য? শুধু কি প্রকৃষ্ট উপলব্ধির জন্য, না ধর্ম্মোন্নতির জন্য? যে 'নিরাকার' উপলব্ধি করিতে পারে না এবং নিরাকার উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরানুরাগে উৎসাহিত হইয়া ধর্ম্মপথে যাইতে প্রধাবিত হয় না, তাহাকে শুধু এক উচ্চ নিরাকার প্রণালীর খাতিরে নিরাকার উপাসনায় জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখা ভাল, না মনকে ঈশ্বরানুরাগে রঞ্জিত করিয়া ধর্ম্মপথে চলিতে প্রবৃত্তি প্রদানার্থ একটা মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিতে দেওয়া ভাল? আমরা শুধু উন্নত পদ্ধতি চাই না; সকলে উন্নত পদ্ধতিতে ঈশ্বরোপাসনা করিতে পারিবে এরূপ প্রত্যাশাও করি না। কিন্তু আমরা ঈশ্বর-ভক্তি এবং ধর্ম্মানুরাগ চাই; আমরা চাই যে সকলেরই

মন যে কোন পদ্ধতিতে হউক ঈশ্বর-ভক্তি এবং ধর্ম্মানুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। নিরাকার পদ্ধতি দ্বারা যে আপন মনে ঈশ্বরানুরাগ ফলাইয়া তুলিতে অক্ষম এবং সেই জন্য ধর্ম্মপথে চলিতে উৎসাহিত বোধ করে না, তাহাকে নিরাকার পদ্ধতি দেওয়াও যা, না দেওয়াও তা, এবং তাহাকে সাকার-পদ্ধতি না দিলে শাস্ত্রকার এবং সমাজনেতার মহাপাতক হয়। তাই ধর্ম্মভীরু হিন্দু শাস্ত্রকার লোকসাধারণের জন্য বহির্মুখ প্রণালীতে জগদীশ্বরের প্রতিমা গড়িয়া দিয়াছেন। ধর্ম্মেও যে statesmanship চাই; সে statesmanship কেবল হিন্দু শাস্ত্রকার দেখাইয়াছেন, আর কেহ দেখান নাই।

যে জগদীশ্বরকে নিরাকার বলিয়া বুঝিয়াছে সে কি তবে কিছুতেই তাঁহাকে হাত পা বিশিষ্ট সাকার মনে করিতে পারে না? এ অবনতি কি একেবারেই অসম্ভব? একেবারেই অসম্ভব এমন কথা বলিতে পারি না। ইতিহাসে এইরূপ অবনতি, এইরূপ বিকৃতি দেখিয়াছি। কিন্তু যেখানে দেখিয়াছি সেখানে এমন দেখি নাই যে মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়াই মানুষ নিরাকার ঈশ্বরকে হাত পা বিশিষ্ট সাকার মনে করিয়াছে। সেখানে এইরূপ দেখিয়াছি যে মানুষের শুধু ঈশ্বরজ্ঞান বিকৃত হয় নাই, সকল প্রকার জ্ঞানই বিকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ সেখানে মানুষের সকল বিষয়ে অবনতি এবং বিকৃতি (general decline) হইয়াছে বলিয়া ঈশ্বর-জ্ঞানেরও অবনতি এবং বিকৃতি হইয়াছে। সকল বিষয়ে বিকৃতি এবং অবনতি ঘটিলে চিরকাল যদি শুধু নিরাকার উপাসনা চলিয়া আসিয়া থাকে তবে তাহাও বিকৃত হইয়া যায়। ইহুদীদিগের মধ্যে—আমাদের মধ্যেও কিয়ৎ পরিমাণে—এইরূপ ঘটিয়াছে। আবার যদি বল যে সাধারণ অবনতি না হইলেও শুধু মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়াই মানুষ ঈশ্বরকে যথার্থই হাত পা বিশিষ্ট মনে করিতে পারে, তবে আমি বলিব যে মূর্ত্তি যখন এতই উপকারী, এতই আবশ্যক দেখা যাইতেছে, তখন, তুমি পণ্ডিত এবং সমাজ-নেতা, তোমার কর্ত্তব্য যে তুমি লোক সাধারণকে সর্ব্বদা এইরূপ সতর্ক কর যে তাহারা মূর্ত্তি দেখিয়া যেন নিরাকার ঈশ্বরকে যথার্থই হস্তপদাদি বিশিষ্ট মনে না করে। এইরূপ কার্য্য করিবার জন্যই সকল দেশে ধর্ম্মযাজক থাকে। যে দেশে নিরাকার উপাসনা সেখানেও এইরূপ কার্য্যের জন্য ধর্ম্মযাজক থাকে। মানুষকে সকল বিষয়ে সতর্ক করিবার জন্য চিরকালই চর্চ্চে সর্ম্মন, মসজীদে খোৎবা

পরিণত হইতেছে। মানুষ সকল উত্তম জিনেসেরই অপব্যবহার করিতে পারে। তা বলিয়া কি তাহাদিগকে উত্তম জিনিস দিব না? দিব। তবে অপরাপর উত্তম জিনিসের অপব্যহার আশঙ্কায় সমাজে যেমন উপদেষ্টা থাকে, মূর্ত্তি পূজার অপব্যবহার নিবারণার্থও তেমনি উপদেষ্টা থাকা চাই। যেখানেই মানুষের ধন ভাণ্ডার সেইখানেই প্রহরীর প্রয়োজন। যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারাই প্রতিমার প্রকৃত প্রহরী। তাঁহারা যদি তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ হন, তবে তাঁহাদের সমাজের নেতৃত্ব ত্যাগ করা উচিত—তবে তাঁহারা প্রতিমার বিরুদ্ধে কথা কহিতে অনধিকারী।

আত্মদান।

"সখি রে, দারুণ বলো না তাঁয়।
অযশের কথা, শুনিলে তাঁহার
পরাণ ফাটিয়ে যায়।
কুশাঙ্কুর যদি শ্যামপদে বিঁধে
শেল ব্যথা মোর লাগে।
শ্যামের অসুখে পরাণে আমার
কুলিশ বেদনা জাগে।
শ্যাম নাম মোর ইষ্ট মন্ত্র সই—
সে নামে আমার প্রাণ;
নিঃস্বার্থে স্বজনি সরবস মোর
শ্যামেরে করেছি দান।
নিঃস্বার্থে সর্ব্বস্ব দান,
কি মধুর কথা সই!
সরবস ধন, জগতে স্বজনি
যে পারে দানিতে পরে,
তার সম লোকে কে আছে বল না
মোক্ষপদ তার তরে।
দিয়াছি কি আমি পরে?
শ্যামে পর বলা, সবে না স্বজনি
হৃদয়ের ধন মম;
অন্তরে, অন্তরে শ্যামমূর্ত্তি জাগে
শ্যাম মোর প্রিয়তম।
এ হেন রতনে কলঙ্কের দাগ
সহে কি স্বজনি বল;—
রাধিকারমণ, যদি অপবাদ,
জীবনে কি তবে ফল?
সখি,—
মরিব মরিব, কত মনে করি
মরিতে পারি না সই।
মরণের ফল ভাবি যদি মনে
জ্ঞানহারা যেন হই।

ভাবি মরণ ত নহে ভাল।
মরিলে আমার প্রাণেশে গো সখি
যতন করিবে কেবা;
দাসী মলে সই প্রাণেশে আমার
কে আর করিবে সেবা?
বাঁশরী শুনিয়া উনমত হয়ে
কে ছুটে আসিবে তবে?
দাসীর কারণে কাঁদিলে প্রাণেশ
কে তাঁরে বুঝায়ে কবে?
কুলে দিয়া জল, গঞ্জনা না মানি
শ্যামপদে সারধন—
আপনা ভুলিয়া দেহ মন কেবা
দিবে সখি বিসর্জ্জন।
শ্যামের অসুখে কার প্রাণ আর
শেলের বেদনা পাবে;
শ্যাম সুখে সই পরম হরষে
কেবা বল সুখী হবে।
প্রাণেশের তরে গঞ্জনা স্বজনি
অঙ্গের ভূষণ মম;
সহিব কলঙ্ক জন্মে জন্মে যেন
পতি পাই শ্যাম সম।
লোকে জানে রাই অসতী রমণী
না ভাবে পতির নাম।
কিন্তু, শ্যাম বই রাই, অন্যে নাহি জানে
রাধা প্রাণ-পতি শ্যাম।"
উরস তিতিয়া নয়ন সলিল
পড়ে দরদর ধারে।
কতই যতনে প্রবোধিলা সখী
তবু থামাইতে নারে।
সহসা পশিল সুমধুর রব
শ্যামবিনোদিনী কাণে;—
উঠিয়া কিশোরী ছুটিবারে যায়
ধাইয়া সে রব পানে।
"শ্যামের বাঁশরী বাজিতেছে শুন
চল গো স্বজনি চল;—
কি হবে হেথায় চল গিয়া দেখি,
শ্যামচাঁদ নিরমল।
না রহিব আর ঘরে।
শ্যামের বাঁশরী শুনিলে গো সখি
পরাণ কেমন করে।"
সখী কহে ধীরে "শুন লো রাধিকে
কেন হলি পাগলিনী?
প্রাণনাথ তব আসিছেন অই,
শুন শ্যাম-সোহাগিনি,—
যুগল মিলন দেখিব লো আজি,
ত্রিভঙ্গ হইয়া শ্যাম
দাঁড়াবে; বামেতে দাঁড়াইবে তুমি,
কিবা রূপ অভিরাম।
সেই—
শ্যামাঙ্গে হেমাঙ্গ মিশামিশি রূপ
দেখিব নয়ন ভরি,—
কিবা—
তমালে যেন বা কনক লতিকা
জড়াবে আদর করি।
আহা—
জলদের কোলে দামিনী যেন বা
সেরূপ দেখিব সবে।
কত—
আহ্লাদে মাতিয়া, গগন পূরাব
'জয় রাধাকৃষ্ণ' রবে।"
আসিলা মাধব বাহু পাশে রাই
জড়াইলা শ্যাম গলে;
কহিলা কাতরে শ্যাম মুখে চাহি
নয়ন পূরিল জলে।

"প্রভু—
তোমার কারণে যে কলঙ্ক তাহা
দাসী তব বহুমানে,
দাসীর কারণে কলঙ্ক তোমার
প্রাণেশ সহেনা প্রাণে।
কালা কলঙ্কিনী রাই!
নাথ—
কালা কলঙ্কিনী অগৌরব নহে
গৌরবের কথা মোর;
কিন্তু,রাধিকা-কলঙ্কী তোমারে বলিলে
দুঃখের না রহে ওর।
ঘুচাও সে ব্যথা তুমি না ঘুচালে
কে ঘুচাবে আর বল
রাধার বেদনা?— নিজ প্রাণ চেয়ে
রাধারে কে বাসে ভাল?
প্রভু,—
প্রেম যে কেমন জানিনু এখন
কে জানিত নাথ আগে?
ভালবাসি যারে তাহার কলঙ্কে
এতই বেদনা লাগে!!
সবে বলে প্রেমে পাপ!
ভালবাসি তোমা হৃদয় ভরিয়া
পাপ ইথে নাহি জানি।
প্রাণ যারে চায়, ভালবাসি তায়
পাপ ইথে নাহি মানি।
না সহে লোকের যদি,
আগে কেন তবে কহিল না মোরে
তা হলে এ পথে কভু;
আসিত কি রাধা?— কলঙ্ক তোমার
হ'ত না ত তবে প্রভু।"
কতই আদরে কপোল চুমিয়া
কহিলা কেশব "রাধা

স্বরগের সুখ ছাড়ি প্রিয়তমে
তব প্রেমে আছি বাঁধা।
কে বলে প্রণয়ে পাপ?
আত্মদান মহাপুণ্য ফল!
আত্মদানে রাই পাপ যদি হয়
এ জগতে কিসে তবে,
কোন্ কর্ম্মবলে সুখী হবে লোকে
কিসে পুণ্য হবে ভবে।
আত্মদান অমূল্য রতন;
মহাপাপী এই রত্ন বিনিময়ে
লভে রাই স্বর্গ ধন।
পাপ কলিকালে, জগাই মাধাই
জন্মিবে দুজন নর;
ব্রহ্ম নারী বধ আদি পাপাচারে
রত হবে নিরন্তর।
এ তত্ত্বের কথা শুনিবে যখন
নিতাই নিমাই কাছে,
ইহারি লাগিয়া পাপব্রত ছাড়ি
ফিরিবে তাদের পাছে।
জগাই মাধাই নিজচিত্ত যবে
করিবে আমারে দান,
আলিঙ্গন দিয়া স্বরগে পাঠাব
তুষিব তাদের প্রাণ।
কাঠ বিড়ালীরা ক্ষুদ্র বনপশু
আত্মদান গুণে রামে
বাঁধিল, লভিল অতুল সুখ্যাতি
দেখ এই ধরাধামে।
পদ্মহস্তে রাম পরশিলা গায়
তুষিলা আদরে কত;
আত্মদানে রাই কি সুফল ফলে
দেখ না লো অবিরত!

আত্মদান চিত্তবিনিময়—
শুন বিনোদিনি এই তত্ত্ব লোকে
শিখিবে; ঘুচিবে ভ্রম;
আপনা পাশরি' কে বল অপরে
ভালবাসে তব সম?
কলঙ্ক দহনে সদাই জ্বলিছ
তবু মোরে ভালবাস;
নিকুঞ্জ কাননে বংশীরব শুনি
উতলা হইয়া আস।
শমী বৃক্ষ যথা আপনি পুড়িয়া
ছায়া দান করে পরে;—
প্রণয়ে পুড়িয়া আপনি প্রেয়সি,
এ প্রেম শিখালে নরে।
তব প্রেম দেখি জগতের লোক
প্রণয় শিখিবে রাই;
এ প্রেম শিখাতে গোলোক ছাড়িয়া
ভূতলে এসেছি তাই।
আত্মদান,
সংসারের সার কথা এই।
এ কথা ত সবাই জানায়,—
কুসুম-সৌরভ মলয়ের বুকে
কেন গো ঢালিয়া দেয়?
তটিনী কেন বা সোহাগে গলিয়া
সাগরে ঢলিয়া পড়ে?
তাড়না পীড়িত ভক্ত কেন সদা
ইষ্টদেবে মনে গড়ে?
কোথা বা তটিনী কোথা শশধর
তবে কেন বিনোদিনি,
প্রেমে মত্ত হয়ে নদীর উরসে
থাকেন সদাই তিনি?
পৃথিবীর বুকে কতই আদরে
দেখ না পর্ব্বত থাকে,
সেই—
পৃথিবী কম্পনে যায় গুঁড়া হয়ে
তবু ত ছাড়ে না তাকে।
রাই—
দুঃখ কি সাজে গো তার?
জগতে যে জন আছে মত্ত হয়ে
মোর প্রেমে অনিবার।
কলঙ্কিনী নাম ঘুচাইব আমি
সতী নাম তব রবে;
কলঙ্কিনী তোমা বলে গো যাহারা
তারা কলঙ্কিনী হবে।"
সখীগণ মিলি দিল করতালি
রাধা বসে শ্যাম বামে,—
দেখ ভক্তগণ নয়ন ভরিয়া
কিবা শোভা ব্রজধামে;—
কনক চাঁদিনী যেন বা ঢলিয়া
নীল জলধর গায়,
সুন্দর সুশ্যাম কূল-প্রবাহিনী
তটিনী শোভিল হায়!
মহাদেব কেশে জাহ্নবী যেমন
সেরূপ দেখ গো সবে!
কহে ভক্ত কবি গগন পূরিয়া
'জয় রাধাকৃষ্ণ' রবে।

শ্রীহেমচন্দ্র মি—

নবজীবন।

১ম ভাগ। | পৌষ ১২৯১। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

তত্ত্ববিদ্যা বা থিয়সফি।

আজ কাল চারিদিকে থিয়সফির আন্দোলন হইতেছে। এই আন্দোলনে বঙ্কিম বাবু বড় অসন্তুষ্ট এইরূপ ভাব তিনি নবজীবনের ৩য় সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু বুঝিয়াছেন যে থিয়সফি বুঝি সাধারণ সকলকেই সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া যোগী হইতে পরামর্শ দেয়। ইহাই তাঁহার অসন্তোষের প্রধান কারণ। আমরা বলিতে চাই যে বঙ্কিম বাবু থিয়সফি সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছেন তাহা ভ্রান্ত। শুধু বঙ্কিম বাবু কেন অনেকেই মনে করেন যে থিয়সফি আর যোগবিদ্যা বুঝি একই পদার্থ। এই ভ্রম সংশোধন করা আমাদের কর্ত্তব্য বিবেচনায় এই প্রবন্ধ লিখিতেছি।

থিয়সফি কথাটির অর্থ তত্ত্ববিদ্যা। ওঁ তৎ সৎ, ব্রহ্মবাচক এই তিনটি বাক্য থিয়সফির মূল মন্ত্র স্বরূপ। ব্রহ্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, সত্যজ্ঞান—থিয়সফির উদ্দেশ্য। সত্য স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ সেই পরব্রহ্ম, যাঁহার চক্রবশে এই জগৎ ঘুরিতেছে, তাঁহার স্বরূপ জানিবার বিদ্যার নাম থিয়সফি বা তত্ত্ববিদ্যা। তৎ শব্দের বাচ্য সেই ব্রহ্মের ভাবের নাম তত্ত্ব (তৎ+ত্ব)। যে যে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব লইয়া এই জগৎ গঠিত তাহার আলোচনার নামই তত্ত্ববিদ্যা। "সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ" ইহা থিয়সফিষ্ট পত্রিকার শিরোবচন। সৎ শব্দের বাচ্যও সেই পরব্রহ্ম এবং এই সতের ভাব সত্য। এবং যথার্থ সত্য কি, তত্ত্ব কি, ইহা অনুসন্ধান দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ থিয়সফির উদ্দেশ্য। কেবল যোগবল লাভ করা থিয়সফির উদ্দেশ্য নহে। যে পথ অবলম্বনে

অলৌকিক ব্যাপার সকল যোগবলে সাধন করা যায় কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান জন্মায় না, থিয়সফিষ্ট সে পথ অবলম্বন করিতে চান না।

থিয়সফি বা তত্ত্ববিদ্যায় সকলকে কিরূপ পথে চলিতে উপদেশ দেয় দেখা যাউক। থিয়সফির উদ্দেশ্য কথন তিনটি।

১ম। প্রেম বৃত্তির সংকীর্ণতা ঘুচাইয়া উৎকর্ষ সাধন দ্বারা জগৎকে ভালবাসিতে শিখ। কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী অহিফেনের ঝোঁকে একদিন বুঝিয়াছিল যে নিত্যসুখ বা নিত্যপদার্থ পাইবার এই বই অন্য পথ নাই। এ কথাটি নূতন নহে। কথাটি নূতন নহে বটে কিন্তু কটা লোক এই কথানুযায়ী কার্য্য করে? কিন্তু যাহাতে লোকে এই কথাটির মর্ম্ম বুঝিতে পারে সেইজন্য এখন থিয়সফি যুক্তি বিজ্ঞানাদির সাহায্যে দেখাইতে যায় যে, যতদিন না পুরুষ

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

ততদিন তিনি নিত্যসুখ পাইতে পারেন না বা অনাদি কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন না। এখন দেখ ইহাই যদি থিয়সফির মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবে কি থিয়সফির আন্দোলনে কাহারও অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত।

২য়। প্রাচীন ঋষিগণ-প্রণীত শাস্ত্র সমূহে একেবারে অশ্রদ্ধা না করিয়া সেই শাস্ত্রসমূহ বুঝিতে চেষ্টা কর। তাঁহারা ব্রহ্ম-নিরূপণ বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ অপেক্ষা অনেক অগ্রগামী হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের সমস্ত শাস্ত্র অন্বেষণ করিতে আরম্ভ কর, তাহার ভিতর হইতে অনেক রত্ন পাইতে পারিবে। তাহার সাহায্যে তুমি ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানের পথে আলোক দেখিতে পাইবে।

এই কথা যাঁহারা একেবারে মানিতেন না, অর্থাৎ শাস্ত্রাদি সকল কেবল কুসংস্কার এবং মূর্খ লোকের মূর্খতায় ভরা এইরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আজ কাল স্বীকার করিতেছেন যে, শাস্ত্রাদিতে যে সকল কথা একেবারে অলীক বলিয়া বোধ হইত তাহা বাস্তবিক সব অলীক নয়। ম্যাডাম ব্লাবাট্স্কি তাঁহার যোগবলের যে মধ্যে মধ্যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা কেবল ঋষিগণ প্রণীত শাস্ত্র সমূহে সাধারণের কথঞ্চিৎ বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য। ঐরূপে কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধা হওয়াতেই শাস্ত্রালোচনা করা আর বৃথা সময় নষ্ট করা যে একই কথা তাহা আর অনেকে বলেন না। এখন

দেখ যদি থিয়সফির আন্দোলনে লোকের শাস্ত্রানুশীলন কথঞ্চিৎও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে তবে থিয়সফির আন্দোলনে কি কাহারও অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত?

৩য়। আমাদের আভ্যন্তরিক শক্তি সমূহের মধ্যে অনেকগুলি উচ্চতর বৃত্তি আদৌ অঙ্কুরিত হয় নাই। সেই সমস্ত শক্তির স্ফুরণের চেষ্টা কর।

এই তিনটি কথা লইয়া থিয়সফি সভা। এবং যিনি নিজে এই তিনটি উপদেশ-বাক্যানুযায়ী কার্য্য করেন এবং তদ্দ্বারা নিজের উন্নতিসাধনে যত্নবান হন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যের উন্নতি সাধন মানসে উক্ত তিনটি উপদেশ বাক্যের যথার্থ মর্ম্ম লোকের হৃদয়ে রোপণ করিতে চেষ্টা করেন, তিনিই যথার্থ থিয়সফিষ্ট।

অনেকে বলেন যে, যে তিনটি লইয়া থিয়সফি সভা তাহার মধ্যে প্রথমটিত সকল ধর্ম্মেই আছে। আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ দেখিবে এবং আপনাতে সর্ব্বভূতকে দেখিবে, এইরূপ উপদেশ ত সকল ধর্ম্মেই আছে, তবে থিয়সফির এটি নূতন কথা নহে। শাস্ত্র আলোচনা করা—তাহা থিয়সফিষ্ট না হইয়াও ত অনেকে করিতেছে। এ দুটি থিয়সফির আসল উদ্দেশ্য নহে। তবে যোগবলাদি যে সকল শক্তির বিকাশ করিবার কথা উহাঁরা বলেন, তাহাই থিয়সফির মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু যাঁহারা থিয়সফি সমাজভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, যে থিয়সফির প্রথম কথাটিই অর্থাৎ "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" দেখিতে চেষ্টা করিবে; এই কথাটিই থিয়সফির মুখ্য উদ্দেশ্য এবং অন্য দুইটি ঐ প্রথমটির সাধনের উপায় মাত্র। সকল ধর্ম্মেই বলে বটে তত্ত্ববিদ্যা প্রভাবে সকল ভূতকেই আপনার ন্যায় জ্ঞান করিবে, কিন্তু ঐ কথাটির যে কতদূর মাহাত্ম্য তাহা সকলে স্পষ্ট বুঝিতে পারে না। সেই মাহাত্ম্য আজ থিয়সফি প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া আজ কালকার সমাজের অন্ধকারে আবৃত প্রাচ্য বিজ্ঞান তত্ত্ব যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া থিয়সফি দেখাইতে চায় যে, তুমি আর আমি একই শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তুমি এখন ভাব যে তোমাতে আমাতে সম্পূর্ণ প্রভেদ। কিন্তু থিয়সফি দেখাইতে চায় যে, তোমাতে আমাতে এমন সম্বন্ধ আছে যে, তোমার দুঃখে আমার দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। যাহাকে তুমি কখন দেখ নাই, যাহার বিষয়ে তুমি কিছুই জান না, এখন তুমি মনে কর যে তাহার

সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু তত্ত্ববিদ্যায় দেখাইতে চায় যে, এরূপ লোক যাহার সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই মনে কর, তাহারও সহিত তুমি একসূত্রে গাঁথা। সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত জনের চিন্তাপ্রসূত শক্তি কত সময়ে তোমাকে সদসৎ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারে তাহা তুমি এখন কিছুই জান না। আমার একটি অঙ্গুলির সহিত অন্য অঙ্গুলির যে সম্বন্ধ তোমাতে আমাতে সেইরূপ সম্বন্ধ। আমার দুইটি অঙ্গুলিই যেমন এক স্নায়ুযন্ত্রের অধীন, সেইরূপ আমি ও তুমি উভয়েই এই জগৎ শরীরের অন্তস্তলস্থ একটি স্নায়ু-যন্ত্রের অধীন। কত কত অদ্ভুতশক্তি সম্পন্ন আকাশ জগতের এই স্নায়ুযন্ত্র। যদি আমার একটি অঙ্গুলি বিষাক্ত হয়, তবে আমার অন্য অন্য অঙ্গুলি যে সতেজ থাকিবে না ইহাও যেরূপ নিশ্চয়, সেইরূপ তুমি যদি তোমার পক্ষে ঘোরতর অনিষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হও তবে তাহা জগতের অন্তস্তলস্থ নিয়মের বলে আমারও অনিষ্টকর হইবে। গুণময়ী প্রকৃতির ক্ষেত্রে চৈতন্যের আভাস্বরূপ যে বীজ নিহিত হওয়াতে এই প্রপঞ্চের বিকাশ হইয়াছে, সেই একমাত্র বীজ হইতে পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা কীট পতঙ্গ তুমি আমি সকলেই উদ্ভূত। ইহাদের মধ্যে কেহ বা পত্র কেহ বা মূল কেহ বা ত্বক কেহ বা শাখা এই মাত্র প্রভেদ। এই প্রপঞ্চ একটি বৃক্ষ স্বরূপ; তত্ত্ববিদ্যায় এই শিক্ষা দেয় যে মনুষ্যত্বই এই প্রপঞ্চের বীজ এবং মনুষ্যত্বই আবার এই বৃক্ষের ফল। তাই তত্ত্ববিদ্যায় বলে, যে এস ভাই সব এস জীব জন্তু উদ্ভিদ দেব গন্ধর্ব্বাদি তোমরা সকলে, সকলে মিলিয়া এই প্রপঞ্চ বৃক্ষে সুন্দর ফল ফলাইবার চেষ্টা করি। জগতে যথার্থ মনুষ্যত্বের বিকাশ যাহাতে হয় তাহাই করি। সকলের চেষ্টা, সকলের কামনা এই এক দিকে প্রণত কর তবেই সকলে যথার্থ সুখী হইতে পারিবে। ক্ষুধা পাইলে যে আহার করিবে তাহাতেও যেন সেই সেই মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনোদ্দেশ ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে। স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারে বেষ্টিত হইয়া থাকিতে চাও—তাহাও যেন সেই উদ্দেশ্যে করা হয় কিম্বা যদি সংন্যাস অবলম্বনে প্রবৃত্তি জন্মে তবে তাহাও যেন সেই মনুষ্যত্বের পূর্ণ-বিকাশ কারণ বশতই হয়, অন্য কোন কারণে না হয়।

মনে করিয়া দেখ জিহ্বা আমার শরীরের একটি অঙ্গ মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন রসের আস্বাদ গ্রহণে জিহ্বা বড় সুখ বোধ করে। কিন্তু জিহ্বা যদি অন্যান্য সমগ্র দেহের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল নিজের সুখে লক্ষ্য রাখিয়া রসাস্বাদনে মত্ত হয়, তবে দেহ শীঘ্রই অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং

সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বাকেও কষ্ট পাইতে হয়। সুতরাং রসাস্বাদ গ্রহণে সুখ লাভ করা যেন জিহ্বার প্রধান উদ্দেশ্য না হয়। সমগ্র জগৎ রূপ শরীরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে লক্ষ্য না রাখিয়া তুমিও কেবল তোমার সুখ লালসা বশত কার্য্য করিতে যাইও না। যেমন সমস্ত শরীরের স্বাস্থ্যের উদ্দেশে চলিলে জিহ্বা রসাস্বাদন সুখে একবারে বঞ্চিত থাকে না, সেই রূপ তুমি যদি সমগ্র জগতের হিতকামনা করত কার্য্য করিতে থাক তবে তোমাকেও যে অধিকাংশ সময় তোমার সুখপ্রদ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে তাহার সন্দেহ নাই। জগতস্থ সবই আমার—এই জ্ঞান যাহাতে জন্মে তাহার চেষ্টা কর। সমগ্র জগতের উন্নতিই যেন তোমার লক্ষ্য থাকে। নিজের সুখ খুঁজিয়া বেড়াইবার দরকার নাই। দুঃখ যেমন না চাহিলেও আসে, সুখ তেমনি বিনা কামনায় আসিবে, তাহার জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই।

তোমাতে আমাতে একসূত্রে গাঁথা সুতরাং পরস্পর পরস্পরের সুখ কামনা করিব। কিন্তু কিরূপ সূত্রে গাঁথা তাহা যদি স্পষ্ট না বুঝিতে পারি, তবে কি পরিমাণে আমি তোমার সুখ কামনা করিব স্থির করিতে পারি না। তুমি আর আমি একই সমাজসূত্রে বদ্ধ, সেই জন্য যদি আমার সুখ তোমার সুখের উপর নির্ভর করে বুঝি, তবে সামাজিক নিয়ম গুলি উল্লঙ্ঘন না করিয়া চলিলেই যথেষ্ট হইল। কিন্তু তত্ত্ববিদ্যায় দেখাইতে চায়, যে, এক সমাজসূত্রে তোমরা বদ্ধ থাক আর নাই থাক, তুমি যদি হিমালয় গহ্বরে নির্জ্জনে বাস কর আর আমি যদি কোলাহল পূরিত রাজধানীতে থাকি, আমরা উভয়ে কোন সমাজসূত্রে বদ্ধ না হইয়াও, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির এক গাছি রজ্জুতে আবদ্ধ। সেই রজ্জু কি তাহা, তত্ত্ববিদ্যার পুনরুদ্ধার মানসে থিয়সফি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে। থিয়সফির মধ্যে যে যোগবল প্রদর্শনের কথা বার্ত্তা শুনা যায় তাহা এই তত্ত্ব, যন্নিবন্ধন তুমি আমি ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইয়াও বাস্তবিক অভিন্ন; সেই তত্ত্বের যথার্থ স্বরূপ বুঝাইবার বাসনায় ইহা প্রদর্শিত হইয়া থাকে, সকলে যোগী হও এই শিক্ষা দিবার জন্য নহে। জগতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত তোমার অভিন্ন সম্বন্ধ আছে, ইহা বুঝাইয়া থিয়সফি বলিতে চায়, "যদি জগতের আদি কারণ সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাও তবে প্রেমের সঙ্কীর্ণতা ঘুচাও, তোমার অন্তরস্থ প্রেমের আলোক সমস্ত জগতে বিকীর্ণ হউক, তবে বুঝিতে পারিবে যে সেই পরব্রহ্ম কিং স্বরূপ।"

কিন্তু আবার দেখ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত আমার অভিন্ন সম্বন্ধ আছে জানিলেই যে আমি আমার প্রেম ভাব সর্ব্বত বিস্তৃত করিয়া যেখানে যেমন উচিত সেই খানে সেইরূপ প্রেমরস ঢালিতে পারিব তাহা নহে। মনে কর একজন নরহন্তা মহাপাপী এবং একজন মহাপুণ্যশালী মহাত্মা; উভয়কেই কি এক ভাবে আমায় দেখিতে হইবে? পায়ের একটি অঙ্গুলির প্রতি যেরূপ যত্ন আবশ্যক, চক্ষের উপরও কি সেইরূপ যত্ন আবশ্যক? না তদপেক্ষা বেশী যত্নের প্রয়োজন? বাস্তবিক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের সহিত কি কি স্থলে কি কি সম্বন্ধে বদ্ধ, তাহা সবিশেষ জানিলে যেমন স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে কখন কি কর্ত্তব্য তাহা ঠিক বুঝা যায়, সেইরূপ জগতের হিত কামনায় যদি প্রেমভাব সর্ব্বত বিস্তৃত করিতে চাও, তবে জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত তোমার কোন্ স্থলে কিরূপ সম্বন্ধ আছে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। যে পথে চেষ্টা করিতে হইবে সেই পথ থিয়সফি সভার তৃতীয় উদ্দেশ্য-কথন দেখাইতে চায়। তোমার আন্তরিক যে সকল শক্তির এখনও অঙ্কুর পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই ক্রমে ক্রমে তাহার বিকাশের চেষ্টা কর। আন্তরিক শক্তির যতই বিকাশ জন্মিবে ততই বাহ্য জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত তোমার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। অন্তর্জ্জগতের সহিত ভিন্ন ভিন্ন বহির্জ্জগতীয় পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞানই সময়ে সময়ে বলরূপে প্রকাশ পায়। কেন না knowledge is power জ্ঞানবলং মহাবলং। এই জ্ঞানজনিত শক্তির প্রদর্শন একটু অসাধারণ হইলেই তাহার নাম যোগবল হইয়া পড়ে। বাস্তবিক একটু যাঁহারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিয়াছেন যে থিয়সফি সভার তৃতীয় উদ্দেশ্য-কথনটি যোগবল লাভের জন্য নয়, তত্ত্বজ্ঞান লাভার্থ এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যে জগতের হিতসাধনার্থ।

থিয়সফি আর তত্ত্ববিদ্যা একই কথা। থিয়সফি আজ নূতন কথা কিছুই প্রচার করিতেছে না। আর্য্যশাস্ত্র সমূহে যেসকল তত্ত্বকথা আছে সেই সমস্ত বিদ্যার পুনরুদ্ধার করিবার জন্যই থিয়সফির প্রচার আবশ্যক। এই জন্যই থিয়সফির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য-কথন আর্য্যশাস্ত্র সমূহ আলোচনার পরামর্শ দেয়। তত্ত্ববিদ্যার আন্দোলনে হিন্দুমাত্রেরই সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নহে।

সরল বিশ্বাসের উপাসনা।

মনুষ্যের বুদ্ধির দ্বিবিধা গতি। একটি তর্ক সহকৃত এবং চঞ্চল, অন্যটি সরস ও একনিষ্ঠ। যদিও প্রথমোক্ত বুদ্ধি জনসমাজে আদরণীয় কিন্তু শেষোক্তবুদ্ধিই সদগতির হেতুস্বরূপ। যে ব্যক্তির বুদ্ধি শেষোক্ত প্রকার, তাঁহাকে হয়ত লোকে দর্শনজ্ঞান-বিহীন মূর্খ বলিয়া জানে; কিন্তু তিনিই সাধু। তর্ক-বিশিষ্ট বুদ্ধিতে ভাগবতী-মতি উপার্জ্জিত হয় না। বেদ কহেন "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"। এই মতি তর্কে লাভ হয় না। মানব তাদৃশ বুদ্ধি দ্বারা কেবল অনর্থক বিষয়ে ঘূর্ণায়মান হন, কেবল হেতুবাদে বিমোহিত হন। কেবল সাংসারিক স্বার্থবশে ঈশ্বরের উপাসনাকে প্রয়োজনানুসারে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রয়োজনানুসারে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু একনিষ্ঠা বুদ্ধির নিকটে তর্ক নাই, স্বার্থ নাই, হেতুবাদ নাই, প্রয়োজন নাই, প্রতিষ্ঠা নাই, প্রত্যাখ্যান নাই। এইরূপ বুদ্ধির সম্মুখেই অবিদ্যা বিদারিত হইয়া ঈশ্বরের প্রভাব বা আবির্ভাব উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে। মনুষ্য ঐ বুদ্ধির দ্বারা সূর্য্যকেও ঈশ্বর বোধ করিতে পারেন, সমুদ্রকেও ঈশ্বর মনে করিতে পারেন, নরবিশেষকেও ঈশ্বর জ্ঞান করিতে পারেন অথবা নিরাকার নিরঞ্জন ভাবেও ঈশ্বরকে বরণ করিতে পারেন। কিন্তু কেবল ঈশ্বরের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি। ঈশ্বর কিরূপ, নিরাকার কি সাকার, মনুষ্য কি দেবতা, জড় কি চৈতন্য—এই সকল প্রশ্ন তাঁহার সে বুদ্ধির অঙ্গ নহে। সুতরাং তিনি ঐ সকল বিষয়ের বিচার দ্বারা চিত্তবিক্ষেপ করেন না। ঈশ্বর জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন—তিনি সন্দেহ শূন্য জ্ঞান-নয়নে তাঁহাকে দেখিতেছেন—তাঁহার জ্বলন্ত সত্তা হৃদয়ে ধারণা করিতেছেন। তাহাতে আবার কোন্ কথার তর্ক, কোন্ কথার মীমাংসা করিতে হইবে? অতএব "জ্বলিতমস্তক পুরুষের জলাশয়ে গমনের ন্যায়" তিনি পথ ঘাট না দেখিয়া, কণ্টক-বন ভাঙ্গিয়া, একেবারে সেই শীতল পরমার্ণবে ঝম্প প্রদান করেন। তিনি কেন সূর্য্যকে পাপঘ্ন বলিয়া ডাকেন, কেন রামচন্দ্রকে নারায়ণ বলিয়া সম্বোধন করেন, তদ্রূপ অনীশ্বর-উপাধিতে ঈশ্বর বোধ করাতে কি দোষ হয়, কি পাপ হয়, সে সকল প্রশ্ন তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় না। তর্কপ্রিয় বুদ্ধিমানেরা তাদৃশ কোন কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয়ত তাহার

কোন উত্তর দিতে পারেন না। তাহাতে লোকে তাঁহাকে একজন অতি গণ্ডমূর্খ, আলাপের অনুপযুক্ত, অসভ্য বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু তিনিত ঈশ্বরে ডুবিয়াছেন। তিনি মৃত্তিকা, প্রস্তর, জল, নরবিশেষ, জীববিশেষ, অথবা প্রতিমায় ঈশ্বর বোধ করিয়া পূজা করাতে প্রখর-বুদ্ধি বিদ্বানেরা মনে করিতে পারেন যে তিনি প্রতারিত হইতেছেন। কিন্তু তাহা নহে। হে বিদ্বন্! তুমি স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতেছ ঐ তিনি সকল জড় পদার্থের ও উপাধির পূজা করিতেছেন, ফলে, সেরূপ ভাবিয়া তুমি নিজেই প্রতারিত হইতেছ। কেন না সুদৃঢ় সরল উপাসক জলে, স্থলে, সূর্য্যে, নরবিশেষে, শক্তিবিশেষে, বা প্রতিমাতে পরমেশ্বরের জাজ্বল্যমান অবতীর্ণ-প্রভাব ও আবির্ভাব দৃষ্টি করত সেই অচিন্ত্য অনুপম প্রভাবেরই পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই পূজা কোন ভূত-পদার্থ, প্রতিমা, প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি, নরনারী প্রভৃতি উপাধির উদ্দেশে নহে। তাহা ঈশ্বরেরই উদ্দেশে। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার একনিষ্ঠা বুদ্ধিই ঐরূপ অতর্কিত সরল উপাসনার প্রসূতি। যদি ঈশ্বরে প্রবল অনুরাগ না থাকে, তবে কি তিনি যাহাকে তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতে পারেন? যদি ঈশ্বর থাকার অখণ্ড বিশ্বাস হৃদয়ে না থাকে, তবে কি তাদৃশ উপাসক যেখানে সেখানে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করিতে সক্ষম হন? তাদৃশ সাধকের হৃদয়ে যে ঈশ্বরের প্রতি জলন্ত বিশ্বাস, জলন্ত অনুরাগ, একনিষ্ঠাবুদ্ধি আছে তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। তার্কিকেরা মনে করেন তিনি বুঝি প্রকৃত ঈশ্বর ত্যাগ পূর্ব্বক ভৌতিক পদার্থ ও স্বকপোল-কল্পিত প্রতিমার আরাধনা করিতেছেন। যাঁহারা এরূপ মনে করেন তাঁহাদের বুদ্ধি অতি জঞ্জাল গ্রস্ত। তাঁহারা জনসমাজে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিবেচক, চিন্তাশীল, দর্শনবিৎ, বিজ্ঞ, ইত্যাদি শ্রুতি সুখকর আখ্যা লাভ করিয়াও ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারেন না। এই বর্ত্তমান সময়ে অনেক নিরাকার-বাদী মহাত্মারা পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সত্তাতে নিসংশয় হন নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা ঈশ্বর কিরূপ এই প্রশ্ন লইয়াই বিব্রত। অথচ তাঁহারা আপনাদের প্রশ্নের উত্তরের নিমিত্ত নিরীশ্বর গ্রন্থ সমূহের প্রতি যত নির্ভর করেন তত ঈশ্বর শাস্ত্রের প্রতি নহে। কেহ কেহ বা কিছু কিছু ভগবৎ প্রেম লাভ করিয়াছেন, কিন্তু ঘোরতর চিত্তচাপল্য ভেদ পূর্ব্বক তাঁহারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা কেবল সাকারোপসনার দোষ ঘোষণা, সমাজ সংস্কার, স্বাধীনতা, ও স্বাস্থ্য বিষয়ক আন্দোলনে জীবন গত করিলেন। আপনারা যে

নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসক তাহাই মনে করিয়া অহঙ্কারে বঙ্গে গৃহ-বিচ্ছেদ করিলেন এবং দর্পে ভারতকে কাঁপাইয়া তুলিলেন। কিন্তু তাদৃশ সহস্রের মধ্যে দশজন ব্যক্তি, একনিষ্ঠ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট সাকারবাদীর ন্যায়, ঈশ্বরকে জ্বলন্ত ভাবে হৃদয়ে অনুভব করেন কিনা তাহা সন্দেহ স্থল। ফলত সাকার ও নিরাকার এই উভয় বাদের মধ্যে কোন ইতর বিশেষ নাই। ঈশ্বরকে হৃদয়ে দর্শন, স্পর্শন ও অনুভব করাই উপাসনার সার উদ্দেশ্য। অতএব একনিষ্ঠ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট সাকারবাদী যেমন অনন্যবুদ্ধিতে ঈশ্বর দর্শন করেন, যেমন তর্ক যুক্তি এবং বাদানুবাদের পক্ষে অন্ধ হইয়া ঈশ্বরের পক্ষে হৃদিনেত্র উন্মিলিত রাখেন,—ঈশ্বর আছেন তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে জানিতে হইলে সেইরূপ অনন্যবুদ্ধি, বাহ্যান্ধতা এবং অন্তর্জ্যোতির প্রয়োজন। সংসার, স্বার্থ, হেতুবাদ, ব্যবহার, পদার্থ ও অর্থবাদ সম্বন্ধে যিনি জাগ্রত, তাঁহার জানা থাকিতে পারে যে ঈশ্বর আছেন। তিনি গ্রন্থাধ্যয়নের বলে বা হেতুবাদ সহকারে বলিতে পারেন যে ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, নিরবয়ব এবং মঙ্গলময়। কিন্তু চঞ্চলচিত্তবশত দৃষ্টিবিক্ষেপ জন্য, একনিষ্ঠ নিস্তরঙ্গ বোধাভাবে সেই প্রেমময়কে দেখিতে পান না। তিনি তাঁহার সমুদয় ব্যুৎপত্তির সহিত কেবল বাহ্যজ্ঞানে জাগ্রত কিন্তু পরমার্থে নিদ্রিত। ফলে ঈশ্বরে যাঁহার একনিষ্ঠা বুদ্ধি তিনি সংসারে যুক্তি ও তর্করাজ্যে এবং ঈশ্বরের সত্তা ও স্বরূপ বিষয়ক বিচারে নিদ্রা যাইতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বরেই তিনি জাগ্রত এবং ঈশ্বরই তাঁহার বিচরণের অনন্ত ক্ষেত্র। তাঁহার সেই বিশ্বাসের বলেই তাঁহার অবলম্বিত প্রতিমাদি উপাধি সমস্ত বিদারণ পূর্ব্বক, ভগবান দর্শন দিয়া থাকেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান-শূন্য, হিতাহিত-বোধ-শূন্য, তর্কসিদ্ধান্ত-শূন্য একনিষ্ঠ অনুভবই তাঁহাকে জয় দান করে। প্রখর বুদ্ধিমানদিগের যেখানে বহুদিনান্তে একবারও ঈশ্বরে সমাধিস্থ হওয়া অসম্ভব, যেখানে তাঁহাদের শিক্ষিত ও শ্রুত ঈশ্বরকে একবারও হৃদয়ে অনুভব করা অসম্ভব, সেখানে সেই ঈশ্বরৈকনিষ্ঠ বিশ্বাসীর পক্ষে পরমেশ্বরের অনন্ত সত্তা ও প্রাণকর্তৃত্ব হৃদয়ঙ্গম করা নিত্য সম্ভব। তিনি প্রতিমা বা সূর্য্যাদি দেবতাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব দৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহাকে জড়োপাসক বলিও না। কেন না সেই আবির্ভাব যখন তাঁহার অন্তর-স্পর্শী হয়,তখন তাহা নিরাকার চৈতন্যময়-রূপেই উপস্থিত হইয়া থাকে। তাঁহার হৃদয়ে সেই আবির্ভাব প্রেমপূর্ণ, করুণাময় এবং বাক্যমনের অগোচর ভাবেই উপনীত হয়। সেই আবির্ভাব

কি সূর্য্যের অথবা প্রতিমাদির আবির্ভাব? প্রতিমা কি তেমন সরস ভাবে হৃদয়ে আসিতে পারে? সূর্য্যদেবতা অথবা গঙ্গা নদী কি তেমন মনোহর ভাবে হৃদয়ে স্পর্শিত হয়? প্রতিমার আবির্ভাব চেতনহীন অবয়ব মাত্র। সূর্য্যের অবির্ভাব মণ্ডলাকার তেজোময় মার্ত্তণ্ড মাত্র। গঙ্গানদীর আবির্ভাব তরল তরঙ্গিণী নদী মাত্র। এই সকল ব্যবহারিক অচেতন অবয়ব কি সাধকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করে? না, তত্রাবির্ভূত ভগবান নিরাকার, চৈতন্যময় ও করুণাময় রূপে সাধকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন? প্রতিমা, অবতার ও সূর্য্যাদি যে কোন উপাধির অবলম্বনে সাধক উপাসনা করুন, উপাসনা ঈশ্বরেরই; সাধকের দৃষ্টিতে সকল উপাধিতেই ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। সুতরাং সাধক সেই আবির্ভাবেরই পূজা করিয়া থাকেন, উপাধির নহে। প্রকৃত কথা এই যে, সদাকালই সকল পদার্থে ও সকল জীবে ঈশ্বরের আবির্ভাব আছে। কেবল সেই সমস্ত আবির্ভাবেই যে নরহৃদয় মোহিত হয় এমত নহে। মানবের স্বীয় হৃদয়ে যে পরমাত্মা বিরাজিত আছেন, অচঞ্চল ধীরচিত্তের সেই দিকে একনিষ্ঠা বুদ্ধি হইয়া থাকে। পরব্রহ্মের বস্তু-তন্ত্র-জ্ঞানের অভাবে সেই বুদ্ধি বহির্জ্জগতে প্রেরিত হইয়া পদার্থ, গুণ, শক্তি ও জীব প্রভৃতি উপাধি বিশেষে সেই প্রাণসখার চরণ বন্দন করে। তাহা সূর্য্যমণ্ডলে জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতাকে প্রকাশ করে। পর্ব্বতে, নদীতে, বৃক্ষবিশেষে ও নরবিশেষে তাঁহাকে দেখাইয়া দেয়। পবিত্র দেবমন্দিরে প্রতিমাতে তাঁহাকে প্রকাশ করে এবং সর্ব্বপ্রকার অর্চ্চনা কালে তাঁহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া দেয়। মানব স্বীয় জ্ঞানানুসারে স্বীয় হৃদয়েরই উত্তেজনায় দেবতা অবতার বা নরবিশেষে ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু হৃদয়ে তর্ক প্রবেশ করিলে সকলই শূন্য ও অনীশ্বর বোধ হয়। হেতুবাদ-লোভী পুরুষ অহৈতুকী বৈষ্ণবী মতি ধারণে অক্ষম হয়েন। সুতরাং তাদৃশ চঞ্চলচিত্ত জনের হৃদয়ে তখন এই পরামর্শ উপস্থিত হয়, যে পরমেশ্বরকে স্বরূপত উপাসনা করাই বিধেয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, কেবল ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রীতিতেই ঐশ্বরীয় স্বরূপ রসবৎ প্রতিষ্ঠিত। সেই জ্ঞান ও ভক্তি তর্কেতে প্রাপণীয় নহে। "নৈষাতর্কেণমতিরাপনেয়া"। সেই মতির অভাবে স্বরূপ দর্শন অসম্ভব। অতএব হেতুবাদে বিমূঢ় পুরুষ স্বরূপত পরমেশ্বরের পূজার পরিবর্ত্তে শূন্য ঈশ্বর নামের উপযাচক হন। সেই উপযাচকতা যত অভিমানে তত হৃদয়ে

প্রতিষ্ঠিত নহে। হৃদয়হীন পুরুষ তর্ক সহকারে উপাধি "নেতি নেতি" পূর্ব্বক ঈশ্বরকে রচনা করেন। সহৃদয় সাধু সেই রসস্বরূপকে লাভ করিয়া সতর্কে "নেতি নেতি" বলেন না, কিন্তু ব্যবহারিক দেবতা, অবতার ও প্রতিমা প্রভৃতি আশ্রয় পূর্ব্বক তৎসারভূত ভূতাতীত ভগবানকে লাভ করেন। তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে দেবতা প্রভৃতি আপনা আপনি "নেতি নেতি" হয়। কেন না তাঁহার জ্ঞান ও প্রেম উপাধির উপযাচক নহে। তাহা উপাধেয় স্বরূপ রসেরই প্রার্থী। মধুলোভী ভৃঙ্গ যেমন কমলের কমনীয় কান্তিতে ভ্রান্ত হয়না—কেবল মধু লাভই তাহার উদ্দেশ্য—সেই মকরন্দ লাভ হইলে সে যেমন স্বভাবত কমলকে ত্যাগ করে; ভগবৎ-পদ-পঙ্কজ বিগলিত সুধা-লাভ করিলে ভগবৎভক্ত ভাগ্যবানের নিকটে উপাধি স্বরূপ দেব, অবতার ও প্রতিমাদির বাহ্যভাব সেইরূপ স্বভাবত পরিত্যক্ত হয়। নতুবা তৎসর্ব্বত্রে ভগবানের পবিত্রাবির্ভাব সত্তে তিনি কোন্ বুদ্ধিতে সে সমস্ত ত্যাগ করিবেন? একথার সংক্ষেপ-তাৎপর্য্য এই যে, অলি যদি পুষ্পকে ত্যাগ করে তবে তাহার যেমন মধুলোভ তৃপ্ত হয় না, দেহকে বিদায় করিয়া দিলে যেমন দেহীর উপলব্ধি হয় না, বস্তুকে বা পদার্থকে পরিহার করিলে যেমন শক্তি ও গুণ ধারণা করা যায় না, সেইরূপ ভগবানকে পূজা করার জাজ্বল্যমান অবলম্বন স্বরূপ দেবতা ও তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা সকল পরিত্যাগ করিলে তত্রাবির্ভূত ভগবানকেও প্রত্যাখ্যান করা হয়। ঈশ্বরাবির্ভাবের সহিত দেবতা, প্রতিমা বা অবতার বিশেষের সামানাধিকরণ্য বশত তৎসমুদয় গৌণকল্পে লক্ষণাপ্রয়োগে ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হন। অতএব প্রতিমা-পূজা, সূর্য্যের পূজা, রামকৃষ্ণাদির পূজা বলিলেই ভগবানের পূজা বুঝিতে হইবে। নতুবা মুর্ত্তিতে, সূর্য্যে, অথবা রামকৃষ্ণাদির মায়িক স্নেহে সে পূজার উদ্দেশ্য নহে। যদি মানব স্বয়ং মায়াশূন্য হন, অর্থাৎ প্রকৃতিজনিত ভেদজ্ঞান হইতে উদ্ধার পান, তাহা হইলে তাঁহার সেই জীবন্মুক্তাবস্থায় দেবতাদি পদার্থ নির্ব্বিশেষে সমদর্শিতা ও উপাধিপরিত্যক্ত অদ্বয়-ব্রহ্মজ্ঞান যুগপৎ জন্মিতে পারে। তাদৃশাবস্থায় তাঁহার দৃষ্টিতে ব্রহ্মা অবধি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ, সূর্য্য হইতে মৃত্তিকা পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু, রাম কৃষ্ণ অবধি কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরী এবং দেবালয় অবধি গৃহাঙ্গন পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান ব্রহ্মময় হইয়া যায়। অর্থাৎ সমস্ত উপাধি হেয় হইয়া ব্রহ্মই দৃষ্ট হয়েন। কিন্তু যতদিন তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মে, ততদিন দেবতা, প্রতিমা ও অবতার বিশেষের অবলম্বনে অথবা

দীপ্তিমান পদার্থ, গুণ বা শক্তি বিশেষের ব্যপদেশে সরলহৃদয় ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে ঈশ্বরের উপাসনা স্বাভাবিক। তার্কিকগণের তাদৃশ সরল-উপাসনায় অধিকার হয় না। ঈশ্বরৈকনিষ্ঠ সরল বুদ্ধি যেমন সূর্য্যাদি দেবতা বা নরবিশেষে অথবা পদার্থবিশেষে বা প্রতিমাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব দৃষ্টি করত সামানাধিকরণ্য বশত আবির্ভাব ও উপাধি উভয়কেই একই ঈশ্বর রূপে গ্রহণ করে, সেইরূপ শাস্ত্রও সগুণাধিকারে তাদৃশ ভাবে ঈশ্বরকে গ্রহণের বিধি দিয়া থাকেন। গীতা প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রে তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে। বিশেষত শাস্ত্র কেবল একনিষ্ঠা বুদ্ধিরই প্রতিষ্ঠা-স্থান। এই রূপ একনিষ্ঠা বুদ্ধিতে দেবতা ও প্রতিমাদির ব্যপদেশে যেরূপ ঈশ্বর-দর্শন সম্ভবে, পণ্ডিতাভিমানী ভেদবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তির নামমাত্র ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা সেরূপ দর্শন সম্ভবে না। এইরূপ ঐশ্বরীয় রস তাদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ে প্রবেশ করে না। তাদৃশ ব্যক্তিরা ঈশ্বরের যেরূপ অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তাহা প্রায়ই শ্রবণ-করা অস্তিত্ব, হেতুবাদ বিরচিত, এবং কেবল লক্ষণা-নিষ্পন্ন। তাহা অনুভব-করা বা হৃদয়ঙ্গম-করা অস্তিত্ব নহে। যদি তাহা হইত তবে তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতেন যে তাঁহারা যে পরম দেবতাকে হৃদয়ে অনুভব করত নিরঞ্জন-ভাবে উপাসনা করিতে যত্ন পান, সকল প্রকার উপাসনা তাঁহারই উদ্দেশে। নানা নাম রূপে, নানা অধিকারে তাঁহারই পূজা হইতেছে। সেই বাঞ্ছাকল্পতরু, জগদ্‌গুরু, চিরকাল শাখা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে নিজ ভক্তগণের কামনা পূর্ণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা এরূপ যদি বুঝিতে পারিতেন তবে শাস্ত্রেও অশ্রদ্ধা হইত না, কেন না তাহাই সর্ব্বশাস্ত্রের মীমাংসা। অতএব যিনি প্রকৃত ঈশ্বরপরায়ণ, সর্ব্বপ্রকার ঈশ্বরোপাসনায় তাঁহার যোগ দেওয়া উচিত। তিনি শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি দেবালয়ে সমানভাবে ব্রহ্মদর্শন করিবেন। হরিসভায় গীত শাস্ত্রপাঠ ও ব্রহ্মসমাজের বেদপাঠ প্রভৃতি সমান শ্রদ্ধার সহিত শুনিবেন এবং বৈদিক, স্মার্ত্ত, ও তান্ত্রিক ক্রিয়া কর্ম্ম সকল সমান শ্রদ্ধার সহিত ব্রহ্মেতে অর্পণ করিবেন। তিনি অভেদ ধ্যান জ্ঞান ও ভক্তিযোগে ব্রহ্মেতে সমন্বয় পূর্ব্বক বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবেন। তাদৃশ অনুভবশীল, নিষ্কাম উপাসকই প্রকৃত সাধু। কিন্তু যিনি ব্রহ্ম হইতে দেবগণকে ভিন্ন মনে করিয়া দেবোপাসনা করেন তিনি নামত হিন্দুধর্ম্ম পালন করেন বটে, কিন্তু তাহা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নহে। আর যিনি তাদৃশ ভেদ বুদ্ধিদ্বারা দেবগণকে অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক

ব্রহ্মোপাসনা করেন তিনি উন্নত জ্ঞানী ব্রাহ্ম বলিয়া আপনাকে মনে করিতে পারেন বটে; কিন্তু আমরা তদুভয় প্রকার ব্যক্তিকে সাধু বলিতে পারি না। তাঁহারা উভয়েই সন্দিগ্ধচিত্ত, ভেদবাদী তার্কিক। তাঁহাদের উভয়েরই মনের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ব্রহ্মেতে থাকিতে পারে, কিন্তু সে উদ্দেশ্যের মর্ম্ম তাঁহারা অনবগত। তাঁহারা সুদৃঢ় সরল উপাসক নহেন।

একনিষ্ঠা সরল বুদ্ধিরই জয়। সেই উজ্জ্বল হৃদয়-ব্যাপারের নিকটে কি তর্ক উপস্থিত করিবে? এই কথা বলিবে যে ওরূপ করিলে পৌত্তলিকতা বা মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্তু সেটি তোমার তর্কের ফল, ভগবানের জ্বলন্ত বিশ্বাসের ফল নহে। সরল সাধক সে কথা গ্রাহ্যও করিবেন না। সরল-বুদ্ধি সাধু তো যে কোন প্রকারে হউক ঈশ্বরকে ডাকিয়া আপনার দিন কিনিয়া লইলেন, কিন্তু হে তার্কিক! তুমি কেবল বিদ্যা, বুদ্ধি, তর্ক, সিদ্ধান্ত, সমাজ সংস্কার ও সভ্যতা প্রচার ব্রতেই কালক্ষেপণ করিলে। আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এইরূপ সরল-উপাসনা কেবল একনিষ্ঠ-বুদ্ধি-সম্পাদিত নহে, তাহা সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রসম্মত। শাস্ত্র ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে নানা বিচার করিয়া অবশেষে সরল-উপাসনারই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি মূর্খ ও পণ্ডিতের সমান শ্রদ্ধা। মূর্খলোকে একনিষ্ঠা সরল বুদ্ধিতে বা বিধিনিষ্ঠ হইয়া যেরূপ দেবদেবীর পূজা করে, পণ্ডিতেরা শাস্ত্রদৃষ্টিতে তাহাতেই যোগ দেন। কারণ তাঁহারা জানেন বিচারত সকল উপাসনা একই ঈশ্বরে সমন্বিত। আমাদের নবীন ব্রাহ্মেরা বিশুদ্ধ ঈশ্বরোপাসনা প্রচার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন বটে, কিন্তু এত বেশি পরীক্ষা করিয়া চলিতেছেন যে, তাহাতে তাঁহাদের অন্তরে একনিষ্ঠা বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। হয়তো এইরূপ পরীক্ষাতেই চিরকাল যাইবে এবং একবার যেটিকে ফল বলিয়া গণ্য হইবে আরবার তাহাই পরিত্যক্ত হইবে। ব্রহ্মদর্শনরূপ স্থায়ী ফল লাভ করা কঠিন হইয়া উঠিবে। সমাজ সজ্জায়, আদর্শ নির্ব্বাচনে, জাতিত্যাগে ও বক্তৃতার ধূমে তাঁহারা যত ফল দৃষ্টি করিবেন, প্রকৃত সাধনা ও ব্রহ্মদর্শনে তত করিবেন না। ফলত ব্রাহ্মগণ যেরূপ তর্ক যুক্তি ও বৈষয়িক আড়ম্বরের সহিত চলিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে ঋষিসেব্য ব্রহ্মজ্ঞান তত শিক্ষার বিষয় হইবে না, কিন্তু বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের অভিমান ক্রমেই প্রচারিত হইবে।

পর্ব্বত।

স্থান—(পুণার পথে) বোরঘাট।
সময়—অরুণোদয়।

১

পাষাণ! তোমার পানে স্থাপিলে নয়ন,
বুঝি এই জীবনের মমতা কেমন,
বুঝি এই জীবনের কঠোর সাধনা,
বুঝি আনন্দের কিবা মধুর ধারণা।
কালের প্রবাহ হ'তে
ভাসি প্রতিকূল বাতে,
গুটিকত পাহারা তরঙ্গ মতন
উর্দ্ধদৃষ্টে কালগর্ভ কর অন্বেষণ।
হৃদয় খুলিয়া বিশ্ব হাসে চারিধার,
তুমি মধ্যে দাঁড়াইয়া শব স্তূপাকার।
তথাপি হৃদয় প'রে
তরুলতা আছ ধরে,
শুষ্ক হৃদিতল তব, তথাপি বিদারি
ঢালিছ অবনি বক্ষে সুশীতল বারি।
অসংখ্য প্রাণীর এই ধারাজল প্রাণ
জীবনের ধর্ম্মগুরু তুমিহে পাষাণ!

২

দেখহে নয়ন তুলি আছে আঁখি যার!
বিরাট—বিশাল ওই মূর্ত্তি মমতার!
ক্ষুদ্র সুখ দুখ হ'তে সরায়ে নয়ন,
আনন্দের অবতার কর দরশন;

ভূতলে কঠিন যাহা,
হৃদয়ে জড়ায়ে তাহা,
প্রসারিয়া শূন্যমর্ত্ত্য—বিশাল ভুবন,
পরহিত-ব্রতে রত অনন্ত জীবন।
নাহি উপভোগ সাধ—উদাসীন বেশ;
সংযমের স্তূপ—নাই ইন্দ্রিয়ের লেশ;
আত্মদানে ব্যক্ত প্রাণ,
আত্মদানে ব্যক্ত জ্ঞান,
আইস মানব ত্যজি পাণ্ডিত্যের ভাণ!
আইস সন্ন্যাসী ত্যজি স্বার্থপর ধ্যান।
গিরি পদতলে আসি কর দরশন
কি গভীর ব্রত তার, সন্ন্যাস-জীবন।

৩

হৃদয় শ্মশানে মম রে উদাস প্রাণ!
তুমিওত আজ এই কঠিন পাষাণ;
বিদীর্ণ—বিকৃত—এই হৃদয় প্রান্তরে,
তুমিওত দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি ক'রে;
তোমার ত চারি পাশে
সংসার অমনি হাসে,
প্রলয়-মথিত মম অতীত জীবন,
তুমি তার পথভ্রান্ত তরঙ্গ ভীষণ;
তুমিওত শূন্য মর্ত্ত্য ধরি প্রসারিত
স্তূপাকার শবমূর্ত্তি সদৃশ পতিত।
ওই ভূধরের মত
করি বক্ষ বিদারিত
ক্ষুদ্র সুখ দুখ তব করি পরিহার
কেন নাহি ধর তুলি হৃদয়ে সংসার?
কঠিন প্রস্তরময় অন্তর বিদারি
তৃষিত সংসারে কেন নাহি ঢাল বারি?

৪

যে বিপুল স্থানব্যাপি যন্ত্রণা তোমার,
অনায়াসে রবে তথা অনন্ত সংসার;
এই পিপাসার যদি পিপাসাই সার,
যন্ত্রণার পর যদি যন্ত্রণা তোমার,
যদিরে মরুর পাশে
কেবল মরুই ভাসে,
যেই মরীচিকা তায় ছিল সুশোভিত,
পরিণামে তাও যদি হ'ল অন্তর্হিত,
অথবা পশ্চাতে তব অনন্ত প্রমাণ
শ্মশানের পরে যদি কেবলি শ্মশান,
যেই চিতা উজলিত,
তাও যদি নির্ব্বাপিত,
তবে কোন্ অভিলাষে রে অবোধ প্রাণ
সেই যন্ত্রণায় বক্ষে কর স্থান দান!
সম্মুখে আনন্দ মূর্ত্তি দাঁড়ায়ে পাষাণ
লহ জীবনের দীক্ষা আজ তাঁর স্থান।

৫

ভীম প্রভঞ্জনে মূলসহ উৎপাটিত,
ভূধর সাগর গর্ভে হইয়া পতিত,
উন্মত্ত তরঙ্গ স্রোতে উলটি পালটি,
অতল সলিল গর্ভ ধরিয়া সাপটি,
তুলি শির ধীরে ধীরে
যথা চতুর্দ্দিক হেরে—
সংসার! প্রবাহগর্ভে তেমতি তোমার!
তোমারি তরঙ্গ ধরি এপ্রাণ আমার
ধীরে ধীরে তুলি শির বারেক ফিরিয়া
সংসারের পানে আজ দেখিবে চাহিয়া;
প্রলয়ময় জীবন!
কর বেগ সম্বরণ;

হারায়েছি হৃদয়ের সকলি আমার,
হৃতসর্ব্বস্বেরে দয়া কর একবার,
দুরাশা দিয়াছি ফেলি উরস চিরিয়া,
সংসারে রাখিব আজ হৃদয়ে ধরিয়া।

৬

জড় জগতের জীব কঠিন প্রস্তরে,
জীবন ধরিয়া যদি আনন্দে বিহরে,
নর জগতের প্রাণী তোমরা কি তবে
এ পাষণ বক্ষে মম অসুখেতে রবে ?
বিনষ্ট মানব জ্ঞানে
হেরিয়া আমার পানে,
সরিয়া দাঁড়াও কেন ফিরায়ে নয়ন,
একবার এ হৃদয় কর দরশন ;
যেই মোহস্বপ্নে প্রাণ ছিল অভিভূত,
স্থির লক্ষ্য করি যাহা সুদীর্ঘ-অতীত,
উন্মত্ত আবেগে প্রাণ
ছুটে ছিল অবিশ্রাম
সুপথ কুপথ নাহি করিয়া বিচার,
ভাঙিয়াছে সেই স্বপ্ন নয়নে আমার।
মাতা ভ্রাতা ভগ্নী ভার্য্যা তনয়-সংসার !
এস আজ একবার হৃদয়ে আমার।

৭

পাষাণ ! তোমার মত প্রফুল্ল বদনে,
হেরিতে কি পারিবনা আমি এভুবনে ?
অমনি করিয়া কভু আনন্দে হাসিয়া
দাঁড়াতে কি পারিব না আলোকে ভাসিয়া?
অমনি আপনা ভুলে,
সংসারে হৃদয়ে তুলে,
বাঁধিয়া প্রাণের অঙ্গে মায়ার বন্ধনে,
নারিব কি নিরখিতে উৎফুল্ল নয়নে ?

যন্ত্রণাই পরিণাম হবে কি আমার ?
হ'বে নাকি পুন হৃদে আনন্দ সঞ্চার ?
যাহা লয়ে তুমি সুখী,
সে ত সকলই দেখি,
'চৌদিকে হৃদয় খুলি বিরাজে আমার,
মায়া দয়া পিপাসার্ত্ত মধুর সংসার।
জীবনের ধর্ম্মগুরু তুমি হে পাষাণ!
দেহ শিখাইয়া মোরে তোমার ও জ্ঞান।

বুদ্ধিবধ বা জ্ঞানকাণ্ড।

পঞ্চশিখা নামক জনৈক মুনি ধীরস্বভাব শিষ্যদিগকে জ্ঞানোপদেশ করিতেছেন।

"দূরে ঐ যে একটি স্থাণু (মুড়োগাছ) দেখিতেছ, এক সময় উহার নিকট আমরা চারি জন ব্যক্তি চারি প্রকার বুদ্ধি লাভ করিয়াছিলাম। আমি, শৈব্য, দাণ্ডিনায়ন ও হাস্তিনায়ন,—আমরা চারি জনে একদা এই স্থান দিয়া যাইতে ছিলাম, দূর হইতে উহা দেখিয়া আমাদের তিন জনের সংশয় হইল, উহা কি স্থাণু ? না একটা মানুষ ? পরে হাস্তিনায়নের জ্ঞান সংশয়েই শয়ান থাকিল, তাঁহার মনে কোন প্রকার তর্কোদ্রেক হইল না; তিনি অনায়াসেই আপন গন্তব্য প্রদেশে চলিয়া গেলেন। দাণ্ডিনায়ন অনেকক্ষণ ভাবিলেন, অনেক চেষ্টা করিলেন, তথাপি তিনি সংশয়চ্ছেদে সমর্থ হইলেন না, অবশেষে তিনি অশক্য বিবেচনা করিয়া চলিয়া গেলেন। শৈব্য বলিলেন, উহা যাহা হয় হউক, আমি উহাতে সংশয় স্থাপন করিতেও চাহি না, পরীক্ষা করিতেও ইচ্ছা করি না, উহার তথ্য কি তাহা আমি জানিতে ইচ্ছুক নহি। যাহা হয় হউক, আমি উহার জন্য কার্য্য ক্ষতি করিব না, এই রূপে তিনিও উক্ত প্রকার সন্তোষ লইয়া প্রস্থান করিলেন, কিন্তু আমি সংশয়িত স্থাণুর নিকটবর্ত্তী হইয়া সঞ্জাত সংশয় বিদুরিত করিলাম। তাহাতে

আরোহণ করিলাম, তাহার ফল, পত্র, পুষ্প, সমস্তই প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহাতে যে পক্ষী ছিল, সে গুলিকেও দেখিলাম। অতএব হে শিষ্য! সকল মনুষ্যের সমান বুদ্ধিশক্তি নাই, বুঝিবার বুঝাইবার ক্ষমতা নাই, ইহা কথিত উদাহরণের দ্বারা বুঝিয়া লও।

বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি,—প্রধান কল্পে এই চারি প্রকার বুদ্ধি ভেদ আছে, ইহা অবধারণ কর। সংশয় (ঠিক্ না বুঝা) ও অজ্ঞান (আদৌ না বুঝা) বিপর্য্যয় (বিপরীত বুদ্ধি) মধ্যে গণ্য। বুঝিতে না পারা, এবং সংশয় হইলে তাহার উচ্ছেদ করিতে না পারা, অশক্তির অন্তঃপাতী। একটু কঠিন দেখিলে, দুরূহ দেখিলে, তাহাতে প্রয়োজন নাই ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকা অথবা বুঝিবার অযোগ্য ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বুদ্ধির তুষ্টি নামক অবস্থা, ইহা অবধারণ করিবে। এই তুষ্টি-নামক বুদ্ধি আলস্যের জননী, ইহা বর্ত্তমান থাকিতে মঙ্গলের আশা নাই। যে কোন দুষ্প্রতর্ক্য বা দুর্বিজ্ঞেয় বস্তু থাকুক, সন্দিগ্ধ বা বিকল্পিত অর্থ হউক, বুদ্ধি যখন তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়া লইতে সক্ষম হইবে, তখনই তাহা সিদ্ধি অবস্থায় আসিয়াছে, ইহা অবধারণ করিবে। এই সিদ্ধিনামক বুদ্ধিই লৌকিক ও পারলৌকিক বস্তুতত্ত্ব বুঝিবার প্রধান উপকরণ।

যে বিপর্য্যয়-বুদ্ধির কথা বলিলাম, তাহা ৫ পাঁচ প্রকার। যে অশক্তির কথা বলিলাম, তাহা ২৮ আটাশ প্রকার। তুষ্টি-নামক বুদ্ধি ৯ প্রকার এবং সিদ্ধি-বুদ্ধিও ৮ আট প্রকার আছে,। আজ তোমাদিগকে আমি ২৮ প্রকার অশক্তির কথা বলিব, ইহা বুঝিতে পারিলে ক্রমে অন্যগুলিও বর্ণন করিব।

মনুষ্যের ১১ এগারটি ইন্দ্রিয় আছে। তাহাদের দোষে, তাহাদের বিকলতায়, তাহাদের অসম্পূর্ণতায়, স্ফুরণ স্বভাব বুদ্ধির স্ফুরণও প্রতিবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ স্ফুরিত হইতে পারে না। স্ফুরণশক্তি থাকিতেও বুদ্ধি যে স্ফুরিত হইতে পারে না, ইহা কেবল একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয়ের দোষেই পারে না। ইহা দেখিয়া আমরা ইন্দ্রিয়কৃত বুদ্ধিবধ (বুদ্ধি বিনাশ) ১১ প্রকার, ইহা নির্ণয় করি। এতদ্ভিন্ন আর ১৭ সপ্তদশ প্রকার বুদ্ধিবধ আছে; তাহা বুদ্ধির নিজদোষে বা নিজ আশ্রয়ের (মস্তিষ্কের) দোষে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাধির্য্য বা শ্রোত্রকৃত বুদ্ধিবধ।

শ্রবণেন্দ্রিয় বা শ্রোত্র-যন্ত্র নিরুদ্ধ হইলে ও বিনষ্ট হইলে বুদ্ধির শব্দে

গ্রহণ শক্তি থাকে না, বধ হয়, ইহা বিদিত আছে। কিন্তু শ্রবণ-যন্ত্রের অপূর্ণতা হেতু বুদ্ধির যে সূক্ষ্ম অংশের ক্ষতি হয়, তাহা তোমরা সহসা অর্থাৎ প্রণিধান না করিয়া বুঝিতে পারিবে না। তোমরা কি স্থির করিয়া রাখিয়াছ যে, সকল ব্যক্তিই সমান শুনিতে পায়? তাহা পায় না। পাইলে, তাল-কাণা ও সুর-কাণা লোক থাকিত না। এমন অনেক ব্যক্তি আছে, শতবর্ষ চেষ্টা করিলেও তাহাদের তালবোধ ও সুরবোধ হয় না। কেন হয় না? না তাহাদের কাণ ভাল নহে, তাহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় সম্পূর্ণ নহে। তাহাদের শ্রোত্রযন্ত্রস্থ শব্দবহা শিরার সকলগুলি সমান নহে, কিংবা কোন কোন শিরার অভাব আছে, অথবা কোন কোন শিরার ক্ষতি হইয়াছে। তাই তাহারা ধ্বনিভেদ বা শব্দের সূক্ষ্মতম তারতম্য বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে অক্ষম। সেইজন্যই তাহারা হয় তালকাণা না হয় সুরকাণা। বাধির্য্য হইলে দেহযাত্রা নির্ব্বাহের কষ্ট হয়, সুতরাং লোক সকল বাধির্য্য নিবারণের চেষ্টা করে, কিন্তু ধ্বনিভেদ না বুঝিলে দেহ যাত্রা চলে, তাই তাহার চিকিৎসাদি করে না। ফল, কাণ ভাল করিবারও উপায় আছে এবং কাণ ভাল না থাকিলে যে বুদ্ধির ক্ষতি হয়, তাহাও নির্ণীত আছে।

রসনেন্দ্রিয় ও অপজিহ্বিকা।

রসগ্রাহক ইন্দ্রিয় জিহ্বা। তাহার দোষ থাকিলে, অপূর্ণতা থাকিলে, অপজিহ্বিকা নামক বুদ্ধিবিঘাত হইয়া থাকে। এরূপ অনেক ব্যক্তি আছে, যাহাদের আস্বাদ বোধ অতি অল্প। স্বাদগ্রহণ শক্তি সকলের সমান, এরূপ মনোভাব, এরূপ বিশ্বাস, পরিত্যাগ কর। ঐ ফলটিতে তুমি যে পরিমাণ বা যে প্রকার আস্বাদ পাইবে, আমি হয়ত ঠিক্ সেইরূপ আস্বাদ পাইব না। লোক সকল মোটামুটি কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি ছয়টি রস জ্ঞানগম্য করিতে পারে বটে; কিন্তু তাহাদের সূক্ষ্ম প্রভেদ আয়ত্ত করিতে সকলে সমান-রূপে পারে না। সর্ব্বসমেত ৬৩ প্রকার রস আছে, কিন্তু সকলে তাহা বোধগম্য করিতে পারে না। এই জন্যই বলিতেছি, রসনেন্দ্রিয়ের বৈগুণ্য বশতও বুদ্ধিবধ হয়, বুদ্ধির ক্ষতি হয়, সুতরাং রঙ্ কাণা লোকের ন্যায় রস-কাণা লোকও আছে। রসবাহী শিরা এককালে নষ্ট হইলে সম্পূর্ণরূপেই রসবুদ্ধির বধ হয়, আর যৎকিঞ্চিৎ বৈগুণ্য থাকিলে অপজিহ্বিকা বা সামান্য রস-কাণা বলিয়া গণ্য হয়, ইহা সূক্ষ্মদর্শী মুনিগণের উপদেশ।

ঘ্রাণপাক ও অজিঘ্রতা।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দোষে, বৈগুণ্য বশত, অথবা অপূর্ণতা হেতু গন্ধবিষয়ক জ্ঞানের বা বুদ্ধির অল্পাধিক্য ও ক্ষতি হইয়া থাকে। রোগবশত কাহার কাহার ঘ্রাণশক্তি এককালে নষ্ট হইয়া যায়। তাহারা কোন প্রকার গন্ধ বুঝিতে পারে না। তাহাদের বুদ্ধি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অত্যল্প ব্যাপার প্রকাশ করিতেও পারে না। সেরূপ ঘ্রাণ বধের নাম অজিঘ্রতা এবং সেরূপ ঘ্রাণ-নাশের নাম ঘ্রাণ-পাক। কিন্তু ঘ্রাণ-যন্ত্রের, গন্ধবাহী শিরায়, অসম্পূর্ণতা দোষে অথবা অন্য কোন দোষে কেহ কেহ গন্ধ সমূহের সূক্ষ্ম তারতম্য বুঝিতে পারেন না। ইহার নিদর্শন অনেক সময়েই সুপ্রাপ্য।

বাগিন্দ্রিয় ও মূকত্ব।

মূক অর্থাৎ বোবা। বাক্‌যন্ত্রের দোষেই মানুষ বোবা হয়, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। যাহারা বোবা নহে, যাহাদের বাক্‌যন্ত্র আছে, মনে করিও না যে,তাহারা সকলেই সমান বলিতে পারে, সকলেই সমান শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে।বাক্‌যন্ত্রের তারতম্য থাকাতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই বাক্য অসমান। বাগিন্দ্রিয়ের অভাব হইলে বুদ্ধির সমূহ ক্ষতি,বৈগুণ্য থাকিলে অত্যল্প ক্ষতি। ফল, বাগিন্দ্রিয় কৃত অশক্তি বা বুদ্ধিবধ থাকিলে, তদ্দ্বারা লৌকিক পারলৌকি সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।

ত্বক্‌কৃত জড়তা বা ত্বক্‌কৃত স্পর্শবধ।

পক্ষাঘাত হইলে, কুষ্ঠবিশেষ জন্মিলে, ত্বক্ নষ্ট হইয়া যায়, অথবা ত্বকের স্পর্শ গ্রহণ শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়, ইহাও তোমরা দেখিয়াছ। কিন্তু ত্বক্‌যন্ত্রের বৈগুণ্য বা অসম্পূর্ণতা হইতে যে স্পর্শভেদজ্ঞান লুপ্ত থাকে, তাহা বোধ হয় তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখ নাই। স্পর্শশক্তি সকলের সমান নহে, ইহা কি তোমরা জান? যদি না জান-ত ক্রমে জানিবার চেষ্টা কর, দেখিতে পাইবে যে,একজন হয়ত আদৌ অনুষ্ণাশীত স্পর্শ বুঝে না, অন্যজন হয়-ত তাহা উত্তমরূপ বুঝি। স্পর্শ শক্তির সম্পূর্ণ অভাব না হইলে, যৎকিঞ্চিৎ অভাবে, দেহযাত্রা চলিয়া যায় বলিয়া সূক্ষ্ম স্পর্শবিজ্ঞান লাভের জন্য কেহ বিশেষ যত্ন করে না। কিন্তু দিব্য স্পর্শানুভবের ও সূক্ষ্ম স্পর্শানুভবের জন্য পৃথক পৃথক উপায় আছে, সে সকল অতীব প্রয়োজনীয় জানিবে। তালকাণা সুরকাণার ন্যায় স্পর্শকাণা হইয়া থাকা বিড়ম্বনার বিষয়। স্পর্শকাণা লোক কোন ক্রমেই অভ্রান্ত নহে।

চক্ষুঃকৃত আন্ধ্য বা চক্ষুঃকৃত বুদ্ধিবধ।

চক্ষু দেখিতে ভাল হইলে কি হইবে? এমন যে আকর্ণ বিশ্রান্ত নেত্র, সেও অনেক সময়ে অনেক প্রকার রূপ বা রঙ দেখিতে বা গ্রহণ করিতে অক্ষম। তোমরা কি মনে কর যে, সকলেই সমান দেখে? তাহা দেখে না। কেহ নিকটস্থ বস্তুকে দূরস্থ দেখে, কেহ বা দূরস্থ বস্তুকে আপনার চক্ষুর উপর জ্ঞান করে। কেহ বা বর্ণের বা রঙের তারতম্য বুঝিতে পারে না, কেহ বা এক রঙে অন্য রঙ দেখে, কেহ বা কোন একটি রঙ আদৌ দেখিতে পায় না। এরূপ রঙকাণা (Color blind) লোক অনেক সময়েই বিভ্রাট ঘটাইয়া থাকে।

মহাভারতে একটি গল্প আছে। তাহার সংক্ষেপ অনুবাদ এই যে, কশ্যপ-পত্নী কদ্রু ও বিনতা, এই উভয় সপত্নীর মধ্যে ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বের বর্ণ বা রঙ্ লইয়া একদা বিতর্ক হইয়াছিল। কদ্রু জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগিনি! বলদেখি, ঐ যে অশ্বটি আসিতেছে, উহার রঙ্ কি! অনন্তর বিনতা দেখিলেন, শাদা এবং কদ্রু দেখিলেন, কাল। বিনতা বলিলেন, শাদা এবং কদ্রু বলিলেন, কাল। কদ্রুর ন্যায় এখনও অনেক লোক শাদাকে কাল অথবা লালকে কাল দেখে, কিন্তু তাহারা ধরা পড়ে না। (শুনিয়াছি, এই বিষয়ের তথ্য লইয়া আজ কাল মহা আন্দোলন হইতেছে, এ সম্বন্ধে অনেক পুস্তক লেখাও হইতেছে এবং রেলওয়ে প্রসাদাৎ আজ কাল নাকি অনেক রঙ কাণা (Color-blind) লোক ধরা পড়িতেছে। আজকাল যেমন রঙ কাণা লোক ধরা পড়িতেছে, এইরূপ যদি দুই একটা জ্ঞান কাণা লোক ধরা পড়িত, তাহা হইলে আমরাও বাঁচিতাম, ধর্ম্মও বাঁচিতেন!) *

---

* রঙকাণা মানুষ আছে, ইহা নাকি পূর্ব্বে কেহ জানিত না! আজ কালকার ইংরাজ পণ্ডিতেরাই নাকি জানিতে পারিয়াছেন! মাক্স মুলার সাহেব, ২১ খানা ঋগ্বেদ সংহিতার মধ্যে ১ খানা মাত্র সংহিতা দেখিয়া, স্থির করিয়াছেন যে, অতি আদিম কালে নীল রঙ ছিল না, অথবা লোকেরা নীল রঙ দেখিতে পাইত না। তিনি নাকি ঋগ্বেদের মধ্যে "নীল" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পান নাই, তাই, তিনি ঐ কথা বলেন। "নীল রঙ্ ছিল না" এ কথা অস্বীকার্য্য; কাজে কাজেই "নীল রঙ ছিল" ইহা স্বীকার্য্য। নীল রঙের বোধক কোন কথা ছিল কি না তাহা আলোচ্য বটে; কিন্তু, এ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করা অযুক্ত। যাহাই হউক, প্রবন্ধান্তরে আমরা এই বিষয়টির পর্য্যালোচনা করিব, অনুসন্ধান করিব, এরূপ ইচ্ছা থাকিল।

চক্ষুস্থ রূপবাহী শিরা প্রশিরার বৈগুণ্য বশত বর্ণবিষয়ক সম্পূর্ণ জ্ঞানের অভাব হয়, ইহা শারীরশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা ও যোগীরা জ্ঞাত। তাঁহারা আরও বলেন যে, ঔষধবিশেষ প্রয়োগের দ্বারা সে সকল দোষ উপশান্ত হইয়া থাকে, যোগ-ক্রিয় প্রভাবেও হইয়া থাকে। যাহাই হউক, নেত্রযন্ত্রের অপূর্ণতা দোষেই হউক, আর অন্য কোন বৈগুণ্যবশতই হউক, বুদ্ধির ক্ষতি হয়, ইহা অত্যল্প ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। অতএব, বুদ্ধির চক্ষুঃকৃত অশক্তি থাকিলে, অথবা চক্ষুঃকৃত বুদ্ধিবিঘাত থাকিলে, তাদৃশ ব্যক্তির দ্বারা বর্ণতথ্য আবিষ্কারের বিশেষ বাধা থাকে।

মনঃকৃত বুদ্ধিবধ বা মনের পক্ষাঘাত।

এইটিই বিশেষ গুরুতর কথা। মনের দোষেই বুদ্ধির সম্পূর্ণ ব্যত্যয় ও সম্পূর্ণ বিনাশ হইয়া থাকে। মনের বৈগুণ্য হইতেই লোক উন্মাদ হয়, তাহাও অসংখ্য প্রকার। অতএব মনের অশক্তি, মনের দ্বারা বুদ্ধিবধ, এবং মনের পক্ষাঘাত বুঝাইবার জন্য পৃথক্ এক অবসর নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। * শরীরের পক্ষাঘাতের ন্যায়, ইন্দ্রিয়ের পক্ষাঘাতের ন্যায়, মনেরও পক্ষাঘাত আছে, (পাক্ষিক অর্থাৎ আংশিক অপূর্ণতা বা অঙ্গবিকলতা আছে), সংসারী উন্মত্ত লোকে তাহা জানে না, জানে না বলিয়াই ইহলোক পরলোক উভয় লোকেই বঞ্চিত হয়। মনঃকৃত বুদ্ধিবধ হইলে, উন্মাদ হইলে, লোকে তাহার নিরাকরণার্থ চিকিৎসা করে, কিন্তু পক্ষাঘাত হইলে, আংশিক বৈগুণ্য হইলে, তাহার পূরণার্থ কেহই যত্ন করে না। ফল, মনঃপক্ষাঘাতের উত্তমরূপ ঔষধ আছে। ব্রহ্মচর্য্য, গুরুকুলবাস, হবিষ্যান্ন ভোজন, ইন্দ্রিয় সংযম, ইত্যাদি অনেক সুপথ্যও নির্দ্দিষ্ট আছে। এ সকল কথা অন্য এক সময়ে বুঝাইয়া দিব।

এ-ত গেল জ্ঞানেন্দ্রিয়-কৃত বুদ্ধিবধের কথা। এইরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয় কৃত বুদ্ধিবধ (বুদ্ধির ক্ষতি) ও হইয়া থাকে। হস্তের অভাবে ও হস্তের দোষে, পদের অভাবে ও পদের বৈগুণ্যে, পায়ুর বিনাশে ও পায়ুর বিকলতায়, উপস্থের বিনাশে ও উপস্থের বৈকল্যে, অনেক প্রকার বুদ্ধিবধ বা বুদ্ধির ক্ষতি হইয়া থাকে।

---

* মনের পক্ষাঘাত অথবা মনঃকৃতি বুদ্ধিবধ কিরূপ, তাহা আমরা অন্য এক প্রবন্ধে বর্ণন করিব।

ঐ সকল দোষ থাকায়, করণ কৈবল্য থাকায়, অযোগী মনুষ্যেরা প্রায়শঃই জ্ঞান-কাণা হয়। প্রকৃত জ্ঞান কি তাহা তাহারা চিনিতে পারে না। অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রিয়গম্য স্থূল পদার্থও তাহারা যথার্থরূপে আয়ত্ত করিতে পারে না। তাহারা যখন অতি যৎসামান্য রেণু তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম তখন যে তাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্ব ও ঈশ্বর তত্ত্ব ঠিক্ বুঝিবে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। অসংস্কৃতাত্মা, অযোগী ও বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্তির ধর্ম্মপিপাসা থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু তাহারা আপনাদের সেই অপূর্ণবুদ্ধির সাহায্যে ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া একে আর করিয়া তুলে। হয়ত কেহ নীতিকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করে, কেহ বা বৃত্তিসামঞ্জস্যকেই ধর্ম্ম বলিয়া বর্ণন করে, কেহ বা সমঞ্জসীভূত সুখকেই ধর্ম্ম বলিয়া দাঁড়ায়। যাঁহারা সংস্কৃতাত্মা, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, যোগানুধ্যানদ্বারা যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়দোষ নষ্ট করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়দিগকে পূর্ণশক্তি করিয়াছেন, তাঁহারা দেখেন, জ্ঞানকাণা বিষয়াসক্ত লোকেরা অন্ধপথিকের হাতী জানার ন্যায় * ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতেছে। আজ এই পর্য্যন্ত, কাল আবার তোমাদিগকে যথাসাধ্য উপদেশ করিব।"

ভগবান্ পঞ্চশিখ মুনি এই বলিয়া উপরত হইলেন।

---

* পাঁচ জন অন্ধ, হাতী কিপ্রকার তাহা জানিবার জন্য একদা সমবেত হইল। একজন চক্ষুষ্মান্ লোকের সাহায্যে তাহারা একটি হাতী পাইল। চক্ষু নাই, কাযেকাযেই তাহারা হস্তের দ্বারা হাতী চিনিতে গিয়া কেহ লেজ ধরিল, কেহ শুঁড় ধরিল, কেহ কাণ ধরিল, কেহ বা পা ধরিল। যে পা ধরিয়াছিল, সে স্থির করিল, হাতী লম্বাকার ও গোল। যে কাণ ধরিয়াছিল, সে স্থির করিল, হাতী কুলোর মত চ্যাপ্টা। যে পা ধরিয়াছিল, সে ভাবিল, হাতী স্তম্ভের ন্যায় স্থূল ও গোল।

ভারতে ব্রিটিশাধিকার।

অনেকের বিশ্বাস, ইংরেজের বাহুবলে ভারতবর্ষ অধিকৃত হইয়াছে। কেবল ইংরেজের পরাক্রমে, ইংরেজের ক্ষমতায়, ইংরেজের বুদ্ধিকৌশলে ভারতবাসী পরাজিত, পদানত ও পরাধীনতার দুর্ব্বহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ ইংরেজ বিজেতা, ভারতবাসী বিজিত। ইংরেজ আধিপত্য স্থাপনকর্ত্তা, ভারতবাসী আধিপত্য স্থাপনে পরাজিত। সাগর ভূধর পরিবৃত নানা রত্ন শোভিত প্রকৃতির এই রমণীয় রাজ্য দিগ্‌বিজয়ী ইংরেজের বিজয়লব্ধ সম্পত্তি! পলাশীর আম্রকাননে, আসাইর প্রশস্ত ক্ষেত্রে, পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে সর্ব্বত্রই ইংরেজের বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে ভারতবাসী পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। অনেক ইংরেজ ইতিহাস লেখক অম্লানভাবে জগতের সমক্ষে আপনাদের এই বিজয়িনী শক্তির মহিমা পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন। মেকলে লর্ড ক্লাইব শীর্ষক প্রবন্ধের অনেকস্থলে "কেহই সাগরের ক্ষমতাশালী সন্তানগণকে—ক্লাইব ও তাঁহার ইংলণ্ডবাসিদিগকে প্রতিরোধ করিতে পারে নাই" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। "সাগরের ক্ষমতাশালী সন্তানগণের" ক্ষমতা বলেই যেন ভারত সাম্রাজ্য অধিকৃত হইয়াছে। ক্লাইব তাঁহার ইংলণ্ডবাসিদিগের পরাক্রমেই যেন পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা আপনার পদানত করিয়া তুলিয়াছেন।

যাঁহারা প্রকৃত ঘটনা বিপর্য্যস্ত করিয়া জগতের সমক্ষে আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি করিতে প্রয়াসী হন, আমি তাঁহাদিগকে শতহস্ত দূর হইতে অভিবাদন করি। ভারতবর্ষ এখন ইংরেজের পদানত হইয়াছে, ইংরেজ এখন অসীম ক্ষমতার সহিত ভারতবর্ষে আপনাদের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন, কিন্তু কেবল ইংরেজের বীরত্বে ভারতবর্ষ অধিকৃত হয় নাই। ভারতের দেশের পর দেশ ইংরেজের করায়ত্ত হইয়াছে, যুদ্ধের পর যুদ্ধে সমস্ত হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছে, অসির পর অসির আঘাতে ভারতবাসীর দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ কেবল ইংরেজের ক্ষমতায় বিজিত হয় নাই। হিমগিরির অত্যুচ্চ শিখর হইতে সুদূর কুমারিকা পর্য্যন্ত ইংরেজের প্রতাপ ছাইয়া

পড়িয়াছে, ইংরেজ শাসনে ভারতের সে গৌরব, সে মহত্ত্ব, সমস্তই অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ ইংরেজের কেবল বিজয়লব্ধ সম্পত্তি নহে। অদূরদর্শী ইংরেজ যতই গর্ব্বিত হউন না কেন, জগতের সমক্ষে আত্মগৌরব বিস্তার করিতে যতই চেষ্টা করুন না কেন, অপক্ষপাত ইতিহাস কিন্তু তাঁহাদিগকে কখনও ভারতবর্ষের বিজেতা বলিয়া সম্মানিত করিবে না। ইংরেজ ভারতবর্ষের বিজেতা নহেন, ইংরেজের ক্ষমতায় ভারতবর্ষ বিজিত হয় নাই, বিজয়লব্ধ সম্পত্তি বলিয়া ভারতবর্ষে আধিপত্য করিতে ইংরেজের কোনও অধিকার নাই। ভারতবর্ষ আপনিই আপনাকে জয় করিয়াছে, ভারতবাসী আপনারাই আপনাদিগকে ইংরেজের অধীন করিয়া তুলিয়াছে!

কেহ এক দেশ হইতে আসিয়া দেশান্তরে কোনরূপ ক্ষমতা স্থাপন করিলেই উহাকে সাধারণত দেশ-জয় বলা গিয়া থাকে। দুই রাজ্যে সংগ্রাম উপস্থিত হইল, এক রাজ্যের সৈন্যগণ অপর রাজ্য আক্রমণ করিয়া সেই রাজ্যের রাজকীয় শাসন বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল, অথবা সেই রাজ্যের অধিপতিকে আপনাদের মনোমত কোনরূপ নিয়মে আবদ্ধ করিল। আক্রান্ত রাজ্যাধিপতি এই নিয়মে আবদ্ধ হইয়া আক্রমণকারীর নিকট প্রকারান্তরে আপনার অধীনতা স্বীকার করিলেন। কতকগুলি বিশেষ বিধির অধীন হওয়াতে তাঁহার স্বাধীনতার গতিরোধ হইল। ইহাই প্রকৃত দেশ-জয়। যখন মাকিদনের মহাবীর সেকন্দর শাহ্ পারসস্তান জয় করেন, তখন মাকিদনের সৈন্যগণের সহিত পারস্য সাম্রাজ্যের সৈন্যদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে পারস্যের সৈন্যগণ সেকন্দর শাহের সৈন্যদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। পারস্যে মাকিদনের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। যখন পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া, আফগানদিগের জনপদ আক্রমণ করেন, তখন নওশেরার যুদ্ধক্ষেত্রে শিখদিগের সহিত আফগানদিগের তুমুল যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এই যুদ্ধে শেষে আফগানদিগের পরাজয় হয়। আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দু নরপতি আফগানদিগের অধিকৃত ভূখণ্ড জয় করেন। যখন নির্দ্দেশ করা যায় যে, ইংলণ্ড ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, তখন সহজেই মনে হয় যে, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যেও এইরূপ কোন ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিহাস স্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে যে, ভারতবর্ষে এরূপ কোনও ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। ইংলণ্ডের অধিপতি—দিল্লীর মোগল সম্রাট বা ভারতবর্ষের কোন

প্রদেশের রাজা বা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই। ইংলণ্ডের সৈন্যগণ যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া, ভারতবর্ষ আক্রমণার্থ উপস্থিত হয় নাই, ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ ভারতবর্ষ জয়ের জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় করে নাই। ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। কেবল ইংলণ্ডের কয়েকজন ব্যবসায়ী ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান বন্দরে ব্যবসায় করিতে আসিয়া, মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্ন দশায় ভারতবর্ষে অরাজকতা দেখিতে পান। এই অরাজকতা তাঁহাদিগকে আধিপত্য স্থাপনে প্রবর্ত্তিত করে। তাঁহারা ক্রমে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ছলে বলে ও কৌশলে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ অধিকার করিতে থাকেন। ইহা প্রকৃত দেশ জয় নহে। ইহাকে আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করাই অধিকতর সঙ্গত।

এই অরাজকতা ও বিপ্লবের সময় যদি ইংলণ্ডের বণিকগণ কেবল তাঁহাদের "সাগরের পরাক্রমশালী সন্তানগণের" বাহুবলে ভারতবর্ষের জনপদ সকল অধিকার করিতেন, তাহা হইলেও বোধ হয় বলিতে পারা যাইত যে, ইংলণ্ডের পরাক্রমে ভারতবর্ষ অধিকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাসে এরূপ চিত্রও পাঠকের নেত্র-পথবর্ত্তী হয় না। ভারতবর্ষের দুই লক্ষ সৈন্যের মধ্যে ৬৫০০০ হাজার মাত্র ইংরেজ। এইরূপ সংখ্যা কেবল সিপাহি যুদ্ধের পর হইতেই দেখা যায়। সিপাহি যুদ্ধের সময় ৪৫ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য ও ২,৩৫ হাজার ভারতবর্ষীয় সৈন্য ছিল। ১৮০৮ অব্দে ভারতবর্ষে ২৫ হাজার ইংরেজ সৈন্য ও ১ লক্ষ ৩০ হাজার ভারতবর্ষীয় সৈন্য দেখা যায়। ইহার পূর্ব্বে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা বড় অল্প ছিল। ব্রিটীশ কোম্পানী যখন আপনাদের অধিকার বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হন, তখন সাত ভাগের এক ভাগ মাত্র ইংরেজ সৈন্য ছিল। ইহার পূর্ব্বে কোম্পানী কেবল ভারতবর্ষীয় সৈন্য দ্বারাই আপনাদের সামরিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অন্ধকূপ হত্যার পর লর্ড ক্লাইব যখন কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য মাদ্রাজ হইতে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে ১৫০০ ভারতবর্ষীয় সৈন্য ও ৯০০ মাত্র ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। যে পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা বৃটীশ কোম্পানীর পদানত হয়, তাহাতে ২৮৮০ জন ভারতবর্ষীয় সৈন্য ক্লাইবের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল; পক্ষান্তরে ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা ১ হাজারের অধিক ছিল না। ইহার পরে ইংরেজেরা যত প্রধান প্রধান যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন, যত প্রধান প্রধান যুদ্ধে তাঁহাদের বিজয় গৌরব বিকাশ পাইয়াছে, তৎসমুদয়েই এক পঞ্চমাংশ মাত্র

ইংরেজ সৈন্য ছিল। অপর চারিভাগের সমস্তই ভারতবর্ষীয় সৈন্য। সুতরাং ইংরেজজাতি ভারতবাসীকে পরাজিত করিয়াছে, ইংরেজ জাতির পরাক্রমে ভারতবর্ষ বিজিত হইয়াছে, ইহা বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত, সত্যের বিরুদ্ধ। সমগ্র ভারতবর্ষ কখনও বিজাতি ও বিদেশীকর্ত্তৃক বিজিত হয় নাই, সমগ্র ভারতবর্ষে কখনও বিজাতি ও বিদেশীয় পরাক্রমে তাহাদের আধিপত্য বদ্ধমূল হয় নাই। ভারতবর্ষ আপনাকেই আপনি জয় করিয়া বিজাতি ও বিদেশীর হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। অনেক দোষে ভারতবর্ষের অধঃপতন হইয়াছে। অনেক অকার্য্যের অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষ পূর্ব্বতন গুণগ্রাম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষ কখনও কেবল বিদেশীর বিক্রমে বশীভূত হয় নাই। মুসলমানেরা ভারতবাসীর সাহায্যে আপনাদের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, আর ইংরেজেরাও ভারতবাসীর সাহায্যে আপনাদের অধিকার সম্প্রসারিত ও সুরক্ষিত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয়দিগকে সৈনিক দলে গ্রহণ করিলে যে, আপনাদের অনেক সুবিধা হইবে, তাহাদিগকে যথানিয়মে শিক্ষা দিলে যে, তাহারা রণনিপুণ বীরপুরুষ হইয়া উঠিবে, এ চিন্তা বা এ ধারণা প্রথমে ইংরেজদিগের মনে উদিত হয় নাই। সুতরাং ইংরেজেরা কখনও ইহা বলিয়াও গর্ব্ব করিতে পারেন না যে, তাঁহারা ভারতবর্ষে সিপাহি সৈন্য সৃষ্টি করিয়া, আপনাদের অধিকার সুরক্ষিত করিবার এক অপূর্ব্ব উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। আপনাদের অভীষ্টকার্য্য সাধনের এই উপায় ফরাসীদিগের উদ্ভাবিত। ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লে প্রথমে ভারতবর্ষীয়দিগকে সৈনিক শ্রেণীতে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করিতে প্রবৃত্ত হন। ইংরেজেরা ফরাসীদিগের প্রবর্ত্তিত দৃষ্টান্ত অনুসারে ভারতবর্ষীয়দিগকে আপনাদের সৈনিক দলে গ্রহণ করেন। এইরূপে ১৭৪৮ অব্দে দক্ষিণাপথে ইংরেজদিগের সিপাহি সৈন্য সৃষ্ট ও ব্যবস্থিত হয়।

ভারতের এই সিপাহি সৈন্য ভারতবর্ষ অধিকারে ইংরেজদিগের প্রধান সহায়। ইহাদের রণনৈপুণ্য, ইহাদের প্রভুভক্তি ও ইহাদের চরিত্র সম্বন্ধে এখানে অধিক কিছু বলার প্রয়োজন হইতেছে না। একজন সদাশয় পুরুষ একদা ভারতের গবর্ণর জেনেরলের নিকট ভারতীয় সিপাহিদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "তাহারা (সিপাহিগণ) যে, জীবিতকাল পর্য্যন্ত আমাদের প্রতি বিশ্বাসী, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। তাহারা ও তাহাদের পূর্ব্ব

পুরুষগণ আমাদের জন্য একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছে, তাহারা ঘোর অন্ধকারময় বিপত্তিপূর্ণ সময়ে—যে সময়ে আমাদের শাসন বিধ্বস্ত প্রায় বোধ হইয়াছিল—আমাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহারা আমাদের পরাজয় সুসাধ্য বোধ হইলেও বিপক্ষ দলের উৎকোচ গ্রহণের বিরোধী হইয়াছে। তাহারা ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কার্য্য সাধন করিয়াছে। তাহারা আমাদের আদেশে, তাহাদের প্রাচীন অধিস্বামী দিগের বিরুদ্ধে, তাহাদের স্বদেশের বিরুদ্ধে এবং তাহাদের আত্মীয়গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে।" বস্তুত ব্রিটীশ সেনার, সহিত ভারতীয় সেনার তুলনা হইতে পারে না। নানা কারণে ও নানাবিষয়ে উভয়ে, উভয় হইতে বহুদূরে অবস্থিত। একজন বিদেশী প্রভুর, দেশ, জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্মানুশাসনে সর্ব্বতোভাবে বিদেশীর ভৃত্যত্ব করে, অন্যজন তাহার স্বদেশী লোকের ও স্বদেশের কার্য্য সাধনের জন্য নিয়োজিত থাকে; একজন অধিকাংশ সময়ে তাহার স্বজাতির স্বধর্ম্মের ও স্বজাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, অন্যজন সকল সময়ে ভিন্ন দেশের ভিন্ন ধর্ম্মের ও ভিন্ন বর্ণের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইয়া থাকে; এক জনের প্রভুভক্তি প্রভুদত্ত বেতনে সমুৎপন্ন ও প্রভুর সদাচরণে পরিবর্দ্ধিত হয়, অন্য জনের প্রভুভক্তি আপনার পরিপুষ্টির সহিত পরিপুষ্ট হয়, এবং আপনার উন্নতির সহিত উন্নত হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ পার্থক্য থাকিলেও ভারতীয় সৈন্য সর্ব্বদা তাহার প্রভুর অনুগত ও তাহার প্রভুর হিতাকাঙ্ক্ষী। অর্থ ও সদাচারের বিনিময়ে যে প্রভুভক্তি ক্রীত হয়, তাহা অনেক সময়ে প্রভুর স্বদেশীয় সৈন্যের কর্ত্তব্য নিষ্ঠাকেও অধঃকৃত করিয়া থাকে। বহুবিধ কষ্ট অথবা অস্থিভেদী পরিশ্রমের প্রয়োজন হইলেও সিপাহি কখনও কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হয় না। বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সিপাহি, সর্ব্বপ্রকার কষ্টভার বহনে প্রবৃত্ত হয়, এবং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সমীহিত সাধনে সমুদ্যত হইয়া থাকে। কোন অভাব বা কোন অনিচ্ছা তাহাকে কর্ত্তব্য পথ হইতে অপসারিত করিতে সমর্থ হয় না। ভিন্ন ধর্ম্মের ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ব্যবহার পদ্ধতির অধিনায়কের অধীনে থাকিয়া, সিপাহি সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্তে ও উৎসাহ সহকারে আপনার ব্রত ধর্ম্ম পালনে অগ্রসর হইয়া থাকে। সে অসন্দিগ্ধ ভাবে এই ভিন্ন দেশীয় অধিনায়কের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অকুণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার সহিত প্রীতি সূত্রে আবদ্ধ হয় এবং অম্লান ভাবে তাঁহার আদেশ পালনে উদ্যত হইয়া থাকে।

কিছুতেই তাহার সাধনা প্রতিহত হয় না এবং কিছুতেই তাহার সহ্যগুণ অবনত হইয়া পড়ে না। সে বিপত্তি সময়ে নিদারুণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও আপনার যৎ সামান্য খাদ্যদ্রব্য দ্বারা সতীর্থ ব্রিটীশ সেনার তৃপ্তি সাধনে অগ্রসর হয়, ইউরোপীয়ের সাহস ও তেজস্বিতা যে স্থানে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হয়, সিপাহী সে স্থানেও অবাধেও অসঙ্কোচে উপনীত হইয়া আপন দলের পতাকা স্থাপিত করে এবং সে যুদ্ধের সময় আপনার বহু পরিশ্রম লভ্য যৎসামান্য বেতনের অংশ দিয়া ইংরেজের সাহায্য করিয়া থাকে। পবিত্র ইতিহাসের প্রতি পত্রে তাহার পবিত্র বিশ্বাস ও পবিত্র প্রভুভক্তি জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। তাহার মহত্ত্ব, তাহার একপ্রাণতা, তাহার কর্ত্তব্য বুদ্ধি, তাহার স্বার্থত্যাগ চিরকাল তাহাকে ইতিহাসের বরণীয় করিয়া রাখিবে। হিমালয়ের অযুত শৃঙ্গপাতেও তাহার গৌরব-স্তম্ভ বিচূর্ণ বা বিক্ষিপ্ত হইবে না, এবং ভারত মহাসাগরের সমগ্র বারিতেও তাহার কীর্ত্তিচিহ্ন বিলুপ্ত বা বিধৌত হইবে না।

এই প্রভুভক্ত সৈন্যের সাহায্যে ইংরেজ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন। এই প্রভুভক্ত সৈন্য প্রধানত প্রধান প্রধান যুদ্ধে ইংরেজদিগের হস্তে বিজয়শ্রী আনিয়া দিয়াছে। ভারতবাসী বিদেশী বিজাতির হস্তে আপনাদের দেশ সমর্পণ করিতে কেন এত যত্ন করিয়াছে, আত্ম-স্বাধীনতায় তাচ্ছীল্য দেখাইয়া বিদেশী, বিজাতিকে আপনাদের অধিপতি করিতে কেন এরূপ স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, তাহার কারণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নহে। ভারতবর্ষে স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা ও জাতি-প্রতিষ্ঠার আদর ক্রমে কমিয়া আসিতেছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা সাহসে ও বীরত্বে অসাধারণ ছিলেন। যখন মহাবীর সেকন্দর শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন গ্রীকেরা ভারতবর্ষীয়দিগের বীরত্ব দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া ছিলেন। এসিয়ার আরবেরা একটি প্রসিদ্ধ দিগ্‌বিজয়ী জাতি। স্বল্পকালে ইহাদের বিজয় পতাকা মিশর, পারস্য, স্পেন, তুরস্ক ও কাবুলে উড্ডীন হয়। কিন্তু আরবগণ একশত বৎসর কাল চেষ্টা করিয়াও ভারতবর্ষ জয়ে সমর্থ হয় নাই। কাসেম সিন্ধুদেশ জয় করেন বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরই উহা আবার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল। যাঁহারা প্রথমে ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করেন তাঁহারা পাঠান। পাঠানেরা আরব দিগের ন্যায় প্রতাপশালী বা সমৃদ্ধিশালী ছিল না, তথাপি ভারতবর্ষ তাহাদের হস্তগত হয়। পৃথ্বীরাজের পর আর কোন ভারতীয় বীর তাহাদিগকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিবার চেষ্টা

করেন নাই। এই নিশ্চেষ্টতার কারণ স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তায় অনাস্থা বা জাতীয় জীবনের অবনতি। ধর্ম্মবিপ্লবে হিন্দুদিগের হৃদয়ে ক্রমে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। তাহারা পার্থিব বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে চিন্তাশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন। চিন্তাশীলতা প্রযুক্ত ক্রমে তাঁহাদের বাহ্যসুখে অনাস্থা জন্মে। এই অনাস্থা হইতেই নিশ্চেষ্টতা ও ঔদাসীন্যের সূত্রপাত হয়। রাজা স্বদেশী কি বিদেশী হউন, তাঁহারা বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতেন। মুসলমানের রাজত্ব সময়ে কেবল এক রাজপুতানা ভিন্ন ভারতের আর কোন ভূখণ্ড আপনার স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার গৌরব দেখাইতে পারে নাই। এই স্বাতন্ত্র্য গৌরব আজপর্য্যন্ত মিবারের ইতিহাস অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থার ন্যায় ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক ভাবের আতিশয্য ছিল। বীর্য্যবন্ত আর্য্যপুরুষেরা যখন মধ্য এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহাদের মধ্যে অনৈক্য বা সাম্প্রদায়িক ভাব দেখা যায় নাই। তাঁহারা তখন একতা সম্পন্ন ছিলেন এবং একপ্রাণ হইয়া চারিদিকে আপনাদের অধিকার সম্প্রসারিত ও ক্ষমতা অপ্রতিহত করিবার চেষ্টা করিতে ছিলেন। ইহার পর ক্রমে তাঁহাদের বংশবৃদ্ধি পায়, ক্রমে অনার্য্যেরা আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিশিয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আর্য্যে অনার্য্যে মিশিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়। এই সময় হইতে অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক ভাব বিকাশ পাইতে থাকে। এইরূপে ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলের সৃষ্টি হইল। প্রতিমণ্ডলে ভিন্ন জাতির ভিন্ন ব্যবহার পদ্ধতির ভিন্ন ভাষার লোক বাস করিতে লাগিল; ইহাদের মধ্যে একতা রহিল না। কোন সময়ে কেহ সমগ্র ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় অধিপতি হইতে পারিলেন না। কোন সময়ে সমুদয় ভারতবর্ষীয় পরস্পর মিলিয়া একটি মহাজাতিতে পরিণত হইল না, সুতরাং ভারতবর্ষে জাতিপ্রতিষ্ঠা বা জাতীয় জীবনের গৌরব দেখা গেল না। জাতিপ্রতিষ্ঠাভাব ও অনৈক্য প্রযুক্ত সাহসে ও বীরত্বে চিরপ্রসিদ্ধ ভারতবর্ষীয়গণ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। আবার মুসলমানেরা যখন সিন্ধুনদ পার হইয়া পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া পড়ে, ভারতবর্ষীয়েরা যখন মুসলমানের অনুগত বা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হয়, তখন অনৈক্যের বন্ধন দৃঢ়তর হইতে থাকে। ভারতের সৌভাগ্যক্রমে এই অনৈক্যের মধ্যেও একবার জাতি প্রতিষ্ঠার অভ্যুদয়

দেখাগিয়া ছিল। দক্ষিণাপথে প্রাতঃস্মরণীয় শিবজী আপনার মহা মন্ত্রবলে একবার একটি মহাজাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। এই মহাজাতির পরাক্রমে চিরজয়ী মুসলমান চিরপরাধীন হিন্দুর পদানত হইয়াছিল। কিন্তু শিবজীর মৃত্যুর পর এই মহাজাতি আবার ক্রমে ক্রমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। যখন মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন হয়, ভারতবর্ষীয় খণ্ড-রাজ্য গুলি যখন স্বস্বপ্রধান হইতে থাকে, তখন ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক ভাব পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। তখন ভারতে জাতিপ্রতিষ্ঠার কোনও চিহ্ন ছিল না, জাতীয় জীবনে কোনও লক্ষণ দেখা যাইত না। তখন একপ্রাণতা ও সমবেদনা, সমস্তই অন্তর্দ্ধান করিয়া ছিল। দীর্ঘকাল বিদেশী ও বিজাতীয় শাসনে থাকাতে ভারতবর্ষীয়গণের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বোধ ছিল না। তখন দিগ্‌বিজয়ী মারহাট্টারা ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল, পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর প্রতাপশালী পেশবা শোকে ও দুঃখে মানবলীলা সম্বরণ করিয়া ছিলেন। স্বাধীনতার লীলাভূমি রাজপুতানা ক্রমে গৌরব শূন্য হইয়াছিল। বীর্য্যবন্ত রাজপুতেরা অনৈক্য দোষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। হয়দরাবাদের নিজাম স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। অযোধ্যার সুবাদার স্বপ্রধান হইয়া ছিলেন। তদানীন্তন মোগল সম্রাট্‌ হীনভাবে বিহার প্রদেশে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। অরাজকতা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছিল। এই অরাজকতার সময় ফরাসীরা প্রথমে ভারতবর্ষীয়দিগের সাহার্য্য আপনাদের প্রাধান্য বিস্তারে উদ্যত হন। ভারতবর্ষীয়েরা এইরূপ সাহায্যদানে অসম্মত হয় নাই। তাহারা দীর্ঘকাল হইতেই বিদেশীয় শাসনে ছিল, এখন অরাজকতা হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় তাহারা অভিনব বিদেশী প্রভুর আনুগত্য স্বীকারে প্রবৃত্ত হয়। ইংরেজেরা দক্ষিণাপথে ফরাসীদিগের এইরূপ কার্য্য পদ্ধতি দেখিয়া ভারতবর্ষীয় দিগের সাহায্য গ্রহণে অগ্রসর হন। বিদেশীজাতির আনুগত্য তখন আর ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে নূতন ছিল না। তাহারা পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল বিদেশীর শাসনাধীন ছিল। ইতালী ও জর্ম্মণি সহজে নেপোলিয়নের বশীভূত হইয়াছিল, যেহেতু ইতালী তখন সে ইতালী বা জর্ম্মণি সে জর্ম্মণি ছিলনা। ইতালীয় ও জর্ম্মানগণ তখন জাতীয়ভাব হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন সময়েও ভারতবর্ষ পৃথ্বীরাজ, প্রতাপসিংহ বা শিবজীর ভারতবর্ষ ছিল না।

সুতরাং ইংরেজ বণিকদিগের চেষ্টা ফলবতী হইল। ভারতবর্ষীয়েরা চারিদিকে ঘোরতর আভ্যন্তরীণ বিপ্লব ও অরাজকতা দেখিয়া আহ্লাদ সহকারে বৃটিশ কোম্পানীর সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল, এবং অত্যন্ত কার্য্যপারদর্শিতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা দেখাইয়া আপনাদের অভিনব প্রভুর অধিকার বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল।

অনেকে বলিতে পারেন, ভারতবাসী ইংরেজের পক্ষ হইয়া আপনাদের দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে সুতরাং তাহারা স্বদেশদ্রোহী। তাহারা দেশহিতৈষিতায় জলাঞ্জলি দিয়া অবলীলায় অসঙ্কোচে একদল বিদেশী বণিককে আপনাদের অধিপতি করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তখন সর্ব্বাংশে ভারতবর্ষীয়দিগের ছিলনা। মুসলমানেরা ভারতবর্ষের চারিদিকে ব্যাপিয়া পড়িয়াছিল। ভারতবর্ষের এক একটি সামান্য ভূখণ্ডে চারি পাঁচ জাতি চারি পাঁচ ভাষার লোক পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে চাহিয়া দেখিতেছিল। যদি এই সময়ে দ্বিতীয় প্রতাপ সিংহ বা দ্বিতীয় শিবজীর আবির্ভাব হইত তাহা হইলে বোধ হয় ভারতের ইতিহাস রূপান্তর পরিগ্রহ করিত। মহারাজ রণজিৎ দ্বিতীয় শিবজীরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব মোগল সাম্রাজ্যের ঠিক অধঃপতন সময়ে হয় নাই। বৃটিশ কোম্পানী উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া আপনাদের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের রেখাপাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—আর ভারতবর্ষীয়গণ দুর্ব্বুদ্ধি ক্রমে এক অধীনতা পাশ হইতে আর এক অধীনতা পাশে আবদ্ধ হইবার জন্য তাহাদের সহায় হইয়াছিল।

এইরূপে ভারতে ব্রিটীশাধিকারের সূত্রপাত হয়, ব্রিটীশ কোম্পানী এইরূপে ভারতে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করেন। পাঠান ও মোগলেরা দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াও ভারত সাম্রাজ্য একীভূত করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইংরেজেরা একশত বৎসরের মধ্যেই ইহাতে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই একীকরণ লর্ড ডালহৌসীর শাসন সময়ে হয়। ডালহৌসীর অদ্ভুত রাজনীতি বা চাতুরীর বলে পঞ্জাব, নাগপুর, সেতারা, অযোধ্যা প্রভৃতি ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ায় সংযোজিত হইয়া উঠে। এই সকল পররাষ্ট্র গ্রহণেই ব্রিটীশ অধিকারের পূর্ণতা সাধিত হয়। পররাষ্ট্র গ্রহণপ্রথা ভারতে ব্রিটীশ অধিকারের পর হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। লর্ড ডালহৌসীর পূর্ব্বে ভারতের আর দুই একটি গবর্ণর জেনেরল এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন।

ইহার উদাহরণ স্থলে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কর্ত্তৃক কূর্গ রাজ্য গ্রহণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বেণ্টিঙ্কের সময়ে কূর্গ রাজ্যের একজন হত্যাপরাধী মহিসূরের ব্রিটীশ রেসিডেণ্টের শরণাগত হয়। কূর্গরাজ এই অপরাধীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে রেসিডেণ্টকে পত্র লিখেন। ইহাতে রেসিডেণ্টের সহিত কূর্গের অধিপতির মনোবাদ জন্মে। এই মনোবাদ হইতে যুদ্ধের উৎপত্তি হয়। কূর্গরাজ পরাজিত হন এবং তাঁহার রাজ্য ব্রিটীশ রাজ্যে সংযোজিত হইয়া যায়। কূর্গের পূর্ব্বাধিকারিগণ মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে দশ লক্ষ টাকা ধার দিয়াছিলেন, পদচ্যুত রাজা সেই টাকা পাইবার জন্য চৌদ্দবৎসর কাল বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা কিছুতেই ফলবতী হয় নাই। ভারতবর্ষে এইরূপ ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া পদচ্যুত কূর্গরাজ বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত যাইবার তাঁহার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। একটি তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী দুহিতার শিক্ষার বন্দোবস্ত করণ, অপরটি তাঁহার সেই দশলক্ষ টাকার প্রাপণ। প্রথমটিতে তিনি বিশেষরূপে ফল লাভ করিলেন; ইংলণ্ডের অধীশ্বরী কূর্গরাজ দুহিতার ধর্ম্মমাতা হইলেন। কিন্তু অপরটিতে তাঁহার কিছুই ফললাভ হইল না। ডিরেক্টরগণ বলিলেন, তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার প্রাপ্য দশলক্ষ টাকার সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং এবিষয়ে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। কূর্গরাজ কাতরভাবে তাঁহার বিষয় পুনর্ব্বিচার করিতে অনুরোধ করিলেন। এবার ডিরেক্টরগণ ভয় দেখাইলেন, কহিলেন তিনি শীঘ্র বারাণসীতে ফিরিয়া না গেলে তাঁহার বৃত্তি বন্ধ করা হইবে। কূর্গরাজ হতাশ ও হতোদ্যম হইয়া ভগ্নহৃদয়ে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। বেণ্টিঙ্কের সময়েও পররাজ্য গ্রহণ নীতির এইরূপ বলবতী যথেচ্ছাচারিতা। যিনি সতীদাহ নিবারণ করিয়া ভারতবর্ষের অক্ষয় আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন, ইংরেজী শিক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্রিটীশ শাসনের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন, ভারতের ইতিহাসে যাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে, তাঁহার সময়েও এইরূপ বলবতী স্বার্থপরতা। লর্ড ডালহৌসীর সময়ে পররাষ্ট্র গ্রহণের পূর্ণতা বিকাশ পায়। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, লর্ড ডালহৌসী যতগুলি রাজ্য গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ অধিকার সম্প্রসারিত করিয়াছেন, তাহার একটিতেও সুরাজনীতির পরিচয় পাওয়া যায় না। ডালহৌসী প্রথমে বিজয়লব্ধ সম্পত্তি বলিয়া পঞ্জাব অধিকার করেন, ইহার পর

ক্ষুদ্র হইয়াও বৃহৎ বিচিত্র,ও মহান্ মনুষ্যের জ্ঞান এখানে নিজ অধিকার মধ্যে অব্যাহত প্রভাব, এখানে উত্তর দিতে সমর্থ। আধুনিক বিবর্ত্তবাদ ইহার উত্তর দিয়াছে। এই উত্তর সম্পূর্ণভাবে নূতন বা ভ্রান্তিহীন না হইলেও মনুষ্যের বিপুল শক্তির পরিচায়ক।

জ্ঞাননেত্র প্রসারণ করিয়া বিজ্ঞানচক্ষুঃ বিবর্ত্তবাদী দেখিলেন, মনুষ্য-জ্ঞানায়ত্ত কালের আরম্ভে, মনুষ্য জ্ঞানায়ত্ত সৃষ্টিক্রিয়ার আরম্ভে দুই সত্তা অথবা দুইরূপধারী এক সত্তা বর্ত্তমান। এই দুই সত্তা জড় ও শক্তি। এই দুই সত্তার পৃথক রূপে অবচ্ছিন্ন ভাবে অস্তিত্ব কল্পনাতীত হইলেও,প্রয়োজনানুরোধে উভয়কে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের মূলসূত্র তিনটি—

(১) জাগতিক সমস্ত পদার্থ ও কার্য্যবিশেষের মূল দুই, জড় ও শক্তি।

(২) জড় ও শক্তি পরস্পর স্বতন্ত্র ও একের পরিবর্ত্তনে অন্যের পরিবর্ত্তন হয় না।

(৩) জড় ও শক্তির সমষ্টি হ্রাসবৃদ্ধি হীন।

জগতে জড় ও শক্তির বিনাশ বা হ্রাস নাই। শক্তির প্রয়োগে জড়কে ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিণত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পার, কঠিনকে তরল, তরলকে বাষ্পীয় আকারে পরিবর্ত্তন করিতে পার, কিন্তু জড়পদার্থের অণুমাত্র একবারে ধ্বংস করিতে তোমার ক্ষমতা নাই। সেইরূপ শক্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপ জড়পদার্থের সংযোগে, কখন তাপ রূপে, কখন তড়িৎরূপে, কখন গতিতে, কখন রাসায়নিক আকর্ষণে, প্রকাশিত হইলেও তাহার সমষ্টি সর্ব্বদা সমান কখনও কমিবার নয়।

শক্তি জড়কে চালাইতেছে। জড়ের প্রতি অংশ অপরাংশকে টানিতেছে। প্রতি পরমাণু প্রতি পরমাণুকে আকর্ষিতেছে। প্রতি অণুর সহিত প্রতি অণুর সংঘর্ষ হইতেছে। কেহ কাছে আসিতেছে, কেহ দূরে যাইতেছে, কেহ নড়িতেছে, কেহ ঘুরিতেছে; এ উহাকে আঘাত করিতেছে, এ উহার আঘাতে দূরে পলাইতেছে। এই শক্তি প্রয়োগে জড়ে জড়ে সংঘর্ষণ, অণুতে অণুতে বিঘট্টন, ইহারই নাম কার্য্য, ইহা হইতেই সমস্ত ক্রিয়ার উৎপত্তি। কতকগুলি অণু দলবাঁধিয়া একবেগে চলিল, আমরা দেখিলাম গতি। কতকগুলি পরস্পর স্বতন্ত্র ভাবে ইতস্তত নড়িতেছে, আমাদের ত্বকের স্নায়ুতে আঘাত করিল; আমরা বলিলাম তাপ। আবার

সেই আণবিক গতি ব্যোমে লাগিয়া ব্যোম কর্তৃক তরঙ্গায়িত ও চালিত হইয়া চাক্ষুষ স্নায়ুতে আঘাত করিল, আমরা বলিলাম আলোক।

বিবর্ত্তবাদী বৈজ্ঞানিক দেখাইয়াছেন স্মৃষ্টির আদিতে সমস্ত জগৎব্যাপিয়া জড় পরমাণু সর্ব্বত্র সমভাবে বাষ্পীয় আকারে বিস্তীর্ণ ছিল। এই বিশ্বব্যাপি পরমাণুরাশির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়া পৃথক্ পৃথক্ নাক্ষাত্রিক জগতের সৃষ্টি, সেই একই নিয়মে প্রত্যেক নাক্ষত্রিক জগৎ হইতে সৌরজগতের উৎপত্তি, সূর্য্য হইতে গ্রহের সৃষ্টি ও গ্রহ হইতে উপগ্রহের সৃষ্টি হয়। সেই একই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সূর্য্যমণ্ডল সৌরজগতের কেন্দ্রবর্ত্তী হইয়া পার্শ্বস্থ গ্রহদিগকে আকৃষ্ট ও জীবিত রাখিয়াছে; সেই নিয়মেই ভূমণ্ডল সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোটি কোটি বর্ষান্তে বাষ্পময়ী মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া তরল হইয়াছে; আবার কতকাল পরে ভূপৃষ্ঠ শীতল হইয়াছে; কেন্দ্রস্থ তরল দ্রব্যের আকুঞ্চনে পৃষ্ঠোপরি পর্ব্বত ও গহ্বরের সৃষ্টি; তাপক্ষয়ে ধরাপৃষ্ঠে জলের সঞ্চার ও সমুদ্র নদীর আবির্ভাব। তৎপরে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনে ভূপৃষ্ঠ জীব-নিবাসের উপযোগী হইলে সেই একই নিয়মবলে জীবের উৎপত্তি। আবার সেই অবয়ব-রহিত প্রাথমিক জীব পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনে ক্রমিক বিকাশের সোপান পরম্পরা অবলম্বন করিয়া উন্নতির পর উন্নতি তার পর উন্নতি এইরূপে এই অদ্ভুতের অদ্ভুত মানবদেহে পরিণত হইয়াছে। মানুষে সমাজ বাঁধিয়াছে, গ্রাম নগর নির্ম্মাণ করিয়াছে, আকাশে উঠিয়াছে, সাগরে পশিয়াছে, রামায়ণ মহাভারত রচনা করিয়াছে, এবং অনন্ত জগতের ক্রিয়া প্রণালী জ্ঞানের আয়ত্ত করিয়া জগদীশ্বরের মহিমা গাইয়াছে। আবার কত বৎসর পরে এইমানুষ হইতে আবার কি জীবের উদ্ভব হইবে। আবার কত যুগান্তরে ভূমণ্ডল উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে সেই চিরন্তন নিয়মবশে হয়ত অবনতির আরম্ভ হইবে। ভূমণ্ডল আবার বিশ্বব্যাপি ব্যোমরাশির সংঘর্ষণে বা জোয়ার ভাঁটার অবিরাম পরিচালিত জলরাশির বিঘট্টনে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণবেগ হইয়া ক্রমশ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইবে এবং কালে যে সবিতার গর্ভ হইতে প্রসূত হইয়াছিল তাহারই দেহে বিলীন হইয়া পুনরপি বাষ্পময় হইয়া যাইবে। এইরূপ দশা বুধ শুক্র বৃহস্পতি প্রভৃতি সকল গ্রহেরই ভাগ্যে ঘটিবে; এবং সর্ব্বগ্রাসী সূর্য্যমণ্ডল বহিঃস্থ অপরাপর বাষ্পীভূত নক্ষত্র পুঞ্জের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় সৃষ্টির আরম্ভে যেমন ছিল তেমনই আবার সবই হইবে। আবার

হয়ত সৃষ্টি, আবার হয়ত লয়, এই অপূর্ব্ব জগতের অপূর্ব্ব রহস্যের ইয়ত্তা করিবে কে?

জগতের কার্য্য প্রণালী বুঝিতে হইলে এই দুইটি পদার্থ চাই, জড় ও শক্তি। ধরিয়া লও জড় পদার্থ আছে, সূক্ষ্ম অবিচ্ছিন্ন অণুরূপে সমস্ত জগৎ সমভাবে ব্যাপিয়া আছে; ধরিয়া লও শক্তি তাহার উপর কাজ করিল; উৎপন্ন হইল গতি বা পরিবর্ত্তন। কালে দেখিবে সূর্য্যচন্দ্র শোভিত, মানুষ কীটা-ধ্যুষিত, অনন্ত বৈচিত্র্য-মণ্ডিত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি; দিবা রাত্রি, শীত গ্রীষ্ম, শাদাকাল, সমস্ত পার্থক্যের বিকাশ; মেঘ বর্ষিবে, বায়ু গর্জ্জিবে, ফুল ফুটিবে, চাঁদ উঠিবে, যুবা হাসিবে, শিশু কাঁদিবে। এই অনন্ত বৈচিত্রের, নিয়ম এক—অখণ্ড ও অদ্বিতীয়।

সৃষ্টির আরম্ভ হইতে—কে জানে কবে সৃষ্টির আরম্ভ—জড়ের উপর শক্তির ক্রীড়া চলিতেছে; অনন্ত কাল ব্যাপিয়া অনন্ত প্রবাহে অনন্ত তরঙ্গে সৃষ্টির স্রোত চলিয়াছে; বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, এই মহাতরঙ্গের মহাকল্লোলে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সহস্রে সহস্রে লক্ষে লক্ষে কোন্ দিক দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। দিগন্তব্যাপী মহাকালের মহাকায় পূর্ণ করিয়া অচল অজর অনাদি অনন্ত সীমাহীন জড়ের মহামূর্ত্তি বিরাজমান; তদুপরি, মহেশ্বরের মহামহিমাময় জড়মূর্ত্তির উপরি, অনন্ত জগতের অনন্ত বৈচিত্র্যের কারণভূতা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত সৃষ্টির প্রসবিনী, জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী জগৎপ্রলয়কারিণী, বিশ্বেশ্বরের মহাশক্তি ক্রীড়মানা! মহাকালের মহাশরীর ব্যাপ্ত করিয়া, বাক্যাতীত, মনোতীত, কল্পনাতীত, ভৈরব রাবে ভৈরব ভাবে ক্রীড়ামানা—মহাশক্তি! ভৈরবী সে শক্তি, ভীষণা সে ক্রীড়া। অনন্তের গর্ভে মহাবেগে উছলিতেছে মহাতরঙ্গ—অতীতের অন্ধকারময় ভীমগর্ভে বজ্রনির্ঘোষে দিগন্ত আপূরিত করিয়া, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া ভাঙ্গিয়া গড়িয়া জড়ের সহিত ক্রীড়মানা—শক্তি; মহেশ্বরের সহিত ক্রীড়মানা মহেশ্বরী। ভীমনৃত্যে উন্মাদিতা মহাকালী। আদি নাই, অন্ত নাই, সৃষ্টির স্রোত চলিয়াছে; অনন্তের গর্ভ দিয়া অনন্ত কল্লোলে ছুটিয়াছে; কে জানে কবে শেষ হইবে? কত কোটি সৌরজগৎ পলকের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়া নিভিয়া যাইতেছে; বিকট স্রোতের বিকট আবর্ত্তে, বিশ্বসৃষ্টির ঘূর্ণচক্রে তখনই ডুবিতেছে, ভীমাবর্ত্তে পড়িয়া কতই বা ছুটা ছুটি করিতেছে—কে জানে ইহার শেষ কি, কে জানে ইহার আরম্ভ কোথায়?

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিত বিরাট পুরুষের বিরাট শরীর জুড়িয়া পরিব্যাপ্ত অনাদি মৃত্যুঞ্জয়, মহাকাল,—

পৃথিবী সলিলং তেজো বায়ুরাকাশমেবচ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সোমযাজী চ————॥

এই অষ্ট মূর্ত্তিতে, সংক্ষেপত জাগতিক বিভিন্ন পদার্থে, মানবেন্দ্রিয় প্রকাশমান, সর্ব্বত্রব্যাপী সর্ব্বতঃ স্থায়ী, জড়রূপী শবরূপী মহাদেবের মহাকায়—সর্ব্বভূতের অধীশ্বর, সর্ব্বভূতের নায়ক, আশুতোষ ব্যোমকেশ মহামূর্ত্তি;—সেই মহাশরীরের হৃদয়োপরি সংস্থিতা, উন্মত্তভাবে ক্রীড়মানা অবিরাম মহাসংগ্রামে উন্মত্তা মহাদেবের অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী মহাশক্তি—ভীমভাবে ভীম সমরে নিরতা

কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।
বিশাল খট্টাঙ্গধরা নরমালা বিভূষণা॥
বালার্ক মণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতা।
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফূরিতাননা।
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চী হসন্মুখী।

দক্ষিণ-কালিকার ভীমামূর্ত্তি, ঈশানের বক্ষোপরি বিকটবেশে সমারূঢ়া; দেবাসুরের ভীমসমরে অসুরনাশার্থ নৃত্যন্তী মহাকালী।

এই সৃষ্টির ক্রিয়া সেই মহাশক্তির মহাসংগ্রামে নৃত্য মাত্র। এই প্রকাণ্ড বিশ্ব—মানব তুমি এই প্রকাণ্ড বিশ্বের কি জান? এই প্রকাণ্ড বিশ্ব সেই প্রকাণ্ড শক্তির নৃত্য মাত্র। বিশ্বমণ্ডলের সর্ব্বত্র—নাক্ষত্রিক জগতে, সৌরজগতে, সূর্য্য পৃথিবীর আকর্ষণে, পৃথিবী চন্দ্রের আকর্ষণে, নদীর পতনে, সাগরের উত্থানে, শরবিক্ষেপে, লোষ্ট্রনিক্ষেপে, ভূগর্ভোত্থ ধাতু পদার্থের উৎক্ষেপণে, বৃক্ষস্থ ফলের অধঃপতনে—সর্ব্বত্র সমভাবে প্রকাশমান—একই নিয়মে জাত, একই নিয়মে চালিত, জাগতিক ক্রিয়াসমষ্টিরই নাম সৃষ্টি, অথবা জগতই সেই অবিচ্ছেদোদ্ভবা ক্রিয়ানিচয়ের পরম্পরা মাত্র।

পুরাণকল্পিত কালিকামূর্ত্তিতে আমরা বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত দেখিলাম, তাহাতে বিস্মিত হইও না। হিন্দু পূর্ব্বপুরুষগণ বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম তত্ত্বে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

জড়পদার্থকে মহাদেবের মহাশরীর বলিলাম তাহাতেও বিস্ময়ের কিছুই নাই। ধর্ম্মযাজকেরা জড়কে হেয় করুন, ক্ষতি নাই, কিন্তু ঈশ্বরে যাঁহার ভক্তি

আছে, ঈশ্বরে যাঁহার ভীতি আছে, তিনি এই নিখিল-ব্যাপি অনন্ত বিশ্বের কারণকে কবিশ্রেষ্ঠ গেটের সহিত জগদীশ্বরের জীবন্ত অঙ্গচ্ছদ বলিয়া ভীতিভরে নমস্কার করিবেন।

অনাদি সেই জড়--দার্শনিক যাহার তত্ত্ব পান না, বৈজ্ঞানিক যাহার পূজা করেন, কবি যাহার গুণ গান করেন,—ব্রহ্মাণ্ডের মূলীভূত, বিশ্বের আদ্য, বিশ্বের বীজ, ঈশ্বর যে মূর্ত্তিতে প্রকাশমান, যাহার জন্ম কেহ দেখে নাই, যাহার মৃত্যু কেহ দেখিবে না, তেত্রিশকোটি দেবতা যাহার অংশমাত্র, সেই সর্ব্বলোক পূজিত

অশেষ জগতাং শেষঃ শেষোহি পরিকীর্ত্তিতঃ
শেষকালে ধৃতঃ কট্যাং কালাভরণভূষিতঃ।

যাহার মহা শরীরে

মহাপ্রলয়সম্ভূতং চিতাভস্ম চ দৃশ্যতে।
পৃথিব্যাদীনি ভূতানি তেষাং বেতালকোগণঃ।
ততোহসৌ প্রোচ্যতে সদ্ভিঃ ভূতবেতালসংবৃতঃ।
পাদৌ যস্য তু পাতালং কটির্ভূ-দ্যৌঃ শিরস্তথা।
দিশো বাসাংসি যস্যাসন্ দিগ্বাসাস্তেন স স্মৃতঃ॥

সেই মহাপুরুষকে

বিভূষণোদ্ভাসি পিনদ্ধভোগি বা
গজাজিনালম্বি দুকূল ধারি বা।
কপালি বা স্যাদথবেন্দু শেখরম্।

কবি ও দার্শনিক যে মূর্ত্তিতেই কল্পনা করুন ও যে ভাবেই দেখুন, আমি সেই মহাপুরুষকে ভীতচিত্তে প্রণাম করি।

শিবের সহধর্ম্মিণী সহচারিণী শক্তি, যার বলে এই মহাচক্র চলিতেছে, জলে স্থলে, সূর্য্যে চন্দ্রে, আকাশে পাতালে, মনুষ্য হৃদয়ে, সমাজ শরীরে, সর্ব্বত্র প্রকাশমানা শক্তি—জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত, পৃথিবীর গতিতে, সূর্য্যের তাপে, মেঘে বিদ্যুতে, চাঁদের আলোকে, ইংরেজের বিপুলবিভবে, ফরাসীর রাজ্যবিপ্লবে, সর্ব্বত্র প্রকাশমান তেজঃপুঞ্জের সমষ্টিরূপা শক্তি—

ততোহতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ।
নিশ্চক্রমে মহাতেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।

নির্গতং সুমহত্তেজঃ তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত।
অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্ত দিগন্তরম্॥
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেব শরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্ত লোকত্রয়ন্থিষা॥ (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

নদীতে পর্ব্বতে, পবনে বরুণে, সূর্য্যে সোমে, সর্ব্বত্র ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশমানা শক্তি—

সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতা সনাতনী।
সর্ব্বস্বরূপা সর্ব্বেশা সর্ব্বশক্তি সমন্বিতা॥
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ॥

প্রাচীন এপিকিউরস, ডিমক্রিটস্ হইতে আধুনিক হক্সলি, টমসন, স্পেন্সার প্রভৃতি পুরুষ-প্রধানেরা যে মহাশক্তির উপাসক; যে শক্তির বিদ্যমানতায় স্বয়ং শিবের বিদ্যমানতা; তান্ত্রিকের সূক্ষ্মদর্শনে যে মহাশক্তি মহাদেবের সঙ্গিনী হইয়াও জননী, সেই জগৎ প্রসূতি মহাদেবীর আরাধনা করিতে পাইলে, আর কি চাও মানব?

এখন দেখিলাম বিশ্বে এই অনন্ত বৈচিত্র্য যাহা কিছু নক্ষত্রে, সূর্য্যে, গ্রহে, উপগ্রহে, পৃথিবীর ইতিহাসে, জীবশরীরের গঠনে, মানব মনের বিকাশে, সমাজ-শরীরের বিবর্ত্তনে, যে খানে যাহা কিছু দেখাযায় সে সমস্তই গতি এবং সেই গতি জড়ের উপর শক্তির ক্রিয়ায় সমুৎপন্ন। সৃষ্টির পূর্ব্বে,—পূর্ব্ব যদি কখন সম্ভব হয়, সৃষ্টির পূর্ব্বে—ঐশী মহাশক্তি হইতে জড়ের উদ্ভব হয় এবং কালক্রমে জড় ও শক্তির সমন্বয়ে এই নিখিল চরাচরের উৎপত্তি হইয়াছে। বিজ্ঞানের বিবর্ত্তবাদ আর কিছুই নয়, পুঁরাকালের কালিকা মূর্ত্তিও আর কিছুই নয়,—উভয়ই এই গভীর তত্ত্বের বিকাশ মাত্র।

এই সৃষ্ট জগতে দেবাসুরে এক মহাসংগ্রাম চলিতেছে, সৃষ্টির আরম্ভ হইতে চলিতেছে; যে দিন এই সংগ্রাম থামিবে সেই দিন আবার জগতে সমস্ত বৈচিত্র্য লোপ হইবে সমস্ত জগৎ আবার একাকার হইয়া যাইবে আবার সর্ব্বত্র একাকার হইবে। সৃষ্টির বৈচিত্র্য যতদিন, দেবাসুরের এই সংগ্রাম ততদিন। এই দেবাসুরের মহাসমর, সুরের সহিত অসুরের, ভালর সহিত মন্দর, কল্যাণের সহিত অকল্যাণের, ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের চিরন্তন

উত্তরাধিকারীর অভাব দেখাইয়া সেতারা, ঝান্সী ও নাগপুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সংযোজিত করিয়া তুলেন। সর্ব্বশেষে অত্যাচার ও অবিচারের ছলে অযোধ্যা অধিকৃত হয়।

ভারতের ব্রিটীশাধিকার এইরূপে সম্প্রসারিত হইয়া উঠে। ব্রিটিশগণ ভারতবর্ষীয়দিগের সাহায্যে যুদ্ধে জয় করিয়াছেন এবং কোথাও চিরন্তন সন্ধিভঙ্গ করিয়া, কোথাও গোপনে যড়যন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজ্যগুলি আপনাদের অধিকারের সহিত সংযোজিত করিয়া তুলিয়াছেন। অনেক অত্যাচারে ও অনেক অবিচারে ভারতে ব্রিটিশ সম্রাজ্য পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। মহারাণী বিক্টোরিয়া যখন এই সম্রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন,"ভারতবর্ষের প্রজাদের শ্রীবৃদ্ধি হইলেই আমি আপনাকে প্রবল ও পরাক্রান্ত মনে করিব, প্রজারা সন্তুষ্ট থাকিলেই আমি আপনাকে নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ ভাবিব এবং প্রজারা সন্তুষ্ট হইয়া যে কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তি দেখাইবে, তাহাই আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করিব।" আমাদের আশা আছে, ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরীর শাসনে এক সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি হইবে, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন করিয়া যে সাম্রাজ্য অধিকার করা হইয়াছে তাহার শাসন কার্য্য ধর্ম্মপরতা ও ন্যায়পরতার মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়া উঠিবে। আমরা সিদ্ধিদাতা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া আশান্বিত হৃদয়ে এই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি।

মহাশক্তি।

তুমি কে? আমি কে? এই অনন্ত বৈচিত্র্য চিত্রিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কি? ইহা কোথা হইতে আসিল? কে জানে ইহা কোথা হইতে আসিল? প্রাচীন আর্য্য ঋষি এ কথার উত্তর দিতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় এ কথার উত্তর দিতে পারে না। দর্শন এখানে দৃষ্টিহীন, বিজ্ঞান এখানে নিরুত্তর। আমি কে যে ইহার উত্তর দিব?

কে এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড গড়িয়াছে, ইহারও কি উত্তর চাও মানব?

কে বলিবে এ ব্রহ্মাণ্ড কার রচিত? কে জানে এই ব্রহ্মাণ্ড কি? এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগৎ সীমাহীন, পরিধিহীন অনন্ত আকাশে অনন্তকাল ভ্রাম্যমাণ,—কে আমাকে বলিবে ইহা কি? প্রাচীন বৈদান্তিক বলিয়াছেন এ মায়া; আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলেন ইহা অজ্ঞেয়। বিজ্ঞান ও দর্শনের একমাত্র উত্তর,—আমি জানি না।

এই যে প্রাতঃসূর্য্য উদিত হইয়া বসুন্ধরার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিতেছে, প্রকৃতি স্বর্ণকান্তি ধারণ করিয়া রূপের স্নিগ্ধ রশ্মিতে ভাবুকের মন ভুলাইতেছে; পাখী জাগিল, ফুল ফুটিল, নব-কুসুমিত তরুশাখে অলি আসিয়া ঝঙ্কার দিল; মনুষ্য, বল দেখি এ সব কি? এ সব সত্য, কি মিথ্যা, এ সব প্রকৃত, কি ভাণ? বিজ্ঞানের তত্ত্বদর্শী চক্ষে দেখিবে এ সব কি তা জান না। দেখিবে, প্রকৃতির এই ভুবন ভুলান হাসি. ফুলের মধুময় বাস কোকিলের এই উন্মাদক স্বর, এ সব মানুষ তোমার কাছেই ভাল তোমার কাছেই এরূপ। প্রকৃত কি তা তুমি জান না। বিজ্ঞানের চক্ষে দেখ, মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের খরজ্যোতিঃ ও পূর্ণচন্দ্রের কনকসুধা বিশ্বব্যাপি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ বিশেষের তরঙ্গায়িত গতি মাত্র। তোমার চক্ষুতে যখন আঘাত লাগে, তুমি দেখ আলো। তোমার চক্ষে যখন আঘাত লাগে না, তখন তুমি দেখ আঁধার। জগৎ হইতে জীবের চক্ষু বিলুপ্ত হউক, তখন আলোক ও আঁধার, নীল ও পীত, সুন্দর ও কুৎসিত কিছুরই পার্থক্য থাকিবে না। তেমনই জলদের গভীর গর্জ্জন ও বীণার মধুর নিক্কণ তোমার কাছেই পৃথক্ মাত্র। জগৎ হইতে জীবের জীবন লুপ্ত হউক, জগতে শব্দের আর পার্থক্য থাকিবে না। তেমনি জগতে ছোট বড়, লঘু গুরু, ভাল মন্দ, সুরূপ কুরূপ, পাপ পুণ্য, সবই তোমার কাছে ও তোমার জন্যে। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বাহির হইতে যদি দেখিতে পার, তাহা হইলে কিছুরই পৃথগস্তিত্ব দেখিবে না। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক বই আর দুই নাই। ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ড; ইহা এক। বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত এই, ইহার চরম উত্তর—যাহা দেখিতেছ তাহা নয়, তাহা কি তুমি জান না। মানুষ অল্পবুদ্ধি, মানুষ কি বলিয়া অনন্ত কি তাহা বলিবে। মানুষের সমস্ত জ্ঞান নিজ অবস্থা সাপেক্ষ, দর্শনে বলে প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা জানি না। একটি পিঁপীড়া যাহাকে ক্ষুদ্র বল, এক খণ্ড কাচ লইয়া দেখ অতি বৃহৎ বোধ হইবে; বায়ুর বদলে অন্য পদার্থের ভিতর দিয়া, দেখ, অন্য আকার লাগিবে, তোমার চক্ষুর যদি পরিবর্ত্তন

হয়, তাহা হইলে এখনই যাহাকে ছোট বল তাহাকে বড় বলিবে, অথবা যাহাকে বড় বল তাহাকে ছোট বলিবে। তোমার কাছে যাহা গরম, আমার কাছে তাহা শীতল; তোমার কাছে যাহা শক্ত আমার কাছে তাহা সহজ; তোমার কাছে যাহা সুন্দর আমার কাছে তাহা কদাকার; কে বলিয়া দিবে তাহার স্বরূপ কি? তুমি বসিয়া আছ, একজন সাধারণ লোক বলিবে তুমি স্থির; একজন বৈজ্ঞানিক বলিবে তুমি পৃথিবীর সহিত ঘণ্টায় এত সহস্র ক্রোশ বেগে ঘুরিতেছ। আবার যদি তখনই সৌর জগতের নিরপেক্ষ গতির বিষয় ভাবিয়া দেখ, কে গণিবে কত কোটি ক্রোশ তুমি দিবামধ্যে ভ্রমণ করিতেছ। কে জানে তুমি স্থির কি অস্থির?

তবে কেন ভাই, এত বাগ্‌বিতণ্ডা? যে জগতের কিছুই জান না, সেই জগতের কর্ত্তাকে লইয়া এত টানাটানি কেন। তুমি কার্য্য জাননা, কারণ অনুসন্ধান কর, ও অনুসন্ধানে কৃতকাম হইয়াছি বলিয়া স্পর্দ্ধারবে জগৎ ফাটাও। এস, ভাই আমরা ভ্রান্ত জীব দূরে চাহিয়া কাজ নাই; অজ্ঞেয়ের অজ্ঞেয়, জ্ঞানের জ্ঞান, প্রাণের প্রাণ, সেই অজ্ঞেয় পুরুষকে

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসম্ ——

সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ—

দূর হইতে প্রণাম করি

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।

সমস্তজগদাধার মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ॥

এস ভাই, সহজ পথে যাই। যাহা অজ্ঞেয় তাহা জানিতে যাওয়াতেই কাজ নাই। যাহা সীমাবদ্ধ মনুষ্যজ্ঞানের গম্য, মনুষ্য জ্ঞান সাপেক্ষ, তাহাই কি,—তাই ভাবি। ভুলো না, যাহা ভাবিবে সমস্তই মনুষ্য জ্ঞান সাপেক্ষ, প্রকৃত নিরবচ্ছিন্ন কি তাহার স্থিরতা নাই।

মানুষের জ্ঞান সীমার অপর পারে ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ড। স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ নাই, আঁধার আলো ভেদ নাই, লঘু গুরু ভেদ নাই, শ্বেত কৃষ্ণ অপৃথক, পাপ পুণ্য অভিন্ন। সেখানে সবই এক, সবই এক ধর্ম্মাক্রান্ত। সেখানে জ্ঞান ও অজ্ঞান এক, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক, স্থিতি ও গতি এক, কার্য্য ও কারণ এক। সেখানে বর্ণ নাই, স্বাদ নাই, সুখ দুঃখে পার্থক্য নাই, হিংসা ভালবাসায় প্রভেদ নাই। সবই আছে, কিছুই নাই। সে তত্ত্ব কার সাধ্য ভেদ করে।

মনুষ্যের জ্ঞানসীমার ভিতরে আইস, দেখিবে সেখানে কি বিচিত্র দৃশ্য। কোটি কোটি সূর্য্য চতুর্দ্দিকে রশ্মিরাশি বিকীরণ করিয়া প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণমান; সূর্য্যের পর সূর্য্য, তার পর সূর্য্য কে গণনা করে কত? অকূল সাগরে অগণ্য জলকণা, সীমাহীন মরুতে অগণ্য বালুকণা, কে গণিবে কত? সূর্য্যের পাশে গ্রহ, গ্রহের পাশে উপগ্রহ, শৃঙ্খলে গ্রথিত, শৃঙ্খলে শৃঙ্খলে বাঁধা। অনন্ত আকাশে প্রকাণ্ড মার্ত্তণ্ডচয়, মানুষের চোখে যেন নীল চন্দ্রাতপে মাণিকের মত ঝিকিমিকি জ্বলে, এর চেয়ে বিচিত্র আর কি চাও? 'জগৎ মুখের পানে চায়, জগৎ পাগল হয়ে যায়''—রূপের অতুল ভাণ্ডারে সৌন্দর্য্যের রাশি, রাশি রাশি, মধুমাখা সুধামাখা, যে যত পার প্রাণ ভরিয়া ভোগ কর; এ ভাণ্ডার শূন্য হইবার নয়। নগণ্য ধূলিকণা সমান পৃথিবী সেখানেও রূপের ছড়াছড়ি, রূপ নিয়ে কাড়াকাড়ি, আনন্দের বাজার, প্রমোদের হাট, সুখের মধুর হিল্লোল, প্রেমের গভীর কল্লোল, এমন কি আর আছে। সাগরাম্বরা অদ্রি-শেখরা বসুন্ধরা, কোথাও নদী, কোথাও ভূধর, কোথাও সাগর কোথাও প্রান্তর, কোথাও বন, কোথাও কানন। শিশুর আধ হাসি যুবতীর রূপরাশি,যৌবনের উদ্বেলতা, বার্দ্ধক্যের গভীরতা, যুবার হৃদয়, রমণীর প্রণয়, কি চাও, এর চেয়ে বিচিত্র আর কি চাও?

আবার দেখ এই জগৎ কি ভয়ঙ্কর। জগতের প্রতি লোমকূপ হইতে অগ্নিশিখা প্রবলবেগে বাহিরিতেছে। অগ্নিজিহ্ব মার্ত্তণ্ড পলকে পলকে কত কত ক্ষুদ্রতর জগৎ গ্রাস করিয়া স্বশরীর পুষ্ট করিতেছে; ঝলকে ঝলকে অগ্নি নিকশিতেছে। কত জগৎ ভাসিতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে কত প্রকাণ্ড জগৎ ধূলিসাৎ হইতেছে। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর কোথাও বাত্যার প্রলয় গর্জ্জনে মহীধ্র শিখর কাঁপিতেছে, কোথাও অগ্নি লক্‌ লক্‌ জিহ্বা বিস্তার করিয়া বিশ্বগ্রাসের প্রয়াস পাইতেছে। কুসুমে কীট, অমৃতে বিষ, জীবনে পাপ, মরণে তাপ, রোগীর যাতনা, সাধুর লাঞ্ছনা, স্থবিরের অপমান, দুর্ব্বলের রক্তপান। কে বলে পৃথিবী সুখময়ী?

এই অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যের কারণ কি? এ বৈচিত্র্য নূতন কি পুরাতন? ইহার উদ্ভব কোথা হইতে? ইহার কি আদি আছে, ইহার কি অন্ত আছে? মনুষ্যের জ্ঞান কি নিজ বিষয়ীভূত? এই পার্থক্যের আদি অন্ত কল্পনা করিতে সমর্থ? বিজ্ঞান বলিবে হাঁ। মনুষ্যের জ্ঞান সামান্য ও সীমাবদ্ধ হইয়াও ভাগ্যবলে ও বিধাতার অদ্ভুত কৌশলবলে আপাতত অসামান্য ও অসীম।

এই মহাসমর—অসুরমজ্‌দের সহিত আর্হিমানের, শেমাইতের অমার্জ্জিত কল্পনায় শয়তানের সহিত স্বয়ং ঈশ্বরের—মহাসমর। এই মহাসমরের বৈজ্ঞানিক নাম জীবন যুদ্ধ; এই যুদ্ধের পরিণাম—সুরের জয় অসুরের পরাজয়, ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের ক্ষয়, ঈশ্বরের জয় শয়তানের পরাজয়।

এই দেবাসুর-সংগ্রামে দেবেরই জয়, মহাশক্তির নির্ম্মম খড়্গে অসুরের নিপাত। যাহা ভাল, যাহা সুন্দর, তাহাই নির্ব্বাচিত হইয়া জগতের কল্যাণসাধন ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করে। সেই শক্তিচালিত নির্ব্বাচনে জগতের এই অবিশ্রান্ত বিবর্ত্তন, সৃষ্টির এই ক্রমিক বিকাশ, জীবদেহের উদ্ভব ও মানব হৃদয়ের উন্নতি।

এই মহাসমরে-দুষ্টের দমনে, শিষ্টের পালনে, অসুরের ক্ষয়ে, সুরের জয়ে সহায়ীভূতা কে?—না, চিন্তার অগম্যা, কল্পনার অতীতা, বৈজ্ঞানিকের আরাধ্যা, সাধকের উপাস্যা, জগন্নিবাস জগন্নাথের মহাশক্তি। আইস ভাই, আমরা সামান্য মানব সেই মহাশক্তির সমক্ষে ভক্তি-প্রীতি-ভীতি-পূর্ণ হৃদয়ে প্রণত হই।

দেবি বিপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাত র্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তুতে॥

ভারতের রাজলক্ষ্মী।

১

"দীর্ঘকাল পরে কেন এ নিদ্রা ভাঙ্গিল,
কেন এত নরনারী,
দাঁড়াইয়া সারি সারি
কেতন বিবিধ বর্ণে গগন ছাইল
উল্লাস বাজনা কেন সঘনে বাজিল?

২

"কেন আজি চারি ধারে আনন্দ ঘোষণা?
নাচিতেছে গাহিতেছে,
প্রেম সুধা ঢালিতেছে!
কোন্ যোগী পূরাইল অভীষ্ট কামনা
আজি এ ধরায় কেন স্বর্গীয় বাজনা?

৩

"কে বলিবে কি ঘটেছে কপালে আমার
প্রিয় পুত্র মোর যত,
সকলি হয়েছে গত,
অবশেষে হ'ল বুঝি বাসনা কাহার
বধিতে আমারে, তাই এ সুখ অপার!

৪

"তাই বুঝি নাচিতেছে গাইছে সকলে?
তাই কলিকাতা অঙ্গে,
সাজাইল নানা রঙ্গে?
মুগ্ধমন্ত্রে মোহিবারে চায় সবে ছলে,
কি আছে কপালে মোর না জানি কি ফলে!

৫

"যদবধি আর্য্যগৃহ ঘুচেছে আমার;
ঘুচিয়াছে সব সুখ,
নিত্য নিত্য পাই দুখ,
অবসাদে মন প্রাণ হইল কেমন
সে অবধি একরূপ ছিনু অদর্শন।

৬

"কর্ম্মদোষে এল কালে দুর্জ্জয় পাঠান।
রাখিতে সতীত্বধন,
আর্য্যকুল বালাগণ
অনলে আহুতি দিল সাধের জীবন;
দেখে শুনে মুদিলাম আমার নয়ন!

৭

"সাধ হ'ল পড়ি আমি জ্বলন্ত অনলে
রাখি স্বাধীনতা ধন,
ব্যাকুল হইল মন,
আর্য্যবালা চিতা যবে জ্বলিল ভূতলে
ধূয়ে সব মুছে গেল মম আঁখিজলে।

৮

"তদবধি শূন্য মনে প্রাণ হীন প্রাণে
গভীর পাতালে বসি,
নাহি তথা রবি শশী;
নিয়ত নিয়তি পদে মুদিত নয়নে
এ মোর দুখের কথা শুনাই গোপনে।

৯

"নিয়তি শুনিলে পাছে বাঞ্ছা পূর্ণ হয়—
ঘোর রবে সিন্ধু তায়,
নিত্যবাদ সাধে হায়!
দুখের ভারতী মোর লয় হয়ে যায়,
বিরলে ফুটিয়ে সাধ বিরলে ফুরায়!

১০

"না নিদ্রিত না জাগ্রত ছিলাম তথায়!
ছিলাম কি বেঁচে প্রাণে,
তাহাও কি কেহ জানে?
মৃতদেহে কিম্বা প্রাণ এল পুনরায়!
আমাতে ছিল না আমি কব তা কাহায়!

১১

"সদা মনে অভিলাষ আর্য্যের কুশল,
দিবা নিশি মম প্রাণ,
গায় আর্য্য কুল গান।
আর্য্য রাজ্য পাবে বলে সহি এ সকল
তা না হলে ভেঙে যেত এ হৃদি বিকল।

১২

"পাঠান মোগল পরে হায় রে আবার—
সুদূর বৃটনবাসী,
শাসিল ভারত আসি।
বিক্রমে শার্দ্দূল-মেষ হ'ল একাচার।
শান্তিময় হল সব, গেল অত্যাচার।

১৩

"তখন নিদ্রার কোলে লভিনু বিরাম;
ভাবিলাম কভু আর,
ঘটিবে না কু আচার।
নির্ভয়ে কুমার কন্যা নিদ্রা যাবে ঘরে;
এ রাজার এই ভাব রবে চির তরে।

১৪

"মম ভাগ্য দোষে হায় সে সুখ ফুরাল
আর সে বিরাম নাই,
শান্তিহীন সর্ব্ব ঠাঁই!
জেতা বিজেতার ভাব বিপদ ঘটাল;
অন্তরের আশা মোর অন্তরে লুকাল!

১৫

"দেখিলাম অত্যাচার কত অবিচার!
কহিতে মনের কথা,
মুখে বুকে যেন ব্যথা!
কে যেন চাপিয়া ধরে রসনা আমার;
মনোব্যথা আজো তাই হয় না প্রচার।

১৬

"কিছুদিন পরে এক বৃটন কুমার
ভারত শাসিতে এল,
প্রাণ জুড়াইয়ে গেল!
মুখের বাঁধন মম করিল মোচন,
আশ্বাসে নিশ্বাস আমি ছাড়িনু তখন।

১৭

"অকস্মাৎ একি শুনি, কেন এ বাজনা?
কেন বা সবার মুখে,
আনন্দ ভাসিছে সুখে?
সমগ্র ভারতে কেন উল্লাস-ঘোষণা—
গেল কিরে ভারতের দারুণ বেদনা"?

১৮

ভারতের রাজলক্ষ্মী, উঠ একবার!
পূর্ব্ব স্মৃতি ভুলে যাও,
নয়ন মেলিয়া চাও
সম্মুখে তোমার, দেখ—রীপণ কুমার!
কি হবে মথিলে আর শোক পারাবার?

১৯

ধর মা, হৃদয়ে ধর প্রাণের নন্দনে,
দুই দিন পরে আর,
থাকিবে না এ কুমার ?
সুনীল সাগর পারে যাইবে বৃটনে!
কেঁদো না জননি আর মলিন বদনে!

২০

চাও মা, প্রফুল্ল নেত্রে বারেক রীপণে
বারেক হৃদয়ে ধর,
রীপণের তাপ হর!
তোমা বিনা হৃদি জ্বালা কে বারে ভুবনে?
তব অঙ্ক শঙ্কাশূন্য মানব সদনে।

২১

এই পুত্র হে জননি, ভারতের তরে
দুঃসহ যাতনা কত,
সহিয়াছে অবিরত!
স্বজাতির টিট্‌কার সহে অকাতরে!
ধর মা, হৃদয়ে ধর সস্নেহ অন্তরে!

২২

"এই কি রীপণ সেই বৃটন কুমার!
আয় বাছা কোলে আয়,
জুড়াই তাপিত কায়!
জ্বলে পুড়ে মন প্রাণ হয়েছে অঙ্গার;
আয় রে শীতল কর হৃদয় আমার!

২৩

"বৃটন জননী তোর প্রিয় সে যেমন
বসে আছে তোর তরে,
যাবি কবে ফিরে ঘরে;
আমিও ত তোর প্রিয়, প্রাণের নন্দন!
আয় বাছা শুভমতি নয়ন রঞ্জন!

২৪

"চিরদিন তার বুকে ঘুমারি আদরে!
আমার তাপিত বুকে,
আর না ধরিবে সুখে,
একবার আয় বাছা আয় দয়া করে!
জনমের মত আজি বিদায় লব রে!

২৫

"তুমি বৎস সুকৃতির আদর্শের স্থল!
বৃটন-গৌরব তুমি,
গাবে ইহা বিশ্বভূমি!
দশ কোটি ভাই তোর হয়েছে বিকল
তোমারে দেখিতে ধায় হইয়ে পাগল!

২৬

"প্রীতি প্রসন্নতা যেন বদনে তোমার
একভাবে দুই লেখা,
ললাটে জ্ঞানের রেখা,
অন্তরের ভাব যেন বদনে প্রচার;
বৃটন্-সুযশ তুমি করেছ উদ্ধার!

২৭

"ফিরে যাবে যবে বৎস স্বদেশে তোমার,
বৃটনিয়া কাণে কাণে,
গাহিও বিষাদ গানে,—
ভবিষ্যে ভারতে যেন হয় সু-বিচার—
এই কথা হে কুমার, বলো একবার!

২৮

"বিদায়ের কালে বৎস, কি দিব তোমায়
নাহি কোহিনুর ধন,
শিখিপুচ্ছ সিংহাসন;
তব যোগ্য উপহার তাই এ ধরায়,
জান বৎস এ ভারতে নাই তা কোথায়!

২৯

"নিবেদন বিধাতায় দাসীর কেবল,
চিরদিন যেন তোরে,
রাখেন শান্তির ডোরে;
যাও বৎস নররাজ্যে নাহি আর ফল;
ধর্ম্মরাজ্য বিচরণে ধর মনে বল!"

৩০

যাবে রে এখনি চলে সাধের রীপণ
আয় আয় বঙ্গবাসী,
বিষাদসাগরে ভাসি,
সাঁতারিয়া যাই চল ত্বরায় বৃটন
লক্ষ্য করি ধ্রুব তারা অই যে রীপণ!

৩১

এত সুখ প্রেম খেলা সব কি স্বপন!
দেখিতে দেখিতে হায়,
সুখ কোথা চলে যায়!
হিমাচল সম দুখ নড়ে না কখন!
সকলি অলীক কিরে এতই যতন?

৩২

আয় প্রাণ ভরে গাই খুলিয়া হৃদয়!
এই সুখ অভিলাষি,
ধর তান বঙ্গবাসী—
মুক্তকণ্ঠে উচ্চস্বরে গাও উভরায়
"জয় জয় মহোদয় রিপণের জয়!"

লর্ড রীপণ।

আজও পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, লর্ড রীপণ ভারতের শাসনভার লইয়া আগমন করেন। তখন এ দেশীয়েরা তাঁহাকে চিনিত না। তিনি তৎপূর্ব্বে একবার দুই কি তিন মাসের নিমিত্ত ভারতের ষ্টেট সেক্রেটরির কার্য্য করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু সে কার্য্যে ভারতবাসী তাঁহার কোন পরিচয় পায় নাই—তিনি ভাল লোক, কি মন্দ লোক, জানিতে পারে নাই। আজ পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি ভারতের শাসনভার পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু আজ আর তিনি এ-দেশীয়ের কাছে অপরিচিত নহেন। তাঁহার স্বদেশযাত্রায় এ-দেশীয় সকলেই কাতরহৃদয়ে ক্রন্দন করিতেছে। ভারতবাসী আর কোন ইংরাজের জন্য এত কান্না কাঁদে নাই— আর কোন ইংরাজকে এত হৃদয় ভরিয়া ভালবাসে নাই, এমন পূর্ণ মাত্রায় পূজা করে নাই। লর্ড রীপণ আজ ভারতবাসীর দেবতা। কেমন করিয়া এত অল্প দিনের মধ্যে একটি অপরিচিত বিদেশীয় ব্যক্তি অসংখ্য বিদেশীয়ের

হৃদয়-দেবতা হইয়া উঠিলেন,—একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। রহস্য বড় গুরুতর। রহস্য ভেদ করিতে পারিলে সকলেরই উপকার আছে। রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিব।

লর্ড রীপণ ভারতের শাসনকর্ত্তা হইয়া এ দেশে আসেন। সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন বা যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার ফলাফল বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহার দোষ-গুণ-বিচার সম্পন্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু আমার এইরূপ সংস্কার, যে তিনি যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহার ফলাফল-বিচার কিছু কাল-সাপেক্ষ। তাঁহার কৃতকার্য্য বা অনুষ্ঠানগুলি দেশের পক্ষে শুভ হইবে কি অশুভ হইবে, তাহা এখন বলা যাইতে পারে না। আত্মশাসন বা শিক্ষা-বিস্তার যে প্রকারের অনুষ্ঠান, তাহার পরিণতি নিতান্তই কাল-সাপেক্ষ। শুধু তাও নয়। তদপেক্ষা একটু গুরুতর কথা আছে। ঐরূপ অনুষ্ঠানগুলির সিদ্ধি শুধু গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা বা শক্তি সাপেক্ষ নয়, অধিক পরিমাণে আমাদের নিজের শক্তি ও প্রবৃত্তি সাপেক্ষ। আত্মশাসন সম্বন্ধে লর্ড রীপণ স্বয়ং এ কথা গোড়া হইতে বলিয়া আসিয়াছেন। শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধেও আমরা সহজে বুঝিতে পারি যে আমাদের নিজের শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রভূত পরিমাণে প্রয়োজন হইবে। অতএব লর্ড রীপণের অনুষ্ঠানের ফলাফল শুধু কাল-সাপেক্ষ নয়, আমাদের নিজেরও শক্তি-সাপেক্ষ। অতএব সে সকল অনুষ্ঠান সম্বন্ধে এখন ভাল মন্দ কোন কথা বলা যাইতে পারে না। এবং ভবিষ্যতে সে সকল অনুষ্ঠান যদি সুসিদ্ধ বা সুফলপ্রদ না হয়, তাহা হইলে তখন দেখিতে হইবে যে আমাদের নিজের দোষে ফল ভাল হইল না কি না। শুধু লর্ড রীপণকে দোষ দিলে চলিবে না।

অতএব লর্ড রিপণের অনুষ্ঠিত প্রধান প্রধান কার্য্য গুলির ফলাফল বিচার করিয়া তাঁহার দোষ-গুণ বিচার আপাতত অসম্ভব এবং অসঙ্গত বলিয়া আমার বোধ হয়। কিন্তু সেই জন্যই তাঁহার অনুকূলে একটি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। তাঁহার প্রধান অনুষ্ঠান গুলির সিদ্ধি বা সফলতা আমাদের নিজের শক্তি এবং প্রবৃত্তি সাপেক্ষ, এ কথার অর্থ এই যে তাঁহার শাসন-প্রণালী প্রজাশক্তিমূলক—শুধু রাজশক্তিমূলক নয়। এবং তাঁহার শাসন-প্রণালী প্রজাশক্তিমূলক, একথার অর্থ এই যে তিনি শক্তিহীন প্রজাকে শক্তিশালী করিতে চাহেন, প্রজাকে শুধু শাসনের পাত্র না করিয়া শাসন-

কর্ত্তা করিতে চাহেন, শুধু বিজয়ী রাজাকে রাজা না রাখিয়া বিজিত প্রজাকেও রাজা করিতে চাহেন। তিনি ঘৃণিত প্রজাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া রাজার পার্শ্বে বসাইয়া রাজা এবং প্রজা উভয়কে লইয়া একটি সরীকি-কারখানা বা জইণ্ট ষ্টক্ কোম্পানি করিতে চাহেন। তাঁহার শাসন-প্রণালী বড় উচ্চ দরের। প্রজার শক্তিই প্রকৃত রাজশক্তি। লর্ড রীপণ সেই প্রজা-শক্তির উপর তাঁহার শাসন প্রণালী স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার মহত্ত্বের এবং রাজশক্তির অত্যুৎকৃষ্ট প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। এখন প্রজা-শক্তির অভাবে যদি তাঁহার প্রণালী সুফলপ্রদ না হয়, দোষ তাঁহার হইবে না, প্রজারই হইবে।

কিন্তু লর্ড রীপণের অনুষ্ঠানের ফলাফল কালসাপেক্ষ হইলেও তাহার মধ্যে দুই একটি সম্বন্ধে আপাতত কিছু বলা যাইতে পারে। প্রেস্ আইন উঠাইবার বিষয় বা রমেশ বাবুকে প্রধান বিচারপতি করার বিষয় আমি এস্থলে কিছু বলিব না। ওরূপ কার্য্যের ফলাফল কিছু সংকীর্ণ—সমাজব্যাপী নয় এবং প্রায়ই উচ্চশ্রেণীসম্বদ্ধ হইয়া থাকে। আমি তাঁহার লবণশুল্ক কমাই-বার বিষয়, খাসমহল-বন্দোবস্তের বিষয় এবং আত্মশাসন-প্রণালীর বিষয় কিছু বলিব।

যাঁহারা ধনী, দ্বিতল ত্রিতল গৃহে বাস করেন, যাঁহাদের জমিদারির আয় প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা, জগতে দীন দুঃখী আছে বলিয়া যাঁহাদের জ্ঞান নাই বলিলেও হয় এবং যাঁহারা জমিদার না হইয়াও আপনাদিগকে জমিদার-শ্রেণীভুক্ত জ্ঞান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হন না, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, যে লবণের শুল্ক কমাইয়া এদেশে লবণ সস্তা করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, এবং লর্ড রীপণ্ লবণের শুল্ক কমাইয়া লবণ সস্তা করিয়া দিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে (sentimental, visionary) ভাব প্রবণ প্রভৃতি উপাধিতে উপহাস করিয়া থাকেন। তাঁহা-দের নিজের ঘরে প্রতিদিন ষোড়শোপচারে ভোজনের আয়োজন হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের অদৃষ্টগুণেই হউক আর অদৃষ্টদোষেই হউক তাঁহাদের জঠরানলও বড় প্রবল নয়। অতএব বিনা আয়াসেই তাঁহাদের ক্ষুধার শান্তি হয়। তাই তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন, যে পৃথিবীতে সকলেই তাঁহাদের ন্যায় বিনা আয়াসে ক্ষুধার শান্তি করিয়া থাকে। কিন্তু তা নয়। বঙ্গের কোটি কোটি লোক যথার্থই লবণের কাঙ্গাল। একটি গল্প বলি।

কয় মাস হইল একদিন সন্ধ্যার সময় আমি কলিকাতার একটি গলি রাস্তা ধীরে ধীরে বেড়াইতেছিলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে এক মুদির দোকানে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখন নিম্ন শ্রেণীস্থ এক দরিদ্র ব্যক্তি আসিয়া মুদিকে একটি পয়সা দিয়া দুই একটি কথার উপর একটু জোর দিয়া বলিল—'ভাল করিয়া এক পয়সার নুণ দেও দেখি, নুণ সস্তা হইয়াছে।' গরীব যে রকম করিয়া এই কয়টি কথা বলিল, তাহাতে বোধ হইল যেন সে উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে কিছু জোরে ঘা দিয়া জানাইয়া দিল, যে, সে যথার্থই নুণের কাঙ্গাল, নুণ সস্তা হওয়ায় আহ্লাদে আটখানা হইয়াছে; জমিদার বাবুরা ত্রিশ হাজার টাকায় তিনলক্ষ টাকার একখানা জমিদারি পাইলে যেমন আহ্লাদে আটখানা হন, তেমনি আহ্লাদে আটখানা হইয়াছে। তখন ভাবিলাম যে এদেশে এই গরীবের ন্যায়, এবং ইহার অপেক্ষাও, কত লক্ষ লক্ষ গরীব আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের জঠরানল বড়ই প্রবল, এক এক রাশি ভাত না খাইলে সে অনল নিবে না, কিন্তু তত ভাত খাইবার ব্যঞ্জন তাহারা পায় না, তাই তাহারা যথার্থই নুণের কাঙ্গাল, আর তাই বুঝি নুণ সস্তা দেখিয়া এই গরীবের মতন লক্ষ লক্ষ গরীব আজ আহ্লাদে আট খানা হইয়াছে।* তাহারা হয় ত জানে না কোন্ দীন-বন্ধু তাহাদের নুণ সস্তা করিয়া দিয়াছেন। আমরা জানি। জানিয়া আমাদের দীনদুঃখীর নুণ যিনি সস্তা করিয়াছেন সেই দীনবন্ধু রীপণকে কি আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নমস্কার করিব না? যিনি ধনী বা জমীদার, যিনি ত্রিতল বিলাস-ভবনের একটা বাতায়ন খুলিয়াও কখন কাঙ্গালের ভগ্ন কুটীরের দিকে একবার চাহিয়া দেখেন না, তিনি এ কৃতজ্ঞতার অর্থ বুঝিবেন

* The total quantity of salt sold within the law limits in the saliferous districts of Midnapore, Howrah, the 24-Pergunnahs, Khulna, Backergunge, Chittagong, Noakholly, Cuttack, and Balasore rose from 9,67,083 to 9,99,653 maunds, showing a net increase of 32,570 maunds, or 3·3 per cent. Consumption increased in all districts except Backergunge. In Midnapore and Khulna the advance was slight. In Howrah however it amounted to 4·3 per cent. on the previous year's consumption, in the 24-Pergunnahs to 3·1 per cent., in Chittagong to 6·9 per cent., in Noakholly to 4·6 per cent., in Cuttack to 4·6 per cent., and in Balasore to 5 per cent. The reduction of the salt duty is alleged everywhere to have contributed in part to the increase, while as special causes tending to stimulate consumption an influx of labourers for employment on local works

না। আমরা দীনদুঃখী না হই, দরিদ্র বটে। আমরা দীনবন্ধু রীপণের কাছে যথার্থই কৃতজ্ঞ। তাঁহার ন্যায় দীনবন্ধু ইংরাজ রাজপুরুষ ভারতে কখনও আসেন নাই।

তাঁহার খাস মহল বন্দোবস্তের নিয়মেও তাঁহাকে সেই দীনবন্ধু মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। ত্রিশ বৎসর অন্তর খাস মহলের বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। প্রতি বন্দোবস্তের সময় মহলের সমস্ত প্রজার সমস্ত জমি জরিপ করা হয় এবং ইচ্ছামত সমস্ত জমির খাজনা বৃদ্ধি করা হয়। এই জরিপ এবং খাজনা বৃদ্ধি উভয় কার্য্যই প্রজার পক্ষে অতিশয় অশুভের কারণ। খাস মহলের প্রজা এই দুই কার্য্যের দ্বারা যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত হইয়া থাকে। দীনবন্ধু রীপণ অসংখ্য দীন দুঃখীকে সেই পীড়ন হইতে উদ্ধারার্থ বিশেষ অনুষ্ঠান করিয়া গেলেন। তিনি এই নিয়ম করিয়া গেলেন, যে দুই একটি নির্দ্দিষ্ট কারণ ব্যতীত বন্দোবস্তের সময় গবর্ণমেণ্ট প্রজার জমি জরিপ বা খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। এই নিয়মে যদি গবর্ণমেণ্ট কার্য্য করেন; তবে খাস মহলের লক্ষ লক্ষ দীন দুঃখী প্রজা যথার্থই অনেক দুঃখ কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করিবে। এজন্যও বলি যে রিপণের ন্যায় দীনবন্ধু রাজপুরুষ ভারতে আর কখনও আসেন নাই। এমন দীনবন্ধুকে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি দিব না?

আত্মশাসন প্রণালীতে রীপণকে কেবল দীনবন্ধু মূর্ত্তিতে দেখি না—ভারত সমাজের জীবন-সঞ্চারক মূর্ত্তিতেও দেখি। আত্মশাসন প্রণালীর ফলাফল কাল সাপেক্ষ—সে প্রণালী সিদ্ধি লাভ করিবে কি না, সুফল প্রসব করিবে, কি কুফল প্রসব করিবে, এখন বলা যাইতে পারে না। একথা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। কিন্তু ঐ প্রণালী অনুসারে আপাতত যে নির্ব্বাচন কার্য্য হইয়া গিয়াছে তদ্দৃষ্টে মনে

has been mentioned in the 24-Pergunnahs, Khulna, and Balasore, increased vigilance on the part of the police in Howrah, Chittagong, and Cuttack, the prosperous condition of the agricultural classes in Chittagong, and increase of population in Noakholly. The decrease in consumption in Backerguge is ascribed to large stocks having been in the hands of the dealers at the beginning of the year, to the prices having been kept high by the dealers for a considerable period, and to the diversion of the trade of some of the marts within salt limits to places outside them. There is no good reason to suspect the prevalence of illicit manufacture to any appreciable extent in the district. *Bengal Administrations Report*, 1882—83, *pp.* 446—7.

বড় আশা এবং উৎসাহ জন্মিয়াছে। গত ২৫শে এবং ২৯শে নবেম্বর বঙ্গ বিহার এবং উড়িষ্যায় কমিশনর নির্ব্বাচন লইয়া যে তোলপাড় ব্যাপার হইয়া গিয়াছে তাহার অর্থ বড় গুরুতর। তাহাতে তীব্র রিষারিষি, দ্বেষাদ্বেষি, বিবাদ বিসম্বাদ, মারামারি, হুড়া হুড়ি প্রভৃত পরিমাণে দেখা গিয়াছে। তাহাতে ধনী এবং উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তি হইতে মুটে মজুর দোকানি পশারিকে পর্য্যন্ত মহা শশব্যস্ত, মহা উৎসাহে উৎসাহিত, মহা রিষারিষিভাবে উত্তেজিত হইতে দেখা গিয়াছে। নির্জ্জীব নিশ্চেষ্ট নিস্পন্দ নিস্তব্ধ নির্ব্বিকার দেশীয় সমাজে এই দৃশ্য যথার্থ ই নূতন, যথার্থ ই আশাপ্রদ, যথার্থ ই জীবন-লক্ষণ-যুক্ত। এই দৃশ্য দেখিয়া বোধ হইয়াছে যেন মহীপাল দীঘির যে ঘনদামাবৃত নিদ্রিত জলরাশির উপর দিয়া অসংখ্য গো মহিষ-আদি চলিয়া গেলেও মুহূর্ত্তকালের জন্যও জলরাশির চৈতন্য হয় না, সেই জলরাশিতে আজ তরঙ্গ উঠিয়াছে। রিষারিষি, দ্বেষাদ্বেষি, দলাদলি, মারামারি দেখিয়া ভয় পাইও না অথবা আত্ম-শাসন প্রণালীর দোষ দিও না। রিষারিষি, দ্বেষাদ্বেষি, দলাদলি, মারামারি মন্দ জিনিস নয়, ভাল জিনিস। যেখানে সমাজ জীবিত সেই খানেই সমাজে রিষারিষি, দলাদলি, মারামারি। যেখানে সমাজ মৃত বা নির্জ্জীব, সেখানে ওসব কিছুই নাই। যখন হিন্দু সমাজ জীবিত ছিল তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে কত বিবাদই হইয়া গিয়াছে। এখন হিন্দু সমাজ নির্জ্জীব; এখন কোন বিবাদই নাই। অতএব দলাদলি মারামারি হুড়াহুড়ি ঠোকাঠুকি ভাল জিনিস, কেন না সজীবতার ফল। নির্জ্জীব নিস্পন্দ নির্ব্বিকার দেশীয় সমাজে এত দিনের পর তরঙ্গ দেখিলাম—জীবনসঞ্চার দেখিলাম—দলাদলি মারামারি হুড়াহুড়ি ঠোকাঠুকি দেখিলাম। লর্ড রিপণের আত্মশাসন প্রণালীর গুণে এই তরঙ্গ যদি বাড়িয়া উঠে, এই জীবনসঞ্চার যদি গাঢ় হইয়া যায়, এই দলাদলি মারামারি হুড়াহুড়ি ঠোকাঠুকি যদি তীব্রতর হইয়া উঠে, তবে নিশ্চয়ই এ দেশের সমাজ—কর্ম্ম এবং উন্নতির পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইবে। রীপণ মরা গাঙ্গে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। স্রোত বিনা ডিঙ্গি চলে না। এখন আমাদের সমাজ-ডিঙ্গি চলিবে বলিয়া আশা হইতেছে। রীপণ যথার্থই ভারত সমাজের জীবন-সঞ্চারক মহাপুরুষ। রীপণের ন্যায় ভারতবন্ধু ইউরোপ হইতে আর কখনও এদেশে আসেন নাই। রীপণকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে পূজা করিব না ত করিব কাহাকে?

মনে কর যাহা বলিলাম সবই ভুল—মনে কর রীপণ আমাদের কোন

উপকারই করেন নাই। তথাপি একটি কথা আছে। যে উপকার করে তাহাকেই কি পূজা করিতে হয়, তাহারই কি প্রশংসা করিতে হয়? রামচন্দ্রের কোন্ রাজকার্য্যের দ্বারা তোমার আমার কি উপকার হইয়াছে? কিন্তু আমরা ত রাম-চরিত্র পূজা করি। উপকারের পরিমাণে পূজা বা প্রশংসা—এ জঘন্য নীতি ভারতে ত কখন ছিল না। আর প্রকৃত কথাও এই যে, যে যথার্থ মানুষ সে ত উপকার বা কৃতকার্য্য দেখিয়া পূজা বা প্রশংসা করে না। প্রকৃত মানুষ যেখানে প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখে সেইখানেই পূজা করে, প্রশংসা করে, উপকারের হিসাব রাখে না। লর্ড রীপণে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখিয়াছি। লর্ড রীপণ বিদেশীয়—ইংরাজ—বিজয়ী-জাতির একজন। বিজিতজাতির প্রতি বিজয়ীজাতির কিরূপ ভাব এবং আচরণ হইয়া থাকে, ইতিহাসে তাহা অনেকদিন হইতে দেখিতেছি। বিজিতজাতির উপর বিজয়ী-জাতিকে অত্যাচার করিতে দেখিলে, অথবা বিজয়ী-জাতিকে বিজিতদিগকে পশুবৎ ঘৃণা করিতে দেখিলে আমরা বিজয়ী-জাতিকে নিন্দা করি বটে। কিন্তু আমরা যদি কোন ক্রমে বিজয়ী-জাতি হইতে পারি তবে বিজিতজাতিকে যে বিজয়ীজাতির রীতি অনুসারে ব্যবহার করি না, এমন কথা বলিতে পারি না। অনেক ইংরাজ রাজপুরুষকে ত আমরা বিজয়ী-বিজিতের মধ্যে প্রভেদ রক্ষা করার বিরুদ্ধে কহিতে বলিতে শুনিয়াছি। কিন্তু কাজের বেলা কেহই ত সে প্রভেদ নষ্ট করিতে প্রয়াস পান নাই। লর্ড রীপণ সেই প্রভেদ নষ্ট করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। আত্মশাসন প্রণালী প্রবর্ত্তনে, বাবু রমেশচন্দ্র মিত্রকে প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগে, রুড়কি রিজোলিউসনে এবং ইলবার্ট বিলে তাঁহার সেই প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। এখন সব কথা ছাড়িয়া কেবল ইলবর্টবিল সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। কিন্তু ইলবর্টবিলে লর্ড রীপণের যে অলৌকিক মহত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের দিক্ হইতে বুঝিলে চলিবে না, বিজয়ী ইংরাজের দিক্ হইতে বুঝিতে হইবে। ইংরাজের দিক্ হইতে এইরূপ বুঝা যায়। আজ একশত পাঁচিশ বৎসরের অধিক হইল ভারতে ইংরাজ-রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। ইংরাজের রাজ্য স্থাপনের তারিখ হইতেই ইংরাজ—ভারতের ইংরাজ এবং ভারতবাসী দুইজনকে তুল্য জ্ঞান করিবেন এবং তুল্য ব্যবহার করিবেন অর্থাৎ বিজয়ী এবং বিজিত দুইজনকেই সমান জ্ঞান এবং সমান ব্যবহার করিবেন এই কথা বলিয়া

আসিতেছেন। কিন্তু মুখে বলিলে কি হয়, আইনের গৌরচন্দ্রিকায় লিখিয়াদিলে কি হয়, কাজে তিনি তাহা বড় একটা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাই এই একশত প'চিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার ভারতবর্ষীয় বিধি-বহিতে বিজয়ী-বিজিতের প্রভেদরূপ বিজয়ীর কলঙ্ক সমস্ত সভ্য জগৎ দেখিয়া আসিয়াছে। এবং সেইজন্য এই একশত প'চিশ বৎসর ধরিয়া সমস্ত সভ্য জগৎ তাঁহাকে অতি-অমানুষ বলিয়া ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে। ইংলণ্ডে এত রাজারাণী হইল, এত পিট্, বর্ক, পীল, ব্রাইট্, গ্লাডষ্টোন হইল, ভারতে এত কর্ণওয়ালিস্, বেণ্টিঙ্ক, ক্যানিং, মেয়ো রহিল—সকলেই বলিলেন, না, এ বিধি আমাদের জাতির কলঙ্কের কারণ, এ বিধি থাকা উচিত নয়, কিন্তু কেহই ত এ বিধি উঠাইলেন না। অবশেষে লর্ড রীপণ এ বিধি উঠাইলেন—এ গাঢ় কলঙ্ক মুচিয়া ফেলিলেন। বিজয়ী এতদিনের পর বিজয়ীর বিষম ভাব বিস্মৃত হইয়া বিজিতকে বিজয়ীর তুল্য বলিয়া সম্মান করিল—পশুকে মানুষের আসনে বসাইল—এবং শত সভ্যজাতির কাছে বিজয়ীর মুখ উজ্জ্বল করিল। বল-দেখি, যদি ইংরাজ না হইয়া বাঙ্গালি আজ বিজয়ী জাতি হইত এবং রীপণ বাঙ্গালি হইয়া যদি বিজয়ী এবং অপর কোন বিজিত জাতির মধ্যে প্রভেদ-বিধিরূপ কলঙ্ক মুচিয়া সভ্যজগতের সম্মুখে বাঙ্গালিজাতির মুখ উজ্জ্বল করিতেন, তাহাহইলে বাঙ্গালির মধ্যে আজ রীপণ কতবড় লোক, বাঙ্গালি-জাতির আজ রীপণ কত শ্লাঘা ও স্পর্দ্ধার জিনিস? বিজয়ী হইয়া—বিশেষ বিজয়ী ইংরাজ হইয়া লর্ড রীপণ যে কাজ করিলেন, বহুশতাব্দীতেও কেহ সে কাজ করিতে পারে না। বিজয়ীর দিক্ হইতে বিচার করিতে গেলে রীপ-ণের মহত্ত্ব এবং মনুষ্যত্ব যথার্থই অসাধারণ এবং অলৌকিক। সে মহত্ত্ব এবং মনুষ্যত্ব দেবত্বের কাছে কাছে যায়। বিজয়ী ইংরাজ দোকানদার, হয় ত তাই এ মহত্ত্ব এবং মনুষ্যত্বের অর্থ বুঝে না।

আবার এই ইলবার্ট বিল পাশ করিতে রীপণ কি অপরূপ মাহাত্ম্যই প্রদ-র্শন করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন যে এদেশে ইংরাজের যেরূপ প্রাধান্য এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট শুদ্ধ এংলোইণ্ডিয়ানের যেরূপ সহায় তাহাতে তাঁহার ইচ্ছা-নুরূপ আইন পাশ করিলে এংলোইণ্ডিয়ান ও ভারতবাসীর মধ্যে আকুণ্ডকুণ্ড বাধিয়া উঠিবে এবং মফঃস্বলে ভীরু ভারতবাসীর ধনপ্রাণ এবং ধর্ম্ম রক্ষাকার্য্য কঠিন হইয়া উঠিবে। এই বিশ্বাসে তিনি আপনার খ্যাতি অখ্যাতির প্রতি কিছু-মাত্র দৃষ্টি না করিয়া শুধু ন্যায়-পালনার্থ এবং ভারতবাসীর মঙ্গলার্থ ইল-

বর্টবিল পরিবর্ত্তিত আকারে প্রচার করিলেন। আর কেহ হইলে নিজের অপযশের ভয়ে বোধ হয় তখন পদত্যাগ করিয়া ফেলিতেন। রীপণের কাছে আত্ম নাই—ভারতবাসীই সব। এ রীপণ কি দেবতুল্য নয়? আবার এই বিল লইয়া বৎসরাধিক কাল ধরিয়া রীপণ এংলোইণ্ডিয়ানের কাছে কতই নিন্দিত, কতই অপমানিত না হইয়াছেন! কিন্তু রীপণের মুখে এ পর্য্যন্ত কখনও এংলোইণ্ডিয়ান উপর রাগের বা ঘৃণার কথা শুনিয়াছ? বিশাল কার্য্যক্ষেত্রে রীপণ প্রথম আমাদিগকে প্রকৃত খ্রীষ্টান চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। খ্রীষ্টান কাহাকে বলে পুস্তকে পড়িয়াছি—বিশাল কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আজ রীপণে প্রথম দেখিলাম। এ চরিত্র যাঁহার, তিনি জগতের একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ মনুষ্য। এ রকম আদর্শ-চরিত্র যে আমাদিগকে দেখাইল, সে আমাদিগকে না দিল কি? স্বাধীন প্রেস, প্রধান-বিচার-পতিত্ব, আত্ম-শাসন, ইত্যাদি, সবই দুই দিনের জন্য—আদর্শ-চরিত্র অনন্তকালের জন্য। সেই আদর্শ-চরিত্র রীপণ দেখাইয়াছেন। তাই ফলাফল তুচ্ছকারী মহত্ত্বপ্রিয় মহান্ হিন্দুর কাছে রীপণ আজ দেবোপম পুরুষ—দেবপূজায় পূজিত। এ পূজা শুধু রীপণের পূজা নয়, হিন্দুরও পূজা। ফলাফল বিচারক, উপকারাপকার গণনকারী ম্লেচ্ছ বা ম্লেচ্ছ-বৎ পতিত হিন্দু এ পূজার অর্থ বুঝিবে না।

আর একটি বড় কথা, দুই কথায় বলি। ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী যে রকম প্রাচীন, গম্ভীর-স্বভাব, বিজ্ঞ, পবিত্র-মনা, ধার্ম্মিক এবং ধর্ম্মপ্রিয়, তাহাতে প্রবীণ, গম্ভীর-স্বভাব, বিজ্ঞ, পবিত্র-মনা, ধার্ম্মিক এবং ধর্ম্মপ্রিয় রীপণ ভারতবর্ষের এবং ভারতবাসীর উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা বটে। রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত না হইলেও, কিন্তু যত ইংরাজ রাজপুরুষ এদেশে আসিয়াছেন, তন্মধ্যে কেবল তিনিই সেই সিংহাসনের পাদমূলে বসিয়া ভারত শাসন করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি। এই জন্যই ভারতবাসী তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছে; যোগ্যে যোগ্যে মিলন না হইলে কি প্রীতির উচ্ছ্বাস হয়!

পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব।

নবজীবনের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত, "বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধের শেষ কথা কয়টি এই প্রবন্ধের প্রস্তাবনারূপে পুনরুক্তি করা আবশ্যক।—

"ভক্তের আধ্যাত্মিক আদর্শ রাধিকা। কিন্তু বাঙ্গালি বৈষ্ণবের একজন ঐতিহাসিক আদর্শ আছেন। তাঁহার জন্মগ্রহণে পুণ্যভূমি ভারতের মধ্যে বাঙ্গালা প্রসিদ্ধ ভক্তিক্ষেত্র এবং পবিত্র তীর্থ। তিনি ভক্তির ঐতিহাসিক অবতার, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। স্বয়ং ভাগবানের ভক্তরূপে অবতারের কথা অতি বিচিত্র। যদি ভক্তগণের কৃপায় পারি, তবে সেই বিচিত্র পবিত্র কথা বারান্তরে বুঝিবার চেষ্টা করিব।"

বারান্তরে বটে, কিন্তু এবারে নয়। অগ্রে পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলে, ঐতিহাসিক অবতারের কথা হৃদ্গত করিয়া বুঝা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, সেই জন্য এবার, অগ্রে, পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ঈশ্বর অবতারের নানা রূপ সিদ্ধান্ত আছে। কেহ বলেন, এই সমস্ত জড়-জীব জগৎ, সমষ্টিতে এবং ব্যষ্টিতে ঈশ্বরের অবতার। সমষ্টিতে এক এবং অদ্বৈত অবতার; ব্যষ্টিতে অনন্ত এবং অসংখ্য অবতার। মানবের ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ী-ভূত হইয়া ঐশীশক্তির যেখানেই বিকাশ দেখিবে, সেইখানেই বুঝিবে জগদী-শ্বরের অবতার। বনে, উপবনে,—গহনে, কাননে,—পর্ব্বতে, সাগরে,—মানবে, দানবে,—কীট, পতঙ্গে,—ফুলে, ফলে,—সর্ব্বত্রই তাঁহার শক্তি ঝল মল করি-তেছে। সর্ব্বত্রই তিনি সশরীর বিরাজমান, সর্ব্বত্রই তাহার অবতার; এই পৃথিবী অবতারময়ী।

কেহ কেহ বলেন, সমগ্র ঐশীশক্তিতে অবতার উপলব্ধি করা ভক্তির চরম দশা বটে, কিন্তু অবতার বলিলে আমরা ওরূপ বিশ্বগ্রাসী কোন ভাব বুঝি না। যে স্থলে আমরা ঐশ্বরিক শক্তির বিশেষ বিকাশ দেখি, আমরা সেই স্থলেই অবতার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। মানবে ঐশ্বরিক শক্তির বিশেষ বিকাশকে প্রতিভা বলা যায়। "প্রজ্ঞা নব নবোন্মেষশালিনী-প্রতিভা

মতা।" জগৎস্রষ্টার স্বষ্টিকারিণী শক্তি মানব হৃদয়ে প্রতিভা রূপে প্রতিভাত হয়; সেই শক্তি তখন মানব হৃদয়েই স্বষ্টিকারিণী, নব নবোন্মেষশালিনী হয়, এবং সেই মানব জগদীশ্বরের অবতাররূপে পরিগণিত হন। কপিল কোম্‌ত্‌, ধন্বন্তরি, নিউটন,—ব্যাস, বাল্মীকি, ইঁহারা সকলেই অবতার।

কেহ কেহ বলেন, কেবল মাত্র ধার্ম্মিক পুরুষগণই প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরের অবতার। জগদীশ্বর ধর্ম্মময়, ধর্ম্ম-ধৃক্, ধর্ম্ম-শক্তি; সেই ধর্ম্মই যাঁহাদের জ্বলন্তজীবন, ধর্ম্মই যাঁহাদের প্রতিভা বিকাশের প্রসরক্ষেত্র, তাঁহারাই মুখ্য কল্পে অবতার। তবে গৌণকল্পে, রূপকের ভাষায় অন্যান্য প্রতিভা সম্পন্ন জনগণকেও কখন কখন অবতার বলা গিয়া থাকে। এই মতে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, মূশা, ঈশা, নানক প্রভৃতি সকলেই অবতার।

খ্রীষ্টানের মতে, কেবল মাত্র ঈশাই দেব-নর বা নর-দেব, অর্থাৎ অবতার। মূশা প্রভৃতি ঈশ্বরের করুণা কটাক্ষে অতিমানুষ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহারা অবতার নহেন। খ্রীষ্টানের মতে নরের প্রধান গুণ আত্মদান। নরের সম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রধানা শক্তি ক্ষমা। এই ঐশ্বরিক অপূর্ব্ব পিতৃ শক্তি ক্ষমা এবং মানবীয় ঐ প্রধান গুণ সন্তানের আত্মোৎসর্গ—বাক্য এবং অর্থের মত মিশ্রিত হইয়া—যীশু-জীবন; সুতরাং যীশুখ্রীষ্ট দেব হইয়া নর; নর হইয়া দেব। তিনিই নর-দেব ও দেব-নর; তিনিই এক মাত্র অবতার।

পুরাণের অবতারতত্ত্ব বিচিত্র। কোন কোন পুরাণে পূর্ণাবতার, এবং অংশাবতার, এই দুই ভাগে অবতার ভেদ করা হইয়াছে।* শ্রীমদ্ভাগবত বলেন;—

এতেচাংশ কলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

পূর্ব্বে যে সকল অবতারের কথা কহিলাম, তন্মধ্যে পরমেশ্বরের কেহ কেহ অংশ এবং কেহ কেহ কলা; কিন্তু কৃষ্ণাবতার আবিষ্কৃত সর্ব্বশক্তি প্রযুক্ত স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ। এই জগৎ দৈত্যকুল কর্তৃক উপদ্রুত হইলে,

---

* বঙ্কিমবাবু পূর্ণাবতারেরই অবতারত্ব স্বীকার করেন। সেইজন্যই তিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই ঈশ্বরাবতার বলেন। "প্রকৃত বিচারে রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। এবং রামচন্দ্রের সে পদ প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে।" প্রচার।

ভগবান্ ঐ সকল মূর্ত্তিতে সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের বিনাশ করত লোক সকলকে সুখী করেন। [শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃতব্যাখ্যানুবাদ।]

পরন্তু অনেকগুলি পুরাণের মত এই যে কেবল পালন কার্য্যের জন্যই ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সৃজন এবং সংহরণে অবতারের কোন প্রয়োজন নাই। এইজন্য কেবল বিষ্ণু বা নারায়ণেরই অবতার হইয়া থাকে, অন্য কোন দেবতার অবতার নাই। তবে যে হনুমানকে রুদ্রাবতার বলিয়া বা বলরামকে অনন্ত বা সঙ্কর্ষণাবতার বলিয়া উল্লেখ আছে, তাঁহারা কেবল নারায়ণাবতারের সহায়রূপে পরিগণিত মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোক-ভাবনঃ।
লীলাবতারানুরতো দেবতির্য্যঙ্ নরাদিষু॥

অপিচ এই লোক-ভাবন ভগবান সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া লীলা বশত দেবতির্য্যক্ নরাদিতে অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে অনুরক্ত হইয়া লোক সকলকে প্রতিপালন করেন। [বিদ্যারত্নকৃত ব্যাখ্যানুবাদ]

মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে ;—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃসত্ত্ব নিধের্দ্বিজ।
যথাবিদাসিনাঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥
ঋষয়ো মনবো দেবাঃ মনুপুত্রাঃ মহৌজসাঃ
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয় স্তথা।

হে দ্বিজ জলাশয় হইতে নদী, খাল, প্রভৃতি যেমন সহস্র প্রকার হয়, সেইরূপ সত্ত্বগুণ প্রধান হরির অসংখ্য অবতার। ঋষি, মনু, দেব, মহাবিক্রম মানব, প্রজাপতি প্রভৃতি সকলেই সেই হরির কলা মাত্র।

বিষ্ণুপুরাণের একস্থানে কথিত হইয়াছে যে ;—

মনবো ভূভুজঃ সেন্দ্রা দেবাঃ সপ্তর্ষয়স্তথা।
সাত্ত্বিকোংংশঃ স্থিতিকরো জগতো দ্বিজসত্তম!॥

ব্রাহ্মণ! মনুগণ, মনুপুত্র ভূপালগণ, ইন্দ্রগণ, দেবগণ ও সপ্তর্ষিগণ বিষ্ণুর সাত্ত্বিক অংশ এবং ইহারাই জগৎ পালন করিয়া থাকেন।

চতুর্যুগেংপ্যসৌ বিষ্ণুঃ স্থিতিব্যাপারলক্ষণঃ।
যুগব্যবস্থাং কুরুতে যথা মৈত্রেয় তৎ শৃণু॥

মৈত্রেয়, জগতের রক্ষার নিমিত্ত বিষ্ণু চারি যুগে যে প্রকার যুগানুসারী ব্যবস্থা করেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

কৃতে যুগে পরং জ্ঞানং কপিলাদি স্বরূপধৃক্।
দদাতি সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূত হিতে রতঃ॥

তিনি প্রথমত সত্য যুগে সর্ব্বভূত হিতার্থে কপিলাদিরূপ ধারণ পূর্ব্বক সকল প্রাণীকে পরম সত্যজ্ঞান দান করেন।

চক্রবর্ত্তিস্বরূপেণ ত্রেতায়ামপি স প্রভুঃ।
দুষ্টানাং নিগ্রহং কুর্ব্বন্ পরিপাতি জগত্রয়ম্॥ ৫৫॥

ত্রেতা যুগে সেই প্রভু চক্রবর্ত্তি স্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক দুষ্টগণের দণ্ডবিধান পূর্ব্বক ত্রিলোক রক্ষা করেন।

বেদমেকং চতুর্ভেদং কৃত্বা শাখা শতৈর্বিভুঃ।
করোতি বহুলং ভূয়ো বেদব্যাস স্বরূপধৃক্॥

তিনি দ্বাপর যুগে বেদব্যাস রূপ ধারণ পূর্ব্বক এক বেদ চতুর্ভাগ করিয়া পশ্চাৎ শত শাখায় বিভক্ত করেন। এবং পুনর্ব্বার উহা বহুল অংশে বিভক্ত করিয়া থাকেন।

বেদাংস্তু দ্বাপরে ব্যস্য কলেরন্তে পুনর্হরিঃ।
কল্কিস্বরূপী দুর্ব্বৃত্তান্ মার্গে স্থাপয়তি প্রভুঃ॥

তিনি বেদব্যাসরূপে এই প্রকার বেদ বিভাগ করিয়া পশ্চাৎ কলির অবসানে কল্কিরূপ ধারণ পূর্ব্বক দুর্ব্বৃত্তদিগকে সৎপথাবলম্বী করিবেন।

[বরদাপ্রসাদ বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত সানুবাদ বিষ্ণুপুরাণ।]

উপরের ঐ কয়টি শ্লোক হইতে মোটামুটি এই বুঝা যায়, যে ভগবানের সত্ত্ব-গুণাংশে অর্থাৎ নারায়ণাংশে লোক পালনের জন্য যুগে যুগে ভগবান মানব আকারে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

বিষ্ণুপুরাণের অন্যত্র কথিত হইয়াছে যে;—

নাকারণাৎ কারণাদ্বা কারণাকারণান্ন চ।
শরীর গ্রহণং বাপি ধর্ম্মত্রাণায় তে পরম্॥

দুঃখপ্রাপ্তিহেতু বা সুখপ্রাপ্তিহেতু, ধর্ম্মহেতু বা অধর্ম্মহেতু, তুমি শরীর পরিগ্রহ কর না, পরন্তু তুমি একমাত্র ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্তই শরীর ধারণ করিয়া থাক।

[ঐ ঐ সানুবাদ বিষ্ণুপুরাণ।]

মহাভারতান্তর্গত ভগবদ্গীতায়ও এই মত সমর্থিত হইয়াছে ;—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য দুষ্কৃতগণের বিনাশ সাধনের জন্য এবং ধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।

সাধুগণের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতগণের দুর্গতি সাধন এই দুইটি ধর্ম্ম সংরক্ষণের অনুষঙ্গ বলিলেও বলা যায় ; সুতরাং ধর্ম্ম সংরক্ষণই ঈশ্বরাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া অনেকগুলি পুরাণই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইরূপ বিবেচনা করিলে নারায়ণের কেবল মাত্র মানবাবতার হওয়াই সম্ভব। সেই মানবও প্রদীপ্ত প্রতিভা পূর্ণ এবং অতুল ধর্ম্ম-শক্তি সম্পন্ন হওয়াও সম্ভব।

কিন্তু পুরাণে মীন কূর্ম্মাদিওত নারায়ণের অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সে সকল কথার অর্থ কি ? ধর্ম্ম স্থিতি সংরক্ষণাদি জন্য ভগবান মীন কূর্ম্মাদি-রূপ পরিগ্রহ করিলেন কেন ? এই সকল পৌরাণিকী কথার কি কোনরূপ পৌরাণিক অর্থ নাই ?

অনেকের মনে অবতার তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সংকল্প বাদ আসিয়া পড়ে। অর্থাৎ অনেকে এই রূপ মনে করেন, যে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, বা ধর্ম্ম-সংরক্ষণ জন্য ভগবান সময় বিশেষে, হয়ত দেব মানব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অবনীতে অবতীর্ণ হন। তাহাতে ভগবানের বিশেষ সংকল্প থাকে এবং তাঁহাকে সেই জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। বাস্তবিক পৌরাণিক বৃত্তান্তের ভাষা দেখিলে, ঐরূপ বোধ হয় বটে। কিন্তু পৌরাণিক তত্ত্বানুসন্ধায়ীগণের এটুকু বুঝা চাই, যে অনেক সময়েই পুরাণের ভাষা সম্পূর্ণরূপে রূপকের ভাষা। যদি যাত্রা শুনিতে গিয়া কেহ বাস্তবিক মনে করেন, যে সত্য সত্যই মা যশোদা বালক কৃষ্ণের দেখা পাইয়া ভৈরবী রাগিণীতে—

"হারাণ ধন আয় রে রতন মণি কোলে করি তোরে।
তোরে বুকে রেখে বদনখানি হেরি রে।"

বলিয়া গান গাইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে যেমন ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকি, পুরাণাদির ভাষা মাত্র বুঝিয়া যিনি সত্য সত্যই মনে করেন, যে নারায়ণ বিশেষ সংকল্প করিয়া কার্য্য বিশেষের জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকেও আমরা সেইরূপ ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে পারি।

বাস্তবিক জগদীশ্বরে সংকল্প বিকল্প, কৌশল, অকৌশল আরোপ করা বড়ই বিড়ম্বনার বিষয়। মনুষ্য অবশ্য মনুষ্য ভাবেই ঈশ্বরভাব বুঝিবে; আপনার প্রজ্ঞার প্রকৃতি মনুষ্য কোন কালেই পরীবর্ত্তন করিতে পারে না। আমরা ঈশ্বরকে অগত্যা মানব মনের বিষয়ীভূত করিয়া তাঁহার প্রকৃতির একরূপ ক্ষীণধারণা করিতে প্রবৃত্ত হই; কিন্তু ঈশ্বর আলোচনার সময় এতটুকু আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে ঈশ্বরে অগত্যা আমরা মানবীয় গুণ আরোপ করি বলিয়া, আমরা আবার সেই সকলকে প্রকৃত প্রস্তাবে ঐশ্বরিক গুণ মনে করিয়া, কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে যেন না যাই।

য়ুরোপীয় ধর্ম্মবিজ্ঞানে এইরূপ সিদ্ধান্ত ও বিতণ্ডার বড়ই বাড়াবাড়ি। মানবীয় দয়া প্রথমে ঈশ্বরে আরোপিত হইল; তাহার পর ঈশ্বর পূর্ণ বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্থির করা হইল, যে তিনি পূর্ণ দয়ালু অর্থাৎ পরম দয়ালু। আবার আর একদিক দেখিয়া স্থির হইল, ঈশ্বর ন্যায়পর, পরম ন্যায়পর। তাহার পর বিতণ্ডা বাধিল, যে যদি পরম ন্যায়পর, তবে আবার তিনি পরম দয়ালু কি রূপে? যদি পরম দয়ালু তবে আবার পরম ন্যায়পর কেমন করিয়া?

এইরূপে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার সহিত তাঁহার কৌশলময় ভাবের সম্পূর্ণ বিরোধ। জগতের অপূর্ব্ব কৌশল দেখাইয়া কৌশলীর অনুমান অবশ্যম্ভাবী,—এই যুক্তি আস্ফালন দিন কতক য়ুরোপে বড়ই হইয়াছিল; মিল বলিলেন, যাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বল, তাঁহাকে আবার কৌশলী বলিতেছ কেন? ঘড়িওয়ালা সহজে দুইটা কাঁটা ঘুরিবার উপায় করিতে পারে না বলিয়াই ত, স্প্রিং, লীবর, চাকা, ফ্লাইহুউল, কত কি যোজনা করে; তাহার শক্তি নিতান্ত অল্প বলিয়া সে কৌশল করিতে যায়। তবে আবার যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহাকে কৌশলী বলিবে কেন?

আমরা বলি ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনায় ঈশ্বরে মানবগুণ আরোপ করিতে আমরা বাধ্য হই বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া এত টুকু জ্ঞান কেন থাকিবে না, যে সেই সকল আরোপিত গুণ লইয়া আবার বিচার বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইব।

অতএব অবতার তত্ত্বের সহিত সংকল্প বাদ বা সংকল্পময় কৌশল বাদ আমরা একেবারেই মিশ্রিত করিব না।

কোন পুরাণে ২৪টি অবতার; কোন খানিতে ২২টি* কোথাও ১৮টি;

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে ২২টি অবতারের উল্লেখ আছে; (১) বিরাট।

কোথাও বা ১০টি। বর্ত্তমান কালের সাধারণ হিন্দুদিগের বিশ্বাসে দশটি অবতোরই প্রাধান্য পাইয়াছে। সেই দশটির নাম এবং ক্রম সকলেই জানেন। (১) মৎস্য। (২) কূর্ম্ম। (৩) বরাহ। (৪) নৃসিংহ। (৫) বামন। (৬) পরশুরাম। (৭) রাম। (৮) বলরাম। (৯) বুদ্ধ। (১০) কল্কী। বরাহ পুরাণ প্রভৃতিতে ঐ রূপ নাম ও ক্রম আছে; বাঙ্গালায় জয়দেব ঠাকুরের প্রসাদে এই মতই গৃহে গৃহে গীত হইয়া প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। পৌরাণিক অবতারতত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ অবতার বলিয়া গণিত নহেন; তিনি পূর্ণাবতার। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবকে দশমাবতার বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

এই দশাবতার সম্বন্ধে বঙ্গের একজন বৈষ্ণব তত্ত্বজ্ঞ বলেন;—

যদ্‌যদ্ভাবগতো জীবস্তত্তদ্ভাবগতো হরিঃ।
অবতীর্ণঃ স্বশক্ত্যা স ক্রীড়তীব জনৈঃ সহ॥
মৎস্যেষু মৎস্যভাবোহি কচ্ছপে কূর্ম্মরূপকঃ।
মেরুদণ্ডযুতে জীবে বরাহভাববান্ হরিঃ॥
নৃসিংহো মধ্যভাবোহি বামনঃ ক্ষুদ্রমানবে।
ভার্গবোঽসভ্যবর্গেষু সভ্যে দাশরথিস্তথা॥
সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পন্নে কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
তর্কনিষ্ঠনরে বুদ্ধো নাস্তিকে কল্কিরেব চ॥
অবতারা হরের্ভাবাঃ ক্রমোর্দ্ধগতিমদ্ধৃদি।
ন তেষাং জন্মকর্ম্মাদৌ প্রপঞ্চো বর্ত্ততে ক্বচিৎ॥
জীবানাং ক্রমভাবানাং লক্ষণানাং বিচারতঃ।
কালোবিভজ্যতে শাস্ত্রে দশধা ঋষিভিঃ পৃথক্॥
তত্তৎকালগতো ভাবঃ কৃষ্ণস্য লক্ষ্যতে হি যঃ।
সএব কথ্যতে বিজ্ঞৈরবতারো হরেঃ কিল॥

---

(২) বরাহ। (৩) নারদ। (৪) নরনারায়ণ। (৫) কপিল। (৬) দত্তাত্রেয়। (৭) যজ্ঞ বা ইন্দ্র। (৮) ঋষভ। (৯)পৃথু। (১০) মৎস্য। (১১) কূর্ম্ম। (১২) (১৩) ধন্বন্তরি, মোহিনী। (১৪) নারসিংহ। (১৫) বামন। (১৬) পরশুরাম। (১৭) ব্যাস। (১৮) নরদেব বা রাম। (১৯) (২০) রাম, কৃষ্ণ। (২১) বুদ্ধ। (২২) কল্কি। দশমাবতার মৎস্যের বিবরণ এইরূপ;—

রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে
নাব্যারোপ্য মহীময্যা মপাদ্বৈবস্বতং মনুং।

এই বর্ণনায় য়ুদীয় পুরাণোক্ত নোয়ার নৌকা দ্বারা সৃষ্টি রক্ষার কথা স্পষ্টই লক্ষিত হয়।

মায়াবদ্ধ জীব যে যে ভাব প্রাপ্ত হইয়া যে যে স্বরূপ পাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রাপ্তভাব স্বীকার করত নিজ অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা তাহার সহিত আধ্যাত্মিকরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। জীব যখন মৎস্যাবস্থা প্রাপ্ত, ভগবান তখন মৎস্যাবতার। মৎস্য নির্দ্দণ্ড, নির্দ্দণ্ডতা ক্রমশ বজ্রদণ্ডাবস্থা হইলে কূর্ম্মাবতার, বজ্রদণ্ড ক্রমশ মেরুদণ্ড হইলে বরাহ অবতার হন। নরপশু ভাবগত জীবে নৃসিংহাবতার, ক্ষুদ্র মানবে বামনাবতার, মানবের অসভ্যাবস্থায় পরশুরাম, সভ্যাবস্থায় রামচন্দ্র। মানবের সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পত্তি হইলে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হন। মানব তর্কনিষ্ঠ হইলে ভগবদ্ভাব বুদ্ধ এবং নাস্তিক হইলে কল্কি, এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে। জীবের ক্রমোন্নত হৃদয়ে যে সকল ভগবদ্ভাবের উদয়, কালে কালে দৃষ্ট হইয়াছে, সেই সকলই অবতার, সেই সকল ভাবের উৎপত্তি ও কার্য্য সকলে প্রাপঞ্চিকত্ব নাই। ঋষিরা জীবগণের উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করত ঐতিহাসিক কালকে দশ ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। যে যে সময়ে একটি একটি অবস্থান্তর লক্ষণ, রূঢ়রূপে লক্ষিত হইয়াছে, সেই সেই কালের উন্নত ভাবকে অবতার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। [শ্রীকেদারনাথ দত্ত প্রণীত শ্রীকৃষ্ণসংহিতা।]

ইহার তাৎপর্য্য এই যে জীবের ক্রম বিকাশ অনুসারে বিষ্ণু অবতারেরও ক্রম বিকাশ হইয়াছে। জীবের ক্রমবিকাশ ধারাবাহিক হইলেও তাহার মধ্যে মধ্যে সন্ধি বা গ্রন্থিস্বরূপ একটি একটি পরিচ্ছেদ আছে; সেই এক এক পরিচ্ছেদে এক একটি বিষয়ের চরমোৎকর্ষ হয়। তাহার পর হইতে অন্যরূপ বিকাশ আরম্ভ হয়। সেই সেই সন্ধিস্থলে জীবের চরমোৎকর্ষ ভাবই, ঈশ্বরের অবতার। এইরূপে অবতার তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে দেখা যায়, যে ইহাতে মানবাবতার গুলিতে প্রতিভা থাকিতেই হইবে, এবং কাজে কাজেই সেগুলি আদর্শ হইয়া উঠিবে।

এখন জীব বিকাশের সন্ধিস্থলে মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি কিরূপে আসিল, তাহাই বুঝিতে হইতেছে। জীব বিকাশ বা জড়বিকাশ তত্ত্ব, হিন্দু পুরাণ দর্শনে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেও আধুনিক য়ুরোপীয় বিজ্ঞানে বিবর্ত্তবাদ কিছু স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। সুতরাং আমরা এইস্থলে য়ুরোপীয় বিবর্ত্তবাদের সাহায্য লইয়া এই বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করিব। সুপ্রসিদ্ধ ডারবিন্ বৈদেশিক বিবর্ত্তবাদের অধিনেতা, সৌভাগ্যক্রমে জীবের ক্রম বিকাশ কথায় আমরা তাঁহারই সাহায্য পাইয়াছি। ডারবিন্ বলেন;—

We thus learn that man is descended from a hairy quadruped furnished with a tail and pointed ears, probably arboreal in its habits, and an inhabitant of the old world.****This quadrumana

with all the higher mammals are probably derived from an ancient *marsupial animal,* and this through a long line of diversified forms either from some reptile-like or some *amphibian-like creature.* and this again from some *fish-like* animal.

Chap. XXI. Part 2. Vol. II. *Descent of Man.* Da*rwin.*

এইরূপে আমরা বুঝিলাম, যে কোন একরূপ লোমশ, সকোণ কর্ণ বিশিষ্ট, এবং সম্ভবত বৃক্ষচর জম্বুদ্বীপবাসী চতুষ্পদ পশু হইতেই মানবের উৎপত্তি হইয়াছে। * * * * * * এই চতুষ্পদ জীবের এবং সকল প্রকার উচ্চতর শ্রেণীর স্তন্যপায়ী জীবের উৎপত্তি সম্ভবত কোনরূপ পুরাকালিক বৃহৎ গর্ভ-কোষ-বিশিষ্ট জীব হইতে হইয়া থাকিবে। কোনরূপ সরীসৃপবৎ, অথবা কোনরূপ উভচর জীব হইতে আবার সেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে, এবং সেই উভচরজীব কোনরূপ মৎস্যবৎ জীব হইতে উৎপন্ন।

অতএব বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তবাদ পর্য্যালোচনায় ডারবিন্ এইরূপ অনুমান করেন, যে উচ্চতর জীব সৃষ্টিতে প্রথমে মৎস্য, পরে উভচর (কচ্ছপ), তাহার পর বরাহের মত কোনরূপ বৃহজ্জঠর জীব, তাহার পর লোমশ কোন পশু, এবং পরে মানব শরীর বিকশিত হইয়াছে। সেই আদি মানবগণ প্রথমে খর্ব্ব বা বামন ছিল, এমন সিদ্ধান্তও য়ুরোপীয় বিজ্ঞানে দেখা যায়। সুতরাং পৌরাণিক অবতারতত্ত্বে জীব সৃষ্টির যেরূপ ক্রম বিকাশের আভাস দেখাযায়, তাহা যে নিতান্ত আধুনিক বিবর্ত্তবাদের বিরোধী তাহা বোধ হয় না। বরং মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ *, বামন—এইরূপ ক্রমই বিজ্ঞান সঙ্গত বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

প্রথম পঞ্চ অবতারে আমরা নিকৃষ্ট জীবের শারীরিক বিকাশে উৎকৃষ্ট জীব মানবের অবতারণা বুঝিলাম। তাহার পর, মানবের সামাজিক বিকাশ; এই বিকাশের তিনটি গ্রন্থি; অবতারও তিনটি। পরশুরাম, শ্রীরাম ও বলরাম।

পরশুরামাবতারে বাহুবলে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব স্থাপন। বশিষ্ঠ, অগস্ত্য,

* ঠিক নৃসিংহ ভাব অবশ্য ডারবিন্ হইতে পাওয়া যায় না, তবে পুরাণে যখন নৃ-সিংহকে নৃ-বরাহও বলা হইয়াছে, তখন নৃ-মর্কট বলিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না।

নৃ-বরাহস্য বসতির্মহর্লোকে প্রতিষ্ঠিতা।
নৃসিংহস্য তথা প্রোক্তা জন লোকে মহাত্মনঃ॥ পাদ্ম।

সর্ব্বত্রই বন্যমানুষ মাংস-লোলুপ হিংস্রজীব; তাহাতে বামনাবতারের পূর্ব্বাবতার নৃ-মর্কট না হইয়া নৃসিংহ বৎ হওয়াই পৌরাণিক মতে সম্ভব।

জমদগ্নি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিরা সকলেই ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য ব্রতী ছিলেন, কিন্তু পরশুরামে সেই ব্রতের পরাকাষ্ঠা; পরশুরাম ভারতের উত্তরের ক্ষত্রিয়গণকে নির্বীর্য্য করিয়া, এবং দক্ষিণে উপনয়ন দ্বারা নূতন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়া সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য সংস্থাপন করেন। ব্রাহ্মণ্যের প্রভুত্বের চরমোৎকর্ষে পরশুরাম অবতার।

মানবের সামাজিক উন্নতির দ্বিতীয় সোপানে শ্রীরামচন্দ্র। রামচন্দ্র রাবণজয় করিরা, অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া যেরূপ সমগ্র ভারতে ক্ষত্রিয়ের আধিপত্য স্থাপন করেন, তেমনই প্রজারঞ্জনের জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া রাজা নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। রামচন্দ্র রাজাবতার। রাম রাজার তুল্য রাজা হয় না, রামরাজ্যের মত রাজ্য হয় না।

তাহার পর বলরাম। বলরামে সামাজিক তৃতীয় সোপান; বলরাম বাল্যে গোপালন নিরত; বয়সে হলধারী। বলরামে কৃষিযুগের উৎপত্তি; বলরামের সময়ে ভারতের গৃহবিবাদ শান্তিলাভ করিল; বলরামের হলই তাহার পর ভারতের প্রধান অস্ত্র হইল,মনুষ্য পরস্পর যুদ্ধ বিবাদ হইতে বিষম রক্তারক্তির পর নিরস্ত হইয়া,সর্ব্বংসহা ধরণীর উপর আপনার অস্ত্র চালনা করিতে ব্যস্ত হইল; পূর্ব্বে ম্লেচ্ছ যবনের মত আর্য্যগণ মধুপর্কের জন্য গো-সেবা করিতেন; এই সময় হইতে প্রকৃত গোপালন হইতে লাগিল; হিন্দুর যথার্থ গো-সেবায় এবং কৃষিচর্চ্চায় ভারতবর্ষ অচিরাৎ ধন ধান্য দধি দুগ্ধে পরিপূর্ণ হইল। ভারতের কৃষিযুগের মানব বৃন্দের সামাজিক উন্নিতির এই চরম সীমা।

তাহার পর আধ্যাত্মিক বিকাশ। ভারতের আধ্যাত্মিক বিকাশের দুই অবতার বুদ্ধ এবং চৈতন্য। প্রথমে যুক্তি, পরে ভক্তি।

সামাজিক উন্নতির চরমোৎকর্ষ হইতে আধ্যাত্মিক সোপান আসিল। সামাজিক অবস্থার অন্ধ বিশ্বাস ঘোরতর তর্কজালে স্থানে স্থানে ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল। বুদ্ধের একটি নাম বিজ্ঞানমাতৃক। শব্দটি শুনিলে বোধ হয়,যেন বিদ্যাসাগর মহাশয় বা বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত ওটি সৃজন করিয়াছেন বাস্তবিক তাহা নহে; ওটি হেমচন্দ্রের অভিধান ধৃত বুদ্ধ শব্দের প্রতিশব্দ। বুদ্ধের ঐ নামকরণেই বুঝা যায়, যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যুক্তিই মূল। সেই যুক্তিতে বিশ্বনিয়ামক ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইল। ইহাই ভক্তিহীন ধর্ম্ম যুক্তির শেষ সীমা। বুদ্ধ সেই যুক্তির অবতার।

যুক্তির নিরাশ্রয়তায় চক্ষুষ্মতী ভক্তির উৎপত্তি। এই ভক্তি অন্ধ বিশ্বাসের সহচরী নহে; ইহা যুক্তির জঠর বিদীর্ণ করিয়া যুক্তির কন্যা অথচ সংহারিণীরূপে অবনীতে অবতীর্ণা হন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই ভক্তির আবির্ভাবে, বঙ্গদেশ পুণ্যক্ষেত্র। সেই ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্য, তাঁহাতেই মানবের ধর্ম্মজীবনের পূর্ণ বিকাশ। আধ্যাত্মিক জীবনে ভগবানের ভক্তরূপে জন্ম গ্রহণের বিচিত্র কথার এইটি আমাদের প্রস্তাবনা।

রীপণ-উৎসব।—ভারতের নিদ্রাভঙ্গ।

ভাঙিল কি তবে— এতদিন পরে—
ভাঙিল কি ঘুম ভারতমাতা ?
জরাজীর্ণ শীর্ণ শরীরে তোমার
ফিরে কি জীবন দিল বিধাতা ?
উঠ—উঠ মাতঃ ডাকিছে তোমায়
তোমার সন্তান যে যেথা আজ,
কিবা বৃদ্ধ শিশু কিবা যুবজন
কি দরিদ্র আর কিবা অধিরাজ ॥
ডাকিছে তোমায় মহারাষ্ট্রবাসী—
ডাকিছে পারসী—পঞ্জাবী—শীক্,
ডাকিছে তোমার বীরপুত্রগণ—
রাজোয়ারাময় যত নির্ভীক ॥
তোমার নন্দন মহম্মদীগণ,—
বাহুবলে যার ধরণী টলে,
ডাকিছে তোমায় সবে একস্বর
জাগো মা ভারত—জাগো মা ব'লে ॥
একা বঙ্গ নয় হিমালয় হ'তে
কুমারীর প্রান্ত যেখানে শেষ
আজি একপ্রাণ হিন্দু মুসলমান—
জাগাতে তোমায় জেগেছে দেশ ॥
"আর ঘুমাইওনা" ব'লে কতদিন
কেঁদেছি—কেঁদেছে কত সে আর,
আজি জন্মভূমি জীবন সার্থক—
তোমার কণ্ঠে এ মিলন হার ॥
কতবারই মাতঃ উদাসীর মত
দেখেছি তোমার ভুবনময়
স্থাবর জঙ্গম কত দিকে কত
অরণ্য যেমন ছড়ায়ে রয় ॥
দেখেছি তোমার গিরি উপত্যকা,—
শস্যক্ষেত্র ভূমি, নগর, দেশ,

ছায়ামাত্র তায় প্রাণিবৃন্দ যত
কালের কালীতে কালিম বেশ ॥
জীবনের বিন্দু না হেরি কোথাই,
সব শূন্যময়—সকলি খালি,
চারিদিকে যত নরাস্থি কঙ্কাল,
চারিদিকে ধূ ধূ করিছে বালি ॥
উঠ গো জননি দেখো চক্ষু মেলি
সেই অস্থিগুলি নড়িছে ধীরে,
মৃদুল হিল্লোলে দেখো কি নিশ্বাস
সে শব-পঞ্জরে বহিছে ফিরে ॥
একমাত্র শ্বাস মিলিত ভারত
নাসিকারন্ধ্রেতে ছাড়িল যেই
কি মহা উৎসব বহিল উচ্ছ্বাসে—
ভারতে যাহার তুলনা নেই ॥
"আর ঘুমাইও না" ডাকি মা আবার
ভাবী আশাফল ভাবিয়া দেখো,
"রীপণ-উৎসব" সোণার অক্ষরে
হৃদয়ের মাঝে লিখিয়া রেখো ॥
শূন্যতল হ'তে নেমেছে পবন
বহিছে তোমার ভুবনময়,
নব-পল্লবিত করিতে তোমারে
ফুটাতে জীবন মঞ্জরীচয় ॥
এ ধীর হিল্লোলে যে বায়ু উঠেছে
কার সাধ্য আর নিবারে তারে,
অগ্রসর গতি কেবা রোধে তার—
কেবা আর তারে বাঁধিতে পারে ?
নব শিখাময় নব প্রভারাশি
ভারত ভস্মেতে মিশেছে ফের,
যে অস্থি কোলেতে কাঁদিলে ভারত
সজীব হ'বে সে শিখাতে এর ॥

জীবন দায়িনী এ দহন শিখা
ভারত অন্তরে ধরেছে ধীরে,
নারায়ণ মুখে হয়েছে উদ্ভব—
ভারতের বুকে থাকিবে স্থিরে ॥
জ্বলিবে আরো এ যাবে যত কাল,
জ্ঞানের আলোক—বিদ্যুৎছটা
দমে না দমনে, দমিলে দ্বিগুণ
ধরে খরতর তেজের ঘটা ॥
ভুলো না ভারত "রীপণ-উৎসব"
ছিঁড়ো না যে ডোরে মিলেছ আজ,
এক বাণী ধর ভারত সন্তান
যেখানে যে থাকো—পরো যে সাজ ॥
মনে ক'রো সবে নিভৃতে—উৎসবে
"রীপণ-বিদায়" নহে এ খালি,
সম আশা ভয় ভারত অন্তরে
এ মিলন তার প্রকাশ্য ডালি ॥
নহে আকস্মিক দৈব সুঘটনা—
বহুদিন হ'তে অঙ্কুর এর
জড়ায়ে জড়ায়ে ভারত অন্তরে
শিকড়ে শিকড়ে বেঁধেছে ফের ॥
আজি প্রস্ফুটিত হ'য়ে দিছে দেখা,
তরুমূল যেন পল্লবময়
ধরণীর গর্ভে ধীরে ধীরে বেড়ে,
ফলে ফুলে শেষে সাজিয়া রয় ॥
ভারতের আশা ভারত-প্রত্যাশা—
জীবন উন্নতি ইহারই সার,
সুবারি-সেচক সে সব লতায়
"রীপণ" কেবলি লক্ষ্য রে তার ॥
হবো অগ্রসর সেই আশাপথে
তিলেক তাহাতে নাহি সংশয়,

দিয়াছে দেখায়ে যে পথ উহারা
হ'বে পরিসর ধ্রুব নিশ্চয় ॥
দিয়াছে যখন দেখায়ে সে আলো
দিয়াছে যখন দেখায়ে পথ,
আজি আর কালি তাহাতে পশিব
সাধনে পুরাবো স্ব-মনোরথ ॥
আজি আর কালি পাবো রে সকলি—
আর এ ভারত নিদ্রিত নয়,
সম তৃষ্ণাতুর সব পুত্র তার
একি পথপানে চাহিয়া রয় ॥
একি পথ পানে চাহে মহারাষ্ট্র
চাহে সে পারসী—পঞ্জাবী—শীক্,
চাহে ভারতের বীরপুত্রগণ—
রাজোয়ারাময় যত নির্ভীক ॥
ভারতনন্দন মহম্মদীগণ—
তাহারাও আজি—জাগো মা-বলে ;
সেই পথপানে একদৃষ্টে চাহে
সাধনা সাধিতে সে পথে চলে।
উঠ উঠ মাতঃ ডাকিছে তোমায়
তোমার সন্তান যে যেথা আজ,
কিবা বৃদ্ধ শিশু কিবা যুবাদল
কি দরিদ্র আর কিবা অধিরাজ ॥
একা বঙ্গ নয়— হিমালয় হতে
কুমারীর প্রান্ত যেখানে শেষ,
আজি একপ্রাণ হিন্দু মুসলমান
জাগাতে তোমারে জেগেছে দেশ ॥
উঠ উঠ মাতঃ ছাড়ো নিদ্রা ঘোর
পূরিয়া নিশ্বাস ফেলোগো-মাতঃ,
দেখি কি না হয় অরুণ উদয়—
তরুণ ছটাতে প্রভাত প্রাতঃ ॥

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নবজীবন।

১ম ভাগ। | মাঘ ১২৯১। | ৭ম সংখ্যা।

সঙ্কর্ষণাগ্নি,—অনন্ত—বলরাম।

সৃষ্টি, প্রলয়, মন্বন্তর, পরলোক প্রভৃতি তত্ত্ব সমূহ পুরাণশাস্ত্র হইতেই পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাণে অর্থবাদ বিস্তর। শাস্ত্রবিচারে অর্থবাদ প্রমাণ হইতে পারে না। অর্থবাদ বাক্যসমূহকে ব্যতিরেকপূর্ব্বক বেদ ও স্মৃতি-মূলক সারতত্ত্ব সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন। পুরাণ শাস্ত্রে পৃথিবীর অভ্যন্তর-নিহিত সঙ্কর্ষণ নামক তমোগুণ-প্রতিপালিত এক মহাভয়ঙ্কর অগ্নির উল্লেখ আছে; এবং বিশ্বের প্রাণস্বরূপ 'ব্রহ্মা' নামক ঈশ্বরাধিষ্টানের স্থিতি, নিদ্রা ও প্রলয়-কাল সম্বন্ধে বিস্তর অঙ্কপাত আছে। সে সমস্ত তত্ত্ব সামান্যবুদ্ধির অনুগত নহে। ভারতীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ব্যতীত তাহা ভাল লাগে না। শ্রদ্ধাবান্ পাঠক বা শ্রোতার নিকট অর্থবাদ প্রতিবন্ধক হয় না। অশ্রদ্ধালুর নিকট অর্থবাদ ভাঙ্গিয়া দিলেও ফল হয় না। তথাপি শাস্ত্রানুরাগী জনগণের বোধ সৌলভ্যার্থ আমরা উক্ত তত্ত্ব সমূহের মর্ম্মোদ্ভেদে যথাসাধ্য প্রবৃত্ত হইতেছি।

উপরি উক্ত তত্ত্বদ্বয়ের মধ্যে সঙ্কর্ষণাগ্নি নামক তত্ত্বটি এই প্রস্তাবের বিচার্য্য বিষয়। এই অগ্নি প্রলয়ের এক প্রকার কারণ রূপে উক্ত হইয়াছে। 'সঙ্কর্ষণ' শব্দের অর্থ 'আকর্ষণ'। ভাগবতে আছে;

'সাত্বতীয়া দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ সঙ্কর্ষণমহমিত্যভিমানলক্ষণং সঙ্কর্ষণমিত্যাচক্ষতে'। (৫।২৫।১)

ভগবদ্ভক্ত জনগণ তাঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলেন, কেন না আমি ও আমার ইত্যাদি সংসারাভিমান দ্বারা তিনি দ্রষ্টা ও দৃশ্যের আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

তাৎপর্য্য এই যে, সেই সঙ্কর্ষণ নামক কালাগ্নির অধিষ্ঠাত্রীদেবতা তমোম অধোভূবন হইতে সকলকে তামসিক প্রলোভনে আকর্ষণ করিতেছেন। তাহাতে স্বার্থপরতা উৎপন্ন হওয়াতে সংসার স্বীয় প্রভাব প্রকাশ করিতেছে। সয়তান যেমন ঈব ও আদমের সাংসারিকতা উৎপত্তির হেতু, সেইরূপ তিনি সংসারের মল-বৃদ্ধির হেতু। এই অভিমান ও প্রলোভনরূপ মলহেতুত্ব জ্ঞাপনার্থে শাস্ত্র তাঁহাকে মদোন্মত্ত বিশেষণ দিয়াছেন।

'নীলবাসামদোৎসিক্তঃ।' (বিঃ পুঃ ২।৫।১৭।)

তাঁহার পরিধান নীলবসন এবং তিনি সর্ব্বদা মদোন্মত্ত।

পুনশ্চ;

'উপাস্যতে স্বয়ং কান্ত্যা যো বারুণ্যা চ মূর্ত্তয়া।' (ঐ।১৮)

তিনি কান্তি অর্থাৎ লক্ষ্মী এবং সুরাদেবী কর্ত্তৃক উপাস্য হয়েন।

প্রলয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রলোভন ও স্বার্থরূপ সেই মল অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ধরণীর ভোগ ও ভোগ্যশক্তিকে বিনাশ করে। তখন এইভূমণ্ডল ঐ সঙ্কর্ষণ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়। সেই অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হইয়া সংসারকে গ্রাস করিয়া ফেলে। সাধনা দ্বারা উক্ত প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলে প্রলয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কেবল যোগিগণই তাহার অধিকারী।

'সঙ্কর্ষণ' শব্দের আর এক অর্থ "সম্যক প্রকারেণ লাঙ্গলাদিনা ভূম্যাদি কর্ষণং।" অর্থাৎ ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধিকরণ। ঐ অগ্নিকে, এস্থলে তদীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে পরিকল্পনা পূর্ব্বক তাঁহাব লক্ষণ নিরূপণ করা হইতেছে। তিনি যেমন প্রলোভনের মূর্ত্তি—বাড়বানলরূপ পাতালাগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেইরূপ তিনি কৃষিকর্ম্মেরও অধিষ্ঠাতৃরূপে কথিত হন। তাৎপর্য্য এই যে, এই সংসারের স্থিতিকালে পৃথিবীর অভ্যন্তরবর্ত্তী ঐ মহান্ অনল কৃষিকর্ম্মের উত্তরসাধকরূপ-উর্ব্বরাশক্তি-সম্পাদক। প্রলয়কালে তৎকর্ত্তৃক পৃথিবী দগ্ধ হয় সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া পুনঃ সৃষ্টিতে অধিকতর উর্ব্বরতা হইয়া থাকে। তাঁহার এই লক্ষণটি জ্ঞাপন করিবার জন্য বলরামরূপে তাঁহার মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। 'সঙ্কর্ষণোবলদেবইত্যমরঃ।' 'লাঙ্গলাসক্তহস্তাগ্রঃ'। (বিঃ পুঃ ২।৫।১৮) তাঁহার এক হস্তে লাঙ্গল আছে। এই লাঙ্গল চিহ্নটি তৎসম্পাদ্য কৃষিশক্তি ও উর্ব্বরতাশক্তির জ্ঞাপক।

সঙ্কর্ষণাগ্নির আরও কয়েকটি লক্ষণ আছে। তাহা প্রধানত প্রলয়াগ্নি

রূপ। দ্বিতীয়ত তাহা ভূমণ্ডলের শূন্যাবস্থান শক্তিস্বরূপ, ভূতলের উন্নয়ন-ক্তিরূপী ও তাহার দার্ঢ্যসম্পাদক। এই লক্ষণসমূহ জ্ঞাপনার্থ তাহা অনন্ত-দেব বা শেষনাগরূপে কথিত হয়। শুকদেব কহিলেন—

"তস্য (পাতালস্য) মূলদেশে ত্রিংশযোজন সহস্রান্তর আস্তে, যাবৈ কলা ভগবতস্তামসী সমাখ্যাতা অনন্ত ইতি' (ভাঃ বঃ ৫।২৫।১)

পাতালের মূলদেশে সহস্র যোজনের অন্তরে ত্রিংশ যোজনের মধ্যে ভগবানের তামসী নামে বিখ্যাতা এক কলা আছে। তাহার নাম অনন্ত। 'সঙ্কর্ষণ-মিত্যাচক্ষতে' তাহার আর এক নাম 'সঙ্কর্ষণ'।

"পাতালানামধশ্চাস্তে বিষ্ণোর্যা তামসী তনুঃ"॥ (বিঃ পুঃ ২।৫।১৩)।

পাতালের অধোদেশে বিষ্ণুর এক তামসী মূর্ত্তি আছে।

'শেষাখ্যা যদ্‌গুণান্ বক্তুং নশক্তা দৈত্যদানবাঃ॥' (ঐ)

তাঁহার নাম শেষ। পুনশ্চ "যোঽনন্তঃ" তিনিই অনন্ত নাগ। তিনি 'নীলবাসা' অর্থাৎ নীলবর্ণ।

"কল্পান্তে যস্য বক্ত্রেভ্যো বিষানলশিখোজ্জ্বলঃ।
সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রো নিষ্ক্রম্যাত্তি জগত্রয়ম্।" (ঐ ১৯)।

প্রলয়কালে তাঁহার মুখ হইতে বিষানলশিখা-সমুজ্জ্বলিত সঙ্কর্ষণাত্মক রুদ্রমূর্ত্তি অগ্নি নিষ্ক্রান্ত হইয়া ত্রিলোক গ্রাস করিয়া থাকে।

এস্থলে তাঁহার মুখ ও সেই মুখ হইতে রুদ্রমূর্ত্তির উদ্ভব ঔপচারিক ভেদ মাত্র। স্থূলত অগ্নি-প্লবনই তাৎপর্য্য। ভূগর্ভে নানাবিধ ধাতুরূপ উপাধিতে স্থিতি করায় উহা নীলবর্ণ অগ্নি। তমোগুণে প্রতিপালিত কালানল স্বরূপ। সেই অগ্নির আর এক লক্ষণ এই যে তাহার মস্তকে এই অবনীমণ্ডল অবস্থিত আছে।

"স বিভ্রচ্ছেখরীভূতমশেষং ক্ষিতিমণ্ডলম্।
আস্তে পাতালমূলস্থঃ শেষোঽশেষ সুরার্চ্চিতঃ॥" (বিঃ পুঃ ২।৫।২০)

অশেষ সুরগণ কর্ত্তৃক সমর্চ্চিত শেষমূর্ত্তি ভগবান পাতালতলে অবস্থিতি পূর্ব্বক মস্তকের শেখর স্বরূপ সমুদয় অবনীমণ্ডল ধারণ করিয়া আছেন।

"তেনেয়ং নাগবর্য্যেণ শিরসা বিধৃতা মহী।" (ঐ ২১)

সেই নাগরাজের ফণা দ্বারা এই অবনীমণ্ডল বিধৃত হইয়া আছে।

"যদা বিজৃম্ভতেঽনন্তো মদা-ঘূর্ণিত লোচনঃ।
তদা চলতি ভূরেষা সাদ্রিতোয়াব্ধি কাননা।' (ঐ ২৩)

এই অনন্ত যখন মদঘূর্ণিতলোচন হইয়া জৃম্ভা পরিত্যাগ করেন, তৎকালে পর্ব্বত, সমুদ্র ও কানন সমূহের সহিত পৃথিবী কম্পিত হইয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, প্রলয়কালে যে সঙ্কর্ষণানলে ভূমণ্ডল দগ্ধ হয় তাহা রুদ্রমূর্ত্তি, অতি ভয়ানক। তাহা সেই অনন্ত নাগাগ্নির গ্রাসরূপী। কিন্তু জলকম্প বা ভূমিকম্প কালে যে অগ্নি সাগরের তলদেশে বা ভূগর্ত্ত মধ্যে বিলোড়িত হয় বা আগ্নেয়-গিরি-বিবর ভেদ পূর্ব্বক উত্থিত হয় তাহা সেই সঙ্কর্ষণেরই জৃম্ভা স্বরূপ। অর্থাৎ তাহা স্বতন্ত্র অগ্নি নহে। ঐ সঙ্কর্ষণাগ্নিরই শাখা প্রশাখা বিশেষ; যাহা আগ্নেয় ভূধর তলস্থ গভীর বিবর সমূহে অবস্থিতি পূর্ব্বক নীলবর্ণ বা তমোময় অবয়বে অহরহ প্রজ্বলিত থাকিয়া পাতালস্থ জলকে উত্তপ্ত করত প্রভূত বাষ্প সহকারে অবনীপৃষ্ঠে উৎক্ষিপ্ত করে, এবং কখন কখন ভূধর বিদারণ, তরলধাতু পদার্থ উদ্গীরণ, উৎক্ষিপ্ত ভস্মরাশিদ্বারা গগনমণ্ডলে মেঘমালা উৎপাদন, পয়োধিকম্প ও ভূমিকম্প প্রভৃতি উৎপাত উপস্থিত করিয়া থাকে। এ সমস্তই সেই পাতালস্থ অনন্ত নাগাগ্নির ক্রিয়া। অতএব ভারতবাসীরা শাস্ত্রানুসারেই বলিয়া থাকেন যে, সেই নাগরাজ বাসুকির জৃম্ভা বা মস্তক বিলোড়ন দ্বারা ভূমিকম্প হইয়া থাকে। পৌরাণিক অর্থবাদ ও অলঙ্কার বর্জন পূর্ব্বক বুঝ, জানিতে পারিবে যে ভূমিকম্প, জলকম্প প্রভৃতি ঐ চিরপ্রতিপালিত ভূগর্ত্তস্থ অনন্ত অগ্নিরই কার্য্য। ঐ তাৎপর্য্য সংবৃত রাখিয়া উষ্ণকুণ্ড বা আগ্নেয়-জলকে নাগকূপও কহা গিয়া থাকে। ঐ অগ্নির স্থূলাংশ ধরণীর অভ্যন্তরে গভীর বিবর মধ্যে মহাব্যাপক ভাবে বাস করে এবং তাহার জ্বালাজিহ্বা সহস্র সহস্র শাখা প্রশাখা আগ্নেয় গিরি-গহ্বরে ও সাগরগর্ত্তে নির্গমন-পথ অন্বেষণ করে বলিয়া তাহাকে সহস্র-ফণা-যুক্ত অনন্ত-সর্প-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। জ্বালামুখী, বাড়বানল, সীতাকুণ্ড প্রভৃতি উষ্ণজলাশয় সমূহ সেই ভূগর্ত্তোত্থিত সহস্রমুখ নাগানলের উদ্গীরিত আগ্নেয় শাখা প্রশাখা কর্ত্তৃক উত্তপ্ত উদক-রাশিমাত্র। অতিপূর্ব্বকালে ভারতীয় জ্ঞানী লোকেরা এ সকল গভীর ভূতত্ত্ববিদ্যা অবগত ছিলেন। শাস্ত্রের বচন এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানের ব্যবহৃত শব্দ সমূহ দ্বারা তাহা উত্তমরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। তৎসমস্ত সহজ কথায় লিখিত থাকিলে এখন এত সন্দেহ জন্মিত না। কিন্তু পূর্ব্বকালে বিচার শাস্ত্র সমূহ ব্যতীত সহজ লেখার গৌরব ছিলনা। এখনও ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত-দিগের মধ্যে সহজ-বর্ণনার যশ নাই তাহা অনেকে জানেন। এই কারণে ঋষিরা পুরাণশাস্ত্রে অত অলঙ্কার, রূপক ও অর্থবাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

এস্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, উক্ত সঙ্কর্ষণাগ্নিকে "অনন্ত নাগ" কহিয়া কেন আবার "শেষ নাগ" কহিয়াছেন ; বরং "অশেষ নাগ" বলিলেই অনন্তের অর্থ-বোধক হইত ? এই কথার উত্তর এই যে নৈমিত্তিক-প্রলয়কালে ঐ অগ্নি সমস্ত দাহন ও জলপ্লাবন পূর্ব্বক পৃথিবীর তমোবীজ স্বরূপে অবশিষ্ট থাকে। তাহাতেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, তখন ব্রহ্মা সেই অবশিষ্ট বীজকে আশ্রয় পূর্ব্বক শয়ন করেন।

"একার্ণবে ততস্তস্মিন্ শেষশয্যাস্থিতঃ প্রভুঃ।
ব্রহ্মরূপধরঃ শেতে ভগবানাদিকৃদ্ধরিঃ।"

তখন আদিদেব ভগবান হরি ব্রহ্মার রূপ ধারণ পূর্ব্বক একার্ণবে ঐ শেষ শয্যায় শয়ন করেন। সেই সময়ে তিনি একার্ণবে ভাসমান থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম নারায়ণ হয়। কুল্লূকভট্ট মনুসংহিতার "আপোনারা" প্রভৃতি শ্লোকের টীকায় ঐ অর্থকে এইরূপে স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন।

"'আপোঽস্য পরমাত্মনো ব্রহ্মরূপেণাবস্থিতস্য পূর্ব্বময়নমাশ্রয়ইত্যসৌ-নারায়ণ ইতি।'" (মনু ১।১০)

প্রলয়কালীন জলরাশি ব্রহ্মরূপে অবস্থিত পরমাত্মার অয়ন অর্থাৎ স্থান হয়, এই জন্য তিনি নারায়ণ শব্দে কথিত হইয়াছেন। তথাচ কৌর্ম্মে "দ্বিতীয়া কালসংজ্ঞান্যা তামসী শেষ সংজ্ঞিতা"। (৪৮অঃ)

অর্থাৎ উপরি উক্ত শেষমূর্ত্তিটি ভগবানের কালরূপা তামসী-শক্তি। তাহা ঐশীশক্তির তমঃপ্রভাব। তাহা প্রলয়কালে অগ্নি ও অগ্নিজ উদকপ্লাবনদ্বারা সমস্ত সংহার পূর্ব্বক নিদ্রাগত ব্রহ্মার প্রলয়-পয়োধি-বক্ষে শয্যারূপ হইয়া থাকে। তখনও ঐ শেষসংজ্ঞিত নাগের তমোময় রূপের অন্তর্ধান হয় না। অতএব তাহা তখন সর্পরূপে থাকে বলিয়া কথিত হয়। ফলে পৃথিব্যাদি সুব্যক্ত পদার্থের অভাব বশত তখন তাহার কালানল ও মহাবিষ নিস্তেজ হইয়া যায়। অন্যান্য জলবাসী সর্প যেরূপ নির্ব্বিষ হয়, তখন ঐ সংহারানল জলবাসী হওয়াতে তাহারও আর বিষ থাকে না। কেবল সৃষ্টির শেষাংশ রূপে, ভাবি সৃষ্টির বীজরূপে, ভাবিধরণীর ধারণ-শক্তিরূপে এবং ভাবি-প্রলয়ের গুপ্তবীজরূপে অবস্থিতি করে।

এতাবতা সঙ্কর্ষণাগ্নির কয়েকটি অবয়ব প্রদর্শিত হইল। প্রলোভন, কর্ষণ, ভূধারণ, ভূতলোন্নয়ন, ভূতলদ্রবীকরণ, প্রলয়সাধন, অনন্তশক্তিত্ব ও শেষ

বীজস্ব এই সমস্ত উহার মূর্ত্তি। এই সমস্ত মূর্ত্তিতেই উহা হয় সর্প, না হয় অগ্নির স্বভাব প্রকাশ করে। প্রলোভন-মূর্ত্তিতে উহা যেন খলসর্প। কর্ষণে উহা অগ্নি। ভূমণ্ডল-ধারণে উহা যেন অনন্ততেজঃশক্তি। অর্থাৎ বিনা আধারে ভূমণ্ডল যে আকাশে স্থিতি করে তাহার শক্তি ভূমণ্ডলের অভ্যন্তরেই আছে। ঐ অগ্নিই সেই শক্তি। অতঃপর উহাই ভূপৃষ্ঠকে নিম্নদেশে প্রোথিত হইতে না দিয়া কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় সদা উত্তোলিত করিয়া রাখিয়াছে এবং উহার সুশীতল ঘনীভূত কঠিন বহিঃস্তরকে ধারণ করিতেছে। প্রলয় সম্বন্ধে উহা অগ্নি ও সংহার-বিষরূপী এবং প্রলয়পয়োধিতে উহা শেষ তামসবীজ।

অপরঞ্চ, অনুমান হয় পূর্ব্বকালে জ্যোতিষের কোনরূপ গণনা-সূত্রে সঙ্কর্ষণাগ্নিদ্বারা সামান্য সামান্য শুভাশুভ সংঘটনের কাল এবং প্রলয়-ঘটনের কাল নির্ণীত হইত। পক্ষান্তরে উক্ত অগ্নির উৎপাত সকল দেখিয়া জ্যোতিষ্কগণের শুভাশুভ ফলজনকত্ব নিরূপিত হইত। এক্ষণে সে বিদ্যা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উক্ত আছে,

"যমারাধ্যপুরাণর্ষি গর্গোজ্যোতীংষিতত্ত্বতঃ।
জ্ঞাতবান্ সকলঞ্চৈব নিমিত্তপঠিতং ফলং।" বিঃ পুঃ ২।৫।২৬

পুরাণ মহর্ষি গর্গ সঙ্কর্ষণনাগের আরাধনা করিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রের তত্ত্ব ও ভাবিশুভাশুভফলজনক সুনিমিত্ত ও দুর্নিমিত্তাদি অবগত হইয়াছেন। এস্থলে গণিত ও ফলিত উভয় জ্যোতিষই অভিপ্রেত হইয়াছে। উল্লিখিত সুনিমিত্ত ও দুর্নিমিত্তাদির জ্ঞান যেমন গ্রহ নক্ষত্রের সঞ্চার-গণনায় লব্ধ হয়, সেইরূপ পশু পক্ষীর গতিবিধি ও রবাদি হইতেও পাওয়া যায়। মানবদেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের স্পন্দন হইতেও লাভ করা যায়। (বিঃ পুঃ উইসন কৃত ইংটীকা ২।৫)। মহর্ষিগণ সঙ্কর্ষণাগ্নির ভাব গতিক হইতে ঐ সমুদয় লাভ করিতেন ইহাই তাৎপর্য্য। পুরাণ শাস্ত্রের এই উক্তিটি অর্থবাদ বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষ তত্ত্ব অবগত না হইলে নির্য্যাস করিয়া বলা অসম্ভব।

সঙ্গীত।

সঙ্গীত স্বর্গীয় সামগ্রী। এমন সর্ব্বজনমনোমোহন সামগ্রীকে যেন পৃথিবী-জাত বলিয়া মনে স্থান দিতে ইচ্ছা হয় না। হিন্দু দেব দেবীগণ মধ্যে দেখিতে পাই দেবাদিদেব ত্রিনেত্র—সেই বলবদ্যঞ্জক নধরদেহ, সেই ঢল ঢল চক্ষু, যন্ত্র হস্তে রাগ রাগিণীর সৃষ্টি ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত শাস্ত্রের অবতারণা করিতেছেন। তাঁহার এই মূর্ত্তি ধ্যান করিলে মন ভক্তিরসে গলিয়া যায়, তিনিই যে এই প্রকাণ্ড বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কর্ত্তা একথা তখন মনেই আসে না। তখন তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তির ধারণা করিতে পারি না। আবার দেখি, শ্বেতবসন-পরিহিত, শ্বেতশ্মশ্রু বিরাজিত, শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতকলেবর, দেবর্ষি নারদ বীণা যন্ত্র সহযোগে ভূতনাথের ও ভূতভাবন, পরম-করুণা-নিধান, সর্ব্বলোক-প্রতিপালক হরির গুণ গান করিতেছেন; সেই গানে আপনি বিভোর হইয়া মাতিয়া উঠিতেছেন, পাগল ঠাকুরকে মাতাইয়া তুলিতেছেন, সর্ব্ব দেব গণকে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন;—দেবপূজার, দেব তৃপ্তি-সাধনের এমন সামগ্রী আর দ্বিতীয় নাই। আবার দেখি সর্ব্বাবয়বসম্পন্না, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী, সর্ব্বাভরণ-বিভূষিতা বিদ্যাদায়িনী বাগ্‌দেবী কমলাসনে উপবিষ্ট হইয়া বীণা হস্তে পিতৃদত্ত বিদ্যা এক মনে অভ্যাস করিতেছেন ও জগতে সেই বিদ্যা প্রচার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। পৃথিবীর অন্যত্র দেবদেবী পূজকগণের মধ্য হইতে শুনিতেছি, দেব মার্করি স্বহস্তে কচ্ছপা স্থিতে সূত্র যোজনা করিয়া বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন,সেইযন্ত্র সহযোগে গান করিয়া ওলিম্পিয়াস্থ যাবতীয় দেব দেবীকে প্রফুল্লিত করিয়া তুলিতেছেন। কি মনোহর বিদ্যা! দেবগণও ইহার জন্য ব্যস্ত; এই মোহিনী মন্ত্রে ক্রোধোন্মত্ত ব্যক্তিও শান্ত হয়, উত্থিত রক্ত-পিপাসু কৃপাণ দানবহস্ত হইতেও স্খলিত হয়।

ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎপরা—একথা যথার্থ; এ বিদ্যা দেবলোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার প্রথম শিক্ষক দেবাদিদেব। দেবরাজ ইন্দ্র হইতে পথের ভিখারী পর্য্যন্ত সঙ্গীত সকলেরই বিনোদন সামগ্রী। শুনিয়াছি, বিশ্রাম কাল উপস্থিত হইলে দেবরাজের প্রধান কাজ নন্দন কাননে সঙ্গীতা-লোচনা। ধনীর সময় ক্ষেপণের অবলম্বন সঙ্গীত। শোকাতুরের শোক দূরীকরণের শ্রেষ্ঠ সাধন সঙ্গীত। সাধারণত ভিক্ষুকের সহজ ভেক সঙ্গীত।

হৃদয়ের নিগূঢ়তম স্থানে প্রবেশ করিতে সঙ্গীত ভিন্ন আর কে সমর্থ? দুর্দ্দম হৃদয়কে এত বশ করিতে আর কে পারে? মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিবার আর কাহার ক্ষমতা আছে? রামের বনবাসে মুমূর্ষু দশরথ বিলাপ করিতেছেন; স্বামীর মৃতদেহ স্বীয় অঙ্কচ্যুত করিবেন না বলিয়া সাবিত্রী নির্দ্দয় যমরাজের নিকট সকরুণ প্রর্থনা করিতেছেন; সে প্রার্থনায় কালের কঠোর অন্তঃকরণও যেন দ্রব হয় হয় হইতেছে; —মৃতস্বামীর পুনঃসন্দর্শনের বলবতী ইচ্ছায় সাবিত্রী পাগলিনীর ন্যায় হৃদয়বিদারক রোদনধ্বনি উত্থিত করিতেছেন, সে ধ্বনি অতি উচ্চে স্বর্গে দেবতার কর্ণে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। এসকল শুনিলে বা পাঠ করিলে মনে যে কারুণ্যের উদ্রেক সকল সময়ে হয় না, একবার এতদ্বিষয়ক সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিলে মনে তাহার শতগুণ করুণা বিস্তৃত হয়; অশ্রুর দ্রুত আবেগ অসম্বরণীয় হইয়া উঠে; যেন সেই সমুদয় মানস চক্ষে প্রত্যক্ষ করি। সঙ্গীত হইতে মনে যে ধারণা জন্মে তাহা অমূলক হইলেও যেন দুরপনেয়।

প্রাচীন ভারতে এই মনোহর বিদ্যার যত আলোচনা ছিল, এত অন্য কোথাও ছিল কি না সন্দেহ একখানি সমগ্রবেদ কেবল গীত ও স্তোত্রে পূর্ণ। পূর্ব্বে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য; পুরাণ, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র তাদৃশ সুলভ ছিল না। ক্ষমতা থাকিলেও দুষ্প্রাপ্য বশত সকলে সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেন না। সেই অভাব মোচন করিবার জন্যই সেই সময় হইতে এতদ্দেশে কথকতার প্রচলন হয়। সোৎসুক শ্রোতৃমণ্ডলী মধ্যে কথক আসীন হইয়া, রামায়ণ, মহাভারতের অপূর্ব্ব কাহিনী, ভাগবতের রমণীয় উপদেশ, পুরাণের সুশিক্ষাপূর্ণ মনোরম ইতিবৃত্ত শ্রবণ করাইতেন। তখন লোকে কথকের সেই বিশুদ্ধ তান-লয়-যুক্ত বক্তৃতা শুনিয়া রামায়ণ মহাভারতের যাবতীয় বিবরণ শিখিত —বক্তৃতার সহিত সঙ্গীতের ভাগ অধিক থাকাতে কথকের কথা সহজেই লোকের হৃদয়গ্রাহিনী হইত। তখন সাধারণত লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, বাড়ীতে কথা দিলে বড় পুণ্য হয়; এখনকার পাশ্চাত্য-রুচি মিশ্রিত মার্জ্জিত বুদ্ধিতে যাহাই আসুক কিন্তু আমাদিগের মতে বাড়ীতে কথা দেওয়া যে সৎকর্ম্ম তাহার সন্দেহ নাই। আপনার ব্যয়ে ও অনুগ্রহে যদি আর পাঁচ জন দুদণ্ড সদুপদেশ পায় ও অন্য রকমে একটু বিশুদ্ধমন হইতে পারে, তবে তেমন

কাজ, পুণ্য কর্ম্ম নয়ত কি?—আজ কাল মুদ্রাযন্ত্রের অনুগ্রহে লোকের সে পুণ্য সঞ্চয় করিবার পথ রুদ্ধ হইয়াছে। এখন পুস্তক অতি সুলভ ও পূর্ব্বাপেক্ষা এমন অধিক সংখ্যক লোকে পুস্তকের সহিত পরিচিত হইতেছে ও হইতে চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং কথকের মুখে বক্তৃতা শুনিয়া মহাকাব্য শিখিবার প্রয়োজন বোধ হয় না। সেই জন্য এখন কথকও তেমন নাই, তেমন মধুর সঙ্গীতও এখন শুনিতে পাই না। তখন সাধারণ লোকে কবি হইত—মুখে মুখে গান বাঁধিত, মুখে ছড়া কাটাইত, দুই দল একত্র হইলে কবির লড়াই হইত। লোকে শুনিয়া শিখিত—আর এক জনকে শুনাইয়া শিখাইত এইরূপে সঙ্গীতের প্রচারও অধিকছিল। তখনকার লোকে অধিক সঙ্গীতপ্রিয়ও ছিল, এখন সঙ্গীতানুরাগী লোক অতি অল্প। এখন কথকতার প্রথাও উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়—কবিরও লড়াই আর শুনিতে পাই না। মুদ্রাযন্ত্র! তোমাকে শত ধন্যবাদ। তুমি দেশে আসিয়া অনেক কাজ করিয়াছ—বালকের হাতের তালপাতা কাড়িয়া তাহার স্থলে "সচিত্র বর্ণমালা" দিয়াছ, অধ্যাপকের তুলটে লেখা কাঠে বাঁধা পুথিখানি লইয়া সুযন্ত্রে যন্ত্রিত "সটীক সিদ্ধান্তকৌমুদী" খানি তাহার স্থলে বসাইয়াছ। মুদী মহাশয়ের একহস্তে তুলাদণ্ড অন্যহস্তে বৃহদাকার রামায়ণ দিয়াছ—দশকর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণকে তালপাতার পুথি বহন ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ করিয়া তাঁহাকে "ব্রতমালা" লইতে বাধ্য করিয়াছ—বিশেষ উপকার করিয়াছ সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের অমন সদ্বক্তা সুকণ্ঠ কথক ও গায়ক গুলিকে দেশছাড়া করিবার চেষ্টায় আছ কেন?

কথকতা ব্যতীত যাত্রা প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ উপায়েও সঙ্গীতের বহুল চর্চ্চা হইত ও তাহা হইতে আমাদের অনেক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ও নৈতিক উপদেশ লাভ হইত। এক্ষণে যাত্রার প্রণালীও ভিন্ন প্রকার হইয়াছে। আধুনিক মার্জ্জিত রুচির যাত্রাতে গীত অপেক্ষা অভিনয়ের ভাগ অধিক—তন্মধ্যে অধিকাংশ অভিনয়ই অতি জঘন্যরূপে সম্পাদিত হয় বলিতে হইবে। কথায় কথায় বীর রসের অবতারণা—যাঁহার সমগ্র অভিনয় অভিনয়াংশ করুণরসে পরিপূর্ণ তিনিও যেন মাঝে মাঝে বীর রসের মূর্ত্তি দেখাইতে পারিলে স্বয়ং পরম পরিতোষ লাভ করিবেন এবং শ্রোতাগণও বিশেষ প্রীত হইবেন বলিয়া বোধ করেন। পূর্ব্বে যে সমুদয় লোক যাত্রার ব্যবসায় করিতেন তাঁহাদের অধিকাংশ সঙ্গীত পারগ ছিলেন। এক্ষণকার দুই একজন ব্যতীত অধিকাংশ যাত্রাকর সঙ্গীতে তাদৃশ পটু নহেন।

পাঁচালীতে সঙ্গীত ও কবিতা উভয়েরই আলোচনা হয়; আধুনিক পাঁচালীরও তেমন গৌরব নাই। এখন যাঁহারা পাঁচালীর গায়ক আছেন, তাঁহাদের নিজের ক্ষমতা অতি সামান্য—তাঁহারা হরুঠাকুর ও দাশরথীর চর্ব্বিত চর্ব্বনে বিশেষ পটু।

প্রাচীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতের সঙ্গীতালোচনার তুলনা করিলে বোধ হয় পূর্ব্বে যাহা ছিল এক্ষণে তাহার চতুর্থাংশ আছে কি না সন্দেহ। শুদ্ধ যে আলোচনার অল্পতা হইয়াছে এমন নহে, অনেক রাগ রাগিণীর স্থর, লয় ও তাল প্রভৃতিরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সঙ্গীতের ক্ষমতা অতি চমৎকার—রাগ রাগিণীর প্রকৃত স্বর মিলন হইলে মনুষ্যের মনের অবস্থা প্রতি রাগিণীতে বিভিন্নরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। দীপক রাগে আগুন জ্বলে, মল্লারে বৃষ্টি হয় একথা বড় উড়াইয়া দিবার কথা নয়—যথার্থ স্বরে দীপক গীত হইলে কি শ্রোতা কি গায়ক উভয়েরই শরীর ও মন অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া উঠে, মল্লারে শরীর শীতল হয়, প্রকৃতি স্তব্ধ হয়। আজি কালি এই সকল রাগের স্বরে কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে সেজন্য স্বরের বিবিধ ভাবোদ্দীপক ক্ষমতারও হ্রাস হইয়াছে। বেহাগ রাগিণীর স্বরে মনে এক অপূর্ব্ব ঔদাস্য আসিবে—কোথায় আছি, কি অবস্থায় আছি, কি করিতেছি জ্ঞান থাকিবে না—সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি জন্মিবে—সেইজন্য দিবস বেহাগ গাইবার সময় নয়, উহা নিশিথে, নিভৃতে গাইতে হয়। কিন্তু এখন বোধ হয় সেই বেহাগের কি একটু সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যাহাতে এখন বেহাগ শুনিলে লোকের মনে সে উন্নত ঔদাস্য, সে গভীর আত্মবিস্মৃতি টুকু আসে না, তৎপরিবর্ত্তে একটু যেন বিলাসিতার ছায়া উপস্থিত হয়। টোড়ী রাগিণীর প্রকৃত স্বরে গীত শ্রবণ করিলে মনে যেন দুঃখের স্রোত বহিতে থাকিবে—ঘোর নৈরাশ্য আসিবে—কিন্তু এখন টোড়ী শুনিলে যেন অনেক সময় মনে স্ফূর্ত্তি পাইতে হয়। বেহাগের সে ঔদাস্য, টোড়ীর সে নৈরাশ্য আর আসে না, তৎপরিবর্ত্তে সু হউক বা কু হইক একটা অন্য রকম ভাব আসে। সেইজন্য বার বার এক কথা বলিতেছি, সঙ্গীতের আলোচনা না থাকিলে অনেক প্রকারে অবনতি।

সঙ্গীতের অবস্থা এরূপ দিন দিন অবনত হইবার কয়েকটি কারণ দেখা যায়। প্রথমত অধীনতার দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর বন্ধন। মনের স্ফূর্ত্তি নাই—আনন্দের বিকাশ হয় না—অন্তরের ভাব প্রকাশ্যে জানাইতে পারি

না। দ্বিতীয়ত শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ বলের অভাব। সঙ্গীত শাস্ত্র সমুদ্র বিশেষ, সে সমুদ্রে সাঁতার দিতে ধৈর্য্য চাই—বুকের বল চাই—আবার শরীরের দৃঢ়তা থাকা অত্যাবশ্যক। ফুস্ফুস্ ও হৃৎপিণ্ড বিলক্ষণ সবল ও কার্য্যক্ষম না হইলে লোকে গায়ক হইতে পারে না। যাহার মন দুর্ব্বল শরীরও দুর্ব্বল সে ব্যক্তি সঙ্গীত শিখিতে পারে না। এখনকার লোক উভয়তই দুর্ব্বল—তাহাদের ধৈর্য্য নাই, বুকের পাটা নাই। তৃতীয়ত সংক্রামক পীড়া। হয় নিজে পীড়িত, না হয় পরিবারভুক্ত কেহ না কেহ অসুস্থ—মন স্ফূর্ত্তি হীন, সঙ্গীতে মন যায় না। চতুর্থত অভাবের আধিক্য। পূর্ব্বে যেখানে সামান্য ব্যয়ে অভাব মিটিত। এখন সেখানে সেই সামান্যের স্থলে গুরুতর ব্যয় করিলেও সে অভাব মোচন হয় না; সেই জন্য লোককে আপন সাংসারিক অভাব মোচনের চেষ্টায় অধিকতর সময় নিয়োগ করিতে হয়। অন্য কোন কাজ করিবার তত সময়ও কুলায় না প্রবৃত্তিও জুটে না। পঞ্চমত রুচি পরিবর্ত্তন। দেশে বৈদেশিক রাজার একাধিপত্য হইয়া রাজার নিজের আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা অনেক সময় দেখা যায়। বিশেষত রাজার জাতির অনুকরণ সাধারণত অনেকে একটু গৌরবের বিষয় বলিয়া বোধ করেন। মনুষ্যের রুচির পরিবর্ত্তনে সকল বিষয়েই সম্যক পরিবর্ত্তন ঘটে।

আমরা সঙ্গীতের মর্ম্ম খুব অবগত আছি। ইহার সুফল আস্বাদনে আমরা বেশ পটু, কিন্তু আমাদেরই দেশে যে সঙ্গীতের অবনতি হইয়াছে ইহাই আক্ষেপের বিষয়। সঙ্গীতের উন্নতি হইলে দেশের একটি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের উন্নতি হইল বলিতে হইবে।

যত প্রাচীন কালের বিষয় আলোচনা করা যায় ততই সঙ্গীতের বহুলালোচনার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন রাজার মহিষী পর্য্যন্ত রীতিমত সঙ্গীত বিদ্যা অভ্যাস করিতেন—সেটি রাজগণের পরম প্রীতির বিষয় ছিল। ইন্দুমতীর মৃত্যুতে রাজা অজ তাঁহার সকল গুণের কথাগুলি একটি একটি করিয়া মনে ভাবিয়া বিলাপ করিতেছেন—তাহার মধ্যে তাঁহার প্রিয়তমার সঙ্গীত নিপুণতার কথা তিনি ভুলেন নাই, তাঁহার এমন সঙ্গীত পারগা প্রিয়তমা যে অঙ্কচ্যুতা হইল ইহাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কষ্টকর।

"গৃহিনী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণা বিমুখেন মৃত্যুনা
হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্॥" কালিদাস।

প্রাচীন কালের সুসভ্য দেশ মাত্রেই সঙ্গীতের বিশেষ আদর ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীসে মহাকাব্য সমূহ ও অপরাপর যাবতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নগরীর প্রত্যেক রাজপথে গীত হইত, সে সময়ে লিখন প্রণালীর প্রচলন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই; লোকে শুনিয়া ইতিহাস শিখিত, কাব্য শিখিত, বৃদ্ধ বয়সে আপন বালক বালিকাদিগকে তাহাই শিখাইয়া যাইত, সঙ্গীত হইতে তাহারা পুরুষানুক্রমে আবশ্যকীয় সকলই শিখিত। রাজ সভায় এক একজন বিখ্যাত ও শিক্ষিত গায়ক থাকিতেন। কোন সাধারণ পর্ব্বাহে অথবা রাজকীয় উৎসব সময়ে সমাগত ও অভ্যাগত লোক দিগকে তিনি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, নৈতিক বা সামাজিক ঘটনা সমূহ অবলম্বন করত সঙ্গীতের রসাস্বাদ অনুভব করাইতেন। প্রাচীন গ্রীসের এই রীতির সহিত আমাদিগের কথকতার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক গ্রীস অধিনতার কঠোর যন্ত্রনায় তাহার প্রাচীন কবিগণের সে মনোহর সঙ্গীত ভুলিয়া গিয়াছে।

সঙ্গীতের মাহাত্ম্য কে না বুঝে? দক্ষিণ আমেরিকার বনবাসী, উলঙ্গ; অসভ্য, পশুবৎ জাতি হইতে ইউরোপের অতি সুসভ্য জাতি পর্য্যন্ত সকলেই সঙ্গীতের মর্ম্ম অবগত। অসভ্যের কঠোর মনে মৃগয়া-ক্লিষ্টদেহে শান্তি দিবার জন্য পর্ব্বত গুহায়, নিভৃত অরণ্যেও সঙ্গীতের আবির্ভাব। সুসভ্যের রাজনীতি পর্য্যালোচনায় ব্যতিব্যস্ত, ন্যায়ের সূক্ষ্ম মীমাংসায় প্রপীড়িত অন্তঃকরণকে কিয়ৎ কালের নিমিত্ত আনন্দ অনুভব করাইবার জন্য সযত্নে নির্ম্মিত, কারুকার্য্যমণ্ডিত, বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত রম্য হর্ম্মেও সঙ্গীতের অবির্ভাব। এ দ্রব্যের আদর সর্ব্বত্র। ইউরোপের যাবতীয় স্বাধীন দেশে সঙ্গীতের বিশেষ চর্চ্চা আছে। আমাদিগের দেশে অনেকের মতে সঙ্গীত যেন বিলাসিতার একটি অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। এমন স্বর্গীয় সামগ্রী যে বিলাসী ও অলসের ক্রীড়া সামগ্রী হইবে ইহার অপেক্ষা দুঃখজনক আর কি হইতে পারে?

সিংহলযাত্রা।

১২৯০। ১৫ই ফাল্গুন—অদ্য জাহাজ হইতে রাবণকোট দেখিলাম। সিংহলে কিম্বদন্তী আছে যে রাবণ কোট রাবণের পুরী ছিল (১)।

"দৃষ্ট্বা দাশরথির্লঙ্কাং চিত্রধ্বজ পতাকিনম্।
জগাম মনসা সীতাং দূয়মানেন চেতসা॥
অত্র সা মৃগশাবাক্ষী রাবণেনোপরুদ্ধতে।
অভিভূতা গ্রহেণেব লোহিতাঙ্গেন রোহিণী॥
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য সমুদ্বীক্ষ্য চ লক্ষ্মণম্।
উবাচ বচনং বীরস্তৎকাল হিতমাত্মনঃ॥
আলিখন্তীমিবাকাশমুত্থিতাং পশ্য লক্ষণ।
মনসেব কৃতাং লঙ্কাং নগাগ্রে বিশ্বকর্ম্মণা॥
বিমানৈর্ব্বহুভির্লঙ্কা সঙ্কীর্ণা রচিতা পুরা।
বিষ্ণোঃপদমিবাকাশং চ্ছাদিতং পাণ্ডুভির্ঘনৈঃ॥
পুষ্পিতৈঃ শোভিতা লঙ্কা বনৈশ্চিত্র রথোপমৈঃ।
নানা পতগসংঘুষ্ট ফলপুষ্পোপগৈঃ শুভৈঃ॥
পশ্য মত্তবিহঙ্গানি প্রলীন ভ্রমরাণি চ।
কোকিলা কুল খণ্ডানি দোধবীতি শিবোঽনিলঃ॥

রামায়ণম্, যুদ্ধকাণ্ডম্, ২৪ সর্গঃ।

পূর্ব্বোক্ত কিম্বদন্তী সমূল হইলে, লঙ্কা পুরীর পতাকামণ্ডিত অভ্রভেদী প্রাসাদ রাবণকোটের সাগর—জলমগ্ন শিলায় পরিণত হইয়াছে; কোকিল কূজিত পুষ্পকানন মকর অম্বুকিরাতাদি হিংস্র জলচরের আবাস ভূমি হইয়াছে। লঙ্কার ভগ্নাবশেষ যেমন মর্ত্ত্য বস্তুর অনিত্যতার প্রমাণ দিতেছে,

---

(1) According to tradition the strong-hold of Ravand (Ravan-cotte), so long besieged, so valiantly defended, was the Great Basses off Kirinda in the Hambantota district. Ceylon Directory, 1880—81, Page 11.

এমন আর কিছুই নাই। গৌড় শার্দূলভূমি হইয়াছে বটে; কিন্তু গৌড়ে বারদ্বারী সোণা মসজিদাদি কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে; দিল্লীর নিকটে ইন্দ্রপ্রস্থের চিহ্ন এখনও আছে। কাণ্যকুব্জ ব্যতীত ভারতবর্ষের কোন প্রাচীন নগরী লঙ্কা পুরীর ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হয় নাই। রাবণকোটের প্রধান দুইটি শিলাখণ্ডে দুইটি নাবিক-সহায় দীপগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে (২)। সুতরাং কবিরা বলিতে পারেন যে রাবণের চিতানল এখনও জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। মহর্ষি বাল্মীকির লিখিত চিহ্ন সমুদয়ের মধ্যে এক চিহ্ন মাত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাবণকোটে পাণ্ডুবর্ণ মেঘের অভাব নাই। লঙ্কাপুরী লঙ্কাদ্বীপের কোন্ অংশে ছিল, মহর্ষি তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখেন নাই; কিন্তু যুদ্ধকাণ্ডের ২৩ ও ২৪ সর্গ পাঠ করিয়া আপাতত বোধ হয় যে উক্ত পুরী দ্বীপের উত্তর ভাগে অবস্থিত ছিল। কিম্বদন্তী মৌলিক হইলে লঙ্কাপুরী দ্বীপের পূর্ব্বভাগে কিরিণ্ডা জনপদের নিকট ত্রিঙ্কোমালী হইতে অনতিদূরে ছিল এবং তাহার বিস্তার প্রায় ১২ ক্রোশ ছিল। রাবণকোট যে রাবণের পুরী ছিল ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদী সম্মত। কিন্তু সিংহলের তামিলদিগের "অশোকবনম্" নামে যে তীর্থ আছে, তাহা রাবণকোট হইতে কিয়দ্দূরে। তামিলদিগের এ বিষয়ে ভ্রম আছে; কারণ বাল্মীকি স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—

"অত্র [লঙ্কাপুর্য্যাম্] সা মৃগশাবাক্ষী [সীতা] রাবণেনোপরুদ্ধতে"

সুতরাং বারণকোটের মধ্যেই অশোকবন ছিল। জাফ্না বা উত্তর সিংহলের ইতিহাসে (৩) লিখিত আছে যে কলিযুগের প্রারম্ভে বিভীষণ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, এবং তৎকালে রাক্ষসগণ লঙ্কা ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়াছিল। সিংহলের ইতিহাস মহাবংশ গ্রন্থে রাক্ষসাধিকারের উল্লেখ নাই। ঐ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে, যে জিন অর্থাৎ শাক্যমুনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির নবম মাসে পৌষী পূর্ণিমায় লঙ্কাদ্বীপকে পবিত্র করিবার জন্য যক্ষপূর্ণ ও যক্ষনিবেশিত লঙ্কাদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন।

"বোধিতো নবমে মাসে পুস্সপুন্নিমায়াং জিনো লঙ্কাদীপাং বিসোধেতুম্

(2) The Light-houses on the great Bass and little Bass Rocks.

(3) Yalpana-vaipavamalai or the History of Jaffna translated by C. Brito., (Colomlo, 1879) P. 1

লঙ্কাদীপামুপাগমী। যকৃখ পুন্নায়া লঙ্কায়া, যকৃখা তিব বাসিয়াতি চ (৪)।"

(মহাবংশ, টর্ণুরের সংস্করণ ২য় পৃষ্ঠা)

মহাবংশের সপ্তম অধ্যায়ে যক্ষগণ কামরূপী ও নরমাংসাশী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং কথিত আছে যে যক্ষরাজ কন্যা কুবেণীর পরিচারিকা কালী যক্ষিণী কুক্কুরীরূপে বিজয়বাহুকে ছলিতে গিয়াছিল। প্রসিদ্ধ কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, যক্ষাধিকারের উল্লেখ করিয়াছেনঃ——

"সেতুবন্ধ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
ত্বরা করি চলিলেন বহিত্র বাহিয়া॥
চিত্রকূট পর্ব্বত যথা যক্ষরাজার দেশ।
সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিল প্রবেশ॥
মোহানাতে সীতা কূলি প্রবেশে হাড় খান।
তেয়াগ করিয়া গেল লঙ্কার মোহান॥
অলঙ্ঘ্য সাগরে রহিতে নাহি স্থল।
পথিকে জিজ্ঞাসে কত দূরেতে সিংহল॥"

সেতু বন্ধ পশ্চিম দিকে রাখিয়া বাহির সমুদ্রে নৌকা চালাইতে হয়, একথা যখন কবিকঙ্কণ জানিতেন, তখন তাঁহার ভূগোলে অধিকার নিতান্ত সামান্য ছিল এমন বোধ হয় না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মান্দ্রাজ ছাড়িয়া জাহাজ দক্ষিণের ঈষৎ (১৫ অংশ) পূর্ব্বে চলে। প্রায় ২৮ ঘণ্টা এইরূপ চলিলে সিংহলের উত্তরাংশের পর্ব্বতগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ করি ইহাদের মধ্যে কোন পর্ব্বত কবিকঙ্কণের যক্ষাধিকৃত চিত্রকূট হইবে। কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন লঙ্কার মোহানা ছাড়াইয়া সিংহল পট্টনে যাইতে হয়। ইহাতে অনুমান হয় যে বর্ত্তমান পইণ্ট ডি গাল নগর যে স্থলে, সে স্থল হইতে অনতিদূরে সিংহল পট্টন ছিল। সিংহল পট্টন যেথানেই হউক, সিংহলদ্বীপ দেখিয়া কোন্ বাঙ্গালীর মনে কবিকঙ্কণের মানস-সরসী-সম্ভূতা কমলে-কামিনীর মূর্ত্তি আবির্ভূতা না হয়? রাবণকোট লঙ্কাপুরীর ভগ্নাবশেষ হউক বা নাই হউক, তাহা দেখিয়া কোন্ হিন্দুর স্মৃতিপথে সেই সত্যব্রত, জিতেন্দ্রিয়, বীর চূড়ামণি ও ধার্ম্মিক চূড়ামণি রাবণারি আরূঢ় না হন?

(৪) পাঠকের স্মরণ থাকা কর্ত্তব্য যে পালিভাষায় রেফ নাই, দন্ত্য ভিন্ন সকার নাই, ব ফলা নাই, য ফলা নাই, ক্ষকার নাই।

কাহার মনেই বা সেই নারীকুল-শ্রেষ্ঠা জন্ম-দুঃখিনী জনক-নন্দিনী অধিষ্ঠিতা না হন? আবার মনে হয়, আমাদের পাপমুখে সেই পবিত্র রাম নাম উচ্চারণের অধিকার কি আছে? আমরা কলি যুগের দোহাই দিয়া ধর্ম্মাধিকরণে মিথ্যা কথন ও প্রবঞ্চনা দ্বারা প্রত্যহ সত্যের যেরূপ অবমাননা করিয়া থাকি, তাহাতে আমাদের সত্যব্রত রামের নাম না লওয়াই ভাল। অন্যান্য পাপের সহিত আবার ভণ্ডামি কেন? আমরা অন্য লোককে ভণ্ড বলি, কিন্তু আমাদের ন্যায় ভণ্ড জগতে অতি বিরল। যদি আমাদের রামভক্তি মৌখিক না হইয়া হৃদয়গত হইত, তাহা হইলে কি সেই বীরেন্দ্রের পৌরুষ কিছুমাত্র আমাদের মনোগত হইত না? তাহা হইলে কি ১৭ জন মুসলমান অশ্বারোহী বঙ্গাধিকার করিতে পারিত? তাহা হইলে কি সেই সত্য কিঙ্করের সত্যানুরাগ কিছুমাত্র আমাদের মনে প্রবিষ্ট হইত না? তাহা হইলে কি আমাদের আদালতে এত মিথ্যার ছড়াছড়ি হইত?

১৬ই ফাল্গুন— বঙ্গের একজন রাজা রমেচন্দ্রের ন্যায় লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন, এমন কথা মনে করিতে পারিলে আমরা লক্ষ্মণ্য সেনের কাপুরুষতা ভুলিতে পারি এবং আমাদের আত্মাদরের বৃদ্ধি হয়। অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর বিশ্বাস এই যে সিংহল-জেতা বিজয় বাহু বাঙ্গালী ছিলেন। কিন্তু এই বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক। বিজয় বাহুর পিতা সিংহ বাহু মগধের অন্তর্গত লাল নামক বন্য প্রদেশের রাজা ছিলেন। লাল-প্রদেশের রাজধানী সিংহপুরে বিজয়ের জন্ম হয়। সিংহবাহু বঙ্গ-রাজের দৌহিত্র ছিলেন; তাঁহার মাতামহী কলিঙ্গ রাজের কন্যা ছিলেন। বিজয়ের পিতামহী স্বরূপা দেবীকে বাঙ্গালী কন্যা বলিলে বলা যাইতে পারে; কারণ স্বরূপার পিতা বঙ্গের রাজা ছিলেন। তবে কি না বঙ্গরাজ আপনাকে বাঙ্গালী বলিয়া জানিতেন কিনা সন্দেহ। এক্ষণে যে ক্ষত্রিয় মহাশয়রা বঙ্গে ১৪ পুরুষ বাস করিতেছেন, তাঁহারাও বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দেন না। বঙ্গরাজের কন্যার পৌত্র বিজয়কে বাঙ্গালীরা স্বজাতীয় করিয়া লইতে চাহেন লউন। সত্যানুরোধে আমি তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মানিতে পারিলাম না; মানিতে পারিলে বাঙ্গালীদের গৌরবের কথা বটে। লাল প্রদেশ কোথায় তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। আমরা এক্ষণে যাহাকে ছোটনাগপুর বিভাগ বলি, তাহার কতকাংশ মগধের অন্তর্গত ছিল। আমার অনুমান হয় বর্ত্তমান সিংহভূম পূর্ব্বে লাল প্রদেশ নামে অভিহিত ছিল। বিজয়বাহু যৌবনাবস্থায় অতিশয়

উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন; এজন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্বরাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। রাজকুমার সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতেন বটে; কিন্তু বীরপুরুষের সমস্ত লক্ষণ তাঁহাতে ছিল। তিনি আপনার ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল অথচ সাহসী ৭০০ লোক লইয়া লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে লঙ্কাই যক্ষরাজের পুরী ছিল। যে স্থলে তরণী হইতে বিজয়বাহু অবতীর্ণ হইলেন, সে স্থলের মৃত্তিকা রাণীগঞ্জের মৃত্তিকার ন্যায় তাম্র বর্ণ। বিজয় ও তাঁহার অনুচরবর্গ সমুদ্র যাত্রার ক্লেশে এমন দুর্ব্বল হইয়াছিলেন, যে তাঁহাদের দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না; তাঁহাদের হস্ত পদ যুগপৎ সেই তাম্রবর্ণ ভূমিতে পড়িল। তাম্রবর্ণ মৃত্তিকা হাতে লাগায় তাঁহাদের নাম তাম্রপাণি হইল। কিয়ৎকাল পরে বিজয় যক্ষদিগকে ধ্বংস করিয়া লঙ্কেশ্বর হইলেন; কিন্তু যক্ষরাজ ধানী লঙ্কাপুরী ত্যাগ করিয়া তিনি আপন অবতরণ স্থলের কাননে 'তাম্রপর্ণী' নাম্নী রাজধানী নির্ম্মাণ করিলেন। ক্রমে সমস্ত দ্বীপের নাম তাম্রপর্ণী হইল। বিজয়বাহুর পিতা সিংহবাহু স্বহস্তে সিংহ বধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বংশের 'সিংহল' উপাধি হইয়াছিল; সুতরাং বিজয়ের রাজ্যের নাম সিংহলরাজ্য এবং লঙ্কাদ্বীপের নাম সিংহলদ্বীপ হইল।

"দুব্বলা ভূমিয়াং হত্থপাণিয়্হি উপলিম্পিতা নিসিদিংসু ততো তেসং তাম্বপন্ন থপান্নিয়ো। তেন তাং কারণে নেব কাননাং তাম্বপাণ্ণীতি লঙ্কাভিধেয়াং তেনেব লক্‌খিতাং দীপামুত্তমাং। সিংহবাহু নরিন্দো সো সেন সিংহং সমাগ্‌গহি, তেন তস্মৎ রজানত্তা সিংহলাতি পবুচ্চরে। সিংহলেন অয়ং লঙ্কা গহিতা তেন বাসিনা তেনেব সিংহলং নাম সন্নিতং সিংহলং স্নুন্না।"—মহাবংশ, ৭ম অধ্যায়।

গ্রীক ও রোমীয়রা লঙ্কাদ্বীপকে 'তাপ্রোবেনি' (Taprobane) নামে জানিতেন। বলা বাহুল্য 'তাপ্রোবেনি' তাম্রপর্ণীর অপভ্রংশ মাত্র।

উত্তর সিংহলের ইতিহাসে লিখিত আছে যে বিজয়বাহু শৈব ছিলেন; তিনি আপন রাজধানীতে চারিটি শিবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত নীলকণ্ঠ আচার্য্য নামে কাশী নগরীর একজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল; আর কোন ব্রাহ্মণ রাক্ষসের দেশে আসিতে চাহে নাই। বিজয় এজন্য অনেক বৌদ্ধ আনাইয়া তাহাদিগকে সিংহলে স্থাপন করিয়াছিলেন। (Yalpana vaipava-malai, translated by C. Brito, PP1—3)। বিজয়ের অব-

তরণ সময় হইতে সিংহলের অব্দ আরম্ভ। মগধরাজ অজাতশক্রুর রাজ্যের অষ্টাদশ বর্ষে, অর্থাৎ শাক্যমুণির নির্ব্বাণ প্রাপ্তির বর্ষে খৃষ্টীয় শকের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে এবং শকাব্দা প্রারম্ভের ৬২২ বৎসর পূর্ব্বে বিজয়বাহু লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন। বিজয় রাজা ৩৭ বৎসর অপত্য নির্বিশেষে প্রজা পালন করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন।

ভক্তি।

প্রথম কথা—মনুষ্যে ভক্তি।

শিষ্য। সুখের উপায় ধর্ম্ম। সুখ, সকল বৃত্তিগুলির সম্যক স্ফূর্ত্তি, পরিণতি, সামঞ্জস্য এবং চরিতার্থতা। বৃত্তিগুলির সম্যক স্ফূর্ত্তি, পরিণতি এবং সামঞ্জস্যে মনুষ্যত্ব। বৃত্তিগুলি, শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী, এবং চিত্তরঞ্জিনী। ইহার মধ্যে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন প্রথা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। নিকৃষ্টা কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন কি, তাহাও বুঝিয়াছি। কিন্তু অনুশীলন তত্ত্বের এ সকল ত সামান্য অংশ। অবশিষ্ট যাহা শ্রোতব্য তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। এক্ষণে, যাহাকে কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির মধ্যে সচরাচর উৎকৃষ্ট বলে, তাদৃশ চারিটি বৃত্তির কথা বলিব। বৃত্তির মধ্যে যে অর্থে উৎকর্ষ নিকর্ষ নির্দ্দেশ করা যায়, সেই অর্থে এই চারিটি বৃত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ভক্তি, প্রীতি, দয়া, এবং সত্যানুরাগ।

শিষ্য। সত্যানুরাগ কি একটা স্বতন্ত্র বৃত্তি? যে প্রীতির কথা বলিলেন সত্যের প্রতি সেই প্রীতি বলুন না?

গুরু। তুমি এখনও প্রীতিও বুঝ নাই সত্যানুরাগও বুঝ নাই। সত্যানুরাগ স্বতন্ত্র বৃত্তি কি না পরে বিচার করিব।

শিষ্য। ভক্তি, প্রীতি, দয়া, এ তিনটি কি একই বৃত্তি নহে? প্রীতি ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই সে ভক্তি হইল, এবং আর্ত্তে ন্যস্ত হইলেই তাহা দয়া হইল।

গুরু। যদি এরূপ বলিতে চাও, তাহাতে আমার এখন কোন আপত্তি নাই; কিন্তু অনুশীলন জন্য তিনটিকে পৃথক বিবেচনা করাই ভাল। বিশেষ, ঈশ্বরে ন্যস্ত যে প্রীতি সেই ভক্তি, এমন নহে। মনুষ্য—যথা রাজা, গুরু, পিতা, মাতা, স্বামী প্রভৃতিও ভক্তির পাত্র। আর ঈশ্বরে ভক্তি না হইয়াও কেবল প্রীতি জন্মিতে পারে। তাই, বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, এবং মধুর, ঈশ্বরের প্রতি এই পঞ্চবিধ অনুরাগ স্বীকার করেন। সে পাঁচটি দেখিবে, এই ভক্তি, প্রীতি, দয়া মাত্র। তবে কোন ভাবটি মিশ্র কোনটি অমিশ্র যথা,—

শান্ত (সাধারণ ভক্তের যে বার) = ভক্তি।
দাস্য (হনুমদাদির যে ভাব) = ভক্তি + দয়া।
সখ্য (শ্রীদামাদির যে ভাব) = প্রীতি।
বাৎসল্য (নন্দ যশোদা) = প্রীতি + দয়া।
মধুর (রাধা) = ভক্তি + প্রীতি + দয়া।

শিষ্য। কৃষ্ণের প্রতি রাধার যে ভাব বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা কল্পনা করেন, তাহার মধ্যে দয়া কোথায়?

গুরু। স্নেহ আছে স্বীকার কর?

শিষ্য। করি, কিন্তু স্নেহত প্রীতি।

গুরু। কেবল প্রীতি নহে। প্রীতি ও দয়ার মিশ্রণে স্নেহ। সুতরাং মধুর ভাবের ভিতর দয়াও আছে। এখন দেখিলে গোঁসাইয়েরা কত দূর উঠিয়াছেন? ভক্তি, প্রীতি, দয়া, মনুষ্য বৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই ভক্তি ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা সন্তুষ্ট হইলেন, ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কিন্তু বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা চাহেন, যে তিনটি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিই ঈশ্বর মুখী হইবে। ইহা একদিনের কাজ নহে। ক্রমে একটি একটি, দুইটি দুইটি করিয়া শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্যের পর্য্যায় ক্রমে সর্ব্বশেষে সকল গুলিই ঈশ্বরে অর্পণ করিতে শিখিতে হইবে, তখন "রাধা" (যে আরাধনা করে) হইতে পারা যায়।

কিন্তু ঈশ্বর ভক্তির কথা এখন থাক। আগে মনুষ্যে ভক্তির কথা বলা যাউক। যিনিই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাঁহার শ্রেষ্ঠতা হইতে আমরা উপকৃত হই, তিনিই ভক্তির পাত্র। ভক্তির সামাজিক প্রয়োজন এই যে,

(১) ভক্তি ভিন্ন নিকৃষ্ট, কখন উৎকৃষ্টের অনুগামী হয় না। (২) নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের অনুগামী না হইলে সমাজের ঐক্য থাকে না, বন্ধন থাকে না, উন্নতি ঘটে না।

দেখা যাউক মনুষ্য মধ্যে কে ভক্তির পাত্র। (১) পিতামাতা ভক্তির পাত্র। তাঁহারা যে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝাইতে হইবে না। গুরু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, আমাদের জ্ঞানদাতা, এজন্য তিনিও ভক্তির পাত্র। পুরোহিত, অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের নিকট আমাদের মঙ্গল কামনা করেন, সর্ব্বথা আমাদের হিতানুষ্ঠান করেন, এবং আমাদের অপেক্ষা ধর্ম্মাত্মাও পবিত্র স্বভাব, তিনিও ভক্তির পাত্র। যিনি কেবল চাল কলার জন্য পুরোহিত, তিনি ভক্তির পাত্র নহেন। স্বামী, সকল বিষয়েই স্ত্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি স্ত্রীর ভক্তির পাত্র। হিন্দু ধর্ম্মে ইহাও বলে, যে স্ত্রীও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত, কেন না, হিন্দুধর্ম্ম বলে যে স্ত্রীকে লক্ষ্মীরূপা মনে করিবে। কিন্তু এখানে হিন্দুধর্ম্মের অপেক্ষা কোমৎ ধর্ম্মের উক্তি কিছু স্পষ্ট, এবং শ্রদ্ধার যোগ্য। যেখানে স্ত্রী স্নেহে, ধর্ম্মে বা পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ সেখানে তাঁহারও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত বটে। গৃহ ধর্ম্মে ইহারা ভক্তির পাত্র; যাঁহারা ইহাদের স্থানীয়, তাঁহারাও সেইরূপ ভক্তির পাত্র। গৃহমধ্যে যাহারা নিম্নস্থ, তাহারা যদি ভক্তিরপাত্র গণকে ভক্তি না করে, যদি পিতা মাতাতে পুত্র কন্যা বা বধূ ভক্তি না করে, যদি স্বামীকে স্ত্রী ভক্তি না করে, যদি স্ত্রীকে স্বামী ঘৃণা করে, যদি শিক্ষাদাতাকে ছাত্র ঘৃণা করে, তবে সে গৃহে কিছুমাত্র উন্নতি নাই—সে গৃহ নরক বিশেষ। একথা কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না, প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। এই সকল ভক্তির পাত্রের প্রতি সমুচিত ভক্তির উদ্রেক, অনুশীলনের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দুধর্ম্মেরও সেই উদ্দেশ্য। বরং অন্যান্য ধর্ম্মের অপেক্ষা এবিষয়ের হিন্দুধর্ম্মেরই প্রাধান্য আছে। হিন্দুধর্ম্ম যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহা তদ্বিষয়ে অন্যতর প্রমাণ।

(২) এখন, বুঝিয়া দেখ, গৃহস্থ পরিবারের যে গঠন, সমাজের সেই গঠন। গৃহের কর্ত্তার ন্যায়, পিতা মাতার ন্যায়, রাজা সেই সমাজের শিরোভাগ। তাঁহার গুণে, তাঁহার দণ্ডে, তাঁহার পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে। পিতা যেমন সন্তানের ভক্তির পাত্র, রাজাও সেইরূপ ভক্তির পাত্র। প্রজার ভক্তিতেই রাজা শক্তিমান্—নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত? রাজা বলশূন্য

হইলে, সমাজ থাকিবে না। অতএব রাজাকে সমাজের পিতার স্বরূপ ভক্তি করিবে। সম্প্রতি লর্ড রীপণ সম্বন্ধে যে সকল উৎসাহ ও উৎসবাদি দেখা গেল, এইরূপ, এবং অন্যান্য সদুপায় তদ্দ্বারা রাজভক্তি অনুশীলিত করিবে। যুদ্ধকালে রাজার সহায় হইবে। হিন্দুধর্ম্মে পুনঃ পুনঃ রাজভক্তির প্রশংসা আছে। বিলাতী ধর্ম্মে হউক বা না হউক, বিলাতী সামাজিক নীতিতে রাজভক্তির বড় উচ্চ স্থান ছিল। বিলাতে এখন আর রাজভক্তির সে স্থান নাই। যেখানে আছে—যথা জর্ম্মানি বা ইতালি, সেখানে রাজ্য উন্নতিশীল।

শিষ্য। সেই ইউরোপীয় রাজভক্তিটা আমার বড় বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। লোকে রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় রাজাকে যে ভক্তি করিবে ইহা বুঝিতে পারি, আকবর বা অশোকের উপর ভক্তিও না হয় বুঝিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় চার্লস বা পঞ্চদশ লুইর মত রাজার উপরে যে রাজভক্তি হয় ইহার পর মনুষ্যের অধঃপতনের আর গুরুতর চিহ্ন কি হইতে পারে?

গুরু। যে মনুষ্য রাজা, সেই মনুষ্যকে ভক্তি করা এক বস্তু, রাজাকে ভক্তি করা স্বতন্ত্র বস্তু। যে দেশে একজন রাজা নাই—যে রাজ্য সাধারণ তন্ত্র, সেইখানকার কথা মনে করিলেই বুঝিতে পারিবে যে রাজভক্তি, কোন মনুষ্য বিশেষের প্রতি ভক্তি নহে। কংগ্রেসের বা পার্লিমেণ্টের কোন সভ্যবিশেষে ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন, কিন্তু কঙ্গ্রেস ও পার্লিমেণ্ট ভক্তির পাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট বা লুই কাপে ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন, কিন্তু তত্তৎ সময়ের ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের রাজা তত্তৎ প্রদেশীয়দিগের ভক্তির পাত্র।

শিষ্য। তবে কি একটা দ্বিতীয় ফিলিপ বা একটা ঔরঙ্গজেবের ন্যায় নরাধমের বিপক্ষে বিদ্রোহ পাপের মধ্যে গণ্য হইবে?

গুরু। কদাপি না। রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক, ততক্ষণ তিনি রাজা। যখন তিনি প্রজাপীড়ক হইলেন, তখন তিনি আর রাজা নহেন, আর ভক্তির পাত্র নহেন। এরূপ রাজাকে ভক্তিকরা দূরে থাক, যাহাতে সে রাজা রাজ্য হইতে দূরীকৃত হয়, তাহা দেশবাসী দিগের কর্ত্তব্য। কেন না, সে রাজা থাকায় সমাজের অমঙ্গল, না থাকায় মঙ্গল। কিন্তু সে সকল কথা ভক্তি-তত্ত্বে উঠিতেছে না, প্রীতি তত্ত্বের অন্তর্গত। আর একটা কথা বলিয়া রাজভক্তি

সমার্পণ করি। রাজা যেমন ভক্তির পাত্র, তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ রাজ পুরুষগণও যথাযোগ্য সম্মানের পাত্র। কিন্তু তাঁহারা যতক্ষণ আপন আপন রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, এবং ধর্ম্মত সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, ততক্ষণই তাঁহারা সম্মানের পাত্র। তার পর তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য।

আমাদের দেশে রাজভক্তি থাকুক বা না থাকুক, রাজপুরুষে ভক্তি কিছু বেশী মাত্রায় আছে। তাই এইখানে তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিলাম। রাজ পুরুষে যথাযোগ্য ভক্তি ভাল, কিন্তু বেশী মাত্রায় কিছুই ভাল নহে—কেন না বেশী মাত্রা অসামঞ্জস্যের কারণ। রাজা সমাজের প্রতিনিধি, এবং রাজ পুরুষেরা সমাজের ভৃত্য একথা কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

(৩) রাজার অপেক্ষাও, যাঁহারা সমাজের শিক্ষক তাঁহারা ভক্তির পাত্র। গৃহস্থ গুরুর কথা, গৃহস্থিত ভক্তির পাত্রদিগের সঙ্গে বলিয়াছি, কিন্তু এই গুরুগণ, গার্হস্থ নহেন, সামাজিক গুরু। যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি বলে, পরিশ্রমের, সহিত, সমাজের শিক্ষায় নিযুক্ত, তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাঁহারাই যথার্থ রাজা। অতএব ধর্ম্মবেত্তা, বিজ্ঞানবেত্তা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, পুরাণ-বেত্তা, সাহিত্য-কার, কবি প্রভৃতির প্রতি যথোচিত ভক্তির অনুশীলন কর্ত্তব্য। পৃথিবীর যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা ইহাঁদিগের দ্বারা হইয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে যে পথে চালান, সেই পথে পৃথিবী চলে। ইহারা রাজা দিগেরও গুরু। রাজগণ ইহাঁদিগের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া, তবে সমাজ শাসনে সক্ষম হয়েন। এই হিসাবে, ভারতবর্ষ, ভারতীয় ঋষিদিগের সৃষ্টি—এইজন্য ব্যাস বাল্মীকি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র মনু যাজ্ঞবল্ক্য কপিল গোতম সমস্ত ভারতবর্ষের পূজ্যপাদ পিতৃগণ স্বরূপ। ইউরোপেও গলিলীও নিউটন কান্ত্‌ কোম্‌ৎ দান্তে সেক্ষপিয়র প্রভৃতি সেই স্থানে।

শিষ্য। আপনার কথার তাৎপর্য্য কি এইরূপ বুঝিতে হইবে, যে যাঁহার দ্বারা আমি যে পরিমাণে উপকৃত, তাঁহার প্রতি সেই পরিমাণে ভক্তিযুক্ত হইব?

গুরু। তাহা নহে। ভক্তি কৃতজ্ঞতা নহে। অনেক সময়ে নিকৃষ্টের নিকটও কৃতজ্ঞ হইতে হয়। ভক্তি পরের জন্য নহে, আপনার উন্নতির জন্য। যাহার ভক্তি নাই, তাহার চরিত্রের উন্নতি নাই। এই লোক শিক্ষকদিগের প্রতি যে ভক্তির কথা বলিলাম, তাহাই উদাহরণ স্বরূপ লইয়া বুঝিয়া দেখ। তুমি কোন লেখকের প্রণীত গ্রন্থ পড়িতেছ। যদি সে লেখকের প্রতি তোমার

ভক্তি না থাকে, তবে সে গ্রন্থের দ্বারা তোমার কোন উপকার হইবে না। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশে তোমার চরিত্র কোনরূপ শাসিত হইবে না। তাহার মর্ম্মার্থ তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না। গ্রন্থকারের সঙ্গে সহৃদয়তা না থাকিলে, তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। অতএব জগতের শিক্ষক দিগের উপর ভক্তি না থাকিলে শিক্ষা নাই। সেই শিক্ষাই সকল উন্নতির মূল; অতএব সে ভক্তি ভিন্ন উন্নতিও নাই। ইহাদের প্রতি সমুচিত ভক্তির অনুশীলন পরম ধর্ম্ম।

শিষ্য। কৈ এ ধর্ম্ম ত আপনার প্রশংসিত হিন্দুধর্ম্মে শিখায় না?

গুরু। এটা অতি মূর্খের মত কথা। বরং হিন্দু ধর্ম্মে ইহা যে পরিমাণে শিখায়, এমন আর কোন ধর্ম্মেই শিখায় নাই। হিন্দুধর্ম্মে ব্রাহ্মণগণ সকলের পূজ্য। তাঁহারা যে বর্ণশ্রেষ্ঠ, এবং আপামর সাধারণ সকলের বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার কারণ এই যে ব্রাহ্মণই ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মবেত্তা, তাঁহারাই নীতিবেত্তা, তাঁহারাই বিজ্ঞানবেত্তা, তাঁহারাই পুরাণ বেত্তা, তাঁহারাই দার্শনিক, তাঁহারাই সাহিত্য প্রণেতা তাঁহারাই কবি। তাই অনন্ত জ্ঞানী হিন্দু ধর্ম্মের উপদেশকগণ তাঁহাদিগকে লোকের অশেষ ভক্তির পাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সমাজ ব্রাহ্মণকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই, ভারতবর্ষ অল্পকালে এত উন্নত হইয়াছিল। সমাজ শিক্ষাদাতাদিগের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়াছিল বলিয়াই সহজে উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

শিষ্য। আধুনিক মত এই যে ভণ্ড ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের চাল কলার পাকা বন্দোবস্ত করিবার জন্য এই দুর্জ্জয় ব্রহ্মভক্তি ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছে।

গুরু। তুমি যে ফলের নাম করিলে, যাঁহারা তাহা অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া থাকেন, এ কথাটা তাঁহাদিগের বুদ্ধি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। দেখ, বিধি বিধান ব্যবস্থা সকলই ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। তাঁহারা আপনাদের উপজীবিকা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে তাঁহারা রাজ্যের অধিকারী হইবেন না, পদের অধিকারী হইবেন না, বাণিজ্যের অধিকারী হইবেন না, কৃষিকার্য্যের পর্য্যন্ত অধিকারী নহেন। এক ভিন্ন কোনপ্রকার উপজীবিকার অধিকারী নহেন। সে একটি উপজীবিকা ব্রাহ্মণেরা বাছিয়া বাছিয়া আপনাদিগের জন্য রাখিলেন সেটি কি? যাহার পর দুঃখের

উপজীবিকা আর নাই, যাহার পর দারিদ্র্য আর কিছুতেই নাই—ভিক্ষা। এমন নিঃস্বার্থ উন্নতচিত্ত মনুষ্যশ্রেণী ভূমণ্ডলে আর কোথাও জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বাহাদুরির জন্য, বা পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য, বাছিয়া বাছিয়া ভিক্ষাবৃত্তিটি উপজীবিকা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে ঐশ্বর্য্য সম্পদে মন গেলে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে, সমাজের শিক্ষাদান বিঘ্ন ঘটে। একমন, একধ্যান হইয়া, লোকশিক্ষা দিবেন বলিয়াই, সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম্ম যাহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারাই পরহিতব্রত সঙ্কল্প করিয়া এরূপ সর্ব্বত্যাগী হইতে পারে। তাঁহারা যে আপনাদিগের প্রতি লোকের অচলাভক্তি আদিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাও স্বার্থের জন্য নহে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে সমাজশিক্ষকদিগের উপর ভক্তি ভিন্ন উন্নতি নাই, সেজন্য ব্রাহ্মণ-ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল করিয়া তাঁহারা যে সমাজ ও যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আজিও জগতে অতুল্য, ইউরোপ আজিও তাহা আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে। ইউরোপে আজিও যুদ্ধটা সামাজিক প্রয়োজন মধ্যে। কেবল ব্রাহ্মণেরাই এই ভয়ঙ্কর পাপ—সকল পাপের উপর শ্রেষ্ঠ পাপ—সকল সামাজিক উৎপাতের উপর বড় উৎপাত—সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। সমাজ ব্রাহ্মণ্য নীতি অবলম্বন করিলে যুদ্ধের আর প্রয়োজন থাকে না। তাঁহাদের কীর্ত্তি অক্ষয়। পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মত প্রতিভাশালী ক্ষমতাশালী জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক কোন জাতিই নহে।

শিষ্য। তা যাক। এখন দেখি ত ব্রাহ্মণেরা লুচি ও ভাজেন, রুটীও বেচেন, কালি থাড়া করিয়া কসাইয়ের ব্যবসাও চালান। তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে হইবে?

গুরু। কদাপি না। যে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কেন? সেখানে ভক্তি অধর্ম্ম। এইটুকু না বুঝাই, ভারতবর্ষের অবনতির একটি গুরুতর কারণ। যে গুণে ব্রাহ্মণ ভক্তির পাত্র ছিল, সে গুণ যখন গেল, তখন আর ব্রাহ্মণকে কেন ভক্তি করিতে লাগিলাম? কেন আর ব্রাহ্মণের বশীভূত রহিলাম? তাহাতেই কুশিক্ষা হইতে লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন কি ফিরিতে হইবে।

শিষ্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি করা হইবে না।

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যে ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব। যিনি নহেন তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্ত্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব।

শিষ্য। অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মণ শিষ্য; ইহা আপনি সঙ্গত মনে করেন?

গুরু। কেন করিব না? ঐ মহাত্মা সুব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণ সকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র।

শিষ্য। আপনার এ রূপ হিন্দুয়ানিতে কোন হিন্দু মত দিবে না।

গুরু। না দিক, কিন্তু ইহাই হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম। মহাভারতের বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয় সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে ঋষিবাক্য এইরূপ আছে; "পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহারে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি। কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।" পুনশ্চ বনপর্ব্বে অজাগর পর্ব্বাধ্যায়ে, ১৮০ অধ্যায়ে রাজর্ষি নহুষ বলিতেছেন, "বেদমূলক সত্যদান ক্ষমা অনৃশংস্য অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে। যদ্যপি শূদ্রেও সত্যাদি ব্রাহ্মণধর্ম্ম লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।" তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ, ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শূদ্রবংশ্য হইলেই যে শূদ্র হয়, এবং ব্রাহ্মণবংশ্য হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র।" এরূপ কথা আরও অনেক আছে। পুনশ্চ বৃদ্ধ-গৌতম-সংহিতায়, ২১ অধ্যায়ে,

ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃশূদ্রা ইতিস্মৃতাঃ॥
অগ্নিহোত্রব্রতপরান্ স্বাধ্যায়নিরতান্ শুচীন্।
উপবাসরতান্ দান্তাং স্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ॥
ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালমপি চিত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

ক্ষমাবান্, দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে; আর সকলে শূদ্র। যাহারা অগ্নি হোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাসরত, দান্ত, দেবতারা তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণ কারক। চণ্ডালও চিত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

শিষ্য। যাক্। এক্ষণে বুঝিতেছি মনুষ্য মধ্যে তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি ভক্তি অনুশীলনীয়, (১) গৃহস্থিত গুরুজন, (২) রাজা (৩) এবং সমাজ শিক্ষক। আর কেহ?

গুরু। (৪) যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক বা যে জ্ঞানী, সে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে না আসিলেও ভক্তির পাত্র। ধার্ম্মিক, নীচজাতীয় বা মূর্খ হইলেও ভক্তির পাত্র।

(৫) আর কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা কেবল ব্যক্তি বিশেষের ভক্তির পাত্র, বা অবস্থা বিশেষে ভক্তির পাত্র। এ ভক্তিকে আজ্ঞাকারিতা বা সম্মান বলিলেও চলে। যে, কোন কার্য্যনির্ব্বাহার্থে অপর ব্যক্তির আজ্ঞাকারিতা স্বীকার করে, সেই অপর ব্যক্তি তাহার ভক্তির, নিতান্ত পক্ষে তাহার সম্মানের পাত্র হওয়া উচিত। ইংরেজিতে ইহার একটি বেশ নাম আছে—Subordination। এই নামে আগে Official Subordination মনে পড়ে। এদেশে সে সামগ্রীর অভাব নাই—কিন্তু যাহা আছে তাহা বড় ভাল জিনিস নহে। ভক্তি নাই, ভয় আছে। ভক্তি মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, ভয় একটা সর্ব্ব নিকৃষ্ট বৃত্তির মধ্যে। ভয়ের মত মানসিক অবনতির গুরুতর কারণ অল্পই আছে। উপরওয়ালার আজ্ঞা পালন করিবে, তাহাকে সম্মান করিবে, পার ভক্তি করিবে, কিন্তু কদাচ ভয় করিবে না। কিন্তু Official Subordination ভিন্ন অন্য এক Subordination প্রয়োজনীয়। সেটা আমাদের দেশের পক্ষে বড় গুরুতর কথা। ধর্ম্ম কর্ম্ম অনেকই সমাজের মঙ্গলার্থ। সে সকল কাজ সচরাচর পাঁচজনে মিলিয়া করিতে হয়—একজনে হয় না। যাহা পাঁচজনে মিলিয়া করিতে হয়, তাহাতে ঐক্য চাই। ঐক্য জন্য ইহাই প্রয়োজনীয় যে একজন নায়ক হইবে, আর অপরের, তাহার এবং পর্য্যায়ক্রমে অন্যান্যের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতে হইবে। এখানেও Subordination প্রয়োজনীয়। কাজেই ইহা একটি গুরুতর ধর্ম্ম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সমাজে এ সামগ্রী নাই।

যে কাজ দশজনে মিলিয়া মিশিয়া করিতে হইবে, তাহাতে সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইতে চাহে, কেহ কাহারও আজ্ঞা স্বীকার না করায় সব বৃথা হয়। এমন অনেক সময় হয়, যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি নেতা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অধীন হয়। এস্থানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্ত্তব্য, যে নিকৃষ্টকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহার আজ্ঞা বহন করেন—নহিলে কার্য্যোদ্ধার হইবে না। কিন্তু আমাদের দেশের লোক কোন মতেই তাহা স্বীকার করেন না। তাই আমাদের সামাজিক উন্নতি এত অল্প।

(৬) আর ইহাও ভক্তিতত্ত্বের অন্তর্গত কথা যে, যাহার যে বিষয়ে নৈপুণ্য আছে, সে বিষয়ে তাহাকে সম্মান করিতে হইবে। বয়োজ্যেষ্ঠকেও কেবল বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া সম্মান করিবে।

(৭) সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে, যে মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণ পোষণ এবং রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তি-ভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান হইবে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া ওগুস্ত কোমৎ "মানবদেবীর" পূজার বিধান করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই।

এখন ভক্তির অভাবে, আমাদের দেশে কি অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে দেখ। হিন্দুর মধ্যে ভক্তির কিছুই অভাব ছিল না। ভক্তি, হিন্দু ধর্ম্মের ও হিন্দু শাস্ত্রের একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু এখন, শিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহারা এই বিকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইয়াছেন, যে মনুষ্যে মনুষ্যে বুঝি সর্ব্বত্র সর্ব্বথাই সমান—কেহ কাহাকে ভক্তি করিবার প্রয়োজন করে না। ভক্তি, যাহা মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তাহা হীনতার চিহ্ন বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইয়াছে। পিতা এখন "my dear father"—অথবা বুড়ো বেটা। মাতা, বাপের পরিবার। বড় ভাই, জ্ঞাতি মাত্র। শিক্ষক, মাষ্টার বেটা। পুরোহিত চালকলা-লোলুপ ভণ্ড। যে স্বামী দেবতা ছিলেন,—তিনি এখন কেবল প্রিয় বন্ধু মাত্র—কেহ বা ভৃত্যও মনে করেন। স্ত্রীকে আর আমরা লক্ষ্মীস্বরূপা মনে করিতে পারি না—কেন না লক্ষ্মীই আর মানি না। এই গেল গৃহের ভিতর। গৃহের বাহিরে অনেকে রাজাকে শত্রু মনে করিয়া থাকেন। রাজপুরুষ, অত্যাচার-

কারী রাক্ষস। সমাজশিক্ষকেরা, কেবল আমাদের সমালোচনা শক্তির পরিচয় দিবার স্থল—গালি ও বিদ্রুপের স্থান। ধার্ম্মিক বা জ্ঞানী বলিয়া কাহাকেও মানি না। যদি মানি, তবে ধার্ম্মিককে "গো বেচারা" বলিয়া দয়া করি—জ্ঞানীকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হই। কেহ কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিব না, সেই জন্য কেহ কাহারও অনুবর্ত্তী হইয়া চলিব না; কাজেই ঐক্যের সহিত কোন সামাজিক মঙ্গল সাধিত করিতে পারি না। নৈপুণ্যের আদর করিব না; বৃদ্ধের বহুদর্শিতা লইয়া ব্যঙ্গ করি। সমাজের ভয়ে জড় সড় থাকি, কিন্তু সমাজকে ভক্তি করি না তাই গৃহ নরক হইয়া উঠিতেছে; রাজনৈতিক ভেদ ঘটিতেছে; শিক্ষা অনিষ্টকারী হইতেছে; সমাজ অনুন্নত ও বিশৃঙ্খল রহিয়াছে; আপনাদিগের চিত্ত অপরিশুদ্ধ ও আত্মাদরে ভরিয়া রহিয়াছে।

শিষ্য। উন্নতির জন্য ভক্তির যে এত প্রয়োজন তাহা আমি কখন মনে করি নাই।

গুরু। তাই, আমি ভক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিতেছিলাম। এ শুধু মনুষ্য-ভক্তির কথাই বলিয়াছি। আগামী দিবস ঈশ্বর-ভক্তির কথা শুনিও। ভক্তির শ্রেষ্ঠতা আরও বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবে।

শিক্ষা।

যাহার প্রভাবে শরীর ও মন—উভয়ের জড়তা অপনীত হইয়া সজীবতা সম্পাদিত হয়, এবং উভয়েই ক্রমে ক্রমে এক অপূর্ব্ব নব-বলে বলীয়ান হইয়া, এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইতে থাকে; তাহার নাম শিক্ষা। শিক্ষা দ্বিবিধ। শারীরিক শিক্ষা ও মানসিক শিক্ষা। যে শিক্ষায় শরীরের মাংসপেশী সমূহ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হইয়া, শরীরকে শক্তিময় করে এবং সুস্থতা ও অঙ্গসৌষ্ঠব প্রভৃতি সম্পন্ন হয়; তাহার নাম শারীরিক শিক্ষা। আর যে শিক্ষায় চিত্তশুদ্ধি, মনের সমুন্নতি ও তাহার সন্তোষ এবং হৃদয়ের বল সম্পাদিত হইয়া, অন্তঃরাজ্যকে নবশক্তিময়—এক নবভাবে ভাবময় করে, তাহার

নাম মানসিক শিক্ষা। এই উভয় শিক্ষার পূর্ণ-সংমিলনে প্রকৃত সুখ ও সৌভাগ্যের উৎপত্তি। সুতরাং যাহারা এই উভয় শিক্ষায় পূর্ণরূপে শিক্ষিত, জগতে তাহারাই প্রকৃত সুখী ও সৌভাগ্যবান। মনুষ্যের প্রকৃত সুখ ও সৌভাগ্য—মহত্ত্ব ও স্বাধীনতা। ইংলণ্ড, জার্ম্মেনি, ফ্রান্স্ ও আমেরিকা প্রভৃতি রাজ্য মহত্ত্বশালী ও স্বাধীন, সুতরাং তাঁহারাই প্রকৃত সুখী ও সৌভাগ্যশালী।

জগতে প্রকৃত সুখ ও সৌভাগ্য অতি দুর্ল্লভ-পদার্থ। সকল জাতির ভাগ্যে এই সুখ ও সৌভাগ্য কখনই সংঘটন হয় না। শারীরিক-শক্তি ও মানসিক-শক্তি যেখানে পূর্ণরূপে সংযোগ লাভ করিয়াছে; সেই খানেই প্রকৃত সুখ ও সৌভাগ্যের উৎপত্তি। নতুবা এক শারীরিক-শক্তি কি মানসিক-শক্তির উৎকর্ষ হইতে প্রকৃত সুখ ও সৌভাগ্যের সম্ভব কোথায়? বঙ্গবাসী, মানসিক-শিক্ষার সাধনায় একরূপ সিদ্ধিলাভ করিতেছেন; আবার শিখ, কি রজঃপূত জাতি, শারীরিক-শক্তির তপস্যায় একান্ত রত। যদি বঙ্গবাসী মানসিক-শিক্ষার ন্যায় শারীরিক-শিক্ষারও সাধনা করিতেন; এবং শিখ, কি রজঃপূত জাতি শারীরিক শিক্ষার ন্যায় মানসিক শিক্ষাতেও উৎসাহী হইতেন; তবে উভয়েরই অদৃষ্ট-গগনে একদিন না একদিন প্রকৃত সুখসূর্য্য ও সৌভাগ্য-চন্দ্রমা সমুদিত হইয়া, ভারতের দুঃখদারিদ্র্যরূপ চির-তামস দূরীভূত করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু তাহা হইল কৈ? বঙ্গবাসী, শারীরিক শিক্ষাকে হেয়জ্ঞান করিয়া, অকালে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছেন; এবং কি শিখ্ কি রজঃপূত জাতি, মানসিক শিক্ষায় ঔদাস্য করিয়া, নির্ব্বোধ বলিয়া অভিহিত হইতেছেন।

শিক্ষার প্রথম ফল—আত্মোন্নতি; দ্বিতীয় ফল—পরোন্নতি। শিক্ষায় কৃতী হইয়া রাজ-সম্মান লাভ করা; তৎপর উচ্চপদস্থ হইয়া, সম্পত্তি ও সাধারণ লোক অপেক্ষা মান উপার্জ্জন করা—আত্মোন্নতি। অনন্তর স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি ও মঙ্গলার্থ, যে সেই উচ্চপদ, সেই সম্পত্তি, ও সেই মান পরিত্যাগ করা, তাহার নাম পরোন্নতি। সাধারণ মানব শিক্ষার প্রথম ফল পাইয়া, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে; দ্বিতীয় ফলের প্রতি ভ্রমক্রমেও একবার দৃষ্টিপাত করে না। কিন্তু ক্ষণজন্মা মহাপুরুষেরা, শিক্ষার প্রথম ফল আত্মোন্নতির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, দ্বিতীয় ফল পরোন্নতির জন্য দেহ ও প্রাণ উভয়কেই যুগপৎ অনন্ত কাল-সাগরে বিসর্জ্জন করিতে বদ্ধপরিকর হন। ভারত

যখন ধ্বনাধিকৃত, যবনের নিদারুণ অত্যাচারে ভারতবাসীর কণ্ঠাগত প্রাণ। তদুপরি ধার্ম্মিকের অপমান, নিরীহের প্রাণদণ্ড, সতীর লাঞ্ছনা! আর্য্যধর্ম্ম, আর্য্যনীতি, আর্য্য আচার ব্যবহার সকলই বিলুপ্ত! ভারত দুর্ব্বিসহ পাপভারে ডুবুডুবু! এমন সময় আর্য্যকুল-ধুরন্ধর-অদীনসত্ব শিবজী জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পিতা, তাঁহাকে শিক্ষার প্রথম ফল—আত্মোন্নতি লাভের জন্য মনোযোগী হইতে বলিলেন। বস্তুত তিনি মনোযোগী হইলে, মোগল প্রসাদে চিরদিন শ্বেতোপল বিনির্ম্মিত সৌধাবাসে বাস করিয়া অর্দ্ধেক ভারত ভোগ করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু ক্ষণজন্মা শিবজী তাহা করিলেন না; তিনি শিক্ষার দ্বিতীয় ফল—পরোন্নতি—আর্য্যধর্ম্ম রক্ষা, এবং ভারত উদ্ধার জন্য যবন বিনাশ ব্রতে ব্রতী হইলেন। কত কঠোর অধ্যবসায়, কত প্রাণান্ত যাতনা ভোগ, কত নিরম্বু-উপবাস, কত নিদারুণ পরিশ্রম করিয়া, কত বনে বনে, কত গিরি-সঙ্কটে পরিভ্রমণ করিলেন, তথাচ মানসিক ব্রত পরিত্যাগ করিলেন না। "হর হর ভবানী" শব্দে ভারতের দিগ্বিভাগ পরিপূর্ণ হইল; বিজয়-বৈজয়ন্তী-সুশোভিনী-আর্য্যপতাকা, ভারতাকাশে উড়িতে লাগিল; আর্য্যতেজ—যবনান্ধকার বিদূরিত করিয়া, দশদিক্ আলোকিত করিল; বিলয়োন্মুখী আর্য্যশক্তি, নববেশে, নবভাবে আবির্ভূতা হইয়া, স্বকীয় নব সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধোজ্জ্বলময়ী লাবণ্য-ছটা, জগন্ময় ছড়াইতে লাগিলেন। যেমন প্রভাতারুণের নবশক্তি-বিধায়িনী কিরণ-লহরী সংস্পর্শে সুষুপ্তিমান্ জীবকুল চৈতন্য পাইয়া, হাসিয়া হাসিয়া, নবসুখ, নব আনন্দ সম্ভোগ করিতে থাকে; তদ্রূপ-উদয়োন্মুখী-প্রফুল্লময়ী-আর্য্যশক্তির সঞ্জীবনী-ছটার সুধাময়-স্পর্শে কাল-নিদ্রাগতা ভারত-মাতাও জাগিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু সেই জাগ্রতভাব ও সুখময়ী হাসি মেঘবাহিনী সৌদামিনীর ন্যায় ক্ষণিক বিকশিত হইয়াই অন্তর্হিত হইল। আবার আঁধার—চির আঁধারে ভারত ডুবিয়া গেল! ইহা কি মহাকালের মহাক্রোধ চিহ্ন! না বিধাতার অভিশাপ!

পরন্তু, কোন কোন মহাত্মা আত্মোন্নতি লাভ করত, পরোন্নতি জন্য সেই আত্মোন্নতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া, শতসঙ্কটে জীবনকে পাতিত করেন। আমেরিকা, ইংলণ্ডের অধীন ছিল; শুভজন্মা ওয়াসিংটন সেই আমেরিকাকে স্বাধীনতা-অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত করিয়া, অমরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ওয়াসিংটন, প্রথমে শিক্ষার প্রথম ফল আত্মোন্নতিই লাভ করিয়াছিলেন;

তিনি স্বতঃই ইংলণ্ডের প্রসাদ আকাঙ্ক্ষা করিতেন; কিন্তু ইংলণ্ড তাহা বুঝিলেন না। ঘোর স্বার্থমদে অন্ধ হইয়া, ওয়াসিংটনকে অনাদর করিলেন। ওয়াসিংটনের হৃদয় অনন্ত-অভিমান ময় ছিল; সুতরাং সেই অনাদরের ভীষণ আঘাতে হৃদয় বিকল হইয়া পড়িল। অনন্ত অভিমান সাগরে তরঙ্গ উঠিল। সেই তরঙ্গাঘাতে আত্মোন্নোতি ভাসিয়া গিয়া, পরোন্নতির আবির্ভাব হইল। শিক্ষার দ্বিতীয় ফল পূর্ণরূপেই ফলিল। আমেরিকা স্বাধীন হইল। বস্তুত যে মহাপুরুষের উদার হৃদয়, শিক্ষার পূর্ণ জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হয়, তাঁহাদের পদরজ সংস্পর্শে, অন্ধকারে আলোকের আবির্ভাব হয়। পতিত তরিয়া যায় এবং তাপিত শীতল হইতে থাকে। তাঁহার এক একটি কথা—অনন্ত সুধাপূর্ণ উৎসতুল্য। তাহাতে কত মৃত অবগাহন করত, চিরজীবন লাভ করিয়া, অমর হইয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ সঞ্জীবনী শিক্ষা অতি দুর্ল্লভ। বিশেষত ভারতবাসী যেরূপ শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শিক্ষিত হইতেছেন, তাহাতে থাক পরোন্নতি, পূর্ণরূপে আত্মোন্নতিও সংসাধিত হইতেছে না।

মানব-সমাজের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য—আত্মোন্নতি; গৌণ উদ্দেশ্য—পরোন্নতি। কিন্তু জাতীয় মহত্ব, জাতীয় গৌরব, এবং আত্মাদর—উক্ত উভয় উদ্দেশ্যেরই মূলে পূর্ণরূপে পরিস্ফুট থাকা কর্ত্তব্য। না থাকিলে, শিক্ষার পূর্ণতা এবং শিক্ষিতের কর্ত্তব্যতা, কদাচই সম্প্যাদিত হয় না। বর্ত্তমান সময়ে রাজা ভারতবাসী প্রজাদিগকে যে নিয়মে শিক্ষা দান করিতেছেন, তাহাতে সকলের ভাগ্যে আত্মোনতিও লাভ হইতেছে না। বর্ত্তমান বৃটিশ-দত্ত শিক্ষা—ধর্ম্মনীতি-বিহীনা; সুতরাং শিক্ষিত মণ্ডলী, মানসিক শিক্ষার প্রথম ফলটি মাত্র প্রাপ্ত হইতেছেন। মানসিক শিক্ষার তিনটি ফল; প্রথম—বুদ্ধি-সংস্কার; দ্বিতীয়—নীতিশিক্ষা; তৃতীয় ফল—ধর্ম্মে বিশ্বাস। শিক্ষা পূর্ণ হইলে বুদ্ধি-সংস্কার হয়; বুদ্ধির পূর্ণ সংস্কার হইলে, নীতিজ্ঞান জন্মে; পূর্ণরূপে নীতিজ্ঞান জন্মিলে, ধর্ম্মে আস্থা হয়। নীতি ধর্ম্মের মূল; নীতি-বিহীন ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়। এই ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি পূর্ণ বিকশিত হইলে জাতীয় মহত্ত্ব, জাতীয় গৌরব, এবং আত্মাদরের সমুদ্ভব হয়। অনন্তর হৃদয়-গগনে স্বাধীনতাময়ী এক দিব্য সুন্দর জ্যোতি প্রকাশ হইতে থাকে। বস্তুত ধর্ম্মের সুস্নিগ্ধ মধুরোজ্জ্বল জ্যোতি না পাইলে শিক্ষা সততই অন্ধকারময়ী; সুতরাং এই অন্ধ-

শিক্ষায় যাঁহারা শিক্ষিত হইতেছেন, তাঁহারা অন্ধ হইয়া আত্মোন্নতির মূল পর্য্যন্তও হারাইয়া বসিতেছেন। আত্মোন্নতির মূল কৃষি ও বাণিজ্য। জাতীয় মহত্ত্ব, জাতীয় গৌরব, এবং আত্মাদর—এই কৃষি ও বাণিজ্যের অভ্যন্তরেই লুক্কায়িত রহিয়াছে। অন্ধশিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী, তাহা দেখিয়াও দেখেন না। সুতরাং যত শিক্ষিত হইতেছেন, ততই হীন-তেজ, শ্রম-বিমুখ, দীনতাপন্ন, চাটুভাষী, এবং অতি ক্ষুদ্র স্বার্থপর হইয়া, "চাকুরী চাকুরী" করিয়া, দিগ্‌দিগন্তরে ভ্রাম্যমান হইতেছেন। ওদিকে সাত সমুদ্র, তের নদী পার হইয়া, অন্য দেশীয় লোকেরা আসিয়া, এই ভারতে কৃষি ও বাণিজ্য করত, কোটীশ্বর হইয়া যাইতেছেন। কি দুরদৃষ্ট! কি বিড়ম্বনা! যে শিক্ষা দ্বারা শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধন না হইল; এবং যে শিক্ষা প্রভাবে জাতীয় মহত্ত্ব, জাতীয় গৌরব, এবং আত্মাদর প্রভৃতি আত্মোন্নতির মূল পর্য্যন্তও ধ্বংস হইতে চলিল, সে শিক্ষায় শিক্ষিত না হইয়া, অশিক্ষিত থাকাই শত-গুণে শ্রেয়স্কর। শিক্ষা, মনুষ্যের হৃদয়কে প্রসারিত ও পবিত্র করিয়া, জ্ঞান ও স্বাধীনতায় সুসজ্জিত করে; কিন্তু তাহাতে যদি সেই শিক্ষা—ভীষণ রাক্ষসীর ন্যায় মনুষ্যের মনুষ্যত্ব—জ্ঞান, এবং স্বাধীনতাকে অপহরণ করিয়া, মানবকে শ্বাপদাবস্থায় পরিণত করে, তবে তাহা হইতে বিড়ম্বনা আর কি অধিক আছে!

বর্ত্তমান সময়ে বৃটিশ দত্ত উদার-শিক্ষা প্রণালী দ্বারা শিক্ষিত হইয়া, আমরা শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি মঞ্চে অধিরোহণ করিতেছি। ভারতবাসীর মন বহুকাল পর্য্যন্ত কোন গভীর জ্ঞান উপার্জ্জনে ব্যবহৃত হয় নাই; সুতরাং যেমন বহুকাল পতিত ভূমি কর্ষণ করিয়া, তাহাতে বীজ বপন করিলে, অপর্য্যাপ্ত শস্য সমুৎপন্ন হয়; তদ্রূপ ভারতবাসীর পতিত মনোভূমি, পাশ্চাত্য শিক্ষা কর্ষণে এইরূপ দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। এই উন্নতি কি স্থায়ী উন্নতি? যেমন প্রাবৃটকালে বেলাভূমি সাগরোচ্ছ্বাসে ডুবিয়া যায়; সেইরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষার আগ্রেয়োচ্ছ্বাসে ভারত প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। আবার যেমন সেই সাগর বারি, দেখিতে দেখিতে থামিয়া যায়; তদ্রূপ এই উন্নতি আজও চলিয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, এই উন্নতিতে আমাদের একদিকে যেমন যথেষ্ট উপকার হইতেছে; তেমনি আবার অন্য দিকে যথেষ্ট অপকারও হইতেছে। কাহার দোষ? আমাদের—না শিক্ষার? আমরা বলি, শিক্ষারও দোষ, আমাদেরও দোষ। আমাদের দোষ - আমরা অধীন; পরাবলম্বন ভিন্ন এক পাও চলিতে পারি না। শিক্ষার দোষ—শিক্ষা সীমা বিশিষ্টা ও স্বার্থময়ী; বিশেষত উলঙ্গিনী।

বৃটীশ দত্ত শিক্ষায় আমাদের উপকার ও অপকার দুই হইতেছে। উপকার—বুদ্ধিসংস্কার; তৎপ্রভাবে তর্কশক্তি, কল্পনা শক্তি, প্রতিভা, অর্জ্জনস্পৃহা, ভোগ লালসা, সুখলিপ্সা প্রভৃতি বহুল পরিমাণে উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে; তৎসঙ্গে সঙ্গে—স্বদেশানুরাগ ও একতাও ক্ষণিক পরিস্ফুট হইয়া থাকে। আপনার অনুচিত বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিতে একান্ত যত্নবান হওয়াতে, অমিতব্যয়িতা; সুরাপানে ভয়ঙ্কর উন্মত্ততা জন্য বুদ্ধির জড়তা; সমাজে পশু বৃত্তির শ্রীবৃদ্ধি; কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলা, অনুৎসাহ, ভগ্ন অধ্যবসায়, সত্যের অপলাপ, নাস্তিকতা, এবং অকালমৃত্যু প্রভৃতি সংঘটিত হওয়ায়, ভীষণ দরিদ্রতা—প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় ভারতকে ডুবাইয়া ফেলিতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় চাকরির লালসা পরিত্যাগ করিয়া, কৃষি ও বাণিজ্য কার্য্যে রত না হইলে, এই ভারত সংহারিণী দরিদ্রতার আর কিছুতেই অপনীত হইবার সম্ভাবনা নাই। চাকরী অধীনতাময়; কৃষি ও বাণিজ্য স্বাধীনতা ময়। স্বাধীন কার্য্যের অসীম অনবরুদ্ধভাবে শিক্ষা—এশিক্ষা অনন্ত গুণে প্রতিভান্বিতা। কিন্তু অধীন কার্য্যের সীমাবদ্ধ অন্ধকার ভাবে শিক্ষার পূর্ব্বপ্রতিভা টুকুও নিভিয়া যায়। যে জাতির হৃদয় সততই অধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত, সে জাতি হইতে আর প্রত্যাশা কি?

স্বদেশ ও স্বজাতির যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হয়, দুর্ভাগ্য বশত শিক্ষিত সম্প্রদায়, সেই দুই পরম মঙ্গলময় ভাবে অবহেলা করিয়া, সর্ব্বাধম পরসেবাতেই রত হইতেছেন। কি বিড়ম্বনাময়ী ললাট লিপি! ভারত কি দেখিয়া আশা করিবে?

বর্ত্তমান কালে জ্ঞান শিক্ষার জন্য কেহই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন না। সকলেই একভাবে ভাবুক হইয়া, এক উদ্দেশ্য—একই অর্থ—পর সেবা জন্য বিদ্যা মন্দিরে পদার্পণ করিয়া থাকেন। এবং "চাকরী, চাকরী" ভাবিয়া গ্রন্থগুলিকে শীঘ্র শীঘ্র আহার করত, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। আর সে গ্রন্থের সহিত কোন সংশ্রব থাকে না। এইরূপে এত প্রাণান্ত পরিশ্রম, এত কঠোর অধ্যবসায়, এত জ্বলন্ত উৎসাহ—সকলই চাকরীরূপ গভীরগহ্বরে চিরদিন তরে লুক্কায়িত হয়। তখন অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তি নিদারুণ বলবতী হইয়া, অন্য সকল বৃত্তিকে পরাস্ত করিয়া ফেলে। তৎসঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই জ্ঞান, ন্যায়, সত্য, এবং বিবেক হৃদয় হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। সুতরাং পাশব ভাব স্বকীয় দলবল সহ, বিকট বেশে হৃদয় রাজ্য অধিকার করিয়া বসে। তরলতাময়ী অর্থকরী শিক্ষা কেবল তরলতাকেই

প্রসব করিয়া থাকে; সুতরাং শিক্ষিত মণ্ডলী, প্রগাঢ়তাময়ী-জ্ঞানকরী শিক্ষার গাম্ভীর্য্য হইতে পরিচ্যুত হইয়া তরল ও চপল হইয়া যাইতেছেন; এবং জাতীয় মহত্ত্ব, জাতীয় গৌরব, আত্মাদর প্রভৃতি ভুলিয়া গিয়া, তুলারাশি হইতে লঘু, ভস্ম হইতেও অসার হইয়া পড়িতেছেন!

এই সংসারে মানব সাধারণ সকলেই যে শিক্ষিত হইয়া, ধনোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে; এবং রাজাও যে তাহাদিগের প্রত্যেককে এক একটি পদ প্রদান করিয়া চরিতার্থ করিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। সংসারে যত মনুষ্য আছে, সকলেই যদি ধনবান হয়, তবে সৃষ্টি বৈচিত্র্যের ভীম-কান্ত-সৌন্দর্য্য আর কিছুই থাকে না। যেখানে অভাব, সেইখানেই আকাঙ্ক্ষা; যেখানে আকাঙ্ক্ষা, সেইখানেই ফলোৎপত্তি—উন্নতি লাভ। সুতরাং বৈষম্য হইতেই সংসারের শ্রীবৃদ্ধি। যে বিজ্ঞান ও শিল্প বিদ্যার অনন্ত-প্রভাবে পৃথিবী আজ বৈজয়ন্ত তুল্য—অনন্ত-সৌন্দর্য্য, অনন্ত-সুখ-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ; সেই বিজ্ঞান ও শিল্প ধনবান কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয় নাই; অনেক দরিদ্রই জঠরানলে পুড়িয়া পুড়িয়া বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব মহিমা ও শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত মহাপুরুষেরা সকলেই শিক্ষিত ছিলেন। যদি তাঁহারা চাকরীর জন্য লালায়িত হইতেন, তবে তাঁহাদের প্রতিভা কোন দিনও অনন্ত স্বাধীন মার্গে বিচরণ করিয়া, "মনুষ্যই যে সৃষ্টি রাজ্যের একরূপ অধীশ্বর" এই বাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইত না। অতএব শিক্ষার প্রারম্ভ হইতেই স্বাধীনভাবে চলিয়া, জ্ঞানোপার্জ্জনে রত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটি কথা এই যে, যদি সকলেই শিক্ষাকার্য্য সমাপনান্তর জ্ঞানোপার্জ্জনে রত হয়; কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া কালযাপন করে; তবে সংসারের অন্যবিধ কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইবে? রাজ্যরক্ষা একটি প্রধান কার্য্য; মন্ত্রী মন্ত্রণা পরিত্যাগ করিয়া, প্রাড়্‌বিবাক বিচার কার্য্য ছাড়িয়া, ব্যবহারাজীবি ও মসীজীবিগণ বাক্‌যুদ্ধ ও মসীযুদ্ধে অবহেলা করিয়া, এবং শান্তিরক্ষক শান্তি সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া যদি কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানাদির সমুন্নতি জন্য প্রবৃত্ত হন; তবে রাজ্য রক্ষা কে করিবে? রাজ্যে অরাজক উপস্থিত হইলে, উক্ত কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ও বিজ্ঞানেরই বা কিরূপে উন্নতি হইবে?—একথা সত্য; কিন্তু আমরা বলি, চাকরী উদ্দেশ্যে শিক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া আত্মোন্নতি

এবং জ্ঞান লক্ষ্য করিয়া, শিক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হও; দেখিবে—সেই শিক্ষা হইতেই ভাবী জাতীয় উদ্ধার-রূপ মহাব্রতের সূচনার সমুৎপত্তি হইয়াছে। উষার ভুবনমোহিনী ধবলময়ী কান্তি সন্দর্শন করিয়া, জীবকুল দিবাগম বিষয়ে নিশ্চয়ই বিশ্বাসী হয়। তাহাদিগের এ বিশ্বাস কখনই ভঙ্গ হইতে পারে না। কেন না, অনন্তর দেখিতে দেখিতেই নব-বিভাকর মূর্ত্তি প্রাচী-ললাটে সমুদিত হয়। পৃথিবী নবানন্দে প্রমত্ত হইয়া খল খল করিয়া হাসিয়া উঠে। যে শিক্ষার বর্ত্তমান গতি—আত্মোন্নতি বিধায়িনী; ভাবী গতি—পরোন্নতি দর্শিনী; এবং যাহার বর্ত্তমান উদ্দেশ্য জ্ঞান; পরো-দ্দেশ্য—স্বদেশ ও স্বজাতির সমুন্নতি; সে শিক্ষার প্রারম্ভ নব শক্তি প্রদায়িনী অনন্ত সুখময়ী প্রফুল্ল বদনা উষার ন্যায় সুখদর্শন—সুখময়। মধ্য—স্নিগ্ধ-সুশীতল, প্রস্ফুটিত-কুসুম-সুরভি সংপৃক্ত, ধীর-সমীর-বাহিত, নবোৎসাহ পরিপূর্ণ, অনন্ত কোলাহলময় প্রভাত তুল্য অনন্ত আশাময়। অন্ত—দিগন্ত প্রস্ফুটিত, খরতর-দাহময় মধ্যাহ্ন কালনিভ—অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় ও অনন্ত তীক্ষ্ণশালী। এইরূপ শিক্ষা বৃক্ষে নিশ্চয়ই মঙ্গল ফল ফলিয়া থাকে। পরন্তু, যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য চির-অধীনতাময়ী চাকরীর আশায় সমন্বিত; সে শিক্ষার ফল—শুষ্ক সঙ্কোচ্যময় না হইবে কেন? অধীনতা সঙ্কোচ্যতার প্রসূতি; মাতা ও দুহিতার অভিন্ন হৃদয়। মাতার প্রতি দুহি-তার অতিশয় ভক্তি; দুহিতার প্রতি মাতার নিতান্ত স্নেহ; উভয়ই একত্র অবস্থান করে; ক্ষণকালের জন্যও কেহ কাহার কাছ ছাড়া হয় না। তবে অধীনতা, যাহাদিগের হৃদয়ের মূল মন্ত্র; সেই মন্ত্রেরই যাহারা পূর্ণ সাধক, সেই মন্ত্রেই যাহারা সিদ্ধ পুরুষ, তাহাদিগের কি বাহির, কি মধ্য—উভয়ই যে সঙ্কো-চ্যতার দুর্মোচ্য বন্ধনে পরিবদ্ধ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যেমন উদ্দেশ্য, তেমন কার্য্য; যেমন কার্য্য, তেমন ফল ফলিয়া থাকে। বিশেষত সঙ্কোচ্যতা—নিষ্ফলা; সুতরাং বর্ত্তমান ভারতে শিক্ষা-বৃক্ষ দীর্ঘায়তন সতেজ ও পরিপুষ্ট হইয়াও সুফল প্রসব করিতে নিতান্ত অক্ষম। শিক্ষা দ্বারা পদ, সম্ভ্রম, সম্পত্তি লাভ হইয়াই থাকে; কিন্তু এই পদ, মান ও ধনের নিকট আত্ম বিক্রয় করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। আত্ম-বিক্রয় মহাপাপে ভারত স্বর্গ হইতে ঘোর নরকে পতিত হইয়াছে। এখনও যদি সেই অধঃপাতের প্রশস্ত বর্ত্মে ভীষণ মহাপাপ-আত্মবিক্রয়ের মহাস্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, তবে ভারতের উপায়? অতএব শিক্ষিত মণ্ডলীর কর্ত্তব্য,

যে সেবাবৃত্তি প্রাপ্তির আশয়ে যেন শিক্ষা ব্রতে ব্রতী না হন। আত্ম সংস্কার, জ্ঞান, এবং স্বদেশ ও স্বজাতির উদ্ধার ও মঙ্গল কল্পে শিক্ষা কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন; দেখিবেন—জন্মভূমির মলিন মুখ-চন্দ্রমা প্রসন্ন ও প্রফুল্ল হইয়াছে।

ভাই হাততালি।

ভাই হাততালি! তোমার দুটি হাতে ধরি, তুমি ভাই একবার ক্ষান্ত হও, তোমার চট চট গর্জ্জনে একবার বিরাম দাও। যে বিধির বিড়ম্বনায় অগাধজলে পড়িয়াছে, তাহাকে মাথায় ঘা দিয়া ডুবাইয়া দিলে আর কি পুরুষার্থ আছে? আমরা ত অগাধ জলেই আছি, তবে ভাই হাততালি! আর আমাদিগকে ডুবাইয়া দিবার জন্য তোমার এত আড়ম্বর কেন?

তুমিই ত স্বর্গের কেশবচন্দ্রকে মর্ত্তের মাটি করিয়াছিলে। সেই প্রশস্ত হৃদয়, সেই অগাধ অধ্যবসায়, সেই অচলা ভক্তি, সেই প্রবলা নিষ্ঠা, সেই আনন্দের ব্রহ্মানন্দ। তোমার চাটু-পটু চট চটিতে সে-হেন কেশবচন্দ্রের মস্তক ঘূর্ণিত হইয়াছিল, পদস্খলিত হইয়াছিল, তাঁহার শরীর অবশ করিয়াছিল। ভাই! এমনই করিয়া কি বাঙ্গলার মুখ হাসাইতে হয়! কালামুখ হাততালি তুমি ক্ষান্ত হও। তোমার গভীর গর্জ্জনের তাড়নায় দুর্জ্জয় কেশবচন্দ্রের তির্য্যক্ গমনের কথা ভাবিতে গেলে এখনও আমাদের হৃৎকম্প হয়। প্রথম সেই সুন্দর, গৌর, সৌম্য, শান্ত মূর্ত্তির ছদচ্ছাদিত সেই দেবব্রত, উপাসনা রত, নিষ্ঠাপূর্ণ, ভক্তিভর হৃদয়ের কথা মনে আসে; সঙ্গে সঙ্গে সেই কূট-দর্শন-তর্ক-ভেদকারিণী তীক্ষ্ণা বুদ্ধি, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রালোচনায় যাপিত সেই অগাধ পরিশ্রম, সেই অকাতর অবিরাম ধর্ম্মালোচনা, সেই উজ্জ্বল কিরণ বিকীরণ কারিণী উদ্দীপনা—সকলই মনে আসে। তাহার পর তোমার তালি-তাড়িত বায়ুবিগুণে,সেই ধীর প্রশান্ত মানবের,তখন ভ্রষ্ট ধূমকেতুর ন্যায় বিকক্ষে বিপথে, কেন্দ্র হইতে দূরে বিদূরে হিমপরি-পূরিত নীহারিকাময় গগন প্রান্তে পরিভ্রমণ সকলই মনে পড়ে। তখন ভাই হাততালি তোমার কৃতিত্ব চিন্তা করিয়া ভয় হয়, তোমার কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া তোমাকে ভাই বলিতে লজ্জা হয়; তোমার কৃতকার্য্যের পরিণাম ভাবিয়া অঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

আর তুমি একটির পর আর একটি, তাহার পর আর একটি এমনই করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাদের সকল শুভগ্রহেরই নিগ্রহ করিতেছ;—তোমার শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, শান্তি নাই। বরং জয়োন্মাদে উল্লাসিত হইয়া দিন দিন আরও বলসঞ্চয় করিতেছ—এই সকল কথা ভাবিয়া মন অস্থির হয়, হৃদয় নিরাশ হয়, প্রাণ শুকাইয়া যায়।

যে দিন শুনিলাম, তুমি কুহকী কতকগুলি লোককে কুহকে মজাইয়া মানুষকে অতিমানুষ বলিয়া পূজা করিতে লওয়াইয়াছ, আর তাহারা ভক্তি-তামসে জ্ঞানাচ্ছন্ন করিয়া, স্বর্গের কেশবচন্দ্রকে মর্ত্তের দেবতা বানাইতেছে, তখনই বুঝিলাম দুরাত্মন্ হাততালি তোমার নিশ্চয়ই দুরভিসন্ধি আছে। তোমার চাটুপটু রসনাধ্বনিতে নর-নারায়ণ অর্জ্জুন বিচলিত হইয়াছিলেন, দুর্ব্বল বঙ্গসন্তান যে বিচলিত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কেশবচন্দ্র ভ্রষ্টলক্ষ্য কক্ষনষ্ট হইয়া বিপথে বিচলিত হইলেন। একদিন যে কেশবচন্দ্র য়ূদীয় অবতার খ্রীষ্টের পূর্ণসত্তা হৃদয়ে ধারণ করিয়া, স্বীয় প্রশস্ত হৃদয়ের বিমল দর্পণে ঈশ্বরের অতুল জ্যোতি উজ্জ্বল কিরণে প্রতিভাত দেখিয়া ঈশ্বর সাক্ষাৎকারে, গভীর গর্জ্জনে সিয়ালদহের বিস্তৃত প্রকোষ্ঠ কম্পিত করিয়া বলিয়াছিলেন (Father forgive them; they knownot what they do.) "পিতঃ ইহাদিগকে ক্ষমা করিবেন,ইহারা জানে না যে কি করিতেছে।" সেই দিনের সেই ভক্তি হুঙ্কারে উপস্থিত সাক্ষণের পাষাণ হৃদয়ও চমকিত হইয়াছিল, দুর্জ্জয় ইংরেজও সেই ক্ষেত্রে তখন একবার ভাবিয়াছিলেন—বাস্তবিক তাঁহারা যে কি করিতেছেন,তাহা কি তাঁহারা জানেন না? কেশবচন্দ্রের সেই একদিন —আর সেই কেশবচন্দ্র কয়বৎসর পরে, তেমনই প্রকাশ্য স্থানে, তেমনই জনতা মধ্যে তেমনই উচ্চকণ্ঠে, পাতকি! তোমার কুহকে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন— (Yet I am a singular man) "তথাপি আমি একজন বিচিত্র মানব।" য়ূদীয় অবতারের পরিত্যক্ত সেই উচ্চ বেদীতে অধিষ্ঠিত কেশবচন্দ্র, আর এই গৌরীভার সেন বংশের ধরাতলস্থ কেশবচন্দ্র; সুমেরু কুমেরু ব্যবধানেও এই দূরত্ব পরিমাণের মাণদণ্ড হয় না। পোড়া হাততালি! তোমার কলঙ্কের কীর্ত্তিতেই না এই কাণ্ড হইল। ইহাতেই কি তুমি ক্ষান্ত হইয়াছিলে? তাহার পর সেই বিচিত্র মানবকে কন্যার সুখাভিলাষে বৈষয়িক করিলে, তাঁহার বক্ষ বিক্ষত করিলে, বুদ্ধি বিড়ম্বিত করিলে,— এখন সে সকল কথা ভাবিতে গেলেও শরীর সিহরিয়া উঠে। তাই

হাতে ধরে, ভাই হাততালি তোমাকে বলিতেছি—ভাই দিন কতক তুমি ক্ষান্ত হও। আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারিও না।

তোমার আর একবারের কলঙ্কের কথা বলি। বিদেশিনী দুঃখিনী বিদুষী রমাবাই ভিক্ষা করিতে ভ্রাতাসঙ্গে বঙ্গদেশে আসিলেন। তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিতা, ভাগবতে বুৎপন্না,তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী, পরিশ্রম নিরতা ও কার্য্যে পটীয়সী। এ হেন স্ত্রীরত্ন ভারতের আদরের ধন, সাধের সামগ্রী, আরাধ্য বস্তু, পূজনীয়া দেবতা। তিনি তখন কুমারী নবদুর্গা; সাক্ষাৎ ভগবতী। কুমারী পূজা ভারতে চির প্রচলিত। কিন্তু অভাগা বঙ্গবাসী তাহার চির প্রচলিত প্রথা এইবার পরিত্যাগ করিল। সসম্মানে কুমারীর পূজা করিয়া তাঁহাকে দক্ষিণা দিয়া বিদায় দিতে পারিত; তাহা করিল না; বুঝিল না। তুমি হাততালি, বালকের সহায়, নবরঙ্গের রঙ্গী; কিন্তু প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, সকলে তোমাকে সহায় করিয়া রমার তোষামোদ করিল। রমা বিদুষী হইলেও অবলা, পণ্ডিতা হইলেও কোমলপ্রাণা, বুদ্ধিশালিনী হইলেও ক্ষীণমতি। কাজেই রমার মাথা ঘুরিল; মন টলিল; হৃদয় গলিল; আগুণ জ্বলিল।—সে আগুণ এখনও নিবে নাই।

এক দিন ছিল, এক সময় ছিল, তখন রমার অগ্রজ সস্নেহ অথচ কর্কশ কণ্ঠে 'এ এ রমা' বলিয়া ডাকিলে রমা ভয়ে ভয়ে, ধীর পদবিক্ষেপে, ললাটে নাদবিন্দুধারিণী সাক্ষাৎ গায়ত্রী মত অগ্রজের পার্শ্বে সলজ্জভাবে আসিয়া দণ্ডায়মান হইতেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি পবিত্র সাবিত্রী বলিয়াই বোধ হইত। সেই রমা তোমার বায়ু বিগুণে বৈদেশিক আসুরিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হইয়া যে দিন দয়ানন্দ স্বামীকে সাহঙ্কার উত্তর প্রদান করিলেন; ভারতের গৌরবশ্রী যে দিন সেই উত্তরের অহম্মুখতায় অধোবদনে রোদন করিল; সেই আর এক দিন—আর-আর—যে দিন সেই রমা বিদেশে, বিবান্ধবে, বিচলচিত্তে বিধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন—সেই একদিন, সেই এক দুর্দ্দিন। তাই বলিতেছিলাম পোড়া হাততালি তুমি কি সকল সময়েই আমাদের কেবল অহিত সাধন করিবে? তোমার কি শ্রান্তি নাই, শান্তি নাই, ক্ষান্তি নাই।

ভাই হাততালি! আর যা কর, তা কর, দিন কতক গোটা দুই তিন লোককে স্থির থাকিতে দাও। স্থির হইতে দাও। দোহাই তোমার হাসি মুখের, দোহাই তোমার বিস্ফারিত চক্ষুর, দোহাই তোমার আনত মেরুদণ্ডের,

দোহাই তোমার দশ অঙ্গুলির, দোহাই তোমার শত বদনের, দোহাই তোমার সহস্র জিহ্বার, দিন কতক গোটা দুই লোককে তুমি স্থির হইতে দাও—তিষ্ঠিতে দাও।

একজন এই সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথ তরল, সুরেন্দ্রনাথ চপল; স্বীকার করিলাম সুরেন্দ্রনাথ একটুতে চালিত হন, একটুতে তাড়িত হন। স্বীকার করিলাম. সুরেন্দ্র বলিবার সময় কথার ঝোঁক এড়াইতে পারেন না, ছন্দের মায়া ভুলিতে পারেন না, বক্তৃতার লয় তালের জন্য লালায়িত। তবুত সুরেন্দ্রনাথ, দেশের জন্য লেখেন, দেশের জন্য বলেন, দেশের জন্য ভাবেন—আজিকার দিনে, সে কি কম কথা? স্বীকার করিলাম সুরেন্দ্রনাথ স্বার্থপর। অপরাধ লইও না. সকলে এক একবার আপনার বক্ষে হস্তদান করিয়া ঊর্দ্ধমুখে বল দেখি, তোমরা কি স্বার্থপর নও। স্বীকার করিলাম সুরেন্দ্রনাথ স্বার্থপর কিন্তু স্বার্থানুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি কি পরার্থ একেবারে ভুলিয়া যান? তাঁহার চরিত্র যে এরূপ বিসদৃশ তাহা ত স্বীকার করিতে পারিলাম না,—তবে তিনি স্বার্থপর হইলেন ত তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি? না—ভালতে মন্দতে এখনও সুরেন্দ্রনাথ আমাদের গৌরব; জাতির গৌরব; দেশের গৌরব। যদি সুরেন্দ্রনাথের অধঃপতন হয়,তবে সে আমাদেরই দোষে হইবে। আর কলঙ্কী হাততালি তোমার দোষে হইবে।

রাজনীতির অকূল-সাগরে সুরেন্দ্রনাথের চপলা-মতি তরণী একটুতেই বিক্ষোভিত হইতেছে; যে পার, সে রক্ষা কর; পাঠাবস্থা শেষ হইতে না হইতে তিনি সিবিল সার্ব্বিশ কমিশনরগণের বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত; রাজ-সেবায় প্রথম বয়সেই চপল স্বভাব নিবন্ধন লাঞ্ছিত; সম্পাদক জীবনের পাঁচ বৎসর না গত হইতেই সুরেন্দ্রনাথ রচনার অলঙ্কার দোষে কারাবন্দী—যে উঠিতে বসিতে আঘাত খাইতেছে, তাহার রাজনৈতিক জীবন যে কপটতা বা স্বার্থপরতার পরিচ্ছদ মনে করিতে চায়, সে করুক, আমরা তাহা করিব না। না সুরেন্দ্রনাথ সত্যসত্যই দেশহিতৈষী—এখনও সুরেন্দ্র-নাথ আমাদের জাতির গৌরব, দেশের গৌরব। তাঁহাকে প্রকৃত পথে চালিত করিতে পারিলে আমাদের দেশের লাভ, জাতির লাভ হইতে পারে তবে যদি সুরেন্দ্রনাথের অধঃপতন হয়—সে আমাদের দোষেই হইবে—আর কালামুখ তুমি, তোমার চটচটির খরতালে হইবে।

আর একদিকে, আর এক পথে আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল,

রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বঙ্কিম বাবু বা অন্যান্য খ্যাতনামা বর্ষীয়ানগণের কথা ধরি না। তোমার অসার আস্ফালনে উদাসীনতা প্রদর্শনের উপহাসে হাস্য করিবার অধিকার অনেক দিন হইল তাঁহাদের হইয়াছে। বয়স বিগুণে রবীন্দ্রনাথের সে অধিকার এখনও হয় নাই;—তাই হাততালি তাঁহার জন্য, আমাদের রবীন্দ্রনাথের জন্য, আজি তোমার কাছে আমাদের এই উপাসনা।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার দীপশিখা; ধীরে স্থিরে জ্বলিলে এই শিখা স্বীয় বর্দ্ধমান আলোকে চারিদিক আলোকিত করিবে; প্রাচীন হিন্দুর সুগন্ধি তৈল নিসেবিত দীপের ন্যায় সেই অমল আলোকের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত করিবে। সেই অমল, কোমল, কমল-শোভা-সমন্বিত মুখশ্রী,—সেই উজ্জ্বল, সলজ্জ ভাসা ভাসা, ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত-পদ্ম-পলাশ-লোচন—সেই ঝামর চামর-নিন্দিত, গুচ্ছে গুচ্ছে স্বভাব-বেণী বিনায়িত চিকুল ঝল ঝল মুখ মণ্ডল,—সেই রহস্যে আনন্দে মাখান, হাসি খুসী ভরা অধর প্রান্ত—সেই সৎচিন্তার প্রসর ক্ষেত্র, সুন্দর, শুভ্র, পরিষ্কার দর্পণোপম ললাট—ভগবানের এরূপ অতুল সৃষ্টি কখন বৃথা হইবার নহে। না, এখনও রবীন্দ্রনাথ আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল; তুমি না লাগিলে তিনি এখনও আমাদের দেশের গৌরব বলিয়া, পরিগণিত হইতে পারেন। তুমি না লাগিলে—আর তুমি লাগিলে? তোমার সেই লক্ষ হস্তের দশ লক্ষ চটচটি একবার প্রতি নিয়ত ধ্বনি করিলে, বীরের বীরাসন টলে, তা কোমল বঙ্গ সন্তানের কি আর স্থৈর্য্য থাকিবে? ভাই স্বীকার করিলাম তুমি বাহাদুর,—তুমি মনে করিলে বীরপাত করিতে পার, কিন্তু তোমার হাতে ধরি, বিনয় করি, তুমি দিনকতক ক্ষান্ত থাকিবে না কি?

চন্দ্রালোকে।

দাঁড়াও দাঁড়াও প্রিয়তম—এ পৃথিবীতে তুমি কাহার না প্রিয়তম!—দাঁড়াও আজ একটিবার ভাল করিয়া দেখি, চাঁদ! তোমার চাঁদ মুখখানি! তুমি থালের জলে আমার খেলার জন্য খসিয়া পড়িতে তখন দেখিয়াছিম

আর আজি আর একরূপ দেখিতেছি ; কত দিন কত রূপে, কত ভাবে, কত অবস্থায়, কত স্থানে, সজনে নির্জ্জনে,—সংসারে শ্মশানে,—সুখে সৌভাগ্যে, দুঃখে দারিদ্র্যে,—রোগে শোকে,—পাপে তাপে দেখিয়াছি তোমায় চাঁদ ! নভস্তলে দেখিয়াছি,—জাহ্নবী জলে দেখিয়াছি, সরোবর বক্ষে দেখিয়াছি, শয়নকক্ষে দেখিয়াছি,—ফুলের বুকে, রমণীর মুখেও দেখিয়াছি। আলোকে আঁধারে, আশায় নিরাশায়,—তোমার ঐ অতুল সৌন্দর্য্য রাশি সন্দর্শন করিয়াছি। উত্তুঙ্গ গিরি-শেখর সন্নিভ উচ্চতম স্থানে আরোহন করিয়া, আবার আমার নিজের ন্যায় নিম্নাদপি নিম্নে নিমজ্জিত হইয়া,—তোমার হাসির হিল্লোলে, কমনীয় কাঞ্চন-কিরণ জালে, গা ঢালিয়া দিয়াছি। এক দিন, দুই দিন, শত সহস্র দিন দিয়াছি। আমি মেঘের 'আড়াল' হইতে তোমায় উকি মারিতে দেখিয়াছি, গবাক্ষ ভেদিয়া নিভৃত কক্ষস্থিতা কামিনীর কমনীয় কপোলদেশে কুটিল কটাক্ষপাত করিতে দেখিয়াছি,—আবার তখনি সসম্ভ্রমে মেঘের অভ্যন্তরে যাইয়া তোমাকে লুকাইতেও দেখিয়াছি;—তোমার কি না দেখিয়াছি,—তোমায় কবে না দেখিয়াছি ! কৌমুদী নিশায় যখন তোমার পূর্ণ প্রফুল্ল জগৎবিস্তৃত গৌরব, শুভ্র সুবিমল অনন্তোচ্ছ্বসিত জ্যোতি—আর সে জ্যোতি পৃথিবীর প্রত্যেক পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট—তখন তোমার সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের, মোহকরী মাধুর্য্যের দিনে, বিলাস-বৈভব সুখ সোহাগের দিনে তোমায় অবশ্যই তো দেখিয়াছি;—কিন্তু তারপর যে দিন তুমি নীরদ-জাল-জড়িত, তামস-কালিমাক্রান্ত, শীত-শিশির-কুণ্ঠিত, মৃদু ও ম্লান-জ্যোতি, বিষাদিত ও বিমর্ষ-ভাবাপন্ন,—সেদিনে, তোমার সেই দুর্দ্দিনেও তোমাকে নিরীক্ষণ করিতে ভুলি নাই। যখন তুমি তোমার সদর রং মহলে সাধারণ দরবারে,—প্রকাশ্য দেওয়ান-আমে পূর্ণ-মজলিসে বারদুয়ারী এজলাসে বার দাও, তখনও তোমায় দেখিয়াছি ; আর যখন তুমি তোমার 'খাস কামরায়'—'প্রাইভেট চেম্বারে' বসিয়া হাস্য কৌতুক রংতামাসা কর, আত্ম-চিন্তা বা পরচর্চ্চা কর তখনও তোমার উপর দৃষ্টি চালাইয়াছি। নিস্তব্ধ নীরব সুষুপ্ত নিশীথ সময়ে বা নিশিদিবার সন্ধিস্থল প্রদোষ কালে, তোমার প্রবেশ ও প্রস্থানের প্রারম্ভে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। আমার অনেক অবস্থা তুমি দেখিয়াছ—তোমারও অনেক অবস্থা আমি দেখিয়াছি। কিন্তু চাঁদ প্রিয়তম ! আমার পাপপুণ্যের সুদিন দুর্দ্দিনের প্রকৃত সাক্ষী, আমার নির্জ্জনের সঙ্গী, চিন্তার অবলম্বন, দুঃখ শোক, ভাবনা যাতনার নির্ম্মম পরিদর্শক—বলি

চাঁদ! তোমায় এতকাল ধরিয়া দেখিতেছি কিন্তু তোমায় কি পুরাণ হইতে নাই? জগৎ সংসার পুরাণ হইয়া গেল,—আমি নিজের নিকট নিজে নিতান্ত পুরাণ হইয়া পড়িলাম, কাল যাহা দেখিলাম আজ তাহা পুরাতন, প্রাতে যাহা দেখিয়াছি রজনীতে তাহা নূতনত্ব বর্জ্জিত। কিন্তু তুমি কি, যা তাই থাকিবে? যা তাই বা কেমনে বলি? তুমি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তেই অভিনব; সম্যক্ প্রকারে নূতন। এমনি নূতন, এতাদৃশ অভিনব যে এতকাল আজন্মকাল দেখিয়াও বোধ হইল না যে তোমায় কখনও দেখিয়াছি। চাঁদ! তুমিও পুরাণ হলে না, তোমায় দেখার ক্ষোভও মিটিল না। আকাঙ্ক্ষা অটুট রহিল, দৃষ্টি হারি মানিল, 'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।' চাঁদ! তোমার নিত্য নবযৌবন, নিত্য নবজীবন, নবভাব, নবরাগ, নিত্য নব সৌন্দর্য্য, অতুল ঐশ্বর্য্য। তোমাকে কত ভাবে কত রূপে, কত লোকে কত কাল হইতে দেখিয়া আসিতেছে, অনাদি অনন্ত কাল হইতে অসংখ্য লোকে দেখিতেছে, ভাবিতেছে, আলোচনা করিতেছে, উচ্চকণ্ঠে সহস্র মুখে তোমার স্বরূপের ব্যাখ্যা করিতেছে, সৌন্দর্য্যের ঘোষণা করিতেছে। যোগী ভোগী উভয়েই তোমাকে সম্ভোগ করে। পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, কবি অকবি, প্রেমিক অপ্রেমিক, রসিক অরসিক, বালক বৃদ্ধ, যুবা সকলেই ত তোমায় লইয়া ব্যস্ত। কে না তোমার রূপে মুগ্ধ? সৌন্দর্য্যে উন্মত্ত? তোমায় দেখিয়া অকবি কবি হয়, অপ্রেমিক প্রেম শিখে। তোমার এই কোমল কিরণ স্পর্শে পাষাণ বিগলিত হইয়াছে, জড় জাগরিত হইয়াছে, বহুকালব্যাপী বিশুষ্কতায় রস সঞ্চারিত হইয়াছে। তুমি কঠিন তরল কর, জটিল সরল কর, পঙ্কিল স্থানেও প্রীতি ঢালিয়া দাও, অসার হৃদয় উত্তপ্ত করিয়া তোল, তোমার এমনি মাধুর্য্য, এতই সৌন্দর্য্য চাঁদ। এ সংসারে সৌন্দর্য্যের পরিমাণ তুমি। তোমারই অনুপাতে লোকে সৌন্দর্য্যের তুলনা করে, তোমারই তুলনায় ভৌতিক সৌন্দর্য্যের তারতম্য হয়। তুমিইত সৌন্দর্য্য বিজ্ঞানের সারসত্তা। তুমি দার্শনিকের দর্শন, কবির সুচির অবলম্বন, ভাবুক প্রেমিকের বুকভরা ধন। কাব্য অলঙ্কার তোমাকে লইয়া, বিজ্ঞান দর্শনে তুমি পরিব্যাপ্ত, তুমি সাহিত্যের সর্ব্বাগ্র ভাগ। সৌন্দর্য্য বৈচিত্র্যের প্রধান উপকরণ তুমি। যেখানে প্রণয়োচ্ছ্বাস, আমোদ উল্লাস, মধুরতা প্রফুল্লতা, কান্তি-কমনীয়তা, যেখানেই সুদৃশ্য ও সৌন্দর্য্যের সমাবেশ—সেইখানেই তুমি। তোমার জন্যই কালিদাসের কবিত্ব—সেক্সপিয়রের

অমরুস্থ। তুমি রোমিও জুলিয়েটের প্রেমালাপ অত মধুর, অত সুন্দর, অত গাঢ়, অত প্রাণস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছিলে। তুমিই লোরেঞ্জো জেসিকার কোমল প্রাণে কোমল জ্যোৎস্না ফুটাইয়াছ। সমগ্র সুকুমার সাহিত্যে তোমার সৌন্দর্য্য প্রকাশ; যে সাহিত্যে তুমি নাই সে সাহিত্যই নহে। যে কাব্যে তুমি নাই সে কাব্যই নহে। জগতের যাবতীয় জাতি—সভ্য অসভ্য, শিক্ষিত অশিক্ষিত,বন্য নগ্ন,অমার্জ্জিত পশুভাবাপন্ন হইতে শত সংঘর্ষণ-সংস্কৃত সুমার্জ্জিত, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিধৌত, প্রকৃষ্ট পরিচ্ছদ-সজ্জিত, সমাজ-বন্ধন-বিজড়িত, আধ্যাত্মিক উন্নত জাতি তোমার সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতেছে, ব্যয় করিতেছে, বিলাইতেছে, অনাদি অনন্তকাল হইতে তোমার সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া সাঁতার দিতেছে, আর তাহা লইয়া ফেলাইয়া ছড়াইয়া ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু তবুত এ সৌন্দর্য্য ফুরাইল না। তবুও এ সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ, অটুট,অক্ষয়,'পূর্ণ কাণে কাণ,' অনুপম,অভিনব। তুমি পুরাতন পদার্থ—কত সৃষ্টি-স্থিতি-লয় নিঃশব্দে দেখিয়াছ; কত বিপ্লব বিপর্য্যয়, উত্থান পতন দেখিয়াছ; কত সম্রাটের সাম্রাজ্যের, কত ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বের প্রারম্ভ ও শেষ দেখিয়াছ; তবুও—দৈনিক সংসারের সামগ্রী অনায়াসলব্ধ পুরাতন হইয়াও—তবু নিত্য নবজীবন নব সৌন্দর্য্য-সমন্বিত।

কিন্তু তুমি কি? তুমি কি তাহা জানি না,—জানিতে চাই না। তোমার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমি বুঝিতে পারি না। মূর্খ বৈজ্ঞানিক,উন্মাদ জ্যোতির্ব্বিদ বলে তোমার জ্যোতি নাই, তোমার দ্যুতি নাই! হরি হরি চাঁদে জ্যোতি নাই! আগুনে উত্তাপ নাই! জলে তারল্য নাই! বিজ্ঞান তোমাকে দূর হইতে নমস্কার। আমার মূর্খতাই অনন্তকাল ব্যাপী হউক! ভাল ঐ যে নরম নরম, মধুর মধুর,—আরাম—আবল্যের আকর, মিষ্ট মদিরাময়ী জ্যোৎস্না—ঐ যে শুভ্র,সুস্নিগ্ধ, সোহাগ-সুখ আর শান্তিতে ভরা—আনন্দোৎফুল্ল, সমীর-দোদুল্য—প্রীতি-বিস্ফারিত অনন্ত উচ্ছ্বসিত আলোক স্রোত,প্রত্যেক অণু-পরমাণুকে স্নান করাইয়া করাইয়া ভাসাইয়া ভাসাইয়া লহর তুলিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতেছে, নাচিয়া নাচিয়া সুধা ছড়াইতেছে আর প্রেমের ক্ষুধা বাড়াইতেছে—উহা কার? ঐ জ্যোতি, ঐ দ্যুতি, ঐ আলোক কার? তুমি সূক্ষ্মদর্শী, শুষ্ক-গণনা-তৎপর, হৃদয়হীন, নির্ম্মম বৈজ্ঞানিক—তুমি বলিলে "উহা সূর্য্যের আলোক, চন্দ্রের নিজের আলোক নাই, সূর্য্যের জ্যোতি চন্দ্রে পড়িয়া এ জ্যোৎস্না ফুটাইয়াছে।" ভাল তাহাই হইল। মানিলাম সূর্য্যের

জ্যোতি চন্দ্রে পড়িয়া এই জ্যোৎস্না ফুটাইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি? তাহাতে কি আমার চাঁদের অগৌরব না অধিকতর উচ্চতর গৌরব! ঐ চাঁদ—মিষ্ট মনোহর চাঁদ—উদার অতুল্য প্রেমময় চাঁদ নিজের হৃদয়ের সুধা দিয়া—অমূল্য অনুপম দেববাঞ্ছিত সুধা দিয়া ভিজাইয়া ভিজাইয়া সেই খরতর রবি কিরণ, ভীম মার্ত্তণ্ডজ অগ্নিময় উগ্র রশ্মি-রাশি এত কোমল এত মধুর করিয়াছেন; এই কমনীয় স্পৃহনীয় রমণীয় প্রাণস্পর্শী জ্যোৎস্নায় পরিণত করিয়াছেন। ধন্য ধন্য হে প্রেমাস্পদ! তোমার প্রণয়ের পরাক্রম—তোমার সৌন্দর্য্যের সোহাগ আর তোমার ঐ—ঐ বিধুমুখের হাসিটুকু! আজি সূর্য্যরশ্মি—শোধিত, মার্জ্জিত, সৌন্দর্য্য-সমন্বিত তোমারই সংস্পর্শে! তোমার মধুরতার এত শক্তি!! যাক্ ও সকল বাজে কথা যাক্; একটা গোপন কথা আছে আজ তোমার সনে কুমুদ বঁধু। তুমি থাক থাক থাক না, কোথা যাও বল দেখি হে? একদিন তোমার পূর্ণ বিকাশ, সারানিশি সহবাস কুমুদিনী কোলে, আর একদিন তাহাকে একটিবারও না দেখা দিয়া, গভীর আঁধারের ভিতর ডুবাইয়া রাখিয়া, কোথায় জানি না তুমি যাও চলে। এ তোমার কেমন ভাব, কেমন ভালবাসা? প্রণয়ের এই কি রীতি হে? এই রীতিই বটে; এই বিরহ ভাব এই বিচ্ছেদ বহ্নিই তো প্রণয়ের অস্থি, মজ্জা প্রাণ। যে প্রেমে বিরহ নাই, বিচ্ছেদ নাই তাহা বিশুষ্ক না হইলেও বেগবিহীন, সরস হইলেও সংকীর্ণ। প্রেমের উদারতা মধুরতা গভীরতা পবিত্রতা—বিচ্ছেদে আর বিরহে। বিরহ প্রণয়ের কড়িকা ফুটাইয়া দেয়, প্রবাহ ছুটাইয়া দেয়, প্রণয়কে ভাদ্রের ভরা গঙ্গায় পরিণত করে। বিরহ অর্থে প্রণয়ের পুনরুদয় ও সঞ্চয়, বিনাশ বা ক্ষয় নয়। বিরহে—বৈরাগ্য, বৈরাগ্যে—প্রেম,প্রেমে—জগৎ বাঁধা। বলি চাঁদ! তুমি প্রকৃতির প্রেম বাড়াইবার জন্য,—আসক্তি উদ্দীপ্ত করিবার জন্য—আকাঙ্ক্ষা অনুরাগ ঝালাইয়া নির্ম্মল করিবার জন্য মাঝে মাঝে পলাতক হও বটে? তা পলাও তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু যখন থাক, তখন অত চপলতা কেন? চাপল্য কি তোমায় ছাড়িতে নাই? চিরকালই কি তুমি চঞ্চল থাকিবে? আমি বলি চাঁদ তুমি এখন একটু গম্ভীর হও। তোমার গাম্ভীর্য্য দেখিতে আমার বড় ইচ্ছাকরে। মনোমোহন সৌন্দর্য্যে স্থৈর্য্য গাম্ভীর্য্য দেখি, বড় সাধ। আহা নিশীশ্বর! তুমি যদি আর একটু গম্ভীর হইতে দুইটা কথা প্রাণ খুলিয়া সুধাইতাম। সুধাইব সুধাইব মনে করি, তোমার ভাব দেখিয়া ভয়ে লুকাইয়া রাখি হৃদয়ের

ব্যথা, হৃদয়ের নীচের তলায়। কেমনে বলিব 'কেমনে সুধাইক' চাঁদ! তোমার যে হাসি। তোমার মুখভরা হাসি,—আমার বুকভরা বিষাদ। তোমায় আমায় আর কেমনে মিলিবে চন্দ্রমা। তোমার সহিত আমার আর বনিবে না। আমার জীবন পুরাতন হইয়াছে। তোমার হাল্‌কা হাসির সহিত আমার হৃদয়ের আর সাদৃশ্য নাই। আমার হৃদয় ভারি। ভারি হাল্‌কায় মিশে না। তবুও যে তোমায় ভালবাসি সে কেবল অভ্যাসের দোষে আর বোধ হয় 'ভ্রান্তির ছলনায়'। কিন্তু দেখ চাঁদ! তোমারও তো হ্রাস বৃদ্ধি আছে; উদয় ক্ষয় আছে,—সঞ্চার ব্যভিচার উভয়ই আছে। আমি মনুষ্য সন্তান আমারও ঐ সকল আছে। কিন্তু সে আর এক প্রকার। আমার ক্ষয়ের পর সঞ্চয় নাই—আমাতে সঞ্চার সংকীর্ণ, ব্যভিচার পদে পদে। আমার আসক্তি আছে, শক্তি নাই; সংশয় আছে, অভ্যুদয় নাই। আমার জ্ঞান কার্য্য হইতে অন্তর। আমার ভ্রান্তি পদে পদে, শান্তি সন্ধানেরও অতীত। তবে কি বাসনানলে পুড়িয়া মরিবার জন্যই মনুষ্য জন্ম!!!

তুমি হাসিয়া হাসিয়া যাহা বলিতেছ তাহা আমি শুনিতে পাইতেছি কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি বলিতেছ—"সাধের মনুষ্য জন্মে কি না আছে, মানুষ অতুল ঐশ্বর্য্যান্বিত হইয়াও আর্ত্তনাদ করে কেন?" আমি এ কথা অনেক বার শুনিয়াছি, এখনও চাঁদ তোমার ঐ চাঁদমুখে শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু এ কথা কখনও বুঝিতে পারি নাই এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। 'সাধের মনুষ্য জন্ম'! সাধেরই বটে! কিন্তু প্রমাদ যে পদে পদে! প্রমাদ-পারাবার পার হইবার উপায় কই? 'মানুষ অতুল ঐশ্বর্য্যান্বিত'। 'অতুল' হউক না হউক, 'ঐশ্বর্য্যান্বিত' তাহাতে সন্দেহ নাই। মানুষের হৃদয় মন প্রকৃত ঐশ্বর্য্য বটে। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের উপর আঘাত অসংখ্য। কয়টা মানুষ আঘাতের পর আঘাত খাইয়া হৃদয় মন বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছে? কয় জনে পারিয়াছে জানি না কিন্তু আমি ত পারি নাই। আমার মন বিপন্ন, হৃদয় অবসন্ন—জীবনের মূল ছিন্ন ভিন্ন। চন্দ্র প্রিয়তম! তুমি এমন তর মানুষের ব্যথার ব্যথী হইতে পার কি? বোধ হয় পার না। নহিলে এখনও হাসিতেছ কেন? * * * * * * * * * কি বলিলে? "নূতন চক্ষে এই পৃথিবী দেখিতে হইবে?" নূতন চক্ষে এ ধরাধাম দেখিব? তা ত আমি পারি না। চক্ষে যে আর জ্যোতি নাই। যে একধার আছে তাহা দূষিত কলুষিত। সেই পুরাতন দৃষ্টি কেমনে নূতন করিব। সেই স্থানে—সেই স্মৃতি, সেই সংসার, সেই

আমিষ এ যে সব পুরাতন। এ পুরাতন নূতন হইবে কিসে? এ ঊষর-ক্ষেত্র উর্ব্বর করিবে কে? এ অপরিষ্কার, অশুচি, পতিত, পূতিগন্ধময় প্রাণ শান্তি-সলিলে বিধৌত করিবে কে? ইহা যে স্পর্শেরও অযোগ্য—কে উহা স্পর্শ করিবে? পঙ্কিল শত ছিদ্র মৃন্ময় অশুদ্ধ আধারে কে স্বর্গীয় সুধা ঢালিতে প্রস্তুত? ভগ্ন, চিররুগ্ন, বিশুষ্ক, বিকারগ্রস্ত দেহে নবজীবন সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব নহে। কে এ দুর্ঘটন ঘটাইতে সমর্থ? এ হৃদয়-বিকার, মানসিক অস্বাস্থ্য দূর হইবে কি কখন? এ জীবনে, যে ঔষধে যে আব হাওয়ায়, এ ব্যাধি মুক্ত হওয়ার সংবাদ শুনিয়াছি—সে ঔষধ সে আব হাওয়া পাপীর আয়ত্তাতীত। পাপীর যদিও আয়ত্তাধীন হয় সংশয়ীর কখনও নয়। পাপী তবু দলে আছে, সংশয়ী দুয়ের বাহির। সংশয়ী পাপীরও অধম—ঘৃণিতেরও ঘৃণিত।

স্বর্গের ঔষধ আমায় কে আনিয়া দিবে? পঙ্কিল, লৌহ-অর্গল-বদ্ধ নরক গহ্বরে স্বাস্থ্যকর গিরি-সমীর কিরূপে প্রবেশ করিবে! হা অদৃষ্ট! একবার যদি সেই অদৃষ্টকে ডাকিতেও পারিতাম! শুনিয়াছি যিনি অনাদি অনন্ত-দেব, সর্ব্বশক্তিময়, সর্ব্বমঙ্গলময়—যদি একটিবার তাঁহাকে ডাকিতেও পারিতাম! কিন্তু সে অধিকার নাই। সংশয়ীর ডাকিবার অধিকার নাই। ভাবিবার অধিকার নাই! সে স্বর্গের দেবতার নাম উচ্চারণ করিতেও অসমর্থ। এ পবিত্র সান্ত্বনাময় অধিকার তাহাকে কে দিবে! তুমি বলিতেছ 'এ আবার একটা অধিকার কি! ইহা তো সকলেরই আছে—ডাক না ঈশ্বরকে?' কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি কেমন করিয়া ডাকিব? তেমন ডাকা তো ডাকিয়াছি। নারায়ণ,শ্রীমধুসূদন—বহুবার উচ্চারণ করিয়াছি এখনও করিয়া থাকি। কিন্তু কৈ কিছুই তো হইল না। পাপ প্রাণ পাপে ডুবিয়া রহিল। নবজীবন আসিল না, হৃদয়ভার ঘুচিল না। স্বার্থে, লোভে; নীচতায়, হীনতায়; ব্যভিচারে, বিকারে; সেই একই রূপ রহিল।

অধিকারে অনধিকার! জাগরণে নিদ্রা—'চেতনে অচেতন'—জীবনে মৃত্যু! কি ভয়ানক ব্যাধি! চিকিৎসক ডাকিব? ডাকায় না ডাকা। মনের সহিত বচনের মিল হয় না। বাসনার সহিত ভাবনার ঐক্য হয় না। মলিন হৃদয়ের অগ্নি-সংস্কার প্রয়োজন। অগ্নি ভিন্ন এত মলা উঠিবে না। কিন্তু আগুন নাই। যাহা আছে তাহা পাপাগ্নি—নরকাগ্নি। এ আগুনে কেবল পোড়ায়, পরিষ্কার করে না। এ অনল নিবাইতে তুষানল ভিন্ন কি অন্য

প্রায়শ্চিত্ত নাই? তুষানল কিরূপে করে জানি না। তবে শরীরের নির্য্যাতনে যদি মনের ব্যাধি ঘুচে, হে সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বনিয়ন্তা! সে অধিকার এই নিশীথকালে পাপী তোমার নিকট যাজ্ঞা করিতেছে।

চন্দ্র! ধীরে ধীরে তোমার সময় আজিকার মত শেষ হইয়া আসিল। আলো নিবাইয়া এখনি তুমি প্রস্থান করিবে। প্রকৃতির হাস্য বদন এখনি নিশীথ তমসাবৃত হইবে। এ সংসার এখনি ঘোর আঁধারে ডুবিবে। ডুবিবে ডুবুক। পীড়িত প্রাণ আঁধারের অভ্যন্তরে ডুবাইয়া রাখি। ডুবাইয়া রাখিব কিন্তু ঢাকিতে পারিব না। আঁধারে ত আঁধার-হৃদয় ঢাকে না। নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত ঢাকে—স্থাবর জঙ্গম আঁধারে ঢাকে। কেবল মনোমালিন্য ঢাকে না। তবে দিবার আলোক অপেক্ষা নিশীথ আঁধারের সহিত আমার মনের যেন কথঞ্চিৎ সহানুভূতি আছে।

অহো দিবার আলোক! উহা বড়ই তীব্র পদার্থ, দুর্ব্বলের দারুণ যাতনা দায়ক। দুঃখী, দরিদ্র, হতভাগ্য,—আশা-প্রবঞ্চিত, প্রত্যাখ্যাত—তীক্ষ্ণ সংসারাঙ্কুশ-ব্যথিত—ইহারা সকলেই দিবালোক ডরায়। উহা যেমন প্রচণ্ড, তেমনি নৃশংস আর তেমনই রুক্ষ। আমি উহার মধ্যে মানুষের অমানুষত্ব, হৃদয়-হীনত্ব দেখিতে পাই—সংসারের মর্ম্মভেদী সমর-বাজনা শুনিতে পাই। সে বাজনায় আমার শরীর লোমাঞ্চিত হয়, রক্তকুম্ভে রক্ত শুকাইয়া যায়। আর দিবালোকের আভ্যন্তরিক শক্তির তো কথাই নাই। সে শক্তি কি সহ্য করা ধারণ করা ত দূরের কথা,তাহার সম্মুখীন হইতেও আমি অসমর্থ। আমিসূর্য্য-রশ্মির তীব্রতা সহিতে পারি না। তাই চাঁদ তোমার কোমলতর কিরণটিকে আরও ভালবাসি। ইহার তলায় বসিয়া একটু জিরাইতে আসি। কিন্তু তুমি জিরাইতে দাও না, পাগল করিয়া তুল। তোমার আলোক স্রোতে নামিয়া ডুব দিলে মানুষ যাথার্থই উন্মাদ হয়। নইলে প্রহেলিকা আর প্রলাপ বকিবে কেন? তোমার আলোকের মাদকতায় উন্মাদ হই—কাযেই তোমায় দেখিতে পাই না—তোমার প্রকৃত সত্তা বুঝিতে পারি না। উন্মাদ কি বুঝিবে সুধার স্বাদ। তাই বলি, চাঁদ তোমায় দেখা হইল না। আজন্মকাল দেখিয়াও দেখা হইল না। দেখা হইল না, শুধান হইল না। যে অনন্ত সৌন্দর্য্যের কণামাত্র পাইয়া তুমি সুন্দর, যাঁহার হস্তের ক্রীড়নক মাত্র তুমি, যাঁহার ক্ষণিক লীলা তোমার এত লাবণ্যের হেতু—তাঁহার কথা শুধান হইল না। তিনি কে, তিনি কেমন, তিনি কোথায়,

তোমায় জিজ্ঞাসা করা হইল না। শুনিয়াছি এসব তত্ত্ব স্বর্গের সুনিশ্চিত সংবাদ তোমার বক্ষে লেখা আছে। কিন্তু হায় তুমি অদৃষ্ট—অপঠিত রহিলে। পাপচক্ষু তোমায় পাঠ করিতে পারিল না। তোমার উপর অনেক অক্ষর অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিতেছি বটে, কিন্তু আমার যে বর্ণপরিচয় হয় নাই। আমি কেমনে উহা পড়িব। আমার কাছে ও সকলই অস্পষ্ট। দেবতা তোমার পায়ে ধরি, আমায় অক্ষর চিনাইয়া দাও, একটিবাঁর বৈকুণ্ঠধামের সংবাদ পড়িয়া দেখি। চন্দ্র! আমার চোখ ফুটাইয়া দাও তোমার জ্যোতির্ম্ময় আধারে একটিবার জগৎপিতার চরণ কমল সন্দর্শন করি। হায়! এমন দিন কি হবে,যবে তোমার বক্ষে লিখিত প্রত্যেক অক্ষর পাঠ করিতে শিখিব—তোমার রশ্মির রেখায় রেখায় অনাদি অনন্তদেব বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পতির আবির্ভাব অনুভব করিতে পারিব! আহা! পাতকীর কি নবজীবন সম্ভব? মরি মরি চাঁদ! তুমি নিঃশব্দে বলিতেছ "এখনই এই মুহূর্ত্তেই সম্ভব, যদি সে চায়।" সুধাকর! তোমার এই ইঙ্গিত বড়ই আশাপ্রদ। বুঝি না বুঝি তোমার এই ইঙ্গিতে ক্ষণেকের জন্য স্বর্গের সঙ্গীত শুনিলাম। আশীর্ব্বাদ কর, ইহা—পাপী পুণ্যবান—বিশ্বাসী সংশয়ী উভয়েরই প্রাণে যেন অহরহ প্রতিধ্বনিত হয়।

ভালবাসা।

ভালবাসা একটি মহাযজ্ঞ। এ যজ্ঞের আহুতি স্বার্থ, দক্ষিণা আত্মদান। স্বার্থত্যাগে ভালবাসার আরম্ভ, আত্মদানে তাহার পূর্ণ বিকাশ। যিনি ভালবাসিতে পারেন তিনি যথার্থ ভাবুক, তিনি যথার্থ প্রেমিক, তাঁহার গুণের সীমা নাই, তিনি জগতে অতুল্য। তুমি যদি ভালবাসিতে চাও, তবে অগ্রে আপনার স্বার্থ বলিদান দাও। আপনার পৃথগস্তিত্ব ভুলিয়া যাও, অন্যের অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব মিশাইয়া দাও, আপনার বলিতে যাহা কিছু আছে সর্ব্বস্ব অন্যের হাতে আনিয়া দাও—পরকে তোমার আপনার করিয়া লও।

সাধারণত, দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কাজ করিতে হইলে লোকে অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাতে হাত দেয়। আগের দিকে একটি পা

বাড়াইতে হইলে শরীরের সমস্ত ভারটুকু অপর পায়ের উপর রাখিয়া ক্রমে ক্রমে নিক্ষিপ্ত পদের উপর ভার সঞ্চালন করিয়া থাকে। পিচ্ছিল ভূমিতে চলিতে হইলে অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া চলিতে থাকে, প্রত্যেক পায়ের পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি তিল পরিমিত স্থানের পরীক্ষায় নিয়োজিত হয়। কিন্তু ভালবাসিতে হইলে ওরূপ করিলে চলে না—ভালবাসা সন্দিগ্ধ মনের কর্ম্ম নয়। সন্দিগ্ধচেতা লোকে কখন ভালবাসিতে পারে না। কারণ তাহার মন বিশ্বাস করিতে শিখে নাই। একটি সামান্য বস্তুও সে কাহাকেও দিতে চায় না। কোন কারণে কাহাকেও কিছু দিতে হইলে বা কাহারো উপর কোনও বিষয়ের ভারার্পণ করিতে হইলে সে সর্ব্বদাই ইতস্তত করিতে থাকে, সে ক্ষণে ক্ষণে সন্দেহ দোলায় দুলিতে দুলিতে মনে কতই অশান্তি কতই গ্লানি না অনুভব করে। অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তুর সম্বন্ধে যাহার মনের গতি এরূপ, সে কেমন করিয়া আপনার মনপ্রাণ অন্যের হস্তে সমর্পণ করিবে? কেমন করিয়া সে আপনার অস্তিত্ব অন্যের অস্তিত্বে লীন করিয়া হরিহররূপে একাত্ম হইতে পারিবে? আর কেমন করিয়াই বা সে ভালবাসার চরম সীমায় উঠিয়া আকণ্ঠপূর্ণস্বরে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই মহান্ সত্য উচ্চারণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে পারিবে? তাই মহাত্মা তুলসী দাস বলিয়াছেনঃ—"বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা"।

যাঁহাদের মন সর্ব্বদা সন্দেহপূর্ণ, তাঁহাদের ভাগ্যে যেমন ভালবাসা ঘটে না, সেইরূপ আবার যাঁহারা বিচারক—যাঁহারা বিচার বিতণ্ডা করিয়া আবর্জ্জনা হইতে বাছিয়া গুছিয়া খাঁটি মাল পাইবার জন্য মার্জ্জিত এবং শাণিত বুদ্ধির চালনা করিয়া থাকেন—তাঁহারাও ভালবাসার মধুর স্বর্গীয় ভাব অনুভব করিতে পারেন না। অনুভব ত দূরের কথা, কখন কল্পনাতেও আঁকিতে পারেন না। সন্দেহ, বিচার বা তর্কের অবশ্যম্ভাবী ফল—জ্ঞান। অর্থাৎ অনুসন্ধান পরায়ণ ব্যক্তি সহজেই জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারেন কিন্তু তাঁহার পক্ষে ভালবাসা তত সহজ প্রাপ্য নহে। জ্ঞানের গতির স্থানে স্থানে বিরাম আছে কিন্তু ভালবাসার বিরাম নাই—উহা অবিশ্রাম স্রোতোবহা নদীর ন্যায় একটানে চলিয়াছে। যেখানে উহার গতির বিরাম সেই খানেই এক অসীম অনন্ত মহাসমুদ্র। সেই খানেই এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড একাকার—লঘুগুরু ভেদ নাই, আত্মপর ভেদ নাই, পাপপুণ্য, সুখদুঃখ, তুমি আমি, ব্রাহ্মণ শূদ্র কিছুরই ভেদ নাই—সবই একভাবে ভাবময়, সেখানে প্রেম লইয়া কাড়াকাড়ি,

সেখানে ভালবাসার ছড়াছড়ি। তুমি জ্ঞানী হইয়া ভালবাসিতে চাও, বহু বিলম্বে তোমার সিদ্ধি হইবে। কিন্তু প্রকৃতিগত ভালবাসা বৃত্তির গতির বাধা না জন্মাইয়া যদি উহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হও, তবে দেখিবে, অবিলম্বে তোমার মনস্কাম পূর্ণ হইবে। কারণ, কাহাকে ভালবাসিতে হইবে, তাহা শিক্ষা করিবার জন্য জ্ঞানের সাহায্য লইতে হয় না বা বিচার বিতণ্ডা করিতে হয় না, মন আপনিই তাহার মীমাংসা করিয়া লয়—মন ভালবাসার পাত্রকে ভাল করিয়া চিনে। তাই কবিগুরু কালিদাস বলিয়াছেন :—"মনোহি জন্মান্তর সঙ্গতিজ্ঞম্।"

ভালবাসার কাছে জাতিভেদ নাই, সুন্দর কুৎসিৎ ভেদ নাই, শত্রু মিত্র একই কথা। তাই শত্রুপক্ষীয় হইয়াও রোমিও জুলিয়েট্‌কে ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন। যদি ভালবাসার ভেদাভেদ জ্ঞান থাকিত, তাহাহইলে উহাকে স্বর্গীয় না বলিয়া পার্থিব বলিয়া ডাকিতাম, অমরাবতীর সিংহাসন হইতে নামাইয়া মরতের সিংহাসনে বসাইতাম। ভালবাসা অপার্থিব ধন। তাই বলিয়া উহার ব্যাপ্তি ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া, ক্ষুদ্রাধারে উহার থাকা চলে না। যেথানে উহার পূর্ণ বিকাশ সেই খানেই উহা উথলিয়া উঠে, সেই খানেই উহার তরঙ্গ উচ্ছ্বাস—সে উচ্ছ্বাস কেহ দেখিতে পায় না, কারণ তাহার আস্ফালন নাই; সে উচ্ছ্বাস কেহ বুঝিতে পারে না, কারণ তাহা অতি গভীর। ভালবাসা সেখানে স্পন্দহীন, নিস্তব্ধ, নিরুত্তর। সময়ে সময়ে উহা যে এক আধটু প্রকটিত হইয়া থাকে সে কেবল বায়ুর আন্দোলনে তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্রের ন্যায়। সত্য বটে দেখিলাম সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিল, ঘন ঘন গভীর গর্জ্জনে, তরঙ্গের পুনঃ পুনঃ ঘাত প্রতিঘাতে সমুদ্র আলোড়িত হইল, ঘূর্ণা বায়ুর আবর্ত্তন বিবর্ত্তনে আকাশ বিক্ষোভিত হইল, মুহূর্ত্তের মধ্যে বিস্তীর্ণ জলরাশি ফেণাময় হইয়া উঠিল। কিন্তু যে মহাশক্তি জলনিধির অন্তর হইতে অন্তরতম প্রদেশ ব্যাপিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহার আমি কি বুঝিলাম?—বুঝিলাম কেবলমাত্র সেই মহাশক্তির বেগবলের আধিক্য বশতই সমুদ্রের এই ভাবান্তর। সে শক্তির স্বরূপ কি, কাহার সাধ্য বলিতে পারে, কার সাধ্য সে শক্তির পরিমাণ করে—সে শক্তি মনুষ্যের অজ্ঞেয়, সে শক্তি অপ্রমেয়।

তাই বলিতেছি, প্রকৃত ভালবাসার পরিমাণ কেহ কখন করিতে পারে নাই, কেহ কখন পারিবে না। উহার স্বরূপ কি, আজ পর্য্যন্ত কেহ জানে

না, কখন জানিতেও পারিবে না; কারণ উাহার মূর্ত্তি অনেক। সন্তানের প্রতি মাতার ভালবাসা স্নেহরূপে এবং মাতার প্রতি সন্তানের ভালবাসা ভক্তিরূপে প্রকাশিত। এইরূপে দেখিবে ভালবাসা কখন উর্দ্ধগামী, কখন নিম্নগামী কখন বা সমতল ক্ষেত্রে বিরাজিত। উহা এক হইয়াও বহু এবং বহু হইয়াও স্বরূপত এক। সেই পূর্ণানন্দ পূর্ণপ্রেম পরব্রহ্মের প্রকৃতি বলিয়াই ভালবাসা স্বর্গীয়। তাই জগতে উহার এত আদর, এত সম্মান। যোগী ধ্যানে যে বস্তুর দেখা পায় না, তত্ত্বদর্শী যাহার তত্ত্ব খুঁজিয়া পায় না, যে পদ পাইবার জন্য ভগবান্ পিনাকপাণি দিগম্বর বেশে ভস্ম মাখিয়া শ্মশানবাসী, সেই যোগীন্দ্র বাঞ্ছিত পরম পদে যাহার উদ্ভব, সে ভালবাসার তত্ত্ব তুমি আমি কি বুঝিব? সে তত্ত্ব অতি গুহ্য, তাহার স্বরূপ যে দিন বুঝিবে, মানব! সে দিন তুমি আর মানব থাকিবে না, সে দিন তোমার মোক্ষ, সেই দিন তুমি নির্ব্বাণ মুক্তি পাইবে, সেইদিন তুমি পরব্রহ্মে লীন হইয়া এক হইবে।

কতকগুলি জিনিস আছে তাহাদের সম্বন্ধে দরদাম করা চলে কিন্তু আর কতকগুলির সম্বন্ধে ওরূপ দরকরা চলে না। শাক মাছের একবারের স্থানে দশ বার দর করা চলে এবং উচিত মূল্যের কম হইলেও বিক্রেতা তাহাতেই জিনিস ছাড়িতে পারে। কিন্তু হীরা জহরৎ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্তুর জন্য সওদাগরের সঙ্গে ওভাবে দরকরা চলে না। যদি কেহ করে, তবে নিশ্চয় বুঝিবে, তাহার হীরা কেনা কর্ম্ম নয়। সেইরূপ যাঁহারা ভালবাসার দর করেন, টাকা কড়ির মত উহাকে বিনিময়ের বস্তু মনে করেন, তাঁহাদের প্রতি নিশ্চয়ই কুগ্রহের দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাঁহাদের ভাগ্যে ভালবাসা জুটিবে না। ভালবাসার দর নাই—যদি থাকে ত চিরকালই বাঁধাই আছে, তাহার কখন কমিবেশী হয় না—ভালবাসা অমূল্য। যদি ভালবাসার মধুময় ভাব অনুভব করিতে চাও ত উহার বিনিময়ে কিছুই পাইবার প্রত্যাশা করিও না।

যদি হৃদয় থাকে তবে বুঝিতে পারিবে এই সামান্য গানটিতে ভালবাসার মহিমাময় দেবভাব কেমন প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। গানটি এই ঃ—

"ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে,
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।"

তুমি যাঁহাকে ভালবাস, তাঁহার জন্য তোমার ঘরের দুয়ার যেন সর্ব্বদা খোলা থাকে। তোমার সৌভাগ্যবশত যদি কখন তিনি তোমার বাড়ী

আইসেন, তবে তাঁহাকে তোমার অন্দর মহলে লইয়া যাও। তোমার বাড়ীর প্রত্যেক কক্ষ একেকটি করিয়া তাঁহাকে দেখাও। অনেক যত্ন ও পরিশ্রমে তুমি যে যে ঘর সাজাইয়া রাখিয়াছ; যেখানে ভাল ভাল অলঙ্কার, বহুমূল্য প্রস্তর অহর্নিশ ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, সেই সেই ঘরে তাঁহাকে লইয়া যাও। আর তোমার যে ঘরগুলি একেবারে অন্ধকার, যেখানে কখনও সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলে নাই, বহুকাল রুদ্ধ থাকায় যাহার মধ্যে প্রভাতের নির্ম্মল বায়ু প্রবেশ পথ পায় নাই সুতরাং যাহার গন্ধ নক্কার জনক, সে ঘর গুলিও যেন তাঁহাকে দেখাইতে ভুলিও না, বা তাঁহাকে তথায় লইয়া যাইতে সঙ্কুচিত হইও না। অম্লান বদনে তাঁহাকে তোমার আঁস্তাকুড়ের পচা নর্দ্দমাটিও দেখাইবে। তোমার যে যে বাগানে জুই, চামালী, বেলী, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি সুগন্ধ পুষ্প সর্ব্বদাই প্রস্ফুটিত থাকে, গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হয়, যেখানে শুক, শারি, ময়না, দোয়েল, কোকিল প্রভৃতি সুকণ্ঠ পক্ষী নানারাগে গান গাহিতেছে সেখানে তাঁহাকে লইয়া যাও। আর তোমার খিরকীর নিকটে যে বাগান আছে, যেখানে শুধুই শেয়াকুলের কাঁটা পথ আগ্‌লাইয়া ঝোঁপ বাঁধিয়া রহিয়াছে, যেখানে শিমুল বই আর ফুল নাই, যে স্থান কেবল কাক, শকুনী, গৃধিনী প্রভৃতি বিকটরবকারী পক্ষীর কর্কশ শব্দে শব্দায়মান, যেখানে প্রভাতের মলয় বায়ু কখন পথহারা হইয়াও বহে না, সেখানেও তাঁহাকে লইয়া যাও—লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হইবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। যদি তুমি এরূপ করিতে রাজী না হও, তবে তোমার ও পোশাকী ভালবাসায় আর কাজ নাই। এ কথাটা যেন স্মরণ থাকে যে, আওতায় কখন গাছ বাড়ে না, শীঘ্রই কুড়াইয়া যায়। ফল ত ধরেই না, যদি ধরে ত মিষ্ট হয় না, পাকিতে না পাকিতে পোকা লাগে—পোকা লাগিলেই অধঃপাতে যায়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্বার্থত্যাগ বা ত্যাগস্বীকারে ভালবাসার আরম্ভ। যিনি ত্যাগে ভীত, ভালবাসা পাইবার জন্য তিনি যেন ভুলেও কখন ইচ্ছা না করেন, প্রয়াস না পান। কারণ তাঁহার যত্ন নিস্ফল হইবে, পরিশ্রম পণ্ড হইবে, তিনি স্বভাবত অসিদ্ধ। ভালবাসার যাহা মূলমন্ত্র, সেই ত্যাগস্বীকার বলিলে আমরা কি বুঝি, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

কোন সাধ্য সাধনার জন্য আমার যাহা প্রীতিদায়ক, যাহাকে আমি

স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি, যাহাতে আমার মনে সুখের সঞ্চার করিয়া দেয়, অকাতরে এরূপ বস্তুর পরিবর্জ্জনের নাম আত্মত্যাগ বা ত্যাগস্বীকার। উদ্বাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া লোকে যেমন সহজেই ইহা শিক্ষা করিতে পারে, এমন আর কিছুতেই পারে না। আমাদের বিবেচনায় বিবাহ প্রথার মূলে একটি অতি গভীর অর্থ নিহিত আছে। সে অর্থ সকলে বুঝিতে পারে না, না পারিলেও কিন্তু সংসারের কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, জানিয়াই হউক আর না জানিয়াই হউক সকলেই সেই তত্ত্বানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। বিবাহ বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া লোকে জগৎকে ভালবাসিতে শিখে এবং আত্ম-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া অন্যের সুখের জন্য লালায়িত হয়। যদি বিবাহ-বন্ধন না থাকিত তাহা হইলে সংসার চলিত কিনা সন্দেহের কথা। অন্য প্রকারে সৃষ্টি রক্ষিত হইতে পারিত বটে কিন্তু জগতে সমাজ থাকিত না। আত্মবিস-র্জ্জন ব্রতে কেহই দীক্ষিত হইতে পারিত না। সকলই ভাঙ্গা ভাঙ্গা, ছাড়া ছাড়া বোধ হইত। প্রথমত ধর তুমি বিবাহ করিলে—অন্য এক অপরিচিতা রমণীর সহিত সঙ্গত হইলে। ইহাতে বুঝায় কি, না তুমি সংসারের একটিকে আপনার করিলে। পরে তোমার সন্তান হইল—তুমি এবার আর দশটিকে আপনার করিয়া লইলে। অভ্যাসের বর্দ্ধমান গুণে সমগ্র জগৎ তোমার আপনার হইল, অন্যের সহিত তোমার বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। তুমি যে একটি ক্ষুদ্র পরিবার সৃষ্টি করিয়াছ, তোমার সেই পরিবার এক্ষণে মানব সমাজরূপ বিরাট পরিবারের অঙ্গীভূত হইল। তুমি এক্ষণে অসংখ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইলে, ঘরে বাহিরে কতকগুলি শক্তিদ্বারা চালিত হইতে লাগিলে অর্থাৎ তুমি অন্যের অধীন হইলে, সমাজের অনুগত ভৃত্য হইলে। এখন কেবল তোমার নিজের সুখ দেখিলে চলিবে না। আর দশজনের সুখের প্রতি তোমার এখন দৃষ্টি রাখা চাই। তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উপার্জ্জন করিবে এবং দশজনকে আগে খাওয়াইয়া তবে খাইতে পাইবে—এক কথায় বলিতে গেলে, তোমাকে এখন ত্যাগস্বীকার অভ্যাস করিতে হইবে। এই-রূপে যখন দেখিবে অভ্যাসে সিদ্ধ হইয়াছ, তখনই বুঝিবে তোমার সংসারে ভালবাসা অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করিয়াছে, তোমার সংসার সোনার সংসার হইয়াছে। অতএব ভালবাসাই সংসারের বন্ধন, সমাজের মূলমন্ত্র, এবং মনুষ্যত্বের বীজ।

পূজার কুসুম।

(বঙ্গের বিধবা)

অপঙ্কিল ফুলরাশি, স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখে হাসি,
কেমন মধুর শোভে একাকী বিজনে,
মানব অস্পৃষ্ট পূত সৌন্দর্য্য কিরণে।

গরিমা মাধুরী ছায়া, উজলিত শুভ্র কায়া,
চন্দ্রিকা হাসিয়া তাহে সুগন্ধ বিতরে,
হাসিছে অতুল রূপ আপনার ভরে।

মধুর সুন্দর বাসে বল্লরী পল্লব পাশে,
দেখ দেখি ফুল্ল ফুল ললনার মুখ,
অকাতরে শোভা করে, নাহি চায় সুখ।

কেন রে মানব! ফুল ফুটিতে না দিবে?
কোমল কোরক তুলে, খেলিবে রে ঐ ফুলে,
আনি অকোমল করে কমল ছিঁড়িবে?
স্বর্গশোভা পাপস্পর্শে পঙ্কিল করিবে?

ঐ শাদা ফুল বনে শোভিছে সুন্দর,
দূরেতে বিহঙ্গ ডাকে, একা ফুল ফুটে থাকে,
ছড়ায়ে শিশির পড়ে মুখের উপর,
বিজন বিপিনে ফুল হাসিছে নিথর।

চপল লাবণ্য নাই, আঁখি অনিমিখ তাই,
শাদা ফুল শাদা রূপে কেমন শোভিছে,
একাকী হাসিছে ফুল একাকী খেলিছে।

ওহে নর! তোমার ও অঙ্গুলি পীড়নে,
ছিঁড় না সাধের ফুল, ভূতলে অসমতুল,
একা খেলে একা হেসে থাকুক বিজনে,
ঢালিও না পঙ্কিলতা পবিত্র জীবনে।

দেবতার উপহার ও ফুলটি বলে,
সকলই লুটিলি তোরা, দুকূল কুসুমে পোরা,
ঐটি রেখেছি শুধু দেবতা পূজনে,
দেবের দোহাই ফুল ছিঁড় না কাননে।

শোভে না কি কমলিনী শৈবাল ভূষণ,
না থাকিলে অলঙ্কার মণি বিজড়িত হার,
স্বভাবের বেশভূষা নহে কি মোহন?
চায় না স্বভাব-রূপ শিল্প আভরণ।

অতুল লাবণ্য তায় নাহি অলঙ্কার,
আলু থালু কৃষ্ণ কেশ, মধুর পবিত্র বেশ,
চম্পকের তীব্র গন্ধ নাহিক উহার,
বন মল্লিকার বাস বিমল সঞ্চার।

বহুদিন সুপবিত্র ভারতেতিহাসে,
ছোঁয় নাই কোন নর, একা একা নিরন্তর,
শোভিয়াছে ঐ ফুল ভকতি-বিকাশে
পূজার কুসুম ওটি দেবতা সকাশে।

ডাকিছে দেবের প্রেম স্বভাবের বেশে,
চারি দিকে মুখ চেয়ে, পড়িছে অলক বেয়ে,
ডাকিছে দেবের দয়া প্রেমের আবেশে,
ছিঁড় না ভারত-ফুল বিলাতী সাহসে।

একাকিনী থাকে বালা তাকায়ে গগনে,
চন্দ্রিকা চাঁদনি মেলা, তারকা করিছে খেলা,
ভাসিছে সুনীল-পট সোনার কিরণে
একাকিনী দেখে বালা মুগধ নয়নে।

সে নয়নে ভক্তি ভরা, বিভোর আনন্দে,
নয়নে গগনে মিল সুললিত ছন্দে,

জলভরা ছল ছল নোয়ায় সে আঁখি,
চরণে শরণ লয় ভগবানে ডাকি।

নিশ্চল নিথর ভাব, নিতান্ত নিঝুম,
স্বর্গের স্বপন তার, স্বর্গে মর্ত্ত্যে একাধার,
তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, ভাঙ্গায়ো না তার ঐ ঘুম,
উৎসর্গ করা ওটি পূজার কুসুম।

অপূর্ব্ব বৈরনির্য্যাতন।*

প্রমারবংশাবতংস ভাইন্স্রোরাধীশ্বর মনোহর হর্ম্ম্য মধ্যে স্বীয় মহিষীর সহিত পচিশী ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রণয়ীযুগলের হৃদয়ে আমোদের সীমা নাই—উভয়েই অতিশয় আগ্রহ সহকারে চা'ল দিতেছেন; চঞ্চলা জয়শ্রী কখনও নায়ককে জয়গৌরব দান করিতেছেন, কখনও বা নায়িকার প্রতি প্রসন্না হইতেছেন। খেলার সঙ্গে সঙ্গে দম্পতী বিবিধ প্রেমলীলা প্রকটন করিতেছেন—একবার তাঁহাদিগের উচ্চ হাস্যের তরঙ্গে সমস্ত গৃহ সুখময় হইতেছে, পরক্ষণেই উভয়ে বিলোল কটাক্ষে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া অল্প অল্প হাসিতেছেন এবং সেই মৃদু হাসি বিদ্যুতের মত প্রকাশিত হইয়া তন্মুহূর্ত্তেই দম্পতীর ওষ্ঠপ্রান্তে মিশিয়া যাইতেছে।

কিন্তু হায়! পরিশেষে অমৃত হইতে গরলের উৎপত্তি হইল! এই সুখ কঠোরতম অসুখের কারণ হইয়া উঠিল!—খেলিতে খেলিতে সামন্ত এবং মহিষীর মধ্যে বিতণ্ডা জন্মিল; উভয়ের বাক্যের তীক্ষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে অল্পে অল্পে ক্রোধও বাড়িতে লাগিল; ভাইন্স্রোররাজ স্বীয় শ্বশুর বংশের

* মিবারের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভাইন্স্রোরের এক স্থানে এই বৃত্তান্ত প্রস্তর ফলকে খোদিত রহিয়াছে। কর্ণেল টড্ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু সময় এবং ভাইন্স্রোর সামন্ত ও তাঁহার মহিষীর নাম উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং আমরাও নাম দিতে পারিলাম না। কতিপয় কারণে জানা যায় যে সম্ভবত রাণা অরিসিংহের শাসন কালের (খৃঃ ১৭৬২—১৭৭২ অব্দের) কোন সময়ে এই ঘটনা ঘটে। এই প্রমার সামন্তের মৃত্যুর পর চণ্ডাবৎ বংশীয় লালজী রাবৎ ভাইন্স্রোরের সামন্ত রাজত্ব প্রাপ্ত হন।

সম্বন্ধে অযথা নিন্দাবাদ প্রয়োগ করিলেন। তাঁহাকে হাতে হাতে এই অবিমৃষ্যকারিতার প্রতিফল পাইতে হইল। পিতৃকুলের গ্লানি শুনিয়া গর্ব্বিতা রাজপুতনীর ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল—সামন্তমহিষী গোলাহত ব্যাঘ্রীর ন্যায় ভীষণভাব ধারণ করিলেন; প্রেম বিষম ঘৃণায় পরিণত হইল; ক্রীড়ামোদ ঘোর জিঘাংসার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল; নীলোৎপল তুল্য সুন্দর তদীয় নেত্রদ্বয় আরক্ত হইয়া সপ্রেম কটাক্ষের পরিবর্ত্তে ভয়ঙ্কর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ করিতে লাগিল। মহিষী পিতৃকুলের অবমাননাকারী স্বামীর প্রতি প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া পরদিন স্বীয় পিতৃসমীপে দূত পাঠাইয়া সকল কথা জানাইলেন।

প্রমারপত্নী বেইগু জনপদের সামন্তের দুহিতা। দূতমুখে স্বীয় বংশের নিন্দাবাদ বিবরণ শুনিবা মাত্র বৃদ্ধ বেইগুরাজ মহাকোপে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। দূত বেইগু পরিত্যাগ করিতে না করিতেই যুদ্ধযাত্রার জন্য ভীষণ গম্ভীর নিনাদে নাকারা বাজিতে লাগিল এবং বেইগুর প্রকাণ্ড রণঘণ্টা আকাশভেদী তারশব্দে শব্দিত হইতে লাগিল। সেই প্রচণ্ড ঘণ্টারব শ্রবণ করিয়া সমস্ত জনপদ যেন সহসা জাগরিত হইল এবং পাথার প্রদেশের কুটীর সমূহ হইতে সুবিখ্যাত কালমেঘের * বীর্য্যবান্ বংশধরগণ আমিষলোলুপ শার্দ্দূলদলের ন্যায় পালে পালে বেইগুতে আসিল। সামন্তের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলেরই হৃদয় যুদ্ধোন্মাদে মাতিল; অবিলম্বে বেইগুরাজ এবং রাজকুমার সসৈন্যে ভাইন্সোরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মেঘাবৎ সৈন্য অস্থির বিশাল অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া বেইগুর কতিপয় ক্রোশ দূরে দুই ভাগে বিভক্ত হইল। সামন্ত এক দূরবর্ত্তী ঘর্ঘরের পথে চলিলেন; যুবরাজ ব্রাহ্মণী নদীর তীরবর্ত্তী সরল পথ অবলম্বন করিয়া অতি সত্বরে ভাইন্সোরে উপস্থিত হইলেন। প্রমার সামন্ত নিশ্চিন্ত চিত্তে অবস্থিতি করিতেছিলেন—এক্ষণে হঠাৎ মেঘাবৎ বীরগণের ভয়াবহ সিংহনাদ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু আর সময় নাই; দেখিতে না দেখিতে জিঘাংসা বশবর্ত্তী বেইগুরাজপুত্র তাঁহার সম্মুখে আসিয়া "রণং দেহি" "রণং দেহি" বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। প্রমাররাজও কাপুরুষ ছিলেন না, তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধসিংহের ন্যায় করাল গর্জ্জন করিয়া শত্রুকে যুদ্ধদান করিলেন। উভয়ে ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতে লাগিল। পরিশেষে

* মহাবীর কালমেঘ বেইগুর সামন্তদিগের মধ্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ। তাঁহার নামানুসারে বেইগুর সামন্তদিগের বংশের নাম মেঘাবৎ।

মেষাবৎ রাজকুমার উদ্ধত প্রমারের শিরশ্ছেদ করিয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিলেন। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে বেইগু সামন্তও সদলে উপস্থিত হইলেন।

ভাইন্স্রোরাধিপতির প্রাণনাশে মহিষীর রোষ শান্ত হইল এবং স্বামিবধ জন্য তাঁহার মনে অত্যন্ত অনুতাপ জন্মিল। তিনি পরলোকে পতির চরণপ্রান্তবর্ত্তিনী হইতে অভিলাষ করিয়া পিতাকে চিতা সজ্জা করিতে বলিলেন। প্রাচীন মেষাবৎ তাহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া চিতা সাজাইলেন এবং ভাইন্স্রোর-রাজমহিষী যথোচিত অনুষ্ঠানাদি করিয়া মৃতপতির সহিত চিতাশায়িনী হইলে স্বয়ং তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন। চিতা ধূ ধূ করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইল; দেখিতে দেখিতে প্রমার সামন্তের শবের সঙ্গে রাজ্ঞীর দেহও ভস্মীভূত হইয়া গেল। এইরূপে বীরনারী পিতৃবংশের অবমন্তা ভর্ত্তার দণ্ডবিধানানন্তর তাঁহার সহমৃতা হইয়া রাজপুত নামের গৌরব রক্ষা করিলেন।

নব মাথুর সংবাদ।

রাজা হ'ল শ্যাম রায়, পড়ি গেল সাড়া,
মথুরায় মহা গণ্ডগোল;
উল্লাস সবার প্রাণে, হিল্লোল বহিছে তানে,
কল্লোলের চারিদিকে উঠিতেছে রোল,
বাজিতেছে শত শত কাড়া।

পতাকা উড়িছে কত পত পত রবে,
বেণুবীণা বাজিছে সানাই,
দোকানি পসারি যত সাজাইয়া রাজপথ
করে কত বিকি কিনি নাহিক কামাই;
মনানন্দে সদানন্দে সবে।

নবরাজ নবরাজ্যে, সকলই নবীন;
মত্ত সবে নব অনুরাগে;
"শ্যামরায় জয় জয়" চারিদিকে ধ্বনি হয়,
পুরাণে ভুলিতে বল কয়দিন লাগে?
মন হ'তে মুছিবারে চিন্?

"মথুরায় শ্যামরায় সে কেমন জন" ?
সকলের মুখে কথা এই ;
কেহ বলে বটে বীর, কেহ বলে অতি ধীর,
কেহ বলে রসিকের শিরোমণি সেই,
রাধাপ্রেমে সদাই মগন।

"রাধা রাধা" বলে সেই বাজাইত বাঁশী
গোকুলেতে গোপের নন্দন ;
চতুরালি জনে জনে, নাগরালি বৃন্দাবনে,
করিয়া করিত সেই দিবস যাপন ;
অধরে মধুর তার হাসি।

হাসি মুখে মিষ্ট কথা, শিষ্ট ব্যবহার,
চৌদিকে চাহনি তার বটে ;
সকলে সন্তোষ করে, হাসি আসি হাতে ধরে,
লয়ে যায় ধীরে ধীরে যমুনার তটে,
যেন চির সখা আপনার।

যে কথা বলিতে যাও তাহা ভুলি যাবে,
এমনই কুহকী সেই জন ;
তাহার কাহিনী শুনি, মুগ্ধ হয় যোগী মুনি,
ব্যথিত সে ভুলে যায় আপন বেদন ;
শত্রু যেও সেও গুণ গাবে।

রাজা হ'ল শ্যামরায়, পড়ি গেল সাড়া,
যুবতী মহলে গণ্ডগোল ;
উল্লাস সবার প্রাণে, হিল্লোল বহিছে তানে,
কল্লোলের কল কল উঠিতেছে রোল,
জনরব যায় পাড়া পাড়া।

"সে না কি চতুর বড় ব্রজের কানাই
কপট লম্পট শঠরাজ,

তপন তনয়া তটে, নীপতরু সুনিকটে,
গোপনেতে গোপিনীরে দিয়েছিল লাজ ;
আই আই লাজে মরে যাই।

'বৃন্দাবনে রাই রাজা, সে ছিল কোটাল,
বহুদিন গেছে কোটালিতে ;
মাথায় বাঁধিয়া পাগ, ডাকিত সে "জাগ জাগ"
ঘুমাতে দিত না সেই ঘোর রজনীতে ;
বুলিত সে ঝাঁকাইয়া ঢাল।

'আই মা গো হইল কি ? রাজ্য কোটালের,
ধন মান রবে নাহি,আর ;
সন্ধারি করিবে যেই, ভূপতি হইবে সেই,
কোটালের রাজত্বতে না হয় বিচার,
বিধাতা করিল হেন ফের !'

এত ভাবি যুক্তি করে মিলিয়া সকলে,
কুবজা সুবজা ওঝাইনি ;
যত মথুরাবাসিনী, মরি মধুর হাসিনী,
রূপ রস বয়সের তরুণী কামিনী,
দশজনে বসিয়া বিরলে।

শ্যাম রায়ে ভেটিবারে শলা হল স্থির।
'বুঝিব তাহার নাগরালি,
যাব সবে দলে বলে, বলিব রে ছলে কলে,
চতুরের বুঝা যাবে যত চতুরালি,
কেমন রসিক যদু বীর।

'গোপের নন্দন সেই, নিজে গোপরাজ,
গোপী সাজে মজিবেক মন ;
নাম গোপিনী-রমণ, বুঝে গোপিনীর মন,
গোপনেতে গোপিনীর ব্যথিত সে জন ;
গোপী সাজে ভেটাইব আজ।

যুকতি যোজনা করি জনে জনে মনে,
গোয়ালিনী সাজে মাথুরিণী;
ডারিল মথুরা বেশ, খুলিল কবরী কেশ,
বিজটা ত্রিজটা হার কঙ্কণ কিঙ্কিণী;
দূরে দিল কনক ভূষণে।

বিনাইল কেশ বেশ গোয়ালিনী ছাঁদে,
বৃন্দাবনী ঘাঘরি আঁটিল,
মাথায় পসার ডালা, সাজিয়া গোপের বালা,
পঞ্চজনা মাথুরিণী বাহির হইল,
ভেটিবারে সেই শ্যামচাঁদে।

সঙ্গে মথুরাবাসিনী অনেক নাগরী
চলে মাথুরিণী বেশে,
সোনা-বুটি নীল শাড়ী, জরদ চমক পাড়ি,
গোটাদার পাল্লাদার আঁচরহি শেষে,
তাহে কত আছে কারিগরী।

ঘিরি ফিরি পরিল রে সেই নীল শাড়ী,
বাম পিঠে ঝুলত আঁচল,
কৌতুকে কাঁচুলি আঁটা, পাহাড় বুকের পাটা,
সুমতি কুমতি তায় করে ঝল মল;
চলিল রে দুহু বাহু নাড়ি।

কঙ্কণ বলয় তাড়, চউরঙ্গ চুড়ী,
বাহুতে শোভিল বড় রঙ্গে,
শিরেতে সীমন্ত টেড়ি, অরধ গুণ্ঠন বেড়ি,
ঝিউরি বউরি দুহু ভিন ভিন ঢঙ্গে,
চিকুর কানড় ছাঁদে মুড়ি।

খয়ল নয়ন ভঙ্গি, গরল মিশালে,
কাজল ডারল তাহে ঘেরি,

করল মরাল গতি, বাহিরল রাজপথি,
ফিরল ঘুরল সচকিত কত বেরি,
ভয় ভয় চৌদিকে নেহালে।

গোপিনী বেশিনী যত মথুরাবাসিনী,
চলিল সবার আগে আগে;
পাতিয়া বেশের ফাঁদ, ধরিব রে শ্যামচাঁদ,
নব ভূপে মজাইব নব অনুরাগে।
পিছে চলে মথুরা-বেশিনী।

বার দিয়া বসিয়াছে শ্যামচাঁদ রায়,
ভোজরাজ রত্ন সিংহাসনে,
নকীব ফুকারে তায় বন্দীগণে স্তুতি গায়,
চোপ্‌দার দাঁড়াইয়া যুগল চরণে;
দিব্যাঙ্গনা চামর ঢুলায়;

দ্বারী করে নিবেদন করি দণ্ডবৎ,
মথুরা-বাসিনী আগমন;
সঙ্কেতিল শ্যামরায়, বন্দী আদি দূরে যায়,
'আসিতে বলহ' বলি আদেশে তখন;
দ্বারবান ছাড়ি দিল পথ।

পশরা উতারি যত গোপিনী-বেশিনী,
গোপী ছাঁদে করে নমস্কার;
মথুরা-বেশিনী সবে, প্রণমিয়া সগৌরবে,
ধীর ভাবে শ্যামচাঁদে দিল জয়কার,
লাজে ভয়ে মধুর হাসিনী।

গোয়ালিনী বেশ হেরি নটবর তাহে,
মুচকি মুচকি থোড়ি হাসে;
উচিত ভরম ভর, কহিল হি ততঃপর,
"নগরবাসিনী ধনী আগমন কাহে?
বলয়িবি হামারি সকাশে।"

আগরি আসিল দূতী একবর নারী,
পরবীণা পরিপক্ক মতি,
বলিল গরজ কথা, জানাল আরজ ব্যথা,
"কোটালে বিচার ভার না দেয় ভূপতি,
আপনক মনহি বিগারি।"

নব ভূপ উত্তরিল বুঝিয়া সন্ধান ;
"ভয় নহি রঙ্গিণী সম্রাজে ;—
আমি ত কোটাল রাজ, জান সব ব্রজমাঝ,
নারীর গোলামি করি কোটালের সাজে ;
পায়ে ধরি বাড়াইতে মান।"

সিংহাসন ছাড়ি তবে নামে যদু রায় ;
ভূমেতে উরিল জনু চাঁদে ;
গোপিনী-বেশিনী পাশে, দাঁড়ায়ে মুচকি হাসে,
ঘাঘরি ধরিল তার বৃন্দাবনী ছাঁদে।
প্রাণ তার উড়ে উভরায়।

"ছি ছি কি কর কি কর শ্যাম নটবর,
মরি মরি মরি হরি লাজে !
গোপিনী-বেশিনী বটি, নহি বৃন্দাবনী নটী,
মথুরায় বসন হরণ নাহি সাজে ;
ছাড় ছাড় যাই সবে ঘর।"

বুঝিল চতুর রায় ভীতা বিদেশিনী ;
আশ্বাসি বিশ্বাস দেয় তায় ;
বলে "নহি নহি সখি, কাহে তুহ থকমকি
রাজা হ্যাম ঐসা কাম, কভি না জুয়ায়,
কাহে তু রে সাজি গোয়ালিনী ?

নগর বাসিনী তুহ নাগরী কামিনী,
কাঁচরি আঁচরি তোরা সাজ ;
তেয়াগিয়া রাজ বেশ, কাহে তু ধরল শেষ,
আভিরি ঘাঘরি পরি গোপী বেশ আজ
কাহে তুহ সাজ গোয়ালিনী ?

হেরত মাথুরী বেশ মর্য্যাদা মাধুরী
চমক জমক হের কৈসা!
আঁধার রাতমে.জনু নীল নভ বরতনু
লচ্ছ লচ্ছহি নচ্ছত্রে চমকতি যৈ সা,
উজারা সুন্দর শান্ত ভূরি।

পাটরাণী বেশ ছোড়ি কাঠুরাণী সাজ,
ছিক্ ছি বিষম মতি ভুল!
কাঞ্চনে আদর নহি; কাঁহা কাচ ঢূরতহি,
হাতের কমল ফেলি, লয়বি সিমুল?
ইহ নহ চতুরিক কাজ।"

প্রবীণা পলিত কেশী দূতি আগুয়ান,
যুড়ি কর করে নিবেদন;
"যত দেখি গোপ রায়, গোপিনীর বেশ চায়;
সেই লাগি পরিয়াছি গোপিনী বসন;
ভূপ তাহে নাহি ভাব আন।"

"আনক গোপক হাম না জানি বিচারি,
কাকর মন মে কিয়া হ্যায়;
হাম তু গোপাল বটি, পহিরহি পীঠ ধটি,
আভিরি ঘাঘরি কিন্তু হামে নাহি ভায়,
ভলি বনি মাথুরিণী শারী।

হের তার পরিচয় লহ হাতে হাতে"
কহিল মুচকি হাসি শ্যামে।
কুবুজা কোণেতে ছিল, হাতে ধরি উঠাইল,
সসম্ভ্রমে বসাইল সিংহাসনে বামে;
আপনি বসিল পরে তাতে।

"জয় জয় শ্যামরায়" পুরিল অবনী।
মাথুরীতে মজিল কানাই।
'দ্বাপরে ঘটিল যাহা, কলিতে হইবে তাহা,
আচম্বিতে দৈববাণী শুনিল সবাই।
হরি হরি কর হরিধ্বনি।

নবজীবন।

১ম ভাগ। } ফাল্গুন ১২৯১ { ৮ম সংখ্যা।

প্রাচীন কলিকাতা।

ইংরাজ আজ সসাগরা জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর। কেশরী-চিহ্নিত ব্রিটিশ পতাকা আজ ভারতের কোমল মৃত্তিকাতে প্রোথিত হইয়া, ইংরাজের বিজয় ঘোষণা করত তরতর রবে উড্‌ডীয়মান হইতেছে। উত্তরে হিমাদ্রিশিখর হইতে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ আজ ব্রিটিশ সিংহের করতলস্থ; পঞ্জাবকেশরী, সুপ্রসিদ্ধ রণজিৎসিংহের ভবিষ্যৎ বাণী আজ অসম্ভব সত্য ঘটনায় পরিণত; ইংরাজ আজ ভারতের ইন্দ্র; কলিকাতা নগরী তাঁহাদের অমরাবতী;—ইংরাজ রাজত্বের এই পূর্ণ বিকাশের দিনে—দুইশত বৎসরের প্রাচীন কলিকাতা ও তৎকালীন ইংরাজের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিলে বোধ হয় পাঠকবর্গের বিরক্তিপ্রদ হইবে না ভাবিয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম। এই প্রবন্ধে আমরা কলিকাতা ও তৎসন্নিকটস্থ স্থান সমূহের প্রাচীন বিবরণ ও বাঙ্গালায় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের অবস্থা ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট দুই চারিটি ঘটনা পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিব।

১৬০০ খৃঃ অব্দে রাজ্ঞী এলিজাবেথের চার্টার অনুযায়ী প্রথম ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য সংস্থাপিত হয়। প্রথমে সুরাটে আসিয়া এই কোম্পানী তাঁহাদের বাণিজ্যনিবাস স্থাপন করেন। কিয়ৎ-কাল এই স্থানে ইতস্তত করিয়া কোম্পানী বুঝিলেন যে, আগ্রায় গিয়া বাণিজ্যনিবাস স্থাপন করিলে বিশেষ লাভজনক হইবে। আগরা নগরী তৎকালে সম্রাটের প্রিয় রাজধানী ছিল। যত সমৃদ্ধিশালী ও বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য পূর্ণ পণ্যনিবাস এই সময়ে এই নগরীতে স্থাপিত হইয়াছিল,

সুতরাং এই স্থলে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্য করিবার জন্য দ্বিতীয় পণ্য-নিবাস স্থাপন করেন। আগরায় থাকিয়া তাঁহারা শুনিলেন-যে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্যই বেহার প্রদেশে পাওয়া যায়। এই স্থানে বাণিজ্যার্থে তাঁহারা ১৬২০অব্দে পাটনাতে দুইটি বাণিজ্য নিবাস স্থাপন করেন। এইখান হইতে দ্রব্যাদি কিনিয়া তাঁহারা নৌকা করিয়া আগরায় পাঠাইতেন এবং আগরা হইতে স্থলপথে সেই সকল বাণিজ্যদ্রব্য সুরাটে পাঠান হইত। ইহাতে লাভ ও সুবিধা হওয়া দূরে থাক, উত্তরোত্তর তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। এদিকে বেহার ও বাঙ্গালার ফলজলপূর্ণ ভূমি, বহুমূল্য পণ্য পূর্ণ আপণশ্রেণী অপর দিকে তাঁহাদের বাঙ্গালায় বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা —তাঁহারা একেবারে বাঙ্গালায় বাণিজ্যনিবাস স্থাপন করিবার চেষ্টায় রহিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহাদের চিরসঞ্চিত অভিলাষও সিদ্ধ হইয়া গেল।

তৎকালে ঢাকা ও রাজমহল বাঙ্গালা অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। হুগলীও বড় কম সমৃদ্ধিশালী ছিল না। পর্টুগীজেরা হুগলীতে বাণিজ্য করিয়া বড়ই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছিলেন, ইংরাজ ইহা দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা বাঙ্গালায় বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করিয়া জলপথে বাণিজ্য দ্রব্যাদি দেশে রওনা করিবেন অথচ তাহা অল্প খরচে হইবে ভাবিয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। অদৃষ্টও প্রসন্নভাবে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন।

শুভদিনে শুভক্ষণে ১৬১৮ খৃঃ অব্দে ইংরাজ প্রথমে বাঙ্গালায় বাণিজ্য উদ্দেশে পদার্পণ করিয়া কুঠী সংস্থাপন করেন। তৎকালে ইব্রাহিম খাঁ নামক একজন উপযুক্ত ব্যক্তি বাঙ্গালা শাসন করিতেছিলেন—চতুর ইংরাজ সূক্ষ্মদর্শী ইব্রাহিমকে বশীভূত করিয়া আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিলেন।

বাঙ্গালা ইংরাজের অদৃষ্টচক্রের প্রধান লীলাভূমি। এই বঙ্গদেশে তাঁহারা প্রতি বিষয়েই পরীক্ষিত হইয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া বাণিজ্যবুদ্ধি, সাহস, উদ্যম, দুঃখসহিষ্ণুতা প্রভৃতি সমস্ত গুণই ইংরাজ এই কার্য্যক্ষেত্রে একে একে দেখাইয়াছিলেন। অদৃষ্টের পরিবর্ত্তনে কখনও বা তাঁহারা অপার আনন্দনীরে ভাসিয়াছিলেন—আবার কখনও বা নিরাশার ভীষণ ভ্রুকুটী, তাঁহাদের দুর্দ্দশা দর্শনে সহযোগী বাণিজ্য-জীবিদিগের অট্ট অট্ট ভীষণ হাস্য, সহিষ্ণুতার শান্তিময়ী প্রতিমূর্ত্তির পূর্ণ বিকাশ, সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে ভীষণ বিভীষিকা দেখাইয়াছিল। কিন্তু যে সহি-

ষ্ণুতা ও উদ্যম ইংরাজের শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে প্রতি ক্ষুদ্র রক্তকণিকার সহিত সংমিশ্রিত, সেই উদ্যম ও সহিষ্ণুতার বলে তাঁহারা এই বঙ্গভূমিতে সেই সমস্ত অনলময়ী ও বিভীষিকাময়ী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সামান্য বণিক হইতে রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন। কি প্রকারে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, সে ঘটনা আমূল বিবৃত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত ইংরাজের কলিকাতায় বাণিজ্য, কলিকাতার তৎকালীন অবস্থা, ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঘটনা বিবৃত করিতে আমরা এক্ষণে অগ্রসর হইলাম।

১৬৯০ খৃঃ অব্দের ২৪এ অগষ্ট কোম্পানির সুপ্রসিদ্ধ প্রেসিডেণ্ট জব চার্ল্স সুতানুটীতে আসিয়া প্রথম বাস করেন। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, এই সময় হইতে কলিকাতা স্থাপনের সময় ধরা যাইতে পারে। সুতানুটীতে বাসের জন্য চার্ল্স সাহেবকে কোম্পানির হইয়া প্রতি বৎসর প্রায় ৩০০০ তিন হাজার টাকা সম্রাট সরকারে প্রদান করিতে হইত। আট বৎসর পরে বাদসাহ ইংরাজ কোম্পানিকে কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামক পার্শ্বস্থ দুই গ্রাম জমা করিয়া লইতে অনুমতি প্রদান করেন। যে সময়ে এই শুভ সংবাদ ইংলণ্ডে ডাইরেক্টরদিগের নিকট পৌঁছিল, তখন তাঁহারা আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ এই আদেশ প্রেরিত হইল যে "কলিকাতা একটি প্রেসিডেন্সিতে পরিণত হইবে, প্রেসিডেন্সির অধ্যক্ষ "প্রেসিডেণ্ট" নামে অভিহিত হইবেন। মাসিক মাহিয়ানা ২০০৲ টাকা ও উপরি হিসাবে (gratuity) ১০০ টাকা—মোট তিনশত টাকা তিনি পাই-বেন। চারি জন মেম্বর সংগঠিত একটি মন্ত্রীসভার সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রেসিডেণ্ট, সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।*

এক্ষণে প্রাচীন কলিকাতার সীমা নির্দ্দেশ করা যাউক। আজকাল কলি-কাতা বলিলে যেমন একটি প্রশস্ত ভূভাগ বুঝায়, আগে এরূপ ছিল না। তখন কলিকাতা, সুতানুটী, ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম পাশাপাশি সংস্থাপিত ছিল। এখন সেই তিনটি নাম ঘুচিয়া একটি নাম হইয়াছে।

---

* এই মন্ত্রীসভার মেম্বরদের মধ্যে একজন হিসাব রক্ষক Accountant, একজন গুদাম রক্ষক Ware house keeper, একজন করসংগ্রাহক ও অপর একজন Marine বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

এই তিনটি গ্রামের সীমা মোটামুটী ধরিতে গেলে, উত্তরে বাগবাজার ও দক্ষিণে খিদিরপুর ও তৎসন্নিহিত ভূভাগ ছিল। হাটখোলা চিৎপুর প্রভৃতির উত্তরস্থ ভূভাগকে সাধারণত সুতানুটী বলিত। সুতানুটী যে এই স্থানটিকে বলিত তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। কারণ, বর্ত্তমান হাটখোলা ঘাটকে পূর্ব্বে লোকে সুতানুটী ঘাটও বলিত। আজকাল সেখানে ময়দান বেষ্টিত ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ বিরাজ করিতেছে। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এখানে গোবিন্দপুর গ্রাম ছিল গোবিন্দপুরে প্রথমে বড় লোকের বাস ছিল না। প্রথম অবস্থায় ইহার মধ্যে মধ্যে, দুই চারি ঘর করিয়া জঙ্গল ও লোক একত্রে বাস করিত। গোবিন্দপুর যে এই স্থানে সংস্থাপিত ছিল, তাহার আর কোন সংশয় নাই; কারণ Holwell সাহেব তাঁহার লিখিত পুস্তকাবলীর মধ্যে এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, কালীঘাট এখান হইতে অতি নিকটে থাকায়, গোবিন্দপুরের বাজারের অধিকাংশ ব্যবসায়ীই কালীঘাটে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে যাইত। ইহাতে কোম্পানীর সমূহ ক্ষতি উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের প্রত্যেক দ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপন করিয়া আয় বৃদ্ধি করা হয়। * আর আজ কাল লালদিঘীর যেস্থানে বড় বড় আফিশ হইয়াছে সেই স্থানকে পূর্ব্বে কলিকাতা বলিত। লালদিঘী নামক বিখ্যাত পুষ্করিণী ও গঙ্গার মধ্যস্থ ভূভাগকে তৎকালে কলিকাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। হলওয়েল সাহেব ১৭৫২ খৃঃ অব্দে কলিকাতার যে ম্যাপ আঁকিয়াছিলেন, তাহাতে লালদিঘীর পূর্ব্ব ধারের ও উত্তরপূর্ব্ব ধারের সমস্ত স্থানকে "ধী কলিকাতা" বলিয়াছেন। বর্ত্তমান বড় বাজারের কিয়দংশও ধী কলিকাতার মধ্যস্থ বলিয়া ঐ ম্যাপে চিহ্নিত আছে। এবং রাজা নবকৃষ্ণ St. John's Cathedral এর জন্য যে ভূখণ্ড প্রদান করেন তাহাও ধী কলিকাতার মধ্যে ভুক্ত ছিল। এই তিনটি গ্রামে তখন এপ্রকার সুন্দর রাস্তা ঘাট ছিল না। এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে হইলে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হইত। একটি সাধারণ রাস্তা (যাহাকে আজকাল চিৎপুর রোড বলিয়া থাকে) কেবল মাত্র ঐ তিনটি গ্রামের একমাত্র সোজা পথ ছিল। অর্থাৎ এই পথ দিয়া তিনটিতেই যাওয়া যাইত। এই তিনটি গ্রাম ছাড়া আরও একখানি ক্ষুদ্র গ্রামও কোম্পানির অধিকারভুক্ত ছিল। যদিও

* Vide Holwell's despatches to the Directors of the Hon'ble E. I. Company; also Calcutta Review vol. III. page 438 Jan. 1845.

ফারমানে বা ইতিহাসে এই গ্রামের নামোল্লেখ নাই, তথাপি পলাশীর যুদ্ধের এক বৎসর পূর্ব্বের লিখিত বিবরণ হইতে এই অনুমান করা যাইতে পারে যে, খিদিরপুরের উত্তরস্থ ভূভাগে কোম্পানীর দুই চারিটি কুঠি ছিল। এই স্থানকে আজকাল গার্ডন রিচ (Garden Reach) বলিয়া থাকে। উলুবেড়িয়া হইয়া যে সকল ষ্টীমার কলিকাতা আসিত, তাহাদের কোনস্থান ভগ্ন বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে এই গার্ডন রিচের নিকটস্থ একটি স্থানে রাখিয়া তৎক্ষণাৎ সারিয়া লওয়া হইত। তৎপরে কোম্পানির Marine yard এ গিয়া সম্পূর্ণ মেরামত হইত। গার্ডেন রিচের নিকটস্থ এই স্থান ডক্ হইবার অতিশয় উপযোগী বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ কর্ণেল ওয়াট্সন গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া একটি ক্ষুদ্র ডক্ স্থাপন করেন। খিদিরপুরের বর্ত্তমান ডক্ ইয়ার্ডই ওয়াট্সন সাহেবের মনোনীত ভূমি ব্যাপিয়া স্থাপিত। এই ডক্ ইয়ার্ড হইতেই ওয়াট্সন সাহেব বাঙ্গালায় প্রথম জাহাজ নির্ম্মাণের পথ খুলিয়া দেন। ১৭৮০ খৃঃঅব্দে *Nonsuch* ও ১৭৮৮ খৃঃঅব্দে Frigate নামক দুইখানি ৩৬টি কামান বিশিষ্ট রণতরী তৎকর্ত্তৃক এই স্থানে প্রথম নির্ম্মিত হয়। ওয়াট্সন ১৭৮০ খৃঃঅব্দে যে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন খিদিরপুরের বর্ত্তমান ডকইয়ার্ড আজও তাহা জলন্ত অক্ষরে বিঘোষিত করিতেছে।

কলিকাতার প্রাচীন বস্তুগুলির মধ্যে বর্ত্তমান চাঁদপাল ঘাট একটি উল্লেখ যোগ্য বটে। পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে চাঁদপাল ঘাটের নামোল্লেখ আমরা কোন স্থলে দেখিতে পাই না। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর ইহা একটি বিখ্যাত জিনিশ। এই চাঁদপাল ঘাট হইতে যে বিষবৃক্ষের মূল রোপিত হইয়াছিল, তাহা কালে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া ভয়ানক বিষময় ফল প্রসব করত ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনারলকে পথের ভিখারী করিতে উদ্যত হইয়াছিল— ইহাঁর জন্য বাগ্মীপ্রবর সেরিডান, ও বার্ক বদ্ধপরিকর হইয়া ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল কথা ভাবিতে হইলেই চাঁদপাল ঘাট আমাদের মনে স্বতই উদিত হয়। এই ঘাটেই সুপ্রসিদ্ধ ইলাইজা ইম্পে ও সার ফিলিপ্ ফ্রান্সিস অবতরণ করেন। ইহারই সোপান শ্রেণী অবরোহণ করিতে করিতে কূটবুদ্ধি, অভিমানী ফ্রান্সিস এক দুই করিয়া ফোর্ট উইলিয়াম প্রাকারস্থ সমস্ত তোপধ্বনি গণনা করিয়াছিলেন। ফ্রান্সিস মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সম্মানার্থ গবর্ণর জেনারলের আদেশ ক্রমে উনিশটি তোপধ্বনি হইবে, কিন্তু তিনি যখন গণিয়া দেখিলেন যে সপ্তদশটি মাত্র তোপধ্বনি হইয়াছে, উনিশটি হয়

নাই, তখন তাঁহার মনে অভিমানের ও অপমানের খরতর মিশ্রস্রোত বহিতে লাগিল। হেষ্টীংস জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়া তাঁহার অপমান করিলেন, এই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। তিনিও হেষ্টিংসের সর্ব্বনাশ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বিষণ্ণচিত্তে ধীরে ধীরে সোপানরাজি পরিত্যাগ করিলেন। বস্তুত চাঁদ-পাল ঘাট একটি গণনীয় ও স্মরণীয় বস্তু বটে। ভারতের যত গবর্ণর জেনেরেল রেলওয়ে সৃষ্টির পূর্ব্বে এদেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সকলেই এই চাঁদপালের ঘাটে জাহাজে উঠিয়াছিলেন। কেবল মাত্র লর্ড এলেনবরা Prinsep ঘাটে উঠিয়াছিলেন। এই ঘাটের নাম চাঁদপাল হইল কেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন যে, চন্দ্রপাল নামক এক মুদী এইখানে দোকান করিত, তাহার নামানুসারে এই নাম হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইংরাজেরা ইহাকে St. Paul's ঘাট বলিতেন—সেণ্টপল হইতে দেশী-য়েরা অপভ্রংশ করিয়া লইয়াছে। যাহা হউক এ বিষয়ের অনুসন্ধানে আমা-দের কোন আবশ্যক নাই।

আজ কাল যেখানে কলভিন ঘাট অবস্থিত, এই স্থান হইতে বর্ত্তমান বেঙ্গল সেক্রেটারিএট্ পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র সরু খাল ছিল। হলওয়েল সাহেবের ম্যাপে এই খালের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল সেই খালের চিহ্নমাত্র নাই, বহুদিন হইল গবর্ণমেণ্ট তাহা বুজাইয়া দিয়াছেন। এই স্থান সর্ব্বদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত—দেশীয়েরা এইস্থলে নৌকায় চড়িতেন। এই ঘাটের অতি সন্নিকটেই পুলিস ঘাট বলিয়া একটি ঘাট ছিল। আজকাল যেস্থানে মহাত্মা চার্লস মেটকাফের কীর্ত্তিস্তম্ভ অক্ষত ভাবে দণ্ডায়মান, ইহারই সান্নিধ্যে পুলিস ঘাট ছিল। যে জায়গায় মেটকাফ হল রহিয়াছে তাহা পলাশির যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতার প্রেসিডেণ্টের নিবাস-ভূমি ছিল। এই বাটীর নিকট প্রেসিডেণ্ট সাহেবের নিজের বাগান, ও তাহার প্রান্তভাগ হইতে লালদিঘী পর্য্যন্ত বিস্তৃত আর এক প্রশস্ত উদ্যান ছিল। এই স্থানকে তৎকালীন ইংরেজেরা Park বলিতেন। প্রতিদিবস সন্ধ্যার সময় প্রাচীন কলিকাতা বাসী ইংরেজগণ এইস্থানে বেড়াইতে আসিতেন। এই পার্কের উত্তর ধারে প্রেসিডেণ্টের বাটী সংলগ্ন একটি সুন্দর তোরণ ছিল। প্রেসিডেণ্ট সাহেব এই তোরণ দিয়া বহির্গত হইয়া পদব্রজে সুবিখ্যাত সেণ্ট-জন গির্জ্জায় যাইতেন। তখন এত গাড়ি ঘোড়ার ছড়াছড়ি ছিল না। আজকাল গবর্ণমেণ্ট অফিসের একজন সামান্য ইংরেজ কর্ম্মচারী যে প্রকার

গাড়ি ঘোড়া চড়িয়া সুখে কাটান, দুইশত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার শাসন কর্ত্তা প্রেসিডেণ্ট সাহেবের তাহার এক চতুর্থাংশও ছিল না। এই প্রবন্ধের শেষভাগে আমরা তৎকালীন প্রেসিডেণ্টের অবস্থা ও কলিকাতার বাণিজ্য বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

নবাব সেরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পর গবর্ণরের (প্রেসি-ডেণ্টের) আবাস স্থান বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট প্যালেসের দ্বারা অধিকৃত স্থানে নির্ম্মিত হয়। প্রেসিডেণ্ট সাহেবের আবাস বাটীর দ্বারা অধিকৃত স্থান মেরিন ইয়ার্ডের জন্য গৃহীত হয়। এই মেরিন ইয়ার্ডকে বাঁকশাল বলিত। কোথাহইতে (Bankshal) নামটির উৎপত্তি হইল তাহা স্থির করা দুরূহ। ইহা ইংরাজি কথা নহে—কেহ কেহ বলেন যে পর্টুগীজ ভাষা হইতে ইহা গৃহীত হইয়াছে। ১৭০০ খৃঃ অব্দেও এই কথাটির ব্যবহার শুনা যায়। ঐ সময়ে ডাইরেকটারেরা একটি বাঁকশাল (Bankshal) নির্ম্মাণের অনুমতি প্রদান করেন। প্রেসিডেণ্ট সাহেবের পুলিস ঘাটের সান্নিধ্যে পুরাণ বাটীতে ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দে একটি ডক নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। Pilot Vessel গুলির মেরামত জন্য এই ডক খোলা হয়। কিন্তু ১৮০৮ খৃঃ অব্দে ইহার অনাবশ্যকতা বুঝিয়া গবর্ণ-মেণ্ট ইহাকে বুজাইয়া ফেলেন। আজকাল যে স্থানকে কয়লাঘাট বলিয়া থাকে, পূর্ব্বে সেই স্থানকে (New Wharf) নিউ হোয়ার্ফ ঘাট বলিত। এই ঘাটের উপরেই পুরাতন কষ্টম হাউস ছিল। ইহার উত্তর দিকে কলি-কাতার প্রাচীন দুর্গ ছিল। এখন যেখানে Export warehouse ও কষ্টম হাউস আছে, পূর্ব্বে সেই স্থানে কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ ছিল। এই দুর্গ খৃঃ ১৭০০ অব্দে নির্ম্মিত হয় ও নবাব সেরাজউদ্দৌলা এই দুর্গ আক্রমণ করেন। বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম নবাব কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পরে নির্ম্মিত হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই দুর্গ প্রস্তরবৎ কঠিন ও মজবুত ছিল। ইহার গাঁথনী এতদূর শক্ত ছিল যে, ইহাকে ভাঙিবার জন্য কামানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এই দুর্গ আমাদিগকে অনেক প্রাচীন কথা মনে করাইয়া দেয়। যদিও এখন ইহার কোন চিহ্ন নাই—তথাপি যত দিন ইংরাজ রাজত্ব থাকিবে, তত দিন ইহার নাম কেহই ভুলিতে পারিবেন না। এইখানেই ঢাকার রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস আসিয়া ড্রেক সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দুর্গ সংস্করণ করিতে গিয়াই ইংরাজ নবাবের বিষ-নয়নে পতিত হইয়াছিলেন। এই দুর্গ মধ্যস্থ

একটি ক্ষুদ্রতম ভবনে সুপ্রসিদ্ধ "অন্ধকূপ হত্যা" সংঘটিত হয়। এই সময়ে ইংরাজের দুর্গ ছিল বটে, কিন্তু ইহার উপযুক্ত সেনা ছিল না। বোধ হয় দুর্গে যদি উপযুক্ত সংখ্যক সেনা থাকিত তাহা হইলে নবাব এত স্বল্পায়াসে দুর্গ জয় করিতে পারিতেন না। এই সময়ে ইংরাজের সামরিক বল কিরূপ ছিল, কলিকাতা দুর্গাক্রমণের নিম্নলিখিত বিবরণটি হইতেই পাঠক তাহা জানিতে পারিবেন। আমরা সাধ্যমতে অনুবাদ ঠিক রাখিয়া নিম্নলিখিত ঘটনাটি সংক্ষেপে তুলিয়া দিলাম। *

"এই সময়ে আমাদের সামরিক বল কিছুমাত্র ছিল না। যুদ্ধ বিগ্রহেরও কোন ভয় ছিল না। সুতরাং আমরাও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতাম। Ware house রক্ষা করিবার জন্য আমাদের স্বল্প সংখ্যক সৈন্য ছিল। যুদ্ধাদি বিষয়ে চালনা না থাকাতে তাহারাও অকর্ম্মন্য হইয়া পড়ে। কি করিয়া বন্দুক ধরিতে হয়, কি প্রকারে লক্ষ্য স্থির করিয়া ইহা ছুড়িতে হয়, বোধ হয় আমাদের সৈন্যগণের মধ্যে দুই চারিজন কথঞ্চিৎ জানিত। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে ডাইরেক্টর যে সমস্ত কামান পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তাহা দুর্গ-প্রাকারে পড়িয়া মরিচা রঞ্জিত হইতেছিল। যুদ্ধ করা দূরে থাক্, সামান্যরূপ আক্রমণ হইলে তাহা হইতে কি প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে হয়—তাহা বোধ হয় অর্দ্ধেক সৈন্য জানিত না। যখন নবাব সেরাজ আসিয়া কলিকাতার দুর্গ অবরোধ করেন, তখন দুর্গ মধ্যে প্রায় দুইশত সৈন্য অবস্থান করিতেছিল—যখন চিৎপুর হইতে নবাবের বজ্রনিনাদী কামান শব্দ শ্রুত হইল, সৈন্যগণ তখনও নিশ্চেষ্ট। Commander Minchin, কাপ্তেন Clayton ও কাপ্তেন Buchanan তখন কেল্লায় সৈন্যদিগের অধ্যক্ষ হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। মিনচিন্ ও ক্লেটন উভয়েই অলস প্রকৃতি ভীরু (?) ও কার্য্যানভিজ্ঞ ছিলেন। আক্রমণের সময়েও ইহারা দুই জনে নিশ্চেষ্ট ছিলেন। Minchin প্রধান কমাণ্ডার ;—সুতরাং Buchanan সাহেব তাঁহা অপেক্ষা সাহসী ও কার্য্যকুশল হইলেও যুদ্ধ করিবার ভার পান নাই। নবাব ১৯এ জুন প্রাতঃকালে দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। দুর্গের ভিতর ১৯০ জন সৈন্যের মধ্যে ৬০ জন মাত্র ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। যাঁহাদের হস্তে সৈন্য চালনার ভার—তাঁহাদিগকে স্বকার্য্য সাধনে এপ্রকার বীতস্পৃহ দেখিয়া

* Vide "Holwell and his contemporaries" a paper contributed to the "Friend of India."

উচ্চপদস্থ সিবিল কর্ম্মচারিরা সেই স্বল্প সংখ্যক সৈন্যগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভাগ করিয়া লইয়া দুর্গের এক এক দিকে গমন করিলেন। এই অধিনায়ক দলের মধ্যে রেবারেণ্ড ম্যাপলেটফ্‌ট (Rev. Mapletoft) নামক একজন পাদরী ছিলেন। পাদরী সাহেবও যুদ্ধে খুব সাহস দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রকার স্বদেশ-হিতৈষীতা দেখিয়া অনেক বাজে লোকে বন্দুক ধরিয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সমস্ত দিন এইরূপে কাটিয়া গেল—রজনী উপস্থিত;—কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য সেই কোলাহলময়ী রজনীতে একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ সমিতি (Council of war) বসিল। সভায় স্থির হইল—এপ্রকার অনিশ্চিত ও অরক্ষিত অবস্থায় যুদ্ধ করিয়া কোন ফলই হইবে না—অতএব স্ত্রীলোকদিগকে ও কোম্পানির টাকাকড়ী ও মালপত্র নৌকায় করিয়া জাহাজে পাঠাইয়া দেওয়া হউক। তৎকালে দুর্গসান্নিধ্যে Dodaly (ডোডালী) ও Diligence (ডিলিজেন্স) নামক দুই খানি জাহাজ অপেক্ষা করিতেছিল। স্ত্রীলোকদিগের ডোডালিতে স্থান সংকুলন হইল না—সুতরাং হলওয়েল সাহেব Diligence নামক নিজের জাহাজ খানিতে বাকী স্ত্রীলোক ও কোম্পানির নগদ টাকা ও হিসাবপত্রাদি তুলিয়া জাহাজ খুলিয়া দিতে অনুমতি করিলেন। জাহাজ গিয়া খিদিরপুরের নিকটে গার্ডেন রিচে অপেক্ষা করিবে এ অনুমতিও দেওয়া হইল। এই সুযোগে ও গোলমালে ম্যানিংহাম ও ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড নামক কৌন্সিলের দুইজন সভ্য স্ত্রীলোকদিগকে জাহাজে তুলিয়া দিবার ছলে জাহাজে উঠিয়া বসিলেন। ক্রমে রজনীর শেষ যাম উপনীত হইল। সমস্ত রাত্রি মন্ত্রণা করিয়া মাথামুণ্ড কিছুই ঠিক হইল না। প্রেসিডেন্ট ড্রেক সাহেব কাউন্সিলের অন্যতম মেম্বর ম্যাকেট, ও যোদ্ধৃ প্রবর মিনচিন ও গ্রান্ট এই অবসরে দুর্গত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে ভাগিরথীতটে উপনীত হইলেন। কতকগুলি নৌকা গোলাগুলির ভয়ে সেই সময়ে দুর্গ নিম্নে অপেক্ষা করিতে ছিল। মাঝিদের মধ্যে দুই একজন ঘুমাইতেছিল—ও আর সকলে জাগিয়া ছিল। ইঁহারাও এই অবসরে নৌকায় গিয়া চড়িয়া বসিলেন, দুই চারি খানি নৌকা সেই খানেই রহিল—অবশিষ্টগুলি তীরবৎ-বেগে গার্ডন রিচের দিকে চলিল। যখন প্রেসিডেন্ট ড্রেকের দুর্গ ত্যাগ সংবাদ চারিদিকে প্রচার হইল, তখন অবশিষ্ট লোক বিপদ উপস্থিত ভাবিয়া অবশিষ্ট নৌকায় গিয়া উঠিল। দুর্গমধ্যে অবশিষ্ট ১৭০ জন লোকের মধ্যে প্রায় ৭০ জন হত ও আহত হইয়াছিল।

অবশিষ্ট লোকে হলওয়েল সাহেবকে অধ্যক্ষ করিয়া শেষ চেষ্টা করিবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু এ চেষ্টা বৃথা; হলওয়েল নবাবের নিকট দূত প্রেরণ করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। সুবিখ্যাত উমীচাঁদ দূত হইয়া নবাব সদনে গমন করিলেন।" ইহার পরে কি হইল তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন, এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

হিন্দুধর্ম্মের নবজীবন।

আজকাল হিন্দুধর্ম্মের উপর নব্যবঙ্গের অতিশয় উৎসাহ দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষের প্রধান নগরে আজ শিক্ষিত সমাজ আগ্রহের সহিত টীকিধারী, অনাবৃত দেহ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বক্তৃতা শুনিতেছেন। যে সমাজকে টাউন-হলে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুবক্তার ইংরাজি বক্তৃতা টলাইতে পারে নাই, আজ সেই সমাজকে অশ্রুতপূর্ব্ব স্থানে অশ্রুতপূর্ব্ব লোকের বাঙ্গালা বক্তৃতা মাতাইয়া তুলিল। যে সকল ব্রতনিষ্ঠাদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট কুসংস্কার বলিয়া সুপরিচিত ছিল, আজ তাহা সম্মানিত হইতেছে, আজ তৎপরিপোষক তর্ক সাদরে গৃহীত হইতেছে।

এই নবানুরাগের প্রধান কারণ, হিন্দুধর্ম্ম—জাতীয় ধর্ম্ম। আমাদের জাতীয় জীবনের অঙ্কুর রোপিত হইয়াছে। সংবাদপত্রে, পুস্তকে, বক্তৃতায়, "সমুদয় ভারতবাসী এক জাতি" ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বিজাতীয় ধর্ম্ম, বিজাতীয় রীতিনীতির উপর বিরাগ, এবং জাতীয় ধর্ম্ম, জাতীয় আচার ব্যবহারের উপর অনুরাগ ক্রমশ প্রবল হইতেছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষাই যে আমাদের নবজীবন প্রভাতের মূলীভূত কারণ, তাহা কোন্ অপক্ষপাতী বিচারক অস্বীকার করিবেন? সত্য বটে আর্য্যেরা সভ্যতা-সোপানের অনেক উচ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে বহুকালের কথা। তাঁহাদের উন্নতি সূর্য্য অনেক দিন অস্তমিত হইয়াছে। গত সহস্র বৎসর ভারতবর্ষের পক্ষে গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন অমাবস্যা রজনী। গত সহস্র বৎসর হিন্দুরা নিদ্রিত ছিল। আমাদের গণিত শাস্ত্র, দর্শনাদি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে খানে ছিল, আজও সেইখানে রহিয়াছে—একটুও অগ্রসর হয় নাই।

কিন্তু ইতিমধ্যে (বিশেষত, গত দুই শত বৎসরে) পাশ্চাত্য জাতিরা প্রাচ্যদিগকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া উন্নতিবর্ত্মে অগ্রসর হইয়াছে। তাহাদিগের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে আমাদের অপমান নাই, তাহারা যে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা স্বীকার করিলে আমাদের গৌরবের হ্রাস হইবে না। প্রাচীন মিসর গ্রীসের গুরু, কিন্তু কালে সভ্যতায় শিষ্যের কাছে গুরুর হার মানিতে হইল। গণিত বিদ্যা এবং রসায়ন আরবেরা হিন্দুদিগের নিকট শিখে; আরবদিগের কাছে বর্ত্তমান ইউরোপীয়েরা শিক্ষালাভ করে। কিন্তু আমাদের গণিত ও রসায়নের সহিত অধুনাতন ইউরোপীয় গণিত ও রসায়নের কত প্রভেদ, তাহা পাঠককে বলার প্রয়োজন নাই।

প্রভেদ স্বীকার করায় কোন অপমান দেখা যায় না। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যে আমাদের বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এক্ষণে আমাদের যাহা কিছু জীবনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহা যে অনেকটা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার বলে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রমাণ,—যাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা পায় নাই, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাব, যাহাদের মনে প্রবেশ করে নাই, তাহাদের মধ্যে নবজীবনের চিহ্ন অতি অল্পই দৃষ্ট হয়—তাহারা পূর্ব্বেও যেরূপ মৃতবৎ ছিল, এখনও সেইরূপ মৃতবৎ।

পাশ্চাত্য খণ্ডে যে বিজ্ঞান দ্রুতগতি উন্নতি-পথে ধাবমান হইতেছে, যে বিজ্ঞানের বলে আমাদের জাতীয় জীবনের সঞ্চার হইয়াছে, যাহা কিছু সেই বিজ্ঞানের প্রতিকূল তাহার পতন নিশ্চয়, যাহা কিছু উহার অনুকূল তাহাই রহিবে। খ্রীষ্টানধর্ম্ম বিনাশোন্মুখ; ফ্রান্স, জর্ম্মাণ, ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশে অখ্রীষ্টানের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার কারণ, খ্রীষ্টানধর্ম্ম বিজ্ঞানের প্রতিকূল। ধর্ম্ম দ্বারা সচরাচর যাহা বুঝায়, তৎসম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের অসামঞ্জস্য নাই। বিশ্বাস সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্মের উদারতা সম্পূর্ণ। তুমি এক ঈশ্বরের উপাসনা করিবে, হিন্দুধর্ম্ম তোমায় ক্রোড়ে লইবে। তুমি প্রতিমা পূজা করিবে, যেরূপ খুসী এবং যত খুসী প্রতিমা গড়িয়া পূজা কর, হিন্দুধর্ম্ম কখনও তোমায় বারণ করিবে না। হিন্দুধর্ম্ম পরিবর্ত্তনশীল, তাই উন্নতিশীল, তাই বিজ্ঞানের বিরোধী নহে, তাই ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। "প্রাচীন এপি-

কিউরস, ডিমক্রিটস হইতে আধুনিক হক্সলি, টমসন, স্পেন্সার প্রভৃতি পুরুষ প্রধানেরা যে মহাশক্তির উপাসক *** সেই জগৎপ্রসূতি মহাদেবীর আঁরাধনা করিতে" * যে ধর্ম্ম উপদেশ দেয়, যে ধর্ম্মে বুদ্ধদেব অবতার মধ্যে গণ্য, যে ধর্ম্ম চার্ব্বাকাদি নিরীশ্বরবাদিদিগকেও আশ্রয় দেয়, সে ধর্ম্মের বিনাশ অসম্ভব। উনবিংশ শতাব্দীর প্রাণীবিদ্যার মূলসূত্র, জীবের ক্রম বিকাশ। ইহা প্রচারিত হইবা মাত্র খ্রীষ্টানধর্ম্ম খড়্গহস্ত হইল, প্রাণী তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম জীবের ক্রম বিকাশ মত সাদরে গ্রহণ করিল, এমন কি কোন কোন পণ্ডিত হিন্দুশাস্ত্রে ঐ মতের অস্ফুট প্রকাশ দেখিতে পাইলেন। পৃথিবীর বয়স পরিমিত নহে, যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইয়াছে, আধুনিক বিজ্ঞানের এই অখণ্ডনীয় সত্য খ্রীষ্টানধর্ম্মের বিরোধী। কিন্তু হিন্দুদিগের ধর্ম্মপুস্তকে এই সত্য পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম হিন্দু সমাজের সহিত অতিশয় জড়াইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুদিগের সামাজিক নিয়ম ধর্ম্মের নামে প্রচলিত। সামাজিক নিয়ম রক্ষা করিবে না, ধর্ম্মচ্যুত হইবে। ঐ সকল নিয়মের সহিত ধর্ম্মের বাস্তবিক কোন সম্বন্ধ নাই, উহাদের নাশে প্রকৃত ধর্ম্মের নাশ হইবে না। যদি উহাদের কোনটি উন্নতি বিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মের কোন ক্ষতি হইবে না। হিন্দু সমাজের পরিবর্ত্তন হইবে, সত্য, কিন্তু পরিবর্ত্তন উন্নতির সহচর। যাহা কিছু স্থায়ী তাহার উন্নতি অসম্ভব। প্রাণীজগতের ক্রমিক পরিবর্ত্তন হইয়া অপকৃষ্ট জীব হইতে উৎকৃষ্ট জীব উৎপন্ন হইয়াছে। সমগ্র জীবজগৎ যে নিয়মের বশবর্ত্তী, সমাজ বিশেষের পক্ষে সে নিয়ম অতিক্রম করা অসম্ভব। পরিবর্ত্তনশীল না হইলে ব্যক্তি বিশেষের ন্যায় সমাজেরও উন্নতি সম্ভবে না।

আমরা যে সকল সামাজিক নিয়মের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলিলাম, এই প্রবন্ধে তাহার প্রধান কয়টির অবতারণা করিব।

১। খাদ্যাখাদ্য বিচার। এই নিয়মটি কোন ক্রমেই হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ নহে। এখনকার ব্রাহ্মণেরা যাহা অখাদ্য বলিয়া মত দিয়া থাকেন; তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা, তাঁহাদের ধর্ম্মের নেতারা, তাহা খাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

---

* "নবজীবন," পৌষ ৬ সংখ্যা ৩৬৪ পৃষ্ঠা।

আর্য্যেরা যে গোমাংস পর্য্যন্ত ছাড়িতেন না, তাহার প্রমাণ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পাইয়াছেন। আবার, আজকালকার হিন্দুদিগের মধ্যেই, বঙ্গদেশে যাহা অখাদ্য, মহারাষ্ট্রে তাহা খাদ্য, মহারাষ্ট্রে যাহা অখাদ্য বঙ্গদেশে তাহা খাদ্য। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের পক্ষে মৎস্যমাংস নিষিদ্ধ; বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ মৎস্য এবং ছাগশাবকের জন্য লালায়িত। মহারাষ্ট্রীয় শূদ্র এবং অনেক রাজপুত নির্ব্বিবাদে গ্রাম্য কুকুটাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে, বঙ্গীয় শূদ্রের পক্ষে ভিন্ন নিয়ম। ফলত প্রতিমাদি পূজা সম্বন্ধে যেরূপ, খাদ্য সম্বন্ধেও সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মের আদেশ অলঙ্ঘনীয় নহে, স্বেচ্ছাপালনীয়। মহারাষ্ট্র এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসীরা যেরূপ দুর্গা পূজা না করিয়াও হিন্দু, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেরা সেইরূপ মৎস্য মাংস খাইয়াও হিন্দু। যদি মৎস্যাদি ভক্ষণ ব্রাহ্মণের পক্ষে বাস্তবিক নিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নামের অধিকারী হইতে পারিতেন না। অতএব দেখা যাইতেছে অখাদ্য ভক্ষণ সম্বন্ধে নিষেধ সামাজিক নিয়ম মাত্র। ধর্ম্মের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই, যদি থাকে তাহা হইলে থাকা উচিত নহে। মৎস্য মাংস খাওয়া ভাল কি মন্দ, উহা ব্যতীত শারীরিক উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর কি না, সে বিষয়ে এখানে তর্ক বিতর্ক করিবার প্রয়োজন করে না। তবে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে ধর্ম্মের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। খাদ্যাখাদ্যের বিচার বিজ্ঞান করিবে; বিজ্ঞানের মতানুসারেও চলা না চলা আমাদের ইচ্ছাধীন,—"আপ্ রুচি খানা।" মাংস শরীরের পক্ষে উপকারী সিদ্ধান্ত হইলেও, অনেক করুণহৃদয় লোক উহাতে বিরত থাকিতে পারেন; মাংস সাধারণত নিষিদ্ধ হইলেও, কাহারও কাহারও পক্ষে, উহা হইতে উপকার অসম্ভব নহে, এবং কখনও কখনও উহা ব্যতীত আর কোন খাদ্য না জুটিতেও পারে।

প্রকৃত পক্ষে, আজ কাল নব্য সম্প্রদায়ের অনেকেই হিন্দুধর্ম্মের খাদ্যবিচার সম্বন্ধের নিয়ম সহস্রাধিক বার লঙ্ঘন করিতেছে। কৈ, তাহারা ত ধর্ম্মচ্যুত হইতেছে না. যে হিন্দু সেই হিন্দুই রহিতেছে! তবে তোমার হিন্দুধর্ম্মের আদেশ কোথায় রহিল? নব্য সম্প্রদায় ঐ আদেশ কেন মানেন না? কারণ, উহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ উহার প্রতিপালনে ব্যক্তিগত বা সমাজগত উন্নতি দৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ বলিবেন, নব্য সম্প্রদায় অখাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা 'অজানত, গোপনে।' যাহা অকর্ত্তব্য তাহা কি গোপনে করিলে কোন দোষ হয় না? গোপনই বা কোথায়? অনেকে

প্রকাশ্যরূপেই বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের অনেক অখাদ্য উদরস্থ করেন। কিন্তু অনেক সময়ে যে অনেককে কপটাচরণ করিতে হয়, মিথ্যা কথা বলিতে হয়, তাহা কে না জানে?* এ পাপের জন্য কি হিন্দু সমাজ কতকটা দায়ী নহে? যে আজ্ঞার ক্রমাগত লঙ্ঘন হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আরও লঙ্ঘন হইবে, যে আজ্ঞার লঙ্ঘনকারীদিগকে সমাজ দণ্ড দিতে অসমর্থ অথচ যে আজ্ঞা থাকা প্রযুক্ত অনেকের মন অনর্থক পাপে কলুষিত হইতেছে, সে আজ্ঞার অবহেলা বর্ত্তমান ঘটনা পরম্পরার অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা বজায় রাখিতে আজ্ঞা রক্ষা করা কি বিধেয়? চেষ্টা করা কি বাতুলের কার্য্য নহে? অতএব আমরা যত শীঘ্র আমাদের ধর্ম্মের খাদ্য অখাদ্য সম্বন্ধে নিয়ম উঠাইয়া দেই ততই আমাদের ধর্ম্মের এবং সমাজের পক্ষে ভাল।

২। পোতারোহণে বিদেশ গমন বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে বাস্তবিক নিষিদ্ধ কি না তাহা লেখক বিশেষরূপে অবগত নহেন। কিন্তু জাহাজে চড়িয়া ইউরোপে যাইলে "জাত যায়" তাহা সকলেই জানেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যে "জাত যায়" জাহাজারোহণের জন্য নহে, "জাত যায়" অখাদ্য ভক্ষণের জন্য। তাহা যদি হয়, তবে ঠিক ঐ সকল অখাদ্য যাঁহারা এই দেশেই প্রকাশ্যেই হউক আর অপ্রকাশ্যেই হউক খাইয়া থাকেন, তাঁহাদের "জাত যায়" না কেন? এ সমস্যা কে পূরণ করিবে? কয়েক জন হিন্দু সমাজ-ভুক্ত হিন্দু (তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ উপবীতধারী) পি এণ্ড ও কোম্পানির জাহাজে—জাহাজের টেবিলে, জাহাজের খাদ্য খাইয়া—মান্দ্রাজ বা লঙ্কাদ্বীপ যাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের "জাত" গেল না। অতএব, দেখা যাইতেছে, যে হিন্দুধর্ম্মের আদেশ যাহাই হউক, জাহাজে করিয়া ইউরোপ যাওয়া হিন্দু সমাজের চক্ষে প্রায়শ্চিত্ত সাপেক্ষ পাপ! এরূপ বিবেকহীন, সঙ্কীর্ণ নিয়ম যে প্রাচীন উন্নতিশীল হিন্দুদিগের ধর্ম্মে ছিল না, তাহার প্রমাণ, তাঁহারা বাণিজ্যার্থ সমুদ্রে গমনাগমন করিতেন। এরূপ নিয়ম যে আমাদের উন্নতির বিরোধী, তাহা পাঠককে অধিক কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলে তাঁহার বুদ্ধির অপমান করা হইবে। ভারতবর্ষ ছাড়া যে অন্য দেশ

* অনেকে বলিতে পারেন এবং বলিয়াও থাকেন, যে সমাজের শৃঙ্খলতা রক্ষার জন্য, কি বৃদ্ধ পিতা মাতার মনস্তুষ্টির জন্য মধ্যে মধ্যে মিথ্যা কথা বলায় বা কপটাচরণ করায় দোষ নাই। তাঁহাদের প্রতি সংক্ষেপে উত্তর—তাঁহারা ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করুন।

আছে, হিন্দু ছাড়া যে অন্য সভ্য জাতি আছে, অনেকের পক্ষে তাহা জানা আবশ্যক। বিদেশ ভ্রমণে যে মনের সঙ্কীর্ণতা যায় এবং শিক্ষালাভ হয়, তাহা সকলেরই জানা আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নিকট এখনও বহুদিন আমাদিগকে নতশির হইয়া শিক্ষালাভ করিতে হইবে। ইউরোপে যে বিজ্ঞানসূর্য্য উদিত হইয়াছে, এখানে যাহার ঈষৎ আভা পাইয়া আমরা নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, ইউরোপে না যাইলে তাহার জ্যোতির সম্পূর্ণ উপলব্ধি অসম্ভব। আবার, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।" ভারতবর্ষের বাণিজ্যের বিস্তার যে বিশেষরূপে বাঞ্ছনীয়, তাহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু যতদিন পোতারোহণে ইউরোপ ও আমেরিকা গমন হিন্দু সমাজে নিষিদ্ধ থাকিবে, ততদিন আমরা ইচ্ছানুরূপ বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না, ততদিন ভারতবর্ষ গরিব থাকিবে। চারিদিকে শুনা যায়, আমাদের দেশে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার যন্ত্রের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যন্ত্রাদি সম্বন্ধে শিক্ষা কে দিবে, কোথায় পাইব? তাহার জন্য কি ইউরোপে যাওয়া আবশ্যক নহে? জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধনাঢ্য হিন্দু বণিক কার্য্যবশত ইংলণ্ডে যান। তিনি ম্যাঞ্চেষ্টার কি লিবরপুলে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে অতি গোপনে লণ্ডন দেখিতে যান—পাছে কোন বাঙ্গালির চক্ষে পড়েন। এখানে প্রচার ছিল, যে তিনি বোম্বাই গিয়াছেন। তাঁহাকে এরূপ নিগ্রহ সহ্য করিতে হইল কেন? এরূপ কপটাচরণ করিতে হইল কেন? লেখক, তাঁহার বিষয় যতদূর শুনিয়াছেন, তিনি একজন গণ্য, মান্য, উৎকৃষ্ট লোক, সহজে মিথ্যা কথা বলিবার লোক নহেন। বোধ হয়, হিন্দু সমাজের কুনিয়মই তাঁহাকে কুপথে যাইতে বাধ্য করিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমথনাথ বসু।

আকাশ।

হে আকাশ! কে বা তুমি জগৎ ব্যাপিয়া
যত দূর যায় দৃষ্টি,
রচিয়া অপূর্ব্ব সৃষ্টি,
বিশাল মহান্ ভাবে আছ দাঁড়াইয়া;
অনন্ত তোমার কায়া,
অনন্ত তোমার মায়া,
ক্ষুদ্রতম নর আমি অবাক হেরিয়া।
নাহি বুঝি কিছু মর্ম্ম,
কিবা সে তোমার ধর্ম্ম,
নয়নেতে লাগে ধাঁধা আকুল ভাবিয়া,
কে তুমি রে রহিয়াছ জগত ব্যাপিয়া।১।

দিন মাস গত হয়,
ঋতু পরিবর্ত্ত ময়,
নিত্য নূতনতা তব ওহে বিশ্বালয়,
বসন্ত শিশির শীত,
কভু নীল, কভু পীত,
স্থির অচঞ্চল কভু, কখনও প্রলয়,
কহ সে বারতা কেন ঘটে বিপর্য্যয়?
কীটাধম কীট আমি,
সতত বিপথগামী—
মুহূর্ত্তেক নহে শুদ্ধ অভ্রান্ত হৃদয়;
অসীম তোমার প্রাণ,
বীর্য্যময় জ্যোতিষ্মান,
তবু বিশৃঙ্খল কেন, ওহে দীনাশ্রয়!
তুমিও কি পরিতপ্ত পাপ যন্ত্রণায়?২।

অনন্ত কালের সাক্ষী তুমি রে আকাশ!
কহ শুনি সে কাহিনী,
কে সৃজিল এ মেদিনী,
পশু পক্ষী প্রাণী কীট নরের আবাস;
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা,
কোথা হতে এল তারা,
সলিল, মৃত্তিকা, তেজ, অনল বাতাস;
কে সৃজিল নরজাতি,
জ্বালিল জ্ঞানের বাতি,
জড়তার মাঝে করি চৈতন্য-বিকাশ,
সৃষ্ট বস্তু শ্রেষ্ঠতম,
এ জগতে অনুপম,
রমণী সৃজিল কে রে কার এ বিলাস
কহ তত্ত্ব কালসাক্ষী তুমি রে আকাশ।৩।

ত্রিকালজ্ঞ তুমি দেব বিশাল হৃদয়,
বিপুল বিস্তার তব,
তুমিত দেখিছ সব,
বল কিসে নরজাতি লভে অভ্যুদয়?
মিশর পারস্য গ্রীস,
বাবিলন্ কি ফিনিস,
জগতের রাজ্ঞী রোম কেমনে উদয়।
কহ দেব পুরাতত্ত্ব—
কে স্থাপিল আর্য্যাবর্ত্ত,
কালের প্রভাতে সেই সুদূর সময়
জগৎ তিমিরাচ্ছন্ন,
নরজাতি পশু বন্য,

ভারত শুধুই যবে জ্ঞান দীপ্তিময়,
পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত, দেব, কহ সমুদয়। ৪।

বারেক হৃদয় দেব কর উন্মোচন,
ভাবি যবনিকা তুলি,
কি আছে দেখাও খুলি,
ভারত অদৃষ্ট-ক্ষেত্রে আশার লিখন।
শূন্য বর্ত্তমান যার,
ভবিষ্যৎ কিবা তার,
আছে কি কালের গায়ে কিছু নিদর্শন?
নাহি থাকে কোন চিহ্ন,
ও হৃদয় কর ভিন্ন,
উগার অনল, বজ্র কর বরিষণ,
কর দেব উল্কাপাৎ,
হক বঙ্গ ভস্মসাৎ,
কালের আঁধারে পুন ডুবাও ভুবন,
শূন্য ভবিষ্যৎ যার, কি ফল জীবন। ৫।

অনন্তের প্রতিকৃতি তুমি জ্যোতির্ম্ময়,
বিশাল হৃদয়ে তব,
এই বিশ্ব সমুদ্ভব,
গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্য জ্যোতিষ্ক নিচয়;
কভু শান্ত নীলপ্রভ,
কভু ভীম বজ্রাহব,
অবিরাম চঞ্চলতা স্থির কভু নয়;
অসীম শক্তির কার্য্য,
নিয়মিত অনিবার্য্য,
তোমাতে লভিছে জন্ম, তোমাতে বিলয়,
বল কোথা শক্তি নাথ শক্তির উদয়? ৬।

হে আকাশ তোমা পানে চাহি বারম্বার;
তুমি সৌন্দর্য্যের খনি,
তুমি নয়নের মণি,
আশৈশব হেরি তোমা প্রীতির সঞ্চার;
কখনও দুখেতে ভাসি,
কখনও আনন্দে হাসি,
কি সম্পদে কি বিপদে সুহৃৎ আমার;
না জানি কি প্রীতিহারে,
কি মধুর স্নেহসারে,
বাঁধিয়া রেখেছ চিত্ত হৃদয়ে তোমার,
তোমারে হেরিলে পরে,
এ প্রাণ কেমন করে,
ভুলে যাই সমুদয় এ বিশ্বসংসার,
অতীত ভবিষ্য দুই নিরখি আঁধার। ৭।

তখন জ্ঞানের চক্ষু হয় উন্মীলন,
চিত্রিত অমর বর্ণে,
তোমার হৃদয় পর্ণে,
জীবনের গূঢ় তত্ত্ব করি অধ্যয়ন,
রাজা কিম্বা রাজপাট,
সব দু দিনের ঠাট,
ভক্তি প্রেম ভালবাসা জাগ্রত-স্বপন;
জ্ঞানেতে না হয় মোক্ষ,
যুক্তিমার্গ নয় যোগ্য,
"শান্তি" মাত্র সার ভবে অনন্য সাধন,
"শান্তি" মোক্ষপদ দেব, অপার্থিব ধন। ৮।

হে আকাশ কে বা তুমি জগৎ ব্যাপিয়া,
যতদূর যায় দৃষ্টি,
রচিয়া অপূর্ব্ব সৃষ্টি,
বিশাল মহান্ ভাবে আছ দাঁড়াইয়া;
অনন্ত তোমার কায়া,
অনন্ত তোমার মায়া,
ক্ষুদ্রতম নর আমি অবাক হেরিয়া;
নাহি বুঝি কিছু মর্ম্ম,
কিবা সে তোমার ধর্ম্ম,
নয়নেতে লাগে ধাঁধা আকুল ভাবিয়া,
কে তুমি রে রহিয়াছ জগত পুরিয়া? ৯।

বল্ দেখি ভাই কি হয় ম'লে।

এটি সাধক প্রবর রামপ্রসাদ সেনের কথা। তিনি যখন সংসারের ঘোরতর মায়ার কথা—সাংসারিক বস্তুতে প্রবল মোহের বিষয় ভাবিতেন,—ভাবিতে ভাবিতে যখন মনে হইত, এই "ভবের বাজারে" বাজার করা শেষ হইলে একদিন সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইবে—ছাড়িয়া কোথায় যাইব তাহার কিছুই স্থিরতা নাই. সংসার ছাড়িয়া, সংসারের নিকট চির বিদায় লইয়া সব কোথায় যায়, যে একবার যায়, সে সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিতে পারে না;—তখন তাঁহার হৃদয়ে বিবিধ অপূর্ব্ব ভাব পরম্পরার সমাবেশ হইত, মনের সহিত গাইতেন—

"কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে।"

প্রথম মনে আসিল ভূত প্রেত হইব—সে কি? ভয়ানক অবস্থা! যাবতীয় মনুষ্যের ভীতি ও ঘৃণা উদ্দীপক পদার্থ! শ্মশানে, মশানে, কুস্থানে ভ্রমণ, কুস্থানে বাস, বায়ুর ন্যায় গতি, অতি ভয়াবহ সামগ্রী! নাম শুনিলে রাম রাম বলিবে—সে কি! অন্ধকারে গাছে গাছে বাস, সানুনাসিক, অস্পষ্ট, অথচ ভয়ানক উচ্চারণ! এখনই মনে হইলে কেমন ভয় হয়, ঘৃণা হয়—তাহাই হইব? সে যে অসহ্য। রাম প্রসাদের মনে তখন এই কথা আসিয়াছিল, মানুষ মরিলে কি যথার্থই তবে ভূত নামক সেই বিকট জীব বা পদার্থে পরিণত হয়?

মরণের পর ভূত প্রেত হইব—একথা বিজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ, মহাসাধক, ঈশ্বরে নিবিষ্ট চিত্ত রাম প্রসাদের মনে স্থান পাইল না। তিনি অনুসন্ধান করিলেন, লোকে আর কি বাদানুবাদ করে—তখন মনে হইল, কেহ কেহ বলিয়াছে "তুই স্বর্গে যাবি।" স্বর্গে যাইব—উৎকৃষ্ট হইতেও উৎকৃষ্টতর স্থান, জগতের শ্রেষ্ঠতম স্থান; তাহার কাছে কি ছার—দেবলোক, চন্দ্রলোক, ইন্দ্রের অমরাবতী! শোভা যে স্থানে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব, চমৎকারিত্ব মনে ভাবিয়া আনিতে পারি না। সেখানে রোগ নাই, শোক নাই, মায়া নাই, মোহ নাই, ক্রোধ নাই, লোভ নাই—কেবল সুখ, শান্তি, সাম্য, আরাম, আমোদ—সেখানে সব সমান, উচ্চ নীচ ভেদ নাই; সেখানে অন্ধকার নাই, কেবল আলোক। বিভিন্ন প্রকার বস্তুর ক্রমিক পরিবর্ত্তন কেবল পার্থিব জীবনেই আবশ্যক,

এখানে সমতায় বিরক্তি হয়; সেখানে বিরক্তি নাই—সেখানে ক্রমাগত আলোকে মনে আরও পরিতৃপ্তি—সেই জ্যোতির্ম্ময়, অথচ নয়ন স্নিগ্ধকর, মনের শান্তিপ্রদ আলোক এ পার্থিব চক্ষে কখন প্রতিবিম্বিত হয় না—সেখানে সব জিনিষই যেন আলোকময়, জ্যোতির্ম্ময়। তেমন স্থান—যাহার বড় পুণ্যের বল, সেই সেস্থানে পঁহুছিতে পারে—অনন্ত সুখভোগ করিবার তাহারই অধিকার; সেখানে সুখ অনন্ত—আমোদ অনন্ত। কিন্তু এ সুখ লাভের চিন্তায় সূক্ষ্ম তত্ত্বদর্শী রামপ্রসাদের মন উঠিল না। তাঁহার কল্পনা, কবির কল্পনা নয়—তিনি সাধক। স্বর্গ নামে এক স্থান আছে—সেখানে অনন্ত সুখের অধিকারী ব্যক্তি মাত্র যাইতে পারে, এ কথা তাঁহার মনের কাছে অতি সঙ্কীর্ণ—এ কথায় তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি জগৎ স্রষ্টা জগৎপাতাকে মাতৃভাবে দেখিতেন, মায়ের নামে তিনি বিভোর হইতেন—সেই মায়ের কাছে—যেখানে কেবল মায়েরই অধিকার যেখানে সেই মা-ময় সব, মরিলে এমন কোন স্থানে কি যাইতে পারিব না? ঈশ্বরকে রামপ্রসাদ মাতৃভাবে সাধনা করিতেন, —মায়ের কাছে না যাইতে পারিলে মা-গত প্রাণ সন্তানের সুখ হয় না, মনের শান্তি আসে না—সেস্থান কোথায়? তখন মনে হইল, কেহ কেহ বলিয়াছেন "সালোক্য পাবি"—সে কি? সেত কল্পিত স্বর্গ নয়—সেত প্রার্থনীয় স্থান, সাধকের প্রার্থনীয় শান্তিপ্রদ স্থান—তাঁহার লোকে যাইব, এ ইন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক, ধ্রুবলোক, অমরাবতী, নন্দনকানন নয়—সে ত কবির কল্পনা। এ তাঁহার লোক—স-লোক তিনি যেখানে আছেন সেই স্থানে। তিনি কে? মা।—এই ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডার, মিহিরের কিরণ, শশাঙ্কের সৌন্দর্য্য, সবই তাঁর; সেই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বময় পরব্রহ্ম—তাঁহার কাছে যাইতে পারিব। জীবনের জ্বালা যন্ত্রণায় বিব্রত হইয়া—"ভবের গাছে" পাক খাইতে খাইতে অসহ্য বোধ করিয়া—"মনের মত" ভাবে "শ্রীপদ" দেখিবার জন্য যাঁহার কত সাধ্য সাধনা করিয়াছি, মরিলে তাঁহার কাছে যাইতে পারিব—ইহার অধিক আর কি চাই? কিন্তু এ সুখেও রামপ্রসাদ মন স্থির করিতে পারিলেন না—তাঁহার ন্যায় সাধকের বাসনা আরও উচ্চ—তিনি মায়ের "আব্দারে" ছেলে—শুধু মা যেখানে আছেন সেখানে যাইতে পারিলেই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হয় না; যে মা-অন্ত-প্রাণ, সে মার কাছে গিয়াও স্থির হয় না, মার কোলে বসিয়াও স্থির হয় না, তাহার এত গাঢ় অনুরাগ, এত বুক ভরা প্রীতি, এত হৃদয় পোরা ভক্তি, যে ইচ্ছা হয়, যেন মায়ের সঙ্গে মিশাইয়া

যাই—মা আর আমি এক হইয়া যাই—এতটুকু পার্থক্য তাঁহার পক্ষে বিষম—তাই উচ্চতম সাধক আরও উচ্চতর সুখের অভিলাষী হইলেন—মনে আসিল কেহ কেহ বলিয়াছে মরিলে 'সাযুজ্য মেলে।' সে ত সালোক্যের বড়—তাঁহাতে সংযোজন মিলিবে, শুধু মায়ের কাছে গিয়া তৃপ্তি হয় না—তাঁহার সহিত যোজিত হইতে পারিব। মরিলে পর এই আমি, এই এতটুকু আমি সেই অনন্ত পরব্রহ্মের সহিত যোজিত হইতে পারিব—কি আদরের সংযোজন—একবার মনে করিলেও যেন দেহ আত্মা পবিত্র হয়। কিন্তু তবু কি আমার আমিত্ব যাবে না? আবার কি সেই অপূর্ব্ব যোগ হইতে বিযুক্ত হইয়া সংসার চক্রে ঘুরিতে হইবে? সাযুজ্যেও সাধকের পরিতৃপ্তি হইল না। মায়ের সহিত যোজিত হওয়ার অপেক্ষা তাঁহাতে লীন হওয়াই রামপ্রসাদের মনের কথা। লোকে "স্বর্গ" "সালোক্য," "সাযুজ্য" লইয়া বাদানুবাদ করিয়াছে, কিন্তু আমি নিজে বলি—

"যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়
জল হয়ে সে মিশায় জলে।"

—সে কি? সে নির্ব্বাণ চরম মুক্তি। রামপ্রসাদ "ভূত প্রেত" স্বর্গ সালোক্য, সাযুজ্য প্রভৃতি সকলই বিচার করিয়া শেষ স্থির করিলেন, যাহা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে, সাধকের তাহাতেই নিবৃত্তি হইবে। বাস্তবিক প্রাচীন দার্শনিকগণের মধ্যে সকলের মতগুলি একটি একটি করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে অবশেষে বেশ দেখা যায় যে, সকলেরই এক ভাবে না এক ভাবে ঐ মত। মানুষ মরিলে তাহার দেহের পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়। আর আত্মা অজর, অক্ষয়, অনন্ত, অবিকৃত—যাহা হইতে তাহার উৎপত্তি, সেই অনন্ত অক্ষয় পরব্রহ্মে যাইয়া লীন হয়।

ভারতে ইংরেজ রাজত্ব।

আমরা ষষ্ঠ সংখ্যায় ভারতে ব্রিটিশাধিকার প্রবন্ধে * দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ভারতবর্ষ কেবল ইংরেজের বাহুবলে অধিকৃত হয় নাই, ইংরেজ

* ভারতে ব্রিটিশাধিকার শীর্ষক প্রবন্ধ সিটিকলেজ গৃহে পঠিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় বিজেতা বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতে পারেন না। ভারতবর্ষ প্রধানত ভারতবাসীর সাহায্যে ইংরেজের অধিকৃত হইয়াছে।

অনেকে বলেন, ইংরেজ আপনাদের অনন্ত মহিমাময় ক্ষমতায় ও অপূর্ব্ব যাদু বিদ্যাবলে প্রায় সমগ্র ভারতে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত বা অশোক, শিবজী বা রণজিৎ সিংহ যে সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারেন নাই, ইংরেজ অল্প সময়ের মধ্যে তাহাতে ফল লাভ করিয়াছেন; চাণক্যের কূট মন্ত্রণায় যাহা সম্পন্ন হয় নাই, ইংরেজের রাজনীতিজ্ঞতায় তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। বণিক ইংরেজ বণিক্ বেশে ভারতবর্ষে আসিয়া অল্প দিনে সিন্ধু ও পঞ্জাবের বিশাল ভূমিতে, বিহার ও বঙ্গের শ্যামল ক্ষেত্রে, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের সমৃদ্ধ স্থলে আপনাদের জয়-পতাকা উড়াইয়া দিয়াছেন। অল্প দিনেই তাঁহাদের স্বদেশের বণিক-সমিতির একজন অনুগত কর্ম্মচারীর ক্ষমতা, সমগ্র ভারতে সেকন্দর শাহ বা শার্লেমানের, পিতর বা নেপোলিয়নের ক্ষমতার সহিত গৌরব ও তেজোমহিমার স্পর্দ্ধা করিয়াছে। ইহা ইংরেজের অলৌকিক দেব-শক্তির ফল—অগম্য, অচিন্ত্য মহিমার পরিচয়। ইংরেজ এই দেবশক্তির বলে—এই অচিন্ত্য মহিমার প্রসাদে হিমালয় হইতে সুদূর কুমারিকা পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে দূরতর ব্রহ্ম পর্য্যন্ত, বহু বিস্তৃত, বহু সমৃদ্ধ ও বহু জনাকীর্ণ ভূখণ্ডে অলোক-সামান্য দেবপুরুষ ও রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী বলিয়া পূজিত হইতেছেন।

যাঁহারা অন্তস্তত্ত্বদর্শী নহেন, তাঁহারা যে, ইংরেজের সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিবেন, তাহা কিছু অস্বাভাবিক নহে। ইতালীর সহিত ভারতবর্ষের অনেক বিষয়ে মিল আছে। এশিয়ার মানচিত্রে যেমন ভারতভূমি, ইউরোপের মানচিত্রে তেমনি ইতালী। উভয়েই উভয় মহাদেশের দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তী একটি প্রশস্ত উপদ্বীপ, উভয়ের দক্ষিণ ভাগই সাগরের দিকে যাইয়া শেষ হইয়াছে, উভয়ের শীর্ষ-দেশেই অটল অচলবর বিরাট পুরুষের ন্যায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রকৃতির অনুপম শোভা বিকাশ করিয়া দিতেছে, উভয়ের অন্তর্দ্দেশেই প্রসন্ন-সলিলা স্রোতস্বতী তরঙ্গ রঙ্গ বিস্তার করিয়া বহিয়া যাইতেছে, উভয়েই প্রকৃতি-রাজ্যের রমণীয় স্থান; শ্যামল তরুলতায়, শস্যপূর্ণ প্রশস্ত ক্ষেত্রে উভয়েই চিরশোভিত, অযত্ন-সম্ভূত সৌন্দর্য্যের গরিমায় অনা-

---

এই বক্তৃতার সারাংশ নবজীবনে প্রকাশিত হয়। মুদ্রাকরের ভ্রমে যথাস্থলে ইহা স্বীকার করা হয় নাই।

য়াস-লভ্য ফলসম্পত্তির মহিমায় উভয়েই বিভূষিত। পক্ষান্তরে ভারতের ন্যায় ইতালীও অনেকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত, বহু শতাব্দী ধরিয়া উভয় জনপদই বিদেশী আক্রমণকারীর পরাক্রমে নির্জ্জিত, নিপীড়িত ও আত্ম স্বাধীনতায় বঞ্চিত। ইতালী পূর্ব্বে অষ্ট্রিয়ার অধীন ছিল। অষ্ট্রিয়ার ন্যায় ইতালীর সৈন্যবল ছিল না, ইতালীর অধিবাসীরাও অষ্ট্রিয়ার অধিবাসীদের ন্যায় সাহস-সম্পন্ন বা রণনিপুণ ছিল না। সীজর বা আণ্টনীর সময়ের বীরত্বকীর্ত্তি, এ সময়ে ইতালী হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। যে অসাধারণ পরাক্রমে, যে বিপুল বৈভবে 'জগতের লক্ষ্মী সৌন্দর্য্যশালিনী রোম নগরী তিবরের তীরে দাঁড়াইয়া আপনার গৌরবে আপনিই হাসিয়াছিল, সে পরাক্রম ও সেই বৈভব ধীরে ধীরে অনন্ত অতীত কালের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। এ দিকে অষ্ট্রিয়া ইতালীর নিকটবর্ত্তী ছিল, সুতরাং অল্প সময়ে, অল্প আয়াসে আক্রান্ত জনপদে আপনাদের পাশব শক্তির পরিচয় দিত। ইতালী এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় থাকিয়াও আপনাকে অষ্ট্রিয়ার অধীনতা-পাশ হইতে বিমুক্ত করিয়াছে। এই অধীনতা-পাশ উচ্ছেদের একমাত্র কারণ—ইতালীর অপূর্ব্ব জাতীয় ভাব। যুদ্ধক্ষেত্রে ইতালী অনেকবার পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু কখনও আপনার জাতীয় ভাব হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। ইতালীর সাহসী সৈন্যগণ পবিত্র সমরে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে—তাহার অধিবাসীগণ বিদেশীর অত্যাচারে সুখের, সম্পদের, শান্তির আশায় অনেকবার জলাঞ্জলি দিয়াছে, ইতালীর বিপুল অর্থ অনেকবার বিলুণ্ঠিত ও দেশান্তরে নীত হইয়াছে কিন্তু ইতালী জাতীয় জীবনের গৌরব শূন্য হয় নাই। জাতীয় ভাবে সম্বদ্ধ ও জাতীয় জীবনে অনুপ্রাণিত হওয়াতে সমগ্র ইতালীতে অভূতপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার হয়, অন্যান্য ভূখণ্ড ইতালীর সহিত সমবেদনা প্রকাশ করে, বিদেশী আক্রমণকারী অবশেষে ইতালীকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়।

পক্ষান্তরে ভারতের দিকে—এই ঘোর দুর্দ্দশাময় পতিত ভূমির দিকে চাহিয়া দেখ। ইতালী যেমন অষ্ট্রিয়ার নিকটে রহিয়াছে, ভারতভূমি তেমন ইংলণ্ডের নিকটবর্ত্তী নহে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের বহু দূরে—সাগর-ভূধর-পরিবৃত বিপুলা পৃথিবীর আর এক ভাগে রহিয়াছে। ইংলণ্ডের বণিকদিগকে বিশাল সাগর অতিক্রম করিয়া, উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া, অনেক কষ্টে—অনেক দিনে ভারতবর্ষে আসিতে হইয়াছিল। তখন অন্তরীক্ষের

তড়িৎ ভূতলে আসিয়া ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের নিকটবর্ত্তী করে নাই, বাষ্প-প্রবাহ বিজ্ঞানের শক্তিতে মস্তক অবনত করিয়া ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষে আসিতে সাহায্য করে নাই, মঁসুর লেসেপ্‌সের বুদ্ধি বিস্তৃত সৈকত ভূমে জলস্রোত প্রবাহিত করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ অধিকতর সুগম করিয়া দেয় নাই। অধিকন্তু ইংলণ্ড সে সময়ে বিজয়িনী শক্তির মহিমায় গৌরবান্বিত ছিল না; ইংলণ্ডের অধিপতি সেকন্দর শাহ বা হানিবলের ন্যায় দিগ্বিজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন না, জনসংখ্যায় ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের আট গুণ পরিমিত ছিল, তথাপি ভারতবর্ষ সহজে ইংলণ্ডের বশীভূত হয়। অথচ পরাধীন ভারতবর্ষ ইতালীর ন্যায় কখনও আত্মস্বাধীনতা লাভে উন্মুখ হয় নাই, সমগ্র ভারতভূমি ইতালীর ন্যায় জাতীয় ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া ইংলণ্ডকে "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া কখনও আহ্বান করে নাই। অষ্ট্রিয়াকে ইতালীর জন্য যেরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষের জন্য সেরূপ কিছুই করিতে হয় নাই। সমগ্র ভারত যেন কোন অভাবনীয় মন্ত্রের গুণে ইংরেজ বণিকের পদানত হইয়াছে। সুতরাং সাধারণে আবার জিজ্ঞাসা করিতে পারে, ইহা কি বিস্ময়কর ঘটনা নহে? ইহাতে কি ইংরেজের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না? ইংরেজের অচিন্ত্যপূর্ব্ব মহিমায় কি ভারতবর্ষ অধিকৃত হয় নাই?

ঘটনা বিচিত্র বটে, কিন্তু এই বৈচিত্র্যের সহিত কোনরূপ অলৌকিক শক্তির সংযোগ নাই—কোনরূপ অচিন্ত্যপূর্ব্ব মহিমার সংস্রব নাই। উপরে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে প্রথমত ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, ইতালীর ন্যায় সমগ্র ভারতবর্ষে জাতীয় ভাব ছিল, দ্বিতীয়ত ইংলণ্ডের পরাক্রমে এই সার্ব্বজনীন শক্তি পর্য্যুদস্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ইংরেজ সমগ্র ভারতস্থ সমান আচার, সমান ধর্ম্ম ও সমান ভাষার একটি বিশাল জাতিকে আপনার ক্ষমতার আয়ত্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই দুইয়ের একটি কথাও প্রকৃত নহে, একটিও যথার্থ ঘটনার উপর স্থাপিত হইয়া ইংরেজের অলৌকিক দেবশক্তির সমর্থন করিতে পারে না।

আমরা ভারতে ব্রিটিশাধিকার প্রবন্ধে প্রসঙ্গ ক্রমে নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, ইংরেজের পদার্পণ সময়ে বা তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষ জাতীয় জীবনে সঞ্জীবিত ছিল না, ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক হইয়া, এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরস্পর ভ্রাতৃভাবে দণ্ডায়মান হয় নাই। এই বিষয়ের বিচার

স্থলে প্রথমেই বুঝিতে হইবে যে, জাতীয় জীবন কিরূপ এবং কিসেই বা জাতীয় ভাবের উৎপত্তি, স্থিতি বা বৃদ্ধি হয়।

জাতীয় ভাবের উৎপত্তির প্রথম কারণ, সমান জাতি ও সমান ভাষা। সমস্ত ইংলণ্ডের লোক এক ইংরেজীতেই আলাপ করিয়া থাকে। কিন্তু এ সুযোগ ভারতবর্ষে নাই। সমগ্র এসিয়ার লোক এক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, ইহা বলিলে সত্যের যেরূপ অপলাপ হয়, আর সমগ্র ভারতবর্ষের লোক এক ভাষায় আলাপ করে, ইহা বলিলেও সত্যের সেইরূপ অন্যথাচরণ করা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের এক জনপদের ভাষা আর এক জনপদের লোকে বুঝিতে পারে না—এক জনপদের সাহিত্য আর এক জনপদের লোকে আদর করিয়া পড়ে না, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন জনপদবাসীর চিন্তা, ধারণা, সমবেদনা প্রভৃতি পরস্পর পৃথক হইয়া পড়ে। ইহাতে জাতীয় ভাব বিকাশের সম্ভাবনা কোথায়? ইতালী ভারতবর্ষের ন্যায় খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত থাকিলেও এক ভাষায় আবদ্ধ ছিল। সমগ্র ইতালীর লোক পরস্পর এক ভাষায় কথোপকথন করিয়া পরস্পরের নিকট মনোগত ভাব জানাইতে পারিত। এই সাধারণ ভাষা হইতে একটি সাধারণ সাহিত্যের উৎপত্তি হয়। স্বদেশবৎসল কবির রসময়ী কবিতায়—স্বদেশ-হিতৈষী বক্তার তেজস্বিনী বক্তৃতাচ্ছটায় এই সাহিত্য অলঙ্কৃত হইতে থাকে। কবিগুরু দান্তে এক সময়ে অপূর্ব্ব দেশ ভক্তিতে বিভোর হইয়া যে গান গাইয়াছিলেন, মাৎসিনি সেই গান গাইয়াই স্বদেশীয়গণের মুহ্যমান হৃদয়ে তাড়িত বেগ সঞ্চারিত করেন। সমস্ত ভারতভূমিতে এ দৃশ্যের আবির্ভাব দেখা যায় নাই, সুতরাং কোন সময়ে সমস্ত ভারতভূমি এক জাতীয় ভাবে সম্বদ্ধ হইতে পারে নাই।

একবিধ ধর্ম্ম, একবিধ স্বার্থ ও একবিধ আচার ব্যবহার প্রভৃতিতেও জাতীয় ভাব পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতবর্ষের অদৃষ্টে ইহাও ঘটে নাই। ইহা ব্যতীত দুরারোহ পর্ব্বত, দুর্গম অরণ্য, দুস্তর তরঙ্গিণী প্রভৃতিতে ভারতবর্ষের জনপদ সকল পরস্পর পৃথক ভাবে অবস্থিত। এই প্রাকৃতিক অন্তরায়েও কোন সময়ে ভারতবর্ষের সংযোগ সাধিত হয় নাই—জাতীয় ভাবের উন্মেষ দেখা যায় নাই। সুতরাং এশিয়া, ইউরোপের ন্যায় ভারতবর্ষও একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র। ইহার সহিত সার্ব্বজনীন রাজনৈতিক ভাবের কোন সংস্রব নাই। নানাবিধ প্রাকৃতিক শক্তিতে ভারতবর্ষের অঙ্গ সকল বহুকাল হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার এক অঙ্গে আঘাত করিলে আর এক

অঙ্গ বেদনা অনুভব করে না, এক অঙ্গে তাড়িত বেগ প্রবেশিত করিলে আর এক অঙ্গের স্পন্দন ক্রিয়া লক্ষিত হয় না। এই বিচ্ছেদে—এই অনৈক্যে ভারতবর্ষ জাতীয় ভাবে বলশালী হয় নাই। যখন সাহাবুদ্দীন গোরিকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিবার জন্য পৃথ্বীরাজ দৃষদ্বতীর তীরে সমাগত হন, তখন জয়চন্দ্র তাঁহার সহিত সম্মিলিত হন নাই। ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের স্থাপন কর্ত্তা বাবরশাহ স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ান, শেষে আফগানিস্থান তাঁহার হস্তগত হয়। বাবরশাহ যখন দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণে অগ্রসর হন, তখন তিনি তাদৃশ সহায় সম্পন্ন ছিলেন না—বিশেষ রণনিপুণ যোদ্ধারাও তাঁহার সহযোগী হয় নাই, তথাপি বাবর শাহ ভারতবর্ষে একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করেন, শেষে ইহারই বংশধরের উদ্দেশে ভারতের হিন্দুগণ "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ধ্বনিতে সকলকে মাতাইয়া তুলেন।

সমগ্র ভারতবর্ষ জাতীয়ভাবে সম্বদ্ধ ছিল না, ইংরেজ কোনরূপ জাতীয় শক্তি বিনষ্ট করিয়া আপনাদের রাজত্ব স্থাপন করেন নাই। নানা কারণে ভারতবর্ষ পূর্ব্বেই বন্ধনী বিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরেজ এই বিচ্ছেদের চূড়ান্ত অবস্থায় ভারতবাসীর সাহায্যে আপনাদের অধিকার স্থাপন করেন। সুতরাং ইহাতে ইংরেজের অলৌকিক দেবশক্তি বা অচিন্ত্যপূর্ব্ব মহিমার পরিচয় পাওয়া যায় না। যদি ভারতের হিন্দুগণ দীর্ঘকাল হইতে আপনাদের স্বদেশীয়, স্বজাতীয় রাজার শাসনাধীন থাকিতেন, এই রাজকীয় শক্তির সহিত যদি তাঁহাদের জাতীয় বল বৃদ্ধি পাইত, তাহাহইলে এক দিন বলিতে পারা যাইত যে, ইংরেজ এই রাজশক্তির উপর আপনার রাজত্ব স্থাপন করিয়া জগতের সমক্ষে অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। আর যদি ভারতের সমস্ত হিন্দু আর্য্য পরস্পর সমবেদনার অধিকারী হইয়া এক বিধ চিন্তায়, এক বিধ ধারণায় একটি মহাজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেন, তাহা হইলেও একদিন বলিতে পারা যাইত, ইংরেজ এই চিরপ্রসিদ্ধ মহাজাতিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া দেবশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাসে এই দুইয়ের একটিরও চিহ্ন পাওয়া যায় না। ইংরেজের পদার্পণ সময়ে ভারতবর্ষ এমন কতকগুলি লোকের আবাস ক্ষেত্র ছিল যে, তাহাদের মধ্যে সমবেদনা ছিল না, রাজনৈতিক একতা ছিল না, একের ধারণা অন্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না, একের চিন্তায় অপরে চিন্তাশীল হইত না, একের স্বার্থ অপরের স্বার্থের সহিত মিশিয়া

যাইত না. একের অভাবে অপরে অভাব বোধ করিত না। ইংরেজ পরের সাহায্যে এই বিচ্ছিন্ন, বিরক্ত লোকদিগকে আপনাদের অধীন করিয়াছেন। ভারতে ইংরেজ-রাজত্ব লোকাতীত দেবশক্তির বলে স্থাপিত হয় নাই। ইতিহাসের চক্ষে ইহা অসাধারণ বিস্ময়কর ঘটনাও নহে। অনিবার্য্য প্রাকৃতিক শক্তি—অপরিহার্য্য আচার ব্যবহারের বৈষম্য ও ধর্ম্মসংঘর্ষ সহায় না হইলে বোধ হয়, ভারতের হিন্দু আর্য্যদিগকে কেহ কখনও পরাজিত করিতে পারিত না। ধর্ম্ম বিপ্লবে ভারতের কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আমরা ভারতে ব্রিটিশাধিকার প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। এই ধর্ম্মের সহিত এখন ভারতের জাতীয় বন্ধনের কিরূপ সংশ্রব আছে, পরে তাহার আলোচনা করিব।

মানুষ কি স্বাধীন?

আমি কে, তুমি কে, আত্ম কি, পর কি, আর এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় জগতই বা কি—যখন এই সকল কথাই জানা নাই, তখন কেমন করিয়া বলিব মানুষ কি? মানুষ স্বাধীন না পরাধীন? যিনি আপনার কাছে আপনি পরিচিত অর্থাৎ যাঁহার আত্ম পরিচয় হইয়াছে, তিনিই বলিতে পারেন মানুষ কি, আর এই কর্ম্মকাণ্ডের প্রসর ক্ষেত্র বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডই বা কি। ঐ যে প্রাতঃ সূর্য্য উদিত হইয়া স্বর্ণময় কিরণ প্রভায় আকাশের সেই সুদূর প্রান্ত হইতে এই সীমাহীন পরিধিহীন অনন্ত বিশ্ব আলোকিত করিলেন—জীবের চক্ষু হইতে ঘুমের নেশা ছুটিল, আলস্যের আবেশ ভাঙিল, চৈতন্যের সঞ্চারে ইন্দ্রিয় সকল জাগিয়া উঠিল, নিশ্চেষ্ট জড় জগৎ সিংহবিক্রমে হুঙ্কার ছাড়িয়া গা ঝাড়া দিল এ সব কি? মানব! তুমি কি জান, এ সব কি? তামসী নিশার গাঢ় অন্ধকারে কাহার মোহিনীমন্ত্রে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কর্ম্মক্ষেত্র হইয়াও নিষ্ক্রিয় হইয়াছিল? আবার মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রে কে এই সংজ্ঞাহীন স্থাবর জঙ্গমাত্মক অনন্ত বিশ্বের চৈতন্য সম্পাদন করিল? তুমি বলিবে, এ সব চিরকালই এক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে, এ নিয়মের কখন ব্যভিচার হয় না, কখনও ব্যত্যয় হয় না। বেশ কথা; এখন জিজ্ঞাস্য এই, তুমিও ঐ নিয়ম পরিধির মধ্যে, না বাহিরে? যদি বল উহার মধ্যে, তবে ত

এই থানেই আমার প্রশ্নের সমাধান হইতেছে। কিন্তু যদি বল, তুমিও নিয়মের বাহিরে, তাহা হইলে প্রস্তুত হও, তোমার নিকট আমার দুচারিটা সংশয় মিটাইয়া লইতে হইবে।

মানিয়া লইলাম, তুমি কখনও কোন নিয়মে আবদ্ধ নও, কাহারও আজ্ঞাকারী নও—তুমি দুনিয়ার কায়দার বাহির। স্বীকার করিলাম, তুমি যাহা ভাব, তুমি যাহা কর, সে সবই তোমার নিজস্ব, তোমার তুমিত্বময়, তোমার অহঙ্কার পূর্ণ। স্বীকার করিলাম;—বিদ্যুৎ তোমার দূতী, স্বয়ং বৈশ্বানর তোমার সারথী, তুমি অমানুষী শক্তির আধার, তুমি জগতের নেতা, তুমি জগতের শিক্ষাদাতা, তুমি জগতের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। তুমি দেখিতেছ, একটি ক্ষুদ্রপ্রাণ পিপীলিকা তোমা অপেক্ষা কত নিকৃষ্ট, তাহার জীবন তোমার কাছে অতি অকিঞ্চিৎকর। সে অসংখ্য বন্ধনে তোমার নিকট আবদ্ধ, সে তোমার অধীন। তাহার অণুপ্রমাণ শরীর যে যে উপাদানে বিনির্ম্মিত, তোমার বিশাল বপুর উপাদান সমষ্টি তাহা অপেক্ষা কত মহত্তর! কিন্তু ইহাত নিশ্চয়, যে তুমি আমি, ঐ পিপীলিকা আর সেই সম্রাট্—কি সজীব, কি নির্জ্জীব, কি স্থাবর, কি জঙ্গম—সকলই কালে জড়ের শরীরে বিলীন হইয়া জড় জগতের কলেবর বৃদ্ধি করিবে। মনুষ্য কোথা হইতে কি প্রকারে এই দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে ভাবিতে গেলে, আমরা বুঝিতে পারি যে, তাহার জন্ম হইবার পূর্ব্বে তাহার অবস্থান পিতা মাতার রক্তে। সেই রক্ত আবার অন্ন, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি আহার্য্য বস্তু হইতে পিতামাতা গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেই দুগ্ধাদি উদ্ভিদ্ হইতে এবং সেই উদ্ভিদ্ আবার মৃত্তিকা জল প্রভৃতি পঞ্চভূত হইতে সমুৎপন্ন। অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বে যে পঞ্চভূতের অঙ্গীভূত, সৃষ্টির পর যে পিতামাতার অধীন, স্থিতিকালে যে ইন্দ্রিয়ের বশ, এবং বিলয়কালে যে আবার সেই পঞ্চভূতের শক্তির অধীন, তাহার আবার স্বাধীনতা কোথায়? তাহার আবার স্বাতন্ত্র্য কোথায়? একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, আহারে কি বিহারে, শয়নে কি স্বপনে, নিদ্রায় কি জাগরণে কোথাও মানবের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নাই। যদি বাহ্য জগৎ না থাকিত, তবে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই নিষ্ক্রিয় হইত; কারণ, যে যে বিশেষ বিশেষ উপাদানে বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয় গঠিত, সেই সেই উপাদান উপযোগী প্রতি বস্তু যদি বাহ্য জগতে দুর্ল্লভ হইত, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা কিরূপে সম্ভবিতে পারিত? যখন বুঝিতেছি চক্ষুদ্বারা নাসিকার বা

নাসিকা দ্বারা চক্ষুর কাজ চলে না, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, উহাদের উপাদান স্বতন্ত্র। ঐ উপাদান আবার অন্যান্য কত কত পরমাণুর সংযোগ বিয়োগে বিনির্ম্মিত। তবেই দেখা যাইতেছে যে, মানুষ আদৌ একাদশটি ইন্দ্রিয়ের অধীন এবং সেই একাদশটি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটিই আবার বহিস্থ জগতের অধীন, বহিস্থ জগতের প্রত্যেক বস্তুই আবার কত শত সম ও বিষম ধর্ম্মাক্রান্ত পরমাণুর পরস্পর সমবায়ে সংঘটিত। এখন কেমন করিয়া মানুষকে স্বাধীন বলিব ?

মানুষের ব্যক্তিগত জীবন যেরূপ পরাধীন, মনুষ্যজীবন পরম্পরা, সম্বন্ধেও সেই রূপ। প্রথিত আছে যে, গোয়ালার বুদ্ধি গোরুর মতই হইয়া থাকে। এটা কিন্তু হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নয়—সংসর্গজা দোষা গুণা ভবন্তি—সঙ্গদোষে শতগুণ নাশে। আবার সৎসঙ্গে সহবাস করিলে এবং সদালাপে রত থাকিলে নিতান্ত পাষণ্ডও সাধু হইতে পারে; লৌহ স্পর্শমণির স্পর্শে স্বর্ণত্ব এবং চুম্বকের ঘর্ষণে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে—

কীটোঽপি সুমনঃ সঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ।
তথা সৎসন্নিধানেন মূর্খো যাতি প্রবীণতাম্॥

পুষ্প সংসর্গে অস্পৃশ্য কীটও দেবতার মস্তক আশ্রয় করিতে পারে এবং সতের সংসর্গে মূর্খও প্রবীণ হইতে পারে। যখন দেখিতেছি যে, অচৈতন্য অন্ধ জড়ের সংযোগে বিয়োগে, ঘর্ষণ আকর্ষণে জড়ও রূপান্তরিত হইতেছে, স্থানচ্যুত হইতেছে, তখন চক্ষুষ্মান্ মনুষ্য কি এই বৈচিত্র্যময় জগতের মায়া কাটাইতে পারিবে ? প্রলোভন এড়াইতে পারিবে ? এ কথা ত কখনই মনে হয় না। যে স্বভাবতই বাহ্য জগতের ক্রীড়নক, সে কেমন করিয়া আপনার স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারিবে ? যে কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের মত দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতেছে, তাহার পথ কবে ফুরাইবে জানি না; যে স্রোতের কুটার মত ভাসিতেছে, সে তীর পাইবে কি না বলিতে পারি না; যে বায়ু বিগুণে বিতাড়িত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছে, তাহার শান্তি কত দূরে বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু এতটুকু বলিতে পারি, যে তিনি স্বাধীন নন।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥২৭॥ ৩য়, অ, ভগবদ্গীতা।

—সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই প্রকৃতির গুণে সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু অহঙ্কার-বিমূঢ় ব্যক্তি আপনাকেই ঐ সকল কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে।

যদি স্বাধীন হইতে চাও, তবে অগ্রে অধীনতা স্বীকার কর; যদি স্বাধীনতার মুক্তিপদ পাইতে অভিলাষী হও, তবে প্রেম ভক্তির অধীনতা-শৃঙ্খলে আপনাকে বাঁধা দাও। যে কখন দুঃখের মর্ম্ম জানে নাই, সে কি করিয়া বুঝিবে সুখ কত মধুর? যে কখনও ছাত্র হইয়া পাঠ লয় নাই, সে কেমন করিয়া শিক্ষক হইয়া পাঠ দিবে?

সকলের ভাগ্যে সব সুখ ঘটে না, সকলের শক্তি সমান হইতে পারে না। যদি সকলের শক্তি সমান হইত, সকলের ভাগ্যে সব সুখ জুটিত, তাহা হইলে সংসারের বৈচিত্র্য থাকিত না; ঈশ্বরের ইচ্ছাময় নামে কলঙ্ক হইত, ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থাকিত। শক্তি বৈষম্যই জগতের বৈচিত্র্যের কারণ। এ সংসারে কেহ সেব্য, কেহ সেবক; কেহ রাজা, কেহ প্রজা; কেহ সুন্দর, কেহ কুৎসিৎ; কেহ প্রবল, কেহ দুর্ব্বল; কেহ ভক্ষ্য, কেহ ভোক্তা; কেহ শিষ্য কেহ উপদেষ্টা। সকলেই যদি এক অধিকার পাইবার জন্য লালায়িত হইত, তাহা হইলে সংসার সুখের না হইয়া নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের কারণ হইত, আনন্দের বাজার না হইয়া বিভীষিকার রঙ্গভূমি হইত। অধীনতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই বলিয়া য়ুরোপে দিন দিন কি আসুরিক কার্য্যের অভিনয় হইতেছে! সাম্য ও স্বাধীনতা য়ুরোপের শিরায় শিরায় আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে—এ আগুন রুষিয়ার সিংহাসন টলাইয়াছে, এ আগুন ফ্রান্সে অনেক দিন হইতে লাগিয়াছে। তাই বলিতেছি, যদি শান্তির মধুরতা অনুভব করিতে চাও, তবে স্বাধীনতার ফরফরে পতাকা গুটাইয়া রাখ, অধীনতার কোমল শৃঙ্খলে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া দাও।

ভক্তি, স্নেহ, দয়া, মমতা প্রভৃতিই সংসারের বন্ধন, ঐগুলিই অধীনতার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল। ঐ যে দুগ্ধপোষ্য শিশুটি জননীর ক্রোড়ে বসিয়া স্তন্য পান করিতেছে, আর জননী তাহাকে কত মতে সোহাগ করিতেছেন, এ দুয়ের মধ্যে অধীন কে? তুমি অবশ্যই বলিবে, শিশুটিই অধীন। কারণ, এখন ইচ্ছামত কোন কাজই করিবার শিশুর ক্ষমতা নাই—তাহাকে খাওয়াইয়া দিলে যে খাইতে পারিবে, তাহাকে শোয়াইয়া দিলে যে ঘুমাইতে পারিবে—সে এখন সম্যক্ প্রকারে মাতার অধীন। মানিলাম, শিশুটিই অধীন। কিন্তু উহার জননী কি?—তিনি কি স্বাধীন? আমি ত স্বচক্ষে দেখিলাম, জননী এতক্ষণ গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, শয্যাশায়ী শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি শুনিবামাত্র যূথবিরহিত কুররীর ন্যায় আকুল প্রাণে ঊর্দ্ধশ্বাসে শিশুর পার্শ্বে উপস্থিত

হইলেন। তাহার ভাসা ভাসা চক্ষু ছল ছল করিতে দেখিয়া জননীর স্নেহ পারাবার উথলিয়া উঠিল—চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ার আসিল, সমুদ্র উদ্বেল হইল, জোয়ারের জলে মাঠ ছাপাইয়া গেল—জননী কাঁদিয়া ফেলিলেন। সে কান্নায় মর্ম্মপীড়ার লেশ নাই, বিষাদের কালিমা নাই, যাতনার তীব্র কশাঘাত নাই—সে কান্না হাসিমাখা, সে কান্না স্নেহের সঙ্গে মাখা চোখা। এখন বল দেখি, জননীকে স্বাধীন বলিব কি মাতৃস্নেহের অনিবার্য্য আকর্ষণের অধীন বলিব? তিনি ত বাৎসল্যের আহ্বান এড়াইতে পারিলেন না, স্বাধীনভাবে নির্লিপ্ত থাকিতে পারিলেন না; স্নেহের দারুণ তুফানে তিনি ত স্থির থাকিতে পারিলেন না।

আর একটা কথা বলি। ঐ দেখ বসন্তের সমাগমে বনস্থলী কেমন অপূর্ব্ব শোভায় অলঙ্কৃত হইয়াছে। নব পল্লবিত তরুশাখে বসিয়া কোকিল, ময়না, শ্যামা, চন্দনা প্রভৃতি গায়ক পক্ষী সকল কত রাগে স্বর আলাপ করিতেছে—পাখীর কূজনে, ভ্রমরের গুঞ্জনে বন আজ আকুল করিয়া তুলিয়াছে। বসন্তের বাতাস পুষ্প সৌরভ ছড়াইতে ছড়াইতে দিগ্‌দিগন্তে সঞ্চরণ করিতেছে। এ সময়ে উনি ওখানে ওরূপ ভাবে ভ্রমণ করিতেছেন কে? উঁহার প্রশস্ত ললাটে ও ভাবব্যঞ্জক রেখা কিসের? ঐ প্রশান্ত গম্ভীর মুখমণ্ডলে কখন হাসির রেখাপাত হইতেছে, কখনও বা বিস্ময়ের বিদ্যুৎময়ী আভা প্রকাশিত হইতেছে। উনি কখন পাগলের মত প্রলাপ বকিতেছেন, কখন হাসিতেছেন, কখন কাঁদিতেছেন, কখনও বা কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর হইয়া যেন আত্মহারা হইতেছেন। উনি কবি; বেশ কথা। উনি কি স্বাধীন? না। উনি কোমল শাসনের অধীন বলিয়াই সুখী। কঠোর শাসনে কি কখন মনে শান্তি হয়? না, সুখের মদিরাময় আবেশে মন বিবশ হয়। শাসনের ও মূর্ত্তি ত নিগ্রহের জন্য নয়! ও শাসনে রক্তিম কটাক্ষপাত নাই, পীড়নাভিলাষের লেশ নাই—শাসন অধৃষ্য হইয়াও এখানে অভিগম্য, শাস্তা হইয়াও এখানে বান্ধবের অগ্রগণ্য। শাসনের সেই আকর্ষণী শক্তি কর্ত্তৃক অনুশাসিত হইয়া কবির মন আজ গাছের পাতায়, ফুলের লতায়, কোকিলের স্বরে, ভ্রমরের ঝঙ্কারে, আত্মহারা হইয়া আপনাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। প্রকৃতি আজ কবির মন ভুলাইয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে। কবি তাহার অন্বেষণে কখন নিবিড় বনে, কখন কুসুম কাননে প্রবেশ করিতেছেন, কখনও বা পাতালের আঁধার উলট্ পালট্,

করিতেছেন—তাই কবি দিশাহারা, তাই কবি উন্মত্ত, পরাধীনের পরাধীন। যে এইরূপ পরাধীনের পরাধীন সেই সম্পূর্ণ স্বাধীন। স্বাধীনতা যত্নের ধন অমূল্য রতন। স্বাধীনতা পথে ঘাটে কুড়াইয়া পাওয়া যায় না, হাটে বাজারে কিনিতে মিলে না—তাই উহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না, তাই উহা এত মহার্ঘ, এত দুষ্প্রাপ্য। যাহা ভোগীর কাম্য, যোগীর ধ্যেয়, দর্শনের দৃষ্টি, বিজ্ঞানের উপপত্তি, সে স্বাধীনতা পাইবার জন্য আত্মবিসর্জ্জন চাই, যুগ যুগান্তর ব্যাপী সাধনার অনুষ্ঠান করা চাই। যে আপনাকে ভুলিয়া পরের অধীন, সেই প্রকৃত স্বাধীন। আর যে আপনাকে আপনি স্বাধীন বলিয়া মনে করে, সে অহঙ্কারের অধীন, অধীনের অধীন।

বদ্ রসিক।

বেতালা, বেসুরো বদ্ রসিকের দল দিন দিন বড় বাড়িতেছে, আমাদের আর ভদ্রস্থতা নাই। সে কালের মত সদানন্দ লোক আর প্রায়ই দেখা যায় না; সেই চোখ-ভরা চাহনি, গাল-ভরা হাসি, প্রাণ-ভরা খুসি, তেমন মজ্‌লিস্‌-ভরা লোক, কৈ আর ত প্রায়ই দেখিতে পাই না। এখন দেখিতে পাই কেবল কতকগুলা, হিংসে-ভরা, রগ্‌চেপা, ক্রূরকটাক্ষ, বিষদিগ্ধ, বেতালা, বেসুরো, বদ্ রসিক।

হচ্চে হেম বাবুর কবিতার কথা—সেই বিষয়ে ভাল মন্দ যাহা ইচ্ছা হয় বল, বড় রসিক বলিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন হয়,—

'বঙ্গের বিধবা বিনা মধু কোথা কুসুমে'—

ইত্যাদি আওড়াইয়া দুটা রঙ্গ রসের ব্যঙ্গ কর, না হয়, বল হেম বাবু—

বাঙ্গালির পিণ্ডার, রসের ভাণ্ডার, কবিকুল গণ্ডার—তা নয়, মাঝে হইতে তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, এবার দুর্ভিক্ষে বর্দ্ধমান জেলায় কয়জন লোক মরিল? লও একেবারে 'ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্বচাল্পবিষয়া মতিঃ, কোথায় হেমবাবুর কবিতা, আর কোথায় বর্দ্ধমানের দুর্ভিক্ষ। একেবারে ময়রাণী হইতে বড়াল গিন্নী। এমন বেতালা বদ্ রসিক এখন অলিতে গলিতে। এদের জ্বালায় কোথাও আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার যো নাই।

কতকগুলা, আছে, তাহাদের আবার আপন কথাই পাঁচ কাহন। যে

সকল গল্প তিন পুরুষ শুনিয়া আসিতেছি, সেই গুলা থাম্‌কা বলিতে থাকিবে, তাই যদি গুছাইয়া বলিতে পারে, তাহা হইলে আপত্তি কি ? তা কৈ ? চিবাইয়া চিবাইয়া বলিবে, আগা গোড়া উলট্‌ পালট্‌ করিবে, আর যেখানটা গল্পের জান্‌, সেই খানটাই ভুলিয়া যাইবে। বদ্‌ রসিকের গল্প এইরূপ; "কৃষ্ণনগরের রাজার বাড়ীতে, জান, অনেক দিনের কথা—জান, গোপাল ভাট নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিল। তাহার দুই স্ত্রী ছিল; তা জান, তার ছোট স্ত্রী বড় সুন্দরী। গোপাল ভাট বড় উপস্থিত বাগ্মী ছিল। তা জান, রাজা এক দিন সেই ছোট স্ত্রীর কথা মনে করিয়া বলিলেন ভাট জি "তোমাদের ওখানে না কি বৌ বিক্রী হয় ?"—ভাটের উপস্থিত কবিতা, ভাট বলিল, "তা হয় বৈ কি।"* এই ত গল্পের শ্রী, তাহার উপর তৎক্ষণাৎ এক খানা ভয়ানক হাসির ঘটা। স্থূল জিহ্বা উল্‌টাইয়া তালুর কাছে লইয়া গিয়া, বদন ব্যাদান করে, বটব্যালের মত একটা বিকটাকার হাসি। হাসির সেই ব্যালোল তরঙ্গে তখন সেই রস-ঘাতুকের উপর ঘৃণা ভাসিয়া যায়; বাতুলের বিকৃতিতে আমাদের পশু প্রকৃতি যেমন মধ্যে মধ্যে হাসিয়া উঠে, সম্মুখের সেই বিকৃতি দেখিয়াও তখন আমরা সেইরূপ হাসি হাসিয়া উঠি। বদ্‌ রসিক মনে করে, বড় রসিকতাই বুঝি হইয়াছে।

বদ্‌ রসিকের গল্পও যেমন, গানও তেমনই। বিবাহ বাসরে গান করিবে,—

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর;
অন্যে কথা কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।

বাইজির সামনে গিয়া, তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিবে,—

"মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারই।"

শ্যামা পূজার রাত্রিতে হোরির গান গাইবে;—

শ্যাম মতে মার পিচিকারী হো,
ভিজি গেই মেরি নীল সারী হো।

---

* গল্পটি শাস্ত্রোক্ত মত এইরূপ;—

উলার মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায়কে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বৈবাহিক বলিতেন; বৈবাহিক সম্পর্কে তাঁহার সহিত রসাভাষ করিতেন। উলা ব্রাহ্মণ কুলীন মণ্ডলীর স্থান। কুলীনগণের কলঙ্ক চিরপ্রসিদ্ধ। কুলীন কন্যাগণের কলঙ্ক কথায় কটাক্ষ করিয়া রাজা মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেন, "মুখুয্যে তোমাদের উলায় নাকি বৌ বিক্রী হয় ?" মুখুয্যে অমনই ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ। যখনই নিয়ে যাবেন।"

আর ঝুলনের রাত্রিতে গাইবে ;—

নীল বরণী নবীনা রমণী,
নাগিনী জড়িত জটা বিভূষণী॥—

বদ্ রসিকের কাছে, সুরের তাল নাই, লয় নাই। রাগের কাল নাই, অকাল নাই। এই সকল মহাপ্রভুদের গুণেই চৌতালে মালকোশের টপ্পা নাই? এবং ঠুংরিতে কালাংড়ার ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়।

বদ্ রসিকদের গন্ধজ্ঞানও চমৎকার। টাকায় চৌষট্টি পয়সা, সুতরাং টাকার জিনিস সুগন্ধ; আর পয়সার জিনিস দুর্গন্ধ বলিয়া বদ্ রসিকদের ধারণা আছে। আমাদের বোধ হয়, বদ্ রসিকদের বিস্তার হওয়াতেই বড় বাজারে বাদামের বরফি বিক্রয় হইয়া থাকে। ওরূপ দুর্গ দ্রব্য বোধ হয় দুনিয়ায় আর নাই, বাদামের বরফি বড় মানুষের বৈঠকখানায় রূপার সালবোটের উপর হইতে সচ্ছন্দে বুক ফুলাইয়া বলিতে পারে,—

কি ছার পোকার গন্ধ ছারপোকা গায়ে?

অথচ সকল দিকেই রসজ্ঞতার অভাবে এইরূপ কদর্য্য পদার্থের ক্রমেই প্রাদুর্ভাব হইতেছে। খরতর জাফরাণের জ্বালায়, কৃষ্ণনগরের সরপূরিয়া মুখে আনা যায় না; পোলাওয়ে মাজেণ্টা দেখিলে গা ঘিন্ ঘিন্ করে, আর খাদ্য দ্রব্য মধ্যে গন্ধ দ্রব্য কস্তুরির বিস্তার দেখিয়া হতাশ হইতে হয়।

যখন তুমি দারুণ যম-যন্ত্রণায়, কাতর পরমাত্মীয়ের বিয়োগে ব্যাকুল, বেতালা তাল কাণা সেই সময়ে আসিয়া তোমার কাছে, তাহার পুত্রের অন্নপ্রাশনের আড়ম্বর বৃদ্ধি করিবার অভিলাষে ঋণ যাচ্ঞা করিবে, আর তুমি যদি তোমার পিতৃশ্রাদ্ধের সময় তাহার সামিয়ানাটি আনিয়া থাক, তবে সে আঁশ-পান্নার দিন, রাত্রি দুপুরের সময় তোমার উঠান হইতে সেইটি খুলিয়া লইতে আসিবে।

ইহাদের সহিত পথ চলা, গাড়ি চড়া, নৌকা ভাসান বড়ই বিড়ম্বনা। পথ চলিতে হইলে দশ পা গিয়াই পথ হাঁটার কষ্ট ব্যাখ্যা করিতে থাকিবে। ধুলা বড়,—আবুড় খাবুড়,—টক্কর লাগে, রোডশেষের টাকা গুলা যায়, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সম্বন্ধীর উদরে—রাস্তার ধারে ভাগাড় কেন?—এই রূপ ঘেনঘেনানি সমস্ত পথটা। শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রের উপর পবন-গমনে যে সবুজ সাগরের উপর ঢেউ খেলাইতেছে, চক্ষু বুলাইয়া তাহা কখন দেখিবে না,—দেখাইলেও বুঝিবে না; পথের পাশে কুল গাছের উপর আলগোছ

লতা সোণার ছাতার মত রহিয়াছে,—সেওড়া গাছটিকে লতা পাতায় ঘেরিয়া সবুজ গোঁয়ারার মত করিয়া তুলিয়াছে, উহার উপরে ছ-পাপ্‌ড়ি শাদাফুল গুলি পুট পুট করিয়া ফুটিয়া রহিয়াছে,—কুল কুল করিয়া মাঠের জল আসিয়া খালে পড়িতেছে,—তাল পুকুরের ঘাটে বসিয়া পল্লীগ্রামের রূপসীরা, একই কার্য্যে,—অঙ্গ সংস্কার, হরিদ্রার শ্রাদ্ধ এবং অশ্লীলতা নিবারিণী সভার পিণ্ডান্ত পিণ্ডশেষ করিতেছে,—যে কেবল পথের কষ্ট ভাবে, সে কি এ সকল ভালমন্দ কিছু দেখিতে পায়? নৌকাতে ইহাদের কষ্ট ততোধিক; আর সঙ্গীদের ত কষ্টের সীমা নাই; শুশুক ভাসিলেই—হাঙ্গর; মেঘ ডাকিলেই—সাইক্লোন; আর নৌকা নড়িলেই—মহাপ্রলয়। কাহাকেও একটু থু থু ফেলিবার জন্য নড়িতে দিবে না,—নৌকা বান্‌চাল হইবে। জোরে হাসিতে দিবে না,—নৌকা বসিয়া যাইবে।

রসহীন ব্যক্তিগণের সকল কার্য্যেই এইরূপ; যার রস বোধ নাই, তাহার সাহস নাই, স্থৈর্য্য নাই, প্রফুল্লতা নাই, কিছুই নাই। ইহাদের সহিত বাস করা অপেক্ষা বিরাগী হইয়া বনে যাওয়া ভাল; ইহাদের সহিত পথ চলা অপেক্ষা, আলিপুর জেলের কয়েদী হওয়া ভাল।

গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং,—আবার রসিকতা ব্যবসায়ী বদ্ রসিক আছেন; ইহারা কখন কথক, কখন লেখক, আর কখন বা সমালোচক।

ইহাদের কথার নমুনা কতক কতক দেওয়া গিয়াছে; তুলনা ইহাদের বড় অদ্ভুত। কবে তাঁহার পিত্তজ্বর হইয়াছিল, এক বাটি পিত্ত বমন করিয়াছিলেন, তাই যেখানে যখন ভোজের নিমন্ত্রণে যাইবেন, সেই খানেই সেই পিত্তের সহিত তুলনা করিয়া মাছের ঝোলের ব্যাখ্যান করিবেন। আর 'শীতল যেমন আগুন,' 'মিষ্ট যেমন নিম্ বেগুণ,' এ সকল বাঁধি বদ্‌রসিকতা ত চিরদিনই সমান কাচান আছে।

রস-বোধ রহিত গুণধামগণ যখন লিখিতে বসেন, তখন খোঁজেন কেবল নূতন পন্থা। সকলেই কামিনীদিগের কোকিল-কণ্ঠের সুখ্যাতি করিয়াছেন, ইনি কাজেই প্রেয়সীর পাপীয়া-কণ্ঠ বড়ই পিয়ার করেন। কমলাকান্ত বলিয়াছেন, মনুষ্য গাছের ফলের মত নানারূপ হইয়া থাকে; এই সকল লেখকেরা উদ্ভাবনী শক্তিদ্বারা নূতন কথার আবিষ্কার করিয়া আস্ফালন করেন; বলেন, মনুষ্য গাছের পাতার মত, তাহাতে শির আছে, ডাঁটা আছে, কখন হল্‌দে, কখন কাল, কখন শাদা। 'জোনাকি-ব্রজ,' এবং 'অচের সৈন্য' ইহাদেরই

ভাষা; আর মনুসংহিতা দগ্ধ করিয়া সেই ভস্মে আপন গালে চূণ কালি মাখা —ইঁহাদের রসিক ভাবের জ্বলন্ত পরিচয়।

সমালোচক ভাবেই বদ্ রসিকের পূর্ণাবতার। এই বেশে তাঁহাদের বদ্ সুর, বেতাল, ভগ্ন-কণ্ঠ, বিকৃত মুখভঙ্গি, সকলই পূর্ণ মাত্রায় সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। ঘৃণা! ঘৃণা! বলিয়া এই শ্রেণীর সমালোচকগণ আপনাদের রসজ্ঞতার পরিচয় দেন। লেখক যাহা বলেন নাই, ভাবেন নাই, সমালোচক তাহাতে তাহা আরোপ করেন, তাহার পর পেশাদারি রসিকতার সুরে লেখেন;—"এ হেন লেখক যখন এ হেন কথা বলিতে পারেন, তখন এ ঘৃণা কোথায় রাখিব?" সুরসিকের উত্তর দিবার ইচ্ছা থাকিলে অবশ্য বলিতে পারেন, "সকলে যখন এ ঘৃণা তোমাতেই ন্যস্ত করিয়াছে, তখন তুমি বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া, এখানে সেখানে রাখিয়া, গচ্ছিত ধন নষ্ট করিবে কেন? ঘৃণা যেখানে দশ জনে রাখিয়াছে, সেই খানেই থাকুক।" ইঁহাদের মুখে যেমন ঘৃণা! ঘৃণা! পেটেও তেমনই ঈর্ষা আর হিংসা। এঁরাই এখনকার দিনে মজ্‌লিসি লোক হইয়াছেন; প্রথমেই বলিয়াছি, এখন এই সকল রগ্‌চেপা, হিংসে-ভরা, কোটর-চক্ষু, বিষদিগ্ধ লোকের ক্রমেই প্রাদুর্ভাব হইতেছে। ইঁহারা সকল কথাতেই একটু ঘৃণা মিশ্রিত দন্তের হাসি হাসিয়া বলেন হ'ল কি? আমরা বলি হ'বে আর কি? অরসিকে রহস্য নিবেদনম্।

বড় গল্প নয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গোবর্দ্ধন মোদকের পুত্র নিধিরাম মোদক। নিধিরাম,—গোবর্দ্ধন ও তদীয় সহধর্ম্মিণীর একমাত্র সন্তান সুতরাং আজন্ম যৎপরোনাস্তি সমাদরে লালিত পালিত। একখানি সন্দেশ মিঠায়ের গোবর্দ্ধনের দোকান ছিল, তাহাতেই তাহার ও তাহার স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ চলিত। নিজে চিরকাল কষ্ট পাইয়াছে তাহাতে গোবর্দ্ধনের দুঃখ নাই, কিন্তু প্রাণাধিক পুত্র যে কষ্ট পাইবে ইহা তাহার সহ্য হইবে না, এজন্য আপনার যৎসামান্য উপার্জ্জন হইতে কিঞ্চিৎ

কিঞ্চিৎ নিধিরামের শিক্ষার ব্যয়ের জন্য বাঁচাইয়া রাখিত। বড় হইলে নিধিরামকে ইস্কুলে ইংরাজি শিখাইবে, ইহাই গোবর্দ্ধনের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইস্কুলে দিলেই যে নিধিরাম অচিরে বিদ্বান হইবে, মোদক দম্পতী তাহার প্রচুর প্রমাণ পাইয়াছে। নিধিরাম যখন ৯।১০ মাস বয়সে "উঁ", "অাঁ, ইত্যাদি রব করিতে শিখিল, তখন নিধিরামের মাতা পুত্রকে লইয়া গোবর্দ্ধনের ক্রোড়ে দিয়া কহিল "ঐ শোন, তোমাকে ডাক্‌ছে।" নিধিরাম হামাগুড়ি দিয়া খেলনা ধরিতে শিখিলে, নিধিরামের মাতা কহিল "দেখেছ, ছেলের কেমন বুদ্ধি হয়েছে ?" পরে নিধিরাম যত বড় হইতে লাগিল ততই অধিকতর বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। মোদক দম্পতীর প্রথমত আহ্লাদ, পরে ভয় উপস্থিত হইল। পাছে অতিশয় বুদ্ধির প্রকোপে নিধিরাম অল্প বয়সে কালগ্রাসে পতিত হয়। যখন নিধিরাম পঞ্চম বর্ষ প্রাপ্ত হইল, তখন যথা-বিহিত বিধানে পাঠশালায় তাহার হাতে খড়ি দেওয়া হইল। ছ মাস ছ মাস যায়, নিধিরাম ক খ শিখিতে পারে না। ইহাতে গোবর্দ্ধন ভীত না হইয়া আহ্লাদিত হইল। বুঝিতে পারিল যে, নিধিরামের মৃত্যুর আশঙ্কা অন্তত কত-কটা অমূলক। কিন্তু যখন নিধিরাম ৩।৪ বৎসর পাঠশালায় কাটাইল অথচ নিজের নাম বানান করিতে শিখিল না, তখন গুরুমহাশয়ের আশঙ্কা হইল —পাছে নিধিরাম অমর হইয়া পড়ে ও অনন্তকাল অন্নকষ্ট পায়। যদি অধিক বুদ্ধি হইলে অল্প বয়সে মরা সঙ্গত হয়, তবে বুদ্ধি না থাকিলে যে অমর হইবে ইহাতে অসঙ্গত কি ? যাহা হউক এ আশঙ্কাও আর দুই এক বৎসরের মধ্যে দূর হইয়া গেল। নিজের নাম দূরে থাক, নিধিরাম তাহার বাপের নাম পর্য্যন্ত বানান করিতে শিখিল। গোবর্দ্ধনের বিদ্যার দৌড়ও ঐ পর্য্যন্ত— অর্থাৎ নাম লেখা, ও কে ক পয়সার মিঠাই ধার লইল, তাহার অঙ্ক ফেলা। ইহার ওধারে যে আর বাঙ্গলা বিদ্যা আছে, তাহা গোবর্দ্ধনের ধারণা নাই, আর যদিও এরূপ অসম্ভব ব্যাপার থাকে, তাহাতে গোবর্দ্ধনের প্রয়োজন নাই, সুতরাং নিধিরামেরও তাহাতে দরকার নাই। এইরূপ তর্ক স্থির করিয়া ও সহধর্ম্মিণীর মত লইয়া গোবর্দ্ধন নিধিরামকে ভবানীপুরের পাদরী সাহেবদের ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিল।

পাঠশালায় যেরূপ নিধিরামের বুদ্ধি ঘুরিত, ইস্কুলেও সেইরূপ ঘুরিতে লাগিল। যে শ্রেণীতে যায়, সেই শ্রেণীতেই ঘোরে, কখন দ্বারের বাহিরে যায় না সুতরাং নিধিরামও সেই শ্রেণীতে থাকে। এইরূপ দু তিন বৎসর

এক এক শ্রেণীতে থাকিয়া নিধিরাম চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিল। নিধিরামের সমপাঠীরা কিন্তু এক্ষণে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া জলপানি পাইতেছে। নিধিরাম যখন পাঠশালায় ছিল, তখন গোবর্দ্ধন মাঝে মাঝে তাহাকে দু একটা লেখা পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু ইস্কুলে যাওয়া অবধি নিধিরাম সে উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে, নিধিরাম আর গোবর্দ্ধনের বিদ্যার আয়ত্তাধীন নহে। জুতা, হেয়ারক্রুস ও পমেটম্ ইত্যাদি যোগানই এখন অবধি গোবর্দ্ধনের পুত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে একমাত্র কার্য্য রহিল। নিধিরাম অনেক দিন হইতে তেল মাথা ক্ষান্ত দিয়াছে। গোবর্দ্ধনকে বুঝাইয়া দিয়াছে, তেল মাখিলে মগজ শুকাইয়া যায় সুতরাং বিদ্যাও হয় না। এত আদরের ছেলে একটু পমেটম্ অভাবে মূর্খ হইবে, ইহা কি প্রকারে গোবর্দ্ধনের প্রাণে সয়? সুতরাং নিধিরাম যখন যাহা চায়, ভিক্ষা করিয়া হউক, কর্জ্জ করিয়া হউক, গোবর্দ্ধন আনিয়া যোগায়। কিন্তু অনেক কচ্‌লালে লেবু তিক্ত হয়, নিধিরাম এটা বুঝিত না। এক দিবস হাতে পয়সা নাই, এমন সময় নিধিরাম এক ফরমাইস্ করিল। গোবর্দ্ধন বিরক্ত হইয়া কহিল "তোর্ সঙ্গে একত্তর যারা পড়্‌তো তারা এখন জলপানি পাচ্ছে, তুই পাস্ না কেন?"

নিধিরাম। "তা কি তুমি, বল্লে বুঝ্‌বে? ওদের পড়া সব কাঁচা হ'য়ে আছে, এক বছরের বেশী এক কেলাসে থাকে না। আমি যা শিখ্‌ছি, সব পাকা হচ্ছে। ওদের জলপানি এক বছর কি জোর দু বছর থাক্‌বে, আর আমি যখন জলপানি পাব তখন ১০ বছর ক্রমাগতই পাব। সাধে কি আমি এক এক কেলাসে ২।৩ বছর করে থাকি। যত দিন পড়া পাকা না হয়, তত-দিন আমি কোন কেলাস ছাড়ি না।"

গোবর্দ্ধন ভাবিল তাই বা হবে! সুতরাং আর কিছু বলে না। নিধিরাম এক্ষণে প্রাপ্ত বয়স্ক। যাহাদের সঙ্গে পড়িতে হয়, তাহারা সকলেই নিধিরা-মের ১০।১২ বৎসরের ছোট সুতরাং তাহাদিগের সহিত পড়িতে নিধিরামের লজ্জা হইতে লাগিল। এজন্য পিতা মাতাকে কিছু না বলিয়া নিধিরাম বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিল। কিন্তু তথাপি রোজ ১০টার সময় আহারাদি করিয়া আপনার পুস্তকাদি লইয়া নিধিরাম ভবানীপুর আইসে। দিন কতক এইরূপ করিতে করিতে সঙ্গদোষে নিধিরাম একটু সুরাপান শিক্ষা করিল। কিন্তু সুরাপান ব্যয় সাপেক্ষ। পরে ক দিন খাওয়াইবে? ক্রমে নিধি-

রামের ১০।১২ টাকা দেনা হইয়া পড়িল, কোথা হইতে সে দেনা পরিশোধ হইবে, ভাবিয়া পায় না। অনেক চিন্তা করিয়া নিধিরাম এক দিবস বাপের নিকট গিয়া কহিল "এত দিনের পর আমার পড়া পাকা হয়েছে, এখন১৫ টাকা খরচ করিতে পারিলেই আমিও জলপানি পাব। এই ১৫ টাকা কালিই চাই।"

গোবর্দ্ধনের গৃহে সে দিবস অন্ন নাই। জনে জনে খরিদদারদিগের বাটী গিয়াছে, কোন স্থানে কিছু পায় নাই। বাটী আসিয়া রাগভরে হুঁকা টানিতেছে। নিধিরাম তাহার উপর অর্থ চাওয়ায়, গোবর্দ্ধন রাগ করিয়া কহিল, "আমি তোর পাকানো বিদ্যাও চাইনে, তোর জলপানিও চাইনে। তোর খরচ যুগিয়ে যুগিয়ে আমার যথা সর্ব্বস্ব গিয়েছে। এতদিন যদি তোকে মেঠাই তৈয়ার করিতে শিখাইতাম, তা হলেও একটা কাজ হ'ত। যা তুই আমার বাড়ী থেকে যা। আমার বাড়ীতে তুই আজ অবধি ঢুক্‌তে পাবি নে।"

নিধিরাম এরূপ উত্তর পাইবে তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। মনে করিয়াছিল টাকা পাইবেই পাইবে, তবে দু এক দিন বিলম্ব হইতে পারে। সুতরাং এ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত দেখিয়া তাহার বুদ্ধি শুদ্ধি (যাহা কিছু ছিল) সমস্তই লোপ পাইল। আর কথা কহিতে না পারিয়া বাটীর অভ্যন্তরে তাহার মাতার নিকট গিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পিতা মাতা কখন এক কালে সন্তানকে তিরস্কার করে না। একে তিরস্কার করিলে, অপরে তিরস্কৃতের পক্ষ হয়। গোবর্দ্ধনের সহধর্ম্মিণী পুত্রের পক্ষ হইয়া স্বামীর সহিত বিবাদ আরম্ভ করিল। দম্পতীর কলহে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া বটে কিন্তু গলা কার কতদূর উঠে তাহা শাস্ত্র কারেরা নিরূপণ করিয়া যান নাই। আমরা অনেক দেখিয়া শুনিয়া স্থির করিয়াছি যে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের গলা অন্তত ১০ গুণ উঠে। সুতরাং মোদক পত্নী যখন কথা কহিতেছিলেন, তখন একজন চাপরাসী বাহির হইতে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছিল "এই কি গোবর্দ্ধন বাবুর বাড়ী?" তাহা কাহারও কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। চাপরাসী উত্তর না পাইয়া অনাহূত হইয়াও গৃহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে মোদক পত্নী অবিলম্বে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। তখন চাপরাসী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল "এই কি গোবর্দ্ধন বাবুর বাড়ী?"

গোবর্দ্ধন অবাক্। এতকাল কেহ তাহাকে বাবু বলিয়া ডাকে নাই। সুতরাং সাহস করিয়া নিজে বাবু খ্যাতি লইতে অসমর্থ। এজন্য জিজ্ঞাসা করিল "কোন্ গোবর্দ্ধন বাবু?"

চাপরাসী উত্তর করিল, "জনার্দ্দন বাবুর ভাই।" শুনিয়া গোবর্দ্ধন সাহসে ভর করিয়া কহিল "আমিই গোবর্দ্ধন বাবু।"

এস্থলে পাঠককে বলিয়া দেওয়া উচিত, গোবর্দ্ধনের এক ভাই ছিল, তাহার নাম জনার্দ্দন। গোবর্দ্ধনের স্বজাতীয় কোন এক ধনী ব্যক্তি জনার্দ্দনকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করে। এই আখ্যায়িকায় বর্ত্তমান ঘটনার দিন কয়েক পুর্ব্বে জনার্দ্দনের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর পুর্ব্বে জনার্দ্দন উইল করিয়া গোবর্দ্ধনকে নগদ এক হাজার টাকা ও সাম্বৎসরিক দুইশত টাকার আয়ের ভূমি সম্পত্তি দিয়া গিয়াছে। সেই উইলের সম্বাদ সম্বলিত পত্র লইয়া চাপরাসী আসিয়াছে।

গোবর্দ্ধন "আমিই গোবর্দ্ধন বাবু" বলায়, চাপরাসির নিকট একখানি পত্র ছিল, সে সেই পত্রখানি গোবর্দ্ধনের হস্তে দিল।

গোবর্দ্ধন ও নিধিরাম উভয়ে যৎপরোনাস্তি যত্ন করিয়া পত্রখানি পড়িল। পত্রের মর্ম্ম এই ;—জনার্দ্দন নগদ ১০০০ টাকা দান করিয়া গিয়াছে ও ২০০ টাকা আয়ের ভূমি সম্পত্তি দিয়াছে। টাকা যখন প্রয়োজন তখনি লোক পাঠাইলে পাওয়া যাইবে আর ভূসম্পত্তি দখল করিলেই হইল।

পত্র প্রাপ্ত মাত্র গোবর্দ্ধন লোক পাঠাইয়া দিয়া টাকা আনিল। টাকা আসিলে, তর্ক উপস্থিত হইল, এ টাকায় কি করা উচিত? গোবর্দ্ধনের মত, টাকায় নিজের পুঁজি বৃদ্ধি করিয়া প্রশস্তভাবে নিজ ব্যবসায় চালায়। গোবর্দ্ধনের স্ত্রীর মত টাকাগুলি ব্যয় করিয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করা হয়। তাহা হইলে টাকাকে টাকা বজায় থাকিবে, যখন প্রয়োজন তখনি বন্দক দেওয়া বা বিক্রয় করা যাইতে পারিবে। নিধিরামের মত, নগদ টাকায় একটা বাড়ী খরিদ করা উচিত এবং ভুমি সম্পত্তির আয়ে ভরণ পোষণ চালান কর্ত্তব্য; আর ময়রার ব্যবসায় একেবারে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। নিধিরাম উপযুক্ত পুত্র বলিয়া নিধিরামের কথাই সকলের গ্রাহ্য হইল। পরে, বাড়ী কোথায় খরিদ করা উচিত, এই প্রস্তাব উপস্থিত হওয়ায় নিধিরামের মতে স্থির হইল যে, যেখানে কেহ না জানিতে পারিবে যে গোবর্দ্ধনের কি ব্যবসায় ছিল?

অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল চানকে বাড়ী খরিদ করা উচিত এবং নিধিরাম ৮০০ আট শত টাকা লইয়া চানকে বাটী খরিদ করিতে গমন করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নিধিরাম বাটী খরিদার্থ চানক আসিয়াছে। বাজারে এক দোকানে বাসা করিয়া নিত্য নিত্য বাটীর অনুসন্ধান করে, বৈকালে পার্কে বেড়াইতে যায়। এক দিবস অপরাহ্লে পার্কে বেড়াইতেছে, এমন সময় একটি পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। পুরুষের আন্দাজ ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম, কামিনীর ২০।২২ বৎসর। নিধিরাম আটশত টাকার নোট কোন স্থানে রাখিতে সাহস না হওয়ায় সর্ব্বদা নিজের পকেটে লইয়া ফেরে, এবং পকেট হইতে কেহ চুরি করে এই ভয়ে সর্ব্বদা পকেটের মধ্যে, নিজ হস্তদ্বয় রাখিয়া সতর্কভাবে ভ্রমণ করে। হঠাৎ উপর্য্যুক্ত স্ত্রী পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় নিধিরাম কামিনীর রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া, মোহিত হইয়া সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। পুরুষ অগ্রসর হইয়া নিধিরামের নাম জিজ্ঞাসা করিল। নিধিরাম নিজের নাম বলিল। কোথায় বাটী, কিজন্য চানকে আসিয়াছে, তাহারও পরিচয় দিল। নিজ উদ্দেশ্য সাধনার্থ যে অর্থ আনিয়াছে, তাহাও প্রকাশ করিতে বাকি রাখিল না। নিধিরাম যে দরিদ্রের সন্তান তাহা কাহাকেও জানাইতে নিধিরামের ইচ্ছা নাই। নিধিরামও অজ্ঞাত পুরুষের নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিল। জানিতে পারিল তাঁহার নাম দীনবন্ধু, কামিনী তাঁহার সহধর্ম্মিণী। উভয়েই ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করণার্থ উভয়েরি চানকে আগমন।

এইরূপ পরিচয় হইলে, নিধিরাম আবার একাকী পশ্চাৎ রহিল, ব্রাহ্ম দম্পতী অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে ব্রাহ্মিকা (নাম সরোজিনী) পতির কাণে কাণে কহিল "এরূপ সুন্দর পুরুষ তুমি কি কখন দেখেছ?" সরোজিনী এরূপে বলিল যে, নিধিরাম তাহা স্পষ্ট শুনিতে পাইল। সরোজিনীকান্ত দীনবন্ধু উত্তর করিল "যা বলেছ ঠিক। অনেক লোক দেখেছি কিন্তু নিধুবাবুর মতন সুরূপ সুগঠন আর কখন দেখি নি।" নিধিরাম একথাও স্পষ্ট শুনিতে পাইল।

এদিবস এই পর্য্যন্ত। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া নিধিরাম বাসায় ফিরিয়া আসিল এবং ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাও গৃহে গমন করিল।

নিধিরামের সে রাত্রি আনন্দে নিদ্রা হইল না। কখন রাত্রি প্রভাত হইবে ও পার্কে পুনরায় বেড়াইতে যাইবে এই ভাবিতে লাগিল।

যথাসময়ে রজনী শেষ হইল, ক্রমে অপরাহ্ণ হইল, নিধিরাম হর্ষোৎফুল্ল

চিত্তে পুনরায় বেড়াইতে গেল। অদৃষ্টক্রমে পুনরায় যুবক ও কামিনীর সহিত তাহার সাক্ষাত হইল। অদ্য সন্ধ্যার সময় দীনবন্ধু বাবু নিধিরামকে কহিলেন "মহাশয়, আমাদের বাসায় আসুন না, পান তমাক খাইয়া যাইবেন।" নিধুর আনন্দের আর সীমা রহিল না। পান তমাক খাইয়া চলিয়া যাইবার সময় দীনবন্ধু তাহাকে পরদিবস আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন।

এইরূপ কএক দিবস পরেই নিধিরামের সহিত ব্রাহ্মদ্বয়ের যৎপরোনাস্তি সদ্ভাব হইল। নিধিরাম এক্ষণে সমস্ত দিবসই প্রায় ব্রাহ্মদ্বয়ের বাটীতে থাকে। বাটী অনুসন্ধান করার কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে।

এক দিবস যথাসময়ে ব্রাহ্মদের বাটীতে গিয়া দেখিল দীনবন্ধু বাটীতে নাই, কামিনী একাকিনী আছে। নিধিরাম দুই এক কথা কহিয়া ফিরিয়া আসিবার প্রস্তাব করিল; কামিনী কহিল "কেন যাবেন? বসুন। তিনি বাটী নাই তাহাতে ক্ষতি কি?" নিধিরাম বসিল। নানাবিধ কথায় দিন কাটিয়া গেল। বাটী আসিবার সময় কামিনী হঠাৎ নিধিরামের হস্ত ধরিয়া কহিল "দীনবন্ধু বাবু আর সাত দিবস বাটী আসিবেন না। তিনি বর্দ্ধমানে গিয়াছেন। আমার একলা থাকতে বড় কষ্ট হয়। অনুগ্রহ করিয়া কাল আর একটু সকালে সকালে আসবেন।"

কামিনীর হস্তস্পর্শে নিধিরামের শরীর শিহরিয়া উঠিল। নিধিরামের মনে কি ভাব হইল, তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে, বর্ণনা করা অসাধ্য। বাটী যাইবার সময় নিধিরাম মাটিতে পা ফেলিতেছে কি না তাহা টের পাইল না।

পর দিবস সকালে সকালে আহারাদি করিয়া নিধিরাম ব্রাহ্মিকার বাটীতে গমন করিল। অনেক ক্ষণ একথা সে কথার পর ব্রাহ্মিকা নিকটে আসিয়া নিধিরামের স্কন্ধে নিজ মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক কহিল "একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, সত্য বোলবে কি?"

নিধিরাম ব্রাহ্মিকার মস্তকে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া কহিল "তার আর সন্দেহ? তুমি যা জিজ্ঞাসা কোরবে আমি সত্য জবাব দিব।"

ব্রাহ্মিকা নিধিরামের দিকে কোমল নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসিল "তুমি আমাকে ভালবাস কি?" এই মাত্র বলিয়া লজ্জাভরে চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া মুখ ফিরাইল।

নিধিরাম আনন্দে পরিপ্লুত। কহিল "আমি তোমাকে ভালবাসি না?

যে অবধি তোমার সহিত দেখা হইয়াছে, সে অবধি তুমিই ধ্যান, তুমিই জ্ঞান। আমি অন্য কিছু করি নাই, অন্য কিছু ভাবি নাই। নিয়ত কেবল তোমাকেই ধ্যান করিতেছি।" একটু থামিয়া পুনরায় নিধিরাম কহিল "আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌বো?"

ব্রাহ্মিকা নিজ হস্তদ্বয় মধ্যে নিধিরামের হস্ত গ্রহণ করিয়া কহিল "যা খুসি।" তখন নিধিরাম জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি আমাকে ভালবাস?"

ব্রাহ্মিকা কহিল "পুরুষের কি কঠিন মন? তোমার কি এখনও তায় সন্দেহ আছে?"

এই উত্তর পাইয়া নিধিরাম ব্রাহ্মিকার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া কি বলিবে এমন সময় গৃহদ্বারে পদ প্রক্ষেপের শব্দ তাহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে দাসী আসিয়া ব্রাহ্মিকাকে কহিয়া গেল, বাবু আস্‌ছেন। ব্রাহ্মিকা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিল "এখন উপায় কি? তুমি ঐ পরদার আড়ালে যাও। নিধিরাম কহিল "কেন আমি খিড়কীর দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া যাই না কেন?"

ব্রা। "না না, তা হলে সর্ব্বনাশ হবে।" এই কথা বলিতে বলিতে ব্রাহ্ম উপরে আসিল। নিধিরাম উপায়ান্তর না দেখিয়া পরদার আড়ালে গিয়া লুক্কায়িত হইয়া রহিল।

ব্রাহ্ম এবং তাহার আর একটি বন্ধু উভয়ে আসিয়া গৃহে উপবেশন করিল। ব্রাহ্ম নিজে কম ষণ্ডা নহে, বন্ধুবর কলেবরে যেন যমের সহোদর। উভয়ে বসিয়া নানাবিধ গল্প করিতে লাগিল। ব্রাহ্মিকা আসিয়াও সেই গল্পে যোগ দিল। কহিল "এসেছ, না বাঁচলাম। এই দু দিন একা একা থেকে আমি পাগল হবার যো হয়েছি। একটি লোক নাই যে একটা কথা কই। সমস্ত দিন কেবল ঘুমাইয়াই কাটাই। তোমরা আসিবার পূর্ব্বেই কেবল আমি জেগেছি। সমস্ত দিন ঘুমিয়ে ছিলাম। নিধু বাবু রোজ রোজ আস্‌তেন কিন্তু আজ দু দিন অদৃষ্টক্রমে তিনিও আসেন নাই।" নিধিরাম মনে মনে বলিতে লাগিল "বেশ, বেশ। কামিনী কি কুহকিনী!" নিধিরাম সমস্ত শুনিতেছে আর কতক্ষণে গল্প শেষ হইবে ভাবিতেছে। মশার কামড়ে নিধিরামের প্রাণ ওষ্ঠাগত। জোরে চাপড়ে মশা মারিবার যো নাই। মুষিকগণ গৃহের একোণ ওকোণ কিচ্‌ কিচ্‌ শব্দ করিয়া বেড়াইতেছে। নিধিরাম সর্ব্বদাই ভয় পাইতেছে, পাছে তাহাকে কামড়ায়। পরে ক্রমে

রাত্রি বৃদ্ধি হওয়ায় আর এক উপসর্গ হইল—নিধিরাম ক্ষুধার কষ্ট পাইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে রাত্রি দুই প্রহর হইল, তখন বন্ধুবর গৃহে প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত। গাত্রোত্থান করিয়া কহিল "দীনবন্ধু চুরুট আছে? একটা দাও দেখি।" দীনবন্ধু চুরুট দিলে চুরুটটি ধরাইয়া বন্ধুবর টানিতে আরম্ভ করিলেন, এবং নিধিরাম যে পরদার আড়ালে ছিল সেইখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। নিধিরাম তামাক খায় কিন্তু চুরুটের গন্ধ সহ্য করিতে পারিল না। চুরুটের গন্ধ পাইলেই নিধিরাম হাঁচে। চুরুটের গন্ধ পাইয়া নিধিরাম নাক টিপিয়া ধরিল এবং অতিকষ্টে প্রথম বার হাঁচি সম্বরণ করিল, কিন্তু কতক্ষণ নাক টিপিয়া থাকিবে? অবিলম্বেই হাঁচিয়া ফেলিল। বন্ধুবর 'কেও কেও' বলিয়া একটু পিছাইল কিন্তু পুনঃ পুনঃ হাঁচায় আলোক আনিয়া ব্রাহ্ম ও বন্ধুবর উভয়ে একত্র আসিয়া নিধিরামকে ধৃত করিল। নিধিরামের হস্ত ধরিবা মাত্রেই নিধিরাম বেহুঁস। কিন্তু দুই চারি বেত্রাঘাত রূপ উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে নিধিরামের চৈতন্য হইল। ব্রাহ্ম নিজ পত্নীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিল। "এই তোমার একা থাকা বুঝি? নিধু বাবুর সঙ্গে বহুকাল সাক্ষাৎ হয় নাই, না?" পরে ব্যবস্থা স্থির হইল, আপাতত নিধিরামের নাক কাণ কাটা। বন্ধুবর ব্যস্ত সমস্ত হইয়া একখানি শাণিত ক্ষুর আনয়ন করিল। নিধিরাম উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া কহিল "আমার নাক কাণ কেটো না, আমার কাছে যা আছে সব নেও।" অনেক কষ্টে ব্রাহ্ম ও বন্ধুবরকে সম্মত করাইয়া নিধিরাম নিজের পকেটে যে ৮০০ টাকার নোট ছিল তাহা দান করিয়া নাক কাণ বাঁচাইয়া চলিয়া গেল।

শুনা গিয়াছে, ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মিকা ও বন্ধুবর এই রূপেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে এবং এইরূপে যথেষ্ট টাকাও সঞ্চয় করিয়াছে।

নিধিরামের যে কেবল নাক কাণ বজায় রহিল, এমত নহে, নিধিরামের চৈতন্য হইল। গোবর্দ্ধনকে বলিয়া বাকি দুই শত টাকা দোকানে ফেলিয়া দোকান ফলাও করিল; ক্রমে বাপ বেটায় গুড়ের কারবার করিল। গোবর্দ্ধনের পরলোক হইয়াছে; নিধিরাম এখন কলিকাতার চীনেবাজারের মোড়ে দোকান করিয়াছে; এখনও দুই প্রহরের সময় দেখিবে, নিধিরাম দুই হাতে সন্দেশ মিঠাই দিতেছে, যে পয়সা দিতেছে একবার মাত্র হাতে ছড়াইয়া দেখিয়া বাক্সে ফেলিতেছে; কিন্তু নিধিরাম ভাল ব্রাহ্ম, ভক্ত ব্রাহ্ম বুঝে না; দাড়ি চস্‌মা ওয়ালা খরিদার দেখিলেই বিকট কটাক্ষ

করিয়া বলে, 'মহাশয় কি নিবেন?' তাহার পর পয়সা লইয়া গণিয়া বাক্সে রাখিয়া তবে মিঠাই দেয়, নিধিরামের ব্রাহ্ম ভীতি বোধ হয় ইহজন্মে যাবে না।

সুন্দর-বনে ব্যাঘ্রাধিকার।

বহুকাল হইল, সুন্দর-বন অতিসমৃদ্ধি শালী জনপদ ছিল। এখনও তাহার নানা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। নিবিড় জঙ্গল মধ্যে, প্রস্তরময় সোপান শোভিত বৃহৎ সরোবর, কারুকার্য্য খচিত বিশাল শিব মন্দির, ভগ্ন অট্টালিকা সমূহের ক্রোশব্যাপী ধ্বংসাবশেষ, সুন্দর বনের যেখানে সেখানে এখনও আছে। ফরাসী রাজধানী পারিস্ নগরে বঙ্গদেশের যে অতি পুরাতন মানচিত্র আছে, তাহাতে সুন্দর-বন মধ্যে পাঁচটি জীবন্ত নগরের নাম ও চিহ্ন আছে; আর সুন্দর-বনের সমৃদ্ধির কথা বৃদ্ধ জনগণের মুখেও শুনা গিয়াছে। কিন্তু এখন সমস্তই কাল কুক্ষিগত। কিসে গ্রাম নগর গৃহ গোষ্ঠ সমস্তই উৎসন্ন গেল? কেমন করিয়া জনাকীর্ণ জনপদ গভীর নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইল?

প্রসিদ্ধ ভূকৈলাসের যোগীকে ভট্টপল্লীর একজন ভট্টাচার্য্য ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। যোগী নিতান্ত স্বল্পভাষী ছিলেন, উত্তরে বলেন যে "সুন্দর-বনে ব্যাঘ্রাধিকার হওয়াতে এবং সুন্দরবন বাসীরা দুর্ম্মতি বশত ব্যাঘ্র ধর্ম্ম অবলম্বন করাতে, কালে সুন্দর-বন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে।"

এ কথা বড় বিচিত্র। ইতিহাসে এরূপ আর কোথাও হইয়াছে কি না জানি না। মনুষ্যে ব্যাঘ্র ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, একথা বিস্ময়কর ও হাস্যকর। কিন্তু আবার পরিণাম ভাবিলে বোধ হয় নিতান্ত বিষাদ পূর্ণ। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কথাটি যে ভাবে বিবৃত করেন, আমরা সেই ভাবেই বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব। তিনি এক জন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন, যদি তাঁহার বিবরণে কার্য্যকারণের পরম্পরা নির্দ্ধারণে কিছু গণ্ডগোল থাকে, তবে তাহাতে তাঁহার 'দীধিতি' দায়ী।

এক কালে চন্দ্র-দ্বীপের রাজারা বড়ই প্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন।

বঙ্গ দেশের দক্ষিণ ভাগ তাঁহারা সমস্তই অধিকার করেন। তখন সুন্দরবন বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ছিল। সাগর সন্নিকট হওয়াতে বৈদেশিক নৌ-বাণিজ্যের বড়ই শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠী জাতীয় নিরীহ বণিকগণ ধান্য,তাম্রকূট, মধু, মোম প্রভৃতির ব্যবসা করিয়া অতুল সম্পত্তি করিয়াছিলেন। পৌণ্ড্র বংশীয় অগণিত কৃষিবলের পরিশ্রমে সমস্ত ভূভাগ সম্বৎসর যাবৎ শস্য-শ্যামল থাকিত। ব্রাহ্মণগণ দেব-প্রসাদে ঐহিক চরিতার্থতা লাভ করিয়া পারকালিক সুখাশায় দিনাতিপাত করিতেন। দিবসে প্রান্তরে কৃষকগণের নীরব শ্রম চালনায়, গ্রাম নগরে বাণিজ্যের উৎসাহময়ী নিরন্তর গতিতে এবং রাত্রি চারিদণ্ড পর্য্যন্ত দেবমন্দিরের ও বৌদ্ধ মঠ সকলের বাদ্যঘণ্টা রবে, সমস্ত জনপদ আকুলিত থাকিত।

সুন্দরবনের পূর্ব্বে পশ্চিমে বন ছিল। চন্দ্রদ্বীপের রাজারা পূর্ব্বদিকের বন কাটিয়া নগর পত্তন করিতে লাগিলেন,পশ্চিম দিকের জঙ্গল তাড়না করিয়া নবাগত মুসলমানেরা সেনানিবাস স্থাপন করিতে লাগিলেন। দুইদিক হইতে তাড়িত হইয়া ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি শ্বাপদ সকল সুন্দর-বন আক্রমণ করিতে লাগিল। এখন, এই মহামারীপূর্ণ বঙ্গদেশের কোন কোন পল্লীগ্রামে যেমন দিবারাত্রি শৃগালের উপদ্রব হইয়াছে, প্রথম প্রথম, সেই সময়ে সুন্দরবনে সেই রূপ বাঘের উৎপাত হইল। তবে শৃগালের উপদ্রব অপেক্ষা বাঘের উৎপাত অবশ্য অধিকতর ভয়ঙ্কর। শৃগালে এখন, ছোট ছেলেটিকে তেল হলুদ মাখাইয়া পীঁড়ার উপর রৌদ্রে শোয়াইয়া রাখিয়া নব প্রসূতি পুকুর ঘাটে গিয়াছে দেখিলে, ছেলেটিকে বনে লইয়া যায়; ছোট বউকে মাছ ধুইতে খিড়কীর ঘাটে নামিতে দেখিলে, পাশের কচুবন হইতে মাছের পেতে ধরিয়া টানাটানি করে; চৌরীঘরের মেঝে হইতে পাকা কাঁটাল মাথায় করিয়া পালায়; কাঁধাকাঁধি করিয়া রান্নাঘরের ঘুলঘুলি দিয়া ইলিশ মাছের হাঁড়ি খায়; আবার দুই দশটা হন্নে হইলে, যাকে পায়, তাকেই কামড়ায়, বাধা বন্ধক মানে না, লোক জনকে ভয় করে না; মারিতে গেলে, ঘাড় ফিরাইয়া লাঠি কামড়াইয়া ধরে। এখনকার দিনে, এই বিপুল অর্থ ধ্বংশকারী পোলিস্ প্রহরী বেষ্টিত বঙ্গমণ্ডলে, এই বন্দুক-বেটন-সঙ্গিন-প্রবল সঙ্গিন্ দিনে যখন সামান্য শৃগালের এইরূপ উপদ্রব হইয়া উঠিয়াছে, তখন, সেই সেকালে, সেই, শ্রেষ্ঠী পৌণ্ড্র পূর্ণ নিরীহ নিবাসে আবাস-তাড়িত ব্যাঘ্রের উৎপাত যে কি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রথমে ছাগ মেষ নিঃশেষ হইতে লাগিল;

তাহার পর গোষ্ঠে আর বৎসতরী থাকে না, ক্রমে বাথানের গো মহিষ করিতে লাগিল; দুটি দশটি করিয়া রাখাল বালক মারা পড়িল; তাহার পর অবেলায়, রাত্রিবেলায়, সকাল বেলায় মাঠে ঘাটে আর কেহ চলে না। ক্রমে গ্রাম নগরেও ঐ সময়ে চলাচল বন্দ হইল, কাজেই খর দিনের বেলা ছাড়া আর দোকান পশার হয় না। লোমশ লাঙ্গুল উত্তোলন করত লক লক করিয়া লালায়িত দংষ্ট্র-জিহ্বার ক্ষীণ প্রভার শ্মশান আলোকে ভীষণ মুখমণ্ডল ভীষণতর করিয়া, বৃহৎ বৃহৎ রাজ-ব্যাঘ্র সকল পথে ঘাটে পাঁদাড়ে বিচরণ করিতে থাকে; সহজে ক্ষুধা নিবারণের উপাদান না পাইলে গো-শালের সন্নিকটে গিয়া ভীম গর্জ্জন করে, দুই একটা ভীরু গোরু দড়ি ছিঁড়িয়া আগড় ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়ে, অমনই ঘাড় ভাঙ্গিয়া পীঠে ফেলিয়া লাঙ্গূল আছড়াইতে আছড়াইতে লম্ফে লম্ফে পগারের মধ্যে লইয়া গিয়া উদর পুরিয়া তাহার রক্ত শোষণ করে। ক্রমে গো-সেবক হিন্দু তাহার বহুদিনের অভ্যস্ত হিন্দুয়ানি ভুলিতে লাগিল। রোগা ভাঙ্গড়া বুড় গোরু আর গোয়ালে বাঁধিত না; ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের নজরানারূপে তাহাই রাত্রিকালে গো-শালার বাহিরে বাঁধিয়া রাখিত। কিছু দিনে গো-মহিষ, ছাগ-মেষ সকলই প্রায় অর্দ্ধসার হইল; দুধ ত আর মেলেই না; চাসীর চাস বন্দ হইবার উপক্রম হইল; ছোট ছোট ছেলেপিলে দুধ বিনে মারা পড়িতে লাগিল; তখন সুন্দরবন অধিবাসীরা দারুণ অন্নকষ্ট আসন্ন দেখিয়া নানারূপ ভাবনা ভাবিতে লাগিল।

তদানীন্তন বুদ্ধিজীবীরা সিদ্ধান্ত করিলেন, যে মনুষ্য শরীরে ব্যাঘ্রের মত বল নাই বলিয়া মনুষ্যের এরূপ দুর্দ্দশা হইতেছে; অতএব শরীরে ব্যাঘ্রের মত বল করা নিতান্ত আবশ্যক। ব্যাঘ্র লম্ফ ঝম্প দিয়া চলে ফিরে, তাহাতেই উহাদের অত বল, অতএব লম্ফ ঝম্পে চলা ফেরা করা নিতান্ত আবশ্যক। রাত্রিতে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে কবাটে লৌহ অর্গল লাগাইয়া বালক বৃদ্ধ যুবা ব্যাঘ্রবৎ হুহুঙ্কারে লম্ফ ঝম্প করিতে লাগিল, দুই দিন এইরূপ হয়, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে, আবার দশ দিন কামাই যায়।

ধুতি লটপট করিয়া ত শার্দ্দূল কুর্দ্দন হয় না; ব্যাঘ্রের মত অঙ্গচ্ছদ করাই ভাল; তাহাতে নানা দিকে সুবিধা আছে, একত ব্যাঘ্র ঝম্পের সুবিধা, দ্বিতীয় গরম কাপড়ে শরীরে বলাধান হয়। তৃতীয় আপাদমস্তক লোমশ কাপড়ে দেহ মোড়া থাকিলে, ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে অনেকটা

রক্ষা আছে; চতুর্থত ব্যাঘ্র বোধেও ভুলক্রমে ব্যাঘ্র হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং ভোট কম্বলের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত "বাঘথাব্বা" বানাইয়া সুন্দর বনের তদানীন্তন বুদ্ধিজীবীরা ও ধনবানেরা তাহাই পরিধান করিতে লাগিলেন। উহারি মধ্যে একজন সুবুদ্ধি বলিলেন, যে লম্ফের সহায় লাঙ্গূল; বিশেষ পশু পক্ষী সরীসৃপ সকল জীবেরই যখন লাঙ্গূল রহিয়াছে, তখন মনুষ্যেরও থাকা চাই; তবে যে স্বভাব হইতে নাই, সেটা কেবল মনুষ্যের বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার জন্য। মানুষের গাত্রে দীর্ঘ লোমও ত নাই তাহা বলিয়া মনুষ্য কি লোমশ অঙ্গচ্ছদ পরিবে না? সিদ্ধান্ত মত কার্য্য হইল; শুষ্ক বেতস লতায় কম্বল চির জড়াইয়া তাহাই মনুষ্যের অঙ্গচ্ছদ মেরুদণ্ডের নিম্নে লাগাইয়া দেওয়া হইল। বিজ্ঞেরা লাঙ্গূলের আর্য্যা স্থির করিয়া দিলেন, পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ হস্ত; পনের বৎসর পর্য্যন্ত এক হস্ত; তাহার পর—

প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে সার্দ্ধদ্বিহস্তকো ভবেৎ।

স্থির হইল, যে ব্যাঘ্রের মত এই লাঙ্গূল ভয়ের সময় হাতে ধরিয়া টানিয়া নত করিতে হইবে; লম্ফ ঝম্প কালে, বেতের রোক ছাড়িয়া দিবে, লেজ বাঁকা হইয়া লক লক্ করিবে; ক্রমে অবশ্যই ইঁহারা বুঝিতে পারিলেন, যে হাতে পায় না চলিলে লক্‌লকায়িত লাঙ্গূলের শোভা হয় না; বিশেষ হাতে পায় হাঁটিলে অনেক চলা যায়, ফুর্ত্তিতে চলা যায়, আর শীঘ্র হাঁপাইতে হয় না—সুতরাং বুদ্ধিজীবীরা হাতে পায়েই চলিতে লাগিলেন।

এইরূপ করিতে করিতে বুদ্ধিজীবীরা ক্রমেই, আচারে ব্যবহারে, আহারে বিহারে সম্পূর্ণরূপ [ব্যাঘ্র ধর্ম্মাবলম্বী হইলেন। শরীরের পশম নষ্ট করাই ভুল এই ধারণা হইল; প্রথমে দাড়ি রাখিতে লাগিলেন; তাহার পর মাথায় বড় বড় চুল রাখিলেন, তাহার পর বাঁকা বাঁকা নখ। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে আঁচড় কামড়ের প্রবৃত্তি বাড়িতে লাগিল। ক্রমে স্নান আচমনাদি মনুষ্যের অহঙ্কার জাত কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। ব্যাঘ্রভয়েও বটে, ব্যাঘ্র রাজ্যাধিকারী বলিয়া তাহাদের অনুকরণেও বটে, ক্রমে রাত্রিতে অর্গল বদ্ধ গৃহে কাজকর্ম্ম হইতে লাগিল। তবে যাতায়াতটা, দিন দুপরে চারি পায়ে, লাঙ্গূল নত করিয়াই হইত; সেই সময়ে পথিকেরা কম্বলের "বাঘথাব্বার" ছিদ্র প্রসারিত করিয়া মুখব্যাদান করিতেন, এবং লিহ লিহ ভাবে লোলজিহ্বা আকুঞ্চন প্রসারণ করিতেন। উত্তীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইয়া, হুঙ্কারে বলিতেন,

"আলুম্" তাহাতে আগমন বার্ত্তাও জানান হইত এবং অবলম্বিত ব্যাঘ্র ধর্ম্মও রক্ষা হইত। বুদ্ধিজীবীগণের দেখা দেখি অনেক গরীব দুঃখীও ব্যাঘ্রধর্ম্ম অবলম্বন করিল; যাহাদের কম্বল জুটিল না তাহারা নারিকেল ছোলের কাঁথার বাঘথাবরা করিল. আর কুটীর মধ্যে গর্ত্ত করিয়া রাত্রিতে তাহারই মধ্যে বাস করিতে লাগিল।

ছাগ মেষ কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু ব্যাঘ্রের মত মাংস না খাইলে শরীরে বল হইবে কি প্রকারে; অনেকেই আহারার্থ কুক্কুট পালন করিতে লাগিলেন; কুক্কুট গুলা বাঁধিয়া রাখিয়া, লম্ফ দিয়া তাহাই স্বীকার করা হইত, প্রথমেই ঘাড় ভাঙ্গিয়া আম রক্ত ভক্ষণ করা হইত, ব্যাঘ্রধর্ম্মবিৎগণ বলিতেন, এমন উপকারী পানীয় আর নাই; আর মাংসও অনেকে অসিদ্ধ ভক্ষণ করিতেন; যাহারা ঐরূপ করে, তাহারাই ত বলশালী। ভক্ষ্য গুলার অস্থি পঞ্জর গৃহমধ্যে ছড়ান থাকিত, পণ্ডিতে স্থির করিয়াছিলেন. যে উহাতে দূষিত বায়ুর দোষ নষ্ট করে, এবং গন্ধে বলাধান হয়।

সুন্দর বন স্বভাবের উপবন স্বরূপ ছিল; ক্রমে ভীষণ জঙ্গলে পরিণত হইল; জঙ্গলে ব্যাঘ্র বাস করে, সুতরাং মানবগণেরও জঙ্গলে বাস করাই শ্রেয় বলিয়া বিবেচিত হইল। কাজেই কেহ আর জঙ্গল কাটে না; তাহাতে চাস বাসের হ্রাস হওয়াতে মাঠ ঘাট সমস্তই জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইল। কুক্কুট গোষ্ঠীর শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল; গ্রামের নিকটস্থ জঙ্গলে পালে পালে বৃহৎ বৃহৎ কুক্কুটগুলা কেবল 'কঃ কঃ' করিয়া পাখা ঝট্‌কাইতে ঝট্‌কাইতে উড়িয়া বেড়ায়, আর পালে পালে বানর ডালে ডালে লাফালাফি করে। এখন ব্যাঘ্র ত সুন্দর বনে রাজ-রাজেশ্বর হইয়াছে। ব্যাঘ্র শব্দের পূর্ব্বে রাজ শব্দ যোগ না দিয়া, কথাটা মুখে আনিতে কেহই সাহস করিত না। সেই অবধি সুন্দরবনের ব্যাঘ্রের নাম রাজবাঘ (Royal Tiger) হইয়াছে। সুন্দরবনের বীরগণ সকলেই তখন 'নরব্যাঘ্র' 'নর-শার্দ্দূল' পদে অভিহিত হইতেন; এবং ঐ রূপ বিশেষণে শ্লাঘা মনে করিতেন। 'বিদ্যাবাগীশ' 'ন্যায়বাগীশ' উপাধির যে দুই দশজন ভট্টাচার্য্য ছিলেন, তাঁহাদিগকে কেহ 'বাঘীশ' বলিলে আহ্লাদিত হইতেন।

সবল পৌণ্ড্রেরা অনেকেই 'বাঘ' 'বাঘেয়া' ও 'বাঘচি' উপাধি পাইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতে লাগিল। এইরূপেই রামধন বাগের, এবং কৈলাস বাগতির পূর্ব্ব পুরুষের নামকরণ হয়। কেবল বিশেষণ শব্দে

বা জাতিবিশেষের নামেই যে সুন্দরবনে ব্যাঘ্রাধিকারের পরিচয় আছে, এমন নহে; বাগ্ পাওয়া, বাগিয়ে লওয়া ইত্যাদি নূতন ক্রিয়া সেই সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে, এবং তাহাতে বাঙ্গালার অভিধান পুষ্ট হইয়াছে। সুন্দরবনে ব্যাঘ্রাধিকারের আরও বিস্তর প্রমাণ আছে; এখন যদিও প্রায় নির্মনুষ্য হইয়াছে, কিন্তু তথাপি যে দুই দশজন লোক দেখা যায়, তাহারা অনেকেই ব্যাঘ্র-ধর্ম্মাবলম্বী।

সুন্দরবন বাসীরা ব্যাঘ্রধর্ম্মাবলম্বী হওয়াতে ক্রমে ব্যবসা বাণিজ্য উঠিয়া গেল; চাস বাস কমিয়া গেল; অনেকেই নির্ধন হইল। কেবল লম্ফ ঝম্পেই মন, জ্ঞানচর্চ্চা উঠিয়া গেল, তাহারা মূর্খ হইল। অল্পাহারে শরীরে বল করিতে গিয়া, অধিকতর বলহীন হইল; ঘোরতর জঙ্গলে একরূপ জঙ্গল-জ্বর জন্মিল; তখন সেই দারুণ জ্বরে, অর্থাভাবে, পথ্যাভাবে, ক্ষীণপ্রাণে তাহারা কত দিন যুঝিবে? প্রত্যহ সহস্র প্রাণী মরিতে লাগিল, ব্যাঘ্র-ধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসীরা প্রায় সকলেই উৎসন্ন গেল, আর রাজ-ব্যাঘ্র সকল সেই ভীষণ গহন শ্মশান বনে শৃগাল হরিণ শীকার করিয়া একাধিপত্য রাজত্ব করিতে লাগিল। কথাটা শুনিলে হাসি পায়, ভাবিলে গা শিহরিয়া উঠে।

আমাদের অধীনতা।

আমাদের অধীনতা আজ কাল সকের সামগ্রী হ'য়ে উঠেছে। যেখানে যাও, শুনিবে অধীনতা! অধীনতা! অধিকাংশ সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রের অধীনতা মৌরুষী জোত। বালকগণের ছাত্রসভায়, রীডিং ক্লবে অধীনতার ছড়াছড়ি। হাট বাজারে, গাছের তলে, গুরু মহাশয়ের পাঠশালে নিত্যই 'অধীনতা' সম্বন্ধে 'বিরাট সভা' আহূত হয়। "ভাই, উঠ, জাগ আমাদের জন্মভূমি—ভারত ভূমি পরাধীন, কতগুলি রাক্ষস যবন (জনান্তিকে ইংরেজ) আমাদিগের জন্মভূমিকে ক্লেশ দিতেছে, আর ঘুমাইও না, কোমর বাঁধ, খাঁড়া ধর, তাড়াও বেটাদের সাগরের পার।" যেখানে সেখানে এইরূপ উত্তেজনা পূর্ণ বক্তৃতা শ্রুত হয়। আমারা একদিন দেখিয়াছি, একটি বিদ্যালয়ে ছুটীর পর ছাত্রগন সভা করিয়াছে 'পরাধীনতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা হইতেছে,

একটি অল্পবয়স্ক রুগ্ন বালক হস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক বক্তৃতা করিতেছে, তাহার ক্ষীণ কম্পিত কণ্ঠের বক্তৃতা শুনিয়া হঠাৎ যাত্রার দলের ছোকরা বলিয়া বোধ হয়। বালকটি বলিতেছে, "হে সভ্যগণ! আসুন, আমরা সকলেই বদ্ধপরিকর হইয়া জন্মভূমির শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হই। "সম্মুখ সংগ্রামে যার মাথা কাটা যায়, কবিগণ মুক্তকণ্ঠে তার যশ গায়।" আমরা আর শুনিতে পাইলাম না, ঘোরতর করতালি ধ্বনিতে দিগন্ত পূরিয়া গেল। হায়! যে দেশের দশম বর্ষীয় বালক পর্য্যন্ত জন্মভূমির জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত, সে দেশের সৌভাগ্য সূর্য্য আজও উদয় হয় না কেন! অনেকেরই বিশ্বাস, যে আমরা স্বাধীনতা বিষয়ে অনেক উন্নত হইয়াছি; শিক্ষিত, অশিক্ষিত, প্রবীণ, শিশু সকলেই অধীনতার যন্ত্রনা ও স্বাধীনতার সুখ বুঝিয়াছে। কিন্তু এটি বিষম ভুল। শুধু ভুল নহে, মহা অনিষ্টকারী ভুল। কেবল বাঙ্গলার কথা বলি, শতবৎসর, শতবৎসর কেন—পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যত বাঙ্গালি স্বাধীনতা অধীনতা বুঝে নাই, আজ কাল তার শতগুণ বাঙ্গালি স্বাধীনতার জন্য মত্ত রহিয়াছে। এটি সময়ের ফল ও তৎসঙ্গে আধুনিক শিক্ষার ফল। পৃথিবীতে কোন জাতি চিরদিন অধীনতা তিমিরে আবৃত থাকে নাই, কেহ অল্প দিনে, কেহ অধিক দিনে, কেহ দশ বৎসরে, কেহ শত বৎসরে, সহস্র বৎসরে আপন অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়াছে। এই চির প্রসিদ্ধ নিয়ম গুণে আজ আমরাও অধীনতা শৃঙ্খলের অসহ্য যাতনা ও স্বাধীনতা সুখের মাহাত্ম্য অনেকটা বুঝিয়াছি। কিন্তু শুধু কাল প্রবাহে জড়বৎ চালিত হইলেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে সুশিক্ষা চাই। দুর্ভাগ্য বশত আমাদের এই শিক্ষা বিকৃতা ও অঙ্গহীনা। অভাবের অভাবত্ব ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম না হইলে, তাহা পূরণের সম্যকরূপ চেষ্টা হইতে পারে না এবং সে চেষ্টাও ফলবতী হয় না। আমরা স্বাধীনতা অভাবী। সর্ব্বদা স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া গণ্ডগোল করি কিন্তু আমরা কয়জন স্বাধীনতা বুঝি? আমরা পরাধীন বলিয়া আমাদের জীবনে কি দুঃখ আছে? আমরা অহোরাত্র গলদ্ঘর্ম্ম পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করি, তাহা ইংরেজকে দিতে হয়, এই দুঃখ? কেন? ইংরেজ রাজা না হইয়া যদি ভারতবাসীই কেহ রাজা হইত, মনে কর বাঙ্গালিই যদি রাজা হইত, তাহা হইলেও ত তোমাকে এইরূপ পরিশ্রমের অর্থ বাঙ্গালি রাজাকে দিতে হইত, তাহাতে তোমার আমার লাভ কি? এইরূপ মনে করাই ভুল এবং এই ভুলেই আমরা স্বাধীনতা স্বাধীনতা করি, কিন্তু উহার কিছুই

বুঝি না। কয়জন বাঙ্গালি প্রকৃত রূপে অধীনতা যন্ত্রণা অনুভব করেন? একথা শুধু অশিক্ষিত দিগের পক্ষেই প্রযুজ্য নহে, দেশীয় অর্দ্ধ শিক্ষিত গণেরও এবিষয়ে সম্যক্ অনভিজ্ঞতা আছে।

অধীনতার যন্ত্রণা প্রকৃতরূপে না বুঝাইলে এবং তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় না দেখাইলে কেবল তেজস্বী বক্তৃতায়, কেবল বিলাপপূর্ণ প্রবন্ধে কোন কাজ করিতে পারিবে না।

প্রাচীন ইতিহাস অধীনতা ব্যাধির পরমৌষধ। কি রূপে একটি দেশ ক্রমে ক্রমে পুনর্ব্বার জীবন্ত হয়, যে যে অভাবে সৌভাগ্য লক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল, কি প্রকারে সেই সকল অভাব পূরিত হইয়া তাঁহার পুনরাবির্ভাব হয়, তাহা প্রাচীন ইতিহাসে পাঠ করা কর্ত্তব্য। প্রাচীন ইতিহাসেই দেখিবে কিরূপে জাতীয় জীবন গঠিত হইয়া স্তরের উপর স্তর উঠে। বিচূর্ণ স্বাধীনতা মন্দির পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিতে হইলে একটি আদর্শ স্বাধীনতা মন্দির চাই। স্তরের পর স্তর তুলিয়া কেমনে একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, দেখিতে হইবে। ভিত্তি না গড়িয়া চূড়া বসাইতে চেষ্টা করিলে হইবে না। কিন্তু আমাদের অঙ্গহীন শিক্ষার দোষে আমরা এইরূপ ভিত্তি না গড়িয়া চূড়া বসাইতে চাই।

আমরা এমত বলিতেছি না যে, আমরা স্বাধীনতার কিছুই শিখিতে পারি নাই; আমরা শিখিয়াছি এবং উন্নতও হইয়াছি কিন্তু যাইতেছি—বিপথে। তাই আজকাল বালকগণ স্বাধীনতা সহচর একতাবদ্ধ হইয়াও চঞ্চল, উদ্ধত ও অপরিণামদর্শী। এইরূপ অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত লোক বাদ দিলে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রেমিক কয়জন লোক থাকেন? এই জন্যই অধীনতা বিষয়ে সাধারণের বোধগম্য উপদেশ অতীব প্রার্থনীয় এবং যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষা-স্রোত চলিতেছে, তাহার অনেক পরিবর্ত্তনও আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

মনে করিও না যে ইংরেজ আমাদের শত্রু; শত্রু হইলেও শত্রু মনেকরা হইবে না। জেতা—শত্রু নহে, শিক্ষাদাতা। যেরূপ অগ্নি দ্বারা স্বর্ণ পরিশোধিত হয়—অগ্নি স্বর্ণের বিনাশক নহে কিন্তু পরিশোধক, জেতাও জিতগণের সেইরূপ অগ্নিস্বরূপ। যাঁহারা সাবধানে কোন অধীন জাতির পুনরুত্থান পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন জেতৃ সংস্পর্শে জিতজাতি কিরূপে সংস্কৃত হয়। যে জেতৃ জাতির সংসর্গে জিতজাতির সংস্কার না হয়, সে জেতৃ জাতি

প্রকৃত বিজয়ী নামের যোগ্য নহেন, তাঁহারা রাজ্যবিপ্লাবক। ইহা সহজেই বুঝা যায়, যে জাতি প্রকৃত রাজ্য শাসন প্রণালী অবগত নহেন, তাঁহাদের বাহুবল লব্ধ রাজ্যও অচিরে হস্তভ্রষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকেই বিপ্লব বলিলাম। যবন দিগের জেতৃভাব পূর্ণ মাত্রায় ছিল না, কাজেই তাঁহারা জিত জাতির আদর্শ ও শিক্ষক হইতে পারেন নাই। এবং সেই জন্যই যবনাধিকারে এত বিপ্লব লক্ষিত হয়। ইংরেজ দিগের জেতৃভাব পূর্ণ মাত্রায় না থাকিলেও মুসলমান দিগের অপেক্ষা শতগুণে আছে, তাই ইংরেজ আমাদের আদর্শ ও শিক্ষক। সেই জন্য ইংরেজ রাজ্যে বিপ্লব অতি অল্প। অতএব প্রকৃত জেতৃ-জাতি শত্রু নহে, শিক্ষক। আমরা যে সৌভাগ্যক্রমে কোন অনভিজ্ঞ জেতৃহস্তে নিপতিত হই নাই, এই মহাভাগ্য। অনেকে মনে করেন যবন রাজ্যের পর ইংরেজ রাজ্য স্থাপিত হওয়ায় হিন্দুদিগের কোন উপকার হয় নাই, একটি অধীনতা শৃঙ্খল যাইয়া আরেকটি শৃঙ্খল হইয়াছে মাত্র। একথা যে সম্পূর্ণ সত্য নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। আজ যদি ভারত অনুন্নত কোন জাতীর অধীন হয়, তাহা হইলে আবার শত শত বৎসরের জন্য অধঃপতনে যাইবে। এই জন্যই রুষ মেরু অধিকার করিলে এত গোল-মাল। আর নূতন জেতৃজাতি উন্নত হইলেও জিত জাতির পক্ষে আদৌ মঙ্গলকর নহে। কারণ, পরস্পর উভয়েই অপরিচিত। জেতৃজিত পরস্পর পরস্পরের ধাত্ না চিনিলে প্রকৃত রাজ্যশাসন হয় না। এই ধাত্ চেনা বড় দুরূহ ব্যাপার। অনেক উন্নত প্রকৃতি জেতৃজাতি জিত জাতির প্রকৃতি বুঝিতে পারে না। এমন কি, এই ইংরেজেরাও আজ পর্য্যন্ত আমাদের ধাত্ ভাল করিয়া বুঝিলেন না। তাই ইংরেজ ও দেশীয়ের মধ্যে সর্ব্বদা এরূপ বিসদৃশ ভাব লক্ষিত হয়। যেমন জেতৃজাতির প্রকৃতি না বুঝিলে মহা অনর্থপাত হয়, তেমনি আবার জিতজাতিও জেতৃ জাতির প্রকৃতি না বুঝিলে তাহাকে সর্ব্বদা বিড়ম্বিত হইতে হয়।

অনেকে মনে করেন, আমরা সকলে একত্র হইয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করি না বলিয়াই আজও আমরা পরাধীন। কিন্তু যুদ্ধই স্বাধীনতা লাভের অমোঘ উপায় নহে। অতএব আজ যাহারা ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন হইবার জন্য উৎসুক, তাহারা মহা ভ্রান্ত। দেশের আপামর সাধা-রণকে অধীনতার কঠোর যন্ত্রণা বুঝাইয়া দাও, কিরূপে আপন অবস্থা পরিব-র্ত্তন করিয়া স্বাধীনতা লাভ করা যায়, তাহা বুঝাইয়া দাও, স্বাধীনতা কি,

অধীন ও স্বাধীন রাজ্য ও জাতিতে প্রভেদ কি, শিক্ষা দাও; মনুষ্যের স্বাধীনতা স্বাভাবিক, তাহার বিকৃতিই অধীনতা, এ কথা বুঝাও এবং সাবধানে শিখাও যে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা নহে। দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী, দরিদ্র সকলের মনে সর্ব্বদা অধীনতা দুঃখ জাগরূক রাখ, সকলে একতা সূত্রে বদ্ধ হও; দেশের আভ্যন্তরিক বল বৃদ্ধি কর; আত্ম নির্ভর করিতে শিক্ষা কর। ভারত যেমন শনৈঃ শনৈঃ স্বাধীনতা সকাশে চলিতেছে, তাহাতে বাধা দিয়া অধৈর্য্য হইলে চলিবে না। স্বাধীনতা প্রাপ্তির উপযুক্ত হও, যুদ্ধ করিতে হইবে না; জাতীয় জীবনের অমোঘ বীর্য্যে অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইবে।

যাঁহারা মনে করেন, তরবারি বলেই দেশ জয় এবং তরবারি বলেই তাহা শাসিত হয়, তাঁহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ। তরবারি মনুষ্যের অঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে পারে, কিন্তু জীবনের—জাতীয় জীবনের কাছে তরবারি তালপত্র স্বরূপ।

রাজপদ ও অধীনতা।

সংসারের মানব, সততই সুখের জন্য উন্মত্ত। এক মুহূর্ত্তের শত ভাগের এক ভাগও—মানবের মন সুখ-চিন্তা শূন্য নহে। তরঙ্গিনী বক্ষে কখন কখন অবিরাম গতিমান্ তরঙ্গের গতিরও ভঙ্গ লক্ষিত হয়; নির্ব্বাত সময়ে সেও বিশ্রাম করে। কিন্তু মানবের হৃদয়ার্ণবে সুখ-চিন্তা-তরঙ্গের ভঙ্গ নাই। একই ভাবে,—অবিরামে অবিশ্রামে, সূতিকাগৃহ হইতে শ্মশান ভূমি পর্য্যন্ত অবাধে চলিতেছে। এই তরঙ্গের সহিত সংসারের অনন্ত-কার্য্য-স্রোত, অনন্ত-উন্নতি-স্রোত সংমিলিত হইয়া অবিরামে চলিতেছে। তাহাতে সংসার অনন্ত বৈভবে বিভববান্ হইয়া, বৈজয়ন্তকেও পরাস্ত করিয়াছে। মনুষ্য, এইরূপ দৈব-শক্তি কোথায় পাইল? তাহার নাম কি?—পাইল হৃদয়ে; নাম আকাঙ্ক্ষা।

যে মহার্ণব গর্ব্ভে গভীরতার আধিক্য, তথায় তরঙ্গের গতি-শক্তিও অতিশয় প্রবল। তদ্রূপ হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষার গভীরতার মাত্রানুসারে সুখ-চিন্তার তারতম্য হয়। এই আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-চিন্তা অসীমেই পরিপুষ্ট

লাভ করে, সসীমে উহার সততই ক্ষীণতা। সীমাবদ্ধ সরোবর গভীর হইলেও তাহার বক্ষঃবাহিনী তরঙ্গলহরী মন্থর; তাহাতে তীব্রতা, কি আবেগ, কি উচ্ছ্বাস ইহার কিছুরই ছায়ামাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং অসীম সাগর বক্ষঃস্থিত তরঙ্গ, আর সসীম-সর-বক্ষঃ-বাহী তরঙ্গ কত বিভিন্ন! একে জীবিত; অপরে মৃত। একের গর্জ্জনে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে; অপরের গর্জ্জনে হৃদয় ফিরিয়াও চায় না। একের ভ্রূকুটী ভঙ্গিতে প্রলয় সংঘটন; অপরের ভ্রূভঙ্গি প্রতি কেহ লক্ষ্যও করে না। তদ্রূপ স্বাধীন হৃদয় অসীম অর্ণব তুল্য; তাহার আকাঙ্ক্ষা, সুখ-চিন্তা যত কিছু সকলই জীবিত সুতরাং প্রভাবান্বিত। কিন্তু অধীন হৃদয় হ্রদতুল্য, তাহার আকাঙ্ক্ষা, সুখচিন্তা সবই মৃত সুতরাং প্রভাব শূন্য। প্রভাব সকলেরই আকাঙ্ক্ষনীয়; অভাব কেহই চায় না। স্বাধীনতা প্রভাবের জননী; অধীনতা সততই অভাব প্রসব করে। প্রভাবের সহচর সুখ ও উন্নতি; অভাবের সহচর দুঃখ ও অবনতি। ইংলণ্ড স্বাধীন, তাহার সর্ব্বাঙ্গই প্রভাব অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত; ভারত অধীন, তাহার সর্ব্বাঙ্গ অভাব ভূষণে ভূষিত; কিন্তু প্রভাব ও অভাব এ উভয়ের কেহই সহচর শূন্য নহে। যাহা হউক, ইংলণ্ডের অলঙ্কার স্বর্ণ, হীরা, মতি প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত; এবং পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত সমুদয় অঙ্গই সুসজ্জিত। কিন্তু ভারতের তাহা নয়। তাহার অলঙ্কার লৌহ নির্ম্মিত; এবং তাহা গলদেশে, কটিদেশে, হস্ত ও পদে দৃঢ় রূপে বাঁধা। এই বিভিন্নতায় কেহই বিস্ময় প্রকাশ করিবেন না। ইহাতে খেদ করিবারও কোন কারণ নাই। কেন না শাস্ত্রে লেখা আছে। বিশেষ এ অলঙ্কারও ধাতু নির্ম্মিত বটে।

মনুষ্য জাতির হৃদয়ের গতি স্বাধীনতার দিকেই অগ্রসারিণী; সে সেই অনন্ত পথে ছুটিতেই যত্নবান। মানবের বহিরাবরণ শরীর, যত কেন অধীনতার সুদৃঢ় শৃঙ্খলে পরিবদ্ধ হউক না, হৃদয় তাহাতে বাধ্য হইতে চায় না। সে অবসর পাইলেই, স্বাধীনতার পথে গতিমান হয়। এই গতি অনন্ত শক্তি-শালিনী; ইহা হইতেই সংসারে রাষ্ট্রবিপ্লবের সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। জগতের প্রত্যেক জাতির ইতিহাস ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুতরাং জীবের পক্ষে স্বাধীনতাই সুখ; অধীনতাই দুঃখ। জীব ভ্রম বশতও একবার দুঃখ চিন্তা করে না। সে সততই সুখ চিন্তায় রত থাকিয়া, ভবিষ্যতের প্রসন্নমূর্ত্তি ধ্যান করিতেছে।

যাহারা স্বাধীন, তাহারাই প্রভাবশালী ও প্রকৃত সুখী। প্রভাব—সুখ, সৌভাগ্য, উন্নতি প্রভৃতি সততই আকর্ষণ করিয়া থাকে। সংসারে রাজপদই স্বাধীনতার আস্পদ; রাজা স্বাধীন। সুতরাং সংসারে রাজাই প্রভাবশালী ও প্রকৃত সুখী। মানবের এই সংস্কার নিতান্ত ভ্রান্ত। ইংলণ্ড, স্বাধীনতার পূর্ণ নিকেতন; সেই ইংলণ্ডের রাজা পূর্ণ স্বাধীন হইয়াও জন সাধারণ শক্তিরূপিনী মহাসভার একান্ত অধীন। সুতরাং সংসারে রাজা হইতে কৃষক—সকলেই মানব সাধারণের পারস্পারিক অধীনতায় দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ। ঐ যিনি ত্রিতল প্রাসাদোপরি স্বর্ণময় সিংহাসনে উপবেশন করিয়া কোটি কোটি লোকের শুভাশুভ চিন্তা করিতেছেন, যাঁহার এক একটি বাক্যে কোটি লোকের অদৃষ্ট-চক্র সূর্য্যমণ্ডল হইতেও ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, আবার কোটি লোকের অদৃষ্ট-চক্র রসাতল হইতেও নিম্নাভিমুখে গড়াইয়া পড়িতেছে; আর ঐ যে বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রে তাপিত কলেবর হইয়া কৃষক ভূমি কর্ষণ করিতেছে; শ্রাবণের বৃষ্টিধারায় অভিষিক্ত হইয়া জানু পর্য্যন্ত কর্দ্দমে প্রোথিত করিয়া, ধান্য রোপণ করিতেছে; উভয়েই জনসাধারণের অধীন। এই অধীনতা ভিন্ন মানব, সংসারে দুই তিন দিনের অধিক অবস্থিতি করিতে সক্ষম হয় না। যিনি সাংসারিক সুখের ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকেই এই অধীনতার চরণে আত্ম সমর্পণ করিতে হইবে। বস্তুত রাজা হইতে কৃষক—সকলেই জন সাধারণের পারস্পারিক অধীনতা সূত্রে সংবদ্ধ হইয়া, সংসার চক্রে ঘূর্ণায়মান হইতেছেন। সুতরাং রাজপদ অধীনতা শূন্য নহে; এবং অধীনতা হইতেও কেবল দুঃখের উৎপত্তি হয় না। জনসাধারণের পারস্পারিক অধীনতা, সততই জন সাধারণের সুখ, সৌভাগ্য ও উন্নতি সংসাধনে রত আছে। এই অধীনতা হইতেই প্রকৃত স্বাধীনতার সমুদ্ভব হইয়া থাকে। সামাজিক শক্তি সংগঠনে, কি জাতীয় উন্নতি সংসাধনে এই অধীনতাই প্রধান উপাদান। সুতরাং অধীনতা হইতেই মানব জাতির যাহা কিছু সুখ, সৌভাগ্য এবং উন্নতি। জন সাধারণের পারস্পারিক অধীনতা হইতে সমাজে কার্য্য শক্তির পরিপুষ্টি হয়; এই পরিপুষ্টির মাত্রানুসারে জাতীয় উন্নতি সংসাধন হইয়া থাকে। সুতরাং মানব মাত্রেই অধীন অথচ তাহারা অধীনতাকে কৃতান্ত তুল্য ভয় করিয়া থাকে। ইহার কারণ কি? যে অধীনতা জাতীয় উন্নতি বিধায়িনী, তাহাকে মানবজাতি কেন ভয় করিয়া থাকে? তাহার নামে কেন অযুত হস্ত দূরে পলাইয়া যায়? ইহার কারণ,

মানবের অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, অস্বাভাবিক স্বার্থ এবং পাশব-শক্তির পূর্ণাভিনয়। এই জন্যই কি, মর্ম্মর-প্রস্তর-রচিত অট্টালিকা-বাসী ধনী, কি পর্ণকুটীর বাসী দরিদ্র কৃষক, কি বৃক্ষতলাশ্রয়ী অনাথ ভিক্ষুক—সকলেই অধীনতার নামে শিহরিয়া উঠে? কিন্তু উঠিলে কি হয়? মানব চিরদিনই মানবের অধীন থাকিবে।

জনসাধারণের পারস্পারিক অধীনতা হইতে স্বাধীনতার উৎপত্তি। এই স্বাধীনতা হইতে প্রকৃত সুখ, প্রকৃত সৌভাগ্য, এবং প্রকৃত উন্নতি প্রসূত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতার সংস্পর্শে সর্ব্ব সুখময়ী স্বাধীনতা, অনন্ত দুর্গতিময়ী অধীনতায় পরিণত হইয়া, জনসাধারণের স্বার্থ হরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সুতরাং স্বার্থাপহারী অধীনতাকে, স্বার্থ-প্রাণ মানব কেন ভয় না করিবে? একই পূর্ণচন্দ্রের প্রাণতোষিণী শান্তিময়ী কৌমুদী ধারায় ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ শান্তি সুখ সম্ভোগ করিয়া, প্রাণ শীতল করিতেছে। কিন্তু সেই কৌমুদীই—ইংলণ্ডে কেমন উদারশালিনী অমৃতময়ী; ভারতে কেমন সঙ্কুচিতা বিষবর্ষিণী! যে ইংলণ্ডের স্বাধীনতাই প্রাণ, সেই ইংলণ্ডই ভারতে এইরূপ স্বাধীনতার অপব্যবহার করিতেছেন। অন্যে পরে কা কথা। অহো স্বার্থ! তোমার স্পর্শে অমৃতও বিষে পরিণত হয়! সংসারে তুমিই ধন্য!

আপাতত দেখা যায়, এই পৃথিবীতে যে সম্প্রদায়, যে পরিমাণে সাধারণের অধীন, সে সম্প্রদায় জনসমাজে তত দুঃখী বলিয়া গণনীয়। সুতরাং কৃষকেরা, মধ্যবিত্তদিগের অশন, বসন দর্শন করিয়া, আপনাদের অপেক্ষা তাঁহাদিগকে অধিক সুখী বিবেচনা করে; আবার মধ্যবিত্তেরা ধনীদিগের বিলাসের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য সততই ব্যস্ত সমস্ত। এবং ধনীরা আবার রাজা হইবার জন্য সর্ব্বদা লোলুপ। এইরূপ সকলেই নিজ নিজ অবস্থাকে দুঃখময় বিবেচনা করিয়া রাজা হইতে ইচ্ছা করে। কেননা রাজা স্বাধীন; তিনি কাহারও অধীন নহেন; সুতরাং তিনিই জগতে প্রকৃত সুখী। কিন্তু ইহা ভ্রান্তি মাত্র। সংসারের দুরারাধ্য রাজপদও অধীনতাশূন্য নহে, এবং তাহাতে বিষাদ বিপত্তিরও অভাব নাই। সুতরাং জগতে সকলেই সকলের অধীন এবং দুঃখ চিহ্নে চিহ্নিত। জনসাধারণ, রাজার অধীন; রাজা, জনসাধারণের অধীন। উভয়ের জীবন স্রোতই না জানি কত বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া, সংসারসমুদ্রে প্রবাহিত হয়! সুতরাং প্রকৃত সুখ কোথায়? মহারাজাধিরাজ রামচন্দ্র, সাধারণের ভয়ে অভিভূত হইয়াই, দেহার্দ্ধভাগিনী প্রাণ-

প্রতিমা জানকীকে বনবাসিনী করিলেন এবং চিরদিন দুর্নিবার বিরহানলে দগ্ধীভূত হইয়া "রাজপদ—বিড়ম্বনার আস্পদ!" বলিয়া, বনবাসী হইতেও ইচ্ছা করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, রাজগৌরবে এক সময়ে পৃথিবীকে ত্রাসিত ও কম্পান্বিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুত তিনি সাধারণের একজন অধীন ভৃত্য মাত্র ছিলেন! যেই প্রভুরা রাগান্বিত হইলেন, অমনি তাঁহাকে রাজপদ পরিত্যাগ করিয়া, পথের ভিখারী হইতে হইল। কৃষক, পাঁচ জনের অধীন; মধ্যবিত্ত, দশজনের অধীন; ধনী, শত জনের অধীন; কিন্তু রাজা ও রাজপদ, কোটি কোটি লোকের অধীন। সুতরাং রাজত্ব অধীনতার নামান্তর—এবং অধীনের নামান্তর—মহারাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী। যিনি সাত কোটি লোকের বিধাতৃ-পুরুষ, সেই ইংলণ্ডের সচিব শ্রেষ্ঠও জন সাধারণের একান্ত অধীন জন সাধারণের ভয়ে অতিশয় সতর্ক। কেন না, জন সাধারণের সন্তোষে তাঁহার উৎপত্তি এবং তাহাদের ভ্রুভঙ্গিতে তাঁহার বিলয়। রাজনীতি-চতুর বীকন্স্‌ফীল্ডের তিরোধানই ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

জগন্মণ্ডলে যত প্রকার নৃশংস ও ঘৃণার্হ কার্য্য আছে, রাজপদ প্রত্যাশায় মানবমণ্ডলী অম্লান বদনে তাহা সম্পাদন করিতে পারেন। ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্মময় যুধিষ্ঠির, রাজ্যলোভে প্রমত্ত হইয়া, বহুসংখ্যক আত্মীয় বান্ধবের জীবন সংহার ব্রতে দীক্ষিত হয়েন। ভারতের ক্ষত্রিয় কুল নির্ম্মূল হইতে লাগিল, কুরুক্ষেত্র আর্য্য শোণিত প্রবাহে প্লাবিত হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির সেই পবিত্র শোণিত স্রোতে পদদ্বয় বিধৌত করিয়া, সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। কিন্তু দেখিলেন না, যে সেই আর্য্যশোণিত তরঙ্গে—আর্য্য জাতীয় শক্তি ভাসিয়া যাইতে লাগিল। দেখিলেন না।—সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। ভাবিলেন—এই দিন এই ভাবেই যাইবে। মহা সমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। সেই অপরিণামদর্শিতার ফলে—রাজ দোষে রাজ্য নষ্ট হইল! নিষ্কলঙ্ক ভারত ললাট পটে, "হিন্দুস্থান—বৃটীশ ইণ্ডিয়া"—যুগল কলঙ্ক চিহ্ন ধারণ করিলেন! ভাগ্যে আরও কি আছে, কে বলিবে? মহম্মদ সাহা, রাজ্য মদে মত্ত হইয়া, পরমারাধ্য পিতার জীবন সংহার করিলেন! মহা প্রতাপশালী সম্রাট আরঙ্গীব, দিল্লীর রাজদণ্ড পাইবার জন্য পরম স্নেহাস্পদ ভ্রাতা, এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে স্বকীয় রাক্ষসিক শক্তি সমীপে বলিদান দিলেন! অনন্ত ভক্তিভাজন দেবতাকল্প জন্মদাতা পিতাকে কারা

বন্দী করিলেন! কি পৈশাচিক আকাঙ্ক্ষা! কি রাক্ষসিক লোভ! এই আকাঙ্ক্ষা স্রোতে—এই লোভ তরঙ্গে মহা-প্রাণ—ধর্ম্মাত্মা ভারত কত হাবু ডাবু খাইল! এইরূপ অনেক মহাত্মাই রাজপদ প্রাপ্তির আশায়, মনুষ্যত্বের পবিত্র সম্পদে পদাঘাত করত, হিতাহিত—ধর্ম্মা ধর্ম্ম—পাপ পুণ্য বিচার পরিশূন্য হইয়া, কত আসুরিক কার্য্য,—প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে সম্পাদন করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছে, সকল মনুষ্যই অধীনতার বিদ্বেষী; তবে ঐ সকল মহাপুরুষেরা, কি জন্য দিগ্বিদিগ্ জ্ঞান শূন্য হইয়া, অধীনতাময় রাজপদ লাভ করিতে এত উৎসুক হইয়াছিলেন? ইহার কারণ—তাঁহারা অধীনতার বিদ্বেষী নহেন। অপরের নিকট অধীনতার কুৎসা শুনিবামাত্র মুখে তাহার ক্ষণিক নিন্দা করিয়া থাকেন, অন্তরে কিন্তু অধীনতারই বিশেষ পক্ষপাতী! অধীনতা জগৎ হইতে অন্তর্হিত হয়, ইহা তাঁহারা ক্ষণকালও মনে ধারণ করিতে পারেন না। সুতরাং রাজগণ স্বাধীনতারই চির-বিদ্বেষী। যখন ইংলণ্ডে মহাসভা পার্লেমেণ্টের সহিত শাসন কর্ত্তা ক্রমওএলের বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন ক্রমওএল মহোদয় অপূর্ব্ব চাতুরী জাল বিস্তার করিয়া, বেয়ারবোনের পার্লেমেণ্ট হইতে সমুদায় রাজশক্তি স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক অম্লান বদনে ইংলণ্ডের স্বাধীনতা হরণ করিলেন। যখন দুর্দ্ধর্ষ ফরাশী জাতি, ষোড়শ লুইর প্রাণ সংহার করিয়া, ফ্রান্সে সাধারণ তন্ত্র প্রণালী সংস্থাপন করে, তখন ইউরোপীয় রাজগণ তদ্বার্ত্তা শ্রবণে একবারে রাগান্ধ হইয়া উঠেন। এবং নর শোণিত পিপাসু ভীষণ ফরাশীদিগকে নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে প্রুসীয়, ওলন্দাজ, জর্ম্মন, ইংরাজ প্রভৃতি মহা পরাক্রান্ত রাজ্যের সৈন্যসামন্ত সমর সাগরে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী রণজয়ী ফরাশী সামন্ত বাহিনী সমীপে পুনঃ পুনঃ প্রহারিত হইয়া, রোদন করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করে। তখন ফরাশী সেনানী নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বুদ্ধি কৌশলে অনেক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন; সুতরাং ফরাসী সেনা তাঁহার প্রতি একান্ত ভক্তিমান হইয়া উঠে। চতুর চূড়ামণি বোনাপার্ট এই সুযোগে সৈন্যদিগকে হস্তগত ওপ্রবোধিত করিয়া, প্রথমত ফ্রান্সের কনসল পদে বরিত হন। অনন্তর ক্রমে ক্রমে জন সাধারণের স্বাধীনতা হরণ করিয়া সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। অতএব রাজগণ, কি রাজ পুরুষগণ কেহ কখনই স্বাধীনতার পক্ষাবলম্বী নহেন। তাঁহারা অধীনতা মহাদেবীর একান্ত অধীন এবং মন্ত্রশিষ্য।

অনেকে প্রকৃত স্বাধীনতায় ও অধীনতায় কিপ্রভেদ, তাহা নির্ণয় করিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাঁহারা প্রচুর ঐশ্বর্য্য ও অতুল প্রভাবকেই স্বাধীনতার কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন; সুতরাং সম্পদশালী ও প্রভাববান ব্যক্তি-কেই যে লোকে স্বাধীন বলিয়া অনুমান করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মনুষ্যের দুর্ভাগ্য বশত, বিধাতা ধনে, কি পদে স্বাধীনতারূপ প্রকৃত সুখ সমর্পণ করেন নাই। যদি বৈভব ও সম্পদই স্বাধীনতার মূল হইত, তবে জগতে দুঃখ রূপ ভীষণ রাক্ষসেরা অহরহ বিচরণ করিত না। জগৎ নিরাপদে সুখের সুধাময় নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিত।

এখন একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে জগতের দরিদ্র কৃষক হইতে বিভব-শালী রাজা পর্য্যন্ত সকলেই যদি অধীন, তবে কি জগতে কেহই স্বাধীন নাই? আমরা বলি আছে। যিনি স্বকীয় জীবনকে বিবেকোপদানে গঠিত করিয়া, তাহার মধ্য বিন্দুতে ঈশ্বরের পবিত্রোজ্জ্বল সিংহাসন সংস্থাপন করিতে পারেন; ন্যায় পথাবলম্বনে এবং হৃদয়ের সৎ প্রবৃত্তি সমূহেরই বশীভূত থাকিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারেন, আর যিনি কার্য্য ক্ষেত্রের অযুত বাধায়, অযুত অত্যাচারে, কি সংসারের অনন্ত প্রলোভনে স্বকীয় পবিত্র আত্মার অতৃপ্তি জনক কার্য্যে একবার পাদস্পর্শও করেন না— এই পৃথিবী মণ্ডলে তিনিই প্রকৃত স্বাধীন; সুতরাং প্রকৃত সুখী। স্বাধীন মহাপুরুষ, রাজা কি রাজপুরুষ, দস্যু, কি অত্যাচারী হইতে ভীত বা প্রলোভিত হন না। কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার ইচ্ছা সর্ব্বদা ফলবতী। উৎকণ্ঠা, অবসাদ, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি তাঁহার হৃদয়-রাজ্য হইতে লক্ষ হস্ত দূরে অবস্থান করে। তিনি হিমাচলের ন্যায় অটল ভাবেই জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য পথে অগ্রসর হন; সংসার তাহাতে বাধা দান করিতে সমর্থ হয় না। কারণ তাঁহার হৃদয় পূর্ণ-স্বাধীন, পূর্ণ প্রভাবময়। এই স্বাধীনতা ও প্রভাব সমীপে পাশব শক্তির আতঙ্কময়ী ঘোর কৃষ্ণ ছায়া কোন দিনও পরিস্ফুট হইতে পারে না। পবিত্র ন্যায় ও পবিত্র বিবেকের উজ্জ্বল আলোকে সে সততই সমুজ্জ্বল হয়; সুতরাং অভাবের বিষাদময়ী ছায়া তাহার লক্ষ হস্ত দূরেও অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। অভাবের অভাবে তাঁহার মুখমণ্ড-লের প্রসন্ন জ্যোতি সংসারের কোন উত্তাপেই নিষ্প্রভ করিতে পারে না। তিনি গৃহাভাবে পর্ব্বত গহ্বরে বাস; বস্ত্রাভাবে বল্কল পরিধান; খাদ্যাভাবে

জলবিন্দু পান করিয়াও ন্যায় ও বিবেক মণ্ডিত প্রভাব বলে সততই স্বর্গীয় বিমলসুখ, বিমল শান্তি অনুভব করেন। অদীনসত্ব খৃষ্ট, মহাত্মা শাক্য সিংহ, প্রেমময় চৈতন্য, ধর্ম্মপ্রাণ জীমূত বাহন, মহাপ্রাণ বন্ধু প্রভৃতি দেবোপম মহাপুরুষগণ ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু রাজ্যেশ্বর রাজা, সুবর্ণ খচিত শ্বেত প্রস্তরময়ী সৌধাবলীর অন্তর্ভাগে দুগ্ধফেণ-নিভ কোমল শয্যায় উপবেশন করিয়া এবং জগতের উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় সামগ্রী সম্ভার ভক্ষণ ও কিন্নর-কণ্ঠী গায়িকাদলের মধুময়ী সঙ্গীত সুধা আকণ্ঠ পান করিয়াও অভাবের তীব্র দংশন হইতে নিস্তার পান নাই। কারণ, যে স্বাধীনতা পাশব-শক্তির ক্রিয়া হইতে মুক্তি লাভ করে নাই, তাহার প্রভাবেও যে পাশব শক্তির লীলা তরঙ্গ ছুটিয়া বেড়াইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? যেখানে পাশব শক্তির রাজত্ব, সেখানে ন্যায় ও বিবেকের সততই অপমান, সততই লাঞ্ছনা। ন্যায় ও বিবেকের হতাদরে আত্মার পবিত্র সন্তোষ অপনীত হইয়া দুরাকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি হয়; সুতরাং তাহাতে অভাবেরও উৎপত্তি। যেখানে অভাবের কিঞ্চিন্মাত্রও ছায়া পরিস্ফুট হয়, সেখানে দুঃখের নিত্য বসতি; যেখানে দুঃখের নিত্য বসতি, সেখানে সুখ শান্তির নিত্যই অভাব। সুতরাং জগতের রাজগণ, ন্যায় ও বিবেক ভূষিত পবিত্র স্বাধীনতা, পবিত্র প্রভাব সম্ভূত পবিত্র সুখ শান্তির কণা মাত্রও সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন না। মহামহিম রুষিয়াধিপতি প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের সার্ব্বভৌম অধীশ্বর হইয়াও, শান্তি সুখ বিহীন। অনন্ত উৎকণ্ঠা, অনন্ত বিষাদ, অনন্ত দুশ্চিন্তা প্রভৃতির গভীর হ্রদেই সতত মুহ্যমান। সেই হ্রদের অগ্নি তরঙ্গে হাবু ডাবু খাইয়া, "ত্রাহি ত্রাহি" করিতেছেন। ন্যায় ও বিবেক বর্জ্জিত স্বাধীনতার পাশব শক্তিময় প্রভাব আর তাহার রাজত্ব,—এ উভয়েরই পরিণাম ঐরূপ "ত্রাহি ত্রাহি।" অনন্ত দুরদৃষ্ট! এবং অনন্ত পরিতাপ!' অতএব রাজপদের পরিণাম—অধীনতা, এবং সেই অধীনতা আবার দুর্ব্বিসহ দুঃখের প্রসূতি।

জাহ্নবী তীরে।

কেন দেখিলাম গঙ্গে! আবার তোমায়,
দেখিব না এ জনমে বলেছিনু যায়;
আবার তোমার তীরে, বিহরিয়া ধীরে ধীরে,
বসন্ত সায়াহ্ন শোভা কেন দেখিলাম!
কেন সে প্রসন্ন নীরে পুন ডুবিলাম।

পুন রুদ্ধ বাসনার তরঙ্গ হিল্লোলে,
ছুটিল চিন্তার স্রোত সুমন্দ কল্লোলে।
যথা তুমি কল কলে, উথলিয়া কুতূহলে,
ছুটেছ অনন্ত পথে অনন্ত গামিনি!
এ হৃদে অনন্ত চিন্তা বহিল অমনি।

জাগিল অনন্ত চিন্তা চঞ্চল মানসে,
কি দিয়া রোধিব দেবি! বাঁধি কোন্ পাশে?
সেতুবন্ধ নাহি মানে, শৃঙ্খল সহে না টানে,
দুরন্ত দুর্ব্বার বেগে ভাসিল সংসার,
ভাসিল সে ঐরাবত পর্ব্বত আকার।

ভেবেছিনু ভাগীরথি! ভুলিয়া তোমায়,
ভুলিয়া অনন্ত চিন্তা, সংসার কারায়
শৃঙ্খলিয়া মত্ত চিতে, সমাজ স্বজন হিতে,
লোকালয় পৃথিবীতে থাকিব মগন।
তোমার তরঙ্গ ভঙ্গে ভাঙ্গিল বন্ধন।

ঐ যে তোমার তটে সান্ধ্য সমীরণ,
ঐ যে তোমার মাথে নক্ষত্র কিরণ,
এ দুয়ে গরল আছে, যে জানে, সে বুঝিয়াছে;
সমীরণ কাণে কাণে কহে সেই কথা,
নক্ষত্র কাঁপিয়া কহে সঙ্কেত বারতা।

আবার নক্ষত্ররাশি তোমার উরসে,
সুবর্ণ অক্ষরে অই কি ভাষা প্রকাশে?
ও যে অনন্তের লেখা, তাই তোর হৃদে রেখা;
ও ভাষা জাহ্নবী আজ দাও বুঝাইয়া;
দিব্য চক্ষু দেহ দেবি দেখিব পড়িয়া।

দেখিব বুঝিয়া তোর মরম ভিতরে,
কলঙ্কিত তনু শশী লুকায়ে কি করে;

পবিত্র তোমার নীরে, দেহ প্রক্ষালন করে,
ঘুচায়ে কলঙ্ক কি মা কলুষ নাশিনি ?
কিছুই বুঝি না আমি বুঝাও জননি।

না বুঝিয়া তবু কেন মাতে মত্ত হিয়া ?
প্রকৃতি সংহিতা মাত দাও বুঝাইয়া ;
কিবা গুহ্য বীজ মন্ত্রে, লুকায়েছ হৃদি যন্ত্রে,
দেখিব অন্তরে পশি ভেদিয়া অতল,
দেখিনু তোমায় যদি, দেখিব সকল।

দেখিব কেন মা তুমি কল কল গাও,
দেখিব অনন্ত পদে কি ব্যথা জানাও ;
দেখিব তোমার তটে, ভাঙ্গা ঘাটে পোড়া কাঠে,
বিকট শ্মশান ঘটা শোভিছে কেমন,
শ্মশান-রঙ্গিণি তোর শ্মশান ভূষণ !

শ্মশানে সেজেছে ভাল দুকুল তোমার,
পতি যে শ্মশান বাসী ত্রিপুর-সংহার ;
চিতা ভস্ম মাখি কায়, হাড় মালা দুলে তায়,
পতি মনোমত বেশে তাই মা সেজেছ !
দুপাশে পতির প্রীতি পুলকে সাধিছ ?

দু তটে চিতার শিখা জ্বলে হু হু রবে ;
হেরি হর প্রেমে বুঝি হাসিছ গরবে ?
তুই না করুণাময়ী, জীব দুঃখে দ্রবময়ী,
কেমনে বুঝিব গঙ্গে এ রঙ্গ তোমার,
অচিন্ত্য দেবতা লীলা বুঝে সাধ্য কার ?

এ কি মা ! সহসা কেন হেরি রূপান্তর,
আবর্ত্ত ভ্রূকুটি আঁখি রোষে থর থর ;
আছাড়ি তরঙ্গ কর, গরজিয়া ঘোরতর,
দাপটে দুকুল ভাঙ্গি ছুটিলে জাহ্নবি !
ভাঙ্গিলে অন্তরে তারা শশধর ছবি !

ক্ষম সুরধুনী দাসে বুঝিনু এবার,
ভকতে ভীষণ কোপ কর পরিহার ;
বুঝিনু তোমার কাজ, বুঝিনু শ্মশান সাজ,
বুঝিনু কেন মা তুমি হয়ে পাগলিনী,
সাজিয়াছ চিতাভস্মে চির সন্ন্যাসিনী।

নর কঙ্কালের ভার বহিয়া হৃদয়ে,
জীবের বিনাশ বার্ত্তা বিষাদে গাহিয়ে,
কাতর তরল দেহে, অসীম অনন্ত স্নেহে,
অনন্ত আবাস ধাম অনন্ত সাগরে,
শত মুখে কত কথা কহ কল স্বরে।

অনন্ত যাতনাময় জীবের জীবন,
পাপ তাপ ব্যাধি জরা তাহে অনুক্ষণ;
এ মহী নরক ধাম, নাহিক সুখের নাম,
বিধির বিলাসক্ষেত্র কিম্বা লীলাস্থল,
দুরন্ত শাসনে প্রাণী করে কোলাহল।

দেখিছ তুমি মা নিত্য তোমার সৈকতে,
পুড়িছে অসংখ্য প্রাণী শমন আঘাতে;
ধরিত্রী রতন রাশি, নাশে কাল দিবানিশি,
অকালে অমূল্য ধন লইছে কাড়িয়া,
পাপিষ্ঠে পূরিল ধরা দেখে না চাহিয়া।

গুণবতী সাধ্বী সতী অতৃপ্ত যৌবনে,
হারাইয়া পতিরত্ন তোমার পুলিনে,
জ্বলন্ত অনল কোলে, ঝাঁপ দিয়া কুতূহলে,
চিতানলে চিন্তানল করিছে নির্ব্বাণ,
অচিন্ত্য অতুল দৃশ্য অপূর্ব্ব মহান!

দেখিছ তোমার তটে শমনের খেলা,
দেখিছ পুড়িছে শিশু, অজ্ঞান, অবলা;
আবার জীবন্ত প্রাণী, কাঁদিয়া কহিছে বাণী,—
অসহ্য যন্ত্রণানলে মরমে মরিয়া,
"মাতর্গঙ্গে লও ত্বরা করুণা করিয়া।"!

অনন্ত বিষাদ ছবি হেরি অবিরত,
সরল তরল প্রাণে কাঁদিছ নিয়ত;
শুনি নিত্য হাহাকার, তরল শরীর ভার
ঢল ঢল কল কল সাগরে ঢালিছ,
অস্থির চঞ্চল গতি উধাও ধাইছ।

অন্তরে অনল-কণা * শিরায় শিরায়,
উঠিছে ফুটিয়া তনু অই দেখা যায়;

---

* নক্ষত্র রাজি।

হৃদয় অনলাকার,† মাঝে মলিনতা তার,
বুকে কাল মেঘ ছায়া ঘোর দরশন,
হুহু রবে দীর্ঘ শ্বাস বহে ঘনে ঘন।

তুমিই করুণাময়ী এ বিশ্ব মাঝারে,
নহিলে প্রকৃতি অতি নিষ্ঠুরা সংসারে;
জীব দুঃখে নাহি দয়া, সাজায়ে আপন কায়া,
হাসে ফুল, দোলে লতা, গায় সমীরণ,
অসাড় অচল রাজ শ্যামাঙ্গ শোভন।

হ্যাদে রে কুমুদীকান্ত কলঙ্কী চন্দ্রমা,
ক্ষয়শীল তনু যার, মাসান্তে পূর্ণিমা;
সেও দেখ হাসি হাসি, সুনীল অম্বরে বসি,
রূপের গরবে যেন সদাই বিহ্বল,
জীবদুঃখে কভু আঁখি নহে ছলছল।

কিন্তু মা তোমার তটে জুড়ায় পরাণী,
শ্মশান তোমার সজ্জা,* তুমি সন্ন্যাসিনী;
বিহরিয়া তব তীরে, পুলকে প্রেমাশ্রু ঝরে,
সংসার থাকে না মনে; শোভার ভাণ্ডার—
তুমি সে শোভার শোভা সকলের সার।

সংসারের শোক তাপ মালিন্য বিশাল,
ধুইয়া বহিয়া তুমি ঘুচাও জঞ্জাল;
প্রাণান্তে প্রাণীর কায়, ভস্মশেষ হলে হায়,
পবনে উড়ালে তায়, মাথ তুমি অঙ্গে,
ঘৃণা তব নাই কভু কৃপাময়ি গঙ্গে!

হেরিলে তোমার ওই পাগলিনী বেশ,
থাকে না সংসার প্রতি মমতার লেশ;
উধাও উদাস প্রাণ, কেন করে আন্‌থান,
নির্ম্মম নিষ্ঠুর চিত্ত সমাজ দুর্ব্বার,
মনে হয় এ জনমে করি পরিহার।

দেখি নাই বহুদিন জাহ্নবী তোমায়,
দেখিলে অনন্তভাবে প্রাণ ভরি যায়;
মনে হয় তব সাথে, ছুটিব অনন্ত পথে,
এহৃদে অনন্ত ব্যথা কেন জাগালাম!
দেখিলে বিহ্বল যারে, কেন দেখিলাম!

---

*

† চন্দ্র।

নবজীবন।

১ম ভাগ। } চৈত্র ১২৯১ { ৯ম সংখ্যা।

পৌত্তলিকের শক্তিপূজা।

যাহার যে শক্তি নাই, সে চিরকাল সেই শক্তিকেই অবনত মস্তকে পূজা করিয়া আসিতেছে, দুর্ব্বল অবনত মস্তকে বলবানের শরণাপন্ন হইতেছে, দরিদ্র সজ্জন ধনবানের আশ্রয় লইতেছে, হীন-জ্ঞান শিষ্য অভিজ্ঞ গুরুকে মান্য করিতেছে, শূদ্র ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিতেছে। সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র বল চিরকাল বৃহৎ বলের আনুগত্য করিতেছে। অল্প বিস্তর শক্তি সকলেরই আছে সত্য, কিন্তু যে শক্তি সকল পদার্থে বা সকল লোকে সমভাবে বিদ্যমান, তাহার কেহ আদর করে না—অসাধারণত্ব ব্যতিরেকে মনুষ্যের নিকট কিছুই শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান বা ভয়ের বিষয় হইতে পারে না। এই কারণে, যে সকল জড় পদার্থ অন্য পদার্থ অপেক্ষা অধিক শক্তি বিশিষ্ট, তাহা প্রথমে মনুষ্যের পূজ্য হইল। ধর্ম্মবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এই জন্য নির্দ্দেশ করেন যে, প্রথমে লোকে জড়োপাসক ছিল। অথচ সভ্য জগৎ জড়োপাসনাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকেন। কেন? তাহা আমরা জানি না।

একেশ্বর বাদীগণ পৌত্তলিকদিগকেও অপদার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। পৌত্তলিকতা কি? এক একটি ঐশ্বরিক শক্তির মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় সেই মূর্ত্তির সাহায্য গ্রহণ করা ব্যতীত অপর কিছুই নহে।

আমরা ঈশ্বরোপাসনা করি কেন? ন্যায়, সত্য, শান্তি প্রভৃতি যে সকল

গুণ ঈশ্বরে আরোপিত হয়, যাহাতে আমরা তৎসমস্তের অধিকারী হইতে পারি, তাহার জন্যই আমরা ঈশ্বরের গুণগ্রাম ধ্যান করিয়া থাকি।

কি জড়োপাসক, কি পৌত্তলিক কেহই জড়ের বা পুত্তলের কেবলমাত্র জড়ত্ব বা পুত্তলত্বের পূজা করে নাই। সকলেই জড় ও পুত্তলের অন্তর্নিহিত অসাধারণ অজ্ঞেয় শক্তির পূজা করিয়াছে। জড়োপাসক যখনই কোন জড়ের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে, তখনই তাহার মনে সেই জড়ের অন্তর্গত এক অব্যক্ত শক্তির ভাব উদয় হইয়াছে। পৌত্তলিক তাহার উপাস্য মূর্ত্তিতে যে শক্তির আরোপ করিয়াছে, সেই শক্তির ভাবই তাহার মনে, সেই পুত্তলিকাকে পূজা করিবার সময় উদয় হইয়াছে। কোন্ জড়ে কোন্ শক্তি নিহিত আছে বা কোন্ পুত্তলিকায় কোন্ গুণের আরোপ করা হইয়াছে, এ বিষয়েও যাহারা অজ্ঞ, তাহারাও উহাদিগকে পূজা করিবার সময় এক প্রকার অব্যক্ত ভয়, ভক্তি, বা প্রীতির বশীভূত হইয়া উহাদিগকে পূজা করিয়াছে। এই ভাবই প্রকৃত দেবার্চ্চনার ভাব—ইহাই স্বর্গীয়। ফলত ইহাকেই ঈশ্বরের প্রকৃত উপলব্ধি বলা যাইতে পারে। যদি বিবেচনা করা যায় যে, ঈশ্বর জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, একেশ্বরবাদী যে উদ্দেশ্যে ঈশ্বর উপাসনা করিয়া থাকেন, পৌত্তলিক বা জড়োপাসক সেই উদ্দেশ্যেই মূর্ত্তি বা জড় পূজা করিয়া থাকে। মনুষ্য-হৃদয় চিরদিনই উপকারের জন্য কৃতজ্ঞ—একেশ্বরবাদী যেমন কৃতজ্ঞ, জড়োপাসক বা পৌত্তলিকও তদ্রূপ। এই জন্য যে যে জড়ের দ্বারা মনুষ্য প্রথমে উপকৃত হইয়াছে, সেই সেই জড় নিহিত শক্তিকেই পূজা করিয়াছে—পৌত্তলিকতায় কেবল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শক্তির আরোপ,—আর জড়োপাসনায় সেই জড়েই শক্তির কল্পনা; নতুবা এতদুভয়ে আর কোন বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। গুণ চিরকালই মনুষ্যের আদরণীয় ও অনুকরণীয়; সুতরাং যাহাতে যে গুণ দেখিয়াছে, সে তাহারই আদর করিয়া তাহার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। যে গুণ মনুষ্য দেখে নাই অথচ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে, সে তাহা কল্পনা করিতে ত্রুটি করে নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, একেশ্বরবাদীগণ যে উদ্দেশ্যে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকেন, পৌত্তলিকেরা সেই উদ্দেশ্যেই পুত্তলিকার পূজা করিয়া থাকে।

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যেমন পৌত্তলিক ও একেশ্বরবাদীর মধ্যে ঐকমত্য

দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরজ্ঞান সম্বন্ধেও তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। ঈশ্বরের স্বরূপ কে কবে অবগত হইতে পারিয়াছেন? যিনি অধিক জানিয়াছেন, তিনি এই মাত্র জানিয়াছেন যে, ঈশ্বর অজ্ঞেয়। পৌত্তলিকও তাঁহাকে অজ্ঞেয় বলিয়া জানিয়াছে—পৌত্তলিক তাঁহার গুণের বা শক্তির সীমা নির্দিষ্ট করে নাই। জড়োপাসকের বা পৌত্তলিকের দেবতা একটি নহেন। শক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন জড়ের পূজা প্রচলিত হইয়াছে, গুণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন পুত্তলিকার পূজা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কোন্ গুণের সাধনা কি প্রকারে করিতে হয়, তাহারও পৃথক্ পৃথক্ উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে—কালী পূজার মন্ত্র শিব পূজায় ব্যবহৃত হয় না। একেশ্বরবাদীগণ যে অনন্ত, অচিন্ত্য, অব্যক্ত শক্তির আরাধনা করেন, পৌত্তলিকও তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকে; তবে প্রভেদ এই যে, এক জন এক ঈশ্বরে সকল গুণের আরোপ করে, অপর সাধনার সুবিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন অংশে সেই গুণ সকলকে বিভক্ত করিয়া একে একে ধ্যান ও ধারণা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহা কি পৌত্তলিকের অনুন্নত ভাব? আমরা তাহা স্বীকার করি না।

যদি সেই এক অনন্ত শক্তিকে বিভাগ করাই দোষের হয়, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে, কে সেই অনন্ত শক্তিকে অখণ্ড ব্রহ্ম স্বরূপে ধ্যান করিতে পারেন? যখনই জ্যোতিস্বরূপ বলিয়া তাঁহার ধ্যান করা যায়, তখনই কি তাঁহার চিন্ময়ত্ব ভাবটি সঙ্গে সঙ্গে মনে উদয় হয়? অভ্যাস গুণে শীঘ্র শীঘ্র দুই তিন বা ততোধিক শক্তির ভাব মনে উদয় হইতে পারে,তাহা স্বীকার করি; কিন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই এক শক্তি বহু রূপে মনে উদয় হইয়া থাকে এবং সেই একত্ব অসংখ্য ভাগে বিভাজ্যমান। পৌত্তলিক সকল শক্তিকে একেবারে অস্পষ্টভাবে ধ্যান ধারণা করিবার চেষ্টা প্রায়াস না পাইয়া এক এক করিয়া স্পষ্ট ভাবে ধ্যান ধারণা করিবার করিয়া থাকেন—জিজ্ঞাসা করি, কোন্ পথ প্রকৃষ্ট? সকল বিষয়ে অর্দ্ধশিক্ষিত হওয়া ভাল, কি এক বিষয়ে পণ্ডিত হওয়া ভাল? পৌত্তলিক এক বিষয়ে পণ্ডিত হইতে চাহেন—ইহা কি তাঁহার অনুন্নত অবস্থা? এক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে পৌত্তলিক যে অপর সাধনা আরম্ভ করিতে না পারেন, এমন নহে; কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন হয় না। এক বিষয়ে ঈশ্বরের সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইলেই বিষয়ান্তরের প্রয়োজন হয় না। সহস্র দ্বার দুর্গের এক দ্বার দিয়া প্রবেশ লাভ হইলে যেমন দ্বারান্তর দ্বারা যাইতে

আর প্রবেশ করিতে হয় না, তেমনই এক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইলে আর বিষয়ান্তরে সিদ্ধির প্রার্থী হইতে হয় না। কোন এক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইলেই সকল সিদ্ধি আয়ত্বাধীন হইয়া পড়ে। একেশ্বরবাদী সকল দ্বারেই ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, কোন একটি বিশেষ দ্বারের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য নাই; সুতরাং তাঁহার সিদ্ধি যে বিলম্বে লাভ হয়, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ইহা ব্যতীত সকল শক্তিই যে এক জনে উপলব্ধি করিতে পারিবে, তাহা সম্ভব নহে। মনুষ্য স্বভাব এমন সম্পূর্ণ নহে যে, সকল শক্তির ধারণাই এক জনের দ্বারা সম্ভব। এই কারণে অধিকার ভেদে ইষ্ট দেবতা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহার প্রকৃতি সত্বগুণ সম্পন্ন, তিনি কদাচ রজোগুণের উপযুক্ত সাধক হইতে পারেন না; সুতরাং সত্বগুণের সাধনা করাই তাঁহার বিধেয়। এই কারণে বহুধা গুণবিশিষ্ট ঈশ্বর সাধনা কিছু কঠিনও অনায়ত্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পৌত্তলিকদিগের ন্যায় সেই অনন্ত শক্তির বিভাগ কল্পনা করিয়া লইয়া কোন এক বা একাধিক বিভাগের সাধনা তত কঠিন ও অনায়ত্ত হয় না। আবার মনুষ্যের প্রকৃতি অনুসারে প্রকৃতি বিশেষের দ্বারা শক্তি বিশেষের সাধনা আরও সুবিধাজনক। সুতরাং পৌত্তলিকতায় সাধনার সুবিধা ভিন্ন আমরা কোন অসুবিধা দেখি না।

মনুষ্য জড়স্বভাব-প্রধান। সুতরাং জড়ের সহিত তাহার সঙ্গতিও অধিক। অতএব জড়ের সহিত শক্তি মিশ্রিত হইলেই তাহার ধারণার বিশেষ সুবিধা হয়। নিরবচ্ছিন্ন শক্তি অপেক্ষা জড় মিশ্রিত শক্তিই মনুষ্যে অধিক ধ্যান ও ধারণা করিতে পারে। নিরবচ্ছিন্ন শক্তি সহজে আয়ত্ত করিতে পারা যায় না। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত উভয়ের দ্বারাই শিক্ষালাভ হয়, কিন্তু কোন্ শিক্ষা হৃদয়ে অধিক স্থায়ী? কোন্ শিক্ষা হৃদয়ে সহজে প্রবেশ লাভ করিতে ও স্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত করিতে সমর্থ? সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে, উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক শিক্ষাদানে সক্ষম। দরিদ্রকে অন্ন দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এই একটি উপদেশ—আর কাশী ধামে অন্নপূর্ণা বেলা দুই প্রহরের সময় অন্নপাত্র লইয়া প্রতি গৃহে গিয়া দরিদ্রকে অন্ন দান করিয়া অবশেষে আপনি ভোজন করিলেন, এই একটি দৃষ্টান্ত। বল দেখি কোনটির দ্বারা মনুষ্যের অধিক শিক্ষার সম্ভাবনা? তুমি অবশ্যই বলিবে, অন্নপূর্ণার দৃষ্টান্তে যে শিক্ষা নিহিত আছে, দান করিবার উপদেশে তাহার শতাংশের এক অংশও নাই। তবে কেন ভাই! দৃষ্টান্ত দ্বারা যে শিক্ষালাভ হওয়া

সম্ভব, পৌত্তলিক তাহার অনুবর্ত্তী হইলে, তাহাকে উপদেশের দ্বারা শিক্ষিত করিতে প্রয়াস পাও? পৌত্তলিক দৃষ্টান্তের শিক্ষা লাভ করেন—একেশ্বরবাদী উপদেশের শিক্ষা লাভ করেন।

বস্তুত দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে শিক্ষা হৃদয়-গ্রাহী হয় না। এই জন্য মনুষ্য স্বভাবতই দৃষ্টান্তের পক্ষপাতী। বোধ হয় এমন একেশ্বরবাদীর সংখ্যা অতি অল্প, যাঁহারা ঈশ্বরের কোন একটি শক্তির বিষয় ধারণা করিতে হইলে সংসার হইতে কোন একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ না করেন। ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিবার সময় অনেকে তাঁহার 'চরণ' তলে লুণ্ঠিত হন। ঈশ্বরের 'চরণ' কি ভাই? এটি কি দৃষ্টান্ত নহে? আমাদিগের বিবেচনায় দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে ঈশ্বরের ধারণাই সম্ভব নহে—পরম যোগী ব্রহ্মনিরত তপস্বীগণও তাঁহার জ্যোতিকে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তেজোময় বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন। উপমার আশ্রয় সকলকেই লইতে হয়—উপমা ব্যতিরেকে ঈশ্বরের গুণ ধারণা করা যায় না। যাঁহারা ঈশ্বরকে নির্গুণ মনে করেন, তাঁহারা কি প্রকারে তাঁহার ধারণা করেন বলিতে পারি না; কিন্তু তাঁহার গুণের ধারণা করিতে হইলে যে উপমার আবশ্যক, তাহা কে অস্বীকার করিবেন?

ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ ব্যতিরেকে সংসারে অন্য পদার্থ নাই। সুতরাং তাঁহার সৃষ্ট পদার্থকেই উপমা স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতেই বা ঈশ্বরের খর্ব্বতা কোথায়? ইহাতে তাঁহার শক্তির খর্ব্বতা স্বীকার করিলে, তাঁহাকে ধ্যান ও ধারণা করা ঘটিয়া উঠে না। অতএব যদি তাঁহাকে ধ্যান ও ধারণা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ হইতেই তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা যুক্তিযুক্ত—অন্য পদার্থ যদি কিছু থাকিত তাহা হইলেও তাহার সহিত তাঁহার উপমা সম্ভবিত না; কেন না তাহা অন্য শক্তি হইতে উৎপন্ন। অম্লের দ্বারা যেমন মিষ্টত্ব অনুভব করা যায় না, তেমনিই এক গুণ বিশিষ্ট সামগ্রীর দ্বারা অন্য গুণের উপমাও সম্ভব নহে। পৌত্তলিক, ঈশ্বর সৃষ্ট পদার্থ হইতেই তাঁহার শক্তির ধারণা করিয়া থাকেন, বলিয়া তিনি যে ঈশ্বরের ঐশী-শক্তিকে খর্ব্ব করেন, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

সংসারের কোন ধর্ম্মই অল্পাধিক পৌত্তলিকতা-শূন্য নহে। আমাদিগের বিশ্বাস যে, পৌত্তলিকতা-শূন্য ঈশ্বর চিন্তা সম্ভব হইতে পারে না—অন্তত মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় পৌত্তলিকতাশূন্য ধর্ম্ম নাই এবং একেশ্বরবাদ নিরবচ্ছিন্ন একেশ্বরবাদ নহে। ঈশ্বরকে কোন সৃষ্ট পদার্থের দ্বারা উপমিত

করিলেই একেশ্বরবাদে পৌত্তলিকতা আসিয়া পড়িল। সুতরাং যিনি মুখে একেশ্বরবাদী, তিনিও কার্য্যে পৌত্তলিক। কিন্তু তথাপি তিনি পৌত্তলিককে ঘৃণা করেন, তাঁহার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে সহানুভূতি প্রকাশে কৃপণতা করিয়া থাকেন। ফলতঃ যখন সেই এক শক্তিকেই নানা জনে নানা মূর্ত্তিতে ধ্যান ও ধারণা করেন, তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংসারে পার্থক্য কোথায়? এক শক্তি নানা রূপে প্রকাশ পায় বলিয়া কি তাহার পার্থক্য কল্পনা করিতে হইবে? বায়ু যখন যে পদার্থে থাকে তখন সেই পদার্থের আকারকেই যেমন বায়ুর আকার বলিয়া বুঝিতে হয়, তেমনই যিনি যে ভাবে ও যে মূর্ত্তিতে তাঁহার উপাসনা ও পূজা করুন না কেন, সকলেই যে সেই এক অনন্ত অব্যক্ত শক্তির পূজা করেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জ্ঞান বৃদ্ধ হিন্দু ঋষিগণ এ কথার মর্ম্ম যেমন বুঝিয়াছিলেন, এমন আর কেহই বুঝিতে পারেন নাই। ভারতবাসী আবার যে দিন এ কথার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিবেন, সেই দিন হইতে জানিব ধর্ম্মের নবজীবন লাভ হইল।

ভারত ভ্রমণ।

আজকাল শুনা যাইতেছে, দুইচারি জন বিদ্যার্থী বঙ্গীয় যুবক অথবা দুই এক জন বঙ্গবাসী সওদাগরী কার্য্যের উপলক্ষে বোম্বাই গমন করিতেছেন, নতুবা সাধ করিয়া প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনার্থ অথবা ভিন্ন দেশবাসীর আচার ব্যবহার রীতি নীতি আলোচনা করিবার উদ্দেশে, অতি অল্প সংখ্যক বঙ্গবাসীই ভারতের মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিম প্রদেশ, রাজস্থান, অথবা দক্ষিণাপথে গমন করিয়া থাকেন। একদিন যে স্থানে রাজপুতদিগের প্রদীপ্ত-বীর্য্য-বিভাসে ভুবন বিজয়ী মুসলমানদিগের গৌরব সূর্য্য নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল, একদিন যথায় মহারাষ্ট্রীয় যুথপতির ভীষণ হুঙ্কারে দুর্জ্জয় ব্রিটিশ সিংহ কম্পান্বিত কলেবর হইয়াছিল, সেই সকল মহাতীর্থকে শান্তিপ্রিয় বঙ্গবাসী তীর্থ বলিয়া জ্ঞান করেন না, বঙ্গবাসী সেই সকল দেবসমতুল জাতির জীবন্ত কঙ্কাল পূজা করিতে জানেন না, বঙ্গবাসী কঙ্কাল মহাত্মা বুঝেন না। আমি বলি, যেমন কাশী, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, হিন্দুর পক্ষে তীর্থস্থান, মধ্য ভারত,

মহারাষ্ট্রীয় প্রদেশ এবং রাজস্থানও তেমনি তীর্থস্থান। অনেকের হয়ত বিশ্বাস আছে, যে ঐসকল প্রদেশে যাতায়াতের বড়ই অসুবিধা এবং দুই চারি দিন অবস্থান করিবার স্থানও হয়ত দুষ্প্রাপ্য। আমি, এই প্রকার ভ্রমদূর করিবার মানসেই আজ যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে বসিলাম। মধ্যভারত পশ্চিম ভারত প্রভৃতি প্রদেশ কিরূপ, এবং তথায় এ দেশীয়ের আশ্রয় পাইবার স্থান আছে কি না এবং যাতায়াতে অর্থ ও সময় কত ব্যয় হইয়া থাকে, সেই সকল কথা যথাযথ বলিবার চেষ্টা করিব এবং ভরসা করি, যে যে স্থানের কথা বলিব সেই সকল স্থানের বিশেষ বিশেষ দৃশ্য, ঘটনা ও স্থানের উল্লেখ করিতে ত্রুটি করিব না।

সকলেই অবশ্য অবগত আছেন, যে মধ্য ভারত ও পশ্চিম ভারতে যাইতে হইলে এলাহাবাদ হইয়া জব্বলপুর লাইন দিয়া যাইতে হয়। এলাহাবাদ হইতে রাত্রি ৭টা ২৭ মিনিটের গাড়ীতে উঠিলে, পরদিন প্রত্যুষে ৫টা ২৭ মিনিটের সময় জব্বলপুরে পৌঁছান যায়। কলিকাতা হইতে জব্বলপুরের গাড়ীভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ৩৭৶০, মধ্য শ্রেণীর ১৮৷/০, এবং তৃতীয় শ্রেণীর ১০৷/০। বাঙ্গালীর বাহুতে আর একটু অধিক বল না হইলে, আমি বিবেচনা করি প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করা তাঁহার পক্ষে নিরাপদ নহে। এলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর পর্য্যন্ত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেল, তাহার পরে বোম্বাই পর্য্যন্ত গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলা রেল।

রেলের কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে আমি দুই এক কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। ইহাদের সম্বন্ধে অনেকেরি অতি অসন্তোষ জনক ধারণা আছে, কিন্তু আমি প্রায় ভারতবর্ষের অর্দ্ধেক ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম যে আজকাল ইহাদের মধ্যে বিস্তর সদাশয় লোক আছেন, আমি যেখানে যেখানে ইহাদের সংস্রবে আসিয়াছিলাম, সেই সেই খানেই ইহাদের ব্যবহারে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। বৈদ্যনাথ, জব্বলপুর, আজমীর, টুণ্ডলা এবং আরো কয়েক স্থানে, ইহাদের ভদ্রতায় আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমি বিবেচনা করি ইহাদের এরূপ সহৃদয়তা দেশ পর্য্যটনের একটি শুভ ফল।

জব্বলপুর।

যাঁহারা উন্নত বিনত পর্ব্বতমালা বিহীন—উল্লাস প্রপূরিত নির্ঝর বিহীন—উচ্ছাসোন্মত্ত জলপ্রপাত বিহীন, এই নির্জীব ও নিদ্রিত, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানের বাহিরে গমন করেন নাই, জব্বলপুর হইতে আরম্ভ

করিয়া মধ্যভারত, পশ্চিমভারত, রাজস্থান প্রভৃতি স্থান, তাঁহাদের পক্ষে যে কি অপূর্ব্ব ও মনোরম্য দৃশ্য তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না। যাহাতে অপার আত্মম্ভরিতা বিদূরিত হয়, হৃদয় বিস্তৃত হয়, আত্মা উন্নত হয়,—এরূপ দৃশ্য সকল ঐ প্রদেশে চারিদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। একবার নয়ন তুলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেই তোমার সকল প্রকার অহঙ্কার শিখা নিবিয়া যাইবে – নিজের ক্ষুদ্রত্ব অনুমিত হইবে এবং সৃষ্টিকর্ত্তারই বল, আর স্বভাবেরই বল, মহিমায় প্রাণ পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে, সংসারের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে—তখন আনন্দ যে কি বস্তু, তাহার ধারণা হৃদয়ে উছলিয়া পড়িবে।

জব্বলপুরে বঙ্গবাসী বিস্তর আছেন, দুই এক দিনের অবস্থানের জন্য স্থান অনায়াসেই পাওয়া যায়। বাসাও দুষ্প্রাপ্য নহে। মধ্য প্রদেশের মধ্যে জব্বলপুর একটি অতি উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে মান্দ্রাজী ও মহারাষ্ট্রীয় জাতিই অধিক, তদ্ভিন্ন মাড়োয়ারী, রজপুত, ইংরাজ, পার্শী ও অন্যান্য জাতিও জব্বলপুরে বিস্তর আছেন। এই প্রদেশের কমিসনর ডেপুটী কমিসনর, আসিষ্টাণ্ট কমিসনর এবং আরো অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীরা জব্বলপুরেই থাকেন। প্রধান প্রধান বিচারালয় ও বড় বড় আফিস প্রভৃতি ও এই স্থানে। সহরটি সাহেবী ধরণের, সুন্দর সুন্দর বাঙ্গালা ও বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা বিস্তর হইয়াছে এবং হইতেছে। দেশীয়েরা যে অংশে থাকেন সে স্থানে বাড়ী ঘর অতি গায়ে গায়ে হইলেও অপরিষ্কার নহে। এষ্টেসন হইতে সহর ১ মাইল দূরে। এষ্টেসনে সিকরাম, টাঙা ও একা যথেষ্ট। সিকরাম অর্থে পালকী গাড়ী, টাঙা টমটমের ন্যায় এক প্রকার শকট, একা প্রায় সকলেই দেখিয়াছেন। টাঙায় ৪ জন বসিতে পারে, দাক্ষিণাত্যের দুইটি টাট্টু টাঙায় যোতা হয়। এ দেশে ঘোটক যেরূপ যোতদ্বারায় শকটে আবদ্ধ থাকে, টাঙায় সে রূপ করিয়া ঘোটক যোতা হয় না। বোমের শেষভাগে, আড়ে একটি ছড়ি আবদ্ধ থাকে, তাহারি উভয় প্রান্তে, এ দেশে বৃষ যে রূপ করিয়া যোতা হয়, সেই রূপ ঘোটক টাঙায় আবদ্ধ থাকে। দাক্ষিণাত্যের টাট্টু অতি দ্রুত গমন করিতে পারে, এমন কি ৬, ৭, মাইল অনায়াসে এক ঘণ্টায় দৌড়িয়া যায়। জব্বলপুরকে একটি আধা মিলিটরি ষ্টেসন বলা যায়, কারণ কিয়দংশ ব্রিটিশ সৈন্য সর্ব্বদাই এই স্থানে থাকে। জব্বলপুরে কএকটি অতি উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক দৃশ্য আছে। সহরের মধ্য দিয়া, কোথাওবা পার্শ্ব

দিয়া, অনতি উৰ্দ্ধ পৰ্ব্বত মালা প্রধাবিত। প্রথমত ইহারি দৃশ্য বড় সুন্দর। তাহার পর, জগদ্বিখ্যাত শ্বেত মৰ্ম্মর শৈল ও নৰ্ম্মদা প্রপাত এবং "মদন মহল" জব্বলপুর হইতে বহুদূর নহে। যাঁহারা প্রায় সমস্ত ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারো কাহারো মুখে শুনিয়াছি, যে, জব্বলপুরের শ্বেত মৰ্ম্মর শৈল ও নৰ্ম্মদা প্রপাতের মত দৃশ্য ভারতে কোথাও নাই। মনুমেণ্টের উপর হইতে কলিকাতার স্থানে স্থানের দৃশ্য মন্দ নহে, এবং ভাগীরথী বক্ষ হইতে উভয় তীরের দৃশ্য স্থানে স্থানে সুন্দর বটে, কিন্তু জব্বলপুরের এই সকলের সহিত সে সকলের তুলনাই হয় না। বৈদ্যনাথে এরূপ দুই চারিটি স্থান দেখিয়াছিলাম। কলিকাতার নিকটবৰ্ত্তী স্থানে আর কোথাও এরূপ দৃশ্য আছে কি না জানি না। প্রথমে আমি জব্বলপুরের শ্বেত মৰ্ম্মর শৈলের কথা বলিব।

এই মৰ্ম্মর শৈল দেখিতে যাইতে হইলে, সহর হইতে ১২।১৩ মাইল দূরে নৰ্ম্মদা নদীর তীরে "ভেড়া ঘাট" নামক স্থান পর্য্যন্ত শকটারোহণে যাইতে হয়। তথা হইতে পদব্রজে যাইয়া শৈলে উঠিলেও উঠা যায়। কিন্তু তাহাতে কিছু আশঙ্কা আছে। সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হইলে, এই ভেড়াঘাট হইতে বোটে করিয়া মৰ্ম্মর শৈলের নিকট যাইয়া নৰ্ম্মদা প্রপাত দেখিতে হয়। সহর হইতে ভেড়াঘাট পর্য্যন্ত সিক্রাম করিয়া যাইলে ৪।৫ টাকা, টাঙা করিয়া যাইলে ৩।৪ টাকা, এবং এক্কা করিয়া যাইলে টাকা দুইয়ের মধ্যে ব্যয় পড়ে। এবং ভেড়াঘাট হইতে প্রপাত দেখিতে যাইবার ও আসিবার বোট ভাড়া ইত্যাদির জন্য দুই টাকা যথেষ্ট। গবর্ণমেণ্ট হইতে দর্শকদিগের জন্য বোটের বন্দোবস্ত করা আছে। বোটে করিয়া যাইবার সময় তুমি, অতি মনোহর দৃশ্য দেখিতে পাইবে। নদীর দুই পার্শ্বেই শ্বেত মৰ্ম্মরের অতি স্বচ্ছদেহ পৰ্ব্বত উঠিয়াছে, স্থানে স্থানে উৰ্দ্ধদেশে উভয় পার্শ্বের পৰ্ব্বত মিলিত প্রায় হইয়াছে; তুমি ইহার মধ্য দিয়া চলিয়াছ। গিরি অঙ্গ এত স্বচ্ছ যে চাহিয়া দেখিলে নৰ্ম্মদার প্রতিবিম্ব দুই পার্শ্বে পৰ্ব্বতের ভিতর আর দুইটি প্রবাহের ন্যায় বলিয়া তোমার ভ্রম হইবে। অস্ফুট আলোকে এই নীরব মাধুরী-মাখা স্থান দিয়া তুমি তরণীবক্ষে উজানে বাহিয়া চলিয়াছ, অদূরস্থিত প্রপাতের হুঙ্কার শব্দে জগৎ পরিপ্লুত, তাহার গম্ভীর প্রতিধ্বনি তোমার কর্ণকুহর প্লাবিত করিতেছে. সন্নিকটে দাঁড়ের "ঝুপ ঝুপ" শব্দ তোমাকে তোমার অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দিতেছে, এমন স্থানে মনের

অবস্থা কিরূপ হইয়া পড়ে তাহা কবিতার সম্পত্তি—তাহাতে আমার গদ্যের অধিকার নাই।

প্রপাতের অদূরে যাইয়া দেখ, প্রস্থে প্রায় ১০০ গজ নর্ম্মদা, "চূর্ণ প্রস্তর" স্তূপে স্রোতরুদ্ধ হইয়া কোলাহলে দিগন্ত পরিপ্লুত করিয়া, প্রায় ২০ হাত নিম্নে পতিত হইতেছে। যে স্থানে পতিত হইতেছে, তথা হইতে স্তম্ভাকারে বাষ্প উত্থিত হইতেছে। বর্ষাকালে এ প্রপাত দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ জলাধিক্য বশত প্রপাত স্থান জল প্লাবিত হইয়া পড়ে। এ অঞ্চলে প্রায় ৪ মাস বর্ষা অনবরত থাকে। নর্ম্মদা প্রপাত দেখিতে হইলে পূর্ণিমা রাত্রে দর্শন করাই উচিত। পূর্ণিমালোকে ইহার দৃশ্য এত মধুর যে তাহা বাস্তবিক কল্পনার অতীত। এ স্থানে রাত্রি বাসের অসুবিধা নাই; প্রপাতের অদূরে শৈলের উপর ডাক-বাঙ্গালা আছে, দেব দেবীর মন্দির ও তৎ সংক্রান্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের গৃহাদিও আছে, তথায় রাত্রি যাপন করিতে পারা যায়। বাঙ্গালার সংলগ্ন একটি পুস্তকালয় আছে, সেখানে পাঠ্য পুস্তকাদিও পাওয়া যায়। জব্বলপুর সহর হইতে এস্থান দেখিতে হইলে পূর্ণ একটি দিবস অতিবাহিত না করিলে, সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায় না। সহর হইতে প্রাতঃকালে উঠিয়াই আহারীয় দ্রব্য সঙ্গে লইয়া বাহির হইতে হয় এবং সমস্ত দিবস ও রাত্রি এই স্থানে কাটাইয়া পর দিন প্রাতে সহরে ফিরিলে তবে ইহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায়। মর্ম্মর শৈল দেখিতে যাইবার আর একটি উপায় আছে। জব্বলপুরের একটি এষ্টেসনের পরের এষ্টেসনের নাম "মিরাজগঞ্জ"। এই মিরাজগঞ্জ হইতে মর্ম্মর শৈল ৫ মাইল মাত্র। কিন্তু মিরাজগঞ্জে শকট প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যায় না। পূর্ব্ব রাত্রে জব্বলপুর হইতে এ স্থানে কোন প্রকার শকট পাঠাইয়া দিয়া, প্রাতে জব্বলপুরে আহারাদি করিয়া, বেলা দশটা কি এগার-টার সময় ট্রেণে মিরাজগঞ্জ গিয়া, অল্প আয়াসে, অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে মর্ম্মর শৈল ও নর্ম্মদা প্রপাত দেখিয়া আসা যায়। যাঁহার চক্ষু আছে, তিনি যেন একবার জব্বলপুরের মর্ম্মর শৈল শৃঙ্গ হইতে নর্ম্মদা প্রপাত দেখিয়া চক্ষু পবিত্র করেন; যাঁহার শ্রবণ আছে, তিনি যেন একবার এই প্রপাত শব্দ শুনিয়া কর্ণকুহর পবিত্র করিয়া আসেন; আর যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি যেন একবার এই জব্বলপুরের শ্বেত মর্ম্মর শৈল ও নর্ম্মদা প্রপাত এবং মদন-মহল, ভেরুলের ইলোরা গিরিগুহা, নাসীকের পাণ্ডব গুফা ও গোদাবরী প্রপাত,

মলঘাট ও বোরঘাটের মহান দৃশ্য, বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীর, পুনার রাস্তা উদ্যান, কত দৃশ্যের নাম করিব ?—তিনি যেন একবার মধ্য ভারত ও পশ্চিম ভারতের স্বভাবের শোভা উপভোগ করিয়া প্রাণ পবিত্র করিয়া আসেন। আমি এই সকল দৃশ্যের কথা ক্রমশ বলিব। প্রথমে মদন মহলের কথা বলিতেছি।

"মদন মহল"। লোকে বলে "মদন মহল" রাণী দুর্গাবতীর গ্রীষ্ম কালের বিশ্রাম ভবন ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যতীত অন্য কোন নিদর্শন পাই নাই। বিচিত্র পর্ব্বত মালার একটি শৃঙ্গে একখানি প্রস্তর খণ্ডের উপর এই অট্টালিকা। এই পর্ব্বতের গঠন বড়ই বিচিত্র। কৃষ্ণবর্ণের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈলখণ্ড, কেহ যেন নানা প্রকার আকৃতিতে মাজিয়া ঘসিয়া উপর উপর বসাইয়া দিয়াছে। সেই শৈলখণ্ডগুলির সম্মিলন স্থান হইতে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহ উত্থিত হইয়া, শত শত শাখা প্রশাখা প্রসারিত করিয়া মদন মহলের শান্তি রক্ষা করিতেছে। মদন মহলের নিকট পর্য্যন্ত শকটারোহণে যাইবার পথ প্রস্তুত করা আছে; কিন্তু বর্ষাকালে ঝরণার জলে এই পথ শকটাদির পক্ষে দুর্গম হইয়া উঠে। বর্ষার সময় গিরিমূলের অদূরে শকট রাখিয়া পদব্রজে উঠিতে হয়। আমি বর্ষার সময় গিয়াছিলাম। এ সময়ে প্রকৃতির শোভা এখানে বড় সুন্দর।

মদন মহল! কি বলিয়া তোমার শোভা বুঝাইব, তাহা ত ভাবিয়াই পাই না! গিরিশৃঙ্গ বিরাজিত—বনরাজি সুশোভিত—গগন পরিবেষ্টিত—তোমার সেই শান্তি নিকেতন ধবলমূর্ত্তি, যাহার অঙ্গে অঙ্গে জীবন্ত কাব্য বিকশিত হইয়া রহিয়াছে, আমার এই দুর্ব্বল লেখনীতে তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা কই! মদন মহল প্রকৃত মদন মহলই বটে; সৌন্দর্য্য ভুবন ত সৌন্দর্য্য ভুবন!!

তুমি "মদন-মহল দেখিবার জন্য পর্ব্বতারোহণ করিবার সময় দেখিবে, চারিধারে গিরিশৃঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, তুমি তাহার মধ্য দিয়া ঢালু উপত্যকার উপরে ক্রমশ উঠিতেছ। উঠিতে উঠিতে দেখিবে কোথাও বা স্বভাবজাত কমল কুমুদ বিকশিত একটি সরোবর, কোথাও বা ঘনতরুরাজি সমাচ্ছাদিত একটি ভগ্ন মন্দির, কোথাও বা শান্তিরক্ষকের একটি পরিত্যক্ত প্রাচীন গৃহ; কোথাও বা তলদেশ প্রসারিত সোপানাবলি সুশোভিত প্রাণতোষিণী একটি পুষ্করিণী, তাহার পার্শ্বে অনতিউর্দ্ধে অত্যুচ্চ শৈল খণ্ডের উপর, একটি বিজন

দেবমন্দির। এইরূপ নানা প্রকার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের পাদদেশে উপনীত হইয়া দেখিবে, এক প্রকাণ্ড শৈলখণ্ডের উপর একটি প্রাচীন দ্বিতল অট্টালিকা।' তোমার সম্মুখেই এই অট্টালিকায় উঠিবার সোপান শ্রেণী দেখিবে। নয়ন তুলিয়া দেখিবে, এই অট্টালিকার চারিপার্শ্বে প্রস্তরখণ্ডের সম্মিলন স্থান হইতে বৃহৎ বৃহৎ অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষ উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। আমি এইস্থানে উপনীত হইয়া অধৈর্য্য আনন্দ বেগে উর্দ্ধশ্বাসে সৌধ শিখরে ছুটিলাম। উঠিয়া অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম! সেই সৌধ-শিখরে পবনস্রোত বিভাসিত—মৃদু "হু হু" শব্দ নিনাদিত বটবৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া—চতুপার্শ্বস্থিত উন্নত বিনত পর্ব্বতমালা হইতে দৃষ্টি তুলিয়া—নিবিড় জলদাচ্ছন্ন গগণচন্দ্রাতপে নয়ন রাখিয়া—উর্দ্ধাকাশের নির্ম্মল বায়ু প্রবাহের মধুর তরঙ্গ বক্ষের উপর ধরিয়া, আমার ওষ্ঠে স্বতই উত্থিত হইল "ইহার কাছে কবিকল্পনা কোথায়!"

ক্রমশ।

প্রতিধ্বনি

নিথর, তিমিরময় নিশীথ সময়,
এবে স্বভাবের হাসি—
মধুর বৈচিত্র রাশি,
গাঢ়তম অন্ধকারে হয়েছে বিলয়!
মৃদু, উচ্চ শত শব্দ
অনন্ত আকাশে স্তব্ধ,
প্রশান্ত নিশ্চল বায়ু সুনীল অম্বরে;
নিদ্রিত, নীরব প্রাণী জগত সংসারে।

সুষুপ্ত সংসার, আমি শোকাচ্ছন্ন মনে
সৈকত পুলিনে বসি,
নয়নের জলে ভাসি,
বিশাদে ভৌতিক দেহ আন্ধারের সনে।
ভ্রাতার শ্মশান-বুকে
কাঁদে রে অভাগা দুখে,
স্মৃতি-পারাবার মথি বিষাদ-লহরী
ছুটিল, তমিস্রময় নভ পূর্ণ করি।

আতঙ্কে কম্পিত হয়ে সহসা তখন
"স্থির নীরবতা" ধীরে
চলি গেল বহু দূরে,
দুঃখীর রোদনে বিশ্ব হইল মগন।
জাগিল সে আর্ত্তস্বরে
নদীর বিজন তীরে
শব্দপ্রাণা প্রতিধ্বনি, শুনি তার বাণী,—
চমকি, আপন ভাবে যেন রে আপনি।

শুনিতাম চমকিয়া সে ধ্বনি-প্রবাহ
"কে তুমি রে নিশাকালে,
বসিয়া নদীর কূলে,
ভাঙ্গিতে আমার নিদ্রা আসিয়াছ কহ?
নিবিড় এ অন্ধকারে—
সকলি বিলুপ্ত ক'রে
দৃশ্যের বৈচিত্র যত ; কিন্তু হায় হায়,
শব্দের বৈচিত্র রাশি মুছিয়া না যায়!

"অনন্তে ভাসায়ে কায় মুহূর্ত্তের তরে
বিশ্রাম করিতে নারি,
শত স্বরে বিদ্ধ করি,
না হতে নিদ্রিতা, মোরে জাগরিতা করে;
তাহাতে সুখের হাসি
অতি অল্প ; দিবা নিশি
দুঃখের তরঙ্গ শুধু লাগে আসি প্রাণে,
কেবলি বিষাদ-শ্বাস বহে এ জীবনে!

"ঈশ্বর-প্রেমিক দেব দেবী কত জনে
সদা ফিরে কূলে কূলে
'জয় হরি হরি' ব'লে
জাগ্রত করিত মোরে পবিত্র রোদনে;
সে অশ্রুতে সুখ আছে,
কিন্তু ক'ব কার কাছে,
বিরহী দুঃখীর তাপ কত মোর মনে,
বাজিছে হৃদয়-যন্ত্রে, যেন রে স্বপনে।

"কত যুদ্ধ আর্ত্তনাদ হৃদয়ে আমার ;
আবার তোমার মত
ক্ষুদ্র নর শত শত
অনিবার কাঁদে আসি; ক্রন্দনে সবার,—
জীবনে যে হাসি ছিল,
সে টুকু ধুইয়া গেল!
অতি ক্ষুদ্র কিম্বা দেবোপম মহাজন
সকলেরি দুঃখে মোর সন্তাপিত মন।

"অশোক কাননে সীতা জনক-দুহিতা—
পবিত্র প্রীতির খনি,
অচঞ্চলা সৌদামিনী,
বিলাপি ভাষিত যবে মরমের ব্যথা,
পশিয়া সাগরকূলে
আমার মর্ম্মের স্থলে
প্রবেশি করুণ স্বর করিত চঞ্চল ;
জাগিতাম নিশি দিবা হইয়া পাগল।

"অচ্যুত প্রণয় লুব্ধা রাধা বিনোদিনী
পুলিনে পুলিনে ঘুরি
যখন ডাকিত 'হরি'
শুনা'ত সখীরে যবে বিরহ-কাহিনী,
পরাণের স্তরে স্তরে
প্রবাহ ছুটিত স্বরে,
প্রমত্তা হইয়া আমি কাঁদিতাম, হায়,
এ হৃদয়ে জ্বলে বহ্নি পরের জ্বালায়।"

"গোপাল গোপাল বলি হায় যশোমতী
তিতিয়া লোচন-জলে,
লুটাইয়া ভূমিতলে,
কাঁদিতেন হয়ে যবে শোকাতুরা অতি,—
বিষাদের প্রতিকৃতি
যখন কৌশল্যা সতী
'হা রাম হা রাম' ডাকি ভেদিত গগন,
আকুল হইত দুঃখে আমার জীবন।

"কেমনে স্মরিব আমি হায় রে সে দিন।
যবে কুরুক্ষেত্র-রণে,
ভ্রাতৃগণ ভ্রাতা সনে
ভৈরব সমরে মাতি হ'ল আয়ু হীন,
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ,
করিয়া ভারত শূন্য
ভস্মসাৎ হইলেন সরস্বতী-তীরে,
কাঁদিয়া আর্য্যের লক্ষ্মীপ্রবেশিল' নীরে

"সহস্র জননী, পিতা, তনয় বিহনে,
যখন সহস্র সতী,
হারাইয়া প্রাণপতি,
কাঁপাইয়াছিল ব্যোম করুণ নিস্বনে,
অস্ত্রের ভীষণ ধ্বনি,
মুমূর্ষুর আর্ত্তবাণী,
পশিল হৃদয়ে কত, কব কি তোমারে?
পরের প্রাণের দুঃখ হৃদয় মাঝারে।

"কাঁদিলাম সে রোদনে আমি অভাগিনী,
কত কত যুগ হায়,
অবসন্ন হ'ল কায়,
ভাবিলাম আর বুঝি না সরিবে বাণী;
সুখ-দুঃখ-বোধ-হীন,
হবে শব্দ দেহ ক্ষীণ
মিশিয়া যাইবে শেষে অনন্তের সনে,
এমন সন্তাপ আর বহিবে না প্রাণে।

"বিধির নিয়মে মৃত্যু নাহি রে আমার,
একটিও ক্ষুদ্র নরে
যদি আর্ত্তনাদ করে,
ব্যথায় দ্বিগুণ আমি করি যে চীৎকার
বিশ্রাম ক্ষণেক নাই
সন্তাপে আকাশে ধাই,
আমার দুঃখের কথা অনন্ত অপার,
সংসারের তাপ এই হৃদয়ে সঞ্চার।

"শান্তি নাহি পাই আমি নিবসি যেখানে
এইত নদীর কূলে
শত শত চিতা জ্বলে,
সতত জাগিয়া কাঁদি আর্ত্তস্বর শুনে।
আবার এ নিশাকালে
কে তুমি এখানে এলে?
কেন জাগাইলে মোরে দহিতে আগুনে?
আর এ বিজলী-তাপ সহে না পরাণে।

"এ জগতে কহ শুনি, সুখী কয় জন?
দুঃখের বৈচিত্র রাশি
আরো কত ফলে আসি,
কি কাজ কহিয়া আর? শুন রে বচন,
মুছিয়া নয়ন-বারি
যাও শোক পরিহরি,
দুঃখের সঙ্গীত তব বলিও না মোরে,
তব সম কত অশ্রু এ সংসারে ঝরে।"

"দয়া করি শুন, দেবি! মুহূর্ত্তের তরে,"
কহিল অভাগা তারে
"কেহ নাই এ সংসারে,"
শুনিতে দুঃখীর কথা শোকার্দ্র অন্তরে—
এই স্রোতস্বতী-তীরে,
শ্মশানের বৈশ্বানরে
পুড়েছে আমার রত্ন—জীবন-দোসর,
দাদা কৃষ্ণচন্দ্র, মোর ভাই সহোদর।

আমি ক্ষুদ্র,শোক ক্ষুদ্র নহেত আমার,
হৃদয়ের কক্ষে কক্ষে,
কেহ নাহি দেখে চক্ষে
আগুনের শিখা কত জলে অনিবার;
অদৃশ্যে যে বহ্নি থাকে
কেমনে হেরিবে লোকে ?
গর্ভাগ্নিতে দহে অদ্রি সতত যেমন,
হৃদয়-নিহিত বহ্নি পোড়ায় তেমন।

পরাণের সখা মোর গিয়াছে চলিয়া
আঁধার সংসারে রাখি
বিপন্ন জনক দুখী,
শোকাতুরা জননীরে জীয়ন্তে মারিয়া!
এক বৃন্তে ছিল দুলে
দুটি ফুল কুতূহলে,
ছিঁড়িল একটি তার দুষ্ট প্রভঞ্জন,
অন্যটি শিথিলবৃন্ত মলিন এখন।

অজ্ঞাত বান্ধবহীন মম সম কেহ
শোকার্ত্ত, তোমার পাশে
যদ্যপি এখানে আসে,
কহিও তাহারে,দেবি! করি হেনস্নেহ—
'অজানিত এক জন
ভ্রাতৃ শোকে তপ্ত মন,
এসেছিল এক দিন কান্দিতে হেথায়',
সংসারে অনেক দুঃখী বুঝায়ো তাহায়।

কাঁদিব না আমি দেবী কাঁদিব না আর,
সম্ভাষিয়া সমাদরে
বহু উপদেশ মোরে
দিয়াছ; চক্ষের জল মুছিব এবার।
অনন্তের অঙ্কে পশি
মুহূর্ত্ত নীরবে ভাসি
যে বিশ্রাম লভ তুমি, চিরকাল তরে
দাদার অনন্ত শান্তি অনন্ত অন্তরে।

কাঁদিব না,কাঁদিব না, কাঁদিব না আর,
অপবিত্র অশ্রুজলে
অনন্ত নাহিক গলে,
অনন্তে এ সুখ দুঃখ না হয় সঞ্চার,
লইয়া আমার বাণী
যাও চলি, প্রতিধ্বনি।
মিশ সে অনন্তে,দাদা আছেন যেখানে,
কহিও আমার ব্যথা নীরব-বচনে।

শক্তিতন্ত্র কেবল বৈষম্য-বাদ।

আধুনিক যুবকগণ সাম্য ও স্বাধীনতা বাদ প্রচারের জন্য বিশেষ ব্যাকুল। তাঁহাদিগের এই নীতির মূলমন্ত্র ইউরোপীয় বিদ্যা। কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করেন না, যে মন্ত্র প্রভাবে তাঁহারা সাম্য মত প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছেন, সেই মন্ত্র তাঁহাদিগের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা অদ্য দেখাইয়া দিব,

যে ইয়ুরোপীয় সভ্যতার ইষ্টদেবতা সাম্য নহে। শক্তিই তাঁহাদের একমাত্র ইষ্ট দেবতা এবং বৈষম্য তাহার ফল। যদি সাম্যতত্ত্ব কখনও পৃথিবীর কোনও স্থানে প্রচারিত হইয়া থাকে, তবে তাহা ভারতবর্ষে হইয়াছে। কিন্তু যখন ভারতীয় ঋষিগণ দেখিলেন প্রকৃত সাম্য ঈশ্বরের অননুমোদিত ও অসম্ভব, তখন তাঁহারা, এরূপভাবে বৈষম্য প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন যে, তাহাতে যেন মানব সাধারণে সাম্য বজায় থাকে, বৈষম্য জন্য ক্ষুদ্রের কষ্ট না হয়।

য়ুরোপীয়েরা মুখে সাম্য ঘোষণা করিতেছেন, কিন্তু কার্য্যে তাঁহারা এরূপ বৈষম্য স্থাপন করিতেছেন, যে, তাহাতে ক্ষুদ্রের দুঃখের সীমা থাকিতেছে না। অধিক কি, ক্ষুদ্র পৃথিবীর অধিকার হইতে এক কালেই বিচ্যুত হই-তেছে। আমরা উদাহরণ দ্বারা এই কথা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছি।

ভারত বলেন, ব্রাহ্মণ জ্ঞান চর্চ্চা করুক, ক্ষত্রিয় বিক্রম প্রকাশ করুন। বৈশ্য বাণিজ্য করুক ও শূদ্রে বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা করুক। রাজার পুত্র রাজা হউক, মন্ত্রীর পুত্র মন্ত্রীর হউক, পিতা রাজসরকারে বা অন্য কাহারও অধীনে যে পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, পুত্র সেই পদের অধিকারী হউক। যাহার শক্তি নাই, তাহাকে সক্ষম ব্যক্তিরা প্রতিপালন করুক; তন্মধ্যে যে অক্ষম-দিগের আত্মীয় আছে, তাহারা তাহাদের দ্বারা প্রতিপালিত হউক ও যাহাদের আত্মীয় নাই, তাহাদিগকে সাধারণে প্রতিপালন করুন। তদনুসারে সকলেই আপন পৈত্রিক কার্য্য করিয়া সুখী হয় এবং ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ ভাগিনেয়, দৌহিত্র, জামাতা প্রভৃতি নিকট ও দূর সম্পর্কীয়দিগকে প্রতিপালন করেন ও গৃহীমাত্রেই ভিক্ষুককে ভিক্ষা ও অতিথিকে অন্ন প্রদান করেন। এক ভাই উপার্জ্জন করিয়া সকলে সমান সুখে উপভোগ করেন। সুতরাং কাহারও বৃত্তিনাশ-জনিত দুঃখ হয় না।

য়ুরোপ বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ নাই, ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই, শূদ্র নাই, সক-লেরই সমান অধিকার। যিনি শক্তি প্রকাশ করিতে পারিবেন, তিনি পদস্থ ও সুখী হইবেন। যিনি শক্তি প্রকাশ করিতে পারিবেন না, তিনি হেয়রূপে পরিগণিত ও দুঃখে ভাসমান হইবেন। অধিক কি এই পৃথিবীতে তাঁহার স্থান মাত্র হইবে না। তুমি রাজপুত্র কিন্তু কোনও কৃষক পুত্রের শক্তি যদি তোমা অপেক্ষা অধিক হয়, তবে তোমার রাজ্য তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। তোমার পিতা অসামান্য বাহুবলে দৃঢ় পরিশ্রম করিয়া রাজ্য লাভ করিয়াছেন,

ও পুত্র-নির্ব্বিশেষে নিস্বার্থ ভাবে রাজ্য পালন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে তোমার অধিকার কি? তোমার কৃতিত্ব কি? যিনি করিয়াছেন, তিনি তাহার ফল পাইয়াছেন। তজ্জনিত কৃতজ্ঞতার পাত্র তুমি হইবে কেন? যদিও তোমা দ্বারা রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, কিন্তু যখন ঐ কৃষকপুত্র তোমা অপেক্ষা অধিক শক্তি সম্পন্ন, তখন কেন তুমি তাহাকে তোমার পদ ছাড়িয়া দিবে না? হে মন্ত্রণা-কুশল মহাপ্রাজ্ঞ মন্ত্রী প্রধানের পুত্র! মানিলাম তুমিও মন্ত্রণা কার্য্যে সামান্য পটু নহ, কিন্তু দেখিতেছি ঐ চর্ম্মকার পুত্র তোমা অপেক্ষাও অধিক ক্ষমতাবান্, অধিকমন্ত্রণাকুশল, অতএব তুমি তোমার পিতৃ পদ তাহাকে প্রদান করিবে না কেন? ওহে ভিক্ষুক! দেখিতেছি, তোমার কিছুমাত্র শক্তি নাই, অতএব তুমি কেন দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া শক্তিসম্পন্ন কর্ম্মিষ্ঠ মনুষ্যগণকে বিরক্ত করিতেছ? যখন তোমার উপার্জ্জনের শক্তি নাই, তখন তুমি কিজন্য জীবিত থাকিয়া খাদ্যান্ন অক্রেয় করিতেছ? তোমার মত সহস্র লোক এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে, আহারীয় দ্রব্য অনেক সুলভ হইবে, অতএব তুমি সত্বর বিদায় গ্রহণ কর। যখন তোমার শক্তি নাই, তখন ধরিত্রী তোমাদের স্থান দিবেন কেন? ওহে কেরাণি বাবু! তুমি গাত্রে হরিদ্রা লেপন করিতেছ কেন? ওকি বিবাহের উদ্যোগ না কি? তুমি বিবাহ করিবে? তুমি জান না, তোমার আয় কি? ২০ টাকা মাত্র বেতন দ্বারা তুমি কি প্রকারে স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ করিবে? তোমার আবার বিবাহ কি? যখন তোমার শক্তি নাই, তখন তোমার এত সুখের আশা কেন? তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, যে তোমার বিবাহোৎপন্ন সন্তানগণ উপযুক্ত ভরণ পোষণ না পাইলে, দেশের লোককে জ্বালাতন্ করিবে? 'হয় চাকরি দেও, নয় ভিক্ষা দেও' বলিয়া ভাগ্যবান্‌দিগের সুখ বিশ্রামের ব্যাঘাত চেষ্টা করিবে। আর তুমি কে ওরূপ আস্ফালন করিতেছ? তোমার পিতা, পুত্র কি ভ্রাতা মাজিষ্টার, উকীল কি ডাক্তার হইয়া ধন ও মানার্জ্জন করিতেছেন বলিয়া তোমার এত অভিমান কেন? তোমার পিতার সুখের অংশ তুমি পাইবে কেন? যখন তোমার শক্তি নাই, তখন তুমি ধনমান জনিত সুখ পাইবে কেন? তোমার পিত্রাদির শক্তি আছে, উচ্চ হইয়াছেন; তোমার তাহা নাই তুমি নীচ নীচকার্য্য কর; তোমার উচ্চাভিলাষ কেন? মাজিষ্টরের পুত্র হইয়া সামান্য মজুর হইবে কি প্রকারে,—ভাবিতেছ? সে ভাবনা বৃথা, কেন না জগতে শক্তিরই জয়।

এইরূপ য়ুরোপের সর্ব্বত্রই একমাত্র শক্তির উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য তথায় পরীক্ষা প্রণালীর এত ধূমধাম। কাহার শক্তি অধিক আছে, তাহা জানার জন্যই পরীক্ষার প্রয়োজন। যাহাদের বিদ্যা-শিক্ষা করিবার সুবিধা, শরীর সচ্ছন্দ, অর্থ, পরিশ্রম করিবার প্রবৃত্তি, সহায় প্রভৃতি ভাগ্য আছে, তাহারাই পরীক্ষা দিয়া প্রধান হইতে পারে ও তাহাদেরই পদ, ধন ও মান লাভ হয়। যাহাদের ঐ সকল নাই তাহারা দুর্ভাগা। দুর্ভাগ্যদিগের স্থান এ জগতে হইবে না। যে কোন প্রকারে হউক, আপন শক্তির উৎকর্ষতা লাভ করাই ইউরোপীয় সভ্যতার মূল নীতি। তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে মরিয়া যাউক, পৃথিবী রসাতলে যাউক, বিশ্বের ধ্বংশ হউক তাহা দেখিতে হইবে না। আপনার উন্নতিই প্রধান লক্ষ্য। সহস্র সহস্র তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। যিনি নিজ শক্তিতে বাস্পীয় যন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিয়া ঐ সকল তন্তুবায়গণের জীবিকা অর্জনের প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন,—তিনি কিছুমাত্র নিন্দনীয় হইতেছেন না। যিনি বাস্পীয় শকট পরিচালন করিয়া সহস্র সহস্র নাবিক, শকটবান ও বাহকের জীবনোপায় নষ্ট করিতেছেন, তিনি নিন্দার পরীবর্ত্তে যশোলাভ করিতেছেন। যিনি রাশি রাশি অকর্ম্মণ্য চাকচিক্যশালী পদার্থ প্রস্তুত করিয়া নির্ব্বোধ লোকদিগকে ঠকাইয়া তাহাদিগের জীবনোপায় স্বরূপ তণ্ডুলাদি গ্রহণ করিতেছেন, তিনি সমাজে বিলক্ষণ যশস্বী হয়েন। অধিক কি, যিনি সুরা প্রভৃতির উৎকর্ষতা সাধন করিয়া মানবজাতির সর্ব্বনাশ সাধন দ্বারা আত্মোন্নতি সম্পাদন করেন, তিনিও কিছুমাত্র নিন্দিত নহেন। কেননা আত্মোন্নতি ও শক্তির প্রাধান্যই ইউরোপের মূল মন্ত্র। তাঁহারা মুখে বলেন সকল মনুষ্যেরই অধিকার সমান। কিন্তু কার্য্যে দেখান যাহাদের শক্তি ও সুবিধা আছে, তাহাদেরই অধিকার আছে; যাহাদের তাহা নাই, তাহারা কিছুরই অধিকারী নহে। তাঁহাদের সমানাধিকার প্রদান বাক্য, কেবল প্রতারণা মাত্র। শক্তিমানেরা সমস্ত সুখ সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়েই সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। কেননা যখন তাঁহারা জানিতেছেন পৃথিবীর সকল লোকের শক্তি অর্থাৎ বল, প্রবৃত্তি, বুদ্ধি, অবস্থা, ধন—সমান নহে, সুতরাং কখনই সকলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সুখী হইতে পারিবে না, যাহাদের শক্তি আছে, তাহাদেরই জয় হইবে, তখন, তাঁহাদের সাধারণের সমান অধিকার আছে বলা, প্রবঞ্চনা ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে?

অথচ যাহাতে শক্তিমানদিগের ক্ষতি না হইয়া উহা লাভেরই কারণ হইতেছে। কেননা, দেখা যায় যে, শক্তিমানগণ একচেটিয়া করিয়া শক্তির ফল স্বরূপ সমস্ত সুখভোগ করিবেন, অথচ তাঁহারা যে মানব অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব নহেন, পরস্বাপহারী দস্যু বা তস্কর নহেন, তাহা প্রকাশ করিবেন। কেহ তাঁহাদের নিন্দা করিলে বা তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা চাহিলে, তাঁহারা এই বলিয়া তাহাদিগকে বিমুখ করিবেন, যে তোমাদিগকে যখন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও সর্ব্ব বিষয়ে অধিকার দেওয়া হইয়াছিল ও তোমরা নিজ দোষে যখন তাহার সুব্যবহার কর নাই, তখন তোমরা আমাদিগকে নিন্দা বা বিরক্ত করিতেছ কেন? নিজ দোষে কষ্ট পাইয়া পরের নিন্দা বা পরকে বিরক্ত করিয়া তোমরা আপনাদেরই হীনত্ব প্রকাশ করিতেছ। বাস্তবিক তাহাদের যে কোন দোষ নাই, তাহা তাঁহারা বলিবেন না। কেননা মানব মাত্রেই অবস্থার দাস, অবস্থা অতিক্রম করিতে পারে, এমন সাধ্য এ পৃথিবীতে কাহারও নাই। প্রতিদ্বন্দিতা ক্ষেত্রে অবস্থা অনুসারে অনেককেই পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। বিশেষত একের শক্তির অধিক উৎকর্ষ হইলে, অন্যের শক্তি খর্ব্ব হইতেই হইবে, কেননা কোনও শক্তিই নূতন সঞ্জাত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। কাহারও নিকট হইতে শক্তি অপহরণ করিয়া লইয়াই অধিক শক্তিমান হইতে হয়। অধিক ধনী হইতে হইলে, কতকগুলি লোককে নির্ধন না করিয়া কখনও তাহা সম্পন্ন হয় না। অধিক বলশালী হইতে হইলে বহু লোককে দুর্ব্বল করিতে হয়।

মাঞ্চেষ্টরের বণিক্‌গণ কি লক্ষ লক্ষ তন্তুবায়দের নির্ধন করিয়া ধনী হইতেছেন না। নীলকরেরা কি কৃষকদিগের ধন সংগ্রহ করিয়া ধনী হইতেছেন না। যে রাজা কি জমীদার নিজ রাজ্যের কি জমীদারির আয় বৃদ্ধি করেন, তিনি কি প্রজার ধন হরণ দ্বারা তাহা সম্পন্ন করেন না? যিনি নূতন জমিদারি ক্রয় করেন, তিনি কি পূর্ব্ব জমীদারকে নিঃস্ব না করিয়া তাহা করিতে পারেন? যিনি কোন উন্নত পদ বা চাকরি প্রাপ্ত হয়েন, তিনি কি পূর্ব্ববর্ত্তি পদারূঢ় ব্যক্তি বা অন্য কোন আশাবান ব্যক্তিকে বঞ্চিত করেন না? ইংলণ্ড যে এত ধনী হইয়াছেন, সে কি কোটি কোটি ব্যক্তি ও শত শত ব্যক্তিকে নির্ধন করিয়া নহে? এক কালে গ্রীস্ ও রোম যে প্রবল বল সম্পন্ন হইয়াছিল তাহাতে কি পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে নির্বীর্য্য করা হয় নাই? মুসলমানগণ যে ভারতের রাজা হইয়াছিলেন,

তাহাতে কি ক্ষত্রিয় কুলকে নির্বীর্য্য করা হয় নাই? এখন বৃটীশ যে সিংহ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে কি ভারত মেষ আখ্যা প্রাপ্ত হয় নাই? এই রূপে দেখা যায়, যে কাহার ও ক্ষতি না করিয়া কখনও আপনার উন্নতি হইতে পারে না।

এবিষয়ে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। কোনও স্থানে একটি ব্রাহ্মণ অতি ভক্তিভাবে নিয়ত শিব পূজা করেন। ঐ ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে বসিয়া দৃঢ় মনঃসংযোগে শিব পূজা করিতেছেন, এমন সময়ে শিব দুর্গা মিলিত হইয়া সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছেন। দুর্গা ব্রাহ্মণকে দেখিয়া শিবকে কহিলেন "নাথ! এই ব্রাহ্মণ নিয়ত আপনার উপাসনা করিতেছে, অথচ অর্থাভাবে ব্রাহ্মণ নিতান্ত কষ্ট পাইয়া থাকে। উহাকে কিছু ধন দেন না কেন?" শিব শুনিয়া কহিলেন "আচ্ছা ঐ ব্রাহ্মণকে কিছু ধন দিব।" ঐ সময়ে এক জন সুবর্ণ বণিক স্নান করিতে আসিয়াছিল। সে শিব দুর্গার ঐ সকল কথা শুনিল, এবং মনে মনে বিবেচনা করিল, যখন স্বয়ং শিব ব্রাহ্মণকে ধন দান করিবেন, তখন সে ধন সামান্য হইবে না। অতএব ব্রাহ্মণের নিকট হইতে উহার অংশ লইবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই চিন্তা করিতে করিতে সুবর্ণ বণিক গৃহে গমন করিল। ব্রাহ্মণ নিবিষ্ট মনে ইষ্ট দেবের অর্চ্চনা করিতে ছিল, সে ইহার কিছুই জানে না। যথা সময়ে তাহার পূজা সমাপন হইলে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। ঐ সুবর্ণ বণিকের গৃহের পার্শ্ব দিয়া ঐ ব্রাহ্মণের গৃহে যাইবার পথ। যখন ব্রাহ্মণ উক্ত বণিকের বাটীর নিকট উপস্থিত হইল, তখন বণিক ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া সমাদরে বসাইল এবং কহিল "ভূদেব! আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক যদি আপনাকে এই ক্ষণে প্রদান করি, তাহা হইলে আপনি অচিরে যে ধন প্রাপ্ত হইবেন, তাহার অর্দ্ধেক আমাকে দিতে স্বীকার করেন কি না।" ব্রাহ্মণ কহিল "আমি নিতান্ত দরিদ্র; আমি ধন কোথায় পাইব যে আপনাকে দিব? আপনি কি জন্য এরূপ বিদ্রূপ করিতেছেন? সুবর্ণ বণিক কহিল আমি বিদ্রূপ করিতেছি না; আপনি ঐ কথা স্বীকার করুন, এই ক্ষণেই আমি আপনাকে আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক প্রদান করিতেছি। আপনি ধন প্রাপ্ত হয়েন দিবেন, না পান দিবেন না।" তখন ব্রাহ্মণ তাহা স্বীকার করিলে, বণিক তাহার অতুল সম্পত্তির অর্দ্ধেক তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিল। কিছু দিন পরে পুনরায় এক দিন, যে সময়ে ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে পূজা ও বণিক স্নান করিতেছিল, সেই সময়ে আবার শিব দুর্গা সেই স্থান দিয়া গমন

করিয়াছেন। তখন দুর্গা শিবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন "সে দিন যে ব্রাহ্মণকে ধন দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা দিলেন না? আপনার সর্ব্বদা এরূপ ভ্রম হইলে চলিবে কেন? এবং লোকেই বা আপনার উপাসনা করিবে কেন?" তখন শিব কহিলেন "প্রিয়ে! তুমি কি জান না, যে, আমি সেই দিনেই ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট ধন দিয়াছি! এখন ও ব্রাহ্মণ বিলক্ষণ ধনী হইয়াছে।" ভগবতী আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "সে কি? আপনি কবে উহাকে ধন দিলেন? সে দিন ঐ সুবর্ণ বণিক উহাকে আপনার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দিয়াছে বটে, কিন্তু আপনি যে দিবেন বলিয়াছিলেন তাহা দিলেন কৈ!" তখন দেব দেব মহাদেব সহাস্যে কহিলেন "প্রাণাধিকে! তুমি কি জান না যে আমার তহবিলে কিছু মাত্র থাকে না, সমস্তই লোকের জিম্মায় থাকে। আমি এক জনের নিকট হইতে আর এক জনকে দিয়া থাকি। আমার ধন কোথায়, যে দিব? ইহার ধন উহাকে ও উহার ধন ইহাকে দেওয়াই আমার কার্য্য।" তখন সুবর্ণ বণিক আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার নিন্দা করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

ঐ গল্পের সার কথা,—এক জনের ক্ষতি না করিলে কখন ও আর এক জন উন্নত হইতে পারে না। যাহারা সাক্ষাৎ ভাবে করে, তাহারা [illegible] ও যাহারা পরস্ব-ভাবে করে তাহারা যশস্বী হয়।

ফল শক্তির উপাসনা সাম্য ভাবের বিরোধী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা বলিয়াছি প্রকৃত সাম্য হইতে পারে না। কেননা সর্ব্বপ্রকারে সকলে সমান হওয়াকেই সাম্য বলে। তাহা অসম্ভব বটে, কিন্তু সকল মনুষ্যইত আপনার ন্যায় সুখ দুঃখের অধীন এবং আপনি দুঃখ পাইলে যেরূপ মর্ম্ম বেদনা পাই, পরে দুঃখ পাইলেও সেইরূপ পায়,—বিবেচনা করিয়া যাহাতে সকলেই সম্ভবমত দুঃখের দায় হইতে এড়াইতে পারে, তাহার যত্ন করাকেই সাম্য চেষ্টা বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক যদি সাম্য সম্ভব হয়, তবে ঐরূপ ভিন্ন অন্যরূপ সাম্য হইতেই পারে না। য়ুরোপীয়েরা কি ঐরূপ উপায় অবলম্বন করেন? অবশ্য বলিতে হইবে, কখনই না। কেননা যখন তাঁহারা শক্তির জয় ঘোষণা করিতেছেন ও যখন জানা যাইতেছে, শক্তি সকলের সমান নয়, তখন শক্তি হীনের দুঃখ মোচনে চেষ্টা তাঁহাদের কই? কি দেখিয়া বলিব যে তাঁহারা শক্তিহীন-গণেরও আপনাদের ন্যায় সুখ দুঃখ আছে, বিবেচনা করেন? তাঁহারা

শক্তিহীনের দুঃখে দুঃখিত হওয়া দূরে থাক, যাহাতে তাহারা সমধিক কষ্ট পায়, তাহারই যত্ন সর্ব্বতোভাবে করিয়া থাকেন।

আমরা ভারতীয় নীতি অনুসন্ধান করিলে, সাম্য নীতি পাইতে পারি। যে জাতি ভেদ প্রথা য়ুরোপীয় সভ্যতার চেলাগণ বৈষম্যের আকর মনে করেন, সেই জাতিভেদ প্রথার মধ্যেও ঐ সাম্য নীতি গূঢ় ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আমরা তাহা কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়া দিবার যত্ন করিব। যখন আর্য্য বুধগণ দেখিলেন, ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানের উচ্চতম সোপানে আরূঢ় হইলেন, ক্ষত্রিয়গণ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন, বৈশ্যগণ বাণিজ্যে বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন, তখন অন্যান্য অক্ষম ব্যক্তিবর্গের জন্য উচ্চতর বর্ণের সেবা, কৃষি ও শিল্প প্রভৃতি কার্য্য করিবার বিধান করিলেন।

আদিম কালে হইতে এ দেশে জাতিভেদ ছিল না এবং শূদ্র অনার্য্য পরাজিত জাতি নহে। মানব যখন বন্যাবস্থায় থাকে তখন প্রায় সকলেই সমান থাকে, ক্রমে যখন স্বাভাবিক বিঘ্ন সকল নিবারণ করিবার জন্য তাহাদিগকে শক্তি প্রকাশ করিতে হয়, তখন যে, যে পরিমাণ শক্তি প্রকাশ করিতে থাকে, সে সেইরূপ উন্নত হয়। বহুকাল পরে ঐ উন্নত ব্যক্তি বূহ আপনাদিগের সন্তানের শুভ কামনায় এবং অন্যান্য কারণ বশত এক জাতিতে মিলিত হয়। ভারতীয় পণ্ডিতগণ মানব জাতির কল্যাণ কামনায় ঐ জাতির সকলকে সমান রাখিবার চেষ্টা করেন। ঐ কল্যাণ সকলের মধ্যে আমরা আজি কেবল সাম্য ভাবের বিষয় মাত্র বলিব।

বুধগণ দেখিলেন, সমস্ত মানবই প্রাকৃতিক শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে অথচ শক্তি বিভিন্নতা হেতু তাহারা পরস্পর এত ভিন্ন প্রকৃতির হইয়াছে, যে তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র, রাজা, প্রজা ও দেবতা পশুর প্রভেদ হইয়াছে। যদি চিরকাল এইরূপ শক্তি উপাসনা চলিয়া যায়, যদি শক্তি অনুসারে মানবের ভোগাধিকার জন্মে, তাহা হইলে মানবের দুঃখের ইয়ত্তা থাকিবে না। তাহা হইলে এখন যেমন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বুদ্ধি জ্ঞান প্রভাবে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া শকটবান, সীবনকর, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, চর্ম্মকার প্রভৃতি সকল প্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ঐ সকল ব্যবসায়ীর জীবনোপায় নাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ভারতীয় ব্রাহ্মণগণও ঐরূপ করিবেন। আজি যেমন ইউরোপীয় বীরগণ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ভারত প্রভৃতি দেশের

শক্তিপ্রিয় জনগণকে বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদের উপর প্রভুশক্তি প্রকাশ করিতেছেন—ক্ষত্রিয় বীর এদেশে তাহাই করিবেন। আজি যেমন ইউরোপীয় বণিকগণ আপন দেশের অকর্ম্মণ্য চাক চিক্যশালী পদার্থ লইয়া নানা দেশের লোককে সৌখীন করিয়া তদ্বিনিময়ে ঐ ঐ দেশের তণ্ডুলাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রহণ করিয়া, ঐ সকল দেশে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করিতেছেন, আমাদের দেশের বৈশ্যগণও তাহাই করিবেন। আজি যেমন ইংলণ্ড ঐ সকল কারণে পৃথিবীর নানা দেশকে দারিদ্র দুঃখে দুঃখিত করিয়াছেন এবং এত ধন রাশি গ্রহণ করিয়াও স্বদেশের নিম্ন শ্রেণীকে ভয়ানক দরিদ্র করিয়াছেন—ভারতেও তাহাই ঘটিবে। অতএব শক্তির উপাসনা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করা আবশ্যক।

কিন্তু শক্তিমাহাত্ম্য খর্ব্ব করা অসম্ভব এবং করিলেও মানবের উন্নতি হয় না। এই জন্য তাঁহারা শক্তির মাহাত্ম্য রাখিলেন অথচ তাহার কুফল নিবারণ করিলেন। তাঁহারা নিয়ম করিলেন, ব্রাহ্মণ সর্ব্ব প্রকার বিদ্যা অনুশীলন করিয়া, সর্ব্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবেন বটে কিন্তু তাঁহাদের ভোগ সুখ পরিত্যাগ করিতে হইবে। সম্ভ্রমে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, দেববৎ সকলের পূজনীয় হইবেন, কিন্তু কাহারও বৃত্তি হানি করিবেন না। তাহার মূল উদ্দেশ্য থাকিল, জীব জগতের হিত সাধন করা। যাজন ও প্রতিগ্রহ লব্ধ ধন ব্যতিরেকে, আর কোনও প্রকার ধন তিনি গ্রহণ করিবেন না, সামান্য গৃহে বাস, সামান্য বস্ত্র পরিধান ও সামান্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক অধ্যয়ন অধ্যাপন ও দানাদি দ্বারা জগতের হিত সাধন করাই তাঁহার মুখ্য কার্য্য। তিনি যাহা কিছু করিবেন, তাহা জনসাধারণের হিতের জন্য, নিজের হিতের জন্য নহে। যে বৃত্তি অবলম্বন করিলে অন্যের ক্ষতি না হয়, সেই বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। ক্ষত্রিয় শারীরিক বলে সর্ব্ব প্রধান। বল দর্পে মানুষে না করিতে পারে এমন কর্ম্ম নাই। এই ভাবিয়া তাঁহাদের জন্য ব্যবস্থা হইল, তাঁহারা অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করিবেন। প্রজা প্রতি প্রতিপালন তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। তাঁহারা কখনও অন্যায় যুদ্ধ করিবেন না এবং শরণাগত হইলে অত্যন্ত শত্রুকেও ক্ষমা করিবেন। এই প্রকারে পণ্ডিতগণ পরাক্রান্ত উভয় জাতিকে এরূপ দমন করিয়াছেন, যে, তাহাদের দ্বারা কাহারও অনিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত জগতের মহান ইষ্ট সাধিত হয়।

এই রূপে বৈশ্য, শূদ্র ও বর্ণসঙ্কর সমস্ত জাতির জীবিকা অর্জনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, সকলেই স্ব স্ব পৈত্রিক বৃত্তি অবলম্বন করিবে; নিতান্ত আপদ না হইলে কেহ কখনও পরকীয় বৃত্তি গ্রহণ করিবে না। সুতরাং কোনও মনুষ্যের বৃত্তি লোপ হইবার সম্ভাবনা নাই। অন্ন বস্ত্র ও গৃহ সকলেরই জুটিবে। ইহার অভাবই প্রকৃত ও ভয়ানক অভাব। এক জাতীয় ব্যক্তির অপর জাতীয় বৃত্তি গ্রহণের নিয়ম থাকিলে, শক্তিমানদিগের উপায় হইত, শক্তিহীনের উপায় হইত না। শাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন, আপদ কালে মানবগণ ন্যূনতর বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে। কিন্তু কদাচ উচ্চতর বৃত্তি গ্রহণ করিবে না। অর্থাৎ শক্তির উপাসনা করিয়া কেহ উক্ত নিয়মের ব্যত্যয় করিয়া যেন সমাজে দুঃখ উৎপাদন না করে। কেবল মাত্র শক্তিহীনতা বশত স্বীয়পদোপযুক্ত কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া জীবনোপায় শূন্য না হয়, এই জন্য তাহাদের নিম্নতর বৃত্তি অবলম্বন করিতে ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু পাছে লোকে এই রূপে অলস হইয়া শক্তিহীন হয় ও নিম্ন শ্রেণীদিগের কষ্টের কারণ হয়, এই জন্য নিম্ন শ্রেণীর সম্মান বিলক্ষণ লাঘব করা হইয়াছে। ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন সুখ দুঃখ সকলের সমান নহে। যাহার যেরূপ কার্য্য করিবার অভ্যাস আছে, তাহাতে তাহার কষ্ট হয় না সুতরাং মেথরের বিষ্ঠা বহন ও কৃষকের রৌদ্র বাতে হল চালন তাদৃশ কষ্ট কর নহে। কিন্তু অন্য কোন জাতির তাহা করিতে হইলে অত্যন্ত কষ্ট হয়। নিম্ন শ্রেণী যদি উচ্চ হয়, তাহা হইলে উচ্চকে অবশ্য নীচ হইতে হইবে। তাহা হইলে উচ্চকে অত্যন্ত কষ্ট দেওয়া হইল। এই জন্য নিম্ন শ্রেণীর উচ্চ শ্রেণীর বৃত্তি অবলম্বন জন্য যাহাতে উচ্চ শ্রেণীর নিম্নতর বৃত্তি অবলম্বন রূপ দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য হইতে না হয়; অথচ অক্ষম হইলে যাহাতে অনশনে প্রাণত্যাগ না করে,—তজ্জন্য আপদ কালে ভিন্ন অন্য বৃত্তি অবলম্বন নিষেধ ও নিম্ন বৃত্তিঅবলম্বনের ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় জাতি ভেদ প্রথা—বৃত্তি রক্ষা ও দুঃখ নিবারণ রূপ সাম্য ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাঁহারা জাতিভেদ প্রথাকে বৈষম্যের পরিচয় বিবেচনা করেন, তাঁহাদের মূল যুক্তি এই যে ঐ প্রথা দ্বারা বাধ্য হইয়া কেহ উচ্চ, নীচ এবং কেহ সুখী ও কেহ দুঃখী হয়েন। এক জন চেষ্টা করিলে উচ্চ হইতে পারে কিন্তু জাতি ভেদ প্রথা তাহা করিতে দেয় না সুতরাং ইহা অত্যন্ত অত্যাচার ও অত্যন্ত

ঘৃণের বিষমতা। তাঁহাদের কথার তাৎপর্য্য এই যে, যাহার যেমন শক্তি ও চেষ্টা আছে, তাহাকে তদনুরূপ না হইতে দেওয়া অত্যাচার ও বিষমতা। এ বড় হাস্যাস্পদ কথা। ছোট বড় হওয়াকে সমতা বলে, না সমান হওয়াকে সমতা বলে? তাঁহাদের মতে ছোট বড় হওয়ার নাম সমতা হইতেছে—কেন না যাহার যেমন শক্তি, তাহাকে তদ্রূপ হইতে হইলে, মহা-ধন-সম্পন্ন রথ চাইল্‌ড্‌ ও আহার-সংস্থান-শূন্য ডিক্রু পিক্রুর ন্যায় প্রভেদ পদে পদে দৃষ্ট হয়। নব্য যুবক ইহাকেই কি তুমি সমতা বল? ঐরূপ সত্যের বিপরীত বলিয়া কি জাতিভেদ প্রথাকে বিষমতার কারণ বলিতেছ? তাহা যদি হয়, তবে জাতিভেদ প্রথা যে অনেক পরিমাণে সাম্য-বিধায়ক তাহা বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না। অন্তত ঐ প্রথা যে এক বিষয়ে সমতা-বিধায়ক সে বিষয়ে বোধ হয় নব্য যুবকের সন্দেহ নাই। সে বিষয় এই যে, সকলেই জীবের স্থিতির সর্ব্ব প্রধান প্রয়োজন—আহার, গাত্রাবরণ ও গৃহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনশনে কাহারও মৃত্যু না হয়, তাহার ভূয়ো ভূয়ো উপায় আর্য্য পণ্ডিতেরা করিয়াছেন।

প্রথমত দেখান হইল, যে জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত করাতে কাহারও বৃত্তি নাশ হয় না সুতরাং কাহাকেও অনশন জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। এক জাতিস্থ ব্যক্তিগণের পরস্পর সঙ্ঘর্ষ ও অক্ষমতা বা আপদ নিবন্ধন নিম্নতর বৃত্তি অবলম্বন নিবারণ জন্য; এবং অক্ষমতা, পীড়া প্রভৃতি কারণে যে সকলের অনশন কষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহাদের দুঃখ নিবারণ জন্যও আর্য্য ঋষিগণ অনেক ব্যবস্থা করিয়াছেন। সকল জাতিরই প্রধান কর্ত্তব্য-কার্য্য সকলের মধ্যে দান একটি প্রধান বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। প্রতিদিনের কর্ত্তব্যের মধ্যে অতিথি ও দরিদ্রদিগকে ভোজন করান নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে এবং মানবগণ পিত্রাদির শ্রাদ্ধ এবং পুত্র কন্যার জাতকর্ম্ম হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত যে কোন কার্য্য করুক, সকল কার্য্যেই প্রভূত ভোজন ও দান একান্ত আবশ্যক। এই সকল উপায় থাকাতে কাহাকেও অনশনে কষ্ট পাইতে হয় না, এবং এই সকল কর্ত্তব্য সাধন করিতে বাধ্য থাকায় গৃহস্থ ও ধনীগণ এক্ষণকার ন্যায় বাবু, ইন্দ্রিয় পরায়ণও পর পীড়ক হইতে পারেন না। য়ুরোপীয় নীতির বড় লোকেরা কেবল অর্থরাশি সংগ্রহ করিয়া বৃহৎ অট্টালিকা, বহুবিধ চাকচিক্যশালী গৃহ সজ্জা ও বেশ ভূষা প্রস্তুত ও বিবিধ আমোদে মত্ত হইয়া আত্মোদর পূরণ ও ইন্দ্রিয় সেবায় লিপ্ত থাকেন দেখিয়া, অত্যাবশ্যক দ্রব্যের অভাব-জনিত দুঃখ-প্রাপ্ত মধ্যবিধ বা দুঃস্থলোকগণের হিংসার পাত্র হয়েন কিন্তু ভারতীয়

নীতিপরায়ণ বড় লোকগণ সেরূপ হিংসার ভাজন হন না; প্রত্যুত দয়া, সৌজন্য নিষ্কামতা, পরসেবা প্রভৃতি গুণগ্রাম নিবন্ধন সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার কারণ হইতেন সুতরাং বড় লোকদিগের ন্যায় উচ্চপদ পাইলাম না বলিয়া, ক্ষুদ্রেরা দুঃখ প্রকাশ করিত না। বিশেষত অবস্থার অবনতিই দুঃখের কারণ, অবস্থার উন্নতি না হওয়া,—প্রকৃত দুঃখের কারণ নহে। যে মনুষ্য বাল্যাবধি যে অবস্থায় আছে, তাহার যদি তাহা অপেক্ষা নিম্ন অবস্থা না ঘটে, তবে কখনই তাহার বিশেষ কষ্টের কারণ হয় না। অবশ্য আমরা স্বীকার করি, যে আকাক্ষার বা দুরাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি কখনই হইতে পারে না। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি আমাদের উদ্দেশ্য নহে, সম্ভবও নহে। শান্তিই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য বলিতে হইবে। কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি না হইলে, কখনও শান্ত হইতে পারে না। যদি প্রত্যেকেই আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যস্ত হয়, তাহা হইলে তাহার নিজের ও অন্যের শান্তির ব্যাঘাত ঘটে, সুতরাং শক্তি সত্ত্বে ক্ষুদ্র বড় হইতে না পারিলে, আকাঙ্ক্ষা অপূরণ জন্য দুঃখ হয়, ঐ দুঃখ হইতে অশান্তির উদয় হইতে না দেওয়াই আর্য্য ঋষিগণের উদ্দেশ্য।

অনেকে বলিবেন, ভারতের নীতির ভয়ানক দোষ এই যে, উহাতে সমধিকরূপে সাধারণের শক্তি পরিচালিত হইতে না পারায় শক্তি সঙ্ঘর্ষ নিবন্ধন উন্নতি হয় না। আমরা তর্ক স্থলে যদি তাঁহাদের ঐকথা স্বীকার করি, তাহা হইলে বলিতে হইতেছে, যে শক্তির জন্য ও সাম্যের জন্য চেষ্টা করিতে হইলে মানবের উন্নতি হয় না। অতএব যদি শান্তি চাও তবে উন্নতি হইবে না যদি উন্নতি চাও ত শান্তি হইবে না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, মানবের শান্তি অর্থাৎ সুখ উদ্দেশ্য, না, সংঘর্ষজনিত অর্থাৎ নিয়ত কষ্টজনিত উন্নতি উদ্দেশ্য? বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন, আমাদের সুখই (ইহকালের হউক বা পর কালেরই হউক) পরম লক্ষ্য। যদি কেহ উন্নতিকেই পরম লক্ষ্য মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিতে হইবে, সাম্য চেষ্টা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। শক্তির উৎকর্ষ চেষ্টাই কর্ত্তব্য। আমরা এ প্রবন্ধে কোন নীতি উত্তম, তাহার বিচার করিব না। আমরা কেবল ইহাই দেখাইয়া দিলাম যে উন্নতি ও সাম্য পরস্পর বিপরীত এবং য়ুরোপীয় সভ্যতা সাম্য জনক নহে, সম্পূর্ণ বৈষম্য জনক। কিন্তু আধুনিক যুবক সম্প্রদায় ইয়ুরোপীয়দিগের দোহাই দিয়া বলেন, বৈষম্য জনক য়ুরোপীয় নীতি অবলম্বন কর এবং তাহা হইলে মানবের মুখ্য উদ্দেশ্য সাম্য হস্তগত হইবে। ইহা নিতান্ত অসার কথা।

হিন্দুধর্ম্মের নবজীবন।

৩। বর্ণভেদ। বর্ণভেদের মূল হিন্দু সমাজে এমনি দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করিয়াছে, এবং এতদূর প্রসারিত হইয়াছে যে, উহাকে উৎপাটিত করা দুঃসাধ্য। অনেক দিন হইতে অনেক সমাজ সংস্কারক বর্ণভেদের বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তথপি উহা সতেজ রহিয়াছে। বোধ হয়, তাহার একটি প্রধান কারণ, তাঁহারা হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছেন। না। নূতন নাম ধরিয়া, নূতন দল বাঁধিয়া, হিন্দু সমাজের দুই চারিটি ডাল কাটিয়া রোপণ করিলে বিশেষ ফল দর্শিবে না। ডাল গজাইল; নূতন গাছ হইল; "জাতির" সংখ্যা বাড়িল মাত্র—হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ যে সেই রহিল, কালে আরও বদ্ধমূল হইল। মিথ্যাকে সত্য করিতে চেষ্টা না করিয়া, কপটাচরণ না করিয়া, যথাসাধ্য হিন্দু সমাজের ভিতর থাকিয়া, বর্ণভেদের মূলে ক্রমাগত কুঠারাঘাত কর, কালে উৎপাটিত হইবেই হইবে।

আর্য্যেরা ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিবার সময় অনেক স্থানে অনার্য্যদিগকে পরাজয় করেন। আর্য্যেরা বিজেতা, অনার্য্যেরা বিজিত; আর্য্যেরা সভ্য, অনার্য্যেরা অসভ্য; আর্য্যেরা গৌরবর্ণ, সুপুরুষ, অনার্য্যেরা কৃষ্ণবর্ণ, কদাকার। এরূপ অবস্থায় পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যত্র যাহা ঘটিয়াছে, এবং অদ্যাপি ঘটিতেছে, ভারতবর্ষেও তাহা ঘটিয়াছিল,—আর্য্যে আনার্য্যে বর্ণভেদ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন? এখন আর্য্য, অনার্য্য অনেকটা মিশিয়া গিয়াছে, সকলেই কৃষ্ণবর্ণ; এখন আর্য্য অনার্য্য সকলেই বিজিত, পদানত। এখন এক নূতন গৌরবর্ণ, প্রভূত ক্ষমতাশালী জাতি হইতে, কি আর্য্য কি অনার্য্য সমুদয় ভারত সন্তান ভিন্ন বর্ণ। এখন আর আমরা কি বলিয়া বর্ণভেদ বজায় রাখি? সমুদয় ফ্রান্সবাসী যেরূপ একজাতি, সমুদয় ইংলণ্ডবাসী যেরূপ একজাতি, আমরা যদি সেইরূপ একজাতি হইতে চাই, তাহা হইলে বর্ণভেদ রক্ষা করিলে চলিবে না। সমুদয় ভারতবাসী একজাতি, সমুদয় ভারতবর্ষ আমাদের দেশ—ইহা নূতন এবং মহৎ ভাব। এখন আর ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে, শূদ্রে শূদ্রে, ব্রাহ্মণে শূদ্রে, বঙ্গে মহারাষ্ট্রে, মহারাষ্ট্রে পঞ্জাবে, বঙ্গে

আসামে, বর্ণভেদ-জনিত সঙ্কীর্ণ সম্বন্ধ থাকা কি অসঙ্গত নহে? শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু "নবজীনে" মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, যে যথার্থ ব্রাহ্মণ গুণে, জন্মে নহে—গুণবান শূদ্র ব্রাহ্মণ, নির্গুণ ব্রাহ্মণ শূদ্র। যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণ লক্ষণ, ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্র লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শূদ্রবংশ্য হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণবংশ্য হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে না হয়, তাহারাই শূদ্র।" * অতএব আমাদের প্রস্তাব ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে—বরঞ্চ ধর্ম্ম সঙ্গত।

বর্ণভেদ থাকা প্রযুক্ত যে কিরূপ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে, এখানে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। বর্ণভেদ সত্বে—হিন্দুর পক্ষে বিদেশ ভ্রমণ এক প্রকার অসম্ভব। মনে কর, কেহ ইউরোপে যাইবে; তাহাকে শ্রেষ্ঠবর্ণের বা সবর্ণের পাচক সঙ্গে লইতে হইবে। পাচক লইবার সঙ্গতি নাই, সে কি করিবে? পাচক লইলেও অনেক স্থলে হিন্দু সমাজের নিয়মানুসারে রন্ধন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

বর্ণভেদ থাকিতে হিন্দু ধর্ম্মের বল বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। যদি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী কেহ হিন্দু ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণেচ্ছুক হয়, হিন্দু ধর্ম্ম কেন না তাহাকে আশ্রয় দিবে? প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের শাখা মাত্র; বৌদ্ধদিগকে হিন্দুর মধ্যে গণ্য করায় হিন্দু ধর্ম্মের কোন ক্ষতি নাই, বরঞ্চ লাভেরই সম্ভাবনা।

জ্ঞানালোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণভেদের বন্ধন ক্রমশ শিথিল হইয়া যাইতেছে। আজকাল, কয়জন শিক্ষিত হিন্দু ম্লেচ্ছ-স্পর্শে পাপ মনে করেন? আজকাল শিক্ষিত হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ শূদ্রের আকাশ পাতাল প্রভেদ কি ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে না? নব্য সম্প্রদায়ের কয়জন; নিকৃষ্ট বর্ণীয় পাচক প্রস্তুত খাদ্য (বা হিন্দু ধর্ম্মের নিষিদ্ধ খাদ্য) উদরস্থ করা পাপ মনে করেন?

৪। বিধবা বিবাহ নিষেধ। বিধবাবিবাহ যে হিন্দু ধর্ম্মে নিষিদ্ধ নহে, তাহা মান্যবর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। তবে কেন হিন্দু সমাজ বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত? অনেক পতিব্রতা সাধ্বী

* "নবজীবন" মাঘ, ৪৯৭

বিধবার মনে দ্বিতীয়বার বিবাহের ভাব হয়ত কখনও উদিত হইবে না, তাঁহারা পতিব্রতার আদর্শ; হিন্দু গৃহ উজ্জ্বল করিতে থাকুন। কিন্তু তাই বলিয়া যে হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ থাকিবে, তাহা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

৫। বাল্য বিবাহ ইহা যে, মোটের উপর, কুফল প্রদ তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অনেকেই এ বিষয়ে ভুক্তভোগী—অতএব অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

যেরূপ প্রাচীরস্থ তরুলতা প্রাচীন অট্টালিকার অংশ হইলেও, উহার পক্ষে হানিজনক, সেইরূপ উপরোক্ত সামাজিক নিয়ম সমূহ এখন হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত হইলেও উহার শত্রু। ঐ সকলে নিয়মের উচ্ছেদে, হিন্দুধর্ম্মের লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই। ফলত হিন্দুধর্ম্মের স্থায়িত্বের জন্য উহাদের বিনাশ অত্যাবশ্যক।

সমাজবদ্ধ হইলেই মনুষ্যকে আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, অনেক বিষয়ে সমাজের অধীন হইতে হয়। ইহা জানা কথা। অনেকে ইহার বিকৃত অর্থ করিয়া, সমাজে যে কোন নিয়ম প্রচলিত থাকে, ভালই হউক, আর মন্দইহউক, তাহার চির স্থায়িত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের মত, আমরা যে সকল নিয়মের উল্লেখ করিলাম, বিচার সঙ্গত হউক আর না হউক, উন্নতি বিরুদ্ধ হউক আর না হউক, হিন্দু সমাজের সভ্যদিগের পক্ষে ইহা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। কারণ, ঐ সকল নিয়ম অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে; না মানিলে সমাজের সুশৃঙ্খলা রক্ষা হয় না। যাঁহারা এরূপ মত প্রকাশ করেন, এবং বাস্তবিক তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু আর একটু উন্মীলিত হওয়া আবশ্যক। বস্তুত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই উল্লিখিত নিয়ম সমূহের উপর আন্তরিক আস্থা আদৌ নাই। অন্তত কখন কখন, তাঁহাদিগের উহার কোন কোনটির প্রতিকূলাচারী হইতে দেখা যায়। সে যাহা হউক, উল্লিখিত নিয়ম সমূহ প্রতিপালনে বিরত হইলে, সমাজে যে কি বিশৃঙ্খলতা, কি ঘোর বিপদ ঘটিবে, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে অসমর্থ। মনে কর কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার শ্রদ্ধাস্পদ, হৃদয়ের বন্ধু, কোন শূদ্রের সহিত এক সঙ্গে আহার করিলেন, তাহাতে সমাজের কি হানি হইল? মনে কর কোন পিতা তাহার অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যার দ্বিতীয় বার বিবাহ দিলেন — তাহাতে সমাজের ক্ষতি কি? মনে কর

কোন ব্যক্তি বাণিজ্য বা জ্ঞানলাভের উদ্দেশে ইউরোপ যাইলেন, নিষিদ্ধ খাদ্য খাইলেন, বর্ণভেদের বন্ধন ছিঁড়িলেন, তাহাতে তাঁহার নিজের, সমাজের এবং দেশের উপকারের, না অপকারের সম্ভাবনা? স্বীকার করি, যে ভিন্ন বর্ণে বিবাহ হইলে—তাহার এখনও অনেক বিলম্ব—আইন লইয়া একটু গোল হইতে পারে। কিন্তু, আইন সমাজের জন্য, না সমাজ আইনের জন্য? সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইনেরও পরিবর্ত্তন হইবে।

হিতকারি, উন্নতিশীল পরিবর্ত্তনে যদি বিশৃঙ্খলতা হয়, তাহা হইলে সেরূপ বিশৃঙ্খলতা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। সেরূপ বিশৃঙ্খলতা ব্যতীত ব্যক্তিগত বা সমাজগত উন্নতি সাধিত হয় না। আধুনিক বিজ্ঞান পড়িয়া অনেক খ্রীষ্টানের মনে বিশৃঙ্খলতা জন্মে; বাল্যকালে যে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল, তাহাতে বিষম আঘাত লাগে, মন বিচলিত হয়—তবে কি সে বিজ্ঞানপাঠ বন্ধ করিবে? পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রযুক্ত আমাদের মনে বিশৃঙ্খলতা জন্মে, সমাজের যে সকল প্রথা যুক্তি-বিরুদ্ধ এবং হানিজনক বলিয়া প্রতীতি হয়, তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি থাকে না—তবে কি আমাদের স্কুল কলেজ বন্ধ করিতে হইবে? তাহা হইলেত সমাজের শৃঙ্খলতা-রক্ষাকারিদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

বলা বাহুল্য, যে, যে পরিবর্ত্তনে উন্নতি সম্ভব, কেবল তাহাই অবলম্বনীয়। সমাজের যে সকল প্রথা স্পষ্টরূপে ধর্ম্ম বিরোধী, নীতি বিরোধী, বা হানিজনক নহে, সেগুলি যেন আমরা রক্ষা করি। পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফলের সঙ্গে সঙ্গে কুফলও ফলিতেছে। সুফলের গাছগুলিরই আমরা যত্ন করিব। কতকগুলি বৃক্ষে ফল ধরিয়াছে; তন্মধ্যে যে যে বৃক্ষের ফল মিষ্ট, কেবল তাহাই রক্ষণীয়।

ভারতবর্ষের নবজীবনের সঙ্গে সঙ্গে, হিন্দুধর্ম্মের নবজীবনের সূত্রপাত হইয়াছে। ভাল চিহ্ন, আনন্দের বিষয়। কিন্তু যেন আমাদের স্মরণ থাকে, যে নবীন উৎসাহ, নূতন প্রেম, নবানুরাগ সচরাচর প্রবল হইলেও সকল সময়ে স্থায়ী হয় না। হিন্দুধর্ম্মের উপর নব্যবঙ্গের যে অনুরাগ, যে উৎসাহ দেখা যাইতেছে, তাহার স্থায়িত্ব যদি আমাদের বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে, আমাদের ধর্ম্মকে সমাজ হইতে কতকটা বিচ্ছিন্ন করা অত্যাবশ্যক। হিন্দুধর্ম্মের সহিত হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান সম্বন্ধ অধিক দিন থাকিবে না।—থাকিতে পারে না। হিন্দুধর্ম্ম যতই কেন উদার হউক না, বিশ্বাস সম্বন্ধে যতই কেন

প্রশস্ত হউক না, আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত হিন্দুধর্ম্মের যতই কেন সামঞ্জস্য থাকুক না, যতদিন ইহা অবনতিগ্রস্ত, অদূরদর্শী, সঙ্কীর্ণমনা, সমাজের দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে, ততদিন ইহা নবজীবন পাইবে না।

শ্রীপ্রমথনাথ বসু।

বসন্ত পূর্ণিমা।

১

আ—ছি ছি! শশধর! কেন অত হাসি?
একটু থাম না ভাই,
আর কি সময় নাই?
স্বর্গের দেবতা কি হে এতই বিলাসী?
বসন্তের হাওয়া খাওয়া,
নিশিতে বেড়াতে যাওয়া,
তোমার এ বাবুগিরি নাহি ভালবাসি!
অই দেখ কত তারা,
বালিকা রূপসী যারা,
পলাইছে তব ডরে পাড়ার পড়সী!
আকাশের ক্ষুদে মেয়ে
কি বলিবে ঘরে যেয়ে,
ভেঙেছে আছাড় খেয়ে কাঁকের কলসী!
আ—ছি ছি! শশধর কেন অত হাসি?

২

বোঝ না যে তুমি ভাই এই বড় দুখ,
পথে ঘাটে দেখা পেয়ে
গৃহস্থের বউ মেয়ে,
কে থাকে অমন চেয়ে নির্লাজ কামুক?
* * *
* * *
* * * * *
খেলে কি লাজের মাথা?
আ—ছি! শোন না কথা,
এখনো রাখিয়া দেও তামাসা কৌতুক,
বোঝ না যে শশধর এই বড় দুখ!

৩

আ—ছি ছি! শশধর অত কেন হাসি?
বহুদিন হতে ভাই!
ফিরিয়া ফিরিয়া যাই,
বলিতে একটি কথা প্রতিদিন আসি,
বলিতে পারি না নিতি,
এ তোমার কি যে রীতি
শোন না কাজের কথা, শুধু হাসা হাসি
না লও কিছুর তত্ত্ব,
সদা আছ উনমত্ত,
মানবের হতে যেন ভোগ অভিলাষী!
আসে কি সত্যই হায়
দক্ষিণ মলয় বায়—
তোমার গায়ের গন্ধ পরিমল রাশি?
মাখিয়াছ পমেটম্,
লাবেণ্ডার ডিকলন্,
বাঙ্গালী বাবুর মত তুমিও বিলাসী!
হেমময়ী তারাগুলি
রূপের বাজার খুলি

মিলেছে মেলায় যেন পারিসে রূপসী।
আকাশের আকবর
তুমি কি হে শশধর?
আজি তব খোসরোজ নিশি পৌর্ণমাসি।
আ—ছি ছি! শশধর অত কেন হাসি?

৪

কি লাগিয়া অত হাসি হাস শশধর?
লাজ নাই, লজ্জা নাই,
ছি ছি লাজে মরে যাই!
বড়ই নিলাজ ভাই তুমি সুধাকর!
গৃহস্থ মেয়ের কাছে
অত কি হাসিতে আছে?
স্বর্গের দেবতা কি হে এতই বর্ব্বর?
শশাঙ্ক! তোমারে নরে
বৃথা নিন্দা নাহি করে,
চির কলঙ্কীর বল, কলঙ্কে কি ডর?

৫

আ—ছি ছি! অত হাসি কেন শশধর?
পাষাণ বাঁধিয়া বুকে
হাস তুমি কোন্ সুখে,
মর্ত্ত্যের মানব আমি চক্ষের উপর।
দুঃখ দরিদ্রতা ভরা,
দেখ না কি বসুন্ধরা—
নানা রোগে শোকে হেথা ক্লিষ্ট কলেবর?
কাঁদে কত পুত্র হীনা,
ভগিনী সোদর বিনা,
দিবানিশি বিধবার নয়নে নির্ঝর!
বিড়ম্বিত মোর মত
আছে হতভাগ্য কত,
প্রাণভরা ধু ধু করে মরু ভয়ঙ্কর!
হায় হায় কত পাপে,
বর্ষে অশ্রু অনুতাপে,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে কত নারী নর!
ইহা কি দেখিয়া নিত্য
হয় না ব্যথিত চিত্ত,
বসন্তের হাওয়া খেয়ে বেড়াও নাগর?
কঠিন শিলার সম
প্রাণ তব নিরমম
ধিক্ দেবতার নামে ওহে শশধর,
নির্ম্মম মানব মত
দৃক্‌পাত নাহি তত,
দুয়ারে দরিদ্র মরে ক্ষুধায় কাতর,
ধিক্ তব দেবনেত্রে, ওহে শশধর!

৬

বল শশি বল শুনি হাস কোন্ প্রাণে,
ঘৃণা, লজ্জা, ঈর্ষা, দ্বেষ,
পাতকের একশেষ—
চৌর্য্য, হত্যা, দস্যুবৃত্তি নিয়ত যেখানে;
ভগিনী ভ্রাতার সনে
কথা কয় পাপমনে,
প্রবঞ্চিত করে জায়া প্রেম প্রতিদানে!
নরের সে অধোগতি
নিরখিয়া, নিশাপতি,
সত্যই করুণা কি হে হইল না প্রাণে?
হৃদয় বেঁধেছ হায় এমনি পাষাণে?

৭

কি করে কঠিন এত হলে শশধর?
আহা হা ভারত ভূমি,
কি ক'রে দেখিয়া তুমি
ধৈরজ ধরিয়া আছ, কাঁদে না অন্তর?

যে দেশের বসুন্ধরা,
গোলকুণ্ডা হীরা ভরা,
বহিছে কনক রেণু পর্ব্বত নির্ঝর!
যে দেশে তোমার মত,
ওঠে শশী শত শত
ইন্দিরা অমৃত সহ মথিলে সাগর!
যে দেশে শ্মশান ভস্মে,
সুন্দর সবুজ শস্যে
হেমন্তে এখনো হাসে দিগন্ত প্রান্তর!
সেই দেশে হায় হায়,
সন্তান চিবায়ে খায়
ক্ষুধার্ত্ত জননী নিত্য, পুরিতে উদর!
বল শুনি কোন প্রাণে,
চেয়ে সে মায়ের পানে,
কি করিয়া এত হাসি হাস শশধর?
নর দুঃখে অমর কি হয় না কাতর?

৮

সত্যই ভারত দেখে কাঁদে নাকি প্রাণ?
অযোধ্যার রাজগৃহে,
সত্যই কখনো কি হে
এক বিন্দু অশ্রু জল কর নি প্রদান?
কখনো কি কুরুক্ষেত্রে,
দেখ নি সজল নেত্রে,—
আপনার বংশধ্বংস—সন্তান শ্মশান?
সত্যই এ সব দেখি কাঁদে নি কি প্রাণ?
যে দেশের বীর নারী,
বর্ম্ম চর্ম্ম অসিধরি,
রণ রঙ্গে রণচণ্ডী করেছে সংগ্রাম,
অস্ত্রের বিধির ডরে,
সেই দেশে শোভা করে,
তালপত্র তরবারি কালীর কৃপাণ!
যে জাতির পদভরে,
বাসুকি কাঁপিত ডরে,
অদ্যাপিও ভূমিকম্পে ধরা কম্পমান,
তাহাদেরি আজ হায়,
পদাঘাতে প্রাণ যায়;
শৃগাল শঙ্কায় কাঁপে সিংহের সন্তান!
কিসে ইহা দেখি শশি,
হাসিতেছ এত হাসি,
এতই কি অমরের হৃদয় পাষাণ?
পতিত ভারত দুখে নাহি কাঁদে প্রাণ?

৯

নাহি কাঁদে না কাঁদুক,—কিন্তু শশধর!
জিজ্ঞাসি একটি কথা দাও হে উত্তর?
শুনেছি লোকের কাছে,
তোমার হে সুধা আছে,
সুধার আকর তাই তুমি সুধাকর।
যে সুধায় মরা বাঁচে,
তাই কি তোমার আছে?
জিজ্ঞাসি সরল মনে দাও না উত্তর।
যে সুধায় ওহে সোম!
বাঁচিল গ্রীরিস রোম,
সেই সুধা আছে, কিহে ওহে শশধর?
নীরব রহিলে কেন? দাও না উত্তর।

১০

মিছা কথা—প্রবঞ্চনা—
কিছুতে বিশ্বাস মম হয় না কখন,
—তুমি সুধাকর সেই সুধা প্রস্রবণ!
তোমার কৌমুদী হাসি,
সঞ্জীবনী সুধারাশি

পর্শিলে শবের অঙ্গ লভে সে জীবন!
প্রাণ ভরা যে দুর্ভোগ,
অধীনতা মহারোগ,
তব ও কিরণ স্পর্শে করে পলায়ন!

১১

শশধর!
যদি তাই সত্য হবে,তা হ'লে কি আর,
সোণার ভারত এত হ'ত ছারখার!
নিত্য হাস এত হাসি,ছড়াও কৌমুদী রাশি
অমৃতে ছাইয়া ফেল কানন কান্তার,
কোথা সে কোশল দেশ,
ইন্দ্র প্রস্থ ভস্মশেষ!
জাগিল না এ জনমে জাঠ মারবার!
এই যে ভারত ভরা,
শশধর এত মরা
এত চিতা ভস্মরাশি—এত পোড়া হাড়
কে বাঁচিল—কই কই,
বল শুনে সুখী হই,
জাগিল কি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ পুনর্ব্বার?
মৃত কি বাঁচিল কেহ অমৃতে তোমার?

১২

আ—ছি ছি!
তবে কেন অত হাসি হাস শশধর?
লজ্জাহীন জ্ঞানহীন,
মূর্খ তুমি চির দিন,
সুধা নাই তবু ধর নাম সুধাকর!
দেবতার ভোগ্য যাহা,
চণ্ডালে দিয়েছ তাহা,
ভাবিতে পারি না চিত্ত কাঁপে থর থর!
এখন তোমারি বলে,তোমারে গ্রাসে কবলে
প্রবঞ্চক ধূর্ত্ত রাহু কৃতঘ্ন পামর!
সে চণ্ডাল স্পর্শে হায়,
আরো দেখ শুভ্রকায়
মেখেছ কলঙ্ক কালি কত শশধর,
ছি ছি ছি! তথাপি হাস, নিলাজ অমর?

১৩

যাও তুমি দূর হও—
ভারত আকাশে এসে উঠিও না আর;
মিলে সেই ভাই ভাই,
সিন্ধু বঙ্গ এক ঠাঁই,
যদি শক্তি থাকে তবে ফিরে পুনর্ব্বার,
উত্তোলিব নব শশী মথি পারাবার!
যে সুধায় বাঁচে মরা,
সে বিধু সে সুধা ভরা,
সৌভাগ্য পূর্ণিমা দিনে হাসিবে আবার,
বিনাশিব সুদর্শনে রাহু দুরাচার!
মৃত এ কৌমুদী রাশি,
এ হইতে ভাল বাসি—
অমা রজনীর সেই ঘোর অন্ধকার,
সুধাশূন্য সুধাকর হাসিও না আর!

অবতার বাদ।

ঈশ্বরের অবতার বলিয়া একটি কথা আছে। এই কথাটির অর্থ ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করেন। অনেকের বিশ্বাস, যে ঈশ্বর একজন মহান্ পুরুষ, স্বর্গের ন্যায় কোন স্থানে বসিয়া আছেন, এবং সেই থান হইতেই পৃথিবী বা অন্য অন্য গ্রহ নক্ষত্রাদির কার্য্য সকলের উপর কর্তৃত্ব করিতেছেন ও প্রাণীগণকে সৃষ্টি করিয়া পৃথিবী বা অন্য কোন স্থানে প্রেরণ করিতেছেন তাঁহারা অবতার কথায় এইরূপ বুঝেন, যে ঈশ্বর সেই নিজস্থান হইতে পৃথিবীতে আসিয়া লীলা করিবার নিমিত্ত জীবরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই জীবরূপধারী ঈশ্বরকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া লোকে বলে। বিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে এমন কথা শুনা যায়, যে, বিষ্ণু যখন পূর্ণাংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি বৈকুণ্ঠ শূন্য করিয়া আসেন।

কোন কোন একেশ্বরবাদীরা এইরূপ অবতার কথার অর্থ বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া, অবতার বাদ স্বীকার করিতে পারেন না। যে আত্মা সর্ব্বব্যাপী, বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থে স্থিত থাকিয়া উহার জীবনরূপে যিনি প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহার আবার কোন বিশেষ শরীরে আবির্ভাব বা তিরোভাব কথার অর্থই নাই। কোন স্থানে কি সেই আত্মার অভাব হইতে পারে, যে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া তিনি অন্য স্থানে অবতীর্ণ হইবেন? ঈশ্বর নিরাকার এবং অনন্ত; তিনি যে কোন জীব দেহ ধারণ করিবেন ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এইরূপ যুক্তি দেখিয়া, কোন কোন লোক হিন্দু শাস্ত্রের অবতার-বাদকে কুসংস্কার পূর্ণ মনে করেন।

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে অবতার কথা কি অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা সবিশেষ বুঝিলে অবতার বাদকে কুসংস্কার পূর্ণ বলিতে পারা যায় না।

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এক এবং ইহা এক শক্তি দ্বারা চালিত হইতেছে। এই অনন্ত শক্তিই ঈশ্বর এবং সেই শক্তির কার্য্যক্ষেত্রই প্রকৃতি। এই এক শক্তিই বিশ্বের কোন অংশকে চিন্ময়, কোন অংশকে জড় ভাবাপন্ন করিয়াছে। এই এক শক্তির প্রভাবেই বিশ্বের কোন অংশ সত্ত্বগুণ প্রধান, কোন অংশ রজোগুণ প্রধান, আবার কোন অংশ তমোগুণ প্রধান। আমরা সমগ্র বিশ্ব একেবারে অন্তরে ধারণ করিতে সক্ষম নহি, সেই জন্য কোন বিশেষ বিশেষ

অংশে বিশেষ বিশেষ গুণের প্রাধান্য দেখিতে পাই। যদি এই সমগ্র বিশ্ব অন্তরে একেবারে ধারণা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম, যে সেই এক ঐশ্বরিক শক্তির বশে প্রকৃতি কোন্ গুণে গুণময়ী হইয়াছেন।

হিন্দু শাস্ত্রকারগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ এক ঐশ্বরিক শক্তির বশে সমগ্র প্রকৃতির যে অবস্থা, তাহা নির্গুণ অবস্থা অর্থাৎ আমরা যাহাকে গুণ বলিয়া বুঝি, সেরূপ কোন গুণ তাহাতে নাই। এই নির্গুণ অবস্থাপন্ন প্রকৃতি আমাদের পক্ষে সমষ্টিভাবে প্রতীত না হইয়া, ব্যষ্টি ভাবে প্রতীত হয়। এই জন্য কোন অংশ সত্বগুণ ময়ী, কোন অংশ রজো গুণ ময়ী, কোন অংশ তমো গুণ ময়ী বলিয়া বুঝি। যেমন একই সূর্য্যকিরণ ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যে পতিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, কিন্তু সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সমষ্টিবর্ণ সেই সূর্য্য কিরণের বর্ণ, সেইরূপ নির্গুণ প্রকৃতি ব্যষ্টিভাবে প্রতীয়মান হইয়া সত্ব-রজো-তমো-গুণ ময়ী হইয়াছেন।

হিন্দু শাস্ত্রে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, এই তিনটি দেবতা, এই তিন গুণের অভিব্যঞ্জক। হিন্দুরা কিন্তু বিষ্ণুরই অবতারের কথা কহিয়া থাকেন। ইহাতে আমরা এই বুঝি, যে, যাঁহাকে ঈশ্বরেরর অবতার বলা যায়, তিনি সত্বগুণের অবতার।

যদি অনন্ত শক্তিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, তবে প্রত্যেক ভাগও অনন্ত শক্তি হইবে, ইহা গণিত শাস্ত্রের কথা। অর্থাৎ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যে অংশ যে শক্তি দ্বারা সত্ব গুণ ময়ী বলিয়া বোধ হয়, তাহাও অনন্ত। তবে সেই অনন্ত শক্তি কি জীব বিশেষে প্রকাশ পাইতে পারে?

আমরা বলি, যে অবতার-জীবে অনন্ত প্রকৃতির সত্ব গুণ ময়ী অনন্ত শক্তির আবির্ভাব হয় না। অনন্ত প্রকৃতি তাঁহার সত্ব গুণ ময়ী অনন্ত শক্তির বলে, যে গুণ ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন, সেই গুণের আবির্ভাব হয়।

মনে কর এক বাটী জলে কিয়ৎ পরিমাণ তেজশক্তির ক্রিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলাম, যে, সেই তেজ শক্তির বশে ঐ জল বাষ্পাকারে পরিণত হইল। ঐ শক্তির বশে ঐ জল বাষ্পীয় গুণ পাইল। ঐরূপ দুই বাটী জলে পূর্ব্বের শক্তির দ্বিগুণ শক্তির ক্রিয়া বশত সমস্ত জল ঐ বাষ্পীয় গুণ পাইবে। সেইরূপ কোটী বাটী জল লও, আর পূর্ব্বোক্ত শক্তির কোটী গুণ শক্তি তাহাতে প্রয়োগ কর; জল সেই বাষ্পরূপেই পরিণত হইবে; অথবা বাষ্পীয় গুণ পাইবে। কোটি বাটী পরিমিত জলের বাষ্পে যে শক্তি রহিয়াছে, এক বাটি জলের বাষ্পে সেই শক্তি আছে বলিতে পারি না;

কিন্তু উভয়েরই গুণ, যে বাষ্পীয় গুণ, তাহা বুঝিতে পারি। সেইরূপ সত্ত্ব গুণময়ী অনন্ত প্রকৃতির অনন্ত শক্তি কোন ব্যক্তি বিশেষ অবতীর্ণ হইতে পারে না, ইহা স্বীকার করি; কিন্তু অনন্ত প্রকৃতির সত্ত্বগুণ যে কোন ব্যক্তি বিশেষে আবির্ভাব হইতে পারে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি।

সত্ত্বগুণময়ী অনন্ত প্রকৃতি অনন্ত শক্তির বশে যে নির্ম্মল সত্ত্ব ভাবাপন্ন হন, যে ব্যক্তি সেইরূপ নির্ম্মল সত্ত্ব ভাবাপন্ন, তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলা যায়। অবতার ঈশ্বরের বা ঐশ্বরিক শক্তির হয় না। ঐশ্বরিক গুণের অবতার হইয়া থাকে।

সত্ত্বগুণ কাহাকে বলে? যেখানে জ্ঞানের প্রকাশ, সেইখানে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য; যেখানে জড়ের জড় শক্তির প্রকাশ, সেইখানে তমোগুণের আধিক্য। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলেন, যে কালচক্রের গতি অনুসারে একই স্থলে তমো রজো ও সত্ত্ব গুণের ক্রম বিকাশ হইয়া থাকে। আজি কালকার ক্রম বিকাশ বাদ (Evolution Theory) দ্বারা ইহা বুঝা যায়, যে এই পৃথিবী এক সময়ে জড় ভাবাপন্ন ছিল; ক্রমে ক্রমে ইহাতে উদ্ভিদ, জীব জন্তু মনুষ্যের বিকাশ হইয়াছে। অন্যান্য জড় বস্তু উদ্ভিদ, জীবাদির সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, যে মানুষে যে গুণের আধিক্য এবং অন্যান্য বস্তুতে যাহা নাই, সেই জ্ঞানময় গুণই সত্ত্বগুণ। ক্রম বিকাশের চরম অবস্থায় মনুষ্য পূর্ণ সত্ত্বগুণময় হইবে।

বাস্তবিক প্রকৃত মনুষ্যত্বই আমাদের মতে সত্ত্বগুণ; প্রকৃত মনুষ্যের চরম আদর্শই সত্ত্বগুণের অবতার বা বিষ্ণুর অবতার।

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। পৃথিবী যখন অধর্ম্মে উৎপীড়িত হন, তখন ঐ স্বাভাবিক নিয়মের বশেই ধর্ম্ম সংরক্ষণ ক্ষম পুরুষের পৃথিবীতে আবির্ভাব হওয়া প্রয়োজন হইয়া উঠে এবং সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

ক্ষুদ্রের নিবেদন।

কুঞ্চিত-কপাল বক্র নাসা, কেন ভাই তুমি অমন করিয়া চাহিতেছ? অত রাগ কেন? কে তোমার সুখে বাধা দিতে চাহিতেছে? কাহার অসদৃশ ব্যবহার দর্শনে তুমি মর্ম্মে স্পৃষ্ট হইয়াছ? বুঝাইয়া বলনা ভাই! আমি ক্ষুদ্র; তোমার ভ্রূকুটি দর্শনে প্রাণে কাঁপিতেছি; সত্য করিয়া বল তুমি কে? কাতরোক্তি শুনিয়া তোমার কি দয়া হইবে না? একবার প্রশস্ত ললাটখানিকে সরল করিয়া একটু অভয় দাও না ভাই! বহুকাল হইতে তোমাকে দুটা দুঃখের কথা বলিবার আছে, আজি বলিয়া লই; উত্তর চাহি না; কেবল তুমি শুনিলেই আমার যথেষ্ট হইবে। কই, মুখভঙ্গি ত সরল করিলে না? বুঝিয়াছি ওটি তোমার অভ্যাস-দোষ। ভাল, আমার যাহা বলিবার আছে বলিয়া যাই, আশা করি তুমি শুনিবে।

আচ্ছা ভাই মহান্! তুমি আমাকে অমন করিয়া ঘৃণার চক্ষুতে দেখ কেন? আমার নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠ কেন? আমাকে ধ্বংস করিবার জন্য তুমি চিরকাল খড়্গহস্ত কেন? ভাবিয়া দেখ দেখি, তুমি মহান্ হইলে কোন বলে? বল দেখি, কে তোমাকে বড় করিল? আমরা পাঁচ জন ক্ষুদ্র ব্যক্তি মিলিয়াই তোমাকে ঐ সোনামাখা গগণ প্রান্তে তুলিয়াছি। তুমি অস্বীকার করিবে; কিন্তু কথাটি সত্য। আমরা পাঁচটি না থাকিলে, বল দেখি ভাই, তুমি কোথায় মাথা গুঁজিয়া থাকিতে? আমরা তোমাকে হাতে ধরিয়া শিখাইয়াছি, কুপথ সুপথ বুঝাইয়া দিয়াছি, শেষ জননী যেমন আদরের শিশুকে উচ্চে তুলিয়া আমোদ করেন, আমরাও তেমনি কাঁধ পাতিয়া তোমাকে তুলিয়া ধরিয়াছি, তুমি প্রাণ ভরিয়া রঙ্গ করিতেছ, আমরা আঁখি ভরিয়া দেখিতেছি। আমরা ক্ষুদ্র, আমাদের ক্ষুদ্র কলেবরে ক্ষুদ্র মন, ক্ষুদ্র মনে ক্ষুদ্র বুদ্ধি, সেই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ত আমরা ভালবাসাই বুঝিয়াছি। তোমার বৃহৎ বুদ্ধিতে তুমি বিপরীত বুঝিতেছ কেন? জগৎ যে কেবল তোমার জন্যই হইয়াছে, এ ভাব দেখাইতেছ কেন? আমরা আদর করিয়া যাহাই বলি, আদরের পক্ষপাতিতায়, অন্ধ নয়নে আমরা যেরূপই দেখি না কেন, সত্যের সহিত সে সকলের মিল বড় অল্প; মহান্ হইয়াও তুমি এটুকু বুঝিতে পার না! তোমাকে স্নেহ করিয়া বলি, যে জগৎ তোমায় জন্য, কথাটি সত্য মনে করিয়া

মহত্ত্ব নষ্ট করিতেছ কেন? আসল কথা সংসার তোমার আমার উভয়ের জন্যই সৃষ্ট; আমি তোমার জন্য সৃষ্ট, তুমি আমার জন্য সৃষ্ট। বুঝিলে? পদতলে তুমি যে তৃণ গাছটি দলিত করিয়া গর্ব্বভরে চলিতেছ, সেই তৃণ গাছটি তোমার নিকটে ঘৃণিত; হেয় বস্তু মাত্রেরই উপমাস্থল। তোমার উচ্চ চিন্তার কলঙ্কের কথা, যে তুমি এরূপ মনে করিয়া থাক। তৃণ নিরন্তর তোমার শত হিতে রত; দিনে সহস্র বার তোমার ব্যথিত নয়নকে প্রশস্ত করিতেছে, চিরজীবন সংসারকে তোমার বাসোপযোগী করিতেছে। আর তুমি না বুঝিয়া তৃণবংশ ধ্বংস করিতে তৎপর! আজি কদর্য্য কলেবর ভূমি-শম্বুক, তোমার চক্ষুঃশূল; কিন্তু হয় ত তিন দিবস পরে তাহা হইতে সুন্দর কলেবর প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার মনে স্বর্গের ছায়া অঙ্কিত করিয়া দিবে। মহান্! তুমি এ সকল বুঝিয়াও বুঝিতে পার না, বলিয়া সময়ে সময়ে তোমাকে ক্ষুদ্র বলিতে ইচ্ছা হয়। ত্রিদিবেশ্বরী মহাশক্তি ক্ষুদ্রে বৃহতে মিশাইয়া এই প্রকাণ্ড বিশ্বযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন; এই যন্ত্রে ক্ষুদ্র বৃহৎ উভয়েই উপযোগী; ক্ষুদ্রকে স্থানচ্যুত করিলে, বৃহতের দ্বারা উপকৃত হইবে না। এমন সোজা কথা বুঝিতে পার না কেন ভাই মহান্? যদি এমন হইত, যে তুমি এই বিশ্বযন্ত্রের ধারাবাহিক কার্য্যপ্রণালীর চরম ফল কি হইবে তাহা জানিয়াছ, তাহা হইলে তুমি যন্ত্রসংস্কারের যে পরামর্শ প্রদান করিতেছ, ঘাড় নামাইয়া তাহাই অনুমোদন করিতাম। তুমি গর্ব্বিত বটে, কিন্তু বোধ হয় তোমার গর্ব্ব আজিও এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই, যে, তুমি "বুক ঠুকিয়া" বলিতে পার "আমি সৃষ্টিকৌশল, সৃষ্টিকারণ বুঝিয়াছি!" তাই বলি বিশ্বযন্ত্র যেমন চলিতেছে চলিতে দাও, নিরন্তর নিজ কার্য্যে রত থাক; বিশ্বগৃহ সংস্কারের জন্য সম্মার্জ্জনী হস্তে লইয়া নিজের ও সংসারের ক্ষণিক অসুখ জন্মাইবার প্রয়োজন নাই। দিনের পর দিন চলিয়া যাইবে, কোটী কোটী বৎসরের পরে মহাসমুদ্রে রামের মহাসেতু অটল হইয়া দাঁড়াইবে, আর সেতু বক্ষে কি কেবল তোমার মহাপর্ব্বত-গুলিই বিরাজ করিবে মনে করিয়াছ? কাষ্ঠবিড়াল-সঞ্চিত ধূলি কণাও সেই সেতুতে স্থান পাইবে। হইতে পারে ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র কার্য্য কেহ বুঝিতে পারিবেন না; কিন্তু সেই ধূলিকণাটী স্থান ভ্রষ্ট হইলে সেতুটিকে সম্পূর্ণ বলিতে পারিবে না। হনুমান্ কাষ্ঠবিড়ালের ধূলি সঞ্চয় দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, অপুষ্কল কলেবর প্রাণীকে আঘাত করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ঈশ্বরাবতার রাম ব্যথিত

প্রাণীকে অভয় দান করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। ভাই মহান্! এ সংবাদটি কি তোমার কর্ণে কথনই প্রবেশ করে নাই? আমরা ক্ষুদ্র, আমাদের নাশ করিও না; তোমার মহত্ব নষ্ট হইবে: আমাদের "স্পর্শ করিয়া তোমাদের 'অমল ধবল কমল' কর কালিমা ভুষিত করিও না।" সংসারে আমরাও আছি, তোমরাও আছ; আমরাও কার্য্য করিতেছি, তোমরাও কার্য্য করিতেছ; আমাদের তাড়াইতে চেষ্টা করিয়া তোমরা যে সময় নষ্ট করিতেছ, সে সময়ের মধ্যে তোমরা কত আপনাদিগের কর্ত্তব্য সাধিতে পারিতে। "মাথা মুণ্ড" কার্য্যে তোমার যে সময় টুকু নষ্ট হইয়াছে, সে সময়ের মধ্যে তুমি হয়ত জগতের কত উপকার করিতে পারিতে। ভ্রমে পতিত হও কেন ভাই? তোমরা বুঝিয়া কার্য্য করিলে, আমরাও কার্য্যের ব্যাঘাত দেখিতে পাইব না, তোমরাও পাইবে না। আমরা এক মনে করিয়া কতকগুলি ধূলি সঞ্চয় করিলাম, তোমরা হাসিয়া সেগুলি উড়াইয়া দিলে; লোককে বলিলে উহারা কাষ্ঠবিড়াল জাতীয়। আমরা ঘৃণিত হইলাম, আমাদের বালুকণা দ্বারা উদ্দিষ্ট উপকার হইল না। তোমরা আড়ে হাতে না লাগিলে, আমাদের বালুকণা হয়ত সেতুপৃষ্ঠে স্থান (অলক্ষ্য স্থান) পাইত। মনে রাখিও যে সমুদ্র জলনিধি হইলেও সতত তৃষ্ণা হরণ করিতে সমর্থ নহে; কূপ হইতেই প্রায়শ তৃষ্ণা নিবারিত হইয়া থাকে। অনেক কথা বলিবার ছিল। কিন্তু বলিয়াছি ত আমরা ক্ষুদ্র, আমাদের এরূপ কার্য্যে সময়ক্ষেপ করিবার অবসর নাই। ক্ষুদ্র চিরকালই মহৎকে উপদেশ দান করিয়া থাকে; সেই জানিয়াই আজি এই চেষ্টা করিলাম। এখন বিদায়! বিদায় কালে ভাই,—তোমার পায়ে পড়ি,—একবার বদনখানি প্রশান্ত ও প্রফুল্ল কর, দেখিয়া প্রাণ জুড়াক্।

জাতীয় গৌরব।

ভারতে পূর্ব্বের সকলই আছে। নাই ভারত বাসীর হৃদয়, নাই ভারত বাসীর আত্মবোধ শক্তি, নাই ভারত বাসীর জাতীয় গৌরব। নতুবা ভারতে পূর্ব্বের সকলই আছে। হৃদয়—মনুষ্যের প্রাণের প্রাণ; সাধারণ জীব মণ্ডলী একটি মাত্র প্রাণের অধিকারী; মনুষ্য—প্রাণ, এবং প্রাণের প্রাণ যে হৃদয়—তাহারও অধিকারী হইয়া, সাধারণ জীব রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। হৃদয় মহিমায় মনুষ্য—দেবতা; প্রকৃতি তাঁহার সেবা দাসী। বস্তুত প্রকৃতি আপনার সামগ্রী সম্ভার দ্বারা সততই মানব জাতির পরিতুষ্টি সংসাধনে একান্ত যত্নবতী। হৃদয়বান্ মনুষ্য—মৃদু মধুর, এবং তীব্র উজ্জ্বল—উভয় গুণেই মণ্ডিত; সুতরাং হৃদয়বান্ পূর্ণ। পূর্ণ মানবে—প্রভাত প্রফুল্ল সুরভি-ময় কুসুমস্তবকের স্নিগ্ধতার সহিত মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ব্রহ্মাণ্ড-প্রদীপন রৌদ্র রাশি সততই বর্ত্তমান। সুতরাং হৃদয়বানের হৃদয় রাজ্যে—শীতের সহিত বসন্ত, গ্রীষ্মের সহিত বর্ষা, শরতের সহিত হেমন্ত সংযুক্ত থাকিয়া, তাঁহাকে এক নব সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করে। কিন্তু হৃদয় বিহীন—যে কোমল, সে নবনীত হইতেও কোমল! যে কঠিন, সে প্রস্তর খণ্ড হইতেও কঠিন! যে শুষ্ক সে মরু হইতেও শুষ্ক! যে শীতল, সে হিম রাশি হইতেও শীতল! যে উষ্ণ, সে অগ্নি হইতেও উষ্ণ! তাহার জীবনে—কোমল কঠিনে, শীত উষ্ণে সংমিলিত হইয়া, যে এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধোজ্জ্বল আভাময়ী জ্যোতি রাশির সমুদ্ভব হয়—তাহার ছায়াও পতিত হয় না। সুতরাং জীবন চিরকালই অন্ধকার ময় থাকে। যে অন্ধকার, সে আপনাকে দেখিতে পায় না। যে দেখিতে পায় না, তাহার কিছুই নাই—উৎসাহ নাই, অধ্যবসায় নাই, গবেষণা বৃত্তি নাই, এবং জীবনের কর্ত্তব্যতাও নাই—কিছুই নাই! সুতরাং তাহার আত্মবোধ শক্তি কিরূপে থাকিবে? আত্মবোধ শক্তি আত্মাকে পর শক্তির আপাতত মধুর ঢল ঢল লাবণ্য সলিলে ডুবিতে দেয় না; সে স্বকীয় যাহা আছে, তাহাকেই পুনঃ পুনঃ সংস্করণ করিয়া ভাল করিয়া লয়। কিন্তু আত্মবোধ শক্তি বিহীন, নিজ শক্তিবলে কোথাও থাকিতে পারে না; সে তুলা রাশি হইতেও লঘু; সুতরাং পর ফুৎকারে উড়িয়া বেড়ায়। আত্মবোধ শক্তি বিহীন মানব সকাশে "জাতীয় গৌরব" একটি অপূর্ব্ব নূতন কথা! সুতরাং জাতীয় গৌরবের মর্ম্ম, সে কিরূপে বুঝিবে?

এই জগন্মণ্ডলে, মনুষ্য জাতির পক্ষে জাতীয় গৌরব অতি দুর্লভ পরম পদার্থ। যে জাতির হৃদয়ে এই পরম পদার্থের পূর্ণ জ্যোতি সততই ঝল মল করে, সে জাতি পৈশাচিক দণ্ডে দণ্ডিত, আসুরিক তাড়নে তাড়িত, এবং রাক্ষসিক প্রহারে প্রহারিত হইলেও, আপনাকে ভুলিতে পারে না। যে আপনাকে না ভুলে, সে জাতীয় গৌরব কিরূপে ভুলিবে? পূর্ব্বতন ভারতবাসী মহাপুরুষদিগের হৃদয় ছিল; এবং তাহাতে আত্মবোধ শক্তির পবিত্র উজ্জ্বল জ্যোতির সহিত—জাতীয় গৌরবের প্রখর দীপ্তিমতী প্রভা, সততই ঝল মল করিত। সপ্তশত বর্ষের প্রলয়ঙ্করী যবন ঝাটিকায়ও নিভাইতে সমর্থ হয় নাই! যদি উক্ত মহাপ্রাণ মহাত্মাদিগের হৃদয় শূন্যময় থাকিত, তবে আর ভারতে একটি হিন্দু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও পাওয়া যাইত না! কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীতে সেই আর্য্য আত্মবোধ শক্তি, সেই আর্য্য জাতীয় গৌরব, চির পবিত্রময়ী আর্য্যভূমি—ভারতভূমি হইতে অন্তর্ধান পাইতেছে! সুতরাং আমরা পরভাব গৌরব তরঙ্গে গড়াইয়া পর হইয়া যাইতেছি! যাহাদের জীবন পরভাবে গঠিত, সে আপনাপেক্ষায় পরকে অধিক ভাল বাসে; সুতরাং বর্ত্তমান ভারতবাসী বলিতে পারেন, যে ভারতে কিছুই নাই!

ভারতে সকলই আছে। পরভাব হইতে জীবনকে আত্মভাবে আনিয়া, সেই পবিত্র আর্য্যমণি সমন্বিত নয়ন যুগ্ম বিস্ফারিত করিয়া দেখ; গবেষণা বৃত্তিকে বলবতী করিয়া, তাহার সহিত—অপ্রতিহত উৎসাহ, অবিচলিত অধ্যবসায়কে সংযোগ কর; অনন্তর স্বকীয় জীবনের কর্ত্তব্যতার সহিত—ভূতপূর্ব্ব মহাপুরুষ দিগকেও স্মরণ কর; ইহার মধ্যে—হৃদয়, আত্মবোধ শক্তি, এবং জাতীয় গৌরবকে ভুলিও না। আর একটি কথা—ঐ যে তোমার পরভাবময় অতি ক্ষুদ্র হৃদয়; তাহার এইক্ষণ যে টুকু আছে, তদভ্যন্তরে যে একটি ঘোর কৃষ্ণময় বিন্দু ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে, যাহার তেজোপ্রভাবে তোমার সোণার অঙ্গ কৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছে, যাহার জন্য তুমি জগতে—"কাণা" বলিয়া অভিহিত হইয়াছ, উহার নাম ব্যক্তিগত পাশব স্বার্থ; উহাকেও পুঁছিয়া ফেল। দেখিবে—ভারতে যাহা আছে, পৃথিবীতেও তাহা আছে; ভারতে যাহা নাই, পৃথিবীতেও নাই! সুতরাং দেখিবে—ভারতে সকলই আছে। অতএব ভারতবাসী! জ্বলন্ত উৎসাহ ও জীবন্ত অধ্যবসায়—এই বীর যুগলকে সঙ্গে লইয়া অনুসন্ধান কর; ভয় নাই, পরিশ্রম বৃথা হইবে না! অনুসন্ধানে দেখিবে—ভারতের এক এক প্রদেশের নিভৃত কক্ষে কত অমূল্য রত্ন পড়িয়া

রহিয়াছে! রত্নজীবী কোথায়? কে সেই রত্নসম্ভার উদ্ধার করে? যদি ভারতে সুযোগ্য রত্নজীবী থাকিত, তবে কি সেই সুবিমল উজ্জ্বল কান্তিমান্ রত্নরাজি, খনির তিমির গর্ভে থাকিয়াই, অনন্ত কাল সাগরে চির তরে ডুবিয়া যাইতে পারিত? ভারতে রত্নজীবীর একান্ত অভাব; তাই রত্নের এত অনাদর!

ভারতবাসী হৃদয় বিহীন, তাহাতে অন্ধ; সুতরাং ভারতে জাতীয় জীবন চরিত, এবং সৎকার্য্যের পুরস্কার হওয়া, একরূপ অসম্ভব। যদিচ, বর্ত্তমান সময়ে ভারতবাসী, নানা বিদ্যায়, নানা গুণে বিভূষিত হইতেছেন; তথাচ সেই বিদ্যা, এবং গুণের তুলনায় কার্য্য কোথায়? ইহাদিগের বিদ্যা এবং গুণ—প্রথমত অতসী কুসুমের ন্যায় বিকশিত হইয়া, দিগ্বিভাগ সুবর্ণালোকে আলোকিত করে; সুবর্ণ ফুলে—হীরক ফল হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু তাহা হয় না! ফল—"পশ্চাৎ ঝঞ্ঝনায়তে।"—অখাদ্য! কাক পক্ষীতেও স্পর্শ করে না! এইরূপ বিড়ম্বনা কেন? যাহা প্রথমত অনন্ত আশাপ্রদ, তাহা অন্তিমে নিরাশার হ্রদে ডুবিয়া যায় কেন? কেন—বিধাতা জানেন! আমরা জানি—যাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়া, সুখ সাগরে ভাসিয়া, ভাসিয়া, লীলা তরঙ্গ বিস্তার করেন; এবং ভারতের বক্ষে পদাঘাত করিয়া, ভারতবাসীর রক্তে হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া, মহানন্দে স্বদেশে চলিয়া যান; ভারত আর মনেও করেন না! পরন্তু যাঁহাদিগের রীতি নীতি, কার্য্য কর্ম্ম, মায়া, ভালবাসা প্রভৃতি সকলের মূলদেশই—সর্ব্বগ্রাসী কূটময় স্বার্থ জালে সমাকীর্ণ! ভারতবাসী, তাঁহাদের জন্য কান্দিয়া বিভোর! তাঁহাদের স্মরণ চিহ্ন সংস্থাপন জন্য উন্মত্ত! এবং তাঁহাদের জীবন-চরিত লিখিবার জন্য কঠোর অধ্যবসায়শালী! আর যাঁহারা—শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে, ভারতের সুখ চিন্তা, মঙ্গল চিন্তা, এবং উন্নতি চিন্তায় রত; যাঁহাদের হৃদয়ের মূল মন্ত্র—ভারতের অভাব মোচন; এবং সুখ সাধন—মঙ্গল সাধন—উন্নতি সাধন,—তাঁহাদিগকে একবার মনেও করেন না! অহো বিধাত! তোমার কি চাতুর্য্যময়ী সৃষ্টি! অহো বিড়ম্বনে! তোমার কি অলঙ্ঘ্য প্রতাপ! অহো লাঞ্ছনে! তোমার কি অপার মহিমা!

খৃষ্টীয় প্রলয়াগ্নি।

ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রে কেবল সৃষ্টি, প্রলয়, ঈশ্বর, প্রকৃতি, কাল, জীবাত্মা, প্রভৃতি তত্ত্ব সমূহের বিচার মাত্রই আছে। তাহা হইতে ভূতত্ত্ব, ভূগোল, খগোল, অন্তকটাহ স্বর্গাদি লোক সংস্থান, সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিবিধ রূপ, মন্বন্তর, কল্প, যুগ, প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভ হইতে পারে না। কিন্তু পুরাণ-শাস্ত্রে সে সকল তত্ত্বের বিস্তারিত বিবরণ আছে। তৎসমূহের সত্যতা স্থাপনার্থ তাহাতে কোন বিচার বা তর্ক উপস্থিত হয় নাই। কেবল মহর্ষি বলিতেছেন, বিনীত শ্রোতা অবিতর্কিত ভাবে মানিয়া লইতেছেন— এই মাত্র তাহার ভাব। 'কিন্তু এখন আর সে কালও নাই, সে গুরুও নাই, সে শ্রোতাও নাই। আমরা তাহা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পাঠ করি বটে, কিন্তু সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে পারি না। তাই বলিয়া যে অমান্য করিব এমত নহে।

ঋষিরা একটু একটু শ্লোকে স্মৃতিতে, পুরাণে, তন্ত্রে, নানাবিধ বসন ভূষণে ভূষিত করিয়া ঐরূপ অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। দর্শনের বিচারে সে সমস্ত গৃহীত হয় নাই। এখন সাহেবেরা আমাদিগকে বহুবিধ বিদ্যায় দীক্ষিত করিয়াছেন। সেই সমস্ত বিদ্যাতে আমাদের দর্শনশাস্ত্রের ন্যায় ব্রহ্ম, জীব, কর্ম্মফল, প্রকৃতি, যোগ বিদ্যা, ন্যায় পদার্থ বিচার প্রভৃতি উন্নত জ্ঞান নাই বটে, কিন্তু ভূতত্ত্ব, ভূগোল, খগোল, তাড়িৎ বিজ্ঞান প্রভৃতি পদার্থ-বিদ্যার উপদেশ বিস্তর আছে। এখনকার কৃত-বিদ্যগণের মধ্যে যাঁহারা ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের বিবৃত ঐ সকল তত্ত্বের কোন তত্ত্ব পাঠ পূর্ব্বক স্বদেশীয় শাস্ত্রে তত্তুল্য তত্ত্ব সকল পাঠ করিতেছেন, তাঁহারা প্রায়ই উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু ঐক্য দেখিতে পাইতেছেন। আমাদের পরম বন্ধু মৃত সীতানাথ ঘোষ বৈদেশিক পদার্থ-বিদ্যা হইতে লব্ধ ব্যুৎপত্তি বলে তিন চারিটি স্মৃতি বচনের মর্ম্মভেদ পূর্ব্বক আর্য্যঋষিগণের তাড়িৎ বিষয়িক জ্ঞান যে প্রকারে প্রচার করিয়াছেন এবং সেই জ্ঞানকে ইউরোপীয় কৃত্রিম তাড়িৎ যন্ত্রে প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহার দ্বারা নানাবিধ রোগের চিকিৎসায় যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা অতি বিস্ময় জনক।

পক্ষান্তরে মাডাম্ ব্ল্যাবাটস্কী ও কর্ণেল অলকট ভারতীয় যোগ ও বেদান্ত-শাস্ত্রের জ্ঞানকে যে প্রকার ইংরেজি ভূষণে দেশমধ্যে প্রচারিত করিতে কৃত

সক্ষম হইয়াছেন, তাহাও অল্প আনন্দকর নহে। ভারতীয় শাস্ত্রের জ্ঞান যদিও বিজাতীয় ভাষায় ও বিজাতীয় লোকের মুখে স্ফূর্ত্তি পায় না, তথাপি তদ্দ্বারা অনেক অস্থির প্রকৃতি সুস্থির হইবেন এবং ঋষি শাস্ত্রেরই জয় হইবে।

ইতি পূর্ব্বে আমরা পৌরাণিক সঙ্কর্ষাণাগ্নির বিষয় যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি আমরা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক মানি, তবেই তাহার সম্মান থাকিবে। কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া মানিবার জন্য, এখনকার বৈদেশিক পণ্ডিতগণের সাক্ষ্য প্রয়োজন। সীতানাথ বাবুর স্মৃতি যদি ইংরেজি তড়িৎ বিদ্যার সহিত কিঞ্চিৎ ঐক্য না হইত, ব্ল্যাবাটস্কী ও অল্‌কট যাহা করিতেছেন, তাহা যদি কোন ভারতবাসী করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তবে কি তাহা সমাজে স্থান পাইত? এইজন্য আমরা আমাদের বুদ্ধিমান যুবা-পাঠকগণকে বলিতে ইচ্ছা করি, যে সহস্র সহস্র বর্ষের পূর্ব্বে পুরাণ শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণাগ্নিরূপ যে তত্ত্বটি স্থান পাইয়াছে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম পুস্তকে সেই তত্ত্বের স্পষ্ট আভাস রহিয়াছে; খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রচারকগণ তাহা অনেকবার প্রচার করিয়াছেন, এবং অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্রে তাহার অল্প বিস্তর সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। আমরা বাইবেল্ ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের দোহাই দিয়া পাঠকগণকে ঐ তত্ত্বটি যে মানিতে বলিতেছি এমত নহে। কেবল ইহাই দর্শাইতেছি যে, ভারতীয় কোন প্রাচীন তত্ত্ব কেমন আশ্চার্য্যরূপে বিজ্ঞান শাস্ত্রদ্বারা পুনরাবিষ্কৃত হইতেছে। ইহা দেখান আমাদের অভিপ্রায় নহে, যে পূর্ব্বকালের ঋষিগণ এখনকার ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎগণের ন্যায় পদার্থতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতেন এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফল। আমাদের এইমাত্র বক্তব্য, যে পদার্থ বিদ্যার যতই উন্নতি হউক, শাস্ত্র যে সেই।

সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, যেমন পুরাণ শাস্ত্রে একটি জলপ্লাবনের ইতিহাস লেখা আছে, সেইরূপ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম পুস্তকেও একটি জলপ্লাবনের বিবরণ আছে। শাস্ত্রানুসারে সত্যব্রত মনু নৌকারোহণ পূর্ব্বক তাহা হইতে রক্ষা পান এবং বাইবেল মতে পয়গম্বর নুঃ সেইরূপ পরিত্রাণ পান। সম্ভবত উহা একই জলপ্লাবন এবং মনু ও নুঃ একই তত্ত্ব। ভাবী প্রলয় বার্ত্তা লেখক সুবিখ্যাত রেবরও জন কমিং কহেন যে, ঐ জলপ্লাবনের পূর্ব্বে এই ভূমণ্ডল যে প্রকার ছিল, তাহা তদ্দ্বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি পিটরের দ্বিতীয়

গ্রন্থের তৃতীয় বচন উদ্ধৃত পূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে, ঐ জলপ্লাবন হইতে স্বর্গ ও পৃথিবীরূপ গোলাকার অণ্ডটি জলদ্বারা প্লাবিত হইয়াও অবশিষ্ট ছিল। পিটরের উক্ত বচনে লেখা আছে, যে পূর্ব্বে ভূমণ্ডল ঐ প্রলয়ে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইলেও তাহার বীজটী অগ্নির সহিত অবশিষ্ট রহিল। অর্থাৎ পুনঃ-সৃষ্টির পর ভাবী প্রলয় কালে ঐ শেষ অগ্নিতে তাহা আবার দগ্ধ হইয়া যাইবে। এ স্থলে কমিং বলেন যে, ইহার তাৎপর্য্য সম্প্রতিকার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে। কেন না বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ নিরূপণ করিয়াছেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে—'উপর হইতে কেন্দ্রের দিকে ক্রমেই উত্তাপের বৃদ্ধি।—যদি আমরা তাহার মধ্যে অধিক দূর প্রবেশ করিতে পারিতাম, তবে বুঝিতে পারিতাম যে, এই পৃথিবীর উপরিভাগ যাহাতে আমাদের পদতল সংলগ্ন আছে, তাহা কেবল এক অথবা সার্দ্ধ এক ক্রোশ পরিমিত বেধ-বিশিষ্ট কঠিন স্তর মাত্র। কিন্তু তাহার অধোদেশে এই পৃথিবীর অভ্যন্তরাংশ অতি উত্তপ্ত, অস্থির ও আবর্ত্তনশীল তরল পদার্থপূর্ণ। পিটরের লেখা অনুসারে ভাবি প্রলয়ের নিমিত্ত সেই ভূগ্রন্থীরূপ বীজ স্থানে ঐ শেষ অগ্নি সঞ্চিত রহিয়াছে। কেবল সময় সময় তাহার কিয়দংশ আগ্নেয় গিরি গহ্বর প্রভৃতি ভেদ পূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। পিটরের উক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া ডাক্তার কমিং আরও লিখিয়াছেন যে, ভাবি প্রলয় কালে স্বর্গ ও এই পৃথিবী উভয়ই ধ্বংশ হইয়া যাইবে। এখানে ডাক্তার কমিং স্বর্গ শব্দে কেবল অন্তরীক্ষ বুঝিয়াছেন। কিন্তু আর্য্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে প্রলয় কালে স্বর্গ লোকও নষ্ট হইবে, কেন না, তাহা বিশ্বের কর্ম্মফল ভোগের প্রদেশ। তবে নৈমিত্তিক-প্রলয়ে মহর্লোকাদি করিয়া ব্রহ্মার ভুবন চতুষ্টয় থাকিবে। সে যাহা হউক পিটরের উক্তি এই যে—"প্রলয় সময়ে স্বর্গ সমূহ তুমুল শব্দ সহকারে নষ্ট হইবে, পঞ্চভূতগণ ভয়ানক অগ্নিতেজে গলিয়া যাইবে, এবং পৃথিবী স্বীয় বক্ষস্থিত (সমস্ত মহা মহা মন্দির ও অভ্রভেদী হর্ম্ম্য প্রভৃতি) কীর্ত্তিকলাপের সহিত দগ্ধ হইয়া যাইবে।" (২।৩।১০) এই স্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে পিটর এই প্রলয়টির যে লক্ষণ কহিলেন, তাহা প্রায়ই শাস্ত্রোক্ত নৈমিত্তিক প্রলয়ের লক্ষণের ন্যায়, এবং ভূগর্ভ সঞ্চিত প্রাগুক্ত অগ্নিটি অবিকল শাস্ত্রোক্ত সঙ্কর্ষণাগ্নি। তাহাই পাতাল ও স্বর্গের সহিত পৃথ্বীমণ্ডলকে প্রলয় কালে দগ্ধ করিয়া থাকে এবং আগ্নেয়গিরি ভেদপূর্ব্বক কখন কখন অল্প মাত্রায় নির্গত হয়। আর্য্য শাস্ত্রে ভূমিকম্পের হেতুস্বরূপ

যাঁহাকে সঙ্কর্ষণের জৃম্ভন বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা বিজ্ঞান শাস্ত্রানুসারে ভূগর্ভস্থ অগ্নিরই অংশ।

ডাক্তার কমিং আরো লেখেন যে, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অগ্নি পৃথিবীর উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধির একটি কারণরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এদিকে বাইবেল অনুসারেও অগ্নি সংস্কার সূত্রেই প্রলয়ের পর নববিধ স্বর্গ ও পৃথিবী পুনরুদিত হইবে। তখন তাহাতে জ্ঞান ধর্ম্ম নবতর বীর্য্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ঐ ভয়ানক অগ্নি প্রলয় এই ভূমণ্ডলকে পুনরায় স্বর্গতুল্য এবং অধিক তর উর্ব্বরা করিবে।—এতাবতা কমিং কহেন যে বাইবেলের উক্তি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সহ এক। কিন্তু আমরা সপ্তম সংখ্যায় সঙ্কর্ষণের যে শাস্ত্র সিদ্ধ হলধর মূর্ত্তিটি চিত্র করিয়াছি, এই স্থলে তাহা ধ্যান করিয়া দেখ; বোধ হয় সে ঐক্য আরো বিস্ময় জনক হইবে। উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত যদি সঙ্গত হয়, তবে বাইবেল ও বিজ্ঞান উভয় মতেই প্রলয়ান্তে পুনঃ সৃষ্টি আছে। আর্য্য শাস্ত্রে সৃষ্টির প্রায় প্রলয়ান্তর ব্যাপী প্রবাহরূপ নিত্যত্ব বিশেষ রূপে বিবৃত হইয়াছে। তাহা বেদ স্মৃতি পুরাণ দর্শন তন্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত।

আমরা ইতিপূর্ব্বে "সঙ্কর্ষণাগ্নি" প্রকরণে প্রলয় পয়োধি ও তাহাতে নারায়ণের শয়নের কথা বলিয়াছি। এই উভয় তত্ত্বের মধ্যে প্রলয় পয়োধিটি বাইবেল ও বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে ভূতলস্থ জল প্রলয় কালীন ভূগর্ভস্থ বর্দ্ধনশীল অগ্নির উত্তাপে বাষ্পাকার হইয়া পরে ধরণীকে প্লাবিত করিয়াছিল। সেই জলে নারায়ণের শয়ন যেমন আমাদের শাস্ত্রে আছে, সেইরূপ বাইবেলেও আছে। বাইবেলে আছে "পূর্ব্বে মহাপ্রলয়াবসানে সৃষ্ট্যারম্ভ সময়ে এই ভূমণ্ডল আকৃতি বিহীন পদার্থ বিহীন জলময় ও অন্ধকারময় ছিল। সাগর বক্ষে ঘোরতর অন্ধকার বিরাজমান ছিল এবং ঈশ্বরের প্রাণ (আমাদের হিরণ্য গর্ভরূপী নারয়ণ) সেই সাগর বক্ষে ভাসমান ছিলেন। তিনি কহিলেন আলোক হউক, তখনই আলোক হইল। তিনি অন্ধকার ও আলোককে বিভাগক্রমে রাত্রি ও দিবা কহিলেন। তাহার পর তিনি আকাশ হইতে জলকে বিভাগ ও জল হইতে মৃত্তিকাকে স্বতন্ত্র করিলেন।" এ সমস্ত কথাই আমাদের শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিতেছে। বেদে আছে, "ঋতঞ্চসত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোহধ্য জায়ত, ততো রাত্র্য জায়ত, ততঃ সমুদ্রোহর্ণবঃ, সমুদ্রাদর্ণবা দধি সম্বৎসরোহ জায়ত। অহরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য

মিবতো বশী সূর্য্য চন্দ্র মসৌধাতা যথা পূর্ব্ব মকল্পয় দ্দিবঞ্চ পৃথিবী ঞ্চান্তরীক্ষ মথো স্বঃ।"

পূর্ব্ব মহাপ্রলয় সময়ে একমাত্র পরমাত্মা ছিলেন। তৎকালে কেবল ব্রহ্মাণ্ডীয় সুষুপ্তিরূপ ঘোরতর অন্ধকার জন্মিয়াছিল। পরে সৃষ্টি আরম্ভ সময়ে জীব সমষ্টির অনাদি অদৃষ্ট রূপ পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ হইতে ভোগার্থ সমুদ্র উৎপন্ন হইল। ("মহদহঙ্কার তন্মাত্র ক্রমেণ।" মনু-কুল্লুকভট্ট ১।৮। অর্থাৎ একবারেই সমুদ্র হয় নাই, কিন্তু মহত্তত্ব অহঙ্কারতত্ব, তন্মাত্রতত্ব প্রভৃতি ক্রমে হইল)। সেই জলে তাহার অধিষ্ঠাতা—সৃষ্টিকর্ত্তা ধাতা বিরাজমান হইলেন। তিনি সূর্য্য চন্দ্র সৃষ্টি করিয়া সম্বৎসর কল্পনা করিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের অনুরূপে তিনি এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে ক্রমে মহর্লোকাদি ব্রহ্মভুবন, দেব ও পিতৃস্বর্গ, অন্তরীক্ষ, ও পৃথিবী উৎপন্ন করিলেন।

চিন্তাশীল পাঠক বুঝিতে পারিবেন, যে শাস্ত্রের এই সৃষ্টি প্রণালীটি শুদ্ধ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম পুস্তকের সৃষ্টি বিবরণের সহিত মিলিতেছে এমত নহে, কিন্তু তাহা হইতে কত সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ।

পূর্ব্বে সঙ্কর্ষণাগ্নি প্রবন্ধে আরও উক্ত হইয়াছে যে, সঙ্কর্ষাগ্নি সর্পরূপী, নীল বাসা, মদোৎসিক্ত, সুরাদেবীর নায়ক, এবং প্রলোভনের দেবতা। অধিক ব্যাখ্যায় প্রবন্ধ বৃদ্ধি হইবে এই ভয়ে সংক্ষেপে কহিতেছি, যে, এ ভাবে ঐ অগ্নিটি খৃষ্টান ও যবনদিগের সয়তানের মূর্ত্তি।—ঐ মূর্ত্তিটি নীল বর্ণ, নরকাগ্নি ও প্রলোভনাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইহা সঙ্কর্ষণের লাক্ষণিক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অর্থ মাত্র। ইহার সহিত বিজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।
খড়্গপুর।

চাকরি।

মুসলমানের ও ইংরেজের আমলে।

সেনাবিভাগে।

দেশ-ভক্তি বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন ভাবে স্ফূর্তি পায়। স্বাধীন দেশের স্বাধীন ব্যক্তিগণের দেশভক্তির কথা আমরা বলিতেছি না, সে কিরূপ পদার্থ তাহা হয়ত আমরা বুঝিই না। আমরা পরাধীন দেশের ব্যক্তিগণের দেশ-ভক্তির কথা বলিতেছি। এই দেশভক্তির প্রধানত দুই মূর্ত্তি। এক মূর্ত্তির প্রধান প্রকৃতি,—বিজেতা জাতির উপর বিষম ঘৃণা। এইরূপ দেশভক্তিতে যাঁহারা অনুপ্রাণিত, তাঁহারা বিদেশীর সংস্রবে আসিতেও আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করেন, বিদেশীয় আচার ব্যবহারে ঘৃণা করেন, এবং বিদে-শীয় রীতি নীতি সমস্তই বিষচক্ষে দেখেন। অন্য প্রকার দেশ-ভক্তেরা বিদেশীর শাসন কার্য্যে যোগ দান করিয়া,তাহার কঠোরতার শমতা করাই দেশের প্রকৃত উপকার বলিয়া বোধ করেন। স্বজাতি-প্রেম উভয় শ্রেণীর হৃদয়ে সম-ভাবে থাকে কি না জানি না, কিন্তু বিজাতির উপর ঘৃণা প্রথম শ্রেণীর মধ্যে যেরূপ মাত্রায় থাকে, দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে সেরূপ ভাবে থাকে না, তাহা নিশ্চয়। কোন্‌রূপ দেশভক্তি কোন্‌ সময়ে অধিক কার্য্যকরী হয়, তাহার পর্য্যালোচনায় অদ্য আমরা প্রবৃত্ত নহি, প্রকৃত দেশভক্তির দুইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতি আছে, ইহাই আমরা বলিতেছি মাত্র।

বিদেশীয় রাজার শাসন-কার্য্যে যোগ দান করার সহজ বাঙ্গালা নাম,—চাকরি করা। এই কার্য্যকে এক দিক্‌ দিয়া বলা যায় দাস-বৃত্তি; অন্য দিক দিয়া বলা যায়, স্ববৃত্তি। যে সহস্র সহস্র লোক আপনার বা পরিবারগণের ভরণ পোষণের দায়ে চাকরি করেন, তাঁহাদের জীবিকা, ভাল বা মন্দ বলিবার, হয়ত কাহারও অধিকার নাই; সেরূপ জীবিকা সমালোচনার সামগ্রী নহে। যাঁহারা আত্মগৌরবের উন্নতি সাধন চেষ্টায়, ছোট হউক, বড় হউক, কোনরূপ চাকরি অবলম্বন করেন, তাঁহাদের চাকরিই প্রকৃত স্ববৃত্তি। এই শ্রেণীর উপর দেশের লোকের যতই সমাদর কমিবে, ততই দেশের মঙ্গল হইবে।

আর যে শ্রেণীর লোক পরকীয় শাসনের কঠোরতা কমাইবার জন্য সেই শাসনে যোগ দান করেন, বিদেশীয় রাজার চাকরি করেন, তাঁহাদের চাকরি, দাসবৃত্তি হইয়াও শ্ববৃত্তি নহে। আপনার জাতির উপকার করিতে পারিব বলিয়া, যে বিজাতির দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, সে নিন্দনীয় হইবে কেন? কে আপনার হিতের জন্য চাকর, আর কে দেশের হিতের জন্য চাকর, তাহা হঠাৎ বুঝিতে পারা না যাউক, দুই চারি বৎসরে সকলেই তাহা বুঝিতে পারেন; সময় পাইলে এবিষয়ে সাধারণ লোকের ধাতুজ্ঞান বেশ টন্‌টনে। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ মিত্রের নিস্বার্থ দাসত্বের কে না প্রশংসা করিয়াছে? আর স্বার্থপূর্ণ দাসত্বের নিন্দা; কোন দিন না শুনিতে পাই? তবে সে নিন্দা যতদূর কার্য্যকরী হওয়া আবশ্যক, তাহা এখনও হয় নাই বটে।

সুতরাং প্রকৃত দেশহিতৈষী হইলেই যে চাকরি তাঁহার ত্যজ্য হইবে, এমন কোন কথা নাই। প্রথম শ্রেণীর দেশভক্তগণ বিদেশীয়ের সংস্রব হইতে দূরে থাকেন, কাজেই চাকরি তাঁহাদের ত্যজ্য বটে, কিন্তু তেমনই আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর পক্ষে, চাকরি করাই দেশের উপকার করিবার প্রশস্ত উপায়।

তাহার পর রাজার দিক হইতে দেখ। আধুনিক বৈদেশিক রাজগণ প্রধানত স্বার্থ পরিচালিত; কোন কোন জাতি, কখন কখন, বিদেশের উন্নতি সাধনই বিদেশ বিজয়ের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু সেই স্নেহ অনেক সময়েই কুম্ভীরের মায়া বলিয়াই আমাদের বোধ হয়। অধুনাতন কালে য়ুরোপীয় জাতিগণেরই বিদেশে রাজত্ব আছে। স্পষ্টই বোধ হয়, যে সমগ্র য়ুরোপের আভ্যন্তরিক রাজনীতিচক্র কেবল মাত্র স্বার্থ কীলকেই ঘুরিতেছে। সুতরাং তাঁহাদের বৈদেশিক রাজনীতিও যে সেইরূপ স্বার্থ-পরিচালিত, এরূপ বিবেচনা করা, নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

বিদেশের শাসন কার্য্যে সেই দেশের লোকের সাহায্য লইলে রাজার কিছু স্বার্থ হানি আছে কিনা,—আমরা যতই বুদ্ধিমান হই, ঐ প্রশ্নের মীমাংসায় আমাদের বুদ্ধি প্রচুর নহে। আমরা আপনাদের দিক দিয়া দেখিতে বেশ পটু বটে। উদরের দায়ে, গৌরবের বিড়ম্বনায়, কথঞ্চিৎ রূপে দেশ-সেবার উদ্দেশে, চাকরিই এখন আমাদের অনেকের লক্ষ্য; কাজেই আমরা প্রকৃতি-জাত স্বত্বের দোহাই দিয়া, নানা ছন্দে চাকরির দাবি করিতে মজবুত। "আমরা আপন দেশে আপনারা চোর হইয়া থাকিব কেন?" ইহাই আমাদের তর্ক, যুক্তি, অভিযোগ ও আব্‌দার। যদি কোন স্পষ্টবাদী রাজা

অমনি মুচকি হাসিয়া বলেন, "তোমার দেশ এখন তোমার নহে, ইহাতে তোমার কোন দাবি দাওয়া নাই।"—তাহা হইলে তাঁহাকে যে আমরা কি উত্তর দিব, তাহা আমরা জানি না।

এ পথে গেলে যে রাজার স্বার্থ হানি নাই, তাহা আমরা রাজাকে বুঝাইতে পারি নাই; সে কথাটা আমরা আপনারাও এখন হয়ত বুঝি নাই, তা রাজাকে বুঝাইব কি? সত্যই কি ইহাতে রাজার স্বার্থ হানি নাই? ধরিয়া লইলাম, যে স্বরাজ্য পোষণের জন্য বিজিত রাজ্য শোষণ করাই রাজার উদ্দেশ্য। ইহাতে কি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ হইল? এখনও হয় নাই; শোষণের আবার প্রকার ভেদ আছে। মূলা ক্ষেতের ও বেগুণ ক্ষেতের উপমায় শোষণের প্রকার ভেদ বেশ বুঝিতে পারা যায়। মূলাতেও তরকারি হয়, বেগুনেও তরকারি হয়; গৃহস্থ পোষণ হয়। কিন্তু মূলার বেলায় একটি গাছ নষ্ট করিয়া তবে তরকারি হয়, বেগুনে গাছ বজায় থাকে, আবার ফল ধরে, আবার বেগুন পাওয়া যায়। মূলা ক্ষেতের মত করিয়া শাসন করিতে হইলে, দেশের লোককে রাজ-কার্য্যে নিয়োগ করায় রাজার স্বার্থ হানি আছে, কেন না ওরূপ কর্ম্মচারীরা শোষণে ব্যাঘাত দিতে পারেন, কিন্তু বিদেশ-রাজ্য বেগুন ক্ষেতের মত করিয়া ভাবিলে, সেই দেশের লোককে রাজকার্য্যে নিয়োগ করায় কোনরূপ স্বার্থ হানি নাই—ইহাই সুবুদ্ধির মীমাংসা। দুই চারিটা সামান্য কথা দেখিলেই হইবে। দেশের সমস্ত শাসন কার্য্য যদি বিজাতীয় লোকের হাতে থাকে, আবার সেই বিজাতি যদি বিদেশী হন, তাহা হইলে দেশের শোষণ বড় প্রখর হয়; বিজিত দেশ প্রকৃতই মূলা ক্ষেত হইয়া উঠে। আর পরজাতির দাসত্ব করিয়া স্বদেশের সেবা করিবে, তাহাও যদি না করিতে পায়, তবে দেশের লোক অসন্তুষ্ট হইবে বৈ কি? এরূপ অসন্তোষে রাজার সম্পূর্ণ স্বার্থ হানি।

পররাষ্ট্র শাসন নীতিতে জবরদস্ত ছিলেন, ওদিকে রোমানেরা, এদিকে মুসলমানেরা। অধুনাতন য়ুরোপ, মুখে বলেন, যে তাঁহারা রোমানদের মন্ত্র শিষ্য, কিন্তু কার্য্যে সেরূপ ভাবে কার্য্য করিতে পারেন না। বিদেশী বিধর্ম্মীকে রোমান করিয়া লইবার ক্ষমতা য়ুরোপীয় কোন জাতিরই নাই। মুসলমানের পররাষ্ট্র নীতির সফলতায় য়ুরোপ এখনও মর্ম্মে আহত। কোথায় কনষ্টাণ্টিনোপল, আর কোথায় সুদান; কোথায় সুলতান ও কোথায় মেহদি—

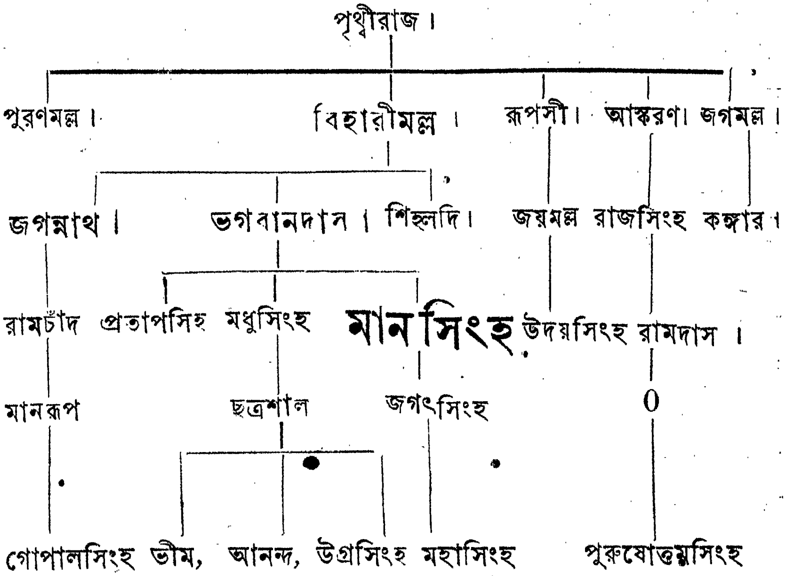
কিন্তু এরূপ বন্ধন, যেন, দুই দেশে মন গাঁথাগাথি রহিয়াছে, অন্তরে অন্তরে ফল্গুস্রোত (Telepathy) চলিতেছে। এ হেন দুর্জ্জয় ইংরেজ আজি মুসলমানের সেই সমধর্ম্মিতায় শশব্যস্ত।

মুসলমানের পররাষ্ট্র নীতির সফলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে। বিজাতি, বিধর্ম্মী মোগল সম্রাটগণ ভারতে যেরূপ রাজত্ব করিয়াছেন, তাহা জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়।

মোগলেরা ভারতবর্ষ আপনাদের স্বদেশ করিয়া লন; মোগল রাজ্যে শোষণের ভয় কাজেই ছিল না। এটা প্রজার পক্ষে সুবিধার কথা। তেমনই ওদিকে আবার রাজা যে অতিরিক্ত শোষণের ভয়ে সজাতি পালনের শমতা করিবেন, সে সম্ভাবনাও ছিল না, এটা প্রজার অসুবিধার কথা। কিন্তু মোগল সম্রাটেরা আপনাদের রাজনীতি-কুশলতা গুণে, শাসন কার্য্যে দেশবাসীর সহায়তা গ্রহণ করা কেবল কর্ত্তব্য কার্য্য নহে, শ্লাঘা বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং পর জাতির দাসত্ব করিয়া স্বজাতির সেবা করিতে সকলেই পাইতেন; সে দিকের অসন্তোষ মোগল সাম্রাজ্যে একেবারে ছিল না বলিলেও চলে।

সকলেই জানেন, বিখ্যাত আকবর শাহ, ঐরূপ চতুর অথচ উদারনীতির প্রবর্ত্তক এবং পরিপোষক। মানসিংহ, তোড়রমল্ল, বীরবল প্রভৃতি হিন্দুগণ যে আকবর শাহের সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে নেতা স্বরূপ ছিলেন, তাহাও অনেকে জানেন; কিন্তু সেনা বিভাগে কতগুলি উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহারা কি রূপে সম্মানিত হইতেন, তাহা অনেকে না জানিতে পারেন, আমরা বিখ্যাত আইন আক্‌বরি হইতে একটি ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীর সেনা বিভাগে চাকরির বিবরণ পাঠককে উপহার দিব। হয়ত পাঠক তাহাতে আক্‌বরের অবলম্বিত নীতির সারবত্তা অধিকতর রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবেন; হয়ত সে সময়ের আভ্যন্তরিক শাসন কার্যের কথঞ্চিৎ আভাস পাইবেন; হয়ত তখনকার জিত জেতা মধ্যে, হিন্দু মুসলমানে, কিরূপ সদ্ভাব বা বিভাব ছিল, তাহাও কতকটা বুঝিতে পারিবেন, আর হয়ত রাজা সুবিধা দান করিলে, দাসত্ব করিয়াও দেশ সেবা হইতে পারে, এমন একটা কথা কেহ না কেহ বুঝিতে পারিবেন। ইতিহাসের নাড়াচাড়ায়, মরীচা সাফ হয়; স্থান বিশেষের উজ্জ্বল আভায় হয়ত মনও এক আধ বার প্রতিভাত হয়।

মোগল সম্রাটদিগের হিন্দু কর্ম্মচারীর কথা বলিতে হইলে, প্রথমে অম্বের রাজ গোষ্ঠীর কথাই বলিতে হয়। অম্বেরের বিহারীমল্ল সর্ব্বপ্রথমে আকবর সাহের সংস্রবে আসেন ; তাঁহার পিতা পৃথ্বীরাজের কুলজিনামা এইরূপ ।



রাজপুত রাজগণের মধ্যে বিহারিমল্লই সর্ব্ব প্রথমে মোগল সম্রাটের সহিত সংস্রব স্থাপন করেন। আকবর শাহের রাজত্বের ১ম বৎসরেই তিনি আহূত হইয়া রাজ সভায় আসেন; যদিও সে সময়ে তিনি সম্যক্ সম্মানিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে আবার সম্রাটের সহিত তাঁহার অপ্রীতি হয়! পরে ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সপরিবার সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, আকবর শাহ তাঁহাকে পঞ্চ সহস্র সেনার সেনাপতিত্ব প্রদান করিলেন।

রূপসী বৈরাগীও সেই সময়ে মোগল সম্রাটের কর্ম্মচারী হন; তিনি পঞ্চ-দশ শত সেনার সেনাপতি ছিলেন।

আস্করণ মল্ল সহস্র সেনার অধিনায়ক এবং কিয়ৎকালের জন্য আগ্রার (জয়েণ্ট) সুবাদার ছিলেন।

জগমল্ল মরথার সুবাদার ছিলেন, এবং সশিবির আকবর শাহের পত্তন ও আহমাদাবাদ যাত্রার সময়ে, সম্রাটের সমভিব্যাহারী সমস্ত সেনার অধিনায়ক ছিলেন।

ভগবান দাস আমীর উলওমরা,—আক্‌বর সাহের বিশেষ সম্রান্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম্ হুসেন মির্জার সহিত আক্‌বর সাহের সরনালের ঘোরতর যুদ্ধে তিনি সম্রাটের প্রাণ রক্ষা করেন। ইহার ছয় বৎসর পরে ভগবান্ পঞ্জাবের সুবাদার হন। তাহার পর পঞ্চ সহস্র সেনার সেনাপতি এবং জাবুলিস্থানের সুবাদার হন। বিখ্যাত তোড়র মলের শোকে ভগবান্ দাস অভিভূত হন, অগ্নিসৎকারের পরেই মূত্রকৃচ্ছ রোগে প্রাণত্যাগ করেন। লাহোরের বিখ্যাত জমি মস্‌জিদ্ ভগবান্ দাসের কীর্ত্তি।

সিহ্লাদি বা সাহ্লাদি আক্‌বর সাহের একজন সামান্য সেনাপতি ছিলেন।

জয়মল্ল ও সেনাপতি ছিলেন, যখন বঙ্গের পাঠানদের সহিত আক্‌বর শাহের সমর চলিতে ছিল, সেই সময়ে জয়মল্ল আকবরের উকীল হইয়া বঙ্গের নৃপতিগণের নিকট আসিতে ছিলেন। পথিমধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজারাজসিংহ প্রথমে গোয়ালিয়রের দুর্গাধিপতি ছিলেন। আকবর শাহ জাহাঙ্গীর শাহ উভয়ের সময়েই চারি সহস্র সেনার এবং তিন সহস্র অশ্বারোহীর অধিনায়ক থাকেন।

তাঁহার পুত্র রাজা রামদাস পঞ্চদশ শত সেনার এবং সাত শত অশ্বের অধিনায়ক ছিলেন।

জগন্নাথের পুত্র রামচাঁদ (বা করমচাঁদ) জেহাঙ্গীর সাহের সময়ে দুই সহস্র সেনার এবং পঞ্চদশ শত অশ্বারোহীর অধিনায়ক ছিলেন।

রাজা মানরূপ যুবরাজ শাজেহান বিদ্রোহী হইলে তাঁহার সহিত যোগ দেন; শাজেহান সম্রাট হইলে তিন সহস্র সেনার এবং দুই সহস্র অশ্বারোহীর অধিনায়ক হন।

১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহের অনুপস্থিতি কালে মহাসিংহ এবং প্রতাপ সিংহ বঙ্গে মোগল সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন।

মধুসিংহ তিন সহস্র সেনার এবং দুই সহস্র অশ্বারোহীর অধিনায়ক ছিলেন।

ছত্রশাল পঞ্চদশ শত সেনার ও সহস্র অশ্বারোহীর অধিনায়ক ছিলেন। শাহজেনানের রাজত্ব কালে, স্বীয় দুই কুমারের সহিত ছত্রশালের সম্মুখ সমরে মৃত্যু হয়; তৃতীয় পুত্র উগ্রসেন আট শত সেনার এবং চারি শত অশ্বারোহীর অধিনায়ক ছিলেন, তিনিই কেবল জীবিত থাকেন।

রাজা মানসিংহ মুসলমান সময়ের ভারতেতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। তিনি রাজপুত শূর রাজর্ষি রাণাপ্রতাপের দ্রোহিতা করিয়া যে মহাপাপে পতিত হন, অভিনব মোগল সাম্রাজ্যে ক্ষত্রিয় আধিপত্য সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই পাপের প্রচুর প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না; পাপ পুণ্যের তুলনা করা আমাদের সাধ্যাতীত; তবে এই বলিতে পারা যায়, যে মানসিংহ স্বীয় প্রতাপে নির্ভর করিয়া দাসত্বের বেনামিতে মোগল সাম্রাজ্য প্রভুত্ব করিতেন মাত্র। তিনিই আকবরের মন্ত্রদাতা মস্তক, ব্যথার ব্যথী হৃদয়, এবং সমর সহায় দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। ইতিহাসে উপরি উপরি আর দুই জন মানসিংহ উদিত হইলে, ক্ষত্রিয়ের ভারতবর্ষে মুসলমান সিংহাসনাধিষ্ঠিত পুত্তলী থাকিতেন মাত্র। আকবরের প্রথম সময়ে দুই তিনটি সুবা লইয়া মোগল সাম্রাজ্য ছিল; রাজা মানসিংহ ক্রমে ক্রমে একটির পর একটি করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করেন, এবং স্বয়ং শাসন ভার লইয়া সুশৃঙ্খলা স্থাপন করেন। প্রথমে সিন্ধু, পরে, জাবুলিস্তান, তাহার পর কাবুলিস্থান, পরে বিহার, তাহার পরে উড়িষ্যা, ক্রমে বঙ্গ ও দাক্ষিণাত্য—মানসিংহ সমস্তই জয় করেন। মানসিংহের শৌর্য্য, বীর্য্য, বিক্রমের গুণেই 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' ভারতের চারিদিকে শব্দিত হইতে থাকে।

পঞ্চ সহস্র সেনার অধিনায়কত্বই সেই সময়ের সৈন্যাধ্যক্ষগণের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদ ছিল। রাজা মানসিংহ আকবর সাহের রাজত্বের পঁয়তাল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সেই উচ্চ পদেই আরূঢ় ছিলেন। সেই সময়ে বিখ্যাত ওসমান খাঁ উড়িষ্যার ভদ্রকের নিকট মোগল সেনাগণকে পরাজিত করিয়া, সমগ্র বঙ্গদেশে পাঠান রাজ্য পুনঃসংস্থাপনের উপক্রম করেন। রাজা মানসিংহ বহুদূরে আজমীরের পথে ছিলেন; এই দুর্ঘটনা শ্রবণমাত্র, ক্ষিপ্র গতিতে গিরি, কন্দর, কান্তার তুচ্ছ করিয়া, অতি দুর্গম অথচ সহজ পথে, বুন্দেলখণ্ড ঝারখণ্ড, রোটাশের মধ্য দিয়া বঙ্গে প্রবেশ করিলেন; মুর্শিদাবাদ বীরভূমের মধ্যবর্ত্তী পথে শেরপুর আতাইয়ের নিকট মোগল পাঠানে ভয়ঙ্কর খেলা হইল। পাঠান প্রতাপ বজ্রাঘাতে নারিকেল বৃক্ষের মত, ছিন্ন ভিন্ন বিধ্বস্ত হইল; ওসমান খাঁ উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। বঙ্গে মোগলাধিপত্য সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। সম্রাট মহা সন্তুষ্ট হইলেন, বহু মানে মানসিংহের সম্মান বর্দ্ধন করিলেন। রাজা মানসিংহকে হপ্ত হাজারি মন্সব অর্থাৎ সপ্ত সহস্র সেনার নায়কত্ব প্রদান করিলেন। হিন্দু সেনাপতি, পারসী, তুরকী, মোগল,

পাঠান সকল শ্রেণীর মুসলমান কর্ম্মচারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রাজপদ পাইলেন। আকবর সাহের এইরূপ উদারনীতির গুণেই সুমহৎ ক্ষত্রিয় সন্তানগণ ধর্ম্ম-বৈর হুতাশন তুষস্তূপে ঢাকা দিয়া বিজাতির সহিত মিলিয়া, বিধর্ম্মীর সহিত এক হইয়া, দেশের হিত সেবায় সচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিয়াছিলেন।

আকবর শাহের হিন্দুকর্ম্মচারীদের মধ্যে আমরা কেবল সেনা বিভাগে নিযুক্ত একটি মাত্র ক্ষত্রিয় বংশের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম মাত্র। সেনা বিভাগের অন্যান্য কর্ম্মচারীর এবং তোড়রমল্ল প্রভৃতি অন্যান্য বিভাগের কর্ম্ম-চারীর পরিচয় সময়ান্তরে দিবার ইচ্ছা রহিল। যে কথাটি আমরা বলিতেছি, তাহার জন্য আপাততঃ উপরের অসম্পূর্ণ বিবরণই যথেষ্ট।

কি কথায়, কি কথা মনে আসিল! দুর্দ্দান্ত প্রতাপ, বিক্রম কেশরী রাজা মানসিংহের কথা বলিতে বলিতে এই দুর্ব্বল বাঙ্গালী হৃদয়ের বালক কালের একটা কথা মনে পড়িল। ইতিহাসের কথা হইতে, জীবনের একটি সামান্য কথা মনে পড়িল। পঠদ্দশায় এক দিন ইংরেজ অধ্যাপক, ব্রহ্মযুদ্ধ, কি কোন যুদ্ধের কথা লিখিতে বলেন; 'বৃটিস ফৌজ, এই করিল, বৃটিশ ফৌজ এই করিল না'—এইরূপ করিয়া আমরা লিখিয়াছিলাম। সদাশয় অধ্যাপক আমাদের লেখা দেখিতে দেখিতে একটু গম্ভীর ভাবে মৃদুস্বরে বলিলেন; "তোমরা 'বৃটিশ ফৌজ', 'ইংরেজ ফৌজ' বলিয়া না লিখিয়া 'আমাদের ফৌজ', 'আমাদের সেনানী', 'আমাদের লস্কর' (Our army, Our general, Our men.) এইরূপ বলিলেই ভাল হয়। বাস্তবিক ফৌজে ইংরেজ কয়জন থাকে?" আমরা মাথা নোয়াইয়া, বিনীত স্বরে বলিলাম, "ওরূপ কথা বলিতে আমাদের কেমন লজ্জা করে।" অধ্যাপক আমাদের মুখের দিকে দেখিয়াই কেমন একটু লজ্জিত হইলেন, একটু পরে অন্য কথা পাড়িলেন। এই সামান্য কথা আজি মনে পড়িল। সেই বালক কালে, যে কথাটা শুনিয়া মাথা নোয়াইয়াছিলাম, এখনও সেই কথায়, তেমনই ভাবে লজ্জায়, দুঃখে, আক্ষেপে মাথা নুইয়া পড়ে।

আজি ইংরেজ-কেশরী দূর দাবানলে বেষ্টিত প্রায়। কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণ দিয়া পঙ্গপাল রুষসৈন্য মধ্য আসিয়া আচ্ছন্ন করিয়া হিরাট অভিমুখে আসিতেছে; কাবুলের আমীর সেই স্রোতে বাধা দিতে ইংরেজ কর্ত্তৃক অনু-রুদ্ধ হইয়াও ইতস্তত করিতেছেন। ধর্ম্মোৎসাহে স্পন্দিত-শিরা, ভ্রূকুটি

ভীষণ, লম্বিত-শ্মশ্রু মুসলমান নিচয় সুদানের অকাল সমরে ফিরিঙ্গির মহাকাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। দুর্জ্জয় জর্ম্মানি উপনিবেশ রক্ষার ছলনায়, কামান বন্দুকের কুজন করিতে প্রস্তুত। ফরাসী চীন সমরের ব্যপদেশে ভারতের পূর্ব্বাঞ্চল আপনার সুসজ্জিত রণতরীতে ছাইয়া ফেলিল। মন্ত্রণা-কুশল ইটালী মৈত্রী প্রদর্শন পূর্ব্বক আফ্রিকায় স্থান সংস্থান করিয়াছেন। চারি দিকে এইরূপ দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আর সিংহের সিংহাসন পার্শ্বে সজাতীয় শক্র, প্রাণতুচ্ছকারী, নরঘাতক সম্প্রদায় গুপ্ত বারুদ যন্ত্র লইয়া নিয়তই ষড়যন্ত্র করিতেছে। এ বড় বিষম সময়।

হিন্দু মুসলমান এক হইয়া, হিন্দু মুসলমানের অধিকার হইতে খণ্ডীকৃত ভারত সাম্রাজ্য ক্রমে ক্রমে ছিনাইয়া লইয়া ইংরেজকে ভারতে একছত্র রাজত্ব দিয়াছে। সাতান্ন সালে ইংরেজের বিষম দুর্দ্দিনে হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়া, হিন্দু মুসলমানের বক্ষ বিদারণ করিয়া, সেই সজাতি রক্তে ইংরেজকে ভারতে আবার পুনরভিষেক করিয়াছে; আজি ইংরেজরাজের এই বিষম দিনে, সেই হিন্দু মুসলমানই আবার কাবুলের পাহাড়ে বল, আর সুদানের মরুতেই বল, প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তবুও আমরা হিন্দু মুসলমানে 'আমাদের সেনা,' 'আমাদের সেনানী' বলিতে পারি না। সাত টাকার সিপাহী গিরি, উহাতেই তোমার আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হইবে, স্থিতি হইবে, প্রলয় হইবে। তুমি আর কোন মুখে বলিবে, আমরা যুদ্ধ করিব? যুদ্ধ করিবেন ইংরেজ, প্রাণ দিবে ভারতবাসী! তাই বলিতেছিলাম, এখনও লজ্জায় মাথা নুইয়া আসে।

যাহার যে গুণ আছে, তাহার সেই গুণটি রাজ কার্য্যে ব্যবহৃত করিয়া লইতে পারিলেই, রাজার মহত্ব, রাজার বিচক্ষণতা। যে রাজা কাহার কিরূপ গুণ আছে, তাহা বুঝিতে পারেন, এবং সেই গুণের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, তিনিই আকবর, তিনিই নেপোলিয়ন। যাহারা উৎসাহশীল, যাহারা রণদক্ষ, যাহারা রাজগৌরব রক্ষার্থ প্রাণ দিতে প্রস্তুত, কেবল সিপাহীগিরি বা হাবেলদারিতেই কি তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইতে পারে? তাহা হয় না। কাজেই উচ্চাকাঙ্ক্ষার উৎসাহশীল লোক এখনকার দিনে সেনা বিভাগের সংস্রবে থাকেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেশভক্তির প্রধানত দুই প্রকার প্রকৃতি। অধিকাংশ দেশহিতৈষীই বিদেশী রাজার কার্য্যে যোগদান করিয়া দেশ হিত সাধন

করিতে ইচ্ছুক; তাহাতে যদি বাধা পায়, তাহাতে যদি স্ফূর্ত্তি না পায়, তাহা হইলে, সহস্রের মধ্যে একজন না একজন, অন্য মূর্ত্তির দেশ ভক্তির সেবা করে। বিচক্ষণ ইংরেজ, অবশ্য এ মূর্ত্তির অর্চ্চনা ভালবাসেন না। তবে মুসলমানের হস্ত হাজারির পরীবর্ত্তে ইংরেজের হাবেলদারি দিয়া, ভারতবাসীকে বিড়ম্বিত করিতে গিয়া, আপনারা কেন যে বিড়ম্বিত হন, তাহা বুঝিতে পারি না।

জাতি।

সৃষ্টি, স্থিতি, উন্নতি।

খ্রীষ্টান মিশনরিদের কৃপায়, এবং অখ্রীষ্টান, অহিন্দু, অমুসলমান সম্প্রদায়ের অনুকরণের অনুষ্ঠান গুণে জাতিভেদে অনিষ্টপাতের কথা শুনিতে আর কাহারও বাকি নাই। জাতিভেদের গুণের কথাই বা কম শুনিয়াছি কি? সেই প্রাচীনের প্রাচীন, বিজ্ঞের বিজ্ঞ মনু হইতে, ঐ বালকের বালক, অজ্ঞের অজ্ঞ, সদ্য উপনীত ব্রাহ্মণ তনয়, জাতিভেদ পক্ষে দুটা কথা কে না বলিয়াছেন? কিন্তু এই ঘোরতর তর্ক বিতর্কের ফল হইয়াছে কি? অন্যান্য বিষয়ে ইংরেজি শিক্ষায় সাধারণত যে ফল ফলিয়াছে এ বিষয়েও ঠিক সেইরূপ ফল হইয়াছে; আমরা এখন ঘাড় নাড়িয়া দুই দিকেই দুই চারি কথা বলিতে পারি। যে দিকে ব্রীফ দিবে আমরা এখন সেই দিকেই ওকালতি করিতে প্রস্তুত। আমরা চৌকোশ লোক (Square man) হইতে পারি, আর নাই পারি, সমানান্তরাল লোক (Parallel man) হইয়াছি বটে; অনেক বিষয়েই আমাদের দুই দিকে সমান টান। বাল্য বিবাহ—হুঁ, দুই দিকেই আছি। বিধবা বিবাহ—সেইরূপ; স্ত্রীস্বাধীনতা,—তথৈবচ; জাতিভেদ—ডিটো। আমরা দুই দিকেই বলিতে কহিতে পারি, কোন দিকেই কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহি। অবস্থা তাড়নায় যেরূপ দাঁড়ায়, সেইরূপই কার্য্য করিয়া থাকি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সেত বক্তৃতার বিষয়। যদি ঠাকুরমা প্রবলা হইলেন, তাহা হইলে গৃহিণী গুদামজাত, আমরা হইলাম রক্ষণশীল; যদি গৃহিণী প্রবলা হইলেন, তাহা হইলে তিনি গড়ের মাঠে; আমরা সংস্কারক। এমন করিয়া আর কত দিন চলিবে?

আসল কথা এই যে, সামাজিক ব্যাপারে, আমরা গোল করিতে মজবুত বটে, কিন্তু কঠোর কর্ত্তব্য বোধে সাধ্যমত মীমাংসা করিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহি। জাতিভেদ, জাতিভেদ আমরা সকলেই বলিয়া থাকি, কিন্তু কিসে জাতি হয়, রয়, যায়, তাহা কি আমরা বাস্তবিক বুঝি?

ইংরেজি পুস্তকে দেখা যায়, যে, জাতিভেদ দোষেই জগন্নাথের রথে যাত্রী মারা পড়ে, বালবিধবায় চির কৌমার্য্যের যন্ত্রণা ভোগ করে, পশ্চিমের ব্রাহ্মণে মৎস্য ভক্ষণ করে না। জাতিভেদ যে কি, তাহা তাঁহারা বড় বলেন না, তাঁহাদের কথায়ও বড় একটা বুঝা যায় না, তবে মোটের উপর এইমাত্র বুঝা যায়, যে জাতিভেদ কেবল শয়তানের শয়তানি। আবার জিজ্ঞাসা করি, এরূপ ফাকা কথা লইয়া কতদিন চলিবে?

কোন্ বিষয়ের কত টুকু ভেদ লইয়া জাতিভেদ, তাহা বুঝা আমাদের অগ্রে কর্ত্তব্য। আমরা যতদূর বুঝি, তাহাতে এই মাত্র বুঝা যায়, যে জন্ম ভেদেই জাতি সৃষ্টি; বিবাহের নিয়মেই ইহার স্থিতি; এবং সঙ্কর-বীজেই জাতকের জাতি নষ্ট।

গুণ ভেদে জাতিভেদ, অসম্ভব কথা। আপনার গুণে সিবিলিয়ান হওয়া যায়; ইলবর্ট বিলের গুণে সমান অধিকার পাওয়া যায়, কিন্তু কোনও বিধি ব্যবস্থায় বাঙ্গালি ইংরেজ হইতে পারে কি? বিশ্বামিত্র, হয় মহাতপস্যা, না হয় মহা দাঙ্গা করিয়া, অথবা দুই করিয়া ব্রাহ্মণের অধিকার পাইয়াছিলেন। তবু তিনি রাজর্ষি হইয়াছিলেন মাত্র; এত সাধ্য সাধনায়ও ব্রহ্মর্ষি হইতে পারেন নাই। উদার ব্যবস্থা থাকিলে, গুণ থাকিলে, এক জাতি উচ্চতর জাতির অধিকার পায়, দোষী হইলে নীচতর জাতির মত কোন কোন অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। বীজশুদ্ধিতে জাতির উৎপত্তি; কেবল বীজের অশুদ্ধিতেই জাতি নষ্ট হয়। অন্য কোন দোষ গুণে জাত্যন্তর প্রাপ্তির কথা অসম্ভব। বিশেষ বিশেষ কার্য্য দোষে ব্রাহ্মণ পতিত হইলে, চণ্ডালের সমান হয়; চণ্ডাল হয় না।

এই বীজ শুদ্ধি জন্য বিবাহ শুদ্ধি একান্ত আবশ্যক; এ কথা হিন্দু শাস্ত্রের সর্ব্ববাদীসম্মত। বিবাহ শুদ্ধি জন্যই, বিবাহে জাতিভেদ হইয়া থাকে। বীজ-শুদ্ধি জন্য অন্ন-শুদ্ধি আবশ্যক বটে; কিন্তু ভিন্ন বর্ণের অন্নে অন্নশুদ্ধি হয় না, এ মতটি সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। পণ্ডিত দয়ানন্দ শাস্ত্রী নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়াছিলেন, যে মহাভারতাদির সময়ে শূদ্র সূপকারের অন্ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সকলেই গ্রহণ করিতেন।

আসল কথা, পাক-ভেদ জাতি ভেদের মজ্জা নহে; বীজ-ভেদেই জাতিভেদ এবং সম্পূর্ণরূপে বীজশুদ্ধিই জাতিভেদের একমাত্র লক্ষ্য।

এই বীজ শুদ্ধিতত্ত্ব য়ুরোপ আমেরিকায় অপরিচিত। ঐ সকল দেশ অশুদ্ধ বীজের বা মিশ্র বীজের ক্ষেত্র। য়ুরোপ বাহুবলে বলীয়ান, যন্ত্র কৌশলে গরীয়ান; নবোৎসাহে তেজীয়ান; অশুদ্ধ বীজে এত করিয়াছে, কাজেই য়ুরোপ শুদ্ধ বীজের গৌরব বুঝে না; চোরা কখন ধর্ম্মের কাহিনী শুনে না। সমগ্র পৃথিবীতে কেবল দুইটি মাত্র জাতি বীজ শুদ্ধির গৌরব করেন; হিন্দু এবং ইহুদী; আর এই দুইটি জাতিই পর-পদদলিত। এই কি বীজ শুদ্ধির ফল হইল? ফল সামান্য নহে; যখন, রোমান, য়ূনান প্রভৃতি অশুদ্ধ-বীজ প্রাচীন জাতিরা অতীতের অতলে লীন হইয়াছে, তখন কেবল এই দুটি শুদ্ধ বীজ জাতিই, লক্ষ লাঞ্ছনেও জীবিত আছে। শুদ্ধ বীজের আশ্চর্য্য জীবনী শক্তি।

য়ুরোপ এতকাল বীজ-শুদ্ধির ভাল মন্দ কোন কথাই জানিত না বটে; কিন্তু সম্প্রতি এক আধটু আভাস পাইতেছে। প্রথমে জাতি শক্তি (Heredity) না বুঝিলে বীজশুদ্ধি বুঝা যায় না। কিছু দিন পূর্ব্বে জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ মহা মহা পণ্ডিতেরা কি সমাজ নীতিতে, আর কি ব্যক্তিগত চরিত্রে, কেবল শিক্ষা শক্তিই স্বীকার করিতেন; হর্বট স্পেন্সরের সহিত মিলের জাতি শক্তি লইয়া মহা তর্ক হয়; শেষে মিল জাতি শক্তি স্বীকার করেন; এখন অনেকেই জাতি শক্তি মানেন। কেহ কেহ জাতি শক্তির প্রাধান্য দিতেছেন। পুংস্ত্রী-ভেদের তত্ত্ব পর্য্যালোচনার পুস্তকে গ্রন্থকার জাতিশক্তির গৌরব করিয়াছেন।

Great attention has been recently given to education, it is looked upon as a sovereign remedy for crime and many other diseases of the body politic, But probably the most urgent question of the times is this: Is not *generation* of more consequence than *education?* * * * * * * In improving the blood of domestic animals, is the best attention given to the *training* or the *blood;*

অন্য স্থলে;—

The truth is that mankind has never investigated the subject but strangely neglected what might be positively ascertained with comparative ease. If the laws of heredity, were as well known as they might and should be, the knowledge of them would greatly conduce to health and length of days and to the transmission to our posterity of the higher and better elments of our nature.

THE LAW OF SEX. *Starkweather.*

মস্তক বেষ্টনে নাসিকা স্পর্শ করাই, এখনকার দিনে আমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। সকল তত্বই এখন য়ুরোপ ঘুরিয়া বুঝিতে হয়। দর্শন, যোগ প্রভৃতি শাস্ত্র আমরা সহজ পথে না শিখিয়া, য়ুরোপীয় তত্ত্বের মধ্য দিয়া বুঝিতে যাই। সুতরাং জাতিশক্তির কথা, এবং বীজশুদ্ধির কথা যখন য়ুরোপে উঠিয়াছে, তখন এদেশেও উঠিবে, এমন ভরসা করা অসঙ্গত নহে।'

বীজশুদ্ধি লক্ষ্য করিয়াই জাতির সৃষ্টি, এবং বীজশুদ্ধিতেই জাতির স্থিতি; কিন্তু কেবল বীজশুদ্ধিতে অধঃপতিত সমাজের কোন জাতিরই উন্নতি হইতে পারে না। তজ্জন্য চিত্তশুদ্ধির সহিত ক্রিয়াশুদ্ধি একান্ত আবশ্যক।

বীজশুদ্ধির গৌরবজ্ঞান ভারতবাসীর অস্থিমজ্জায় অন্তর্নিবিষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টান হইয়াও কন্যার বিবাহ দিবার সময় ব্রাহ্মণ (খ্রীষ্টান) পাত্রের অনুসন্ধান করেন। সুতরাং জাতিভেদের মজ্জা রক্ষার জন্য আমাদিগকে বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইবে না; কিন্তু চিত্তশুদ্ধি ক্রিয়াশুদ্ধির জন্য যত্ন করা সকলের পক্ষেই একান্ত আবশ্যক।

সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ জাতির। ব্রাহ্মণ এখনও হিন্দু সমাজের শীর্ষ স্থানীয়। ব্রাহ্মণের পুনরুত্থান সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক; ব্রাহ্মণ উঠিলে, সকলের উদ্ধার সহজ হইবে। এই বিষয়ে অগস্ত্যকোম্‌তের মত অতি বিচিত্র; তিনি বলেন, ব্রাহ্মণ হইতে ভারতের পুনরুদ্ধার হইবে; তবে তজ্জন্য বিষয় বাসনা, এবং ঐহিক প্রভুত্ব লালসা পরিত্যাগ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তাঁহার সবিস্তার মত, সানুবাদ উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

* * * Positivism must first regenerate the polytheists of India, then of China, lastly those of Japan.

Although it will act simultaneously on the three, whether through the direct agency of the West, or indirectly through the Mussulman, it is impossible to doubt that *the Theocracy which has suffered the least from time will be the most open to the regnerative process.* Besides my lectures on this subject, I must refer to the preceding volume for explanations in consistent with the limits of my present sketch, to show the *latent predisposition of the Brahmins* in favor of the faith which will restore their social position, whilst perfecting their moral nature and their mental organisation * * * * * Positivism will deliver it (the theocratic caste i.e. the Brahmins) from the oppression of the temporal power to which it has been subjected for twenty centuries, an oppression which it bows to more and more *without ever losing its consciousness of its spiritual superiority*

and the hope of seeing it definitiivly reestablished. Such a restoration, it is true, demands its complete *renunciation of command and even of property,* but the systematic guardians of human order will hot be slow to accept conditions in the name of their social mission and of their indivinal dignity.

Positivism offers, then, the regenerate Brahmins the reorganisation of Brahmanical body, but it offers them besides, and nothing else does, gratification of the noble wish they have cherished to free their country from all foreign dominion. *Appealling in fitting terms to the English nation it will peacably remove a yoke, which, under whatever veil of illusion justly inspires more antipathy than that of the Mussalmen* * * * * the great object of instituting that doctrine (the positive faith) being to enable the Brahmins who have become posivists to modify their theocratic milien.

Extract from POSITIVE POLITY. VOL. IV. Page 447.

বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম প্রথমে ভারতের, পরে চীনের সর্ব্বশেষে জাপানের দেবোপাসকগণকে পুনর্জীবিত করিবে।

বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম ঐ তিন জাতির উপরই একই সময়ে শক্তি চালনা করিবে বটে, তা সাক্ষাৎভাবে য়ুরোপীয়দিগের দ্বারাই করুক অথবা পরোক্ষাভাবে মুসলমানদের দিয়াই করুক, কিন্তু, যে জাতি কালবলে সকল অপেক্ষা অল্প পরীবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারাই (ব্রাহ্মণেরাই) বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মের নবজীবনী শক্তিতে শীঘ্র সঞ্চালিত হইবে। এই বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যার জন্য আমার অন্যান্য বক্তৃতা এবং এই গ্রন্থের পূর্ব্ব খণ্ড দেখিতে বলি; এই ক্ষুদ্র বিবরণে সকল কথা বিবৃত করা আয়ত্তি সাধ্য নহে; ঐ সকল দেখিলে, বুঝা যাইবে, যে, যে ধর্ম্মে ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহাদের পূর্ব্ব সামাজিক গৌরব দেয়, অথচ তাঁহাদের মানসিক প্রকৃতি সর্ব্বগুণ সম্পন্ন করে, সে ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে ব্রাহ্মণদের গূঢ় প্রবৃত্তি আছে।

বিগত দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মণেরা রাজশক্তির অধীন হইয়া আছেন, এই রাজশক্তির অত্যাচারের হস্ত হইতে বিজ্ঞান ধর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগকে উদ্ধার করিবে। ব্রাহ্মণেরা রাজ শক্তির অত্যাচারের নিকট দিন দিন অধিকতর নত হইয়া আছেন বটে কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগকে আধ্যাত্মিকতায় অন্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর উন্নত বলিয়া জানেন; সে জ্ঞান তাঁহারা এক দিনের তরেও হারান নাই; আর সর্ব্বতোভাবে সেই শ্রেষ্ঠতা পুনঃ সংস্থাপনের আশাও একদিনের তরে ত্যাগ করেন নাই। আপনাদের গৌরব পুনঃ স্থাপনার জন্য ঐহিক বিষয়ে প্রভুত্ব ও বিত্তাদির বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে আবশ্যক; (নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণেরা তাহা করিবেন) যাঁহারা এত কাল ধরিয়া ধারা বাহিক ক্রমে মানব সমাজের সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদের ব্যক্তিগত মহত্ত্ব রক্ষা জন্য, এবং তাঁহাদের সমাজিক কর্ত্তব্য সাধন জন্য, ঐরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না।

ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় পুনর্গঠনের সুবিধা নবজীবন-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণকে বিজ্ঞানধর্ম্মে প্রদান করে; আর সর্ব্বপ্রকার বৈদেশিক আধিপত্য হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিবার যে আশা তাঁহারা এতদিন ধরিয়া পোষণ করিয়াছেন, সেই আশা ফলবতী করিবার সুযোগও বিজ্ঞান ধর্ম্মই তাঁহাদিগকে প্রদান করে, সে সুযোগ আর কিছুতেই দেয় না। ইংরাজ জাতির নিকট যথোপযুক্ত ভাবে আত্ম বেদন জানাইয়া, ইহারা বিনা রক্তপাতে, ইংরাজের প্রভুত্ব হইতে আপনাদিগকে উন্মোচন করিবেন; ইংরেজের প্রভুত্ব যতই কেন মোহ কুহকে ঢাকা ঘেরা থাকুক না, মুসলমানের রাজত্ব অপেক্ষা বাস্তবিকই অধিকতর অসন্তোষের নিদানীভূত। * * *. বিজ্ঞানধর্ম্ম ভারতে প্রতিষ্ঠান করার উদ্দেশ্যই এই যে, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা ঐ মতাবলম্বী হইবেন, তাঁহারা এতদ্দ্বারা সহজে যাজক সম্প্রদায়ের প্রকৃতি পরীবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

বিজ্ঞান ধর্ম্মের বলে ব্রাহ্মণ জাতির পুনরুত্থানের কথা,—সহজেই মনে করা যাইতে পারে, কোমতের নিজ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মে গাঢ় অনুরাগের পরিচয় মাত্র। কিন্তু বিষয়-বৈভব-বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ জাতি আবার পূর্ব্ব গৌরব পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন, এ কথাটিতে বড় আশা হয়, বড় আনন্দ হয়। কিন্তু য়ুরোপের সুদূর প্রান্ত হইতে কঠোর বৈজ্ঞানিক কোমৎ ভারতের বিকৃত ইতিহাস পাঠ করিয়া যে কথাটি বুঝিতে পারিলেন, যাঁহাদের কথা, তাঁহারা শাস্ত্রের বিধি নিষেধ সহস্র স্থানে স্পষ্ট দেখিয়াও সেই কথা বুঝিতে পারেন না, ইহাই অশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাই আক্ষেপের কথা! যখন তোমার বিষয় বাসনা ছিল না, সামান্যে সন্তুষ্ট থাকিতে, শ্রদ্ধার দানে দিন যাপন করিতে, পরমার্থ চিন্তায় আনন্দ বোধ করিতে, তখন তুমি ঊর্দ্ধ হস্তে কেবল আশীর্ব্বাদ করিয়া সমগ্র সমাজের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়াছ, আর আজি তুমি বৈষয়িক বৈভবের জন্য ব্যস্ত, কাজেই আজি তোমাকে দক্ষিণার জন্য দ্বারে দ্বারে জোড় হস্তে পরিভ্রমণ করিতে হইতেছে! জানিনা কত দিনে তোমার চক্ষু উন্মীলিত হইবে!

ব্রাহ্মণগণ এখন যদি জাতি স্থিতির ভাবনা না ভাবিয়া, স্বজাতির উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম জীবনের উচ্চ ব্রত অবলম্বন করেন, তাহা হইলে, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরব লাভ করেন, এবং ভারতে সত্য সত্যই নবজীবন হয়। জানি না, ব্রাহ্মণের চক্ষু কবে উন্মীলিত হইবে! এমন করিয়া আর কত দিন চলিবে!

প্রকৃতির গীত।

গান।

"নাথ! ভু'লো না এ দাসীরে!
এই অনুরাগ যেন,
থাকে চির দিন তরে।
কুল মান লাজ ভয়,
ত্যজিয়াছি সমুদয়,
সঁপেছি জন্মেরি মত
মন প্রাণ তব করে।
তুমি বিনে অন্য আর,
কি ধন আছে আমার,
প্রাণে মরি ও বদন,
তিলেক না হেরিলে পরে।"

১।

গভীর নিশীথে, কি গভীর গীত
গাইছে প্রকৃতি গভীর স্বরে!
অনন্ত রূপিণী, অনন্ত কণ্ঠেতে,—
"ভু'লো না দাসীরে" গাইছে কাতরে
অনন্ত স্বরূপে, অনন্ত কণ্ঠেতে—
"ভুলিও না নাথ"—কিবা একতান
গাইছে অশ্রান্ত; অনন্ত পুরিয়া—
"ভুলো না দাসীরে"—উঠিছে গান।

২।

"এই অনুরাগ, চির দিন তরে,
"থাকে যেন তব ওহে প্রেমময়!
"এই অনুরাগে সৃষ্টি প্রকৃতির,
"এই অনুরাগে দাসী বেঁচে রয়।
"এই অনুরাগে শোভিতেছে নিত্য
"দাসীর গলায় পুষ্প তারা হার।
"এই প্রেম বহ্নি জ্বলিছে হৃদয়
"উচ্ছ্বসিছে বক্ষে প্রেম পারাবার।
"রবি, শশী, তারা, ভূধর, সাগর,
"জল স্থল কণা এই প্রেমময়;
"এই অনুরাগ নাহি থাকে যদি
"মরিবে এ দাসী, হইবে প্রলয়।

৩।

"নাহি কুল, নাথ, তব এ দাসীর,
"পুরুষে প্রকৃতি হয়েছে লয়।
"নাহি তার, প্রভু, মান অভিমান,
" অশ্রান্ত তোমার সেবায় রয়
" উলঙ্গ প্রকৃতি, নাহি দ্বিধা জ্ঞান;
" নাহি লজ্জা, সদা প্রতিব্রতাময়।
"যেই পথে বল, চলে সেই পথে,
"যেই রূপে গড়, সেরূপ হয়।
"দিয়েছ অভয়, নাহি তার ভয়,
"অশনি বিদ্যুৎ খেলিছে বুকে;
"কত সৌর রাজ্য, আগ্নেয় ভূধর,
"লইয়া ছুটেছে অনন্ত মুখে।

৪।

"তুমি বিনা আর, কি ধন তাহার
"আছে? তুমি এক দ্বিতীয় নাই।
"মরি দাসী, যদি তিলেক তোমার
"প্রেমময় মুখ দেখিতে না পাই।
"তব প্রেম মুখ তিলেক অন্তর,
"হয় যদি নাথ! রবি, শশী, তারা,
"নিবিবে, ঢাকিবে আঁধারে প্রকৃতি;
"হইবে জগত নিয়তি হারা।
"গ্রহে উপগ্রহে ঘাত প্রতিঘাতে
"অঙ্গে অঙ্গে দাসী হইয়া ক্ষত;
"ভৌতিক বিপ্লবে হয়ে আত্মঘাতী
"হইবে প্রকৃতি শূন্যে পরিণত।"

৫।

গভীর নিশীথে, কি গভীর গীত
গাইছে প্রকৃতি গভীর ধীরে;
অনন্ত রূপিণী অনন্ত কণ্ঠেতে
কহিছে কাতরে—"ভু'লো না দাসীরে।"
আমি ক্ষুদ্র নর, মাতা প্রকৃতির
অণু পরমাণু; এই মহা গীত
গাই যেন নিত্য হৃদয় ভরিয়া—
প্রকৃতির এই জীবন সঙ্গীত।
প্রকৃতি রাধিকা, করিছে এ গীতে
কৃষ্ণ আরাধনা, ভাসি প্রেম নীরে;
প্রতি পরমাণু, অনন্ত গোপিনী
গাইতেছে—"নাথ ভু'লো না দাসীরে।"

নবজীবন।

১ম ভাগ। } বৈশাখ ১২৯২ { ১০ম সংখ্যা।

ভারতীয় ও বৈদেশিক সূক্ষ্ম-ভূত তত্ত্ব।

আমাদের আর্য্যশাস্ত্রে আছে "অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যাদাকাশঃ, আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নি রগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী চোৎপদ্যতে।" প্রকৃতিতে উপহিত পরমেশ্বর হইতে প্রথমত সূক্ষ্ম আকাশ, সূক্ষ্মাকাশ হইতে সূক্ষ্ম বায়ু, সূক্ষ্ম বায়ু হইতে সূক্ষ্ম তেজ, সূক্ষ্ম তেজ হইতে সূক্ষ্ম জল, সূক্ষ্ম জল হইতে সূক্ষ্ম ক্ষিতি উৎপন্ন হইল। "ইমান্যেব সূক্ষ্মভূতানি তন্মাত্রান্যপঞ্চীকৃতানি চোচ্যন্তে। এতেভ্য সূক্ষ্ম শরীরানি, স্থূল ভূতানিচ উৎপদ্যন্তে।" এই অবস্থার আকাশাদি পঞ্চভূতকে সূক্ষ্মভূত, মহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র (ন্যায়মতে পরমাণ) এবং অপঞ্চীকৃত (অস্থূল—অব্যবহার্য্য), কহে।—মানবের মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিরূপ সূক্ষ্মদেহ ঐ সকল সূক্ষ্ম ভৌতিক উপাদানে বিরচিত। অপর সেই সকল সূক্ষ্ম ভূতই পঞ্চীকৃত (অর্থাৎ পরস্পর মিলিত ও স্থূলত্ব প্রাপ্ত) হইয়া ব্যবহারোপযোগী স্থূলপঞ্চভূতরূপে ক্রমে পরিণত হয়। 'যথা ক্রমং কারণতা মেকৈকস্যোপ যান্তিবৈ।' ঐ আকাশাদি ভূতগণ ক্রমপূর্ব্বক অর্থাৎ প্রথম ভূত দ্বিতীয় ভূতের, দ্বিতীয় ভূত তৃতীয় ভূতের, তৃতীয় ভূত চতুর্থ ভূতের, চতুর্থ ভূত পঞ্চম ভূতের ক্রম কারণতা লাভ করে। পর পর ভূতগণ স্ব স্ব অসাধারণ গুণের অতিরিক্ত ক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণীভূত ভূতের গুণ প্রাপ্ত হয়। এই সকল স্থূল ভূতই স্থূল শরীরের উপাদান। এতাবন্মাত্র ঋষির উপদেশ, ইহাতে কোন বাকাড়ম্বর নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যদি এই কয়েকটি তত্ত্ব বিজ্ঞাপন করিতেন, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডের বিদ্যুতীয়-শক্তি, চৌম্বকাকর্ষণ শক্তি,

রাসায়নিক তত্ত্ব, মধ্যাকর্ষণ প্রভৃতির সঙ্কলন ব্যবকলন পূর্ব্বক বহু বাগাড়ম্বর সহকারে বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়া ফেলিতেন।

ফলত সৃষ্টি, প্রলয়, এবং ভূগর্ভস্থ অগ্নি সম্বন্ধে ভারতীয় শাস্ত্রে যেরূপ বিবরণ আছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে, তাহার মধ্য হইতে বিস্তর আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইতে পারে। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, এই সৃষ্টি অনাদি কামকর্ম্ম ও অদৃষ্ট বীজস্বরূপিণী ব্রহ্ম শক্তিতে বিলীন ছিল। কেন না তাহাই মূল শক্তি। যাহা মূল শক্তি, তাহাই মূল কারণ। সেই শক্তি হইতে সূক্ষ্ম আকাশ, সূক্ষ্ম আকাশের মধ্য হইতে সূক্ষ্ম বায়ু, সূক্ষ্ম বায়ুর মধ্য হইতে সূক্ষ্ম তেজ, সূক্ষ্ম তেজের মধ্য হইতে সূক্ষ্ম জল, সূক্ষ্ম জলের মধ্য হইতে সূক্ষ্ম মৃত্তিকা উৎপন্ন হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রত্যেক তত্ত্বের মধ্যে পর পর সমুদায় তত্ত্ব অবচ্ছিন্ন ছিল। এই সূক্ষ্মভূতগুলিকে তন্মাত্র কহে। তন্মাত্র সকল কেবল পঞ্চভূতের অনুমান সিদ্ধ সূক্ষ্ম অবয়ব। তাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। স্থূল চক্ষু যেমন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ, চক্ষুর দর্শন শক্তিটি সেরূপ নহে। তাহা কেহ দেখিতে পায় না। তথাপি তাহা আছে, ইহা সকলেই মানে। সুতরাং তাহা অনুমান সিদ্ধ হইল। পরমাণু অর্থাৎ তন্মাত্র সকল ঐরূপ অনুমান-সিদ্ধ। জ্যোতি পদার্থটি স্থূল হইলেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়, কিন্তু সেই স্থূল জ্যোতির বীজরূপিণী তৈজস-শক্তি যাহা সর্ব্ব পদার্থে আগ্নেয় ধাতুরূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছে, যাহা দেখা যায় না, অথচ যাহা উপযুক্ত আশ্রয়রূপ ও উত্তর সাধকরূপ উপাধি-লাভ করিবা মাত্র ব্যক্ত হয়, তাহাকে রূপ-তন্মাত্র বা তৈজস পরমাণু বলে। তাহার সে রূপ সূক্ষ্ম সত্তা কেবল অনুমান সিদ্ধ। প্রত্যেক জাতীয় তন্মাত্র এই রূপ অতি সূক্ষ্ম ভূত পদার্থ। প্রকৃত প্রস্তাবে তৎসমূহ ভৌতিক শক্তির আদিম বিশুদ্ধ অবয়ব। তাহাই জগদুৎপত্তির পক্ষে সুসূক্ষ্ম উপাদান স্বরূপ।

প্রাকৃতিক প্রলয়ের অন্তে যখন প্রথম সৃষ্টি হয়, তখন ঐ সকল উপাদানে জীবের সূক্ষ্মদেহ বিরচিত হইয়া থাকে। ঐ সকল তন্মাত্র—সৃষ্টি-করণোন্মুখী ঐশী শক্তি স্বরূপিণী প্রকৃতিরই স্ফুরণ মাত্র। তৎসমূহ জীবের অনাদি ভোগ শক্তি ও তদীয় উত্তর সাধকরূপ ভোগ পদার্থীয় শক্তির ধর্ম্ম বিশিষ্ট। জীবের ভোক্তৃত্ব-শক্তি ও বাহ্য সৃষ্টির ভোগদানের শক্তি—এ উভয় শক্তিই মূলে প্রকৃতিরূপিণী। সূক্ষ্ম তত্ত্বের প্রকটন কালে সেই প্রকৃতি অনাদি বীজানুসারে ভোক্ত মাত্রায় ও ভোগ্য মাত্রায় বিভক্ত হইয়া পড়েন। উহার মধ্যে এক-

ভাগ জীবরূপ প্রার্থীর ধর্ম্মকে রচনা করে, অন্যভাগ সেই প্রার্থনা পুরণার্থ ভোগ্য পদার্থকে বিন্যাস করিয়া থাকে। রসতন্মাত্র রূপ শক্তি জীবের রসনেন্দ্রিয়কে রচনা করে, পক্ষান্তরে তাহারই দ্বিতীয় মূর্ত্তি স্বরূপ জলীয় পরমাণু সেই রসনাকে চরিতার্থ করিবার জন্য জলরূপে পরিণত হয়। সমস্তই তন্মাত্র শক্তির কার্য্য। সমস্ত ইন্দ্রিয় গ্রাম এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ, তাহাদেরই রচনা। মন তাহাদের সমষ্টি সাত্ত্বিক শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া, কূর্ম্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধারণের ন্যায় ঐ সকল সূক্ষ্ম অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপী ইন্দ্রিয় শক্তি সমুহকে আপনার মধ্যেই ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যে সকল ইচ্ছা সূত্রে মন স্বীয় সূক্ষ্ম দেহকে পরিচালন করে, তাহা প্রকৃতিরই সূক্ষ্ম দেহ নির্ব্বাহক শক্তি মাত্র। এই সমস্ত ব্যাপার কেবল অনুমান সিদ্ধ। মন, ইন্দ্রিয় এবং ভোগ্য দ্রব্যের সূক্ষ্ম শক্তি—এ সকল কিছুই ইন্দ্রিয় গোচর নহে।

সম্প্রতি অনেকগুলি পাশ্চাত্য গ্রন্থে আর্য্য শাস্ত্রীয় ঐ সকল প্রাচীন সিদ্ধান্তের বিস্তর আভাস পাওয়া যাইতেছে। ইউরোপীয় ও মার্কিণ পণ্ডিতগণ ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত ভারতীয় শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন কি না, এ স্থলে আমরা সে বিচার করিব না। পক্ষান্তরে তদ্দ্বারা ভারতীয় শাস্ত্রের প্রাচীন সমীচীনতা বিন্দুমাত্র আহত বা পুষ্ট হইয়াছে, এমনও মনে করা উচিত নহে। প্রাগুক্ত শাস্ত্রীয় সূক্ষ্ম সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রলয় তত্ত্বের সহিত যে সকল পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তের ঐক্য বোধ হইতেছে, আমরা বক্ষ্যমান কতিপয় পংক্তিতে তাহা দেখাইয়া, স্থূল জগতের বিবরণে প্রবৃত্ত হইব।

আমরা ইতি পূর্ব্বে জানিতাম যে, জর্ম্মণ দেশে দর্শন-বিৎ কাণ্টের সময় হইতে ক্রমেই নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে 'ব্রহ্মসত্য, জগৎ মিথ্যা' এই ভারতীয় তত্ত্বটি প্রচার হইয়া পড়িতেছে। নবেনিস্ বলেন যে, জর্ম্মণীয় সমস্ত তত্ত্ব-বাদীগণের মধ্যে ঐ মত সংক্রমিত হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই এই মূল তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন যে, ভৌতিক পদার্থ ধ্রুব সত্য নহে। বিসপ বর্কলি সম্ভবত স্বীয় ধর্ম্ম মতের মধ্যে উহা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ফাদার বস্কোবিক্ গণিততত্ত্বের মধ্যেও ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। নবেনিস্ লেখেন যে ভূমণ্ডলের সীমান্ত ভাগে ভারতবর্ষে তথাকার ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত সমাজে অতি প্রাচীন কাল হইতে ঐ প্রকারের মত প্রচলিত আছে। অধ্যাপক ষ্টুয়ার্টও কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি স্বীয় জীবন কালের মধ্যে কোন সময়ে "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" এই মতটি গ্রহণ করিতে না পারিয়াছে, সে দর্শন

শাস্ত্রে কোন ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। নবেনিস কহেন, যে যাঁহারা ‘ব্রহ্মসত্য-জগৎ মিথ্যা’ বলেন তাঁহাদের মতে বাহ্য জগৎ না আছে, এমন নহে, কিন্তু তাহা স্বয়ংসিদ্ধ নহে। তাহা কেবল ব্রহ্ম শক্তির আবির্ভাব মাত্র। এই মতটি বৈদান্তিক মতের সহিত সম্পূর্ণ এক। কিন্তু বেদান্তের মূল তাৎপর্য্য এই যে এই সৃষ্টি প্রবাহরূপে নিত্য। প্রবাহের মধ্যগত অসংখ্য জীবের প্রাচীন কর্ম্ম নিমিত্ত অদৃষ্ট, মায়া বা অজ্ঞান ব্রহ্মশক্তির অন্তর্গত। সেই কর্ম্ম জন্য অজ্ঞান, অদৃষ্ট, বা মায়া বাসনা বীজরূপী। তাহারই মধ্যে ভোগ-কর্ত্তৃত্ব ও ভোগ্য পদার্থের অন্তর্ভাব। সৃষ্টিকালে তাহা হইতে ভোগকারী মন ও ভোগ্য ভৌতিক-পদার্থ আবির্ভূত হয়। মনই ইন্দ্রিয়গণের গর্ভক্ষেত্র। তাহা তখন অনাদি বন্ধন সূত্রে জীবাত্মাকে আশ্রয় করে। জীবাত্মা তাহাতে অধ্যস্ত হন। আর ভোগ্যরূপ সৃষ্টি সেই ইন্দ্রিয় মনো বিশিষ্ট জীবের সন্নিধানে স্বীয় মহিমা ও প্রলোভন সৌন্দর্য্য ও ভোগ শক্তি প্রকাশ করে। অতএব মন ও ভৌতিক পদার্থ—উভয়ই সেই অজ্ঞান ও মায়ারূপিণী ব্রহ্ম শক্তির আবির্ভাব মাত্র। তাহারা সত্য নহে। কেন না, তাহারা ব্রহ্ম জ্ঞানের উদয় মাত্র রজ্জুতে আবির্ভূত ভ্রম-সর্পের ন্যায় তিরোহিত হইয়া যায়। এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় সমস্তজ্ঞানী ঋষিগণ প্রকাশ করিয়াছেন। বেদার্থ প্রতিপাদক পুরাণ শাস্ত্রে (অর্থাৎ বেদান্ত ও সাংখ্যের মিলন ক্ষেত্রে) উহা শোভা পাইতেছে।

সম্প্রতিকার কয়েক খানি পাশ্চাত্য গ্রন্থেও ঐরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হইতেছে। অধ্যাপক টিণ্ডল বলেন যে, ভৌতিক পদার্থ মাত্রই শক্তির বিকার শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে পদার্থ কিছুই নহে। টিণ্ডল হয়ত ঐ শক্তিটিকে সাংখ্যের “প্রধানের” ন্যায় অন্ধ শক্তি কহেন। কিন্তু ব্রহ্ম বাদীরা উহাকে ঈশ্বরের শক্তি কহিয়া থাকেন। আণ্ড্রু জ্যাকসন ডেবীস কহেন যে ভৌতিক পদার্থ সমূহ অতি সূক্ষ্ম আকাশবৎ চিরস্থায়ী ভৌতিক তত্ত্বের বিকার মাত্র। বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রতিপন্ন করিতেছে, যে, ভৌতিক জগৎ কেবল সূক্ষ্ম তত্ত্বের স্থূল পরিণাম। উহা প্রকৃত প্রস্তাবে অন্য কিছুই নহে। কিন্তু এক পরিপূর্ণ, অনন্ত শক্তিমান পুরুষের মূর্ত্তি মাত্র। তুমি যাহা দেখ বা স্পর্শ কর, তাহা কেবল ছায়ামাত্র, বাহ্য আকৃতি মাত্র। তোমার ইন্দ্রিয়গণের নিকটে তাহা সত্য বটে, কিন্তু সে সত্য কি? উত্তর, সে সত্য আবির্ভাব মাত্র। ডেবিস আরো কহেন যে, এই ক্ষণে এই পৃথিবী ও গ্রহ

তারাগণ যেরূপ কঠিন পৃষ্ঠ ইন্দ্রিয় গোচর স্থূল পদার্থ হইয়া আছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। বিজ্ঞান শাস্ত্রে প্রমাণ করিতেছে যে, অতি পূর্ব্বে এই সকল লোকমণ্ডল এ প্রকারে সুসূক্ষ্ম আকাশবৎ অবস্থায় ছিল, যে তাহাতে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণ সকল অভিব্যক্ত হয় নাই। তখন কোন আকৃতি বা দেহ প্রকাশ পায় নাই। সে সমস্ত সেই সূক্ষ্ম আকাশবৎ অবস্থা হইতে ক্রমে ঘনীভূত রূপে আবির্ভূত হইতেছে। এই ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মতম বিভাগে এক সুসূক্ষ্মা অন্তরতম প্রকৃতি বিরাজমান আছে। এই ভূলোক ও এই তারাগণ সেই শক্তিরই স্থূল আবির্ভাব। তাহাদের গতি—পরিক্রমও সেই শক্তির কার্য্য। মহাত্মা ডেবিস স্পাইনোজার এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যে একমাত্র ব্রহ্মই সদ্বস্তু। আর সমুদায় পদার্থ তাঁহারই আবির্ভাব। তিনি আরো লেখেন যে ডাক্তার জুল অগ্নিকে শক্তিরই আবির্ভাব মাত্র বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। সংক্ষেপত ডেবিস্ কহেন যে ভৌতিক পদার্থের ভৌতিকত্ব সম্পূর্ণরূপে উড়িয়া যাইতেছে। কেবলমাত্র ব্রহ্ম শক্তি অবশিষ্ট থাকিতেছে। এস্থলে আমাদের এইমাত্র ব্যক্তব্য যে এসকল পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত ভারতীয় শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের তুল্য। ডেবিসের উক্ত যে আকাশবৎ চিরস্থায়ী সূক্ষ্ম ভৌতিক-শক্তির উল্লেখ ইতি পূর্ব্বে করা গিয়াছে, তাহা আমাদের—'পঞ্চতন্মাত্র' এবং 'পরমাণু' স্থানীয়।

ডেবিস্ আরো লেখেন, যে মানবদেহ কেবল একটা আভ্যন্তরিক কারণের বিকার। আমাদের ভারতীয় শাস্ত্র অনুসারে মনই সেই কারণ। মনের দেহ প্রকটন-শক্তি প্রসিদ্ধই আছে। যেমন স্বপ্নে, সেইরূপ জন্মে জন্মে পারে। বাসনাই হেতু, ঘটনা সকল ভোগ্য মাত্র। ডেবিস্ কহেন এই জগতের দুই উপাদান। উভয়ই নিত্য। বস্তুত উভয়ে এক, কিন্তু নিত্য কাল ধরিয়া কার্য্য ও কারণ ক্ষেত্র সম্বন্ধে পৃথক্ভাবে দুই। উহার একটি মন, অন্যটি ভৌতিক পদার্থ। উভয়ে যোগবদ্ধ। উভয়ে মূলত এক ব্রহ্মশক্তি মাত্র। কেবল তাহাদের আবির্ভাব দ্বিবিধ। মনও একেবারে অভৌতিক নহে, এবং ভৌতিক পদার্থও মূলত স্থূল নহে। তাৎপর্য্য এই যে, উভয়ে এক মূল শক্তির আবির্ভাব। সেই মূল শক্তি অদৃশ্য। ডেবিসের এই কয়েকটি কথায় আর্য্য শাস্ত্রেরই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে। কেন না শাস্ত্রে কহেন যে, অনাদি কাম-কর্ম্ম বীজ স্বরূপিণী মায়া, যাহা ঈশ্বরের সৃষ্টি শক্তি, তাহা হইতে অনাদি অদৃষ্ট বীজ-সূত্রে জীবের নিমিত্তে মন

ইন্দ্রিয়াদি ভোগ-কর্তৃত্ব এবং সৃষ্টিরূপ ভোগ্য বস্তু উভয়ই আবির্ভূত হয়। এক মাত্র ঐশী শক্তিই ভোক্তৃমাত্রারূপ মন ও ভোগ্যমাত্রারূপ ভৌতিক পদার্থের আবির্ভাব বীজ। সৃষ্টিকালে মন ও ভোগ্য পৃথক্ পৃথক্। কিন্তু মহাপ্রলয়ে তদুভয়ই এক ঐশী শক্তি। যাঁহারা পাশ্চাত্য গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি একটু ধীর হইয়া ভারত সেবিত পবিত্র বুদ্ধি যোগ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ শাস্ত্রও পাঠ করেন, তাহা হইলে কিছু দিনের মধ্যে তাঁহাদের নিশ্চয় বোধ হইবে যে, পাশ্চাত্য দর্শন সকল খদ্যোৎ তুল্য, কিন্তু শাস্ত্র মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড সদৃশ। আমরা সূক্ষ্ম তত্ত্ব স্বরূপ পঞ্চতন্মাত্র ও ইন্দ্রিয় শক্তি যুক্ত মনের বিষয় বলিলাম। আগামিতে ঐ পঞ্চ-তন্মাত্র নামক সূক্ষ্ম ভৌতিক পরমাণুগণ পঞ্চীকৃত বা সমবেত হইয়া কিরূপে একদিকে জীব দেহ এবং অন্যদিকে ব্যবহারিক স্থূল জগৎ উৎপন্ন করে এবং সে সম্বন্ধে ভারতের মতের সহিত পাশ্চাত্য মতের ঐক্য আছে কিনা, তাহা বলিব।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু,
খড়্গপুর।

ভারত ভ্রমণ

জব্বলপুর হইতে ছয়টি ষ্টেসন্ পরে "নরসিংপুর।" এই স্থানের একটু ঐতিহাসিক বিবরণ বলিব। গত ১৮০০ বৎসরের মধ্যে এই স্থানটি চারিটি বিভিন্ন জাতীয় রাজার অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল। প্রথমে ইহা খন্দ জাতীয় রাজার অধিকারে ছিল, পরে সগর প্রদেশীয় মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, তৎপরে নাগপুরের ভন্‌স্লা রাজা ইহা অধিকার করেন। এক্ষণে অবশ্যই ব্রিটিশ অধিকারে। ১৮১৭ সালে হার্ডিমান সাহেব নাগপুরের রাজার নিকট হইতে নরসিংপুরের দুর্গ ও নগর অধিকার করিয়াছিলেন। প্রাচীন দুর্গের কিছু কিছু চিহ্ন এখন আছে। কর্ণেল শ্লিম্যান সাহেব এইখানে বসিয়া ঠগী দমন কার্য্য আরম্ভ করেন। ঠগী দমন সম্বন্ধে একটি বড়

কৌতুকাবহ গল্প আছে। শ্লিম্যান এইখানে আসিয়া বসিলেন, নানা দিক্ দেশান্তরে ঠগীর সন্ধানে চর পাঠাইলেন, নিজে দিবারাত্র ঠগীর সন্ধানে বিব্রত, কিন্তু ঠগীর সন্ধান ত পাওয়া যায় না; মাস গেল, বর্ষ গেল, ঠগীদলের কেশাগ্রও কেহ দেখিতে পায় না, অথচ "মান্দেশ্বরের" বনে হত্যাকাণ্ডের বিশ্রাম নাই। মান্দেশ্বরের মত ভয়ঙ্কর স্থান তখন ভারতবর্ষে আর কোথাও ছিল না। মান্দেশ্বরের নাম শুনিলে দেশ দেশান্তরের লোকের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত, সে নাম শুনিয়া শ্লিম্যান সাহেবের হৃদয়ও প্রতিদিন কাঁপিয়া উঠিতেছে, তথাপি ঠগী দলের কিছুমাত্র সন্ধান হইতেছেনা। এমন কি ৭।৮ বৎসর ধরিয়া নিরন্তর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়াও শ্লিম্যান ঠগীর কোন উদ্দেশ করিতে পারিতেছেন না। অবশেষে সন্ধান হইল, শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন, শ্লিম্যান সাহেবের বাসস্থানের চারি শত গজ মাত্র দূরে বসিয়া নির্বিঘ্নে এতকাল ধরিয়া হত্যাকাণ্ড করিতেছে। এই বার ধরা পড়িল; ঠগীর অদ্ভুত কৌশলও ধন্য এবং শ্লিম্যানের অধ্যবসায়ও ধন্য।

ইহার কয়েকটি এষ্টেশন পরে "বাগ্‌ড়া" নামক এষ্টেসনে পৌছিবার দেড় মাইল পূর্ব্বে বড় টোয়া নদীর উপর "অ্যাল্‌ফ্রেড্ ব্রিজ" নামক একটী পুল আছে; ইহা দেখিবার যোগ্য। পুলটি লম্বায় ১১৪৭ ফিট্। বাগড়ায় বনরাজি সুশোভিত সুন্দর স্বাভাবিক দৃশ্য বিস্তর। অ্যালফ্রেড্ পুলের উপর হইতে, দেড় মাইল দূরে বড় টোয়া নদীর বাম তীরে পূর্ব্ব দোয়ারি একটি প্রাচীন দুর্গ দৃষ্টিগোচর হয়। উহা ভীষণ ঠগী দলের একটি প্রধান দুর্গ ছিল। এই দুর্গ হইতে একটি সুড়ঙ্গ পথ নদীর তল দেশের নিম্ন দিয়া অপর তীরে এক পর্ব্বতের সহিত মিশিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস আছে, যে ইংলণ্ডে টেমস্ নদীর নিম্ন দিয়া যেরূপ টনেল আছে, ভারতবর্ষে সেরূপ টনেল নাই; বড় টোয়া নদীর টনেল দেখিলে তাঁহাদের সে বিশ্বাস অন্তর্হিত হইবে। অবশ্য ইহা টেমসের টনেল অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। ঠগীদল যখন দুর্গ রক্ষণে অসমর্থ হইত, তখন এই সুড়ঙ্গ দিয়া নদীর অন্য তীরে পর্ব্বতের নিভৃত স্থানে উঠিয়া পলায়ন করিত, কেহ সন্ধান পাইত না, এই সুড়ঙ্গ ও দুর্গ একবার দেখা উচিত।

বাগ্‌ড়ার এক এষ্টেসন পরে 'ইটসারি।' ইহার কিয়দ্দূরে "হোসেঙ্গাবাদ;" এইখানে নর্ম্মদা নদী ইংরাজ রাজত্ব ও ভুপাল রাজত্বকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইটসারি হইতে ভুপাল রাজধানি ৫৭

মাইল। এই এষ্টেসন হইতে ভুপাল এষ্টেট রেলওয়ে শীঘ্র খোলা হইবে, পথ প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে।

ইহার গুটি ৫ এষ্টেসন পরে "হার্দা।" "হার্দার" পর ৮টি এষ্টেসন ছাড়াইয়া "খান্দোয়া" এষ্টেসন। এ এষ্টেসনে ধর্ম্মশালা আছে, হিন্দুরা অনায়াসে এই এষ্টেসনে থাকিতে পারেন। তবে শয্যাদি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয়। এই খান্দোয়া এষ্টেসনে জি, আই, পি লাইন এবং রাজপুতানা ও মালোয়া লাইন মিলিত হইয়াছে। ইন্দোর, চিতোর, উজ্জয়িনী প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দু নগরীর শ্মশান দৃশ্য দেখিয়া যিনি অশ্রু বর্ষণ করিতে চাহেন, তাঁহাকে এই খান্দোয়ার জি, আই, পি লাইন ত্যাগ করিয়া, রাজপুতানা ও মালোয়া লাইন দিয়া যাইতে হইবে। এ লাইন বরাবর আজীমর পর্য্যন্ত গিয়াছে। প্রতি বৎসর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে খান্দোয়ার ভিতরেই একস্থানে "তুলাজি ভবানী" নামক এক প্রসিদ্ধ মেলা হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ ওঁকারমান্ধাতা শিব মন্দির এই স্থান হইতে ৪০ মাইল দূরে। ওঁকারমান্ধাতা দেখিতে যাইতে হইলে, হোলকার এষ্টেট রেলে "সানোয়াদ" এষ্টেসনে নামিতে হয়। নর্ম্মদা নদীর মধ্যস্থলে এক মাইল বিস্তৃত এক দ্বীপের উপর ওঁকারমান্ধাতার মন্দির। দ্বীপের দুই পার্শ্বে পর্ব্বত অঙ্গে ওঁকারমান্ধাতার ও অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির সকল স্তরে স্তরে উঠিয়াছে, তাহার শোভা বড়ই সুন্দর। মন্দিরের কারুকার্য্যও দর্শন যোগ্য। এ অঞ্চলে ওঁকারমান্ধাতাকে অতি জাগ্রত দেবতা বলিয়া লোকের বিশ্বাস। প্রাচীন কালে অমরতা লাভ করিবার জন্য পর্ব্বতোপরিস্থ মন্দির হইতে নিম্নে নর্ম্মদা গর্ভে পতিত হইয়া যোগীরা আত্মবিনাশ করিত। *

---

* সার রিচার্ড টেম্পল এই স্থান দেখিয়া কি বলিয়াছেন, তাহা আমি উদ্ধৃত করিলাম।

* "Emerging from these horrid wilds the Narbudda again becomes beautiful, crashing in grand turmoil over dark trap-rock, then flowing quietly down the shadow of the wall-like ridges, and then surrounding the sacred Island in "Oonkar Mandhata," the heights of which are covered with temples and priestly buildings. Here egain the river forms itself into deep pools of still water, in which are imaged all the forms of the rocks and structures. Here also at stated times are held religious gatherings which greatly add to the beauty of the place. In former days devotees used to precipitate themselves from the rocky peaks to earn immortality by perishing in the Narbudda."

"খান্দোয়া" ও "বারহাম" নামক এষ্টেশনের মধ্যে এক স্থানে বসিয়া বিখ্যাত "আশীর গড়" নামক দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্গ দেখিতে যাইতে হইলে, "চাঁদ্নি" এষ্টেশনে নামিতে হয়। চাঁদ্নি হইতে আশীর গড় প্রায় ছয় মাইল পথ হইবে। আশীর গড় দুর্গে এক্ষণে কেবল মাত্র "রাজদ্রোহীরা" কারারুদ্ধ থাকে। প্রবাদ আছে যে এই দুর্গ ১৩৭০ সালে জনৈক পরাক্রান্ত পশুপালক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার নাম "আশা আহির," এবং তাহার নামেই এই দুর্গের নামকরণ হইয়াছিল। ১৪০০ খৃঃ অব্দে খান্দেশ প্রদেশীয় টরুকী রাজবংশের দ্বারায় এই দুর্গ অধিকৃত হইয়াছিল, এবং ১৬০০ খৃঃ অব্দে আক্‌বর বাদ্‌সা তাঁহাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়েন। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে এই দুর্গ বাজিরাও পেশোয়ার হস্তে আইসে, এবং ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে ইহা সিন্ধিয়ার অধিকারভুক্ত হয়। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে জেনারল ওয়েলেস্‌লি ইহা অধিকার করেন, এবং সিন্ধিয়ার সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন হইলে তাঁহাকে ইহা প্রত্যর্পিত হয়। কিন্তু পরিশেষে নাগপুরের রাজ্যচ্যুত রাজা আপা সাহেবকে আশ্রয় দেওয়া অপরাধে, ১৮১৯ সালে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই দুর্গ প্রতিগ্রহণ করেন। এইখানে দেশীয় একটি প্রকাণ্ড কামান ছিল, এক্ষণে সে কামান ইংলণ্ডের উলউইচ্‌ নগরের যুদ্ধাস্ত্রের সংগ্রহ শালায় রাখা হইয়াছে। আশীর গড় একটি পাহাড়ের উপর, প্রায় একশত একাশি বিঘা স্থান বিস্তৃত, চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত; তরুশ্রেণী মধ্যস্থিত দুইটি সরল পথ ব্যতীত প্রবেশের অন্য পথ নাই। আশীর গড় যে পর্ব্বতের উপর তাহার নিম্নে গ্রাম আছে, তাহার সন্নিকটে দ্রাক্ষাফল বিস্তর জন্মে এবং সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এই গ্রামে ডাক বাঙ্গালা আছে তথায় অবস্থিতি করিবার সুবিধা আছে, চাদ্‌নি এষ্টেশনে সরাই আছে, তথায় হিন্দুরা সচ্ছন্দে থাকিতে পারেন।

"চাঁদ্‌নির" এক এষ্টেশন পরেই "বারহানপুর।" সহর এষ্টেশন হইতে ৩ মাইল। খান্দেশ প্রদেশীয় প্রথম স্বাধীন রাজা "নাসির খাঁ" ১৪০০ খৃঃ অব্দে এই নগর স্থাপন করেন। নাসির খাঁ, টুরুকী বংশসম্ভূত। দুই শত বৎসর পরে আক্‌বর বাদ্‌সা ইহা অধিকার করেন। ১৭২০ খৃঃ অব্দে "আসাফ্‌ নিজ্‌জাম্‌ উলমুলুক" এই অঞ্চল জয় করিয়া এই স্থানে তাঁহার প্রধান বাস স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন, এবং এইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে ইহা পেশোয়ার অধিকারভুক্ত হয় এবং ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে তৎকর্ত্তৃক

সিন্ধিয়াকে প্রদত্ত হইয়াছিল। ১৮০৩ খৃঃঅব্দে জেনারল্ ওয়েলেস্‌লি ইহা অধিকার করেন এবং "সুইজি আঞ্জিমগান" নামক সন্ধি সূত্রে এই নগর সিন্ধিয়াকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছিল। পুনরায় ১৮৬০ খৃঃঅব্দে সিন্ধিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ইহা প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। ১৬১৪ খৃঃঅব্দে ইংলণ্ডের অধিপতি প্রথম জেম্‌সের নিকট হইতে সর্ টমাস্ রো নামক যে রাজদূত মোগল সম্রাটের নিকট আগমন করিয়াছিলেন, তিনি প্রথমে জাহাঙ্গীর বাদসাহের পুত্র পুরীয়রের সঙ্গে এইখানে সাক্ষাত করেন। পরবেজ পুরীয়র তখন এই অঞ্চলের রাজ প্রতিনিধি হইয়া এই বারহানপুরে থাকিতেন। বারহানপুরের জলের কলের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। ইহা নির্ম্মাণে বিস্তর বুদ্ধি ও কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। বারহানপুরে দুইটি সুন্দর মস্‌জিদ্ আছে, উহাদের চূড়া রেল হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই নগর প্রায় দেড় মাইল স্কোয়ার এবং ইহাতে প্রায় ৩৪০০০ হাজার লোক বাস করে। পাদ্‌সা কিল্লার মধ্যে মোগল রমণীদিগের একটি স্নানাগার এখনও রক্ষিত হইয়াছে। উহা দেখিবার উপযুক্ত। স্নানাগারটি তাপ্তি নদীর উপরেই, সেই জন্য উহা বড় মনোরম্য স্থান। বারহানপুরে কিংখাব ও রেশমি কাপড় অতি উত্তম প্রস্তুত হয়। রেলওয়ে ষ্টেসনের অতি অল্প দূরেই লালবাগ নামে প্রমোদোদ্যান আছে। জানুয়ারি, এপ্রেল, আগষ্ট ও অক্টোবর মাসে এখানে প্রতি বৎসর প্রসিদ্ধ মেলা হইয়া থাকে। বারহানপুরে হিন্দুর থাকিবার জন্য ধর্ম্মশালা আছে।

"বারহানপুর" হইতে ৫টি এষ্টেশন অতিক্রম করিয়া "ভসোয়াল" এষ্টেশন। জি, আই, পি, লাইন এবং নাগপুর লাইন এই এষ্টেশনে মিশিয়াছে। এই এষ্টেশন হইতে নাগপুর যাইতে হয়। এই স্থানে গবর্ণমেণ্টের ও রেলের প্রধান প্রধান আফিস এবং তৎসংক্রান্ত বিস্তর ইংরাজ ও ভদ্রলোক বাস করেন। ভসোয়ালের কিয়দ্দূর পরেই রেলের একটি প্রকাণ্ড পুল আছে, উহা দীর্ঘে প্রায় ২৫৫৬ ফিট্, খিলান ২৮টি, পুল্‌টি দেখিবার যোগ্য। জি, আই, পি লাইনে এত বড় পুল বোধ হয় আর নাই।

ইহার কিয়দ্দূর পরেই "জল্‌গেওন" এষ্টেশন, এস্থানটি এ অঞ্চলের মধ্যে একটি প্রধান ব্যবসার স্থান, খান্দেশ প্রদেশীয় যা কিছু উৎপন্ন হয়, এইস্থানে বিক্রয়ার্থ আইসে। এষ্টেশন হইতে দুই মাইল অন্তরে "হংস বক কারণ্ডবাদি জলপক্ষিভিরলঙ্কৃত" মারুণ নামক একটি সুন্দর হ্রদ আছে, উহা দেখিবার

উপযুক্ত স্থান। নির্ম্মল সলিলা গীর্ণা নদী এই স্থানের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া কল কল রবে প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানে কয়েকখানি তুলার বিখ্যাত কারখানা আছে। এনগরের একটু বিশেষ নূতনত্ব এই যে, এখানে ওজন দরে কাপড় বিক্রীত হইয়া থাকে। জলগেওনে ধর্ম্মশালা আছে।

ইহার এক এষ্টেশন পরেই মাসোয়াদ। মাসোয়াদ হইতে ৪০ মাইল দূরে "ধরমগেওন" গ্রাম অতিক্রম করিয়া "অনবেদকো" নামক একটি উৎস দেখিতে পাওয়া যায়। একটি প্রাচীন দেবমন্দিরের পাদদেশ হইতে সীতাকুণ্ডের ন্যায় উষ্ণজল এই উৎস হইতে অবিশ্রান্ত উত্থিত হইতেছে, ইহাও একটি আশ্চর্য্য দৃশ্য।

মাসোয়াদ অতিক্রম করিয়া এক এষ্টেশস পরে পাঁকোড়া নামক এষ্টেসন। প্রসিদ্ধ "অজান্তা" গিরিগহ্বর দেখিতে যাইতে হইলে, এই এষ্টেশন হইতে যাইতে হয়। এষ্টেশন হইতে অজান্তা গিরিগহ্বর ৩৪ মাইল। অজান্তা গহ্বরের নিকটস্থ স্থানের নাম "ফর্দ্দাপুর"। পাঁকোড়া হইতে প্রত্যূষে বহির্গত হইলে ফর্দ্দাপুরে সায়ংকালে উপস্থিত হওয়া যায়। পাঁকোড়ার মাম্‌লুতদারদের সহিত পূর্ব্বে বন্দোবস্ত করিলে গোরুর গাড়ী ও অন্য কোন যানের অসুবিধা থাকে না। ফর্দ্দাপুরে ডাক্‌বাঙ্গালা আছে, কিন্তু এ ডাকবাঙ্গালায় আহারীয় দ্রব্য, কি শয্যা, কি ভৃত্য নাই; এসকল সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে ডাক্‌বাঙ্গালায় থাকিবার অসুবিধা হয় না। অজান্তা-গহ্বর দেখাইবার জন্য ও তাহার প্রাচীন বিবরণ শুনাইবার জন্য পথ প্রদর্শক ফর্দ্দাপুরে সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। অজান্তা গহ্বরের দেয়ালে অতি আশ্চর্য্য চিত্রকার্য্য আছে। সাহেবেরা বহুযত্নে ও অর্থব্যয়ে এই সকল চিত্রের প্রতিচিত্র তুলাইয়া বিলাতে লইয়া গিয়া ক্রিষ্ট্যাল প্যালেসের একস্থানে রাখাইয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে উহার একখানি প্রতিচিত্র সাউথ কেনসিণ্টন নামক স্থানে ভারতচিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে, অজান্তা গহ্বর বৌদ্ধদিগের কীর্ত্তি। গহ্বর সর্ব্বশুদ্ধ ২৯টি। এই সকল গহ্বর নির্ম্মাণে শিল্প ও কৌশল এত প্রদর্শিত হইয়াছে যে কেহ কেহ বলেন যে ভারতবর্ষে অন্যকোন গিরিগুহায় এরূপ চিত্র নাই। চিত্রকার্য্য কেবল মাত্র ১,২,৩,৯,১০,১১,১৬,১৭,১৯ এবং ২০ নম্বর গহ্বরে আছে। ভারতে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম রাজধর্ম্ম ছিল, তখনকার ভারতবাসীর সামাজিক জীবন ও ধর্ম্মগত জীবনের আদর্শ প্রতিকৃতি এই সকল গহ্বর অঙ্গে খোদিত আছে।

পাঁকোড়া হইতে ৪টি এষ্টেশন পরে "চল্লিশগেওন"। এই এষ্টেশন হইতে প্রায় ৫৮ মাইল দূরে প্রাচীন সুলতানপুর নগরীর ভগ্নাবশেষ আছে, উহা দেখিবার উপযুক্ত। তাহার কিঞ্চিৎ দূরে একটি কোয়া আছে, সেটির নির্ম্মাণ কৌশল অতি সুন্দর। চল্লিশগেওন হইতে প্রায় ৪৮ মাইল যাইয়া "পিম্‌পালনার" নামক স্থানে স্বাভাবিক দৃশ্য বড় সুন্দর। পিম্‌পালনার গ্রামে "বাল্‌সানী" দেবমন্দির একটি উৎকৃষ্ট দৃশ্য। তদ্ভিন্ন কয়েকটি গিরিগুহা আছে, তন্মধ্যে "ভামার গুহা" সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ভামারগুহা চল্লিশগেওন এষ্টেসন হইতে প্রায় ৬৯ মাইল।

চল্লিশগেওন হইতে গুটিতিন এষ্টেশন পরে নন্দগেওন। বোম্বাই যাইবার সময় সুপ্রসিদ্ধ "ইলোরাগুহা" দর্শন করিয়া যাওয়া সকলেরি উচিত, এবং সেই ইলোরা গুহা দেখিতে যাইতে হইলে এই নন্দগেওন এষ্টেশনে নামিতে হয়। ইলোরা দেখিতে যাইবার অন্য পথও অছে, মাদ্রাজ লাইনে "ধোন্দ অথবা "অমদ নগর" এষ্টেশনে নামিয়াও ইলোরা দেখিতে যাওয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে বোম্বাই যাইবেন, তাঁহাদের পক্ষে নন্দগেওনে নামিয়া ইলোরা দেখাই যুক্তি সিদ্ধ। ইলোরা গুহা বর্ষাবসানেই দেখিতে যাওয়া উচিত। এই সময় পর্ব্বতমালা শ্যামলবর্ণে রঞ্জিত হয়, চতুর্দ্দিক হইতে পূর্ণতোয়া নির্ঝরের ঝরঝর শব্দে দিগন্ত পরিপূরিত হইয়া উঠে, বর্ষাবসানে এইস্থানের দৃশ্য বড়ই মনোরম। নন্দগেওনের প্রায় ৫৬ মাইল দূরে আরাঙ্গাবাদ, নন্দগেওন হইতে আরাঙ্গাবাদ যাইবার সুন্দর পথ আছে, এবং ডাকের টাঙ্গা প্রতিদিন রাত্রি ৩টার সময় নন্দগেওন হইতে ছাড়িয়া ৯ঘণ্টায় আরাঙ্গাবাদ পৌছায়। এই আরাঙ্গাবাদের রাস্তা হইতে একটি শাখা পথ বাহির হইয়া ইলোরা গুহায় গিয়াছে। নন্দগেওন হইতে ইলোরা প্রায় ৪৪ মাইল পথ। যাঁহারা আরাঙ্গাবাদের ডাক টাঙ্গার উঠিয়া ইলোরা দেখিতে যাইবেন, তাঁহাদের পথে একস্থানে নামিয়া অন্য শকটাদির বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয়, কারণ আরাঙ্গবাদের ডাকটাঙ্গা ইলোরার পথে যায় না। ইলোরা দেখিতে যাইতে হইলে নন্দগেওন ষ্টেশনে নামিয়া ডাক কণ্ট্রাক্টরদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিলে, বরাবর ইলোরা পর্য্যন্ত যাইবার টাঙ্গা পাওয়া যায়। নন্দগেওনে ধর্ম্মশালা আছে। ইলোরাকে ও অঞ্চলের লোকেরা "ভেরুল" কহে। "ভেরুল" বলিয়া একটি স্থান ইলোরার নিকটেই আছে। ভেরুল হইতে ইলোরার

গুহা এক মাইল দূরে এবং ইলোরা হইতে আর এক মাইল যাইলে "রোজা" নামক এক দর্শনোপযোগী স্থানে যাওয়া যায়। এই রোজা নামক স্থানে আরঙ্গজীব, আলমগীর, ও অন্যান্য বিখ্যাত মুসলমানদিগের অতি সুন্দর সুন্দর কবর আছে। রোজার গোরস্থান সংশ্লিষ্ট একটি অট্টালিকা লইয়া আরাঙ্গাবাদের সাহেবেরা দর্শকদিগের বাসস্থানের উপযোগী করিয়া রাখিয়াছেন। এই অট্টালিকায় থাকিতে হইলে এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আরাঙ্গা-বাদের "মেল সেক্রেটারির" নিকট আবেদন করিতে হয়।

যাঁহারা সাধনার স্থান দেখিবার প্রয়াসী তাঁহারা একবার ইলোরা দর্শন করিয়া আসুন। এই স্থানে দেড় মাইল ধরিয়া পরে পরে প্রায় ৪০টি গুহা আছে। ফাগুর্সন সাহেব তাঁহার 'ভারতবর্ষের পর্ব্বত খোদিত মন্দির' নামক গ্রন্থে, বলিয়াছেন যে, ইলোরা গুহা সকল দেখিতে হইলে প্রথমে দক্ষিণ প্রান্ত "ধারওয়ারা" হইতে আরম্ভ করা উচিত, কারণ এই দিকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গুহা গুলি আছে। এই অংশে যে কয়টি গুহা আছে তন্মধ্যে "বিশ্বকর্ম্মা" গহ্বরটি আধুনিক। এ গহ্বরগুলি বৌদ্ধদিগের কীর্ত্তি বলিয়া সকলেই অনুমান করেন। ইহার পরের গুহাগুলি ব্রাহ্মণদিগের কীর্ত্তি। এই ব্রাহ্মণদিগের গুহার মধ্যে "কৈলাস" বা "রংমহল" এবং "ধামারলীনা" নামক গহ্বরগুলি অতি আশ্চর্য্য। তাহার পরেই জৈনদিগের কীর্ত্তি। জৈন গহ্বরগুলির মধ্যে, "জগন্নাথ দেব" ও "ইন্দ্রসভা" প্রভৃতির চিত্র খোদিত আছে। এই অংশ উত্তর প্রান্ত। অতএব ইলোরা গিরিগুহাগুলি তিনটি প্রধান প্রধান ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা স্থান। এ স্থানকে ত্রিনীতি ক্ষেত্র বলিতে পার।

ভক্তি।

দ্বিতীয় কথা।

ঈশ্বরে ভক্তি। উপক্রমণিকা।

শিষ্য আজ, ঈশ্বরে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু উপদেশের প্রার্থনা করি।

যাহা কিছু তুমি আমার নিকট শুনিয়াছ, আর যাহা কিছু শুনিবে, তাহাই ঈশ্বর ভক্তি সম্বন্ধীয় উপদেশ; কেবল বলিবার এবং বুঝি-

বার গোল আছে। "ভক্তি" কথাটা হিন্দু ধর্ম্মে বড় গুরুতর অর্থ বাচক, এবং হিন্দু ধর্ম্মে ইহা বড় প্রসিদ্ধ। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মবেত্তারা ইহা নানা প্রকারে বুঝাইয়াছেন। এবং খৃষ্টাদি আর্য্যেতর ধর্ম্মবেত্তারাও ভক্তিবাদী। সকলের উক্তির সংশ্লেষ এবং অত্যুন্নত ভক্তদিগের চরিত্রের বিশ্লেষ দ্বারা, আমি ভক্তির যে স্বরূপ স্থির করিয়াছি, তাহা আমি এক কথায় বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, এবং যত্ন পূর্ব্বক স্মরণ রাখিও। নহিলে আমার সকল পরিশ্রম বিফল হইবে।

শিষ্য। আজ্ঞা করুন।

গুরু। যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।

শিষ্য। বুঝিলাম না।

গুরু। অর্থাৎ যখন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরানুসন্ধান করে, কার্য্য কারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যই উপভোগ করে, এবং শারীরিকী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের কার্য্য সাধনে বা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই ভক্তি বলি। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম্ম ঈশ্বরে, আনন্দ ঈশ্বরে, এবং শরীরার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে। অথবা—ঈশ্বর সম্বন্ধিনী ভক্তির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইয়াছে।

শিষ্য। এ কথার প্রতি আমার প্রথম আপত্তি এই যে, আপনি এ পর্য্যন্ত ভক্তি অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে একটি বৃত্তি বলিয়া বুঝাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এখন সকল বৃত্তির সমষ্টিকে ভক্তি বলিতেছেন।

গুরু। তাহা নহে। ভক্তি একই বৃত্তি। আমার কথার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সকল বৃত্তিগুলিই এই এক ভক্তি বৃত্তির অনুগামী হইবে, তখনই ভক্তির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি হইল। এই কথার দ্বারা, বৃত্তি মধ্যে ভক্তির যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়াছিলাম, তাহাই সমর্থিত হইল। ভক্তি ঈশ্বরার্পিতা হইলে, আর সকল বৃত্তিগুলি উহার অধীন হইবে, উহার প্রদর্শিত পথে যাইবে, ইহাই আমার কথার স্থূল তাৎপর্য্য। এমন তাৎপর্য্য নহে, যে সকল বৃত্তির সমষ্টি ভক্তি।

শিষ্য। কিন্তু তাহা হইলে সামঞ্জস্য কোথা গেল? আপনি বলিয়াছেন যে সকল বৃত্তিগুলির সমুচিত স্ফূর্ত্তিই মনুষ্যত্ব। সেই সমুচিত স্ফূর্ত্তির

এই অর্থ করিয়াছেন, যে কোন বৃত্তির সমধিক স্ফূর্ত্তির দ্বারা অন্য বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্ত্তির অবরোধ না হয়। কিন্তু সকল বৃত্তিই যদি এই এক ভক্তি বৃত্তির অধীন হইল, ভক্তিই যদি অন্য বৃত্তিগুলিকে শাসিত করিতে লাগিল, তবে পরস্পরের সামঞ্জস্য কোথায় রহিল ?

গুরু। ভক্তির অনুবর্ত্তিতা কোন বৃত্তিরই চরম স্ফূর্ত্তির বিঘ্ন করে না। মনুষ্যের বৃত্তি মাত্রেরই যে কিছু উদ্দেশ্য হইতে পারে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরই মহৎ। যে বৃত্তির যত সম্প্রসারণ হউক না কেন, ঈশ্বরানুবর্ত্তী হইলে সে সম্প্রসারণ বাড়িবে বৈ কমিবে না। ঈশ্বর যে বৃত্তির উদ্দেশ্য, —অনন্ত মঙ্গল, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ধর্ম্ম, অনন্তসৌন্দর্য্য, অনন্তশক্তি, অনন্তই যে বৃত্তির উদ্দেশ্য,—তাহার আবার অবরোধ কোথায় ? ভক্তি শাসিতাবস্থাই সকল বৃত্তির যথার্থ সামঞ্জস্য।

শিষ্য। তবে আপনি যে মনুষ্যত্ব-তত্ত্ব এবং অনুশীলন-ধর্ম্ম আমাকে শিখাইতেছেন, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য কি এই, যে ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব, এবং অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্যই—সেই ঈশ্বরে ভক্তি ?

গুরু। অনুশীলন-ধর্ম্মের মর্ম্মে এই কথা আছে বটে, যে সকল বৃত্তির ঈশ্বরে সমর্পণ ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণার্পণ, ইহাই প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম্ম। ইহাই স্থায়ী সুখ। ইহারই নামান্তর চিত্তশুদ্ধি। ইহারই লক্ষণ "ভক্তি, প্রীতি, শান্তি।" ইহাই ধর্ম্ম। ইহা ভিন্ন ধর্ম্মান্তর নাই। আমি ইহাই শিখাইতেছি। কিন্তু তুমি এমন মনে করিও না, যে এই কথা বুঝিলেই তুমি অনুশীলন ধর্ম্ম বুঝিলে।

শিষ্য। আমি যে এখনও কিছু বুঝি নাই, তাহা আমি স্বয়ং স্বীকার করিতেছি। অনুশীলন ধর্ম্মে এই তত্ত্বের প্রকৃত স্থান কি, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই। আপনি বৃত্তি যে ভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহাতে শারীরিক বল, অর্থাৎ মাংসপেশীর বল একটা Faculty না হউক, একটা বৃত্তি বটে। অনুশীলন ধর্ম্মের বিধানানুসারে, ইহার সমুচিত অনুশীলন চাই। মনে করুন রোগ, দারিদ্র বা আলস্য বা তাদৃশ অন্য কোন কারণে কোন ব্যক্তির এই বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্ত্তি হয় নাই। তাহার কি ঈশ্বর ভক্তি ঘটিতে পারে না ?

গুরু। আমি বলিয়াছি যে, যে অবস্থায় মনুষ্যের সকল বৃত্তি গুলিই ঈশ্বরানুবর্ত্তী হয়, তাহাই ভক্তি। ঐ ব্যক্তির শারীরিক বল বেশী থাক, অল্প

থাক, যতটুকু আছে, তাহা যদি ঈশ্বরানুবর্ত্তী হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরানুমত কার্য্যে প্রযুক্ত হয়—আর অন্য বৃত্তিগুলিও সেইরূপ হয়, তবে তাহার ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে। তবে অনুশীলনের অভাবে, ঐ ভক্তির কার্য্য-কারিতার, সেই পরিমাণে ত্রুটি ঘটিবে। একজন দস্যু একজন ভাল মানুষকে পীড়িত করিতেছে। মনে কর, দুই ব্যক্তি তাহা দেখিল। মনে কর, দুই জনেই ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত, কিন্তু একজন বলবান, অপর দুর্ব্বল। যে বলবান, সে ভাল মানুষকে দস্যু হস্ত হইতে মুক্ত করিল, কিন্তু যে দুর্ব্বল, সে চেষ্টা করিয়াও, পারিল না। এই পরিমাণে, বৃত্তি বিশেষের অনুশীলনের অভাবে, দুর্ব্বল ব্যক্তির মনুষ্যত্বের অসম্পূর্ণতা বলা যাইতে পারে, কিন্তু ভক্তির ত্রুটি বলা যায় না। বৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফূর্ত্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই; এবং সেই বৃত্তিগুলি ভক্তির অনুগামী না হইলেও মনুষ্যত্ব নাই। উভয়ের সমাবেশেই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব। ইহাতে বৃত্তিগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইতেছে, অথচ ভক্তির প্রাধান্য বজায় থাকিতেছে। তাই বলিতেছিলাম, যে বৃত্তিগুলির ঈশ্বর সমর্পণ, এই কথা বুঝিলেই মনুষ্যত্ব বুঝিলে না। তাহার সঙ্গে এটুকুও বুঝা চাই।

শিষ্য। এখন আরও আপত্তি আছে। যে উপদেশ অনুসারে কার্য্য হইতে পারে না, তাহা উপদেশই নহে। সকল বৃত্তিগুলিই কি ঈশ্বরগামী করা যায়? ক্রোধ একটা বৃত্তি, ক্রোধ কি ঈশ্বরগামী করা যায়?

গুরু। জগতে অতুল সেই মহাক্রোধগীতি তোমার কি স্মরণ হয়?

ক্রোধং প্রভো সংহরসংহরেতি,
যাবৎ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনঞ্চকার॥

এই ক্রোধ, মহা পবিত্র ক্রোধ—কেননা যোগভঙ্গকারী কুপ্রবৃত্তি ইহার দ্বারা বিনষ্ট হইল। ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের ক্রোধ। অন্য এক নীচবৃত্তি যে ব্যাসদেবে ঈশ্বরানুবর্ত্তী হইয়াছিল, তাহার এক অতি চমৎকার উদাহরণ মহাভারতে আছে। কিন্তু তুমি ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ। আমি তোমাকে তাহা বুঝাইতে পারিব না।

শিষ্য। আরও আপত্তি আছে—

গুরু। থাকাই সম্ভব। "যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তি গুলিই ঈশ্বর-মুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।" এ কথাটা এত গুরুতর, ইহার

ভিতর এমন সকল গুরুতর তত্ত্ব নিহিত আছে, যে ইহা তুমি যে, একবার শুনিয়াই বুঝিতে পারিবে, এখন সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই। অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইবে, অনেক গোলমাল ঠেকিবে, অনেক ছিদ্র দেখিবে, হয় ত পরিশেষে ইহাকে অর্থ শূন্য প্রলাপ বোধ হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও, সহসা নিরাশ হইও না। দিন দিন, মাস মাস, বৎসর বৎসর, এই তত্ত্বের চিন্তা করিও। কার্য্যক্ষেত্রে ইহাকে ব্যবহৃত করিবার চেষ্টা করিও। ইন্ধন-পুষ্ট অগ্নির ন্যায়, ইহা ক্রমশ তোমার চক্ষে পরিস্ফুট হইতে থাকিবে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে তোমার জীবন সার্থক হইল, বিবেচনা করিবে। মনুষ্যের শিক্ষণীয়, এমন গুরুতর তত্ত্ব আর নাই। একজন মনুষ্যের সমস্ত জীবন সৎ শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, সে যদি শেষে এই তত্ত্বে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবেই তাহার জীবন সার্থক জানিবে।

শিষ্য। যাহা এরূপ দুষ্প্রাপ্য, তাহা আপনিই বা কোথায় পাইলেন ?

গুরু। অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, "এ জীবন লইয়া কি করিব ?" "লইয়া কি করিতে হয় ?" সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি, এবং কার্য্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে এই টুকু শিখিয়াছি—যে সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। "জীবন লইয়া কি করিব ?" এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর অযথার্থ। লোকের সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল ; এই একমাত্র সুফল। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, আমি এ তত্ত্ব কোথায় পাইলাম ? সমস্ত জীবন ধরিয়া, আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া এত দিনে পাইয়াছি। তুমি একদিনে ইহার কি বুঝিবে ?

শিষ্য। আপনার কথাতে আমি ইহাই বুঝিতেছি, যে, ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে আমাকে যে উপদেশ দিলেন, ইহা আপনার নিজের মত। আর্য্য ঋষিরা এ তত্ত্ব অনবগত ছিলেন ?

গুরু। মূর্খ! আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এমন কি শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা, যে যাহা আর্য্য ঋষিগণ জানিতেন না—আমি তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারি। আমি যাহা বলিতে ছিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়া, তাঁহাদিগের শিক্ষার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। তবে, আমি যে ভাষায় তোমাকে ভক্তি বুঝাইলাম, সে ভাষায়, সে কথায়, তাঁহারা ভক্তিতত্ত্ব বুঝান নাই। তোমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক—ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে, কিন্তু সত্য নিত্য। ভক্তি শাণ্ডিল্যের সময়ে যাহা ছিল, তাহাই আছে, ভক্তির যথার্থ স্বরূপ যাহা, তাহা আর্য্য ঋষিদিগের উপদেশ মধ্যে প্রাপ্তব্য। তবে যেমন সমুদ্রনিহিত রত্নের যথার্থ স্বরূপ, ডুব দিয়া না দেখিলে পাওয়া যায় না, তেমনি অগাধ সমুদ্র হিন্দু শাস্ত্রের ভিতরে ডুব না দিলে, তদন্তর নিহিত রত্ন সকল চিনিতে পারা যায় না।

শিষ্য। আমার ইচ্ছা আপনার নিকট তাঁহাদের কৃত ভক্তি ব্যাখ্যা শুনি।

গুরু। শুনা নিতান্ত আবশ্যক, কেন না ভক্তি হিন্দুরই জিনিস। খৃষ্টধর্ম্মে ভক্তিবাদ আছে বটে, কিন্তু হিন্দুর নিকট, বিশেষত বাঙ্গালী চৈতন্যের নিকট, ভক্তির যথার্থ পরিণাম প্রাপ্তি হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের কৃত ভক্তি ব্যাখ্যা সবিস্তারে বলিবার বা শুনিবার আমার বা তোমার অবকাশ হইবে না। আর আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য অনুশীলন ধর্ম্ম বুঝা, তাহার জন্য সেরূপ সবিস্তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই; স্থূল কথা তোমাকে বলিয়া যাইব।

শিষ্য। আগে বলুন, ভক্তিবাদ কি চিরকালই হিন্দু ধর্ম্মের অংশ।

গুরু। না, তাহা নহে। বৈদিক ধর্ম্মে ভক্তি নাই। বেদের ধর্ম্মের পরিচয় বোধ হয়, তুমি কিছু জান। সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্য দেবের যে সম্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক ধর্ম্মে উপাস্য উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। 'হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস পান কর! হবি ভোজন কর, আর, আমাকে ধন দাও, সম্পদ দাও, পুত্র দাও, গোরু দাও, শস্য দাও, আমার শত্রুকে পরাস্ত কর।' বড় জোর বলিলেন, 'আমার পাপ ধ্বংস কর।' দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ন করিবার জন্য বৈদিকেরা যজ্ঞাদি করিতেন। এইরূপ কাম্য বস্তুর উদ্দেশে যজ্ঞাদি করাকে কাম্য কর্ম্ম বলে।

কাম্যাদি কর্ম্মাত্মক যে উপাসনা তাহার সাধারণ নাম কর্ম্ম। এই কাজ করিলে, তাহার এই ফল; অতএব কাজ করিতে হইবে। এইরূপে ধর্ম্মার্জ্জনের যে পদ্ধতি, তাহারই নাম কর্ম্ম।* বৈদিক কালের শেষ ভাগে এইরূপ কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যাগ যজ্ঞের দৌরাত্ম্যে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন, যে এই যাগাত্মক কর্ম্ম বৃথা ধর্ম্ম। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন, যে, বৈদিক দেব দেবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় না; ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণ আছেন। তাঁহারা সেই কারণের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন।

এই সকল কারণে কর্ম্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাঁহারা ত্রিবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিলেন—সেই বিপ্লবের ফলে আসিয়া প্রদেশ অদ্যাপি শাসিত। এক দল চার্ব্বাক,—তাঁহারা বলিলেন, কর্ম্মকাণ্ড সকলই মিথ্যা—খাও দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নেতা শাক্যসিংহ। তিনি বলিলেন, কর্ম্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম্ম হইতেই দুঃখ। কর্ম্ম হইতে পুনর্জ্জন্ম, অতএব কর্ম্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া চিত্ত সংযম পূর্ব্বক অষ্টাঙ্গ ধর্ম্মপথে গিয়া নির্ব্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকদিগের দ্বারা উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায় ব্রহ্মবাদী। তাঁহারা দেখিলেন, যে জগতের যে অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অনুসন্ধানে তাঁহারা প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। সেই ব্রহ্ম জানিতে পারিলে, সেই জগতের অন্তরাত্মা বা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ, এবং জগতের সঙ্গেই বা তাঁহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পারিলে, বুঝা যাইতে পারে, যে এ জীবন লইয়া কি করিতে হইবে। সেটা জানা কঠিন—তাহা জানাই ধর্ম্ম। অতএব জ্ঞানই ধর্ম্ম—জ্ঞানেই নিশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপনিষদ্ বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের কীর্ত্তি। ব্রহ্মনিরূপণ এবং আত্মজ্ঞানই উপনিষদ্ সকলের উদ্দেশ্য। তার পর ষড়্দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবর্দ্ধিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কপিলের সাংখ্যে ব্রহ্ম পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবাদাত্মক। ষড়্দর্শনের মধ্যে কেবল পূর্ব্ব মীমাংসা কর্ম্মবাদী। আর সকলেই জ্ঞানবাদী।

শিষ্য। জ্ঞানবাদ বড় অসম্পূর্ণ বলিয়া আমার বোধ হয়। জ্ঞানে ঈশ্বরকে জানিতে পারি বটে, কিন্তু জ্ঞানে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? জানিলেই কি

পাওয়া যায়? ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার একত্ব, মনে করুন বুঝিতে পারিলাম—বুঝিতে পারিলেই কি ঈশ্বরে মিলিত হইলাম? দুইকে এক করিয়া মিলাইয়া দিবে কে?

গুরু। এই ছিদ্রেই ভক্তিবাদের সৃষ্টি। শাণ্ডিল্য বলিলেন, জ্ঞানে ঈশ্বর জানিতে পারি বটে, কি জানিতে পারিলেই কি তাঁহাকে পাইলাম? অনেক জিনিস আমরা জানিয়াছি—জানিয়াছি বলিয়া কি তাহা পাইয়াছি? আমরা যাহাকে দ্বেষ করি তাহাকেও ত জানি, কিন্তু তাহার সঙ্গে কি আমরা মিলিত হইয়াছি? আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতি দ্বেষ করি, তবে কি তাঁহাকে পাইব? বরং যাহার প্রতি আমাদের অনুরাগ আছে, তাহাকে পাইবার সম্ভাবনা। যে শরীরী, তাহাকে কেবল অনুরাগে না পাইলে না পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যিনি অশরীরী, তিনি কেবল অন্তঃকরণের দ্বারাই প্রাপ্য। অতএব তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলেই আমরা তাঁহাকে পাইব। সেই প্রকারের অনুরাগের নামে ভক্তি। শাণ্ডিল্য সূত্রের দ্বিতীয় সূত্র এই—"সা (ভক্তিঃ) পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

শিষ্য। ভক্তিবাদের উৎপত্তির এই ইতিবৃত্ত শুনিয়া আমি বিশেষ আপ্যায়িত হইলাম। ইহা না শুনিলে ভক্তিবাদ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম না। শুনিয়া আর একটা কথা মনে উদয় হইতেছে। সাহেবেরা, এবং দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি এদেশীয় পণ্ডিতেরা বৈদিক ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন. এবং পৌরাণিক বা আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মকে নিকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এ কথা অতিশয় অযথার্থ। ভক্তিশূন্য যে ধর্ম্ম, তাহা অসম্পূর্ণ বা নিকৃষ্ট ধর্ম্ম—অতএব বেদে যখন ভক্তি নাই, তখন বৈদিক ধর্ম্মই নিকৃষ্ট, পৌরাণিক বা আধুনিক বৈষ্ণবাদি ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যাঁহারা এ সকল ধর্ম্মের লোপ করিয়া, বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বিবেচনা করি।

গুরু। কথা যথার্থ। তবে ইহাও বলিতে হয়, যে বেদে যে ভক্তিবাদ কোথাও নাই, ইহাও ঠিক নহে। শাণ্ডিল্য সূত্রের টীকাকার স্বপ্নেশ্বর ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তি শব্দ ব্যবহৃত না থাকিলেও ভক্তিবাদের সারমর্ম্ম তাহাতে আছে। বচনটি এই—"আত্মৈবেদং সর্বমিতি। সবা এষ এব পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতি রাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড় ভবতীতি।

ইহার অর্থ এই যে,আত্মা এই সকলই (অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে) যে ইহা দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতে ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাজ (আপনার রাজা বা আপনার দ্বারা রঞ্জিত) হয়।

ইহা যথার্থ ভক্তিবাদ। এক্ষণে তোমাকে শাণ্ডিল্যের ভক্তিবাদ সংক্ষেপে শুনাইতে ইচ্ছা করি। কিন্তু আজ আর সময় নাই। বারান্তরে হইবে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সোহং।

সোহং— সেই আমি—

একথা ভারতের হিন্দু বই আর কেহ কখন কহে নাই। আর একজন মাত্র মহা পুরুষ কহিয়াছিলেন—যীশুখ্রীষ্ট।

কথাটা কেমন? বুঝিয়া দেখা যাক।

ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ড, সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সৃষ্টি—এ দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ কি, সম্বন্ধ কি? এ বিষয়ে প্রধানত দুইটি মত আছে। একটি মত এই যে ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্ম, সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সৃষ্টি একই পদার্থ। অর্থাৎ ব্রহ্মই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান, সৃষ্টিকর্ত্তাই সৃষ্টির উপাদান। উপাদান কাহাকে বলে? না যাহার দ্বারা কোন বস্তু নির্ম্মিত হয়, তাহাই সেই বস্তুর উপাদান—যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান। অতএব এই মতানুসারে ব্রহ্ম যে পদার্থ, সেই পদার্থেই ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মিত। ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্ম হইতে পৃথক নয়। এই মত সম্বন্ধে ইহাই মোট কথা,—যে সকল অবান্তর কথা এই প্রবন্ধে বলা আবশ্যক হইবে তাহা পরে বলিব। আর একটি মত এই যে ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ড হইতে, সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সৃষ্টির অগ্রে সৃষ্টির উপাদান কিছুই ছিল না। সৃষ্টিকালে সৃষ্টিকর্ত্তা আপন অসীম শক্তিদ্বারা কি-জানি-কেমন-করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং যে বস্তু, সৃষ্ট জগৎ সে বস্তু নয়, সে বস্তু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক

এবং ভিন্ন প্রকৃতির বস্তু। দুইটি মতের মধ্যে প্রথম মতটি হিন্দুর, দ্বিতীয়টি খ্রীষ্টান প্রভৃতির। প্রথম মতটি যে ভারতে বই আর কোথাও প্রচলিত হয় নাই তা নয়। তবে ভারতে যেমন প্রবল হইয়াছে তেমন আর কোথাও হয় নাই। তাই ইহা ভারতের হিন্দুর মত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দুইটি মতের মধ্যে কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি গ্রহণ যোগ্য? এ প্রশ্ন দুই রকমে মীমাংসা করা যাইতে পারে এবং উভয় প্রকারেই হিন্দুর মত পাকা বলিয়া বোধ হয়। প্রথম কথা এই যে, জগৎ যদি জগদীশ্বর হইতে পৃথক হয় তবে জগদীশ্বর আর অসীম হইতে পারেন না, সসীম হইয়া পড়েন। যেখানে দুইটি বস্তু থাকে সেখানে কোনটিই অসীম হইতে পারে না, দুইটিই সসীম হইয়া যায়। খৃষ্টান প্রভৃতি অপর ধর্ম্মাবলম্বীরা এই রূপ বলিয়া থাকেন, যে জগদীশ্বর জগৎ হইতে পৃথক হইলেও জগতে বিরাজমান, অতএব সসীম নন। কিন্তু জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকা আর জগৎ হওয়া এক কথা নয়। অতএব জগদীশ্বর যদি জগতে শুধু বিদ্যমান থাকেন, জগৎ না হন, তবে জগতে জগদীশ্বর ছাড়া আরো কিছু আছে এবং তাহা হইলেই জগদীশ্বর সসীম হইয়া পড়েন। যেখানে একটি মাত্র বস্তু সেখানে সীমা নাই— যেখানে দুই বা ততোধিক বস্তু সেখানে সীমাজ্ঞান অপরিহার্য্য। দ্বিতীয় কথা এই যে সৃষ্টির অগ্রে সৃষ্টির কোন উপাদান ছিল না, ইহা আমরা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। কোন বস্তুর একেবারে কিছু নাই এরূপ কল্পনা মানব শক্তির অতীত, মনুষ্য মনের অসাধ্য। মনুষ্য ইহা বুঝিয়াই উঠিতে পারে না। তবে যাহার কিছুই ছিল না, তাহা হইয়া পড়িল, ইহা কেমন করিয়া মনে লাগে? যাঁহারা এই মতের পক্ষপাতী তাঁহারা বলিয়া থাকেন, যে জগদীশ্বরের শক্তি অসীম, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই, মানুষ যাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তিনি তাহা অনায়াসে করিতে পারেন, অতএব মানুষ যাহার ধারণা করিতে পারে না, তাহাই যে অসম্ভব বা অসত্য এমন কোন কথা নাই। এ কথা ঠিক। কিন্তু জগদীশ্বরের সকলই সাধ্যায়ত্ত বলিয়া তিনি যে সকলই করেন, এমন কোন কথা নাই। মনে করিলে তিনি যে সবই করিতে পারেন, ইহাই তাঁহার প্রকৃত অসীমত্ব এবং অনন্তত্ব। তিনি অসীম এবং অনন্ত বলিয়া যে সবই করিবেন এমন কোন আবশ্যকতা নাই। অতএব যে প্রণালীর সৃষ্টি মানুষ বুঝিয়া উঠিতে পারে না সে প্রণালীতে জগদীশ্বর সৃষ্টি করেন নাই, এ কথা বলিলে জগদীশ্বরের অনন্তত্ব বা অসীম

শক্তি অস্বীকার করা হয় না। এখন বিচার্য্য এই যে, যে মতানুসারে সৃষ্টিক্রিয়া মানুষের দুর্বোধ্য সে মত অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রত্যুত্তরে সচরাচর এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে, যে সৃষ্ট জগত স্রষ্টা জগদীশ্বর হইতে এত অধম ও নিকৃষ্ট যে, জগৎ এবং জগদীশ্বরকে এক পদার্থ জ্ঞান করিলে জগদীশ্বরকে নিতান্তই অবমাননা করা হয়, নিতান্তই অধম করা হয়। কিন্তু জগদীশ্বর অধম পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা, একথা বলিলেও কি জগদীশ্বরকে তেমনি অবমাননা করা হয় না, তেমনি অধম করা হয় না? শুধু অধম পদার্থ হইলেই কি অধম হইতে হয়, অধম কার্য্য করিলে অথবা অধম পদার্থ প্রস্তুত করিলেও কি অধম হইতে হয় না? কোন ব্যক্তি শুধু দুশ্চরিত্র হইলেই কি অধম হয়? সচ্চরিত্র হইয়া যদি একখানা দুর্নীতিপূর্ণ পুস্তক লেখে তাহা হইলেও কি অধম হয় না? তবে জগৎ অপকৃষ্ট জিনিস বলিয়া তাহাকে জগদীশ্বরের রূপ, বিকাশ বা বিবর্ত্ত না বলিয়া তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ বলিলেই কি তাঁহার মান বা গৌরব রক্ষা করা হয়? যাঁহারা এমন কথা বলেন, তাঁহাদিগকে আমি বুঝিতে পারি না, তাঁহাদের নীতিশাস্ত্র কেমন তাঁহারাই জানেন, তাঁহাদের মান মর্য্যাদা বিষয়ক সংস্কার কি রূপ, তাঁহারাই বলিতে পারেন। এ বিষয়ে আর যাহা বক্তব্য আছে পরে বলিব।

কিন্তু দুইটি মতের মধ্যে কোন্‌টি ভাল তাহা মীমাংসা করিবার আর একটি উত্তম উপায় আছে। একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যে দুইটি মতের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই—জগৎ জগদীশ্বরের রূপ, বিকাশ বা বিবর্ত্ত এ কথার অর্থও যা, জগৎ জগদীশ্বরের সৃষ্টি এ কথার অর্থও প্রায় তাই। সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্ত্তার মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহা একটি পার্থিব দৃষ্টান্ত দ্বারা কতকটা বুঝিতে পারা যায়। সেক্সপীয়র অথবা সেক্সপীয়রত্ব একটি পদার্থ। সেক্সপীয়র রচিত হ্যাম্‌লেট্ চরিত্র আর একটি পদার্থ। সেক্সপীয়র হইতে হ্যাম্‌লেট্ পৃথক পদার্থ সন্দেহ নাই। হ্যাম্‌লেট্ চরিত্র যে সকল উপকরণে নির্ম্মিত স্বয়ং সেক্সপীয়রের চরিত্রে বোধ হয় সে সব উপকরণ ছিল না। এ অর্থে সেক্সপীয়র এবং হ্যাম্‌লেট্ দুইটি পৃথক পদার্থ। কিন্তু আর এক অর্থে দুইয়ের মধ্যে বড় বিভিন্নতা নাই—অর্থাৎ সেক্সপীয়রও যা, হ্যাম্‌লেট্ও তাই। হ্যাম্‌লেট্ সেক্সপীয়র হইতে ভিন্ন হইলেও হ্যাম্‌লেটে এমন একটু কিছু আছে, যাহা সেক্সপীয়রেই পাওয়া যায়, আর কোন ব্যক্তিতে পাওয়া যায় না। সে একটু কিছুর নাম

সেক্সপিয়রত্ব, সেক্সপীয়রের ধাত্, সেক্সপীয়রের অস্থিমজ্জা বা সেক্সপীয়রের সেক্সপীয়র—যাহা সেক্সপীয়রের কোন একটি ভাব বা কার্য্য বিশেষ নয়, যাহা সেক্সপীয়রের সকল ভাব এবং সকল কার্য্যে আছে—যাহার গুণে সেক্সপীয়রের সকল ভাব সেক্সপীয়রেরই ভাব, আর কাহারো বা আর কোন রকমের ভাব নয়; সেক্সপীয়রের সকল কার্য্য সেক্সপীয়রেরই কার্য্য, আর কাহারো বা আর কোন রকমের কার্য্য নয়। সে একটু-কিছু অর্থাৎ সে সেক্সপীয়রত্ব, সেক্সপীয়রের ধাত্, সেক্সপীয়রের অস্থিমজ্জা বা সেক্সপীয়রের সেক্সপীয়র শুধু হ্যাম্‌লেটে নয়, সেক্সপীয়র রচিত ভাল মন্দ সমস্ত চরিত্রে আছে—লীয়রে, মিরন্দায়, ফাল্‌ষ্টাফে, ওবেরণে, ম্যাক্‌বেথে, ম্যাক্‌ডফে, শাইলকে, সমস্ত চরিত্রে আছে। মিল্টন রচিত কোন চরিত্রে সে সেক্সপীয়রত্ব নাই। আবার সেক্সপীয়র রচিত কোন চরিত্রে মিল্টনত্ব নাই। এইরূপ সকল মানব-সৃষ্টিকর্ত্তার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। এবং এ কথার অর্থ এই যে, যে যাহা সৃষ্টি বা রচনা করে, তাহাতে তাহার নিজের কিছু অথবা নিজত্ব-কিছু থাকেই থাকে। যে পরিমাণে সেই নিজের-কিছু বা নিজত্ব-কিছু থাকে, অন্তত সেই পরিমাণে মানব-স্রষ্টা এবং মানব-সৃষ্টির সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, যে দুইই এক পদার্থ এবং মানব-সৃষ্টি মানব-স্রষ্টাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারে—সোহং। সেক্সপীয়রের হ্যাম্‌লেট্ কাল্পনিক সৃষ্টি না হইয়া যদি তোমার আমার ন্যায় সজীব ও সচেতন সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে তুমি আমি যেমন ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলি—সোহং, সেও তেমনি সেক্সপীয়রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারিত—সোহং। কার্য্য হইতে কারণ ভিন্ন হইলেও কার্য্যে কারণ থাকিবেই থাকিবে। খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপীয় দার্শনিকেরাও একথা স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব সৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্ত্তা অবশ্যই আছেন—সৃষ্টি হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইতে পারেন না। সৃষ্টিকর্ত্তাকে অন্তত সৃষ্টির আংশিক উপাদান বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়। অন্তত সেই অংশ সম্বন্ধে সৃষ্ট পদার্থ সৃষ্টিকর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারে—সোহং বলিলেও কোন দোষ হয় না। বলাই কর্ত্তব্য। না বলিলে সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার নামই নাস্তিকতা। অতএব খ্রীষ্টান প্রভৃতি দ্বৈতবাদীদিগের মতানুসারেও ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মাণ্ড পৃথক নয়, সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে সৃষ্টি পৃথক নয়। সে মতানুসারেও অস্তিত্ব একটি বই দুইটি নাই—বস্তু একটি বই দুইটি নাই। দার্শনিক

শ্রেষ্ঠ ফরিয়র বলিয়াছেন*—The only absolute existence is an eternal Mind in permanent synthesis with matter, অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত অচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্ত, কেবল এই রকম একটি অনন্ত চৈতন্য আছে, আর কিছুই নাই। অতএব সৃষ্টি হইতে সৃষ্টিকর্ত্তাকে ভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করা যুক্তিবিরুদ্ধ এবং ভিন্ন বলিলেও, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে সৃষ্টিতে যাহা কিছু আছে তাহাই সৃষ্টিকর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারে—সোহং। অতএব বিবর্ত্তবাদ এবং সৃষ্টিবাদ—উভয়বাদেই সৃষ্টি এবং সৃষ্টি কর্ত্তার একত্ব নিশ্চিত।

এখন একটি গুরুতর কথার মীমাংসা আবশ্যক হইতেছে। যাঁহারা খৃষ্টান প্রভৃতির ন্যায় দ্বৈতবাদী, তাঁহারা বলিতে পারেন, যে ব্রহ্মাণ্ডে যখন ভাল মন্দ উভয়বিধ দ্রব্যই দেখিতে পাই, তখন কেমন করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্ম বলি—কেমন করিয়া তিক্ত এবং মিষ্টকে এক বলি, সুগন্ধ এবং দুর্গন্ধকে এক বলি, সৌন্দর্য্য এবং কদর্য্যতাকে এক বলি, দয়া এবং নির্দ্দয়তাকে এক বলি? একথার প্রথম উত্তর এই যে, যখন বিবর্ত্তবাদ এবং সৃষ্টিবাদ উভয়বাদেই সৃষ্টি কর্ত্তার একত্ব প্রমাণীকৃত হইতেছে, তখন কেহই এরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন না। দ্বিতীয় এবং প্রধান উত্তর এই যে, এই সকল বিভিন্নতা প্রকৃত বিভিন্নতা নয়—এই সকল ভিন্নতা মনুষ্যের একটি অবস্থা বিশেষের ফল বা উপলব্ধি মাত্র। মানুষ যে দ্রব্য তিক্ত বলিয়া ফেলিয়া দেয়, একটা পশু সেই দ্রব্যকে অতিশয় মিষ্ট বলিয়া উদর পূরিয়া ভক্ষণ করে। মানুষের চোকে যাহা লাল, পক্ষীর চোকে হয়ত তাহা কাল। স্থূল অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন আকার ও আস্বাদ থাকে, রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা সেই দ্রব্য সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে এক আকার ধারণ করে এবং প্রায় এক আস্বাদ উৎপন্ন করে। স্থূল আকারে একই বস্তু স্থূল ইন্দ্রিয়ের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপলব্ধ হয়। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে তাপ, তড়িৎ, আলোক, প্রভৃতি যে সকল স্থূল পদার্থ স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এত বিভিন্ন বলিয়া অনুভূত হয়, সূক্ষ্মাকারে সে সমস্ত একই পদার্থ। অতএব জগতে যাহা বিভিন্নতা বলিয়া বোধ হয় তাহা প্রকৃত বিভিন্নতা নয়—স্থূল-ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন-স্থূল অবস্থার স্থূল-উপলব্ধি মাত্র। যে স্থূল ইন্দ্রিয়ের শাসন অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে উন্নত হইয়া

* Ferrier এর *Institutes of the Metaphysic* নামক গ্রন্থ দেখ।

সূক্ষ্মরূপে দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার কাছে জগতে ভাল মন্দের প্রভেদ নাই, প্রকৃত বিভিন্নতা নাই। তাহার কাছে তিক্ত মিষ্টের প্রভেদ নাই, সুন্দর কুৎসিতের প্রভেদ নাই, পাপ পুণ্যের প্রভেদ নাই। যে স্থূল ইন্দ্রিয়ের শাসনে থাকিয়া স্থূল দৃষ্টিতে দেখে, সেই কেবল তিক্ত মিষ্ট, পাপপুণ্য প্রভৃতি বিভিন্নতা দর্শন করে এবং সেই সমস্ত বিভিন্নতার অধীন হইয়া নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করে এবং অবনতি প্রাপ্ত হয়। এই যে আমরা জড়পদার্থ এবং চৈতন্যের মধ্যে প্রভেদ করিয়া থাকি, তাহাই কি ঠিক? আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান বলিতেছে যে জড়জগৎই চিন্ময় জগৎরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরাও নিত্য দেখিতেছি যে যে সকল জড় দ্রব্য আমরা ভক্ষণ করিয়া থাকি তাহা শুধু আমাদের জড়শোণিত এবং জড়অস্থি বৃদ্ধি করিতেছে না, আমাদের চিন্তাশক্তিও বৃদ্ধি করিতেছে। শুক্রশোণিত সমুদ্ভূত সন্তান কেবল জড় নয়, চৈতন্য সম্পন্নও বটে। তাই আমাদের একজন গুরুদেব তুল্য গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন যে 'জড়জগৎ চিন্ময়'। * অতএব কেমন করিয়া বলি যে জড়পদার্থ এবং চৈতন্য ভিন্ন পদার্থ? কেমন করিয়া না বলি, যে আমরা স্থূল অবস্থায় স্থূল ইন্দ্রিয়ের শাসনে আছি বলিয়াই জড়ের এবং চৈতন্যের একত্ব দেখিতে পাইতেছি না? কেমন করিয়া না বলি, যে জড়ত্ব চৈতন্যের একটি অবস্থা মাত্র? কেমন করিয়া না বলি যে ব্রহ্ম অথবা স্থূলতা-শূন্য চৈতন্যের কাছে জড় এবং চৈতন্য একই পদার্থ?

কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর প্রকৃত বিভিন্নতা বা বৈষম্য না থাকিলেও; এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে ব্রহ্মাণ্ডের একটি স্থূল অবস্থা আছে। ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃত বিভিন্নতা নাই বটে, কিন্তু এক রকমের একটা বিভিন্নতা আছে। সে বিভিন্নতা স্থূলত্বের ফল অথবা স্থূলত্বের অঙ্গ। অতএব স্বীকার করিতে হইতেছে, যে ব্রহ্মাণ্ডে একটা স্থূলত্ব আছে এবং তাহা হইলে কেমন করিয়া বলা যায় যে ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্ম একই পদার্থ? ব্রহ্মাণ্ডের যদি স্থূলত্ব থাকে, তবে ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মকে এক বলিলে ব্রহ্মকেও স্থূল বলা হয় এবং তিনি স্থূল এ কথা বলিলে তাঁহাকে পাপপুণ্যরূপ বিভিন্নতা এবং বৈষম্যের অধীন করা হয়। এ কথার উত্তর এই যে ব্রহ্মাণ্ডের স্থূলত্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিত্য গুণ বা অবস্থা নয়—ক্ষণস্থায়ী গুণ বা অবস্থা মাত্র। এবং সে গুণ বা অবস্থা প্রকৃত অস্তিত্বও নয়—ক্ষণিক অবস্থার ক্ষণিক উপলব্ধি মাত্র। সে গুণ বা

* পারিবারিক প্রবন্ধে—উৎসর্গপত্র দেখ।

অবস্থা যে প্রকৃত অস্তিত্ব নয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মানুষের রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ প্রভৃতি কতকগুলি স্থূল প্রবৃত্তি আছে। মানুষ যতক্ষণ সেই সকল স্থূল প্রবৃত্তির বশীভূত থাকে, ততক্ষণ তাহাকে কেবল কতকগুলি ক্ষণস্থায়ী এবং বিভিন্ন ভাবের রঙ্গক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয়। সেও সেই বিভিন্ন এবং ক্ষণস্থায়ী ভাবের অধীন থাকিয়া আপনাকে প্রতি মুহূর্ত্ত বিভিন্ন ভাবে অনুভূত করে—আপনি যে আগা গোড়া একটি সুদৃঢ়, সুনিশ্চিত, সুস্থির, সমতাময় অস্তিত্ব তাহা অনুভব করে না, বা করিতে পারে না। স্বচ্ছ জলে মেঘের পর মেঘের ছায়া পড়িলে জলের যে প্রকার আকৃতি হয়, তাহার আধ্যাত্মিক আকৃতিও সেইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু মেঘের পর মেঘের ছায়ায় থাকিয়া স্বচ্ছ জলের যে আকৃতি বা অস্তিত্ব হয়, সেও যেমন স্বচ্ছ জলের প্রকৃত আকৃতি বা অস্তিত্ব নয়, বিভিন্নভাবের অধীন থাকিলে মানুষের যে আকৃতি বা অস্তিত্ব হয়, তাহাও তেমনি মানুষের প্রকৃত আকৃতি বা অস্তিত্ব নয়। কিন্তু মানুষ যখন লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি স্থূল-ইন্দ্রিয়-মূলক স্থূল প্রবৃত্তির শাসন অতিক্রম করে, তখন সে সতত‍ই একটি সুদৃঢ়, সুনিশ্চিত, সুস্থির, সুন্দর, সুনির্ম্মল সমান আকার ধারণ করিয়া থাকে। জগতের কিছুতেই সে আকারের পরিবর্ত্তন বা বিকার ঘটাইতে পারে না। তখন মানুষের আকার বা অস্তিত্ব মেঘের ছায়া হইতে বিমুক্ত স্বচ্ছ জলের আকার বা অস্তিত্বের সমান হয়। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে ব্রহ্মাণ্ডে যে স্থূলত্ব আছে তাহা ক্ষণস্থায়ী অবস্থামাত্র এবং প্রকৃত অস্তিত্বও নয়। অতএব ব্রহ্মের আংশিক মায়াময় ক্ষণস্থায়ী রূপ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বা প্রক্ষিপ্ত হইলেও ব্রহ্ম তদ্দ্বারা দূষিত হন না, কেন না ব্রহ্ম নিত্যতাময় অতএব অনিত্য কর্ত্তৃক পরাভূত হইবার নয়, এবং ব্রহ্ম তাহার অধীন নন, সে-ই ব্রহ্মের অধীন, যেহেতু, সে-ই ব্রহ্মের ইচ্ছাসম্ভূত—ইন্দ্রজাল যেমন ঐন্দ্রজালিকের ইচ্ছাসম্ভূত সেও তেমনি ব্রহ্মের ইচ্ছাসম্ভূত, এবং ইন্দ্রজাল যেমন ঐন্দ্রজালিকের প্রকৃত অস্তিত্বকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেও তেমনি ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। তবে কেন যে তিনি স্থূলরূপ ধারণ করেন বা স্থূলত্ব প্রকাশ করেন, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু যে কারণেই করুন, তিনি যখন আপনাকে লইয়াই আপনি এইরূপ করিতেছেন, তখন আর কোন কথাই হইতে পারে না। পরকে লইয়া কোন কাজ করিলে অনেক কথা হইতে পারে। আপনাকে লইয়া কোন কাজ করিলে কোন কথাই হইতে পারে

না। অতএব ব্রহ্মাণ্ডে স্থূলত্ব থাকিলেও ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্ম এক, এ কথা বলিলে কোন দোষই হয় না। ফলত ব্রহ্মাণ্ড যদি ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলে—সোহং—তবে ব্রহ্মাণ্ড সকল কথার সার কথাই বলে।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা আমাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন না, ইংরাজি শাস্ত্রই বেশী অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগের দুই তিনটি কথার এইখানে মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিব। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যে ব্রহ্মাণ্ড যদি ব্রহ্মই হয়, তবে ব্রহ্মাণ্ডে যত পদার্থ আছে সবই ব্রহ্ম। তাহা হইলে তুমিও ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম, গাছটাও ব্রহ্ম, পাথরখানাও ব্রহ্ম, ইট্‌খানাও ব্রহ্ম, সবই ব্রহ্ম। তাহা হইলে জগদীশ্বর এক নন, জগতে যতগুলি পদার্থ আছে, ততগুলি জগদীশ্বর আছেন। কিন্তু ইহার অপেক্ষা হাস্যাস্পদ কথা আর হইতে পারে না। যাঁহারা এইরূপ তর্ক করিয়া থাকেন, তাঁহারা ব্রহ্ম কাহাকে বলে তাহাও জানেন না এবং সোহং কি তাহাও জানেন না। তাঁহারা জানেন না যে ব্রহ্ম একটি পদার্থ, বিভাজ্য নয়, এবং ব্রহ্মকে কেবল জ্ঞানের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, চক্ষু কি অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না। অতএব তাঁহারা যখন বলেন যে জগতে যতগুলি পদার্থ আছে, ততগুলি ব্রহ্ম আছেন, তখন তাঁহারা ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থকে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ পদার্থের অবস্থাপন্ন করেন। তাঁহাদের আরো এই একটি ভুল হয়, যে যেখানে প্রকৃত সংখ্যা নাই, সেখানে তাঁহারা সংখ্যা কল্পনা করিয়া থাকেন। জগতে পদার্থের সংখ্যা আছে, স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জগৎ দেখিলেই এইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে। প্রকৃত জ্ঞান-চক্ষে দেখিলে জগতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বা বহু সংখ্যক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ একই পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন আকার বা অবস্থা বলিয়া বোধ হয়। আধুনিক সূক্ষ্ম এবং উন্নত বিজ্ঞানও এই কথার সূচনা আরম্ভ করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম যখন স্থূল চক্ষে দেখিবার জিনিস নন, জ্ঞান-চক্ষে দেখিবার জিনিস, তখন ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মাণ্ড বা জগতের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে হইলে জগৎকেও স্থূল চক্ষে না দেখিয়া জ্ঞান চক্ষে দেখা উচিত। কিন্তু জ্ঞানচক্ষে দেখিলে জগতে একাধিক পদার্থও দেখিবে না, একাধিক ব্রহ্মও দেখিবে না।

দ্বিতীয় কথা, জ্ঞানচক্ষু ছাড়িয়া দিয়া স্থূল চক্ষু দ্বারা দেখিলেও জগতে যত পদার্থ ততব্রহ্ম দেখিতে পাওয়া যায় না। সোহং—ইহার অর্থ এই যে ব্রহ্ম যে পদার্থ আমি (অথবা জগৎ) ও সেই পদার্থ—ইহার এমন অর্থ নয়

যে আমিই ব্রহ্ম। তবে কেমন করিয়া বল, যে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ডকে এক পদার্থ বলিলে, তুমি আমি গাছ পাতা ঘটি বাটি সকলকেই ব্রহ্ম বা জগদীশ্বর বলা হয়? সমস্ত সমুদ্রও যে পদার্থ এক ফোঁটা জলও সেই পদার্থ। তা বলিয়া এক ফোঁটা জল কি সমুদ্র? এক ফোঁটা জলে কি সমুদ্রের তিমি তিমিঙ্গিল খেলে, সমুদ্রের তরঙ্গ উঠে, সমুদ্রের পোতশ্রেণী চলে, সমুদ্রের মহাপ্রলয় উদ্ভূত হয়? একটি অঙ্গুলিও যে পদার্থ সমস্ত দেহটাও সেই পদার্থ। তা বলিয়া একটা অঙ্গুলি কি দেহ? মনের একটা ভাবও যে পদার্থ মনও সেই পদার্থ। তা বলিয়া মনের একটা ভাবই কি মন? তবে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বানন্দ ব্রহ্মও যে পদার্থ, জগৎও সেই পদার্থ বলিয়া কেমন করিয়া বল, যে তুমি আমি গাছ পাতা ঘটি বাটি সকলই এক একটি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বানন্দ ব্রহ্ম? 'সোঽহং' এর প্রকৃত অর্থ বুঝ না বলিয়াই এইরূপ প্রলাপ বকিয়া থাক।

যাঁহাদের কথা বলিতেছি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ইহাও বলিয়া থাকেন যে ব্রহ্ম অতি মহৎ পদার্থ। অতএব যখন দেখিতেছি যে জগতে মানুষ ছাড়া আর কেহ বা আর কিছুই প্রকৃত মহৎ নয়, কেন না প্রকৃতরূপে মহৎ কার্য্য করে না, তখন কেমন করিয়া জগৎ এবং জগদীশ্বরের একত্ব স্বীকার করিয়া জগতের সকল পদার্থকে মহৎ বলি? তাঁহারা বলিয়া থাকেন, যে যেসকল পদার্থ অচেতন সে সকল পদার্থ কোন কাজই করে না, যেসকল পদার্থ সচেতন সে সকল পদার্থের মধ্যে মানুষ ছাড়া কেহই মহৎ কার্য্য করে না, কেবল আত্ম-সেবাতেই নিযুক্ত। ইহাই কি ঠিক? জগতে কি এমন একটা সময় হয় নাই যখন জগতে মানুষ ছিল না? কিন্তু সেই মনুষ্য-শূন্য জগৎই কি মানুষকে প্রসব করে নাই? যদি করিয়া থাকে তবে কেমন করিয়া বল যে জগতে যাহা মানুষ নয় তাহা মহৎ কার্য্য করে না বা করে নাই? তুমি বলিবে—আমি ইউরোপীয় বিজ্ঞানের বিবর্ত্তবাদ মানি না বা বুঝি না। আচ্ছা তাহাই হউক। তুমি মানুষ—অতএব তুমি মহৎ—ইহা ত মান, ইহা ত বুঝ। কিন্তু বল দেখি তুমি যাহা আহার কর অর্থাৎ জগতে যাহা মানুষ নয়, তাহা তোমার দেহে বল সঞ্চার করিতেছে বলিয়া তুমি জগতে মহৎ কার্য্য করিতে পারিতেছ কি না? যদি তাহাই হয় তবে কেমন করিয়া বল যে জগতে যাহা মানুষ নয় তাহা মহৎ কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত নয়? তুমি যে ইউরোপকে এত ভাল বল, সেই ইউরোপের বিজ্ঞান আজ কি বলিতেছে? বলিতেছে না কি যে পৃথিবীর কীটাণুকীট, অণুপরমাণ

ক্ষুদ্র বৃহৎ, সচেতন অচেতন সকল পদার্থই জগদীশ্বর কর্ত্তৃক বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছে? তুমি আত্মপ্রধান, আত্ম-সর্ব্বস্ব, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী * নও, তাই মনে কর, যে তুমি যা কর, তাই জগতের কাজ, তোমার যা উদ্দেশ্য, বিপুল ব্রহ্মাণ্ডেরও সেই উদ্দেশ্য, অনন্ত ব্রহ্মেরও সেই উদ্দেশ্য। তাই তুমি বুঝ না, যে অসীম অনন্ত ব্রহ্মের কাছে তুমি একটি বালির কণাও নহ। তাই তোমার মনে হয় না, যে অসীম অনন্ত ব্রহ্মের অসীম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কি জানি-কোন্-অসীম-অনন্ত-উদ্দেশ্যে তুমি আমি রাজা প্রজা পর্ব্বত প্রান্তর গাছ পাতা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ধূলা কাদা সমস্ত পদার্থকে সমভাবে সেই এক উদ্দেশ্যের সাধক করিয়া অসীম তেজে অনন্ত পথে ছুটিয়াছে! তুমি কি না আজ বল, যে জগতে মানুষ বই মহৎ আর কিছুই নাই, মানুষ বই আর কেহ মহৎ কার্য্য করে না! তুমি ত ভারতের হিন্দু নহ। সোঽহং—ভারতের হিন্দুর কথা। তুমিত ভারতের হিন্দু নহ। তুমি কি ভারতের, কি ইউরোপের, কোন দেশেরই প্রকৃত মনুষ্য নহ।

মৃত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এইরূপ আশঙ্কা করিতেন †, যে মানুষ যদি আপনাকে ব্রহ্ম মনে করে, তবে তাহার অহঙ্কারের সীমা থাকিবে না। আমরা বলি তা নয়—মানুষ আপনাকে ব্রহ্ম মনে করিলেই তাহার অহঙ্কার নাশ হইবে। যে হিন্দু বলেন—সোঽহং, সেই আমি, সেই হিন্দু বলেন যে জগতে শুধু আমি নয়, যা কিছু আছে সকলই সেই। যেখানে সকলেই ব্রহ্ম সেখানে এক জনের ব্রহ্ম বলিয়া অভিমান বা অহঙ্কার করিবার স্থান বা পথ কই? আবার যেখানে মানুষ আপনাকে আপনি বলে—সোঽহং, সেখানে অহং জ্ঞান ত হইতেই পারে না, সেখানে 'অহং-এর' স্থান কই? জগতের সাহিত্যেও ইহার প্রমাণ পাই। ইউরোপে এক সময়ে ধর্ম্মের নামে অনেক অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রটেষ্টাণ্ট এবং অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক মহাপুরুষ পুড়িয়া মরিয়াছেন, আনন্দে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তথাপি আপন আপন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করেন নাই। সে মহান্ ইতিহাস পাঠ করিলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু সে ইতিহাসে এমন একটি কথা পাই যাহা

* সাম্প্রদায়িক অর্থে এ শব্দ ব্যবহার করিলাম না।

† India asks—Who is Christ? এবং That Marvellous Mystery, The Trinity নামক প্রবন্ধদ্বয় দেখ।

ভারতের সাহিত্যে পাই না। সে কথাটি এই—সেই সব মহাপুরুষেরা যে, ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মচ্যুত হইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন তা নয়—আত্মস্বাধীনতার (Individual judgment-এর) নামে অস্বীকার করিয়াছিলেন। সে অসাধারণ বীরত্ব এবং মহত্বের মূলে আত্ম বা অহং দেখিতে পাই। হিন্দুর সাহিত্যে প্রহ্লাদের কথা, সেই রকমের কথা—সেই রকম বা তদপেক্ষা বীরত্ব এবং মহত্বের কথা। কিন্তু সে কথায় অহং বা আত্মের লেশমাত্র নাই। সে কথায় বিষ্ণু-বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুই অহং বা আত্মের প্রতিমূর্ত্তি—প্রহ্লাদে অহং বা আত্মের সম্পূর্ণ অভাব। প্রহ্লাদ আপনার নামে, আত্ম-স্বাধীনতার নামে, সকল যন্ত্রণা সহ্য করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব ধর্ম্ম ধরিয়া থাকেন নাই, বিষ্ণুর নামে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, শেষ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব ধর্ম্ম ধরিয়া ছিলেন। যেখানে বিষ্ণুই সব, সেখানে প্রহ্লাদ আবার কে? বিষ্ণু পুরাণে প্রহ্লাদচরিত পাঠ করিলেই একথা সত্য কি না বুঝিতে পারিবেন। এই জন্যই হিন্দুর সাহিত্যে, ধর্ম্মের ইতিহাসে মহত্ব এবং বীরত্বের কাহিনীতে অহং বা আত্মের নাম গন্ধও নাই—খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপের সাহিত্যে ধর্ম্মের ইতিহাসে মহত্ব এবং বীরত্বের কাহিনীতে অহং বা আত্ম বড়ই প্রবল। ভারতের সোহং ভারত এবং ইউরোপের মধ্যে এই অপূর্ব্ব প্রভেদ করিয়াছে, ভারতকে ইউরোপ অপেক্ষা এতই শ্রেষ্ঠ করিয়াছে। ভারতের সোহং ভারতের হিন্দুর বড়ই গৌরবের জিনিস। কিন্তু তা বলিয়া অভিমান করিও না। সোহং, কাহাকে বলে যদি বুঝিয়া থাক, তবে অভিমান করিতে পারিবেও না। অভিমান বা অহঙ্কার বিনষ্ট না হইলে কেহ ‘সোহং’-এর অধিকারী হয় না। আর ‘সোহং’-এর প্রকৃত অধিকারী না হইলে, কেহ প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানীও হয় না প্রকৃত ধার্ম্মিকও হয় না। এসকল কথা পরে আরো বুঝাইয়া বলিব। সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুর সূক্ষ্মতম ‘সোহং’-এর, অর্থ—প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান, প্রকৃত আত্মজ্ঞান,—সমস্তের সামঞ্জস্য, সমস্তের মহত্ব, সমস্তের একত্ব, অত্যুচ্চ বিশ্বব্যাপী কবিত্ব।

হিন্দুর সোহং বলিতেছে যে হিন্দুর ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্ম-দর্শী, ব্রহ্মভক্ত, ব্রহ্মাণ্ড-গ্রাহী, ব্রহ্মাণ্ডের কবি পৃথিবীতে আর কোথাও জন্মে নাই।

বঙ্গে ইংরেজাধিকার।

পলাশী যুদ্ধের পর হইতে বাঙ্গালায় ইংরেজদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল হয়। এই যুদ্ধের পর হইতেই বাঙ্গালার নবাব ইংরেজের পদানত হইয়া পড়েন। যে যুদ্ধ এক দল বিদেশীকে বণিক বেশ ছাড়াইয়া রাজবেশে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইয়াছে, তাহাতে বিজেতা আপনার লোকাতীত শূরত্ব বা অসাধারণ পরাক্রম দেখান নাই। দেওয়ীরের যুদ্ধে জয়ী হইয়া, প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহ মোগলের হস্ত হইতে মিবার রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। পরাক্রমশালী রণজিৎ সিংহ নওশেরার যুদ্ধে জয়শ্রী অধিকার করিয়া সিন্ধুনদের অপর পারে—আফগানের অধিকৃত পেশাবরে আপনার জয় পতাকা উড়াইয়া দিয়াছিলেন। ভারতের মহাশক্তিরূপিণী কর্ম্মদেবী আম্বেরের নিকটে কোতবদ্দীন ইবককে পরাজিত করিয়া, স্বরাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষত করিয়াছিলেন। বীরকেশরী শিবজী দক্ষিণাপথের যুদ্ধে মোগল সৈন্যের ক্ষমতা রোধ করিয়া, হিন্দুজয়ী মুসলমানের মধ্যে স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধেই বিজেতার বিজয়িনী শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়—বিজেতারা ঐ সকল যুদ্ধেই আপনাদের বীরত্ব ও ক্ষমতা বলে বিজয়লক্ষ্মী অধিকার করেন। ইতিহাসে এই সকল কথা অক্ষয় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে। কিন্তু যে পলাশীর যুদ্ধে হতভাগ্য সিরাজউদ্দোলার অধঃপতন হয়, মীরজাফর ইংরেজের নিকটে আত্ম বিক্রয় করেন, ব্যবসায়ী ব্রিটিশ কোম্পানি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সন্ধি বিগ্রহ ঘটিত রাজকার্য্যে অভিনিবিষ্ট হন, তাহাতে বিজেতা ইংরেজ আপনার বীরত্বের পরিচয় কিছুই দেন নাই। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" একথা পলাশী সম্বন্ধে খাটে না। অকৃতজ্ঞতায় এই যুদ্ধের উৎপত্তি—বিশ্বাসঘাতকতায় এই যুদ্ধের স্থিতি এবং আশ্রয় দাতা প্রতিপালকের প্রাণনাশের সহিত তাঁহার অতুল ধন সম্পত্তিতে অকৃতজ্ঞ আশ্রিতের লোভের পরিতর্পণ—এই যুদ্ধের পরিণাম। মহারাজ পুরু যদি বীরোচিত তেজস্বিতা ও পৌরব দেখাইতে না পারিতেন, তাহা হইলে সেকন্দর শাহের উদারতা ইতিহাসের বরণীয় হইত না। সিরাজের অকৃতজ্ঞ কর্ম্মচারীগণ যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করিতেন, তাহা হইলে পলাশীর যুদ্ধে লর্ড ক্লাইব বাঙ্গালায় ইংরেজের আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিতেন না।

ইংরেজ ইতিহাস লেখক ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বী সিরাজের চরিত্র বড় কুৎসিত ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। মার্শম্যান প্রভৃতির মুখে আমরা শুনিতে পাই সিরাজউদ্দৌলা বড় অত্যাচারী ও ক্রূরপ্রকৃতি ছিলেন, গর্ভিণীর গর্ভ বিদারণ করিয়া, আমোদিত হইতেন—ভাগীরথীতে জনপূর্ণ নৌকা ডুবাইয়া তামাসা দেখিতেন। সংক্ষেপে পৃথিবীতে যত প্রকার দুষ্প্রবৃত্তি ও পাপ আছে, সিরাজ তৎসমুদয়েরই অধিকারী ছিলেন। আপনাদের প্রতিন্দ্বীকে সাধারণের নিকট ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত করাই বোধ হয়, ইংরেজ ইতিহাস-লেখকের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে। আজ কাল কোন নৃশংস নরাধমের নাম করিতে হইলে প্রায়ই সিরাজউদ্দৌলার সহিত তুলনা হইয়া থাকে। কিন্তু সিরাজ প্রকৃতপক্ষে এইরূপ নরপশু ছিলেন কি না, তাহা অনেকে অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই। সিরাজউদ্দৌলা যখন তাঁহার মাতামহের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স আঠার বৎসর। এ বয়সে বুদ্ধির স্থিরতা বা দূরদর্শিতা জন্মে না। সুতরাং সিরাজ যে, কোন কোন অংশে অস্থির-বুদ্ধি ও অদূরদর্শী ছিলেন, তাহা এক প্রকার স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তরুণ বয়সে একটি বহুসমৃদ্ধ—বহু-জনাকীর্ণ রাজ্যের অধিকার পাইলে সহজেই রাজ্যাধিকারীর ক্ষমতাপ্রিয়তার বিকাশ হয়। সিরাজ যে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী পাইয়া উদ্ধত ও ক্ষমতাপ্রিয় হইয়াছিলেন, তাহাও আশ্চর্য্যের কথা নহে। আজ কাল সুসভ্য দেশেও এইরূপ ক্ষমতাপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে। জর্ম্মণির সম্রাট ও রুষিয়ার জার কিরূপ কঠোর ভাবে আপনাদের রাজশক্তির পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা অনেকেই জানেন। স্বদেশহিতৈষী আরাবি পাশা স্বার্থপর ইংরেজের ক্ষমতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে ইংলণ্ডের উদারনীতিক সম্প্রদায় তাঁহাকে কিরূপে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, তাহাত কাহা-রও অবিদিত নাই। এই সকল পরিণতবুদ্ধি দূরদর্শীকে কেহ ক্রূরপ্রকৃতি নর-শার্দ্দূল বলিয়া উল্লেখ করেন না। অথচ অপরিণতবুদ্ধি অদূরদর্শী সিরাজউদ্দৌলা উদ্ধত ভাবের পরিচয় দিয়াছেন বলিয়াই যে, সমুদয় পাপ-ভার তাঁহার স্কন্ধে সমর্পিত হইবে, সেই বা কোন্ কথা?

বাঙ্গালায় ইংরেজাধিকারের কথা কেবল চাতুরী, প্রবঞ্চনা ও অবাধ্যতায় পরিপূর্ণ। এই চাতুরীময়, প্রবঞ্চনাময় ও অবাধ্যতাময় কথার প্রসঙ্গে আমরা সিরাজ উদ্দৌলার পরিচয় পাই। এই পরিচয়ে সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রে

যত দোষ দেখা না যায়, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজের চরিত্রে ততোধিক দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সিরাজউদ্দোলা যখন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার, ইংরেজেরা কলিকাতায় তখন একদল সামান্য ব্যবসাদার। এই ব্যবসাদারের দল যে কোন প্রকারে হউক, নবাবের আদেশে তাচ্ছল্য দেখাইয়া—নবাবের মতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আপনাদের আধিপত্য স্থাপনে উদ্যত হন। ইঁহারা নবাবের অধিকারস্থ একজন অপরাধীকে আপনাদের আশ্রয়ে রাখেন, নবাব পুনঃ পুনঃ বলিয়া পাঠাইলেও তাহাকে ছাড়িয়া দেন না—আবার নবাবের বিনা অনুমতিতে আপনাদের দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। একদল বিদেশী ব্যবসায়ীর এইরূপ আস্পর্দ্ধা ও অনধিকারপ্রিয়তা রাজ্যাধিপতির অসহনীয়। লাহোর দরবারের একজন তেজস্বী সর্দ্দার বৃদ্ধ পিতার অপমানে উত্তেজিত হইয়া, অস্ত্র ধারণ করিলে, ইংরেজ চিরবন্ধু রণজিৎসিংহের শিশু পুত্রকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, অনায়াসে পঞ্জাব আত্মসাৎ করিতে পারেন, আর বাঙ্গালার নবাব একদল সামান্য ব্যবসায়ীর অবাধ্যতায় উত্তেজিত হইয়া, তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারিবেন না কেন, তাহা ইতিহাস নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ। সিরাজ তাঁহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে সসৈন্যে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে দুর্গ নির্ম্মাণ ও দুর্গের জীর্ণ সংস্কার সম্বন্ধে কলিকাতার গবর্ণর ড্রেক সাহেবের অবিনয় ও অবাধ্যতা-পূর্ণ পত্র পাইলেন। তাঁহার ক্রোধ প্রবল হইল। তিনি অবিলম্বে আপনার নির্দ্দিষ্ট পথ পরিবর্ত্তন করিয়া কাশীমবাজারে উপনীত হইলেন। ওয়াটস্ সাহেব এইস্থানে ইংরেজদিগের কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। নবাব তাঁহাকে তাঁহার স্বদেশীয়দিগের অবাধ্যতা ও অবিনয়ের জন্য মিষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। কিন্তু ওয়াটস্ ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতির সহিত তিনি সদ্‌ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিলেন না।* অপমান-ক্রুদ্ধ, নরঘাতক ও গর্ভিণীর গর্ভবিদারকের সমক্ষে ইংরেজেরা অক্ষত শরীরে রহিলেন। ইহার পাঁচদিন পরে নবাব সসৈন্যে কলিকাতার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এইরূপে নবাবের সহিত ইংরেজদিগের বিরোধ ঘটে, শেষে পলাশীর যুদ্ধে এই বিরোধের অবসান হয়। ঘটনার মূল সূত্র ধরিয়া বিবেচনা করিলে বোধ হইবে, ইংরেজদিগের অবাধ্যতা ও প্রাধান্যপ্রিয়তার জন্য এই বিরোধ ঘটিয়াছিল। ইংরেজেরা আপনাদের ক্ষমতা বদ্ধমূল করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন,

* Torrens, Empire in Asia, p. 27.

সিরাজউদ্দৌলা ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়াতে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান সময়েও দেখা যায়, ইংরেজ যে কোন কার্য্যের উদ্দেশ্যে যে কোনস্থানে গমন করেন, প্রায় সেই স্থানেই কোন না কোন প্রকারে আপনাদের ক্ষমতা স্থাপন করিয়া থাকেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল। ইংরেজ বাণিজ্য করিতে বাঙ্গালায় আসিয়া, ধীরে ধীরে দুর্গ নির্ম্মাণ ও তাহাতে সৈন্য নিবেশ করিতে থাকেন। এজন্য নবাবের প্রতি তাচ্ছল্য দেখাইতেও ত্রুটি করেন নাই। নবাব ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেও কাশীমবাজারে কলিকাতাস্থিত ইংরেজদিগের সতীর্থগণের সহিত সদ্‌ব্যবহার করিতে ভুলেন নাই। ইহা বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিকারী অষ্টাদশবর্ষীয় তরুণ যুবকের অল্প সুখ্যাতির কথা নহে।

সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে ইংরেজদিগের কুঠীতে ৫১৪ জন লোক ছিল। ইহাদের মধ্যে পর্ত্তুগীস ও ইউরেশীয়ের সংখ্যাই বেশী, ১৭৪ জন মাত্র ইংরেজ। যাহা হউক, গবর্ণর ড্রেক সাহেব ও সৈন্যদলের অধিনায়ক মিন্‌চিন্ সাহেব নবাবের আক্রমণে ভীত হইয়া, দুর্গ হইতে পলায়ন করিলেন।* কলিকাতা নবাবের অধিকৃত হইল। নবাব পর্ত্তুগীস্ ও ইউরেশীয়দিগকে ছাড়িয়া দিলেন। কেবল হলওয়েল প্রভৃতি ১৪৬ জন ইংরেজ তাঁহার বন্দী হইলেন। সিরাজ এই বন্দীদিগের প্রতি কোনরূপ কঠোরতা দেখান নাই। তিনি হলওয়েল প্রভৃতির বন্ধন মুক্ত করিয়া, তাঁহাদিগকে অনেক আশ্বাস দিলেন*। অপরিণত-বয়স্ক নবাবের এইরূপ ব্যবহার, তাঁহার শিষ্টতা ও সৌজন্যের দ্বিতীয় প্রমাণ। যে নরহত্যায় আমোদিত হয়, কেহ বিপদগ্রস্ত হইলে আহ্লাদে গলিয়া যায়, সে কখনও বন্দীকৃত শত্রুকে বন্ধন মুক্ত করিয়া, আশ্বাসিত করে না। হতভাগ্য সিরাজের অনেক দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু পতিত শত্রুর প্রতি এইরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শনে, তাঁহার যে গুণ-গরিমা প্রকাশ পাইয়াছে, ইতিহাস তাহার আদর করিতে বিমুখ হইবে না।

নবাব বন্দীভূত ১৪৬ জন ইংরেজকে আশ্বাস দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের দুরদৃষ্ট ঘুচিল না। যাঁহার হস্তে এই সকল বন্দীর রক্ষার ভার ছিল, তিনি সকলকে রাত্রিকালে একটি অতি সঙ্কীর্ণ গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। প্রচণ্ড নিদাঘের নিশীথে এইরূপ বায়ুশূন্য গৃহে আবদ্ধ থাকাতে অনেকের

* Empire in Asia, p. 27.

প্রাণ-বায়ুর অবসান হইতে লাগিল। ভয়ঙ্করী রাত্রি প্রভাত হইলে ১৪৬ জনের মধ্যে ২৩টি বিবর্ণ বিশীর্ণ কঙ্কাল মাত্রাবশিষ্ট জীবিত দেহ বাহিরে আসিল। নবাব রাত্রিকালে বিশ্রাম গৃহে নিদ্রা যাইতে ছিলেন; এই শোচনীয় অন্ধকূপ হত্যার বিষয় তাঁহার গোচর হয় নাই। সুতরাং এজন্য তাঁহাকে দায়ী করা যাইতে পারে না। প্রভাতে এবিষয় তাঁহার গোচর হইলে তিনি বন্দীরক্ষকগণকে সমুচিত শাস্তি দেন নাই, এইটি তাঁহার একমাত্র দোষ। এদোষ গোপন করিতে কেহই ইচ্ছা করে না। কিন্তু মহাপাপী হড্‌সনের পৈশাচিক ব্যবহারের সাফাই করিবার জন্য যাঁহারা ব্যগ্র হইয়া পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাঁহারাই আবার অন্ধকূপ-বিড়ম্বনার উল্লেখ করিয়া আসিয়াবাসীর নৃশংসতায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন,—ইহাই আশ্চর্য্যের আশ্চর্য্য, এবং বর্ত্তমান সভ্যনীতির রহস্য।

সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বের একশতবৎসর পরে ব্রিটিশ কোম্পানির সুশাসিত ভারতবর্ষে যখন সিপাহি হাঙ্গামা মিটিয়া গেল, তখন কাপ্তেন হডসন দিল্লীর তিন জন রাজকুমারকে যেরূপ নির্দ্দয়রূপে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা মনে হইলে আজ পর্য্যন্ত হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে। হুমায়ুনের সমাধি মন্দিরে প্রেতাত্মার আশ্রয় ভবনে এই রাজকুমারগণ আত্ম রক্ষণ করিতে ছিলেন। আপনাদের জীবন রক্ষা পাইবে, এই আশায় ইঁহারা সমাধি-মন্দির হইতে আপনাদের ইচ্ছায় বাহিরে আসিয়া ইংরেজ সেনানী হড্‌সনের নিকটে আত্মসমর্পণ করেন। ইঁহাদের মুখমণ্ডলে ভয়ের চিহ্ন ছিল না—আশঙ্কার কালিমা ছিল না—নিরাশার বিষণ্ণতা ছিলনা, ইঁহারা উপস্থিত হইয়া বিনয় ও নম্রতার সহিত হড্‌সনকে অভিবাদন করিলেন। হড্‌সনও প্রত্যভিবাদন করিলেন। হড্‌সন ইঁহাদিগকে সমাধি-মন্দির হইতে পাঁচ মাইল দূরে লইয়া গেলেন। শেষে আপনার সৈন্যদ্বারা ইঁহাদের আরোহিত গোরুর গাড়ী ঘেরিলেন, এবং ইঁহাদের গাত্র বস্ত্র খুলিয়া স্বহস্তে ইঁহাদিগকে গুলি করিয়া বধ করিলেন। কেবল এই হত্যাতেই ব্রিটিশ বীরপুরুষের ক্রোধ শান্ত হইল না। হড্‌সন্ নিহত সম্রাট পুত্রগণের অস্ত্র, অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ সংগ্রহ পূর্ব্বক দিল্লী নগরে যাইয়া মৃত দেহগুলি বাহিরে অনাবৃত স্থানে ফেলিয়া রাখিলেন *। সুসভ্য ব্রিটিশ রাজত্বে ব্রিটিশ বীরের নিকটে এইরূপে আশ্রয় প্রার্থীর আত্ম-সমর্পণের গৌরব রক্ষা পাইল, ব্রিটিশ বীর পুরুষ এইরূপে যুদ্ধ-বিরত শোচনীয় দশাগ্রস্ত নিরাশ্রয়

* Martin's Indian Empire, Vol II. p. 448.

জীবকে হত্যা করিয়া জগতের সমক্ষে আপনার অপূর্ব্ব বীরত্ব কীর্ত্তির পরিচয় দিলেন। আর সেই মহা পাপীর মহতী কীর্ত্তির গৌরব তাঁহার সজাতীয় পুণ্যাত্মাগণ উচ্চ কণ্ঠে গান করেন। হায়! জয়শ্রী! তুমি মনুষ্য হৃদয়কে কতই না মলিন করিতে পার।

কিন্তু ঠিক এই ওজনের না হৌক, এইরূপ দোষ, এই ভাবের দোষ,—বিচারে শৈথিল্য, পক্ষপাতের বিচারে সজাতি পাপিষ্ঠের অব্যাহতি, রাজার বা রাজপুরুষগণের দণ্ড-প্রণেতৃত্ব ভাবে বিষম বিড়ম্বনা—এরূপ ঘটনা কি নিত্য ঘটিতেছে না? এখনকার দিনে অনেক নরঘাতক ইংরেজকে ইংরেজের বিচারে অব্যাহতি পাইতে আমরা কি দেখিতেছি না? মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজত্বে উদারতা ও সমদর্শিতার উপাসক গ্লাডষ্টোন প্রভৃতির প্রাধান্য সময়ে এই সকল ঘটনা আমাদের চক্ষের উপর ঘটিতেছে। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যাঁহারা রাজনীতিবিশারদ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, রাজ্যশাসনে ও প্রজা পালনে যাঁহারা দূরদর্শী বলিয়া গৌরব লাভের প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহারা যাহা করিতে পারিতেছেন না, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একটি অপরিণত-বুদ্ধি তরুণ যুবক তাহা যে করিতে পারেন নাই, ইহা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু এজন্য নিরন্তর অকথ্য কলঙ্কের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহার পর-লোকগত আত্মার সন্তর্পণে প্রবৃত্ত হওয়া কতদূর ন্যায়সঙ্গত, বলিতে পারি না।

অন্ধকূপ হত্যার পর একজন ইংরেজ সেনানী মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় উপনীত হন। ইঁহারই অসাধারণ সাহস ও প্রতিভা অথবা ইঁহারই অসাধারণ চাতুরি ও ছলনায় বাঙ্গালায় ইংরেজের অধিকার বদ্ধমূল হয়।

কর্ণেল ক্লাইব মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া কলিকাতা উদ্ধার করেন। ইহার পর হুগলী অধিকৃত হয়। হুগলী সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল না। ইংরেজ কোম্পানি এই সুযোগে—নবাবের সৈন্য পহুঁছিতে না পঁহুছিতেই হুগলীর উপর গোলা গুলি চালাইতে আরম্ভ করেন। ইংরেজেরা উড়িয়া আসিয়া কিরূপে যুড়িয়া বসিতেছিলেন, তাহা ইহাতে বুঝা যাইবে। ইংরেজ কর্ত্তৃক হুগলী অধিকারের সংবাদে নবাব ক্রুদ্ধ হন। এস্থলে ক্রোধ না হওয়াই আশ্চর্য্য। একদল বিদেশীয়ের এইরূপ অত্যাচারে যে রাজ্যাধিপতি নীরবে থাকেন, তিনি প্রকৃত নরপতি নামের যোগ্য নহেন।—সিরাজউদ্দৌলা ক্রুদ্ধ হইয়া, আবার সৈন্য লইয়া, কলিকাতায় আসিলেন। কিন্তু এবার ইংরেজ-দিগের ক্ষতি হইল না। নবাবের সহিত ইংরেজেরা সন্ধিস্থাপন করিলেন।

এই সন্ধিতে তাঁহাদের অনেক লাভ হইল। তাঁহারা আপনাদের ইচ্ছামত কলিকাতা গড় খাই করিবার অধিকার পাইলেন। নবাব ও তাঁহার কর্ম্মচারী-গণ, তাঁহাদের যেসকল সম্পত্তি লইয়াছিলেন, তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইল। পূর্ব্ব ফর্ম্মাণ অনুসারে ইংরেজেরা যেসকল ক্ষমতা পাইয়াছিলেন, তাহা বজায় থাকিল। তাঁহারা বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায়, স্থলপথে ও জলপথে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদিগকে টাকা প্রস্তুত করিবার অধিকার দেওয়া হইল। নবাব ইংরেজদিগকে রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন, ইংরেজেরাও নবাবের সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন *। এই সন্ধিস্থাপনের দুই দিন পরে নবাব মুর্শিদাবাদের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

যে সন্ধিতে ইংরেজ পক্ষে এত লাভ হইল, ইংরেজেরা যদি সেই সন্ধির নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতেন, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু দুরন্ত লোভী আত্ম লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। নবাব ইংরেজ কোম্পানির নিরন্তর সুবিধা করিয়া দেওয়াতে ইংরেজেরা এখন তাঁহার সুখ্যাতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইংরেজের বক্তৃতায়—ইংরেজের চিঠিপত্রে, নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা এখন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলিয়া সম্মানিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু এই বন্ধুতা—এই সম্মানের উদ্দেশ্য—সর্ব্বস্ব গ্রহণ। বন্ধুর সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিতে না পারিলে, বন্ধুতার গৌরব রক্ষা পাইবে কেন? নবাব বহু বিস্তৃত জনপদের অধিকারী ও বহু সম্পত্তিশালী, সুতরাং তিনি ঘোর অত্যাচারী। এই অত্যা-চারের অপরাধে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করাই উচিত। উপস্থিত সময়ে ইহাই লর্ড ক্লাইবের প্রধান নীতি ছিল। ইংরেজাধিকারের পরবর্ত্তী ইতিহাসেও আমরা এই নীতির বিকাশ দেখিতে পাই। ধনসম্পত্তির মহিমায় ও দেব-বাঞ্ছনীয় কোহিনুরের বিমল বিভায় পবিত্র পঞ্চনদ ভারতে তুলনা রহিত, সুতরাং লাহোর দরবার উচ্ছৃঙ্খল ও শান্তির বিরোধী। এজন্য দলীপসিংহকে রাজ্যচ্যুত করাই সঙ্গত। বিপুল বৈভবে অযোধ্যা লক্ষ্মীর প্রিয় নিকেতন সুতরাং অযোধ্যা ঘোর অরাজকতাপূর্ণ; অযোধ্যার নবাবকে মুচিখোলায় নির্ব্বাসিত করা কর্ত্তব্য। দাহিরের দুহিতা সুন্দরী না হইলে সিন্ধুজয়ী কাসেমের শিরশ্ছেদ হইত না। হতভাগ্য ভারতের রাজ্যগুলি ধনসম্পত্তিতে

* Orme's Hindustan Vol. II. P. 135—136. Malleson's Life of Lord Clive. p. 189.

গৌরবান্বিত না হইলে রাজ্যাধিকারীরা দুর্দ্দশায় পড়িতেন না। এই লোভ-লালায়িত নীতির সূত্রপাত লর্ড ক্লাইব করিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী সময়ে লড ডালহৌসী তাহারই সম্প্রসারণ করিয়াছেন। বঙ্গে ইংরেজাধিকারের মূল গ্রন্থী পৌনঃপুনিক দশমিকের মত ভারতেতিহাসে কতবারই না দেখা দিয়াছে! আবার যে দেখিতে পাইব না, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব ?

জননী কোথায় ?

এ নহে ত সেই উদাস আকাশ
হু হু করে মন হেরিলে যাহায়।
এ নহে ত সেই চাঁদের কিরণ
উল্লাসের শূন্য ছায়া ভাসে যায় ॥
সে সমীর আজ নহে ত এ কভু
সে শুধু বহিত পরশিয়া কায়।
প্রাণী কণ্ঠরব নহে ত এ সেই
নিতান্ত একাকী হ'ত প্রাণ তায় ॥
সে শূন্য প্রকৃতি নাহি আজ আর
এ প্রাণ সঞ্চার ছিল না তাহায়।
যে দিকে নিরখি আজ সেই দিক
উথলি উথলি পড়ে মমতায় ॥
প্রবাসী সন্তানে হেরি প্রত্যাগত
প্রেম উছলিত অতুল বদনে,
বিরহিণী মাতা ডাকে যথা তায়
স্নেহ-বিগলিত মধুর বচনে ॥
আজি এ প্রকৃতি পরিপ্লুত হেরি
পুত্র-পরিচিত সেই মমতায়।
যেন এ জগত বক্ষ বিছাইয়া
ডাকিছে আমায় "আয় বাছা আয় ॥

এ দুর্জ্জেয় প্রেম ছিল যে কেবলি
মায়ের আমার হৃদয় ভাণ্ডারে।
কোথায় পাইলে তুমি সেই স্নেহ
বল একবার প্রকৃতি আমারে ॥
একাকী প্রবাসে চিরবাসী আমি
দাসত্বের গ্রন্থি কণ্ঠের বন্ধন।
হৃদয়ের মম জ্বলন্ত চিতায়
জ্ঞান ভস্মরাশি ছিল আচ্ছাদন ॥
স্নেহের ভাণ্ডারে দূর লক্ষ্য করি
চিরতৃষ্ণাতুর জীবন আমার।
সে স্নেহে কাঙ্গাল হইয়ে এখন
দগ্ধ জ্ঞানে ভস্ম হ'ত না সঞ্চার ॥
নিতান্ত অনাথ নিতান্ত নিস্পৃহ
নিতান্ত বিচ্ছিন্ন হয়েছিল প্রাণ।
ইহ জীবনের আশা অভিলাস
হয়েছিল যেন সব(ই) অবসান ॥
কর্ম্ম নামে যাহা ধর্ম্মের বিকাশ
প্রবৃত্তি তাহার ফুটিত না আর।
চিত্ত না বুঝিত জীবনের মম
ছিল কি না ছিল কোন ব্যবহার ॥

জাহ্নবীর তীরে জীর্ণ অট্টালিকা
প্রবাসে একাকী বসিয়া তাহায়।
খুলি বাতায়ন চাহিয়া আকাশে
ভাবিতাম শুধু জননী কোথায়?
কে দিবে বলিয়া জননী কোথায়
হেন মহাজ্ঞানী কে ছিল সংসারে।
কে দিবে সান্ত্বনা জননীর শোকে
এত সুধা কার জ্ঞানের ভাণ্ডারে॥
প্রাণান্ত করিয়ে যে সংসার তরে
সুদীর্ঘ জীবন করিব বহন।
যন্ত্রণায় মম হৃদয়ে তাহার
না মিলিল যদি সান্ত্বনা কখন,—
তবে কোন্ সুখে সর্ব্ব বিনিময়ে
করি একমাত্র দাসত্ব সম্বন্ধ?
এই মরুময় সুদীর্ঘ জীবন-
ভারে অবনত হইয়া কি ফল?
হতাশ হৃদয়ে উদাস নয়নে
সংসারের পানে করি দরশন।
এই ভাবনায় যুগল নয়নে
হইত কেবলি অশ্রু বরিষণ॥
আজ অকস্মাৎ কোথায় পাইলে
প্রকৃতি এ প্রেম মায়ের আমার।
তোমারি হৃদয়ে পরমাত্মা তাঁর
লুক্কায়িত কিনা বল একবার।
আজি যে আকাশ তাঁরি মায়া মত
বেষ্টিয়া আমার আছে চারিধার।
তাঁরি স্নেহ মত এ চাঁদের আলো
পড়িতেছে ঝরি হৃদয়ে আমার॥
এ মৃদুল বায় পরশিছে কায়
মায়ের আমার ব্যজনের প্রায়।

মায়ের আমার সম্ভাষণ মত
উথলিছে সুধা প্রাণীর ভাষায়॥
তুমি বিনা মা গো নহে কেহ আর
আজি এ প্রকৃতি তোমাতেই মাখা।
কাঁদিয়া উঠিছে বড়ই এ প্রাণ
সেই মুখখানি বারেক দেখা॥
অথবা তোমার বচন ঠেলিয়ে
প্রবাসী হইনু—সেই অভিমানে,
দরশন আর দিবে না জননী
এ তব নির্ম্মম অধম সন্তানে॥
বুঝি নাই আমি বুঝিতে পারিনি
কি ব্যথা সহিতে বিরহে আমার।
এস এইবার যাবত জীবন
বসিয়া রহিব ক্রোড়ে মা তোমার॥
লুকায়ে রহিবে কত দিন তুমি
আমি মা তোমার কোলের সন্তান।
জগত ব্যাপিনী এ তব ছায়ায়
ঢালিয়া রাখিব সতত এ প্রাণ॥
যখনি হেরিব এ নীল আকাশ
হেরিতে তোমায় তুলিব আঁখি।
এ চাঁদের আলো হেরিব যখনি
কাঁদিব তখনি তোমারে মা ডাকি॥
এ মৃদু মলয় বহিবে যখনি
প্রসারিব প্রাণ ধরিতে তোমায়।
প্রাণী কণ্ঠ এই যখনি শুনিব
তব কণ্ঠ ভাবি বুকে ল'ব তায়।
কোথায় রহিবে লুকায়ে জননি
এ জগত বুকে ঢালি দিয়-প্রাণ।
মাধুরী তাহার তন্ন তন্ন করি
করিবে কেবলি তোমার সন্ধান॥

ত্রিগুণ ও সৃষ্টি।

১। ত্রিগুণ কি বুঝা আবশ্যক।

হিন্দু শাস্ত্র বুঝিতে হইলে প্রথমেই ত্রিগুণ কি তাহা বুঝিতে হয়। শ্রুতি স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র, কাব্য, ইতিহাস—এমন কোন গ্রন্থই নাই যাহাতে ত্রিগুণের কিছু না কিছু উল্লেখ নাই। কিন্তু ত্রিগুণের গূঢ়ার্থ বুঝা নিতান্ত সহজ নহে। আর্য্য ঋষিগণ সংসারের কি চেতন, কি অচেতন, সমস্ত পদার্থের মূলে যে প্রকৃতির কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই প্রকৃতিই এই ত্রিগুণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহারা বলেন,—

'সত্ত্বং রজস্তম ইতি এবৈব প্রকৃতিঃ সদা।' সাংখ্যদর্শন।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সম্মিলিত এই তিন পদার্থই প্রকৃতি। ইহারাই জগতের বীজাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, এবং ইহা হইতেই জগতের যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি, পরিণতি ও বিনাশ হয়। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ এই ত্রিগুণের ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। আর্য্য ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন যে, ঐ যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকণা অনন্তের মধ্যে নগণ্য হইয়া—মনুষ্যের পদ-দলিত হইতেছে, আর এই যে সৃষ্টি রহস্যের অপূর্ব্বতম দৃষ্টান্ত মনুষ্য উহা পদ-দলিত করিতেছে, উভয়েই সেই ত্রিগুণের ক্রিয়া বিশেষ মাত্র। তাঁহারা এই ত্রিগুণের তত্ত্ব হইতেই সংসারের যাবতীয় তত্ত্ব নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এই তিন তত্ত্বের উপরেই তাঁহারা সমাজ-বিজ্ঞান, জীবন-বিজ্ঞান, নীতি-শাস্ত্র, ব্যবহার-শাস্ত্র প্রভৃতির ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহারই উপর তাঁহারা মুক্তি, পরকাল, পুনর্জ্জন্ম, আত্মার অমরত্ব, স্রষ্টা ঈশ্বর, পরমাণু শক্তি প্রভৃতি সমুদায়ই কল্পনা করিয়াছেন। জগতের পরিণতি, সমাজের পরিণতি, মানুষের পরিণতি সমস্তই তাঁহারা এই তিন তত্ত্ব হইতেই নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। আধুনিক দার্শনিকেরা মনোবিজ্ঞান বুঝিতে হইলে, তাহার মূল তত্ত্ব স্থির করিতে পারেন না; মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি, তাহাদের কি নীতি অনুসরণ করা উচিত, তাহার ভিত্তি অন্বেষণ করিয়া পান না; কিন্তু প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ এই ত্রিগুণের উপর মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত করিয়া কেমন সকল সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন। অতএব যখন হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের

সৃষ্টি রহস্যে ত্রিগুণ এত উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়াছে, যখন আর্য্য ঋষিগণ এই বিচিত্র জগৎ কার্য্য মধ্যে তিনটি মাত্র মূল তত্ত্ব উদ্ভেদ করিয়া তাহা হইতেই সমস্ত জাগতিক ব্যাপার বুঝাইয়া দিয়াছেন, তখন সে বিষয় আলোচনা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত, আমরা যতদূর পারি এই অদ্ভুত জগতের সৃষ্টি কৌশলের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করি। এক্ষণে ক্রমে ক্রমে যতই জগতের তত্ত্ব (laws) গুলি আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই এই রহস্য উদ্ভেদের জন্য পণ্ডিতগণ অধিকতর অগ্রসর হইতেছেন। আর্য্য ঋষিগণ কিরূপে অতি প্রাচীন কালেই সেই সমস্ত তত্ত্ব উদ্ভেদ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের উদ্ভাবিত তত্ত্বের মূলে কোনরূপ বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে কিনা, তাহাই দেখান আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

২। ত্রিগুণের প্রথম উল্লেখ কোথায়।

এই ত্রিগুণ কোন সময় হইতে আমাদের শাস্ত্রে প্রথম স্থান পাইয়াছে, তাহা বলা সহজ নহে। বেদে ইহার বিশেষরূপ উল্লেখ আছে কিনা জানি না। উপনিষদের এক স্থানে লিখিত আছে—

"অজা মেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানা স্বরূপাঃ।"

অর্থাৎ জগতের মূল লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ, সম্মিলিত এই তিন পদার্থ হইতেই এই বহু প্রজার উৎপন্ন হইয়াছে। পরবর্ত্তী দর্শন শাস্ত্রে পাওয়া যায়, যে রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণও যথাক্রমে উল্লিখিত তিন গুণ সম্পন্ন। সুতরাং যদি এই লোহিত শুক্ল ও কৃষ্ণ উল্লিখিত গুণের নামান্তর হয়, তবে উপনিষদেও এই ত্রিগুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদের পরেই দর্শনগুলির সৃষ্টি। এই সময়েই বোধ হয় ভারতে দর্শন এবং সম্ভবত বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হইয়াছিল। সুতরাং সৃষ্টি রহস্য উদ্ভেদের জন্য এই সময়েই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা হয়। সাংখ্যকার মহর্ষি কপিলই এই পথের প্রধান অগ্রণী। হিন্দু মাত্রেই তাঁহাকে সর্ব্বপ্রধান জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করেন। সকলেই জানেন "নাস্তি সাংখ্য সমং জ্ঞানং"; ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, আমিই "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।" ভাগবতে কপিল দেব, অবতার বিশেষ। শুধু তাহাই নহে নিরীশ্বর সাংখ্য বৌদ্ধদিগের মধ্যেও অত্যন্ত পূজনীয় ছিলেন। সাংখ্য দর্শনেই সৃষ্টি তত্ত্ব স্থিরীকৃত করিবার সময় এই ত্রিগুণের উল্লেখ হইয়াছে। এই ত্রিগুণের বিশেষ বিবরণ, ত্রিগুণ হইতে সৃষ্টি প্রক্রিয়া প্রভৃতি আমরা সাংখ্য হইতেই বিশেষরূপে জানিতে পারি।

দর্শনকারদিগের মধ্যে কপিল ব্যতীত এই ত্রিগুণের বিষয় স্পষ্ট করিয়া আর কেহই উল্লেখ করেন নাই। সেশ্বর সাংখ্য পতঞ্জলির উল্লেখ, কিছুই নহে বলিলেও চলে। বেদান্ত সূত্রে ইহার বিশেষ উল্লেখ নাই। ব্রহ্মের সৃষ্টি শক্তি মায়া বা অবিদ্যাকে ত্রিগুণাত্মিকা বলা হইয়াছে মাত্র। পঞ্চদশী প্রভৃতি পরবর্ত্তী বেদান্ত মত প্রতিপাদক গ্রন্থেও ইহার কতক বিবরণ পাওয়া যায় যাহা হউক কিন্তু পুরাণগুলিতে ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখ দেখা যায়। সকল পুরাণেই সৃষ্টি প্রক্রিয়া বুঝাইতে হয়। সুতরাং প্রায় সকল পুরাণেই উক্ত ত্রিবিধ গুণের ন্যূনাধিক পরিমাণ অবতারণা আছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভগবদ্গীতাতে ত্রিগুণের বিস্তারিত বিবরণ দেখা যায়। গীতার প্রায় দুই অধ্যায় ইহার ব্যাখ্যায় পূর্ণ। আমরা যথা সময়ে তাহার উল্লেখ করিব।

৩। সৃষ্টি বুঝাইতেই প্রধানত ত্রিগুণের অবতারণা।

পূর্ব্বে যত দূর উল্লিখিত হইল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যে প্রধানত সৃষ্টি রহস্য উদ্ভেদের জন্য এবং দ্বিতীয়ত এই পরিদৃশ্যমান জগতের গূঢ় তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবার জন্য হিন্দু দার্শনিকেরা এই ত্রিগুণের অবতারণা করিয়াছেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রের কোথাও সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্ভেদের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই। জগত বুঝাইতে গিয়া সৃষ্টি প্রক্রিয়া দেখাইতে গিয়া ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকার অধিক দূর যান নাই। তাঁহারা পরমাণু (atoms) ও অদৃষ্ট (বা অজ্ঞাত শক্তি ?) পর্য্যন্ত গিয়া তাহা হইতেই দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক (molecules of monad and diad atoms) প্রভৃতি কল্পনা করিয়া এ জগতের সৃষ্টি বুঝাইয়াছেন। এ বিষয়ে গৌতম ও কণাদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন অনেক পরিমাণে সৃষ্টি প্রক্রিয়া নির্দ্দেশ সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্য পরমাণু-বাদী (materialist) পণ্ডিতদিগের মতাবলম্বী। ইহারাও বলেন, পরমাণু হইতেই জগতের সৃষ্টি। পণ্ডিত হর্বার্ট স্পেন্সর এক স্থলে বলিয়াছেন, 'শুধু পরমাণু ও মাধ্যাকর্ষণ হইতেই এই সমগ্র জগতের সৃষ্টি কল্পনা করিতে পারি।' লাপ্লাস প্রমুখ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগেরও এইরূপ মত। ইঁহাদিগেরই মতন ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে পরমাণু ও অদৃষ্ট বা বিশেষ শক্তি হইতেই সমস্ত জগতের সৃষ্টি কল্পনা হইয়াছে। বেদান্তকার আরও কতকদূর গিয়াছেন। তিনি পরমাণু শক্তি প্রভৃতি সমুদায়ই সেই এক অনাদি কারণ হইতেই উৎপন্ন

করিয়াছেন। তাহার মতে পরব্রহ্মের অবিদ্যা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং তিনি এক প্রকার সমস্ত গোলযোগ মিটাইয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার ছাড়েন নাই—তিনি এই ব্রহ্মের অবিদ্যা, বা মায়াই ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়াছেন এবং তাহা হইতেই জগতের উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন। যাহা হউক মহর্ষি কপিল আশ্চর্য্য প্রতিভা বলে জগতের প্রকৃত আদি-কারণ মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি পরমাণু ও শক্তির কিরূপে উৎপত্তি হইল তাহাও কল্পনা করিয়াছেন। এবং এইরূপে সৃষ্টির মূলতত্ত্ব উদ্ভেদ করিতে গিয়া তিনি ত্রিগুণের অবতারণা করিয়াছেন। কপিলের পর সকলেই তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া ত্রিগুণের দ্বারা সৃষ্টি প্রণালী বুঝাইয়াছেন।

৪। সুতরাং ত্রিগুণ বুঝিতে হইলে সাংখ্যের সৃষ্টি প্রণালী বুঝা আবশ্যক। অতএব ত্রিগুণ বুঝিতে হইলে, প্রথমে সাঙ্খ্যমতে সৃষ্টি প্রণালী বুঝা উচিত। কিরূপে এই ত্রিগুণ হইতে মহর্ষি কপিল সৃষ্টি কল্পনা করিয়াছেন, তাহা দেখা কর্ত্তব্য। আমরা এস্থলে তাঁহার যুক্তির অবতারণা করিব। যে আশ্চর্য্য প্রতিভা জাগতিক ব্যাপার বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা এবং তাহার বিশ্লেষণ না করিয়াই কেবল (*a priori*) মূলানুসন্ধায়ী যুক্তি বলে * জগতের আদি কারণ স্থির করিয়া, তাহা হইতেই এই জগত কার্য্য বুঝাইয়াছেন, সেই অতুল্য প্রতিভাকে আমরা একবার দূর হইতে দেখিব।

* তত্ত্ব উদ্ভেদের জন্য পণ্ডিতেরা বরাবর দুইটিমাত্র পথ স্বীকার করেন। সংসারের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া অথবা পরীক্ষার দ্বারা তাহাদের সাধারণ ধর্ম্ম স্থির করিয়া এবং সেই সকলের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা-দিগকে শ্রেণীবিভাগ করিয়া এবং তৎপরে সেইশ্রেণীগুলিকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ-তর শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া ও তাহার সাধারণ ধর্ম্ম স্থির করিয়া ক্রমে বিশ্লেষণ বলে মূল তত্ত্ব যতদূর সম্ভব স্থির করাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের অভি-মত পন্থা; ইহা ব্যতীত, এরূপে ঘটনাগুলি পরীক্ষা না করিয়া, তাহাদের কার্য্য-কারণ অনুসন্ধান না করিয়া, তাহাদের ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা না করিয়া এবং তাহাদের শ্রেণী বিভাগ না করিয়া, কেবল কল্পনা বলে, কতকগুলিমাত্র ঘটনা দেখিয়া তাহাদের মূল তত্ত্ব উদ্ভেদ করিবার অন্য এক পথ আছে। ইহা আধু-নিক বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতদিগের বিশেষ অনুমোদিত নহে। এরূপ যুক্তি বলে কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া কোন সত্য স্থির করিতে যাওয়া, তাঁহারা প্রমাদকর মনে করেন। প্রথমোক্ত যুক্তিকে কার্য্যানুসন্ধানী (analytic or *a posteriori*) যুক্তি বলে, ইহাতে কার্য্য হইতে (analysis বা বিশ্লেষণ করা)

৫। গুণের অর্থ কি?

কিন্তু ত্রিগুণের কথা বলিবার আগে—সাংখ্যমতে সৃষ্টি কার্য্য দেখাইবার আগে, গুণের অর্থ কি, তাহা বুঝিয়া রাখা উচিত। গুণ বলিলে সচরাচর আমরা পদার্থের লক্ষণা, কখন বা তাহার অন্তর্গত শক্তি বুঝিয়া থাকি। ইংরাজিতে আমরা গুণকে quality বা attribute বলি। আমাদের মতে পদার্থ বিশেষ হইতে তাহার গুণের বিভিন্ন সত্তা নাই। অগ্নির দাহিকা শক্তি তাহার এক গুণ, জলের শীতলতা জলের এক গুণ। অগ্নি বা জল হইতে ঐ গুণগুলির স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ইঁহাকে আমরা সচরাচর পদার্থের ধর্ম্মও বলি। ন্যায় বা বৈশেষিক দর্শনে গুণ বলিলে এইরূপ বুঝায় বটে, কিন্তু ত্রিগুণ বলিলে গুণ পদ ঠিক সেরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। গুণ এস্থলে স্বতন্ত্র পদার্থ বাচক হইতেছে, প্রকৃতি হইতে ইহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই সত্য কিন্তু এই তিন পদার্থের সমবায়েই এই প্রকৃতি হইয়াছে। যদিও আমরা প্রকৃতি হইতে গুণত্রয়ের সতন্ত্র সত্তা দেখি না, তথাপি ইহা প্রকৃতির গুণ বা ধর্ম্মবাচক নহে। আমরা সংসারে ভৌতিক শক্তির (physical energy) স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখি না, পদার্থের উপর তাহাদের ক্রিয়া জনিত গতি মাত্র দেখিতে পাই, অথচ পদার্থ হইতে আমরা তাহার স্বতন্ত্র সত্তা বুঝিয়া থাকি। সেইরূপ প্রকৃতির এই তিন উপকরণও তিনটি স্বতন্ত্র দ্রব্য অথবা তিনটি স্বতন্ত্র শক্তি মাত্র। তাহারা আত্মাকে অভিভূত বা রজ্জুর (গুণের) ন্যায় আবদ্ধ করে বলিয়া, তাহাদিগকে শাস্ত্রকারগণ গুণ বলিয়াছেন। বিজ্ঞান ভিক্ষু সাংখ্যসারে বলিয়াছেন,—

"সত্ত্বাদিত্রয়স্য * * * পুরুষোপকরণত্বাৎ পুরুষবন্ধকত্বাচ্চ গুণশব্দে নোচ্যতে" তিনি সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যেও ঠিক এই রূপ কথা বলিয়াছেন।

ঘটনা সকলের মূল সত্য উদ্ভেদ করা হয়, দ্বিতীয়টি মূলানুসন্ধায়ী Synthetic or *a priori* যুক্তি। ইহাতে মূল কারণ অনুমান করিয়া ঘটনা বিশেষের তত্ত্ব স্থির deduction করা হয়। ইউরোপে বেকনের সময় হইতে কার্য্যানুসন্ধায়ী যুক্তির উপর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা অধিকতর আস্থা প্রদর্শন করেন। আমরাও পাশ্চাত্য শিক্ষাবলে মূলানুসন্ধায়ী যুক্তিকে অবজ্ঞা করিতে শিখিয়াছি। বোধ হয় আধুনিক জর্ম্মান দার্শনিক এবং কোন কোন বিলাতী পণ্ডিত ইহার আদর না করিলে, এতদিন ইহা ইউরোপের পণ্ডিত সমাজে স্থান পাইত না। যাহাহউক আর্য্য ঋষিগণ, এই মূলানুসন্ধায়ী যুক্তি দ্বারাই ত্রিগুণ কল্পনা করিয়াছেন। ইহাকে আর্য্য পণ্ডিতগণ সাংখ্য যুক্তি (সম্যক্ প্রকারে খ্যাত) বলিয়াছেন।

সে যাহা হউক সাংখ্যকার কিরূপে এই ত্রিগুণ হইতে সৃষ্টি প্রক্রিয়া দেখাইয়াছেন, এ স্থলে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিব। এই সৃষ্টি প্রক্রিয়া দেখাইবার সময় এবং অন্যান্য স্থানেও আমরা আধুনিক বিজ্ঞানবিদ পাঠকগণের সুবিধার জন্য সংস্কৃত কথার ইংরাজি প্রতিশব্দ * এবং প্রাচীন ভাবের ইংরাজী অনুবাদ লিখিয়া দিব। তৎপরে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি কল্পনা দেখাইয়া সাংখ্যকারের সৃষ্টি কল্পনার সহিত তাহার তুলনা করিব। তাহা হইলেই পাঠকগণ উভয়ের মধ্যে কতদূর সৌসাদৃশ্য আছে, বুঝিতে পারিবেন।

৬। ত্রিগুণের উৎপত্তি।

সাংখ্য-সারের পূর্ব্বভাগের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে,—

"যথা তম এবেদমগ্র আস তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং
প্রয়াত্যেতদ্বৈ রজসো রূপং, তদ্রজঃ খল্বীরিত
বিষমত্ব প্রয়াত্যেতদ্বৈ সত্ত্বস্য রূপমিতি।"

অর্থাৎ "শ্রুতিতে দেখা যায় যে শক্তির বৈষম্য (differentiation) হইতেই সত্ত্বাদি নাম হইয়াছে। সর্ব্বাগ্রে সৃষ্টির প্রথমে একমাত্র শক্তিই তমঃ রূপে বিদ্যমান ছিল। পরে বৈষম্য বশত সেই তমোগুণই রজঃরূপে পরিণত (transformed) হয়। অনন্তর সেই রজোগুণ আবার সত্ত্বগুণে পরিণত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা গেল যে কেবল বৈষম্য (differentiation) দ্বারাই একমাত্র শক্তি তিন প্রকার বিভিন্ন শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। শক্তির এরূপ পরিণাম (transformation) সম্ভব কি না, তাহা এস্থলে অধিক বুঝাইবার আবশ্যক নাই। যাঁহারা প্রাকৃত বিজ্ঞানের মূলসত্য (transformation of energy) বুঝেন, একমাত্র (physical energy) ভৌতিক শক্তি কি রূপে তাপ, তড়িত প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তি রূপে পরিণত হয় জানেন, তাঁহারা ইহার অর্থ বুঝিতে পারিবেন। আমরা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত সৃষ্টি প্রণালী দেখাইবার সময় এ কথার সবিশেষ আলোচনা করিব।

(*) আর্য্য ঋষিদিগের চিন্তা প্রণালীও আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তা প্রণালী একরূপ নহে। সংস্কৃতে যে কথা যে ভাব ব্যঞ্জক—ঠিক সেইরূপ ভাব ব্যঞ্জক কোন ইংরাজী কথা মিলে না। যেমন religion কথা ধর্ম্মের প্রতিপাদক হইলেও ধর্ম্ম বলিলে যাহা বুঝায় religion বলিলে তাহা বুঝায় না। বিজ্ঞান বা দর্শন সম্বন্ধীয় শব্দ অনুবাদ করা আরও কঠিন। সুতরাং আমাদের অনুবাদ যদি ঠিক না হয়—তবে আশা করি পাঠকগণ সে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

৭। সাংখ্য মতে সৃষ্টি ও প্রলয়।

তাহার পর যখন কাল বশে এই তিন শক্তি বৈষম্য বশত সমভাবে স্ফূর্ত্তি পাইয়া সমান রূপে কার্য্যকরী হইল, তখন তাহাদের পরস্পর সংঘাতে স্যাম্যাবস্থা (equilibration) স্থাপিত হইল। এইরূপে কার্য্য বন্ধ হইয়া প্রলয় বা সৃষ্টির প্রাক্কালীন অবস্থা উপস্থিত হইল। এই অবস্থাকে সাংখ্যকার মূল প্রকৃতি বলেন।

'সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ'। সাংখ্যদর্পণ ১।৬১।—

অর্থাৎ সত্ত, রজঃ ও তমঃ পদার্থের (শক্তির) সাম্যাবস্থা (যখন উক্ত দ্রব্যত্রয় সমভাবে বা অন্যূনাতিরিক্ত ভাবে অবস্থান করে তখনই) তাহাকে প্রকৃতি (বীজাবস্থা) বলে। বিজ্ঞানভিক্ষুও বলিয়াছেন,—

"সা (প্রকৃতিঃ) চ সাম্যাবস্থয়োপলক্ষিতং সত্ত্বাদিদ্রব্যত্রয়ং।"

অর্থাৎ সাম্যাবস্থোপলক্ষিত সত্ত্বাদিদ্রব্যত্রয়ই প্রকৃতি। এই অবস্থায় তিনটি গুণ সমান প্রবল থাকে, কেহই কাহাকে হীন করিতে পারে না, কোন'গুণই অন্য কোন গুণে পরিণত (tradsformed হয় না, তখন তাহাদের কোন কার্য্য থাকে না। কিন্তু সে অবস্থায়ও পরিণাম হইতে থাকে। পরিণতি কখন বন্দ থাকে না। কিন্তু তখন সদৃশ পরিণাম হয় মাত্র।

যাহা, হউক এ অবস্থা বরাবর থাকিতে পারে না। এই শক্তি সংগ্রামে গুণত্রয় বরাবর একভাবে (সাম্যাবস্থায়) থাকিতে পারে না। যখনই ন্যূনাধিক ভাব হয়, তখনই একটি শক্তি অন্য শক্তিতে পরিণত করায় বিসদৃশ পরিণাম হয়। তখন একটি প্রবল হইয়া অন্য শক্তিগুলিকে অভিভূত করে—তখন গতি আরম্ভ হয়—এই বিষম শক্তির ক্রিয়া হইতেই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়—এবং এই রূপে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে জগতের পরিণতি হইতে থাকে। প্রকৃতি পরিণত না হইয়া ক্ষণকালও থাকে না। সাংখ্যকার বলেন"না পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে।" এই অবস্থাকে প্রকৃতির বিকৃতি অবস্থা বলে। তাহার পর যখন পরিণামের চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হয়—,তখন আর এরূপ পরিণাম হয় না—ক্রমে কার্য্য বন্ধ হইয়া আইসে।. তখন পরিণাম দ্বারা সত্ত্ব গুণের আধিক্য গিয়া—তিন গুণই পরস্পর সমভাবে আসিলে আবার সাম্যাবস্থা (equilibration) স্থাপিত হয়। এবং ক্রমে ,তমোগুণের আধিক্য হইয়াই প্রলয় উপস্থিত হয়।

তৎপক্ষে আবার তমোগুণ হইতে বৈষম্য বশত রজঃ ও সত্ত্বের উৎপন্ন হইলে, ক্রমে তাহাদের সাম্যাবস্থা হইয়া সৃষ্টির প্রাক্‌কালীন অবস্থা উপস্থিত হয়—পরে আবার সাম্যাবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া সত্ত্বের আধিক্য হইলেই সৃষ্টি আরম্ভ হয়। এইরূপে সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয় বরাবর চলিয়া আসিতেছে। বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—

"কার্য্যসত্ত্বাদিবারণায়োপলক্ষিতান্তং।

সাম্যাবস্থাচ ন্যূনাধিক্যভাবেনসংহননাবস্থা অকার্য্যাবস্থেতি যাবৎ।"

"অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতির কার্য্যসত্ত্বাদি বন্ধ হইয়া যায়। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা এই যে তখন তাহাদের মধ্যে ন্যূনাধিক না থাকায় কেহ কাহাকে নষ্ট (বা অভিভূত) করিতে পারে না, এবং তখন কোন কার্য্যেরও উৎপত্তি হয় না।" সে যাহা হউক যদিও গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় তাহাদিগকে প্রকৃতি বলা হইয়াছে, তথাপি তাহাদের বৈষম্য বশত জগতের ব্যক্তাবস্থায়ও তাহাদিগকে প্রকৃতি বলা হয়। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন—

"বৈষম্যাবস্থায়ামপি প্রকৃতিত্বসিদ্ধয়ে উপলক্ষিতমিত্যুক্তং।" ইত্যাদি

সাংখ্যসার ১।৩।৩।

৮। সাংখ্যে পুরুষের কল্পনার কারণ কি?

এইরূপে যে প্রকৃতির পরিণাম হয় ইহার কারণ কি? প্রকৃতি জড়ভাবাপন্ন হইলেও কিরূপে তাহা হইতে এরূপ সুকৌশল সম্পন্ন জগতের সৃষ্টি হইল। একথার উত্তরে সাংখ্যকার পুরুষ নামক অন্য এক তত্ত্বের কল্পন করিয়াছেন *।

* মহর্ষি কপিল পরমাণুবাদী পণ্ডিতদিগের অগ্রণী হইয়াও কেন স্বতন্ত্র পুরুষের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন তাহা বুঝা সহজ নহে। কপিল প্রভৃতি আর্য্যঋষিগণের মতে আমাদের জীবাত্মা—পরমাত্মা বা পুরুষের অংশ স্বরূপ। তাঁহারা যোগের দ্বারাই কেবল আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেন এবং আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ বুঝিতে পারিতেন। এবং এইরূপে আত্মা হইতে অনাত্ম পদার্থের এবং সৎ হইতে অসৎ পদার্থের পার্থক্য অনুভব করিতে পারিতেন। আমাদের যোগ বল নাই আমরা একথার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিব না। সাংখ্যকার আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই কথা বলেন যে, "অস্তি হ্যাত্মা নাস্তিত্ব সাধনা ভাবাৎ"—আত্মা নাই এরূপ প্রমাণ নাই সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার্য্য। তিনি জড় পদার্থ অথবা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন মনকে আত্মা বলেন না "ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ।" সে যাহা হউক যদি কপিল যদিও স্বতন্ত্র পুরুষ অথবা পরমাত্মার কল্পনা করেন, তাই বলিয়া

এই পুরুষ—বলিতে গেলে,বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মের নামান্তর মাত্র। সাংখ্যকার বলেন, এই পুরুষ স্বয়ং নির্গুণ নিষ্ক্রিয় চৈতন্য স্বরূপ, অথচ অনন্ত শক্তির আধার। সান্নিধ্য বশতই প্রকৃতি কতক পরিমাণে সেই পুরুষের শক্তির অংশ প্রাপ্ত হয় মাত্র। সাংখ্যকার বলেন,

"তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ।"

যেমন অয়স্কান্ত মণির সান্নিধ্য বশত লৌহাদি চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় (অথচ তাহাতে মণির কোনরূপ বিকৃতি বা পরিবর্ত্তন হয় না) সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষের সন্নিধান বশত কার্য্যকরী হয় মাত্র। বিজ্ঞানভিক্ষুও বলিয়াছেন,—

"অত ঈশশ্চিদাত্মৈব জগতঃ সন্নিধানতঃ।
মণিবৎ প্রেরকত্বেন জড়ানাময়সামিব।"

অথবা যেরূপ ("নিরীচ্ছে সংস্থিতে রত্নে যথা লৌহ প্রবর্ত্ততে") অয়স্কান্ত মণি সান্নিধ্য বশত জড় লৌহের প্রবর্ত্তক বা প্রেরক হয় (তাহার শক্তি যেরূপ লৌহে সংক্রামিত হয়) সেইরূপ চিন্ময় (পুরুষ) আত্মাই সন্নিধান বশত জড়জগতের ঈশ্বর হয়েন।

অতএব দেখা গেল যে, যখন প্রলয়াবস্থায়, প্রকৃতিতে পরমাত্মার (পুরুষের) শক্তি সঞ্চরিত হয়—তখনই সাংখ্যকারের মতে, সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। যে তমোগুণ প্রবল হওয়ায় প্রলয় হইয়াছিল, তাহা পুরুষের শক্তির প্রভাবে ক্রমে রজঃ ও তৎপরে রজঃ হইতে সত্বগুণে পরিণত হয়—এবং এইরূপে ত্রিগুণের উৎপত্তি হইয়া তাহাদের সাম্যাবস্থা হইলে সৃষ্টির প্রাক্কালীন অবস্থা হয়। তৎপরে যখন পরমাত্মার শক্তির প্রভাবে সত্বগুণের বিশেষ আধিক্য হয়—তখনই সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। তাহার পর জগতের সৃষ্টি বা ব্যক্ত-

---

স্বতন্ত্র, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, স্রষ্টা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে স্বতন্ত্র স্রষ্টা ঈশ্বর অসিদ্ধ (ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ), কারণ তাহার প্রমাণ নাই, (প্রমাণাভাবাৎ) এবং সম্বন্ধ বিহীন করিয়া এরূপ অনুমান করাও যায় না (সম্বন্ধাভাবান্নানুমানং)। কপিল যে পুরুষ বা পরমাত্মার কথা বলেন তিনি স্রষ্টা ঈশ্বর নহেন,—তিনি প্রকৃতি ও সৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তাঁহার মতে স্রষ্টা ঈশ্বর যিনি তিনি পুরুষের সান্নিধ্যবশত সত্ব শক্তির আধিক্যে প্রকৃতি হইতে জাত। এই জন্য ঈশ্বর তিনি বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন "ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধি সিদ্ধা" এইরূপ জন্য ঈশ্বর সর্ব্ব-প্রমাণ সিদ্ধ ও সর্ব্ববাদী সম্মত। একথা পরে লিখিত হইবে।

প্রকার বিকাশের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে, তৎসমস্তই চিদ্বিভূতি নামে অভিহিত হয়। বিবিধ প্রকার জড়ের চিদ্বিভূতি, তাহাদের বিবিধ প্রকার জড়ত্ব। বিবিধ প্রকার উদ্ভিদ দেহের চিদ্বিভূতি তাহাদের বিবিধ প্রকার উদ্ভিদত্ব। বিবিধ প্রকার জীব দেহের চিদ্বিভূতি তাহাদের বিবিধ প্রকার জীবত্ব। তদ্ভিন্ন পরা, মায়া ও অবিদ্যার চিদ্বিভূতি উক্ত চেতন পদার্থ ত্রয়ের ত্রিবিধ প্রকার চৈতন্য। তবে পরা মায়া ও অবিদ্যা চিদ্বিভূতি লাভে সচৈতন্য অর্থাৎ স্ব স্ব দেহগত চৈতন্য সম্পন্ন। আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চ বা স্থূল পঞ্চ স্ব স্ব চিদ্বিভূতি লাভ করিয়াও সেরূপ দেহ চৈতন্য সম্পন্ন হইতে সক্ষম হয় নাই। এজন্য পরা মায়া ও অবিদ্যাতে যে চৈতন্য ময় চিদ্বিভূতির স্ফূর্ত্তি, সূক্ষ্ম বা স্থূল পঞ্চে তাহা অস্ফূর্ত্ত থাকাতে, স্ব স্ব চিদ্বিভূতি মাত্র সংযুক্ত হইয়া তাহারা জড় উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

এতদ্দ্বারা সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে পুরুষের স্বতন্ত্র স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা কোথাও নাই; পুরুষ নিত্য সস্ত্রীক, নিত্য প্রকৃতিগত। অষ্টবিধ প্রকৃতিই পুরুষের লীলাভূমি, কিন্তু পুরুষের মূল আধার একমাত্র পরাপ্রকৃতি। পরা-প্রকৃতি চিৎসত্তার বরাঙ্গ, রাজকলেবর। এই কলেবরে সমস্ত নির্ম্মল চিন্ময় মাধুর্য্যের নিরবচ্ছিন্ন সম্ভোগ হয়। মায়া প্রকৃতি এই চিৎসত্তার ঐশ্বর্য্যময় রাজসদন। এই রাজসদনে সমস্ত সাত্ত্বিক বিভূতির নিরবচ্ছিন্ন স্ফূর্ত্তি হয়। অবিদ্যা প্রকৃতি এই চিৎসত্তার সুদিব্য রাজধানী। এই রাজপাটে সমস্ত দিব্য বিভূতির নিরবচ্ছিন্ন আবির্ভাব হয়। সূক্ষ্ম ও স্থূল পঞ্চ এই চিৎসত্তার বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বটে। কিন্তু এই সাম্রাজ্যে পরার পরম চৈতন্য, মায়ার ঈশ্বর চৈতন্য বা অবিদ্যার দিব্য চৈতন্য সমস্তই অস্ফূর্ত্ত ও প্রচ্ছন্ন থাকে। এখানে কেবল নিরবচ্ছিন্ন জড়ত্বের বিকাশ। মায়ার ঐশী শক্তি ও অবিদ্যার দিব্য শক্তি এই জড়পুঞ্জ লইয়া নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে।

পরা প্রকৃতির পরম চৈতন্য—অনাবৃত সাক্ষাৎ চৈতন্য। এ জন্য এখানে নৈর্ম্মল্যের অবধি নাই। মায়া প্রকৃতি, পরাপ্রকৃতির অঙ্গের উপর তদুৎপন্ন একটি মলিন আবরণ মাত্র। মায়া প্রকৃতির ঈশ্বর চৈতন্য, পরা প্রকৃতিরই চৈতন্য, কেবল তদীয় দেহাবরণ বা স্তরের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে মাত্র। এ জন্য এখানে কথঞ্চিৎ মালিন্য আছে। অবিদ্যা প্রকৃতি, মায়া প্রকৃতির অঙ্গের উপর তদুৎপন্ন আর একটি মলিন আবরণ মাত্র। অবিদ্যা প্রকৃতির দিব্য চৈতন্য, পরা প্রকৃতিরই চৈতন্য; কেবল উপর্য্যুপরি

দুটি আবরণ বা স্তরের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে মাত্র। এজন্য এখানে মালিন্যাংশের অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য্য আছে। আকাশাদি সূক্ষ্মপঞ্চ, অবিদ্যা প্রকৃতির অঙ্গের উপর ক্রমশ এক একটি করিয়া পাঁচটি আবরণ পড়িয়া উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র। সূক্ষ্মপঞ্চে যে চৈতন্য প্রচ্ছন্ন, তাহাও পরাপ্রকৃতিরই চৈতন্য; কেবল উপর্য্যুপরি তিনটি হইতে সাতটি আবরণ বা স্তরের মধ্যে আবৃত মাত্র। স্থূলপঞ্চে সূক্ষ্মপঞ্চ পঞ্চীকৃত এবং তাহা সূক্ষ্মপঞ্চের উপর একটি সর্ব্বব্যাপী আবরণ মাত্র। তাহাতে যে চৈতন্য প্রচ্ছন্ন, তাহাও সেই আদিম পরাপ্রকৃতিরই চৈতন্য, কেবল উপর্য্যুপরি আটটি আবরণ বা স্তরের মধ্যে আবৃত মাত্র। এই সমস্ত আবরণের মধ্য দিয়া যে যে স্থলে চৈতন্য স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, তাহাকে ব্যক্ত বা আভাস চৈতন্য বলে; এবং এই সমস্ত আবরণের মধ্যে যে যে স্থলে চৈতন্য অস্ফূর্ত্ত রহিয়াছে, তাহাকে প্রচ্ছন্ন বা অব্যক্ত চৈতন্য বলে। অব্যক্তই থাকুন, আর ব্যক্তই থাকুন, চৈতন্য সর্ব্বত্র কূটস্থ রহিয়াছেন।

বর্ত্তমান জগতের প্রত্যেক পদার্থ পূর্ব্ব বর্ণিত অষ্টাবরণযুক্ত বা অষ্টস্তর-বিশিষ্ট। পদার্থ বা বস্তু মাত্রেরই মর্ম্মপ্রদেশ পরাপ্রকৃতি। তবে তদুপরি আটটি মলিন আবরণ পড়িয়া তাহাকে বর্ত্তমান আকারে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এ স্থলে এই প্রশ্নটি স্বতই উত্থিত হইতেছে, যে, উল্লিখিত অষ্টাবরণের উপরে সর্ব্বত্রই যে জীব চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি দেখা যাইতেছে, তাহা কিরূপে কোথা হইতে অভিব্যক্ত হইল? মায়ার আবরণের উপর ঈশ্বর চৈতন্য এবং অবিদ্যার আবরণের উপর দিব্য চৈতন্য ভাসমান। এই দিব্য চৈতন্যের মুখশ্রীর উপর, সৃষ্টির ক্রম বিকাশ সময়ে, আকাশাদি সূক্ষ্ম ও স্থূল পঞ্চের ছয়টি মলিন আবরণ যখন এক একটি করিয়া ক্রমান্বয়ে পড়িতে লাগিল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সেই চৈতন্যের মুখশ্রী ঢাকা পড়িয়া গেল। সে চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি অবিদ্যার দেহেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল। তৎপরে যে ছয়টি স্তর ব্যাপিয়া জড়ত্বের স্রোত প্রবহমান হইল, তদুপরি সে চৈতন্য ভাসমান হইতে অসমর্থ হওয়াতে বাহিরে তাহা অপ্রকট রহিল। তখন জীব চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি ছিল না। তখন জগৎ—জড়ময় জগৎ। তৎপরে মায়ার ঐশী শক্তি বলে ও অপূর্ব্ব কৌশলে এই অবিদ্যাগত চৈতন্য সূক্ষ্মপঞ্চের সত্ত্বাংশ-নির্ম্মিত পঞ্চ জ্ঞান দ্বার যোগে বহির্ম্মুখ হইয়া বাহ্য স্ফূর্ত্তি লাভ করিল। জীব চৈতন্য অবিদ্যার আবরণের উপর ভাসমান চৈতন্য মাত্র; তবে বর্ত্তমান অবস্থায় সে চৈতন্য

এখন আত্ম-বিস্মৃত। মূল অবিদ্যাগত যে চৈতন্য, তাহা এখন জীব চৈতন্যে নাই। দেহস্থ ও ইন্দ্রিয় দ্বার যোগে বহিস্থ হওয়াতে, তাহার পূর্ব্ব চৈতন্য আবৃত হইয়া গিয়াছে এবং সেই স্থলে নব চৈতন্যের উদয় হইয়াছে। এ জন্য মূল অবিদ্যার বিরাট দেহে যে সমস্ত অনুভূতি হইতেছে, এই দেহস্থ অবিদ্যাংশ তাহার কিছুই অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছে না। তবে ইন্দ্রিয় দ্বার যোগে বহিস্থ হওয়াতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া স্বতন্ত্র চৈতন্য অনুভব করিতেছে। ইহা মায়ার আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক কৌশলে, ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে কীট পতঙ্গ পক্ষী, গো অশ্ব, মনুষ্য, দেবতা স্ব স্ব প্রকৃতিগত মালিন্যের তারতম্যানুসারে উৎপন্ন হইয়া জীব চৈতন্য প্রবাহ রক্ষা করিতেছে।

কখন কখন শুভযোগ উপস্থিত হইলে, মায়ার অংশ বিশেষও মাতৃগর্ব্ভস্থ হইয়া মনুষ্য দেহ ধারণ করেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ 'মহাপুরুষ' কেহ কেহ বা 'অবতার' আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইহাঁদের মধ্যে যে চৈতন্য স্ফূর্ত্তি পায়, তাহা মায়ার আবরণের উপর ভাসমান চৈতন্য মাত্র, দেহস্থ প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় দ্বার যোগে বহিস্থ হইয়া পড়ে। সেই মায়ার আবরণের উপর অবশ্যই অবিদ্যার আবরণ আছে; কিন্তু তাহার মালিন্যের ঐকান্তিক স্বল্পতা প্রযুক্ত, স্বচ্ছ পদার্থের ন্যায়, সেই মায়াংশকে সে আর সম্পূর্ণরূপে আবরণ করে না, তাহাকে স্বাধীনভাবে স্বপ্রকাশ হইতে দেয়। সাধারণ জীব দেহেও এই মায়াংশ আছে, কিন্তু তাহা অবিদ্যার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত। এই মায়াংশ অবশ্যই বহির্ম্মুখ; সুতরাং মূল মায়ার বিরাট দেহে যে সমস্ত অনুভূতি হইতেছে, এই দেহস্থ মায়াংশ তাহার কিছুই অনুভব করিতে সক্ষম হয় না, তবে ইন্দ্রিয় দ্বার যোগে বহিস্থ হওয়াতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া স্বতন্ত্র চৈতন্য অনুভব করে মাত্র। অন্তরের ঐকান্তিক নৈর্ম্মল্য প্রযুক্ত এই সমস্ত মহানুভব দুর্ল্লভ জীবনে ঐশী শক্তি ও ঐশী প্রতিভা সকল স্বভাবতই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। ইহারা শুভযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সংসারের বিশেষ প্রয়োজন সাধনার্থ আবির্ভূত হইয়া জন সমাজের বিশেষ অভাব মোচন করিয়া যান।

মূল পরা প্রকৃতির অংশ বিশেষ কদাপি এরূপ ভাবে মাতৃ গর্ব্ভস্থ হইয়া মনুষ্য দেহ ধারণ করেন না। এই পরা প্রকৃতি অনুক্ষণ সৃষ্টির অতীত। ইনি "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং নগচ্ছতি।" ইনি তুরীয়ধাম পরিত্যাগ

করিয়া সৃষ্টির মধ্যে এক পদও গমন করেন না। সৃষ্টির মধ্যে, মায়ার ঐশী শক্তিই সর্ব্বে সর্ব্বা। পরা প্রকৃতির উপর ইহার শক্তি কোন মতেই পরিচালিত হইবার নহে। তবে পরা প্রকৃতি কি কোন মতেই সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশিত হয় না? হয়, তাহা অন্যপথে। মাতৃগর্ভস্থ জরায়ুর পথ দিয়া নহে। পরা প্রকৃতি নির্ম্মল আত্মাতে, সাধুর নির্ম্মল দেহে, নির্ম্মল ভক্তি যোগে, শুভযোগের সাহায্যে অভিব্যক্ত হন। ভক্তদেহেই পরা প্রকৃতির প্রকট হয়। সেই দেহেই পরা প্রকৃতির নির্ম্মল সুদুর্লভ চিদ্গত অবস্থার স্ফূর্ত্তি ও সম্ভোগ হয়। এই দেহ নিত্য চিন্ময় আনন্দময়, প্রেমময়। সেই দেহ জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি তিন অবস্থায় পরম চৈতন্যময়। এরূপ দেহ এই মায়ার দেশে নিতান্ত দুর্ল্লভ, কিন্তু এখানে তাহার ঐকান্তিক অভাব নাই। "ভক্ত দেহে নিত্য লীলা করেন গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥" এরূপ ভক্ত দেহ যে কোন গতিকেই হউক, এ সংসারে আছে, এবং কেবল ভাগ্যবান জনেরই চক্ষে পতিত হয়। এই দেহ এই সংসার ধামে থাকিয়াও তুরীয় ধামে নিত্য বিরাজিত, এবং তুরীয় লীলাতে অবিশ্রান্ত নিমগ্ন চিত্ত। যদি কশ্চিৎ জীব দেহে, এরূপ ভক্ত সাধুর দেহস্থ পরা প্রকৃতি (নির্ম্মল আত্মার) সংসর্গহেতু তদীয় কূটস্থ পরা প্রকৃতি শুভযোগে জাগ্রত হয় এবং যদি কশ্চিৎ সাধুসঙ্গে ও সৎপ্রসঙ্গে সেই জাগ্রত ভাব সেই জীবদেহে রক্ষিত, পোষিত ও বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে সময়ে সেই জাগ্রত ভাব পূর্ণাঙ্গ হইয়া জীবের জীবত্ব হরণ পূর্ব্বক সমগ্র দেহকে পরা প্রকৃতির লীলাভূমি করিয়া তুলে। এরূপ দেহে, শক্তি ও প্রতিভার স্ফূর্ত্তি নাও থাকিতে পারে। কেন না, এখানে সমস্ত শক্তি ও গুণের পরম সাম্যভাব বা নিগুর্ণভাব। এখানে কেবল শুদ্ধ মাধুর্য্যের নিরবচ্ছিন্ন স্ফূর্ত্তি ও সম্ভোগ। এরূপ দেহের মায়াংশ, অবিদ্যাংশ, একাদশ ইন্দ্রিয় যুক্ত সূক্ষ্মাংশ, সমস্তই পরা প্রকৃতিময়—সমস্তই পরম চৈতন্যময়। এই দেহের অভ্যন্তর ভাগ চিদভিমুখ স্রোতে পড়িয়া পরা প্রকৃতির চিদ্গত অবস্থায় প্রবেশ পূর্ব্বক কায়াস্থ থাকিয়াও মায়াপারে সৃষ্টির মধ্যে থাকিয়াও সৃষ্টির অতীত—সেই তুরীয় রাজ্যে বিচরণ করে। এইরূপে পরাপ্রকৃতি মায়ার চক্ষে ধূলি দিয়া মায়ার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন, এবং মায়ার সৃষ্টির মধ্যে তুরীয় স্রোত নিত্যকাল রক্ষা করেন হিরণ্য গর্ভ ব্রহ্মাও এরূপ দেহকে চিনিয়া উঠিতে পারেন না অথচ দেখিবামাত্র সম্ভ্রম করেন এবং নানা পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া বুঝিবার জন্য সচেষ্ট হন।

আমি অধম জীব। আমি স্বকীয় স্বরূপের মালিন্যের আধিক্য প্রযুক্ত অবিদ্যার অবস্থানুযায়ী চিদ্বিভূতি প্রাপ্ত হইয়া এই ভব সংসারে ইন্দ্রিয় সুখাসক্ত স্বার্থান্ধ, পরশ্রী-কাতর-অধম মনুষ্য। আর তুমি যদিও সেই জীব, তুমি স্বকীয় স্বরূপের মালিন্যের ন্যূনতা প্রযুক্ত অবিদ্যার অবস্থানুযায়ী চিদ্বিভূতি প্রাপ্ত হইয়া বিজিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী, পরশ্রীতুষ্ট, উত্তম মনুষ্য। তুমি আমি যদি ভাগ্যবলে পরা প্রকৃতি গত সাধু ভক্তের পবিত্র সংসর্গ ও কৃপা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদেরও অন্তঃশুদ্ধি হইয়া পরম নির্ম্মল অবস্থা লাভ হইতে পারে। অথবা যদি আমরা ঐশর্য্য সিদ্ধ সগুণ সাধকের অনুগত হইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের মায়িক ঐশ্বর্য্য বিশেষও লব্ধ হইতে পারে।

আর, ঐ সর্ব্বজন পূজ্য—সর্ব্বজনারাধ্য অতুল প্রতিভান্বিত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। ইহার স্বভাব সিদ্ধ ঈশিত্ব ও বশীত্ব ইহাকে জীব উপাধির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইনি স্বকীয় স্বরূপের নির্ম্মল স্বত্বাংশ প্রযুক্ত মায়া প্রকৃতির অবস্থাবিশেষ ও তদীয় চিদ্বিভূতি লাভ করিয়া মায়িক ঐশ্বর্য্য, শক্তি, প্রতিভা ও প্রভাবে ভূষিত মহাপুরুষ বা ঈশ্বরাবতার। ইনি স্বকীয় প্রভাবে জগৎ বিখ্যাত, সহস্র মুখে ইহার যশোগীত কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহাকে দেখিয়া লোকের মস্তক সম্ভ্রমে অবনত হইয়া যায়। ইহার ইচ্ছা, ইহার মত, ইহার ভাব—স্বতই সর্ব্বত্র জয়লাভ করে। কার্য্যসিদ্ধি দাসীর ন্যায় ইহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া থাকে। ইহার কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে লোকে স্বতই আকৃষ্ট হইয়া আইসে, এবং ইহার সাঙ্গোপাঙ্গ হইয়া ইহার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে থাকে। ইহার দৃষ্টি, ইহার বাক্য অসীম তেজে স্বপক্ষের উৎসাহ বর্দ্ধন করে এবং বিপক্ষের দুষ্ট বুদ্ধিকে পরাস্ত ও পর্য্যুদস্ত করে। ইনি স্বভাবত দুষ্ট জনের দমনকর্ত্তা এবং শিষ্টজনের প্রতিপালক। সমস্ত দুষ্টজন ইহাকে কালান্তক যমের ন্যায় দর্শন করে এবং সমস্ত শিষ্টজন ইহাকে পরমসুহৃদ ও সহায় বলিয়া স্বতই মনে করিয়া থাকে। ইহার নামে সমাজের অসুর বৃন্দ কম্পিত ও সন্ত্রস্ত হয় এবং সমাজের বৃন্দারক বৃন্দ আশ্বস্ত, প্রবোধিত ও উৎসাহান্বিত হন। যে সময়ে একপ ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, তৎকালে সামাজিক শাসন ধর্ম্মানুগত এবং আসুরিক মত ও আচার ব্যবহার সকল লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া লুক্কায়িত হয় এবং অসুরেরা সমাজের উচ্চস্থানে তিষ্ঠিতে না পারিয়া অধঃস্থানে (পাতালপুরী) আশ্রয় করে এবং দেবতারা,

সমাজের উচ্চস্থানে (স্বর্গপুরে) রাজত্ব করেন। ইহার প্রভাবে পাপ নিস্তেজ এবং পুণ্য প্রভাবান্বিত হয়। এরূপ ব্যক্তি সংসারের শ্রী, জনসমাজের শ্রী, ও মানবকুলের গৌরব। ইহাঁরা স্বকীয় শক্তিতে ভূভার-ধারণ-ক্ষম এবং পাপ ভারাক্রান্ত পৃথিবীর পাপ-ভার-হরণ-ক্ষম। এরূপ ব্যক্তি যদি ভাগ্যবলে পর প্রকৃতিগত সাধু ভক্তের পবিত্র সংসর্গ ও কৃপা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে নির্ম্মল অবস্থা লাভ করিয়া যেমন একদিকে যুগ ধর্ম্ম (সামাজিক ধর্ম্ম) সংস্থাপন করিতে সমর্থ হন, তেমনি অপর দিকে নির্ম্মল ধর্ম্মের (নিজ ধর্ম্মের) স্রোত, অধিকারী বিশেষের মধ্যে প্রবহমান রাখিতে পারেন। অথবা যদি ইনি ঐশ্বর্য্য-সিদ্ধ সগুণ সাধকের অনুগত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে, ইনি মায়ার গুণময় অষ্টৈশ্বর্য্যে ভূষিত এবং তদীয় বিরাট্ দেহস্থ চৈতন্যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া অশেষ বিধ আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বলে জন সমাজকে চমকিত করিয়া, অত্যাশ্চর্য্য ভাবে যুগধর্ম্ম সংস্থাপন ও ইচ্ছামত অন্যান্য দুষ্কর কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হন।

আর ঐ পরম ভক্ত সাধু—যদিও আজিও জীব উপাধিতে আবরিত হইয়া আছেন, কিন্তু ইনি স্বকীয় স্বরূপের পরম নৈর্ম্মল্য প্রযুক্ত পরা প্রকৃতির নির্ম্মল চিদ্গত অবস্থা অধিকার করিয়া নিত্য চিন্ময়, নিত্য আনন্দ ময়, নিত্য প্রেমময়; জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে সহজ স্ফূর্ত্তি ও পরম চৈতন্য লাভ করিয়া সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বরূপ। এই দেহের মধ্যে আশ্চর্য্য যুগল মিলন; ভক্ত ও ভগবানের একত্র সমাবেশ; প্রেম ভক্তির নিত্য স্রোত এবং সেই স্রোতে ভগবৎ লীলার অকারণ নিত্য সংঘটনা; অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ, বাহিরে শ্রীরাধা; এই দেহে প্রেমভক্তির বিমল বন্ধনে চৈতন্য নিত্য বদ্ধ। এই দেহের মুখশ্রীতে ভক্তরূপ ও ভগবৎরূপ একত্রে বিরাজিত,—অরূপের রূপ এখানে বিকশিত, ইহাকে জগৎ চেনে না, জানে না; ইহার দীন হীন সহজ ভাব দেখিয়া সকলে ইহাকে অতি তুচ্ছ সামান্য ব্যক্তি মনে করে। ইহাতে এমন কোন ঐশ্বর্য্য নাই, যে লোকে ইহাকে পূজা করিবে, এমন কোন আড়ম্বর নাই, যে জগৎ ইহাকে দেখিয়া চমকিত হইবে, এমন কোন শক্তি সামর্থ্য নাই, যে লোকে সম্ভ্রান্ত হইবে। এখানে অষ্টৈশ্বর্য্যের স্ফূর্ত্তি নাই, এখানে তাহা শুদ্ধ মাধুর্য্যের মধ্যে আত্ম হারা হইয়াছে। ইহার শাপ গালি দিবারও শক্তি নাই। ইহাকে অপমান করিলে অনায়াসে করা যায়; ইহাকে নির্যাতন করিলে, কেহ বাধা দিবার নাই। যদি কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি ইহাকে চিনিতে পারেন, তিনি সর্ব্বস্ব পণে ইহার পবিত্র সঙ্গ ক্রয় করিয়া, সহচর অনুচর হইয়া, ইহাকে যত্ন ও সেবা করিয়া থাকেন। ইহারই সংসর্গে তাঁহার অন্তর্দ্দেশ প্রকাশিত হয়, এবং প্রাণের মধ্যে অপূর্ব্ব প্রেমের স্রোত প্রবহমান হয়। ইহাকে যত্ন ও শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া, সেই অনুগত সাধক ক্রমেই দেখিতে পান, যে, ইনিই তাঁহার অন্তরের আলোক, ইনিই তাঁহার অন্তরের স্ফূর্ত্তি ও চৈতন্য।

বিবাহ বিভ্রাট*

বা

শিক্ষা বিভ্রাট।

প্রথমেই বলা উচিত, যে পুস্তকের নামকরণে ভুল হইয়াছে, ইহা এক প্রকাণ্ড দোষ। এই ভুলে অনেকের মূল কথা সম্বন্ধেও ভ্রম জন্মিতে পারে, এবং জন্মিয়াছে। পুস্তকে যাহা দেখান হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক "বিবাহ-বিভ্রাট" নহে; আমি তাহাতে "শিক্ষা বিভ্রাটই" দেখিতে পাই। সেই জন্য বলিতেছি নামকরণে ভুল হইয়াছে, সুস্পষ্টাক্ষরে পুস্তকের নাম দেওয়া উচিত ছিল—"শিক্ষা বিভ্রাট।"

বাস্তবিক বিবাহ ব্যাপার উপলক্ষ মাত্র করিয়া, অধুনাতন শিক্ষার সমালোচনাই গ্রন্থকর্ত্তা করিয়াছেন। গ্রন্থের গল্পাংশের সার সংগ্রহ করিলেই, ইহা বুঝিতে পারা যায়। গল্পটি এই,—

নন্দলাল নামক একটি বালক 'এণ্ট্রান্স পাস' করিয়া কালেজে এল-এ, পড়িতেছে; সুতরাং পূরা ইংরাজ হইবার কামনা তাহার মনে বিলক্ষণরূপেই প্রবলা। নন্দলাল মনের মত সঙ্গী খুঁজিয়া লইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং বিলাসিনী কারফরমা নাম্নী "শিক্ষিতা" যুবতী, মিষ্টার সিং নামক বিলাত প্রত্যাগত 'পূর্ণ পুরুষ' প্রভৃতির সংসর্গে এবং সহবাসেই নন্দলাল স্বীয় জ্ঞান পরিধি ও সুখ পরিধি বর্দ্ধিত করিতেছিলেন।

পুত্রের শিক্ষাগৌরবে, নন্দলালের পিতাও গর্ব্বিত। ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইতে এবং সংসার প্রতিপালন করিতে নন্দলালের পিতা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইচ্ছা, যে বিবাহ-বাজারে উচ্চদরে ছেলের পাস বেচিয়া তিনি বধূমুখ দর্শন করিবেন এবং ঋণদায়েও সেই সঙ্গে মুক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ সঙ্গতি করিয়া লইবেন।

ক্রমে নন্দলালের বিবাহের প্রস্তাব স্থির হইল। শেষে বিবাহও হইল। বিবাহের রাত্রিতেই নন্দলাল টাকাগুলি হস্তগত করিয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। "শিক্ষিত" বন্ধুদের সহিত আগে হইতেই ষড়যন্ত্র করা ছিল, ইহা বলাই বাহুল্য।

নন্দলালের পিতা হাওড়া ষ্টেশন হইতে ছেলেকে ফিরাইয়া আনিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ছেলে পলাইল, টাকাগুলিও হাতছাড়া হইল।

গল্পত এই; ইহার উপর পত্র পুষ্প ফল যেমন থাকিতে হয়, তাহা আছে। এখন অনায়াসেই বুঝা যাইবে যে নাটকীয় পাত্র পাত্রীগণের চরিত্র অঙ্কনের জন্য বিবাহ-সূত্রে এই গল্প গ্রথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে কেবল সমাবেশের সুবিধার জন্য। পাত্র পাত্রীগণের স্বভাব চরিত্র যেরূপ, তাহাই এই বিবাহ

---

* বিবাহ বিভ্রাট। (সামাজিক নাট্যলীলা)—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রণীত। মূল্য।০ চারি আনা।

ব্যাপারে প্রকটিত হইয়াছে; বিবাহ উপলক্ষে তাহাদের স্বভাব চরিত্র নূতন করিয়া গঠিত হয় নাই। এ বিবাহ না উপস্থিত হইলেও যাহার যেমন চরিত্র তেমনই থাকিত। সেই জন্যই বলিতেছি যে, উপস্থিত বিভ্রাট যদিও বিবাহ উপলক্ষেই ঘটিয়াছে। কিন্তু পুস্তকখানিতে আগাগোড়া শিক্ষা বিভ্রাটেরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাহাই এইবার দেখাইব।

এ নাটকের প্রধান কৃতিত্ব এই কয় জনের,—মিষ্টার সিং, নন্দলাল, বিলাসিনী; গোপীনাথ এবং ঝী। বাকি যাহারা আছে, তাহাদের প্রয়োজন কেবল পৃষ্ঠ পূরণার্থে। মূল কথা, ঐ কয় জনের চরিত্র লইয়া। কি ভাবে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে, দেখা যাউক। কিন্তু আরও দুই চারি কথা এইখানে বলিয়া রাখিতে হইবে।

খৃষ্টান ইংরেজ আর হিন্দু বাঙ্গালী এক জাতীয় মনুষ্য নহে; ইংরেজী সমাজ এবং আমাদের সমাজ ভিন্ন ভিন্ন মূলে প্রতিষ্ঠিত, ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে সংগঠিত; সংক্ষেপে বলা যাউক, ইংরেজী রুচি এবং আমাদের রুচি, ইংরেজী আকাঙ্ক্ষা এবং আমাদের আকাঙ্ক্ষা,—অধিক কি,—ইংরেজের মন এবং আমাদের মন নানা রকমে পৃথক্ ভাবাপন্ন। এ কথাগুলি সর্ব্ববাদী সম্মত কি না, ঠিক বলা যায় না; কিন্তু সর্ব্ববাদী সম্মত হউক আর না হউক, এ কথাগুলি বলা আমি আবশ্যক বোধ করি। কারণ, অনেককেই দেখিতে পাই যে, তাঁহারা মুখে এই পার্থক্য স্বীকার করেন বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদের আচরণ ঠিক বিপরীত। এখন অসঙ্কোচে বলা যায়, যে সাধারণত "শিক্ষিত" বাঙ্গালী এক প্রকার "কাঁটালের আমসত্ব"।

যে ব্যক্তি যে সমাজভুক্ত, তাহাকে সেই সমাজের উপযুক্ত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এখন, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের উদ্দেশ্যই যদি ভিন্ন ভিন্নরূপ হইল, তবে শিক্ষার প্রণালীও আবশ্যই ভিন্নরূপ হইবে, শিক্ষার ফলও ভিন্নরূপ হইবে। এ কথা নিয়তই আমাদের মনে থাকা উচিত, কিন্তু থাকে না, এই দুঃখ। থাকে না, এইজন্য বলিতেছি যে, এখনকার সকলেরই ঝোঁক ইংরেজী শিক্ষা এবং ইংরেজী প্রণালীর শিক্ষার উপর। ইহাতে দুইটি ফল হাতে হাতে হইতেছে, এক, আমাদের জাতীয় শিক্ষার অনাদর, সুতরাং আমাদের সমাজের ধ্বংস মুখে অবনতি; অপর, বাঙ্গালী ভিত্তির উপর ইংরেজী সমাজের পত্তন, সুতরাং এক বিকৃত পদার্থের উৎপত্তি; তাহাকেই আমি কাঁটালের আমসত্ব বলিতেছি।

"বিবাহ বিভ্রাট" পুস্তকে এই তত্ত্বই সতেজে উদাহৃত হইয়াছে; এবং এই পুস্তকের প্রধান কৃতি বলিয়া উপরে যাহাদের পরিচয় দিয়াছি, তাহাদের চরিত্র অঙ্কন করিয়া, বিকৃত শিক্ষার বিকৃত ফলের এক প্রকার ক্রম নির্ণয় করা হইয়াছে।

Boiling point অর্থাৎ টগ্ বগ্-ফুটন্ত ইংরেজী শিক্ষা পাইলে বাঙ্গালি-যাহা হয়, মিষ্টার সিং তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নন্দলালের চরিত্র চিত্রে ঐ শিক্ষার গতি ও বেগ বুঝা যায়; বাধা বিঘ্ন না পাইলে সকল নন্দলালই ক্রমে মিষ্টার সিংহে পরিণত হইয়া উঠে। যেটি

অহা হইতে পারে না, বাধায় ব্যাহত, বিঘ্নে রুদ্ধগতি হইয়া যায়, সেও এক বিকট জীব হইয়া উঠে।

অথচ এই কুশিক্ষাই এখন দেশ মধ্যে বহুল প্রচার এবং প্রবল। যাহার যত নিকট সম্বন্ধ, সে সেই পরিমাণ বেগে এই শিক্ষা-তরঙ্গের দ্বারা আহত। কাহারই পরিত্রাণ নাই। সাক্ষী, নন্দলালের পিতা গোপীনাথ সরকার; বেচারা ইংরেজী শিক্ষা না পাইয়াও ছেলের "পাশের" ধাক্কায় হিন্দুয়ানি ভুলিয়া গিয়াছে, অথবা ভুলিতে বসিয়াছে।

অন্তঃপুরেও ঢেউ লাগিয়াছে। এই কুশিক্ষার কত আদর, কত গৌরব, তাহা গোপীনাথের স্ত্রী "গিন্নীর" কথাতে গ্রন্থকার দেখাইয়া দিয়াছেন। ছেলের বিবাহে গোপীনাথ যে টাকা পাইবেন স্থির হইল, তাহা হইতে দেনা শোধ করিলে বিশেষ কিছু থাকে না, গোপীনাথ এই ভাবনা ভাবিতেছেন; সেই সময়ে গিন্নীর সঙ্গে, তাঁহার কথোপকথন যে প্রকার হইল, তাহা মনের মধ্যে যত্ন পূর্ব্বক ধারণা করিবার উপযুক্ত। গোপীনাথ বলিলেন—

"গিন্নি! এ যে দিয়ে থুয়ে কিছু থাকে, এমন তো বোধ হয় না?

গিন্নী। হু হুঁ "গুরুর কথা না শোন কাণে—প্রাণ যাবে তোমার হ্যাঁচ্কা টানে;" আমি তো বলেছিলুম, অত কমে রাজি হইওনা; নন্দলাল কি আমার চার হাজারের! কর্ত্তাপনা করা অমন মেনীমুখোর কায নয়।

গোপী। কি জান, এই দিতেই তাদের সর্ব্বনাশ হবে।

গিন্নী। তাদের সর্ব্বনাশ হ'ল তো আমার কি! আহা, কি আমার সাত পুরুষের কুটুম গো! নন্দলালের পায়ে মেয়ে দেবে, তাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হ'য়ে যাবে, এতে পোড়ার মুখো মিন্সের টাকা খরচ কোত্তে হাতে আগুণ লেগে যায়! আর সে মাগীই বা কেমন! মেয়ের মা—চোখ্খাকীর জামাইকে দিতে চোখ টাটায়, গায়ে গহনা টহনা নেই—বেচুক না।

গোপী। আমি একটা ঠাউরে আছি, আগে সব ঠিক হ'য়ে যাগ না, নন্দকে আড়ালে শিখিয়ে দেব এখন—সম্প্রদানের সময় একটা কোট ক'রে বসবে।

গিন্নী। আচ্ছা, এবার তুমি কোচ্ছ কর—আমি আর হাত দেব না, কিন্তু বছরের ভেতর বৌটোর যদি ভাল মন্দ হয়—নন্দর তদ্দিনে পাশ বাড়বে—দেখ দিখিন—তখন ছেলের ফের বে দিয়ে, আমি দোতালা বাড়ী, আর নিজের গা ভরা গহনা কোত্তে পারি কি না!"

হিন্দু কুলবধূর কথা শোন। অর্থ, অর্থ, অর্থ বৈ আর চিন্তা নাই, আর কথা নাই। নববধূটি মরিয়া যাউক, ছেলের আবার বিবাহ হইবে, আবার বেশি বেশি টাকা ঘরে আসিবে! কি ভয়ানক ব্যাপার! আর এই ধন লালসার মূল নন্দলালের সেই অপূর্ব্ব শিক্ষাতে নিহিত। "নন্দর তদ্দিনে পাশ বাড়বে।" পঞ্জিকাতে লেখা থাকে, কলিতে অন্নগত প্রাণ; আরও এক কথা লিখিয়া রাখিতে হয়—আধুনিক শিক্ষা প্রভাবে বঙ্গদেশে "পাশ" গত সর্ব্বস্ব!

শিক্ষার পরোক্ষ বা গৌণ ফলে হিন্দুর অন্তঃপুর কলুষিত হইতেছে,

তাহাতে উন্নতিশীল সংস্কারক দলের চক্ষু ফুটা দূরে থাকুক, মহিলাগণকে যত্নসহকারে এই শিক্ষায় শিক্ষিতা করিবার জন্যই ইঁহাদের যত্ন। যত্ন করিতে হয় করুন, কিন্তু ফল বিষয়ে আর অন্ধ থাকিবার যো নাই, চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া ভবিষ্য পট দেখাইবার উদ্দেশেই গ্রন্থকার বিলাসিনী কারফরমাকে চিত্রিত করিয়াছেন।

"বিবাহ বিভ্রাটে"র অভিনয়ে "ঝী" বড় প্রতিপত্তিশালিনী। সকল চক্ষুই ঝীর উপর সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, সকল কর্ণই ঝীর বাক্যামৃত পান করিবার জন্য সদা লালায়িত। ইহা হইবারই কথা। একা ঝী এক দিকে, নাটকের অন্যান্য প্রধান পাত্র পাত্রীগুলি সকলে মিলিয়া অপর দিকে। যদি মিষ্টার সিংহের শিক্ষা, বিলাসিনীর শিক্ষা, নন্দলালের শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা হয়, তাহা হইলে ঝী ভয়ঙ্কর অশিক্ষিতা। সুতরাং ঝীর সঙ্গে সকলকারই বিরোধ। বাস্তবিক, হিন্দুর শিক্ষা ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া "ঝী" সকলেরই কর্ম্ম সমালোচনা, শিক্ষা সমালোচনা এবং ব্যবহার সমালোচনা করিতেছে। এমন ক্ষেত্রে সমালোচকের যেমন হওয়া উচিত, ঝী তেমনই হইয়াছে।—ঝী কোরকাপ জানে না, সকলকেই সকল সময়ে স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দেয়—অথচ ঝী ফিলসফার নহে, একটা সাদা সিধা মানুষ মাত্র। সেই জন্যই তাহার কথায় এত তীব্রতা, তাহার সমালোচনায় এত তীব্রতা।

নাটকোল্লিখিত সকল ব্যক্তির সকল কথার বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইলে, আমার অবকাশে কুলাইবে না, নবজীবনেও স্থান হইবে না। তবে উপরে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহার সম্যক্ উপলব্ধির জন্য পুস্তকের উপর বরাত দিয়া এখানে কতকগুলি উদাহরণ দিলেই বোধ করি, আমার অভিপ্রায় পরিস্ফুট হইতে পারিবে।

মিষ্টার সিং বিলাতী শিক্ষাগুণে এখন পূর্ণ পুরুষ। উমাচরণ গুপ্তের মাতৃবিয়োগ হইল, গুপ্ত মহাশয় "কাচা গলায় দিয়ে, জুতো খুলে" বেড়াইতেন, এ কথা শুনিয়া মিষ্টার সিং অবাক হইলেন; বলিলেন—"নেংটো গা, নেংটো পা, লেডীর সাম্‌নে"—কি ভয়ানক!

বাড়ীতে থাকিলে মিষ্টার সিংহকে "কাপড় ছাড়তে বলে, ভাত খেতে বলে", সুতরাং তিনি গোরস্থান গলিতে বাসা লইয়া আছেন, আর বাড়ী যান না। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর শিক্ষা আর কি হইতে পারে?

ফলত, মিষ্টার সিংহের দেশভক্তি, সমাজ ভক্তি, বিলাসিনীর পতিভক্তি, লজ্জাশীলতা এবং স্বার্থশূন্যতা, নন্দলালের সদাশয়তা, মহদভিলাষ; স্বদেশের উত্তোলন ব্রতে নিষ্ঠা, এবং কর্ত্তব্য জ্ঞান—এ সব এক সঙ্গে পাশাপাশি রাখিয়া মিলাইয়া দেখিবার সামগ্রী। দেখিলেই " শিক্ষা " সম্বন্ধে "দিব্যজ্ঞান হয়।

দেখুন, গ্রন্থকার কেমন করিয়া আমাদিগকে এই কল সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছেন

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিলাসিনীর বসিবার ঘর।

সিংহ। গত বৎসর আমার এখান থেকে ছাড়বার কিছু পূর্ব্বেই—সকল রকম দেখে কিন্তু আমার বেশ অনুমান হ'য়েছিল, যে, আপনি উমাচরণ গুপ্ত-কেই সুখী কর্‌বেন।

বিলা। অনুমান ঠিকই করেছিলেন, উমাচরণ বাবুকে আমি এক প্রকার বিবাহ কোত্তে স্বীকারও করেছিলেম বটে, কিন্তু তাঁর মার মৃত্যু হওয়াতে কাচা গলায় দিয়ে, জুতো খুলে বেড়াতে লাগলেন, সুতরাং অমন অসভ্যকে আমি আর স্বামী বলে কি করে নিই।

সিংহ। নেংটো গা, নেংটো পা, Ladyর সাম্‌নে—Horrible!

বিলা। Shocking!

সিংহ। Mr. Karforma (বিলাসিনীর স্বামী) করেন কি?

বিলা। আগে Teachery কোত্তেন, আমি তা ছাড়িয়ে একটা প্রেস করে দিয়েছি। কামিনী ভট্টাচার্য্যের স্বামীতে আর গৌরে মিলে এক খান বাঙ্গলা কাগজ বার করেন, আর এ দিকে আমার সংসারের সকল কাজ কর্ম্ম দেখেন।

সিংহ। সুখী Mr. Karforma, যাঁর এমন স্ত্রী!

* * * * *

বিলা। (স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন) ওবেলা রান্নার কি উয্যগ করেছ?

গৌরী। কি খাবে বল—ক'রে দিচ্ছি।

বিলা। বেশি কিছু না, আমি সকাল সকাল খেয়ে বেরুব; আজ আমা-দের "পুরুষ দমন" সভার Anniversary; রাত্রে ফিরতে পারব কি না বল্‌তে পারিনি; তোমার মাছের ঝোল টোল যা হয় পরে ক'র, আমায় এক Plate Sago pudding, আর খান চেরেক Cutlet ভেজ দেও; কিন্তু দেখ যেন সেদিনকার মত পুড়িয়ে ফেল না।

গৌরী। কয়লার জ্বালে ঠিক আঁচ বোঝা যায় না—

বিলা। What a stupid! this dear husband of mine is as stupid, Mr. Singh, as—as—as—

সিংহ। What d'ye call it.

বিলা। Yes quite so, I half regret my choice, in takiug him for my partner. আমি তোমায় দুশো দিন বলেছি, যে, আমার অবসর মতে ঘণ্টাখানেক ক'রে আমার কাছে বসে একটু একটু science এর lecture শুনো; তা তোমার হ'ল না, Theory of heat জান না; রাঁধবে কি ক'রে?

গৌরী। তা দিও, একখানা বাঙ্গালা বিজ্ঞানের বই কিনে দিও; তোমার Ganot আমি বুঝ্‌তে পারি নি—

বিলা। Ganot বুঝ্‌তে পার না, fie! গোটা দুই সোজা কথা মনে রাখ না, আর Thermometer এর useটা শিখে নাও, তা হ'লেই হল;

কশো degree Centigradeএ boiling point, সরসের তেল দুশো egreeতে জ্বলে উঠে, ১২৫ কি ১৩০ degree হ'লেই বেশ ভাজা হয়, কাট য়লার জাল ! science শিখলে বরফের জালে রাঁধা যায়।

গৌরী। বরফের জাল—বরফের জাল !

বিলা। হ্যাঁ হ্যাঁ, বরফ—যাকে Ice বলে, ভাবতে ভাবতে আমরা যা াথায় দিই, ওলাউঠা হ'লে তোমরা যা খাও—সেই বরফ; Sir Humphrey Davyর মতে দুখান বরফ ঘসাঘসি কোল্লে রীতিমত heat পাওয়া ায়। আজ বাদে কাল আমি scienceএ M. A. দিব, আর আমার husband heat theory বোঝে না।

(নন্দলালের প্রবেশ।)

নন্দ। Good day Mr. Karforma, নমস্কার Mrs. ditto. Good lay, good day নীলরতন বাবু।

সিংহ। Mr Singh if you please—

* * * * * *

নন্দ। আপনাকে বলি, আমি এবার L. A. দিব Second year এ পড়ছি, বিলাতে Examine দিলে হয় না ?

সিংহ। আপনার সেখানে কি যাবার ইচ্ছা আছে নাকি ?

নন্দ। ইচ্ছা ! যাবই।

সিংহ। আপনার Fatherএর মত হবে ?

নন্দ। আবশ্যক, বুড়োদের মত আর কোন্ সৎকার্য্যে হয় ?

সিংহ। তবে টাকার যোগাড় কি রকমে হবে ?

নন্দ। সে যোগাড় বাবাই কচ্ছেন, এক রকম ঠিকও হ'য়েছে।

সিংহ। তাঁর মত নেই অথচ টাকার যোগাড় কচ্ছেন কি রকম ?

নন্দ। তিনি আমার বিবাহের সম্বন্ধ কচ্ছেন, তাতে চার পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যাবে।

বিলা। বিবাহ ! কিরূপ পাত্রী ?—কি পাশ করেছে ?—কি মতে বিবাহ ?

নন্দ। সে সব বিশেষ কিছুই জানা যায় নি, বাবাও টাকার কথা ঠিক কচ্ছেন, আমিও তাই হাতাবার অপেক্ষায় আছি।

বিলা। কিরূপ পাত্রী জানেন না; দেখ্‌তে কেমন—আপনার চেয়ে বড় কি ছোট—কত দূর লেখাপড়া জানে—আপনাকে বশে রেখে চালাতে পার্‌বে কি না—কিছুই জানেন না ? হয় তো কোন অপবিত্র সেকেলে বেআইনি মতে বিবাহ হবে. এসব না জেনে—না ঠিক ক'রে আপনি বিবাহ কত্তে যাচ্ছেন ?

নন্দ। দেখুন আমি এক ঢিলে তিন পাখী মারবো। সমাজকে শাসিত করবো, বাবাকে শিক্ষা দিব, আর আমার শ্বশুর হবার যে বেয়াদবি রাখে, তারেও শাস্তি দিব। বাবা যেমন লাভের লোভে আমাকে একটা জানোয়ারি জুটিয়ে দিচ্ছেন, সেই জানোয়ারের বাপ যেমন বাবাকে ঘুষ দিয়ে আমার মত Educated manকে একটা পোঁটাপড়া মুর্খের সহচর ক'রে দিচ্ছেন,

আর সমাজ যেমন এসব দেখে শুনেও বিন্ধ্যাচলের মত গা ঢেলে দিয়ে প'ড়ে আছেন—আমিও তেমনি বাগে যোগে টাকাটি হাত কর্‌বো অথচ বিবাহ Null and Void হবে।

বিলা। কিন্তু বালিকার দশা কি হবে?

নন্দ। There are Ten thousands bachelors to choose from; যাকে ইচ্ছা ফের বে কোত্তে পারে। I will get one milk white wife with a pair of cat's eyes.

* * * * * *

সিংহ। আপনার Husband খুব তো Docile.

বিলা। পতির প্রধান গুণ স্ত্রীভক্তি, যে পতি স্ত্রীকে না ভক্তি করে, সে ব্যভিচারী, পুরুষ-বেশ্যা; আর আমরা যদি স্বামীকে দমন কোত্তে না পার্‌ব তবে আমাদের high educationএর ফল কি?

[সিংহের প্রস্থান।

তবে নন্দবাবু বিবাহ কোত্তে চল্লেন?

নন্দ। বিবাহ! হয় বিবি, নয় আপনার মত Graduate. আহা গৌর বাবুর কি অদৃষ্ট!

বিলা। কি jealousy হয় না কি?

নন্দ। কার না হয়? আমি বিলাত থেকে ফেরা অবধি যদি আপনি Miss থাক্‌তেন?

বিলা। *Wife* তো *widow* হয়।

নন্দ। *Would to God,* সে দিন কি হবে!

বিলা। আপনি Science পড়ছেন, God বল্লেন যে, God মানেন না কি?

নন্দ। রাম! ওটা কথার কথা বল্লেম, যে দিন Ganot কিনেছি—সেই দিন বুঝেছি God নেই।

* * * * * * * * *

সংক্ষেপে বলি, পুস্তকের সকল স্থানই এইরূপ মূল্যবান ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু ইঙ্গিত বুঝিলে ত!

আমি স্বীকার করি, যে এই নাটক আমাদের কলঙ্কে এবং কুৎসায় নির্ম্মিত। কিন্তু সে দোষ গ্রন্থকারের, না আমাদের? এত যে জাতীয়তার ভাণ, এত যে দেশ-ভক্তির ছলনা, এমন করিয়া না আঁকিলে কি ইহার প্রতিশোধ হয়? যদি প্রকৃত শিক্ষায় কাহারও আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকে, তবে আমাদের ব্যবহার শুধরাইতে হইবে, আমাদের চরিত্রে নিষ্ঠাগুণের সঞ্চার করিতে হইবে, "চাদর নিবারিণী" অথবা "ভাত কাপড় নিবারিণী" সভা ছাড়িয়া, ভ্রান্ত অভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং কঠোর কশাঘাতকারী গ্রন্থকারের গুণগান করিতে করিতে কিছু কালের জন্য "ঝী"কেও আমাদের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আমাদের মতিগতি ফিরাইয়া লইতে হইবে।

শ্রীইন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

নবজীবন।

১ম ভাগ } জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ { ১১শ সংখ্যা

ভারতীয় ও বৈদেশিক স্থূলতত্ত্ব।

ইতি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে 'এতেভ্য স্থূল ভূতানিচ উৎপদ্যন্তে।' সূক্ষ্ম ভূতগণ যেমন অনাদি সূক্ষ্ম দেহের হেতু, সেইরূপ তাহা স্থূল ভূতগণকেও উৎপন্ন করিয়াছে। সূক্ষ্ম ভূতগণ ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অব্যবহার্য্য, এবং প্রত্যেক ভূতের 'মাত্রা' অর্থাৎ সূক্ষ্মতম বীজরূপা। এ কথা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। সুপ্রসিদ্ধ আণ্ড্রু জ্যাকসন ডেবিস অবিকল সেইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কেন না তিনি কহেন যে, জগতের সূক্ষ্মাবস্থাতে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণ সকল অভিব্যক্ত হয় নাই। ইহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রেও স্পষ্টই আছে 'তদানীমাকাশে শব্দো হভিব্যজ্যতে, বায়ৌ শব্দ স্পর্শৌ, অগ্নি-শব্দ স্পর্শ রূপাণি, অপ্সু শব্দ স্পর্শরূপ রসাঃ, পৃথিব্যাং শব্দ স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাশ্চ।'' ইহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্বে সূক্ষ্ম ভূতগণ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ছিল না। ক্রমে তাহারা সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণের সহিত সুব্যক্ত হইল। তাহারই সঙ্গে সঙ্গে স্থূল আকৃতি, অন্ন পান, এবং বসতির জন্য লোক মণ্ডল সকল তদীয় উপাদানে বিরচিত হইয়া উঠিল। "এতেভ্য * * ব্রহ্মাণ্ডস্য তদন্তর্গত * * স্থূল শরীরাণাং অন্ন পানাদিনাঞ্চ উৎপত্তির্ভবতি।" স্থূল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, ব্যবহার্য্য, সুব্যক্ত, পঞ্চীকৃত ভূতগণ অভিব্যক্ত হইলে পর তাহারা ক্রমে সৌর জগৎ প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ড, তদন্তর্গত মনুষ্যাদি জীবগণের স্থূল দেহ এবং তাহাদের ভোগ্য অন্ন পান রূপে পরিণত হইল।

ইতিপূর্ব্বে 'তদানীমাকাশে' প্রভৃতি যে বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা প্রমাণ করিতেছে যে এই স্থূল দৃশ্য, কঠিন পৃষ্ঠ, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ভুবাদি লোক সমস্ত উদয় হওয়ার পূর্ব্বে, তৎসমস্ত শব্দেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য আকাশ মাত্র ছিল। পরে তাহা শব্দ স্পর্শ ও দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য অগ্নিময় ভয়ানক পদার্থরূপে পরিণত হইল। তাহার পশ্চাৎ উহা শব্দ স্পর্শ রূপ রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য জলবৎ তরল পদার্থের রূপ ধারণ করিল। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল একাকার হইয়া এক মিশ্র পদার্থরূপে অবস্থিত হইল। তাহার জল ভাগের মধ্যে পৃথ্বিবীজ অব্যক্ত ছিল। কালেতে তাহা হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য গুণগ্রামের সহিত এক অণ্ড অভিব্যক্ত হইল। আকাশ বায়ু অগ্নি জল ইহারা মৃত্তিকা অপেক্ষা অধিক তেজোময়, বীর্য্যবান, ও ব্যাপক। ঐ অণ্ড উক্ত তেজো ধাতুর সহিত এক বৃহৎ সূর্য্যরূপে অবতীর্ণ হইল। এই কারণে ঐ অণ্ডটি মনু প্রভৃতি শাস্ত্রে সহস্র সূর্য্যের প্রভা তুল্য ও হিরণ্য বর্ণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। শাস্ত্রানুসারে সূর্য্যাদি সমস্ত লোক মণ্ডল সেই অণ্ডেরই অংশ। সেই আদি সৌর-অণ্ডের সূক্ষ্মজ্যোতি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধাতু উর্দ্ধদেশে ব্রহ্ম-লোকাদি গঠন করিল। নিম্নে স্বর্লোক ও পৃথিবী উৎপন্ন করিল। সমস্ত স্বর্লোক সূর্য্য চন্দ্র তারাগণে খচিত হইল। ব্রহ্মভুবন চতুষ্টয়ে সূক্ষ্ম তেজ ও বীর্য্য বিরাজ করিতে থাকিল। নিম্নস্থ লোক সকল স্থূল ধাতু প্রধান হইল। (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৩ প্রপা ১৯ খ দ্রষ্টব্য) এই সমস্ত স্থূল মণ্ডলে ক্রমে ক্রমে তেজোভাগ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। তাহাতেই তাহারা মৃত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। 'মৃত" অর্থাৎ "শীতল" ঘনীভূত, স্থির, ব্যাপ্য (ব্যাপক নহে) এবং অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ। সেই সহস্র সূর্য্যোপম প্রথম অণ্ডের তুলনায় অথবা তাহার সুসূক্ষ্ম উৎকৃষ্ট মূর্ত্তিস্বরূপ ব্রহ্মলোকের সম্বন্ধে আমাদের সূর্য্যও মৃত। তিনি সৌরজগতের তেজ, বীর্য্য, আকর্ষণের কর্ত্তা হইলেও আদি অবস্থা অপেক্ষা তাঁহার অগ্নিত্ব অনেক হ্রাস হইয়াছে। সমগ্র স্বর্গলোক এবং এই ভূলোকে যত তেজ ও বীর্য্য আছে, যত অস্ত্রশস্ত্র আছে, যত ধাতু পদার্থ আছে, সে সমুদয়ই সূর্য্যতেজ সম্ভূত। জগতের সৃষ্টি অবধি সূর্য্যতেজ নানা পদার্থে পীত ও পরিণত হওয়ায়—ক্রমে সূর্য্যের অগ্নিত্ব বিস্তর পরিমাণে হ্রাসাবস্থ হইয়াছে। এবিষয়ে (বিঃ পুঃ ৩।২।৯ প্রভৃতি শ্লোকে) এই রূপক আছে, যথ, বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যতেজের সাত ভাগ চাঁচিয়া লইয়াছিলেন। তদ্দ্বারা

বিষ্ণুর চক্র, রুদ্রের ত্রিশূল, কুবেরের শিবিকা এবং অন্যান্য নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সূর্য্যের কেবল অষ্টমাংশ তেজ মাত্র অবশিষ্ট আছে। সূর্য্যতেজের এইরূপ ন্যূনতা হওয়ায় ঋষিরা তাঁহাকে "মৃত অণ্ড" বলিয়াছেন (ভাঃ ৫।২০।৩৫)। মৃত অণ্ড বলিয়া শাস্ত্রে তিনি "মার্ত্তণ্ড" নামে অভিহিত হয়েন। যখন সূর্য্যই "মার্ত্তণ্ড" হইলেন, তখন পৃথিবীর তো কথাই নাই। ইহা একেবারে শীতল, নির্ব্বাপিত ও মৃত বিধায় "মৃত্তিকা" নামে কথিত হইয়াছে।

এক্ষণে এই ব্রহ্মাণ্ডের জলময় তরলাবস্থা, অগ্নিময় দীপ্তিমানাবস্থা এবং অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর বায়বীয় অবস্থা সকল সম্বন্ধে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কি বলেন, আমরা তাহারই কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিব। তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় মতের তুলনা করিলেই সুধীর পাঠক ঐক্য সকল অনুভব করিতে পারিবেন। শুদ্ধ তাহাতেও নহে, কিন্তু অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতীয় সিদ্ধান্তের শৃঙ্খলা, পারিপাট্য ও যৌক্তিকতা কত গভীর অথচ কেমন সারগর্ভ ও সংক্ষিপ্ত।

সম্প্রতিকার প্রেততত্ত্ববাদী আলান কার্ডিক স্বীয় পুনর্জ্জন্ম বিষয়ক গ্রন্থে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যথা "যে সকল জীব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা কোথা হইতে আগমন করিয়াছে ?" এই প্রশ্নের তিনি আপনি এই উত্তর লিখিয়াছেন যথা—"এই সকল জীবের বীজ পৃথিবীতে অর্থাৎ মৃত্তিকাবচ্ছিন্ন ছিল। তাহারা উপযুক্ত সময়ে প্রকটিত হইবার জন্য তথা অবস্থিতি করিতেছিল। এই সকল জীব-বীজ, বৃক্ষ-বীজ সমূহের অভিব্যক্তিনিমিত্ত ঋতুকাল অপেক্ষা করার ন্যায়, মৃত্তিকাগর্ভে নিরুদ্ধ বৃত্তিতে আবদ্ধ ছিল। তাহারা যথা ঋতুকালে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবী উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব্বে, সেই সকল বীজ তদীয় তরল প্রাগ্‌বস্থার মধ্যে অবচ্ছিন্ন ছিল। তথা হইতে পৃথিবীর ক্রম-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পৃথিবীতে স্থূল কলেবর পাইয়াছে।" এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের যে উপাদেয় সিদ্ধান্ত আছে, আমরা এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

শাস্ত্রানুসারে জীবের তিন ভাগ। স্বয়ং জীবাত্মা, তাঁহার সূক্ষ্ম দেহ এবং সেই সূক্ষ্ম দেহের বাহ্য মূর্ত্তি,—স্থূল দেহ। জীবাত্মা স্বয়ং নির্ম্মল পদার্থ। সুতরাং আপনার অন্তরাত্মাকে তিনি সর্ব্বদাই আশ্রয় করিয়া থাকেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে "স্বপিতি" শ্রুতিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, সুষুপ্তি কালে

যখন জীবের স্থূল সূক্ষ্ম উভয় দেহ নিস্পন্দ হয়, তখন জীবাত্মা পরমাত্মাতেই নিদ্রিত হয়েন। তাঁহার স্থূল সূক্ষ্ম দেহ—প্রাকৃতিক শক্তি প্রকৃতিকে আশ্রয় করে বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং অন্তরাত্মাতে প্রবেশ করেন। অর্থাৎ যাহার যেখানে সমতা বা জাতিত্ব সম্বন্ধ—যেটি যে কারণের কার্য্য—তাহা সেই তত্ত্বকে আশ্রয় করে। জীবাত্মা পরমাত্ম-স্বরূপোৎপন্ন, অতএব তিনি পরমাত্মাতে এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, অতএব তদুভয় প্রকৃতিতে স্থান গ্রহণ করে। অথচ সুষুপ্তি কালে জীবাত্মা স্বীয় বাহ্য দেহেতেই সূক্ষ্ম দেহের সহিত নিরুদ্ধভাবে অবচ্ছিন্ন থাকেন। ইহাই সাধারণ সংস্কার। কেন না স্থূল শরীর হইতে বিশেষত সূক্ষ্ম দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া জীবাত্মাকে অনুভব করা যোগী ভিন্ন অন্যের সাধ্য নহে। সাধারণ জনগণ দুরতিক্রমণীয় অভ্যাসে চিরবদ্ধ।

অতএব সর্ব্বসাধারণকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত, শাস্ত্র জীবাত্মাকে তদীয় সূক্ষ্ম দেহে অধ্যস্ত পূর্ব্বক কহিয়াছেন যে, স্থূল দেহ লাভের পূর্ব্বে সূক্ষ্ম দেহাবচ্ছিন্ন জীবাত্মা অন্নেতে, তৎপূর্ব্বে পৃথিবীতে, তৎপূর্ব্বে জলেতে, তৎপূর্ব্বে তেজেতে,তৎপূর্ব্বে বায়ুতে, তৎপূর্ব্বে আকাশে এবং তৎপূর্ব্বে প্রকৃতিতে ছিল। তাৎপর্য্য এই যে, সৃষ্টি আকাশ অবস্থা হইতে ক্রমে যেমন যেমন পরিণাম লাভ করিয়াছে, জীবাত্মা আসিয়া ক্রমে সেই সেই পরিণামকে আশ্রয় করিয়াছে। পশ্চাৎ উপযুক্ত ঋতুতে অদৃষ্টানুযায়ী স্থূল দেহ লাভ করিয়াছে। সূক্ষ্ম ভূত হইতে সূক্ষ্ম দেহ সৃষ্টির যে বিবরণ পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই এই কথার প্রচুর প্রমাণ। শারীরক দর্শনে (৩।১।২২ প্রভৃতি সূত্রে) কহিয়াছেন, "স্বভাব্যাপত্তি রূপপত্তেঃ।" জীবাত্মা স্থূলদেহ লাভ করিবার পূর্ব্বে, সূক্ষ্মদেহের সহিত আকাশ, বায়ু, অগ্নি, ও জলময় অবস্থার সাদৃশ্য লাভ করে, ফলে সাক্ষাৎ আকাশাদি হয় না। "নাচিরেণ বিশেষাৎ" (ঐ)। অচির কাল মধ্যে জল পর্য্যন্ত আবস্থিক সাম্য ত্যাগ হইলে জীবাত্মা পৃথিবীর মৃত্তিকামধ্যে আশ্রয় লন। পশ্চাৎ পৃথিবীর সুব্যক্ত পরিণাম অন্নেতে বাস করেন। "অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ব বদভিলাপাৎ।" (ঐ)। জীব সাক্ষাৎ অন্ন হন না, কিন্তু পূর্ব্ববৎ আকাশাদিতে, আকাশাদির সাদৃশ্যে অধিষ্ঠানের ন্যায় অন্নেতে অধিষ্ঠান করে মাত্র। "রেতঃ সিগ্‌যোগোঽথঃ।" (ঐ)। অন্নেতে স্থিতির পর রেতের সংসর্গ হয়। "যোনেঃ শরীরং।" (ঐ)। তাহার পর যোনি হইতে স্থূলদেহ নিষ্পন্ন হয়। "পৃথিব্যাধিকার রূপশব্দান্তরেভ্যঃ। (ঐ ২।৩।১২)।

এস্থলে অন্ন শব্দে পৃথিবী। "কার্য্যকারণয়োরন্ন পৃথিব্যোরভেদ বিবক্ষয়া তদুপপত্তে স্তস্মাদন্নং পৃথিবীতি।" কার্য্য ও কারণরূপ শস্য ও পৃথিবীর অভেদ লক্ষণায় অন্ন পৃথিবীর রূপ। এতাবতা স্থূল দেহ লাভের পূর্ব্বে এবং সুব্যক্ত সৃষ্টির প্রাক্কালে জীবের ক্রমে আকাশাদি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত ও তৎপরে রেতে ও গর্ভে স্থিতি হয়। "সূক্ষ্ম শরীরাবৃত জীব সকল প্রথমত আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীতে অনুপ্রবেশ করে, পরে বনস্পতি ও ওষধিতে অবশিষ্ট হয়, অবশেষে রেত রূপে পরিণত হইয়া মাতৃগর্ভযোগে জন্ম-গ্রহণ করে॥" (সম্ভব পর্ব্বে ৯০ অঃ মঃ ভাঃ) পূর্ব্বোক্ত আলান কার্ডিকের সিদ্ধান্তে শাস্ত্রের মর্ম্মটিই সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রের ন্যায় বিশদরূপে প্রদর্শিত হয় নাই। শাস্ত্রের মধ্যে আদ্যোপান্ত একটি শৃঙ্খলা আছে। ভিন্ন দেশীয় লোকেরা যত দিন আপনাদের বিদ্যাবুদ্ধির অভিমান ত্যাগ না করিবেন এবং ভারতীয় শাস্ত্রকে গুরুরূপে গ্রহণ না করিবেন, ততদিন, সে শৃঙ্খলা লাভ করিতে পারিবেন না।

আমরা বিদেশীয় সিদ্ধান্ত সমূহের সহিত ভারতীয় শাস্ত্রের ঐক্য প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম সৃষ্টি, স্থূল সৃষ্টি, এবং জীবের সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলাবস্থায় অবতরণের কথা বলিলাম। এক্ষণে আরো কতিপয় বৈদেশিক সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিব।

ভারতীয় শাস্ত্রে যেমন আছে, আত্মা হইতে প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে ক্ষিতি—এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে একদিকে সূক্ষ্ম দেহাবচ্ছিন্ন মন, অন্য দিকে স্থূল-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আকাশাবধি পৃথিবী পর্য্যন্ত পঞ্চীকৃত পঞ্চ স্থূল ভূত উৎপন্ন হইল; তাহার পর মূল সৌর-অণ্ড এবং তাহার বিভাগ হইতে ঊর্দ্ধস্থিত লোক সমূহ এবং এই মর্ত্তপুরী উৎপন্ন হইয়াছে; সেইরূপ অবিকল পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত সকল বর্ত্তমানকালে চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িতেছে।

সুবিখ্যাত আণ্ড্রু জ্যাকসন ডেবিস সৃষ্টি পরিণতির যে শৃঙ্খলা দর্শাইয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে আমাদেরই শৃঙ্খলা। যথা—ব্রহ্ম, কামনা, মূলশক্তি, বিধি, মূলভূত, আকাশ, বাষ্প, জল এবং ক্ষিতি এই কয়েকটি তত্ত্বের পূর্ব্ব পূর্ব্ব তত্ত্ব পর পর তত্ত্বের সাক্ষাৎ উৎপাদক। ইহার মধ্যে যাহা 'মূল ভূত' তাহাই পঞ্চ তন্মাত্র। ডেবিস্ কহেন, এই পঞ্চ তন্মাত্রই মন এবং স্থূল ভূতের যোজক। শাস্ত্রেরও যে ঠিক সেই সিদ্ধান্ত তাহা উপরিভাগে

উক্ত হইয়াছে। ডেবিসের "বাষ্পটি" আমাদের মিলিত বায়ু ও তেজ। তাহা হইতে জল এবং জল হইতে মৃত্তিকা জন্মিয়াছে। ডেবিস কহেন যে উপরি উক্ত 'মূল শক্তি'' নিম্নস্থ সমস্ত তত্ত্ব সংখ্যার সমাবেশ ক্ষেত্র। তাহা হইতে ক্রম পূর্ব্বক সকল তত্ত্ব ব্যক্ত হয়। তাহার অন্তিম পরিণাম মৃত্তিকা। এ কথাও অবিকল শাস্ত্রীয় কথা।

"যথাক্রম কারণতামেকৈকস্যোপবাপ্তিবৈ। (বিঃ পুঃ)।

ডেবিস্ বলেন, যে সমস্ত সৌর জগতই ঐরূপে উৎপন্ন। সে সমস্তই এক মহা সৌর কক্ষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে শীতল হইয়া পৃথিব্যাদি লোক মণ্ডল রূপে পরিণত হইয়াছে। টিণ্ডল বলেন, যে আমাদের বর্ত্তমান সূর্য্যের তেজও ক্রমে অনমুভবনীয় ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। সূর্য্য তেজই সমস্ত বলবীর্য্য অস্ত্র শস্ত্রের একরূপ উপাদান। এই সকল বার্ত্তা যেমন বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রমাণ করিতেছে, সেইরূপ তৎসমূহ যে আমাদের শাস্ত্রেরও সহিত এক, সে কথা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভূতত্ত্ব বিদ্যা হইতে জানা যায় যে, মানবের বাসোপযোগী হওয়ার পূর্ব্বে এই পৃথিবী শীতল ছিল না। অসংখ্য যুগ ব্যাপিয়া উহা অস্থির বায়বীয় অবস্থায় ছিল। পশ্চাৎ বহুকাল ধরিয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত আগ্নেয় অবস্থায় ছিল। তাহার পর উহা জলময় হয়। সংক্ষেপত সমস্ত সৌর জগতই ঐ সমস্ত অবস্থার মধ্য দিয়া পরিণত হইয়াছে। এই পৃথিবীর বর্ত্তমান আকারই সাক্ষ্য দিতেছে যে, ইহা অব্যবহিত পূর্ব্বে জলময় ছিল।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, বায়ু অগ্নি ও জলদ্বারা একাকৃতি বাষ্পভাবাপন্ন তরল ধাতু পদার্থ হইতে ক্রমে এই পৃথিবী শীতল ও ঘনীভূত হইয়াছে। সমস্ত গ্রহ তারাই এই প্রণালীতে ঘনীভূত হয়। পৃথিবী শীতল ও ঘনীভূত হওয়ার কালে, প্রথমে তাহার উপরিস্থ আবরণ বা ত্বক্ শীতল হইয়াছিল। সেই শীতলতাই তাহাকে ঘনীভূত ও কঠিন-পৃষ্ঠ করিয়াছে। পৃথিবী রূপ অণ্ডটির অভ্যন্তর ভাগ, যাহার উপরি ঘনীভূত, শীতল ও কঠিন ভূতল রূপ ত্বকটি দণ্ডায়মান আছে, তাহা এখনও তরল আগ্নেয় অবস্থায় রহিয়াছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে সেই অগ্নিই ভূমিকম্প ও আগ্নেয়-গিরি সমূহ হইতে অগ্ন্যুৎপাতের হেতু। তাহাকেই ভূগর্ভস্থ অগ্নি কহে এবং তাহাই প্রলয়ের বীজ। শ্রীচন্দ্রশেখর বসু। (খড়্গপুর)

মহৎ,—ক্ষুদ্রের প্রতি।

হে ক্ষুদ্র! সাধু—সাধু! তুমি বলিতে শিখিয়াছ, তুমি সাধু! ভাই হে! তুমি আমার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত যাহা বলিয়াছ তাহাতে, আমি প্রীত হইলাম,—আশীর্ব্বাদ করি—স্বস্তি, স্বস্তি! তুমি আমাকে বল দান করিয়াছ—আমাকে এই উন্নত গিরিশিখরে তুলিয়া দিয়াছ, কিন্তু ভাই!—বল দেখি, তুমি রামকে না তুলিয়া, শ্যামকে না তুলিয়া, আমাকেই এত অনুগ্রহ করিলে কেন? আমি উঁচু হইব, ইহা দেখিতে বড় সাধ হইয়াছিল—নয়? ভাল, যেন তাহাই হইল,—এখন সে সাধ ফুরাইল কেন? আমি তোমাকে পদে দলন করিয়াছি বলিয়া? আমি আত্মম্ভরিতায় মুগ্ধ হইয়া, অহং তত্ত্বে পণ্ডিত হইয়া, আবার তাহার উপর, বুঝি, তুমি যে বল আমাকে ধার দিয়াছিলে বলিতেছ, সেই বলে বলবান হইয়া, তোমার সকেশ মস্তক আহার করিয়াছি বলিয়া?—ভাই হে! তুমি ভ্রান্ত। তুমি রোমের ইতিহাস পড়িয়াছ কি?—না হয়, কথামালা পড়িয়াছ কি? একদা উদরের সহিত বিপরীত কলহে সমুদায় অঙ্গাদি কি ঘোর বিপাকে পড়িয়াছিল, তাহার বার্ত্তা কি তোমার কাণে উঠিয়াছে? "উদর" না হইলে এত দিন রহিতে কোথায়? আমাকে তুমি বলই দাও, আর সৃষ্টিই কর, আর সংসারে এই উচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিতই কর, আমি চক্ষু বুজিলে ভাই তোমারো গতি নাই! বুঝিলে কি? আবার বলি, আমার ক্ষমতাটা কি তোমার এতই চক্ষুশূল হইয়াছে? হইয়াছে বৈ কি—নহিলে হাটে, ঘাটে, মাঠে, হলে, স্কোয়ারে, ষ্ট্রীটে, আজ কেবল নাকে কাঁদিয়া বেড়াইতেছ কেন? অই যে ইংরাজিতে একটা কথা বলে—

"Some must lead, while some must follow;" এই প্রথা না হইলে সংসার চলিত না। দেখ যত বড় বড় ব্যাপারে যেখানে যত সন্ন্যাসী সেখানে "গাজন" ততই নষ্ট। সবাই সমান হইলে, কাজ চলিবে কেন ভাই? —তুমি বড় হইতে চাও, আইস। আমি আমার বড়ত্ব ছাড়িয়া দিয়া তোমার কুটীরে যাইতে প্রস্তুত। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, কত দিন তুমি আমার অবস্থায় থাকিয়া সুখী হইবে? আমাকে যদি তুমিই এ অবস্থায় তুলিয়া থাক, তবে তাহার জন্য আমি তোমায় বড় একটা আশীর্ব্বাদ করিতে প্রস্তুত নই। কেননা এ জায়গাটা বড়ই কদর্য্য না হইলেও, বড় একটা রম্য

উপবন মত নয়। লোকে ভাবে অই রজত-ধবল-স্ফাটিক-স্তম্ভবৎ হিমাচলের অভ্রভেদী শিখরদেশ, না জানি কত সাধের, কতই সুখের। একবার গিয়া দেখিয়া আইস ত' ভাই! বড় সহজ ব্যাপার নয় হে! তুমি বলিবে, ঐ পর্ব্বতের উপকণ্ঠে যে সুন্দর কি-যেন-কেমন-তর ছোট বড় মাজারি প্রজাপতি উড়িতেছে, তাহাদিগকেও আমাদের দেশে ছাড়িয়া দাও মরিয়া যাইবে! ঠিক কথা—আমিও তাহাই বলি! যে পোকা হিমাচলে প্রজাপতি হইয়াছে, তোমার দেশে হইলে তাহারা মরিয়া যাইত—নয়ত মশক হইয়া শ্রবণ ও ত্বক পরিতৃপ্ত করিত! আমি—"আমি" হইয়াছি, "মহৎ" হইয়াছি (—তুমিই বল আমি মহৎ) কেন?—না, আমার উদরে ঘৃত সহ্য হয় বলিয়া। আর তুমি ক্ষুদ্র হইলে কেন?—তোমার মহৎ হইবার ক্ষমতা নাই তাই। ক্ষমতা থাকিলে হয়ত আমাকে উপদেশ দিতে না বসিয়া আপনাকে উন্নত করিতে—আমার সমান করিতে চেষ্টা করিতে। বেশ ভাই! তাই হও না! দুজনেই হইব। দেখি তোমায় কেমন দেখায়! আইস আমি তোমায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত, কিন্তু ভাই তোমার নিজের যে টুকু আবশ্যক তাহা আছে কি?—

শ্রীমহৎ।

[নবম সংখ্যায় প্রকাশিত 'ক্ষুদ্রের নিবেদন' লইয়া বড়ই গণ্ডগোল উপস্থিত। বঙ্গসাহিত্যের নিতান্তই দুর্ভাগ্য যে এখনও অনেকের ধারণা আছে, যে ব্যক্তি বিশেষের উপর লক্ষ্য না থাকিলে, ওরূপ প্রবন্ধ লেখাই হইতে পারে না। এইরূপ ভ্রমে পড়িয়াই অনেকে, ইঁহাকে—তাঁহাকে, ক্ষুদ্রের লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এটি দুঃখের কথা; এ বিষয়ে হাসির কথাও আছে। পূর্ব্বে কবির দলে কটুক্তির শ্লেষের লড়াই হইত। অকথ্য গালাগালি দিয়া একদল অন্য দলের উপর চাপান গাহিলে, যাহাদের গালি দিয়াছে, তাহাদের বাঁধনদার, চোতাধারী, মূল দোহার মধ্যে বিবাদ হইত, প্রত্যেকেই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিত, যে সে-ই নিজে গালাগালির লক্ষ্য; কেন না, গুণের ধিক্কার, জাতির আবিষ্কার, পিতৃ নিন্দা, গৃহ কুৎসা তাহাকেই খাটে। কথা এই, যে গালাগালির লক্ষ্য হইল, তাহাকে নিশ্চয়ই প্রতিপক্ষ প্রধান বলিয়া স্থির করিয়াছে। এইরূপে প্রধান হইবার এখন আবার সময় উপস্থিত। ক্ষুদ্র বলিতেছে, মহৎকে,—লক্ষ্য আমি, কাজেই আমি মহৎ। এইরূপে মহৎ হইবার সুযোগ অনেকে ছাড়িতে পারিতেছেন না। কথাটা হাসির কথা বটে। তবে আসল কথা বলিতে গেলেই সকল ফাঁকা হয়। লেখকগণ আমাদের পরিচিত নহেন; এবং লক্ষ্য কাহারও উপর নাই।] সম্পাদক।

৩।

যাঁহারা ইলোরা দেখিতে যাইবেন, তাঁহাদের আরাঙ্গাবাদ দেখিয়া আসাও কর্ত্তব্য। তথায় এখনও প্রাচীন আরাঙ্গাবাদ নগরের ধ্বংশাবশিষ্ট আছে, সে সকল দর্শনোপযুক্ত। আরাঙ্গাবাদ হইতে ৮ মাইল দূরে বিখ্যাত দৌলতাবাদ দুর্গ এখনও আছে। উহা দেখিতে হইলে অনুমতি পত্র (pass) আবশ্যক করে। আরাঙ্গাবাদের রাজকর্ম্মচারিদিগের দ্বারায় সুবার নিকট হইতে অনুমতি পত্র আনাইতে হয়। এ দুর্গের গঠন এমন অদ্ভুত যে, কেহ কেহ বলেন, যে এরূপ দুর্গ অতি অল্পই আছে। এই দুর্গে দেশীয় কয়েকটি প্রকাণ্ড কামান আছে। আরাঙ্গাবাদে, আরঙ্গজীব বাদসাহের কন্যা রুবিয়া ধুরাণীর অতি সুন্দর গোরস্থান আছে, ইহা আগ্রার প্রসিদ্ধ তাজমহলের অনুকরণে নির্ম্মিত। আরঙ্গাবাদে ইংরাজবস্তির নাম, বড় বাড়ী দোয়ারি; এ স্থানটি একটি সুন্দর সহরের মত। আরাঙ্গাবাদে চলিত মুদ্রাকে "হালি সিক্কা" কহে। এখানকার আঙ্গুর, লেবু, আতা প্রভৃতি ফল অতি সুমিষ্ট। সার্ স্যালার জঙ্গের এই স্থানে ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে মৃত্যু হইয়াছিল।

নন্দগেওন ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর পরেই "মান্মর"। ইহার অদূরেই "এঙ্কাই টেঙ্কারিয়া" নামক একটি গিরিদুর্গ আছে। এই গিরি আরোহণের সময় পথে কয়েকটি প্রাচীন গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গুহায় কতকগুলি হিন্দুর দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে। রেলের দক্ষিণদিকে একগিরি শৃঙ্গে একটি প্রস্তরস্তম্ভ আশ্চর্য্য ভাবে আপনা আপনি উত্থিত হইয়াছে। ইহাকে এ অঞ্চলের লোকেরা "রামগুল্হি" কহে। এই খান হইতে এক শাখা লাইন গিয়া মান্দ্রাজ লাইনে "ধোন্দ" এষ্টেসনে মিশিয়াছে। বোম্বাই না যাইয়া, এই লাইন দিয়া মান্দ্রাজ যাওয়া যায়।

"মান্মরের" পর একটি এষ্টেসন ছাড়াইয়া লাসল-গেওন। এই এষ্টেসন হইতে তিন মাইল দূরে ভিঙ্কোর দুর্গ; এ দুর্গ দর্শনোপযুক্ত। ভিঙ্কুরার নামক জনৈক পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় সর্দার এই দুর্গের পূর্ব্বতন অধিপতি ছিলেন। দুর্গ দেখিতে যাইবার সুবিধাও আছে। "লাসল-গেওন" এষ্টেসনে হিন্দুদের থাকিবার উপযোগী ধর্ম্মশালা আছেন।

লাসিল-গেওনের পর চারটি এষ্টেসন ছাড়াইয়া নাসীক নামক বিখ্যাত স্থান, ষ্টেসনের নাম নাসীক-রোড। আমি নাসীক সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত করিয়া বলিব।

হিন্দুমাত্রেরই নাসীক দর্শন করা উচিত। আমি নানা তীর্থ দেখিলাম, কিন্তু নাসীকের মত আনন্দ জনক স্থান, এক বারাণসী ব্যতীত আর কোথাও দেখি নাই। বরং ইহাও বোধ হয়, যে বারাণসীতেও নাসীকের মত প্রকৃতির মাধুর্য্যময়ী শোভা নাই। সহর এষ্টেসন হইতে পাঁচ মাইল দূরে। সহরটি ছোট খাট, কিন্তু বসতি বিস্তর। সহরে প্রায় ৩৫০০০ লোকের বাস, তন্মধ্যে প্রায় ১০,০০০ ব্রাহ্মণ। নাসীকের পথ ঘাট বেশ পরিষ্কার। এষ্টেসনে উত্তম উত্তম টাঙ্গা ভাড়া পাওয়া যায়। একখানি টাঙ্গা সমস্ত দিনের জন্য ভাড়া করিলে ২॥০ টাকা লাগে। দর্শকদিগের পক্ষে সমস্ত দিনের জন্য টাঙ্গা ভাড়া করাই উচিত। সহরের অদূরেই হিন্দুর অবস্থিতির জন্য ধর্ম্মশালা আছে। তদ্ভিন্ন পাণ্ডাদের বাটিতেও উত্তম বাসা ভাড়া পাওয়া যায়। নাসীকের সকলই ভাল, কিন্তু এরূপ ছারপোকার দৌরাত্ম আমি বঙ্গদেশে কোথাও দেখি নাই। পুনায় আবার ছারপোকা ইহার অধিক। বাড়ীগুলি অধিকাংশ কাষ্ঠ নির্ম্মিত এবং চাল খোলার। এই সকল বাড়ী সমূলে বিনষ্ট না করিলে ছারপোকা ধ্বংশ হইবে না। কিন্তু আজমীরে কোটাবাড়ীতেও ছারপোকা বিস্তর দেখিয়াছি। এই সকল অঞ্চলে এত ছারপোকা কেন হয়, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিনাই। কি করিয়া যে এদেশের লোকে ছারপোকার দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া থাকেন তাহাই এক আশ্চর্য্য। আমি এই সকল স্থানে যে কয় দিন ছিলাম, এক দিনও নিদ্রা যাইতে পারি নাই।

নাসীকরোড় এষ্টেসনে পাণ্ডা বিস্তর দাঁড়াইয়া থাকে। দ্বাদশ বৎসর অন্তর এখানে যোগ হয়, সেই সময় নানা দিক্ দেশান্তর হইতে পিপীলিকার ন্যায় লোক সমাগম হয়। সৌভাগ্য ক্রমে আমি যে সময় নাসীকে গিয়া ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে এই যোগ আরম্ভ হইয়াছিল। জব্বলপুর হইতে বেলা ১০।৩০ দশটা ত্রিশ মিনিটের সময় যে গাড়ী ছাড়ে, সেই গাড়ীতে উঠিলে পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে নাসীকে পৌছান যায়। আমি নাসীকে উক্ত সময়ে পৌছিবামাত্র বিস্তর পাণ্ডা আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, যে আমি কোন জাতি। ইহার কারণ নাসীকে বঙ্গবাসী অতি অল্পই গিয়াছে। আমি হিন্দু ও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলাম তবে তাহারা আমার

বাসায় লইয়া যাইতে উৎসুক হইল। নাসীক যাইবার সময় ট্রেণে বিস্তর যাত্রীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলাম, তাঁহাদেরও কাছে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম, কিন্তু তথাপি তাঁহারা বিস্মিত হইয়া, পরস্পরে মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া,পরিশেষে আমার পরিচ্ছদ লক্ষ্য করিয়া,স্বীয় স্বীয় ভাষায় কি কথা কহিতে লাগিলেন,আমি বুঝিতে পারিলাম না ; কিন্তু ভাবে বোধ হইল যে আমি ব্রাহ্মণ কিনা তদ্‌বিষয়ে তাঁহারা সন্দিহান হইতেছেন। তখন আমি যজ্ঞোপবীত দেখাইয়া কনৌজ বংশ সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া আমাদের প্রাচীন ইতিহাস কহিলাম ; তবে তাঁহারা প্রসন্ন মুখে আমায় অভিবাদনাদি করিয়া, আমি ইজের চাপ্‌কান প্রভৃতি পরিচ্ছদ পরিধান করি কেন, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমার মুখে, বঙ্গদেশে ব্রহ্মাণদিগের মধ্যে এরূপ পরিচ্ছদ প্রচলিত হইয়াছে শুনিয়া, তাঁহারা পরস্পরে কি কথা কহিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। এই সকল যাত্রী গুজরাটি ব্রাহ্মণ, ইহারা বঙ্গদেশ কখন দেখেন নাই। ইহারা বড় স্থানান্তরে গমনাগমন করেন না, বৎসরান্তে একবার কেবল মাত্র তীর্থ দর্শন করিয়া থাকেন। সেই উপলক্ষে যে যে স্থানে গমন করেন তদ্বিষয়েই অভিজ্ঞতা আছে। ইহারা গুজরাটি ভাষায় কথা কহেন, ইঁহাদের সহিত কথা কহিতে বড়ই সঙ্কটে পড়িয়াছিলাম। গুজরাটি ভাষা শুনিতে অনেকটা বাঙ্গালার মত, কিন্তু বুঝিতে পারা যায় না।

এষ্টেশন হইতে জনেক পাণ্ডা লইয়া তাঁহার বাসায় সন্ধ্যার সময় পৌঁছিলাম। পথে একস্থানে প্রত্যেক্‌কে।০ চার আনা করিয়া মাশুল দিতে হয়, আসিবার সময়ও ঐরূপ মাশুল লাগে। গোদাবরীর উপরে পুল নির্ম্মাণ জন্য এই মাশুল যাত্রীদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত হইতেছে। আমার পাণ্ডা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের স্ত্রীলোকেরা রন্ধন করিলেন, আমি আহারাদি করিলাম, আহার করিতে রাত্রি হইয়া পড়িল, তথাপি একবার সহর ঘুরিয়া আসিলাম ; কিন্তু ভাল করিয়া কিছু দেখা হইল না। পরদিন প্রাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া দেব দেবী দেখিতে বহির্গত হইলাম। কিয়দ্দূর গিয়াই দেখি ;—

এতে তে কুহরেষু গদ্গদনদদ্গোদাবরী বারয়ো,
মেঘালঙ্কৃত মৌলি নীল শিখরাঃ ক্ষৌণীভৃতো দক্ষিণাঃ।
অন্যোন্য প্রতিঘাত সঙ্কুল চলৎকল্লোল কোলাহলৈ,
রুত্তালাস্ত ইমে গভীর পয়সঃ পুণ্যাঃ সরিৎ সঙ্গমাঃ॥

সহরের মধ্যদিয়া প্রসন্ন সলিলা গোদাবরী খরতর স্রোতে প্রবাহিত হই-তেছে। সহর হইতে রাস্তাগুলি সর্পাকার বক্র গতিতে গোদাবরী সলিলে মিশ্রিত হইয়াছে। গোদাবরী উর্দ্ধতরস্তর হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ,—কোথাও সোপানরাজি বিরাজিত তীর, কোথাও বা কেবলমাত্র প্রস্তরাচ্ছাদিত তীর, কোথাও বা অনুন্নত শৈলরাজি—প্লাবিত করিয়া, আনন্দের কল্লোল তুলিয়া চলিয়াছে। তীরেও গোদাবরীগর্ভে, যথা তথা স্রোত প্লাবিত ভিত্তির উপর, এক একটি দ্বীপের ন্যায়, নানা দেব দেবীর মন্দির প্রসন্ন-দর্শন-রূপে দাঁড়াইয়া আছে। মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতেছে। একটু জলে নামিয়া উত্তর পার্শ্বের তীর ভাগে চাহিয়া দেখিলে, চক্ষু স্পন্দ রহিত হইয়া পড়ে। চম্পকবরণা কুলস্ত্রীরা কেহ স্নান করিতেছেন, কেহ তর্পণ করিতেছেন, কেহ জল তুলিতেছেন, কেহ বা তৈজস ও বস্ত্রাদি ধৌত করিতেছেন। বালক ও যুবকেরা এই প্রখর স্রোতে আনন্দধ্বনি করিতে করিতে সন্তরণ করিতেছে, প্রাচীনেরা তার স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে অবগাহন করিতেছেন, স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রে পুরুষ ও রমণী অতি পবিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্রোত ভাঙ্গিয়া মন্দিরে মন্দিরে পূজা করিতে করিতে চলিয়াছেন। গোদাবরীর কল কল শব্দের সহিত জলপ্রবাহের অবিশ্রান্ত কণ্ঠস্রোত মিশিয়া চলিয়াছে। নাসীকের এ আনন্দময়ী পবিত্রামূর্ত্তি আমি জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না।

গোদাবরীর উত্তরতীরে "পঞ্চবটী"। সকলেই অবগত আছেন, যে এই থানেই বনবাসী রামচন্দ্র, পতিপ্রাণা ভার্য্যা ও স্নেহজীবন লক্ষ্মণের সহিত বাস করিতেন, এই থানেই সীতা হরণ হইয়াছিল, এবং ভবভূতির অমৃতময়ী লেখনীপ্রসূত উত্তরচরিতের লীলাক্ষেত্রও এই স্থান। আমি প্রথমেই পঞ্চবটী দেখিতে চলিলাম। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে বর্ষার পরেই আমি এ অঞ্চলে গিয়াছিলাম। এ সময়ে গোদাবরীর স্রোত বড়ই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। আমি রামতীর্থ ঘাটে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই ঘাটের পার্শ্বেই একটি ক্ষুদ্র প্রপাতের ন্যায় হইয়াছে। গোদাবরী পার হইতে এ স্থানে নৌকা পাওয়া যায় না। এস্থানে নৌকা চলিতেও পারে না, কারণ এস্থানে গোদাবরীর জল অতি অল্প গভীর এবং তলদেশ এতই বন্ধুর ও স্রোতের বেগ এতই প্রবল, যে নৌকা আসিলেই চূর্ণ হইয়া যাইবে। বর্ষাকালে মনুষ্যস্কন্ধে উঠিয়া গোদাবরী উত্তীর্ণ হইতে হয়। অন্যসময়ে সকলেই হাটিয়া পার

হইতে পারেন, কিন্তু এ সময়ে অতি বলবানেরও অভ্যাস না থাকিলে হাটিয়া পার হইতে তাঁহার জীবন সংশয় হয়।

আমি রামতীর্থ ঘাটে, যমদূতের ন্যায় আকৃতি একজন মনুষ্যের স্কন্ধে উঠিলাম। সে আমাকে লইয়া উজানে চলিল। নদীর মধ্য স্থলে উপস্থিত হইয়া বামভাগে চাহিয়া দেখি, অদূরে এক উর্দ্ধতর স্তর হইতে "হু" "হু" শব্দে উথলিয়া গোদাবরী এক নিম্নতর স্তরে পতিত হইতেছে। দক্ষিণ দিকে চাহিয়া দেখি, অদূরেই ঐরূপে গোদাবরী নিম্নতর স্তরে উথলিয়া পড়িতেছে। এই সময় শঙ্কায় আমার হৃদয় একবার কাঁপিয়া উঠিল। আমার বাহক স্রোতের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, দক্ষিণ দিকের প্রপাতের সন্নিকটে হটিয়া পড়িয়াছে, এমন কি আর হাত দুই সরিয়া পড়িলেই জীবন সংশয়। কিন্তু সে অসুর অবতার; তখনি বিজাতীয় বলে স্রোতের বেগ সম্বরণ করিয়া উজানে উঠিল। এইরূপে দুই তিন বার সংকটাপন্ন অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া পরপারে পৌছিলাম। পার হইয়া পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে এরূপ সময়ে এইস্থানে গোদাবরী পার হইতে, সময়ে সময়ে দুই এক জন লোক স্রোতের বেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া প্রপাতে পতিত হইয়া জীবন হারাইয়া থাকে। এই নিমিত্ত গোদাবরী উত্তীর্ণ হইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে পুল নির্ম্মাণের উপায় উদ্ভাবন হইতেছে। পাণ্ডাও আমার ন্যায় মনুষ্য স্কন্ধে উঠিয়া গোদাবরী পার হইয়াছিল। বাহকেরা প্রত্যেককে পার করিতে এক আনা করিয়া লয়। আমরা পরপারে রামেশ্বরজীর মন্দিরের সোপানে দাঁড়াইয়া ছিলাম। ইহাই সে পারের প্রধান দেব মন্দির। আমি মন্দিরের দেব দেবী দর্শন করিয়া, মন্দিরের সংশ্লিষ্ট গৃহের ছাদে উঠিলাম, তথায় দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিবা মাত্র, তথাকার মধুর দৃশ্যে প্রাণ পরিপ্লুত হইয়া উঠিল; ধীরে ধীরে রামচন্দ্রের কথাগুলি মনে ফুটিয়া উঠিল। পাঠক! যদি উত্তর চরিতের কবিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে চাও, তবে একবার নাসীকে গিয়া তাহার অভিনয় স্থলের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া আইস। পত্নী বিরহে কাতর রামচন্দ্র এই স্থানেই দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন:—

স্নিগ্ধ শ্যামাঃ ক্বচিত দপরতো ভীষণা ভোগরুক্ষাঃ
স্থানে স্থানে মুখর ককুভো ঝঙ্কতৈ র্নির্ঝরাণাম্।
এতে তীর্থাশ্রম গিরি সরিদ্গর্ত্ত কান্তার মিশ্রাঃ
সন্দৃশ্যন্তে পরিচিত ভুবো দণ্ডকারণ্য ভাগাঃ॥

এ কবিতা গৃহে বসিয়া আবৃত্তি করিলে, ইহার অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারিবে না, নাসীকে যাইয়া গোদাবরী দেখিয়া আইস, তখন বুঝিবে যে ভবভূতি যে শব্দ বা বর্ণ-টুকুর কথা বলিতে, যে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, সে সকল বাক্যের ভাবগুলি বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে যেন অভেদ্য সম্বন্ধে গ্রথিত। গোদাবরীর স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে ভবভূতির ভাষা উঠিয়াছে, পড়িয়াছে, ছুটিয়াছে, ঘুরিয়াছে এবং গোদাবরীর প্রাণের কথা যাহা মানব জ্ঞানাতীত, ভবভূতি তাহাও,স্রোতের স্বাভাবিক আবেগে,আকুলিত ভাষায় মানবের বোধগম্য করিয়া দিয়াছেন। যদি ভারতের কোন কবি স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া থাকেন, তবে তিনি ভবভূতি।

রামেশ্বরজীর মন্দির হইতে নামিয়া আমি পঞ্চবটী দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, একটি ইষ্টক নির্ম্মিত বাটীর কিয়দংশ ভূগর্ভ স্থিত এবং তাহার এক পার্শ্বে কয়েকটি প্রাচীন বটবৃক্ষ। এই স্থানটিকে পাণ্ডা পঞ্চবটী বলিয়া উল্লেখ করিল, এবং কহিল যে এই গৃহই রামচন্দ্রের আবাস ছিল। কিন্তু আমার বোধ হইল বাটীটি তত কালের নহে, এবং বটবৃক্ষ গুলিও তত প্রাচীন নয়; তবে হইতে পারে এই স্থানের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে রামচন্দ্র ছিলেন। নাসীকের নাম জনস্থান ছিল, তাহা পাণ্ডাদের কথা বার্ত্তায় পাইয়াছি, এবং এইস্থান পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যের এক অংশ ছিল, তাহাও ইহাদের কথায় পাওয়া যায়, কিন্তু পঞ্চবটীর অদূরেই যে পম্পা সরোবর, প্রস্রবণ নামে গিরি, মাল্যবান নামে গিরি ছিল বলিয়া বর্ণনা দেখা যায়, তাহার কোন নিদর্শন পাই নাই। তবে অগস্ত্যের আশ্রম যে ইহার অদূরে ছিল তাহা পাণ্ডারা উল্লেখ করে। ভরদ্বাজের তপোবন নামক এক স্থান পঞ্চবটীর সন্নিকটেই আছে; কিন্তু ভরদ্বাজ ঋষি এখানে তপস্যা করিতেন কি না তাহা আমি বলিতে পারি না। পাণ্ডারা কহে, যে স্থানে রামচন্দ্র খরদূষণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার নাম "তিগুন্ধা"। এখন তথায় বস্তি হইয়াছে; এবং এই স্থানেই লক্ষ্মণ সূর্পনখার নাসিকা কর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রমাণ করিবার জন্য কহে, যে সেই ঘটনা অনুসারে ইহার নাম নাসিক হইয়াছে। এ অঞ্চল বাসীরা নাসীককে বারাণসী তুল্যজ্ঞান করেন এবং গোদাবরীকেই গঙ্গা বলিয়া ইঁহাদের বিশ্বাস। তাঁহারা কহেন যে আমরা যে নদীকে গঙ্গা বলিয়া জানি, সত্যযুগে তাহা ছিল না, সত্যযুগে সমস্ত ভারতবাসীই এই গোদাবরীকে গঙ্গা বলিয়া জানিতেন। নাসীক যে অতি প্রাচীন স্থান, তাহা প্রমাণ

করিবার জন্য পাণ্ডারা একটি শ্লোক আবৃত্তি করেন; আমি সেই শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

আদৌহি পদ্মনগরং ত্রেতা যুগে জনস্থানং।
দ্বাপরেতু ত্রিকণ্টকং কলৌ নাসীক মুচ্যতে ॥

সর জর্জ ক্যাম্বেল নাসীককে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান মনে করিয়া, এবং অন্যান্য সর্ব্ব প্রকারে সুবিধা জনক স্থান ভাবিয়া, সিমলা ও কলিকাতার পরিবর্ত্তে নাসীকেই রাজধানী স্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্টেকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। নাসীকে কি শীত কি গ্রীষ্ম বৎসরের কোন সময়েই অধিক হয় না এবং সকল সময়েই এখানে সমুদ্রবায়ু সঞ্চালিত হইয়া থাকে। নাসীক যে অতি স্বাস্থ্যকর স্থান, তাহা আমিও অনুভব করিয়াছিলাম।

নাসীকের আট মাইল দূরে গঙ্গাপুর নামে একটি গ্রাম; এই গ্রামে গোদাবরীর একটি প্রপাত আছে। এ প্রপাত সম্বন্ধে আমি একটু বিশেষ করিয়া বলিব, কারণ এরূপ প্রপাত আমি আমার জীবনে এই খানেই প্রথম দেখিলাম। প্রপাতের কিয়দ্দূরেই গোদাবরী একটি বনান্তরাল হইতে আসিয়া প্রস্তর ময় ঊর্দ্ধতর স্তর হইতে, নিম্নতর স্তরে গড়াইয়া, একস্থানে প্রায় ৩৫ কি ৪০ ফিট নিম্নে উথলিয়া, অসম আকৃতি শৈলখণ্ড বিস্তৃত তলদেশে পতিত হইতেছে। প্রপাত স্থান হইতে সেই বনন্তরালের দিকে চাহিয়া দেখিলে সহসা ভ্রম হইবে যে যেন গোদাবরী সেই শান্তমূর্ত্তি অরণ্য-প্রদেশের পাদদেশ হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া দেখিলে প্রপাত স্থানের ও কানন প্রদেশের মূর্ত্তির বৈষম্যে মনের ভিতর শক্তি ও শান্তির যুগপৎ চিন্তা ফুটিয়া উঠিবে। কিন্তু গোদাবরী প্রপাত আমার পক্ষে এক অতি অদ্ভুত, বিস্ময়কর ও উন্মাদক দৃশ্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। প্রপাত দেখিতে যাইবার সময় প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূর হইতে প্রপাত শব্দ শুনিয়া আমার হৃদয় উচ্ছসিত হইতেছিল; প্রপাত শব্দ সন্নিকটস্থ হইলে, আমি ধৈর্য্য সম্বরণ করিতে পারি নাই; লম্ফ প্রদানে টাঙ্গা হইতে নামিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া প্রপাতের নিকট উপনীত হইলাম; উপনীত হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে প্রাণ একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। আমি প্রপাতের বিপরীত দিকে প্রায় বিশ ফিট অন্তরে, এক শৈল খণ্ডের উপর বসিলাম, আমার সম্মুখে প্রায় ৭০ কি ৮০ ফিট্ বিস্তৃত একটি প্রবাহ ৩৫ কি ৪০ ফিট্ নিম্নে পতিত

হইতেছে। যেখানে পতিত হইতেছে, সেখানে, শত সহস্র ধুনুচীর দ্বারায় রাশি রাশি তুলা ধুনিলে যেরূপ দেখায়, সেইরূপ রাশি রাশি চূর্ণ জলরাশি স্তূপাকারে, উন্মত্তাধিক উন্মত্ত আবেগে, শ্বেত ফেনা জাল সুদূর বিকীর্ণ করিয়া, চূর্ণ হইতে হইতে, ফুটিতে ফুটিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটিয়াছে। সে আবেগ সে উন্মত্ততা—সে শক্তি—সে আবর্ত্ত—সে বর্ণ—সে শব্দ—সে উচ্ছ্বাস—সে উল্লাস—বুঝাইব আমার সাধ্য কি! সে উন্মত্ততা মত্ত হস্তীর নাই—এন্‌জিনের গতিতে নাই—গঙ্গা যমুনার তুফানে নাই—মনুষ্যের হৃদয়ে নাই—কবিত্বের উল্লাসে নাই, কল্পনার সাধ্য কি, যে তাহার ধারণা করে! কেননা তাহার বিরাম নাই। সে শব্দ মেঘগর্জ্জনে নাই—রেলের শব্দে নাই—কামানের মুখে নাই—কেননা তাহার বিশ্রাম নাই। সে উচ্ছ্বাস—সে উল্লাস—সে উন্মত্ততা, অশ্রান্ত ভাবে, প্রাণে প্রাণে মিশিয়া, আনন্দের কল্লোল তুলিয়া, অবিরাম—গতি ছুটিতেছে। শোকার্ত্তের মর্ম্মে সে উন্মত্ততা নাই—উদ্যোগীর হৃদয়ে সে উল্লাস নাই—প্রেমিকের হৃদয়ে সে উচ্ছ্বাস নাই। তাহাতে নিদ্রা নাই—তন্দ্রা নাই—ক্ষুধা নাই—তৃষ্ণা নাই—তৃপ্তি নাই—ভীতি নাই—সে প্রবাহের পতনেই আনন্দ, তাই সে পূর্ণানন্দে পতিত হইতেছে। সে পতনে পাষাণ চূর্ণ হইতেছে, দিগন্ত কম্পিত হইতেছে—তরুরাজি শঙ্কিত হইতেছে—জগত মোহিত হইতেছে—দর্শক বিস্মিত ও অভিভূত হইতেছে, কিন্তু কিছুতেই সে প্রতাপের দৃক্‌পাত নাই। সে আপন আনন্দে আপনি অধীর হইয়া, আপন কর্ত্তব্যে আপনি উন্মত্ত হইয়া—আপন হৃদয়ে স্বীয় হৃদয় স্থিত রামধনু রঞ্জিত শত সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী জুঁই ফুলের কুসুমঝারার ন্যায় সলিল শীকর বিকীর্ণ করিতে করিতে ছুটিতেছে।

এ প্রপাতকে এ অঞ্চলের লোকেরা "দুধাচল" কহে; দুধাচলই বটে।

প্রপাতের অদূরে শান্তি নিকেতন কয়েকটি দেব মন্দির আছে, সে গুলিও দেখিয়া আসা উচিত। গঙ্গাপুর হইতে ৫ মাইল দূরে গোদাবরী তীরে একটি ভগ্ন দুর্গ আছে, এ দুর্গ কাহার ছিল, আমি সময়াভাবে তাহার অনুসন্ধান করিতে পারি নাই।

নাসীক হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে একটি গিরির উর্দ্ধদেশে কয়েকটি গহ্বর আছে, তাহার নাম "পাণ্ডবগুফা" গুহাকে এদেশের লোকেরা গুফা কহেন। ইংরাজেরা এ গুলিকে Lena caves কহেন। এ নামের কারণ কি তাহারি সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই। পাণ্ডব গুফার সম্বন্ধে এই

রূপ প্রবাদ আছে, যে, পঞ্চপাণ্ডব বনবাসী হইয়া কিছু দিন এই গুহায় বাস করিয়াছিলেন। আমি এই পাণ্ডব গুফার সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত করিয়া পরে বলিব।

ক্রমশ।

বৈষ্ণবতত্ত্ব।

প্রকৃতি ও পুরুষ।

প্রধান কে?

এই প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে প্রধান কে? এ প্রশ্নটি আপাতত অতি দুরূহ প্রশ্ন বলিয়া বোধ হয়। যখন একটি না হইলে আর একটির চলে না, যখন একটির অভাবে আর একটি অর্দ্ধাঙ্গ মাত্র, সম্পূর্ণ সত্তা নহে, তখন কাহাকে প্রাধান্য দান করিব? সাধারণ লোকে কিন্তু অন্তত লৌকিক ও ব্যবহারিক ভাষাতেও প্রকৃতিকে প্রাধান্য দান করিয়া থাকেন। সর্ব্বত্রই স্ত্রীজাতিকে শ্রেষ্ঠতর অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া স্বীকার করত প্রকারান্তরে লোকে প্রকৃতিকেই প্রাধান্য দান করিতেছেন। জ্ঞান পক্ষপাতীরা সর্ব্বত্রই পুরুষেরই প্রাধান্য সংস্থাপন করিবার চেষ্টা পান। প্রেমভক্তির সাধকেরাও এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে সহসা সাহসী হন না। তবে যাঁহারা প্রকৃতিকে প্রাধান্য দান করেন, তাঁহাদের তাহা করিবার কয়েকটি কারণ ও যুক্তি আছে। তন্মধ্যে একটি কারণ এই, যে লোকে পুরুষ অভাবে প্রকৃতির জড়ময় অস্তিত্ব অন্তত মনেতেও কল্পনা করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু প্রকৃতি অভাবে পুরুষের কোন প্রকার অস্তিত্ব-কল্পনা, প্রকৃত প্রস্তাবে কাহারও অন্তরে উদয় হয় না।

দ্বিতীয় কারণ এই, মানুষ যখন নির্ম্মল প্রকৃতির সঙ্গ (ভক্ত সঙ্গ) ভিন্ন পুরুষকে আয়ত্ত করিতে পারে না, যখন প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুভূত হইবার নহে, যখন প্রকৃতির অনুগ্রহ ভিন্ন পুরুষকে লাভ করিবার উপায়ান্তর সম্ভাবনা নাই, তখন সহজেই প্রকৃতিকে প্রাধান্য দান করিতে লোকে বাধ্য হইয়া থাকে।

তৃতীয় কারণ। ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, যে পুরুষের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া উপায় স্বরূপ প্রকৃতিকে অবলম্বন করিলে, কি প্রকৃতি, কি পুরুষ, কাহাকেও কেহ ধরিয়া ছুইয়া পায় না। যত দিন না সাধকের প্রকৃতির উপর অকৃত্রিম, অহেতুক নিষ্কাম প্রেম উপস্থিত হয়, তত দিন প্রকৃতি ও পুরুষের গূঢ়মর্ম্ম কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই। বরং পুরুষের প্রতি লঘুত্ব বোধ থাকিলে, কাহারও কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু প্রকৃতির প্রতি অনাদর থাকিলে, পরাপ্রকৃতির চিদ্গত অবস্থা লাভ কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। পুরুষের প্রতি কেহ অবজ্ঞা করিলে, পুরুষ তাহা অনায়াসে সহ্য করেন, কিন্তু প্রকৃতির প্রতি কেহ অবজ্ঞা করিলে তাহার কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। যাঁহার নির্ম্মল প্রকৃতির সঙ্গে প্রেম ও একাত্ম ভাব হইয়াছে, তিনি পুরুষকে বিনা মূল্যে লাভ করিয়া থাকেন। প্রকৃতিকে লাভ করাই পুরুষকে লাভ করা, পুরুষকে স্বতন্ত্র লাভ করিতে লাভ করিতে হয় না। প্রকৃতিকে লাভ করিলে পুরুষকে ফাও পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি প্রকৃতিকে ছাড়িয়া পুরুষকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, পুরুষ চিরকাল তাহার নিকট অধৃত থাকিবে। তাহার সকল চেষ্টা সে পক্ষে বিফল হইবে।

চতুর্থ কারণ;—যে কিছু সুখ দুঃখ তাহা প্রকৃতি গত। তন্মধ্যে নির্ম্মল পরা প্রকৃতি নিরবচ্ছিন্ন অকারণ আনন্দের উৎস; অন্যান্য মলিন প্রকৃতি সকারণ সুখ দুঃখের প্রতিষ্ঠা-ভূমি। মানুষ যত দিন মলিন প্রকৃতি গত, তত দিন তিনি এই সকারণ সুখ দুঃখের অধীন। যখন মানুষের অন্তরে সুখ দুঃখের উদয় হয়, সেই সঙ্গে তাহার এক প্রকার অন্তর্ চৈতন্য স্ফূর্ত্তি পায়। কিন্তু সে অন্তর্ চৈতন্যের দিকে তাহার দৃষ্টি ও মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না; যে কারণ হইতে তাহার সে চৈতন্য উদয় হইতেছে, তাহার দৃষ্টি ও মনোযোগ স্বভাবত তৎ প্রতি ধাবিত হয়। এইরূপে কারণ-গত হওয়াতে, চৈতন্য তাঁহার লক্ষ্য পথে আইসে না। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা তিনের অনৈক্য হেতু সে চৈতন্য কারণাবৃত হইয়া অপ্রত্যক্ষীভূত থাকে। অপ্রত্যক্ষীভূত থাকিলেও চৈতন্য যে এ স্থলে প্রকৃতি-গত তাহা সম্প্রমাণিত হইতেছে। পরা প্রকৃতিতে তাহা আরও সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। পরা প্রকৃতিতে সুখ দুঃখ নাই। ইহা স্বয়ং হ্লাদিনী—সাক্ষাৎ আনন্দ এবং সে আনন্দ নিত্য নিরবচ্ছিন্ন অকারণ, সহজ, আনন্দ। ধ্যান চিন্তা স্মরণ মননাদি যোগে সে আনন্দকে রক্ষা করিতে হয় না, প্রকৃত চিৎ সত্তার স্ফূর্ত্তি এই আবির্ভাবের সঙ্গেই প্রস্ফুট হয়।

সাধুর হৃদয়ে নিরবচ্ছিন্ন, অযত্ন-সিদ্ধ অকারণ সহজ আনন্দের স্ফূর্তিতেই প্রকৃত চৈতন্যের স্ফূর্তি;—তাঁহার আনন্দের সহজ অনুভূতিতেই, তাঁহার চৈতন্য স্বপ্রকাশ। তাঁহার দৃষ্টি ও মনোযোগ কারণ-গত হইয়া আবৃত না হওয়াতে, সেখানে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার সুন্দর ঐক্যস্থল প্রযুক্ত, সেখানে চৈতন্যের সহজ স্ফূর্তি। যে হৃদয়ে এই অকারণ সহজ আনন্দের স্ফূর্তি নাই, সেখানে চৈতন্য প্রভাত হইতে পারে না। এই কারণে প্রকৃতিকেই প্রাধান্য দিতে হয়, এবং এই প্রাধান্যের ইহা একটি প্রধান কারণ।

আমাদের আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব এই প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে আগে আগে পুরুষকে প্রাধান্য দিতেন, ঐ সকল কারণে এখন প্রকৃতিরই প্রাধান্য দিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেব যখন ঈশ্বর পুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মন্ত্র-দীক্ষিত হইলেন. সেই দীক্ষা বলে তাঁহার মন্ত্র চৈতন্য সঞ্চার হইবা মাত্র তিনি "কৃষ্ণ রে! বাপ রে!" বলিয়া কৃষ্ণানুরাগে কাঁদিয়া উঠিলেন; কিন্তু সকলেই জানেন, তাঁহার জীবনের শেষ দশায় তিনি "রাধা রাধা" বলিয়া রাই অনুরাগে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, রাধা প্রেমে আত্মহারা হইয়াছিলেন। "ও তাঁর এমনি আঁতের ঘা, 'রা' বই বল্‌তে নারে 'ধা'।"

আমাদের আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব যখন প্রথম আত্ম চৈতন্য লাভ করিয়া চিদভিমুখ স্রোতে নিপতিত হন, তখন তিনি প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হন নাই; প্রবল কৃষ্ণানুরাগে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। স্বকীয় বৈরাগ্য হেতু, অন্তর্ চৈতন্যের আকর্ষণে প্রকৃতির মুখ দর্শন, তাঁহার বিপ্রিয় বোধ হইত। তখন তিনি নিমীলিত নেত্রে, কৃষ্ণ মন্ত্র সাধন করিতেন, ধ্যান যোগে অন্তর্পথে তাকাইয়া থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার এ অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ক্রমে প্রকৃতির দিকে, তাঁহার দৃষ্টি এক এক বার পড়িতে লাগিল, এখন বুঝিতে লাগিলেন, যে প্রকৃতির মুখের দিকে তাকাইলে, ভক্তের মুখ চ্ছবির শোভার দিকে দৃষ্টি করিলে, অন্ত স্ফূর্তির গাঢ়তা হইয়া থাকে। এ অবস্থায় তিনি "কৃষ্ণ রাধা" মন্ত্র সাধন করিতে লাগিলেন। এখনও তিনি প্রকৃতিকে প্রাধান্য দেন নাই, এখনও তিনি পুরুষকেই প্রাধান্য দিয়া সাহায্যার্থে প্রকৃতিকে অবলম্বন করিতে লাগিলেন।—অন্তর্‌চৈতন্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভক্ত সঙ্গের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। এ অবস্থাও তাঁহার অন্তরে অধিক দিন স্থায়ী রহিল না। এখন তিনি পরাপ্রকৃতির লীলা ভূমি বৃন্দাবন ধামের সন্নিহিত,

এখন ভক্তই তাঁহার আকর্ষণের বস্তু হইল, অন্তর্‌চৈতন্যের আর আকর্ষণ রহিল না। তিনি দেখিলেন অন্তর্‌চৈতন্য, সাধু সঙ্গের,—ভক্ত সঙ্গের—নির্ম্মল প্রকৃতি সঙ্গের ফল মাত্র। এখন তিনি 'রাধা কৃষ্ণ' মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার লক্ষ্য স্থল ফিরিয়া গেলে। রাধাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইলেন। ভক্তই তাঁহার প্রধান আকর্ষণের বস্তু হইল। সেই অনুরাগে, সেই প্রেমে, তাঁহার অন্ত স্ফূর্ত্তির গাঢ়তা হইতে লাগিল। এ অবস্থাও তাঁহার অন্তরে অধিক দিন স্থায়ী রহিল না। ক্রমে প্রকৃতি দর্শন ও অন্তর্‌চৈতন্যে কোন প্রভেদ রহিল না। দুই এক হইয়া গেল। যে ভক্ত, যে প্রকৃতি,—সেই অন্তর্‌চৈতন্য হইয়া গেল। প্রকৃতি চৈতন্যময় হইয়া গেল, অন্তর্বাহ্য এক হইয়া গেল, কোন ভেদাভেদ রহিল না। এখন তাঁহার 'রাধা' মন্ত্রে সহজ উপাসনা। এখন তাঁহার চক্ষু ফুটিয়াছে, এখন কূটস্থ পরা প্রকৃতি তাঁহার দৃষ্টি পথে আসিয়াছে। এখন প্রকৃতির সর্ব্বত্রই তাঁহার ইষ্ট দেবতার স্ফূর্ত্তি। প্রাণের মধ্যে রাধা বই আর শব্দ নাই। আমাদের আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব এখন প্রকৃতিকেই পুরুষ দেখেন, রাধাকেই কৃষ্ণ দেখেন। কৃষ্ণ তাঁহার নিকট আর স্বতন্ত্র পদার্থ নহেন। প্রকৃতির সর্ব্বত্রই তাঁহার কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি।

সৃষ্টির সমস্ত বিকৃতি তাঁহার নিকট আর বিকৃতি নহে; তাঁহার চক্ষু নির্ম্মল হওয়াতে সমগ্র প্রকৃতি তাঁহার দৃষ্টিতে নির্ম্মল পরা প্রকৃতি হইয়া গিয়াছে। সমগ্র দৃষ্টি তাঁহার নিকট নির্ম্মল তুরীয় বেশ ধারণ করিয়াছে। তাঁহার এই বৃন্দাবনে কৃষ্ণের নাম নাই। কেবল রাধারই নাম। শ্রীরাধাই বৃন্দাবনের অধিকারিণী এবং সেখানে সকলেরই মুখে "রাধা রাণী কি জয়!"

সংক্রান্তি তত্ত্ব।

মাসের শেষ দিনকে সকলেই সংক্রান্তি বলিয়া জানেন, বাস্তবিকও মাসের শেষ দিনই যে সংক্রান্তি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু মাসের শেষ দিনকে কেন সংক্রান্তি বলা যায় অর্থাৎ সংক্রান্তির তাৎপর্য্যার্থ কি অনেকেই তাহা জানেন না। সূর্য্যাদি গ্রহগণের একরাশি অতিক্রম করিয়া অপর রাশিতে প্রবেশ করাকেই যে,সংক্রান্তি বলা যায়, ইহা এতদ্দেশীয় পণ্ডিত

গণের বিদিত থাকিলেও, সায়ন ও নিরয়ন ভেদে সংক্রান্তি যে দ্বিবিধ, এতত্ত্ব অনেকেরই অবিদিত রহিয়াছে। প্রচলিত পঞ্জিকাতে অয়নাংশ অনুসারে সংক্রান্তির গণনা হয় না, বহুকাল পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ নিরয়ন প্রবেশানুসারে যে সংক্রান্তির গণনা করিয়াছিলেন, আজিও তাহাই অব্যাহত রহিয়াছে। অয়নাংশ অনুসারে সংক্রান্তির গণনা করিলে নিরয়ন সংক্রান্তি দিবসের প্রায় ২১ দিন পূর্ব্বে সায়ন সংক্রমণ হয়, ইহাকেই প্রকৃত সংক্রান্তি বলা যায়, ইহা যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে। "মুহূর্ত্তচিন্তামণি" প্রভৃতি গ্রন্থে সায়ন সংক্রান্তিরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে, যথা,

"তথায় নাংশা থরসা হতাশ্চ, স্পষ্টার্ক পত্যা বিহৃতা দিনাদ্যৈঃ।
মেষাদিতঃ প্রাক্চলনং ক্রমাৎস্যু, দানে জপাদৌ বহুপুণ্যদাস্তে॥

আমাদের দেশে সংক্রান্তি-জ্ঞানের বা সংক্রান্তিগণনার বিশুদ্ধতার যত প্রয়োজন, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে তত নয়। কেননা সংক্রান্তির সহিত হিন্দুজাতির ধর্ম্ম কর্ম্মের অতি নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। মহাবিষুব ও উত্তরায়ণ সংক্রান্তিদিবসে হিন্দুগণের বিস্তর ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সংক্রান্তির অবিশুদ্ধতা নিবন্ধন অনুষ্ঠানেরও যে, বিশুদ্ধতা নষ্ট হইতে পারে ইহা বলা বাহুল্য। আরও, ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া নহে, জাতক-স্কন্ধের অর্থাৎ ফলিত জ্যোতিষের সংক্রান্তির সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। অতএব নিরয়ন সংক্রমণ অনুসারে গ্রহগণের শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিলে তাহা যথাযথ হইতে পারে না, অবশ্যই সময়ের অন্যথা হইয়া যায়। গণিত স্কন্ধের ন্যায় জাতক-স্কন্ধ যে, সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন নয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু ইহার যে অংশ বিশুদ্ধ, বর্ত্তমানকালে উক্ত কারণাদি বশত সর্ব্বত্র তাহার আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ইদানীং কেহ কেহ অন্তরীক্ষ-চর গ্রহগণের সহিত পৃথিবীস্থ মানবগণের যে, কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে, তৎপ্রতি বিশ্বাস করেন না, সুতরাং জ্যোতিষ শাস্ত্রের ফলিত ভাগের প্রতি ইঁহাদিগের শ্রদ্ধা নাই। গণেশ-দৈবজ্ঞ নামক জ্যোতির্বেত্তাও জাতক-স্কন্ধের প্রাধান্য আদৌ স্বীকার করেন নাই। ইনি বলেন;—জন্মকালীন গ্রহব্যবস্থা বিচারাদে তস্মিন্কালে সুখ মেতস্মিন্ কালে চ দুঃখ, মিতি জ্ঞানং স্যাৎ তচ্চ ন পুরুষার্থঃ। তদেব নিষ্প্রয়োজনত্বাৎ বিচারো-নারম্ভনীয়ঃ কিঞ্চ সুখ দুঃখ কালজ্ঞানমাপি ন সম্ভবতি"। অর্থাৎ জন্মকালীন গ্রহ ব্যবস্থা বিচারে একালে সুখ, সে কালে দুঃখ হইবে, এই যে জ্ঞান, ইহা

পুরুষার্থ নহে, অতএব নিষ্প্রয়োজন হেতু তাহার বিচারই আরম্ভ যোগ্য নহে। আর সুখ দুঃখ কাল জ্ঞান ও সম্ভব পর হইতে পারে না।

ইউরোপ খণ্ডেও এক সময়ে ফলিত জ্যোতিষের বিশেষ আদর ছিল, সম্প্রতি নাই বলিলেই হয়; কিন্তু আশানুরূপ ফল লাভ না হইলেও আমাদিগের দেশে শুভাশুভ ফল গণনা বিষয়ে অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক অনেক স্থলে ফলিত জ্যোতিষের অতি আশ্চর্য্য গণিত ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যাহা হউক এতদনুসারে শুভাশুভ ফল গণনা করা ভাল নহে, কেন না নিজের বা অন্তরঙ্গ জনগণের ভবিষ্যৎ অশুভ ফলের বিষয় জানিতে পাইলে, অনেকেরই অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হয়। মৃত্যু কালের অল্পতা জানিতে পাইয়া কেহ কেহ যে, জীবন্মৃত হইয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে।

পৃথিবীর যে প্রদেশে দণ্ডায়মান হইলে উত্তর ও দক্ষিণ ধ্রুব দ্বয়কে তুল্যরূপে পৃথিবীর সহিত সংলগ্ন দেখা যায়, সেই প্রদেশের অর্থাৎ পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলের উপরিস্থ আকাশে যে বৃত্তাকার রেখার কল্পনা করা যায়, তাহার নাম বিষুবৎ বৃত্ত এবং রাশিচক্রের সমসূত্রপাতে তন্নিম্নে যে বৃত্ত কল্পিত হয়, তাহাকে ক্রান্তিবৃত্ত বলা যায়। যে দুই স্থানে উক্ত উভয় বৃত্ত পরস্পর তির্য্যক ভাবে মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম ক্রান্তিপাত; এই ক্রান্তিপাতের পূর্ব্ব বা পশ্চিমে যে গতি হয়, জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাহা অয়নাংশ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। যে সময়ে অয়নাংশ ছিল না অর্থাৎ যে সময় মীন রাশির এবং কন্যা রাশির অন্তর্ভাগে ক্রান্তিপাত ছিল, সেই সময়ের গণিতানুসারে যে, সংক্রান্তি নির্ণীত হইয়াছে, তাহাকেই নিরয়ন সংক্রান্তি বলা যায়। প্রচলিত পঞ্জিকাতে এই নিরয়ন সংক্রান্তিই স্থিরতর রহিয়াছে। সম্প্রতি অয়নাংশের পরিমাণ ২০।৪৬।৩০ কুড়ি অংশ, ছচল্লিশ কলা, ত্রিশ বিকলা। অর্থাৎ উক্ত ক্রান্তিপাত মীনের শেষ সীমা ৩০ অংশ হইতে প্রত্যহ ৯ প্রবিকলা করিয়া পিছাইয়া মীনের ১০ম, অংশে গমন করিয়াছে। সুতরাং নিরয়ন সংক্রান্তি দিনের, প্রায় ২১ দিন পূর্ব্বেই সায়ন সংক্রমণ হয়। সূর্য্য, যে সময়ে মীন বা মেষ রাশিস্থ ক্রান্তিপাত স্থল প্রাপ্ত হন, সেই সময়কেই মহাবিষুব সংক্রান্তি বলা যায়। বলা বাহুল্য যে, এই স্থান সম্প্রতি মীন রাশির ১০ম অংশে আছে; সুতরাং চৈত্র মাসের ১০ই তারিখেই সায়ন মহাবিষুব সংক্রান্তি হয়। এই সায়ন-ক্রান্তিকেই প্রকৃত সংক্রান্তি বলা যায়। প্রতি বৎসর ৫৪

চুয়ান্ন বিকলা করিয়া অয়নাংশের বৃদ্ধি হয়। বর্ত্তমান সময়ে অয়নাংশের পরিমাণ ২০।৪৬।৩০। তদনুসারে গণনা দেখিলে ১৩৫৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৪২১ শকাব্দে অয়নাংশ ছিল না, জানা যায়। তাৎপর্য্যার্থ এই যে, উক্ত শকাব্দে মীন ও কন্যা রাশির অন্তর্ভাগে ক্রান্তিপাত ছিল।

ক্রান্তিপাত স্থানের উক্তরূপ গতিকে "অয়ন-চলন" বলা যায়। এই অয়ন চলন সম্বন্ধে জ্যোতির্ব্বিদগণের মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, ক্রান্তিপাত, ক্রমশ ২৭ অংশ পর্য্যন্ত পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া পুনরায় প্রতিদিন ৯ নয় প্রবিকলা করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, আবার যথা স্থানে অর্থাৎ রেবতী নক্ষত্রের নিকটে উপস্থিত হইবে, এবং তথা হইতে মেষ রাশির ২৭ অংশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া আবার রেবতী নক্ষত্র পর্য্যন্ত প্রতি গমন করিবে। ঘটিকা যন্ত্রের দোলক (পেণ্ডুলাম) যেরূপ স্বীয় লম্বস্থান হইতে একবার এদিক আর বার ওদিক অবিশ্রান্ত গমনাগমন করে, ক্রান্তিপাতও সেইরূপ একবার পশ্চিমদিকে মীনের ২৭ অংশ, আরবার পূর্ব্বদিকে মেষের ২৭ অংশ পর্য্যন্ত যাতায়াত করে।

দ্বিতীয় মত এই যে, ক্রান্তিপাত, মীনের শেষ বা মেষের আদি হইতে পশ্চিমাভিমুখে সম্যক্ রাশি চক্রের ৩৬০ অংশ অতিক্রম করিয়া পুনরায় যথা স্থান প্রাপ্ত হইবে। মীনের শেষ সীমাকে যথা স্থান বলিবার কারণ এই যে, সৃষ্টিকালে, ক্রান্তিপাত এই স্থানেই ছিল, আর্য্য জ্যোতিষশাস্ত্রের ইহাই অভিমত। এই দ্বিতীয় মতের সহিত ইউরোপীয় মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। এই স্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, আর্য্য জ্যোতিষশাস্ত্রে ক্রান্তিপাতের বার্ষিক গতি ৫৪ চুয়ান্ন বিকলা লিখিত আছে; কিন্তু ইউরোপীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে কিঞ্চিদধিক ৫০ পঞ্চাশ বিকলা নির্ণীত হইয়াছে। এতদনুসারে ক্রান্তিপাতের সমস্ত রাশিচক্র অতিক্রম করিতে ২৫৮৬৮ বৎসর অতিবাহিত হয়। অয়নাংশের গতির পরিমাণ সম্বন্ধে আর্য্য মতের সহিত ইউরোপীয় মতের অতি সামান্য অনৈক্য দৃষ্ট হয়।

পরস্পর সপ্তম রাশি অন্তরে (বর্ত্তমান সময়ে মীন ও কন্যাতে) বিষুবৎ বৃত্ত বা ক্রান্তিবৃত্তের যে দুইটি মিলন স্থল আছে, তাহাকেই ক্রান্তিপাত বলা যায়। আমাদের দেশে রাহু কেতু নামে যে দুইটি গ্রহ বিখ্যাত আছে, পৌরাণিক কল্পনানুসারে, যাহাদিগকে সাধারণ জনগণ মূর্ত্তিমান দৈত্য বা অসুর বলিয়া জানেন, উপরোক্ত ক্রান্তিপাত দ্বয়ই সেই রাহু এবং কেতু; একথা

বলিলে অনেকেই চমকিত হইবেন; কিন্তু হইলে কি হয়, সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রের (Astronomy) প্রত্যক্ষ প্রমাণানুসারে সাহস সহকারে বলা যাইতে পারে, উক্ত ক্রান্তিপাত দুইটিই রাহু ও কেতু। এই দুই স্থানেই চন্দ্র ও সূর্য্যদেব পৃথিবী ও চন্দ্র বিম্বের ছায়াদ্বারা সময় বিশেষে আবৃত হইয়া থাকেন। পৌরাণিক কল্পনাতে ইহাই রাহু কর্ত্তৃক চন্দ্র সূর্য্যের গ্রাসরূপে কল্পিত হইয়াছে। যাহার বাস্তবিক আকার নাই, কবিকল্পনা, তাহারই ভীষণ মূর্ত্তি অতত্ত্বজ্ঞ নর নারীর হৃদয়ে দৃঢ়তর রূপে অঙ্কিত করিয়াছে। এস্থলে পৌরাণিক কল্পনা বৈজ্ঞানিক কল্পনাকে পরাভব করিয়াছে।

যে সংক্রান্তি-তত্ত্ব উপলক্ষে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল, আমাদের কল্পনা দেবী সেই নির্জ্জীব নিরাকার সংক্রান্তির কেমন আশ্চর্য্যরূপ রূপ আমাদিগের গোচর করিয়াছে! সংক্রান্তির সেই বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিটি অনেকেই প্রচলিত পঞ্জিকাতে অবলোকন করিয়াছেন। কল্পনা দেবী, সাক্রান্তির কেবল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠাও করিয়াছেন।

আমাদিগের দেশের পঞ্জিকাতে সংক্রান্তির দ্বিভুজ পুরুষ মূর্ত্তি দেখা যায়, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রদেশ বিশেষে নবভুজা স্ত্রীমূর্ত্তি সংক্রান্তির পূজার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভূপাল-প্রদেশ-বাসী ওঙ্কার ভট্ট নামক কোন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত "জ্যোতিষ চন্দ্রিকা" নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে নবভূজা মূর্ত্তির বিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে। লিপি বাহুল্য ভয়ে আমরা এ বিষয় অধিক লিখিতে ক্ষান্ত হইলাম। দ্বিভুজ স্থলে দুই ক্রান্তিপাত এবং নবভুজ স্থলে নবগ্রহকেই কল্পনার মূল কারণ বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীগোবিন্দমোহন রায়।
কাকিনীয়া।

কুলীন-পত্নী।

১

তবে কেন এ দারুণ পরিণয়-পাশে,
তবে কেন এ দারুণ ধর্ম্মের বিশ্বাসে,
করেছিলে বল ও হে আমায় বন্ধন ?
ক্ষণেকের তরে তবে কেন, ছি ছি হায় !
করিয়াছ 'গরবিত' এনারী জীবন ?
হে নিষ্ঠুর পাষাণ হৃদয় !

২

করিবে এ বিড়ম্বনা, ছিল যদি মনে,
তবে কেন বল এই ধর্ম্মের বন্ধনে
বাঁধিলে আমায় !
বাঁধিলে আমায় কেন, হায়! জনমের তরে
করিতে দুর্গতি ?
হে নির্দয় নিষ্ঠুর দুর্মতি !

৩

এ যে ধর্ম্মের বন্ধন ! উদ্বাহ-শৃঙ্খল !
এনারী জীবনে এ যে অচল অটল !
ছেদ্দিব কেমনে !
ছেদ্দিব কেমনে হায়! লঙ্ঘিব কেমনে বল
পরিণয়ের বন্ধনী ?
আমি যে হিন্দুর মেয়ে—বঙ্গের রমণী !

৪

জানিতে যদ্যপি তুমি হবে না আমার,
তিলেক ছুইয়েছিলে কেন হে আমায় ?
তিলেক ছুঁইয়ে কেন জন্মের মতন
করেছ নিষ্ফল মম এ. নারী জীবন !!

৫

হায় সেই কৌমার্য্য আমার !
বঙ্গ নারীর সম্বল
ফিরে পাব কি তা আর—
এনারী জীবনে—
সেই অভঙ্গিত ধনে—
সেই স্বভাবজ সতীত্ব রতনে ?
হায় বৃথা করিয়াছ তুমি তা সংহার,
ক্ষণেকের তরে অঙ্গ পরশি আমার !

৬

প্রবঞ্চক !
করিয়াছ অপচয় আমার 'স্ত্রীধন'
তুমি অকারণ ;
জাননা কি আছে আজও দেবতা ব্রাহ্ম
আছে আজও রবি শশী নক্ষত্র পবন ?
আছে ধর্ম্মমাথার উপর ;
কেন দাও না উত্তর ?
আজ ধর্ম্মপানে তাকাইয়ে
কোন পথে যাব আমি. দাও দেখাইয়ে

৭

পেয়েছি সাক্ষাৎ যদি বহু অন্বেষণে,
জিজ্ঞাসি তোমায় বল, বল কি কারণে
কি কারণে, কোন প্রাণে, হায় কি বিচা
পাথারে ভাসা'লে বল এই দুঃখিনী
যদিও পাষাণে তব নির্ম্মিত হৃদয় ;
তবুও কি হয় না কিছু সম্ভ্রমেরও ভ

পরিণীতা ধর্ম্ম-পত্নী আমি হে তোমার,
একথা অবশ্য তুমি করিবে স্বীকার;—
স্বচক্ষে দেখিয়ে তবে মোর 'এসময়',
একটুও হয় না কি হে সম্ভ্রমেরও ভয়?
প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসি তাই, নয়ন খুলিয়ে
কোন পথে যাব আমি দেও দেখাইয়ে!
বার বার শত বার জিজ্ঞাসি তোমায়,
কোন পথে দাঁড়াইব, বল হে আমায়।

৮

কোন কুলে দাঁড়াইব, বল না আমায়?
বল কার কাছে যাব কে দিবে আশ্রয়?
কে দিবে আশ্রয় ওরে,
হায় এই অভাগীরে
কে আছে কোথায়?
কোন কুলে দাঁড়াইব বল না আমায়!
খেয়েছ ত মাথা মোর জন্মের মতন,
কোন কুলে দাঁড়াইব বল না এখন!

৯

বল কার কাছে যাব, নারী ধর্ম্ম বাঁচাইব
বল না কেমনে,
এই পাপ শরীরের তরঙ্গে—তুফানে,
নারী ধর্ম্ম বাঁচাইব বল না কেমনে?
তুমি ত কুলীন-শ্রেষ্ঠ কুলীন-সন্তান
ধর্ম্ম-পত্নী কোন কুলে করিবে প্রদান!

১০

করি কত আয়োজন, তব করে সমর্পণ,
আহা কত অহঙ্কারে
কত না গৌরব করে,
করিয়াছিলেন পিতা আমায় তখন,—
তুমিও আপন করে, যথাবিধি ধর্ম্মাচারে
করেছিলে সভাস্থলে আমায় গ্রহণ।
সে কথা কি মনে নাই তোমার এখন?

১১

করেছিলে অঙ্গীকার কোন কথা বারম্বার
নাহি কি হে মনে?
রেখে সাক্ষি দেবতা ব্রাহ্মণে?
রেখে সাক্ষি চন্দ্রমা তপনে
করেছিলে অঙ্গীকার,
সেই কথা বার বার
কিছু কি তা মনে নাই তোমার এক্ষণে?

* * * *

১২

পিতা মাতা পরলোকে ভ্রাতা নাই হায়
কাহারে বলিব , না বলে তোমায়
আশ্রিত তোমার দাসী! কি কহিব আর
আপনিই তুমি নাথ কর গো বিচার।
বিচার কর গো আজ দাসীর উপায়,
নতুবা এখনি এই—এই ছুরিকায়
তোমার সম্মুখে নাথ ত্যজিয়া জীবন
জুড়াইব এ যাতনা জন্মের মতন।
মর্ম্মান্তিক দুঃখে নাথ উন্মাদিনী প্রায়
বলেছি অনেক কথা, আজ গো তোমায়
দাসী বলে ক্ষমা কর ধৃষ্টতা আমার
পর-লোকে হয় যেন পাপীর উদ্ধার।*

* 'কুলীন-পত্নীর', যে কয়েকটি উক্তি এই পদ্যে প্রকাশিত হইল, তাহা প্রকৃত ও বিশেষ ঘটনা মূলক। লেখক।

পৌত্তলিকের শক্তিপূজা।

প্রতিবাদ।

বিগত চৈত্র মাসের ৯ম সংখ্যার নবজীবনে 'পৌত্তলিকের শক্তি পূজা' প্রস্তাবে. প্রস্তাব লেখক মহাশয় ঈশ্বর পূজা সম্বন্ধে পৌত্তলিককে একেশ্বর বাদী অপেক্ষা উচ্চ সোপানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রকৃত একেশ্বর বাদী, পৌত্তলিককে ঘৃণাচক্ষে দর্শন করা দূরে থাকুক বরং তাঁহাকে এক লক্ষ্যান্বেষী সহযাত্রী জানিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন। ঈশ্বর প্রাপ্তিরূপ পরম শান্তি সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য হওয়াতে, পৌত্তলিক ও একেশ্বর বাদীদিগের মধ্যে সাধন প্রণালীগত বৈষম্য ব্যতীত মূল মন্ত্রে কোন প্রকার বিভিন্নতা নাই। পরম পূজনীয় শ্রীকৃষ্ণ ভক্তার্জ্জুনকে জ্ঞানোপদেশ সময়ে কহিয়াছিলেন যে "হে পার্থ! আমার ভক্ত সকল যে প্রণালীতে আমার পূজা করুন না কেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের পূজাই আমি প্রাপ্ত হই।" এই মহান সত্য বাক্য দ্বারা পৌত্তলিক ও একেশ্বরবাদী উভয়েই সমভাবে আশ্বস্ত হইয়াছেন, কিন্তু এই পূজা ও উপাসনার প্রণালী-গত বিশুদ্ধতার ইতর বিশেষানুসারে সাধকের পরম শান্তি প্রাপ্তি সময়ের দৈর্ঘ্য হ্রস্বত্ব হইয়া থাকে। কলিকাতা হইতে কাশী গমনার্থ একজন রেলওয়েতে বাষ্পীয় রথে গমন করিলেন, আর এক জন পদব্রজে গমন করিলেন; জিজ্ঞাসা করি, এই দুই যাত্রী কি ঠিক একই সময়ে কাশী পৌঁছিবেন? কখনই না। কাশী গমনের প্রণালীগত তারতম্যানুসারে তথায় পৌঁছিবার সময়েরও তারতম্য হইবে। লেখক মহাশয় যে যুক্তিতে কহেন যে লোক প্রথমে জড়োপাসক ছিল, সে যুক্তির জগৎ ব্যাপকত্ব (Universal applicability) নাই, সর্ব্বত্র খাটে না। লেখক মহাশয় অনুধাবন করিলে দেখিতে পাইবেন, যে একেশ্বর পূজা অতি প্রাচীনকাল হইতে আবহমান চলিয়া আসিতেছে; কেবল দুর্ব্বলাধিকারীর জন্য পৌত্তলিক পূজার অবতারণা ও ঈশ্বরাবতারদের প্রয়োজন। পূজনীয়া মৈত্রেয়ী, সুলভাদি স্ত্রীলোক, সকলে একেশ্বর বাদিনী ছিলেন।

লেখক মহাশয় কিরূপে কহেন, যে পৌত্তলিক পুত্তলীর অন্তর্নিহিত অসাধারণ অজ্ঞেয় শক্তির পূজা করেন, পুত্তলীর পূজা করেন না? পূজাকালে পৌত্তলিক তাঁহার সম্মুখস্থ পুত্তলী মধ্যে প্রথমে ঈশ্বরের শক্তিকে আবাহন

(প্রাণ প্রতিষ্ঠা) না করিয়া, কোন মতে পূজায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। যে কালে একেশ্বর বাদী সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার প্রাণাধার ঈশ্বরের সত্তায় পরিপূর্ণ জানিয়া, তাঁহার ন্যায় ও দয়া প্রভৃতি গুণের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করেন ও মনের সাধে হৃদয়ের মর্ম্ম কথা তাঁহাকে নিবেদন করেন, সেই সময়ে পৌত্তলিক মৃত্তিকা কিম্বা প্রস্তর নির্ম্মিত পুত্তলির অভাবে ঈশ্বর পূজায় বঞ্চিত হইয়া, যেন ঈশ্বর বিহীন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে থাকেন। কারণ তাঁহার ঈশ্বর তাঁহার পক্ষে সীমাবদ্ধ। ঈশ্বরের যে মহতী শক্তি আদ্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার শক্তি-চ্ছেদ ও স্থানান্তর সন্নিবেশ—যুক্তি বিরুদ্ধ ও কাল্পনিক ভাবাবৃত। এস্থলে পৌত্তলিক কি ঈশ্বরের সর্ব্ব-বিদ্যমানত্ব শক্তির থর্ব্বতা করিতেছেন না? যে পৌত্তলিক পূজাকালে সম্মুখস্থ পুত্তলিকা না দেখিয়া তন্মধ্যস্থ ঐশ্বরিক শক্তিকেই কেবল দেখিতে পান, তাঁহাকে আমরা পৌত্তলিক বলি না। তিনি পৌত্তলিক নামধারী হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে একেশ্বরবাদী। কিন্তু যিনি সম্মুখস্থ পুত্তলিকা না দেখিলে ঈশ্বর শক্তিকে ধ্যান করিতে পারেন না, তিনি গৌণ কল্পে যে নশ্বর পুত্তলীকে কিয়ৎ পরিমাণে ঈশ্বর স্থানীয় করিয়া থাকেন এবং একেশ্বরবাদীর ন্যায় একই সময়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সমর্থ হন না, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পৌত্তলিক তাঁহার ইষ্ট দেবতার তুষ্টি সাধনার্থ পশ্বাদি বধ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না, কিন্তু একেশ্বর বাদী তাঁহার ইষ্ট দেবতার ভিতরে অযুত লোক সম্পন্ন ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত দেখিয়া, তাঁহার প্রীত্যর্থ পশুবধ করা আবশ্যক বোধ করেন না।

লেখক মহাশয় যে ভাবে ঈশ্বরের জ্যোতিঃস্বরূপ ধ্যানের বর্ণনা করিয়াছেন, একেশ্বরবাদী সে ভাবে ঈশ্বরের ধ্যান করেন না। তাঁহার ধ্যানের মূলে পরম পূজনীয় আর্য্য ঋষিগণোক্ত প্রাচীন সত্য শব্দ সকল—"যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ" ইত্যাদি তিনি নিরন্তর শ্রবণ করেন। পৌত্তলিক যখন তাঁহার ঈশ্বরের "ন্যায়" গুণের ধ্যান করেন, একেশ্বর বাদীর অন্তঃকরণে সে অবস্থায় ঈশ্বরের ন্যায়, দয়া মঙ্গলাদি গুণ ও ভাব সকলের শক্তি সমষ্টি একীভূত হইয়া "যতোবাচা নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি বাক্যার্থে মিলিত হইয়া ও তাঁহার তদবস্থার প্রত্যেক মানসিক ভাবের ক্ষুদ্রত্ব প্রদর্শন করাইয়া তাঁহাকে এই পৃথিবী মধ্যেই এমন এক অভিনব আধ্যাত্মিক শান্তিময়ী অবস্থায় নীত করে, যে, সে অবস্থা পৌত্তলিকের কল্পনায়ত্ত নহে। বিবেক

ও আত্ম প্রত্যয় বলে একেশ্বর বাদীকে ঈশ্বরের কোন একটি বিশেষ গুণকে আলোচনা ও অধ্যাসনা দ্বারা আয়ত্ত করিতে হয় না। "ঈশ্বর" "প্রাণারাম" শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র তাঁহার হৃদয়ের তন্ত্রী সকল একে বারে বাজিয়া উঠে। তাঁহার প্রাণের ভিতরে এককালে ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রেম, শক্তি ও মঙ্গল ভাবের সমষ্টি আকার বিহীন স্রোতে উদ্বেলিত হইয়া তাঁহাকে যে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহা তিনিও জানিতে পারেন না। এই সময়ে তাঁহার নিকট অনল নাই, অনিল নাই, কিছুই নাই, কেবল সেই জীবন্ত চৈতন্যের অস্তিত্ব বোধ মাত্র অব্যক্ত আকারে অবস্থিতি করে। অপিচ একেশ্বর বাদী ঈশ্বরের গুণ সমষ্টির আলোচনা করেন বলিয়া, তাঁহার বুদ্ধি বৃত্তির সামর্থ ও আয়তন বৃদ্ধি হয় এবং তজ্জন্য তিনি ঈশ্বরের কোন একটি নির্দ্দিষ্ট গুণধারী পৌত্তলিক অপেক্ষা যে প্রতিভাশালী, এবং সত্য গ্রহণ ও অবধারণে অধিকতর সমর্থ,—তাহাতে আর সন্দেহ কি? দুইটি বালকের মধ্যে একটি পাঁচ বৎসর কাল সাহিত্য, গণিত ও জ্যামিতি শিক্ষা করিল; অপরটি পাঁচ বৎসর কাল কেবল সাহিত্য শিক্ষা করিল, ইহাদের মধ্যে বহু বিষয় দর্শন জনিত বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষতায় যে প্রথমোক্তটি শ্রেষ্ঠ, ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার্য্য। ঈশ্বর দুর্জ্ঞেয়। পরিমিত মনুষ্য যখন তাঁহার অন্যান্য গুণের কথা দূরে থাকুক, একটি গুণকে সমক্রূপে আয়ত্ত ও অবধারণ করিতে পারে না, তখন একেশ্বরবাদী যে ঈশ্বরের একটি একটি গুণ-সৌন্দর্য্যে নব ভাবে মোহিত হইয়া পৌত্তলিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সৃষ্ট বস্তুর সহিত স্রষ্টার উদাহরণ দিতে দোষ নাই বটে, কিন্তু সৃষ্ট ও স্রষ্টার প্রভেদ রক্ষা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। একেশ্বর বাদী যখন ঈশ্বরের "চরণ" শব্দ উচ্চারণ করেন তখন তিনি পঞ্চ অঙ্গুলি বিশিষ্ট চরণকে অভিপ্রায় করেন না। "চরণ" শব্দটি তাঁহার ঈশ্বরের নিকটে বিনীত ভাবের পূর্ণ বিকাশ ব্যঞ্জক; কারণ এই বিনীত ভাব প্রকাশার্থ তাঁহার অন্য ভাষা নাই, তাঁহার শব্দ নাই, শাস্ত্র নাই ও তাঁহার ব্যাকরণ নাই। যোগীগণ সাধারণকে বুঝাইবার জন্যে ঈশ্বর জ্যোতিকে সূর্য্য রশ্মির ন্যায় করিয়া উদাহরণ দিয়াছেন, কারণ, সূর্য্য শব্দ অপেক্ষা জ্যোতি প্রকাশক শব্দ অভিধান মধ্যে নাই। নতুবা সূর্য্যরশ্মির সহিত ঈশ্বর জ্যোতির সমকক্ষতা প্রদর্শন করেন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে সূর্য্যরশ্মি ঈশ্বর জ্যোতির ছায়ার ছায়া মাত্র।

পৌত্তলিক ও একেশ্বরবাদীর মধ্যে প্রভেদ এই যে, একেশ্বরবাদী পৌত্তলিক হইতে অপেক্ষাকৃত উন্নতিশীল ও অগ্রগামী। একেশ্বরবাদীর ঈশ্বর চিন্তা সম্পূর্ণ রূপে পৌত্তলিকতা শূন্য এবং বিবেকাদেশ ও শাস্ত্রাজ্ঞা পালন জন্য তিনি ততদূর অন্যদীয় দৃষ্টান্ত সাপেক্ষ নহেন। কারণ কর্ত্তব্য কার্য্য পালন জন্য তিনি মুহুর্মুহু বিবেকাদেশ শ্রবণ করিয়া থাকেন। যেমন পশু হইতে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, যেমন অচেতন হইতে চেতন শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পৌত্তলিকের আশ্রিত, সীমাবিশিষ্ট ঈশ্বরচিন্তা হইতে অপৌত্তলিকের, অবলম্বরহিত, অসীম ঈশ্বরচিন্তাই শ্রেষ্ঠ এবং এই শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আমরা বিবেকের আদেশ যত বুঝিতে পারিব, ততই আমরা শীঘ্র শীঘ্র শান্তি নিকেতনের নিকটস্থ হইব। অজ্ঞান, কুসংস্কার আমাদের পথের কণ্টক মাত্র। আধ্যাত্মিক নিয়মে এই সকল এক সময়ে দূরীভূত হইবেই হইবে, তবে আমাদের স্বীয় স্বীয় যত্নে গন্তব্য পথের এই সকল বিঘ্ন যত শীঘ্র অতিক্রম করিতে পারিব, তত শীঘ্রই আমরা শান্তি সুখে সুখী হইব।

শ্রীরসিকলাল রায়।
হাজিপুর।

কেন লেখা হইল না।

রামশরণের বড়ই লিখিবার সাধ; ছাপিবার সাধ তাহা অপেক্ষাও বেশী। ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহারই বা না হয়! সুতরাং রামশরণ লেখেন। লেখাও বিস্তর। রামশরণ লিখিয়াছেন, গদ্য, পদ্য, কাব্য, নাটক, নবেল, উপন্যাস, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ছাই, মাথা, মুণ্ড। অতএব বন্ধুমহলে রামশরণ প্রতিভাশালী বলিয়াই পরিচিত। "রামশরণের লেখা না কি ছাপার সাজে সাজিয়া কখন বাহির হয় নাই, তাই এখনও তাঁহার নামশব্দ মহলেও প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

বিনোদলালও লিখিয়ে লোক। শুধু লিখিয়ে নয়, ছাপিয়েও বটে। রামশরণের সঙ্গে বিনোদলালের দুদিন-দশ-দিনকার পরিচয়। সেই পরিচয়ের সুপারিসে আজি একটা মতলব সিদ্ধির কল্পনা রামশরণের মনে উঠিল।

মতলব এই যে, বিনোদলালের সহিত মোহর যুক্তে, লেখক বলিয়া ছাপাখানার মারফত রামশরণ জাহির হইবেন।

এ কথা সে কথার পর, রামশরণ বিদ্যার কথা পাড়িল। প্রথমে বিনোদলালের বিদ্যা, তাহার পর নিজের বিদ্যা। শেষ ভাগটায় বিনোদলালের সৌম্য-ভাবটা রৌদ্র ভাবের দিকে ঈষৎ চলিতে আরম্ভ করিল। বিনোদলাল বলিলেন 'তা শোনবার বাধা কি আছে, তবে আমার সময় বেশী নাই। তা হোক, কি নবেল লিখেছেন তা নয় একটু পড়ুন। দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া, রামশরণ পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

* * * * * * * * * *

"রাইমণির নামটি যেমন সেকেলে, বুদ্ধিখানিও তেমনি। অথচ রাইমণি সুন্দরী, যুবতী এবং তুই ভাগ বর্ণ পরিচয় তাহার কণ্ঠস্থ। বিকালে রাইমণি এক খানি কাশীদাস পড়িতেছেন।"

"অতিকষ্টে অথচ প্রগাঢ় মনোনিবেশ করিয়া যদি কোন কার্য্যোদ্ধার করিতে হয়, তাহা হইলে বাহ্যজ্ঞান কোন মতেই রক্ষা করা যায় না। রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেও থাকে না। রাইমণি পড়িতেছে। কপালে মুক্তা পাঁতির ন্যায় স্বেদ বিন্দু সকল দাঁড়াইয়াছে। সুগোল গণ্ডদ্বয় অলক্তাভ হইয়াছে। যেন টুসি মারিলে রক্ত ফুটিয়া বাহির হইবে। খঞ্জন গঞ্জন নয়ন দ্বয় এখন পোষা পাখীর মত চক্ষু পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া স্পন্দহীন হইয়াছে। সুতরাং নিশি যে সেই খানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে, রাইমণি তাহা দেখিতে পায় নাই। শুধু তাই নয়, সত্যই রাইমণি একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য। গায়ের কাপড় খসিয়া পায়ে পড়িতেছে। কাবুল প্রান্তস্থিত ইংরেজ রুষিয়ার Debatable ground এর মত কতক্ষণ কোথা কাপড় থাকিবে, কিছুই নিশ্চয় বলা যায় না। রাইমণির হৃ— * * * *"

বিনোদলাল বলিলেন, "রক্ষা কর, আর পড়িতে হইবে না। লেখা অমনি অমনি হয় না। আগে রুচি শেখা চাই।" রামশরণ অপ্রতিভ হইল। বলিল 'নিশি যে মেয়ে মানুষ তায় সেখানে আর কেহ উপস্থিত নাই। তবে একটু স্বভাব বর্ণনায় দোষ কি?' বিনোদলাল এ কথার উত্তর দিলেন না। নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া চক্ষু রঞ্জিত করিয়া উঠিয়া গেলেন।

রামশরণের সে নবেল অদ্যাপি ছাপা হয় নাই। তাহাতে ভাল কথা ছিল, কি মন্দকথা ছিল? কেমন করিয়া জানিব, কিন্তু ইহা জানি, যে রামশরণ সেই অবধি

বিকাল বেলায় কেবল পুরবী রাগের আলাপচারি করিত। গুণ গুণ স্বরে কেবল "দিবা অবসান" গাইত। তাহাতে নিতান্ত বিরক্তি ধরিলে, কাগজ কলম লইয়া ব্রহ্মসংগীত রচনার চেষ্টা করিত। দুঃখের বিষয় বেচারির একটিও গান সম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই। চরণ ভাবিলে পা মনে পড়িত। পা মনে পড়িলে রাইণিকে মনে পড়িত। রাইমণিকে মনে পড়িলে, বিনোদলাল মনে আসিত। আর সঙ্গে সঙ্গে হস্তের অঙ্গুলি গুলি স্পন্দহীন হইত, হাতের কলম খসিয়া পড়িত। কিন্তু বায়ুর ক্রিয়া মনুষ্যের শাসনাধীন নয়। অধুনাতন বৈজ্ঞানিকেরা স্নায়ু মণ্ডলের আবর্ত্তন প্রবণতার তথ্য যে ভাবে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে সহজেই বুঝা যায়, যে রামশরণের এই চেষ্টা ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হইল। অত যে রামশরণ বিব্রত ও ভীত হয়, অত যে বিনোদলালের সেই মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে আতঙ্ক এবং হস্তে পক্ষাঘাত আনিয়া দেয়, তথাপি ব্রহ্মসংগীত রচনার চেষ্টা, রামশরণ কিছুতেই ভুলিতে পারে না।

যাহারা প্রতিভাশালী লোক, যাহাদের হৃদয় উদার এবং প্রশস্ত, তাহাদের প্রধান বিশেষণ এই যে, তাহারা পরদুঃখে কাতর না হইয়া থাকিতে পারে না। রামশরণের যে অবস্থার কথা উপরে বলিয়াছি, তাহা যখন সকলে জানিতে পারিল, তখন বিনোদলালও অবশ্যই জানিতে পারিলেন। এক দিন বিকালে হৃদয় খুলিয়া দুঃখ করিবার অভিপ্রায়ে বিনোদলাল রামশরণের কাছে গিয়া উপস্থিত। রামশরণ তখন সেই কাগজে কলমে ব্রহ্মসংগীত বাত্যায় বিক্ষোভিত।

বিনোদলাল বলিলেন, "ও কি হচ্চে, দেখি দেখি। আবার লিখ্‌চ যে?" বলিয়া কাগজ খানি হাতে করিয়া লইলেন। তখন রামশরণের ঠোঁট দুখানি হইয়াছে যেন শাক, চক্ষুতে পলক নাই, মুখে রক্ত নাই, জিহ্বায় রস নাই, হাত পায়ের সাড়া নাই, রামশরণের জীবাত্মা তাঁহার হৃদয়ের অতি গুহ্য দেশে তখন লুকাইয়াছে।

বিনোদলাল কাতর হইতে জানেন, দুঃখ করিতে জানেন, সহৃদয়তা দেখাইতে জানেন, কিন্তু সত্য গোপন করিতে জানেন না; অন্তরের অগ্নি প্রজ্বলোন্মুখ হইলে, তাহা চাপিয়া রাখিতে জানে না। প্রতিভার রাজ্যে কেহ অনধিকার প্রবেশ করিলে, বিনোদলাল চুপ করিয়া থাকিতে জানেন না। যাহার লিখিবার অধিকার নাই, সে কাগজে কলমে করিলে বিনোদলাল নীরবে সে ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিতে জানেন না। বিনোদলাল পড়িলেন,—

"তোমারি ও চন্দ্রাননে সদাই জোছনা হাসি,
উথলে সুখসাগর ভাসা'য়ে জগতবাসি।
বলে শশী সুধাকর তোমারি সে শশ——"

আর লেখা হইয়াছিল কি না বলা যায় না, কিন্তু বিনোদলাল এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই বিকট চীৎকার করিয়া উঠিয়া পড়িলেন—"চুরি। চুরি। এ সাফ চুরি। কতক কথা, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের চুরি; কতক চুরি রজনী গুপ্তের বাল্য রচনা হইতে।" বিনোদলাল নিজের নামটা মুখে আনিতে আনিতে আনিলেন না, উঠিয়া চলিয়া গেলেন। রামশরণ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া এই মাত্র বিড়বিড় করিয়া বলিল—"তা শব্দ কটা সবই তো অভিধানের।" বলিয়া একটি দেশলাই জ্বালিয়া নিকটস্থ অভিধান খানি পুড়াইয়া ফেলিল। সেই অবধি রামশরণের বাক্‌রোধ। লেখাতো আর হইলই না।

ত্রিগুণ ও সৃষ্টি।

৯। সংখ্যমতে সৃষ্টির কারণ।

আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় সাংখ্য মতে জগতের উৎপত্তি, পরিণতি ও বিনাশের তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে সৃষ্টির প্রকৃত কারণ কি, কেন সৃষ্টি হইল, বা সৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য (knowable) কতটুকু,—তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, যে সাংখ্যকার দ্বৈতবাদী। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে সংসারের সৃষ্টি কল্পনা করিয়াছেন। তিনি বলেন এই প্রকৃতি আর পুরুষই নিত্য—ইহা ব্যতীত সকলই জন্য—সকলই অনিত্য। তাঁহার মতে

প্রকৃতি পুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্যম্। ৫।৭২।

ইহার মধ্যে পুরুষত নিষ্ক্রিয় ও অপরিণামী, কেবল প্রকৃতিই সক্রিয় ও পরিণামী। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, প্রকৃতির এই পরিণাম ও ক্রিয়া পুরুষের সান্নিধ্য বা সংক্রামিত শক্তি জন্যই হইয়া থাকে। কারণ,

উপরাগাৎ কর্ত্তৃত্বং চিৎ সান্নিধ্যাৎ। সাংখ্যপ্রবচন ১।১৬৪।

তাহার পর যখন এই শক্তি প্রভাবে প্রকৃতির পূর্ব্বেকার সাম্যাবস্থার পরিণাম হইয়া সৃষ্টি আরম্ভ হয়—সে পরিণামের প্রধান নিয়ম এই যে,

"অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ।" ৩।১।

অথবা পূর্ব্বে যাহা একরূপ (homogeneous) ছিল, তাহা ক্রমে বহুরূপ ও বিষম (heterogeneous) হইতে আরম্ভ হইল। * কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি ত, প্রকৃতির এই অবিশেষ অবস্থা এই সাম্যাবস্থা বরাবর থাকিতে পারে না। †

সে যাহা হউক, এই বৈষম্য' হইতে ক্রমে ক্রমে জগত সৃষ্টি হইয়া ক্ষিতি পর্য্যন্ত স্থূলত সৃষ্টি হইলে শেষে শরীরের সৃষ্টি (organic Fvolution) আরম্ভ হয়। সাংখ্যকার বলেন, একথা সৃষ্টি বিবরণে "তস্মাৎ শরীরস্য" ৩।২। এ কথা সৃষ্টি বিবরণে উল্লিখিত হইবে।

এই সৃষ্টি অবস্থায় সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের সাধারণ ধর্ম্ম কি, তাহা সাংখ্য কার দেখাইয়াছেন। আমরা এস্থলে তাহার উল্লেখ করিব মাত্র—মূলানুসন্ধায়ী (*a priori*) যুক্তি দ্বারা সাধারণ ধর্ম্ম (generalisation) কতদূর পর্য্যন্ত স্থির হইতে পারে, তাহা দেখাইব মাত্র। সাংখ্যকার বলেন জগতের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থই,

"হেতুমৎ, অনিত্যং, অব্যাপি, সক্রিয়ং, অনেকং, আশ্রিতং, লিঙ্গং। ১।১২৪।

অর্থাৎ সকল গুলিই সকারণ, নশ্বর, সীমানির্দ্দিষ্ট, ক্রিয়াশীল, বহুসংখ্যক, কারণের অধীন এবং ধ্বংশ কালে কারণে বিলীন হইয়া যায়। বিজ্ঞান ভিক্ষু আরও বলেন, তাহারা "সাবয়বং, পরতন্ত্রং, ব্যক্তং।"

এই রূপে সৃষ্টি কার্য্য চলিতে থাকে। সাংখ্যকার সৃষ্টির যে আর একটি সত্য স্থির করিয়াছেন, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্য সম্মত। তিনি বলেন,

---

* সাংখ্যকার যাহা একটি মাত্র সূত্রে বলিয়াছেন, তাহা আধুনিক পণ্ডিত হবর্ট স্পেন্সর তাঁহার "First Principles" নামক পুস্তকে কত বাহুল্য রূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার Law of Heterogeneity এই :—

Evolution then under its primary aspect is a change from a less coherent form to a more coherent form, consequent upon the dissipation of motion, and integration of matter ; * * * * from homogeneity to heterogeneity."

† স্পেন্সর এ কথা উক্ত পুস্তকে, "Instability of the Homogeneous" শীর্ষক অধ্যায়ে বিশেষরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

"রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ। ২।৯।

অথবা, আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ, (পরিবর্ত্তন ও অপরিবর্ত্তন) এই ক্রিয়া য়ের সম্মিলনেই সৃষ্টি অথবা পরিদৃশ্যমান জগতের যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিজ্ঞানে ইহাকেই Law of Attraction and Repulsion অথবা Action and Reaction বলা হয়। *)

এইরূপে সৃষ্টি চলিতে থাকে। যখন বস্তু বিশেষের নাশ হয়, তখন তাহা স্বকারণে লয় হইয়া যায়। (কারণ, "নাশঃ কারণ লয়ঃ। ১।১২১।) বস্তুত কার্য্য কেবল কারণের বিকার মাত্র (কারণ ভাবাৎ।১।১৮৮।) সুতরাং বিনাশের সময় বস্তু সকল সকল তাহার কারণে বিলীন হয়।

সে যাহা হউক, এইরূপ বৈষম্য অবস্থায় আকর্ষণ বিক্ষেপণ হইতে সৃষ্টি ক্রিয়া চলিতে চলিতে পুনর্ব্বার যখন, সমস্ত সৃষ্টি স্বকারণে লয় হয়, যখন প্রকৃতি পুনর্ব্বার সাম্যাবস্থায় আইসে, তখনই ধ্বংশ হয়। তখনি প্রলয় উপস্থিত হয়। এইরূপে বলিয়াছি ত প্রলয় ও সৃষ্টি বরাবর চলিয়া আসিতেছে। সাংখ্যকার বলিয়াছেন,—

"সাম্যবৈষম্যাভ্যাং কার্য্যদ্বয়ং। ৬।৪২।

ইহার ভাষ্যে বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন,

"সত্ত্বাদিগুণত্রয়ং প্রধানং তেষাং চ বৈষম্যং ন্যূনাতিরিক্ত ভাবেন সংহননং, তদভাবঃ সাম্যং ত্যাভ্যাং হেতুভ্যামেকস্মাদেব সৃষ্টি প্রলয়রূপ বিরুদ্ধ কার্য্যদ্বয়ং ভবতীত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ প্রকৃতির সত্ত্বাদিশক্তিত্রয় ন্যূনাতিরিক্ত ভাবে সংহত হইতেই বৈষম্য ভাব নতুবা সাম্যভাব—এই দুই ভাব—এই দুই কারণ হইতেই সৃষ্টি ও প্রলয় রূপ বিরুদ্ধ কার্য্যদ্বয় হইয়া থাকে। পণ্ডিত স্পেন্সরও এইরূপে Equilibration হইতে প্রলয় (ও সৃষ্টির প্রথমাবস্থা,) এবং Differentiaion হইতে সৃষ্টি হওয়া (বা জগতের ব্যক্তাবস্থা) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১০। আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত সৃষ্টিতত্ত্ব—ও সাংখ্যমতের সহিত উহার সাদৃশ্য।

এক্ষণে সাংখ্যমতে সৃষ্টি প্রণালীর অন্যান্য বিবরণ উল্লেখ করিবার

* এই সূত্রের বিজ্ঞান ভিক্ষুকৃত ব্যাখা পূর্ব্বসূত্র (২।৮) দেখিলে সঙ্গত বোধ হয় না বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

পূর্ব্বে, আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ সৃষ্টি তত্ত্ব উদ্ভেদ করিতে গিয়া, কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, আমাদের দেখা কর্ত্তব্য। বাস্তবিক বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ কেবল মূলানুসন্ধায়ী যুক্তির অনুসরণ করিয়া সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে যতদূর প্রবেশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রের উন্নতি বলে, আধুনিক পাশ্চাত্যগণ কেবল জাগতিক ব্যাপার বিশ্লেষণ করিয়া ও কার্য্যানুযায়ী যুক্তি অবলম্বন করিয়া সেই পথেই অগ্রসর হইতেছেন। এক্ষণে লাপ্লাস প্রমুখ প্রায় সমুদায় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণই জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে Nebular Theory বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের মতে সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাণু ও শক্তি মিশ্রিত কি একরূপ কুহেলিকাবৎ (chaos) পদার্থ সমস্ত জগৎ ময় ব্যাপ্ত ছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টেট্ সাহেব বলিয়াছেন,—

"Our modern knowledge enables us to look back with almost certitude to the time when there was nothing but gravitating matter and its potential energy throughout the expanse of space—ready—as slight local difference of distribution predisposed it, to break up into portions, each converging to one or more nuclei of its own and thus forming in time separate solar or stellar systems." *The Unseen Universe p. 128.*

কাণ্ট প্রভৃতি আধুনিক প্রসিদ্ধ দার্শনিকদিগেরও এই মত। হর্বর্ট স্পেন্সর তাঁহার Essays নামক পুস্তকে সৃষ্টি বা Genesis শীর্ষক প্রবন্ধে এ কথা বেশ বুঝাইয়া দিয়াছেন।

অতএব যতদূর দেখা গেল, তাহাতে ইহা একরূপ বুঝা যায়,যে সাংখ্যকার সৃষ্টির যে প্রাক্কালীন অবস্থাকে সাম্যাবস্থা বলিয়াছেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ সেইরূপ অবস্থাকেই chaos বা nebulæ বলেন। সাংখ্যকার যে বৈষম্য হইতে জগতের পরিণতি কল্পনা করিয়াছেন, তাহাই আধুনিক পণ্ডিতগণ Differentiation বা Heterogeneity বলিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ আরও বলেন যে এই বৈষম্য জন্যই উচ্চতর গতিশক্তি দ্ব্যণুক ত্র্যণুক molecules of diad and triad atoms প্রভৃতির সংযোগিক কার্য্য করিয়া এবং তৎপরে জৈবনিক শরীর (organic) সৃষ্টি করিয়া ক্রমে ক্রমে হীন হইতে থাকে। হর্বর্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন,—

The permanenty effective force, having expended in working both the insensible re-arrangement which constitute molecular

modification and the sensible arrangement which results in structure must generate of either kind an amount, that is greater or smaller as it has generated a small or great amount of the other." *First Principles.*

এইরূপ সাংখ্যকারও বলেন, যে সৃষ্টির প্রথমে যে সত্ত্বগুণের আধিক্য থাকে, তাহা হইতে বৈষম্য বশত রজঃগুণ বৃদ্ধি হয়, পরে এই শক্তিই রজঃ দ্বারা পরিণত হইলে ক্রমে তমোগুণের আধিক্য হইতে থাকে। অতএব যতদর বুঝা যায়, সাংখ্যকারের মতে সৃষ্টি অবস্থায় এই সত্ত্বগুণের পরিণতি ও তমঃ গুণের আধিক্য সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের প্রায় একরূপ মত। *

তৎপরে যখন সত্ত্ব হইতে রজঃ ও তমের বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে এই তিনটি শক্তিই যখন সমশক্তি সম্পন্ন হয়, তখনই আবার প্রলয়ের পূর্ব্বকালীন সাম্যাবস্থা উপস্থিত হয়। বলিয়াছিত, এই অবস্থাকে হর্বর্ট স্পেন্সর equilibration অবস্থা বলিয়াছেন। ইহার পরেই প্রলয় (dissolution) হইতে আরম্ভ হয়। পাঠকগণ দেখুন, এসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কিরূপ বুঝিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,

"It is absolutely certain, that life, so far as it is physical, depends essentially upon transformations of energy; it is also certain that age after age, the possibility of such transformations is becoming less and less: as so far as we yet know, the final state of the present universe must be an aggregation (into one mass) of all matters it contains, its potential energy gone......for though the *quantity* of energy remains for ever unchanged, its availability steadily decrease."

The Unseen Universe P. 127 & 116

অতএব বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মতে, প্রবলতর শক্তি (energy of higher potentiality) পরিবর্ত্তিত ও অপব্যয়িত (dissipation) হইয়া পরমাণুর সংশ্লেষণ ও জৈবনিক সংশ্লেষণেই সৃষ্টি হয় এবং যখন এই প্রবলতর শক্তি

---

* টেট্ সাহেব বলেন "Dissipation of energy of the visible universe proceeds with the aggregation of mass, দার্শনিকদিগের মতও এইরূপ, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।

নষ্ট হইয়া যায়, অথবা নিম্নতর শক্তিতে পরিণত হয়—তখন পরমাণু সমস্ত স্তূপীকৃত (integration) হয়, অথচ তাহাদের জৈবনিক সংযোগ (disintegration) নষ্ট হইতে থাকে। এই সময়েই প্রলয়ের সময় উপস্থিত হয়। আমরা দেখাইয়াছি যে, সাংখ্যকারও বলিয়াছেন সৃষ্টি হইলে সত্বগুণ রজঃ গুণে পরিণত (বিসদৃশ পরিণাম) হইতে থাকে—পরে ইহাই তমোগুণে পরিণত হয়, আর ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার পরে যখন ক্রমে তমোগুণের বিশেষ প্রাবল্য হয়, তখনই প্রলয় হয়—প্রকৃত প্রলয়ের প্রথমাবস্থায় তমোই বিদ্যমান থাকে। তখন সত্বশক্তি অকর্ম্মণ্য হইয়া প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়—তখন তাহার কার্য্যকরী বা সৃষ্টিকরী ক্ষমতা থাকে না। সাংখ্যকার বলেন,

ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা মগ্নবদুত্থানং ।৩।৫৪।

অর্থাৎ কারণে বিলীন (নাশ) হইলেই শেষ হয় না—পুনর্ব্বার তাহা উত্থিত হইয়া সৃষ্টি আরম্ভ করিবে। কিরূপে উত্থিত হয়, তাহা পরে বলিতেছি।

১১। বিজ্ঞান মতে 'পুরুষের' কল্পনা আবশ্যক।

আমরা যতদূর বুঝিলাম তাহাতে এই মাত্র জানা গেল যে, সৃষ্টির প্রথমাবস্থা এবং সৃষ্টির বিনাশের অবস্থা, সাংখ্যকার যতদূর কল্পনা করিয়াছেন—আধুনিক বিজ্ঞানও বিশ্লেষণ বলে প্রায় ততদূর পর্য্যন্ত গিয়াছেন মাত্র। কিন্তু এই পর্য্যন্ত গিয়াই বিজ্ঞান স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। বিজ্ঞান মতে প্রলয়ের সময় পরমাণু সমস্ত স্তূপীকৃত হয়, শক্তি অকার্য্যকরী হইয়া আকাশময় (?) ব্যাপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রলয়ের সময়ের স্তূপীকৃত পরমাণুগুলি অনন্তে মিলিয়া গিয়া শক্তির সহিত মিলিত হয়। স্পেন্সর সাহেব বুঝিয়াছেন যে "Ultimate law is the continuous redistribution of matter and motion" অথবা "integration of matter with concomitant dissipation of motion, and absorption of motion and concomitant disintegration of matter.

টেট সাহেবও দেখিয়াছেন, যে "a seperate existence of the visible universe will ultimately disappear, so that we shall have no huge useless inert mass of matter. এ কথা কেবল বিজ্ঞানের কল্পনা প্রসূত (বা theory) নহে। স্মিট, বোগেল, কোপলাণ্ড প্রভৃতি সাহেবগণ, সোয়ান (Swan) নামক নক্ষত্রপুঞ্জের (রাশির মধ্যে) সিগনস (Cygnus) নামক একটি নূতন নক্ষত্র আলোক-বিশ্লেষণী যন্ত্রের দ্বারা (Spectrum Ana-

lysis) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহা ধ্বংশ হইয়া ক্রমে আবার nebulaতে পরিণত হইল। *

কিন্তু এই disintegration or disappearance of matter কিরূপে সংসাধিত হইবে?—প্রলয়ের সময়ের এই স্তূপীকৃত পরমাণুর শক্তিসংযোগে অনন্তময় ব্যাপ্তি কিরূপে সম্ভব হইবে? বিজ্ঞানত প্রমাণ করিয়াছে যে, "Energy is of use solely because it is constantly being transferred" কিন্তু এই transfer এই পরিণাম ত সকল অবস্থায় সম্ভব নহে। উচ্চতর (higher potential) শক্তিই নিম্নতর শক্তিতে পরিণত হইতে পারে। এইরূপ পরিণামেই গতি এবং কার্য্য হইয়া থাকে—নতুবা কোন কার্য্যই সম্ভব নহে। নিম্নতর শক্তি কখন উচ্চতর শক্তিতে পরিণত হইতে পারে না। † যাঁহারা এ বিষয়ের তথ্য জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা টেট ও টমসনের Natural Philosophy নামক পুস্তকে এ বিষয় এবং Carpol's Perfect Reversible Engine এর বিষয় দেখিবেন। ‡

সুতরাং যখন প্রলয় হইয়া যায়, যখন সৃষ্টির উচ্চতর শক্তি প্রলয় কালে নিম্নতরশক্তিতে (পরমাণুর স্তূপে) পরিণত হয়, তখন আবার কোন শক্তি বলে তাহা উচ্চতর শক্তিতে (higher potential) পরিণত হইবে, নতুবা ত

* Vide *The Nineteenth Century Vol 11. p. 887*
"There is little doubt but that this star has changed into a planetary nebulæ."

† এই কথা বুঝাইবার জন্য সর উইলিয়ম টমসন বিজ্ঞান ও গণিতের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, প্রধানত যে উত্তাপ শক্তিতে সৌরজগতের পরিণতি হইতেছে, তাহা সূর্য্য হইতই পাওয়া যায়। যখন পরিণতি দ্বারা ক্রমে ইহার এবং সমস্ত জগতের তাপ তাপমাণযন্ত্রের শূন্য ডিগ্রি হইতে ৪৭৩ ডিগ্রি নিম্নে আসিবে, তখনই ক্রিয়া বন্ধ হইয়া প্রলয় হইবে। এই তাপকে বৈজ্ঞানিকেরা "absolute 0 of temperature" বলেন।

‡ টেট্ সাহেব এক স্থলে বলিয়াছেন,
To obtain work from heat we must have hotter and colder bodies, to correspond as it were, with the boiler and condenser of a heat engine; and just as we can get no work from still water, if it be all at the same level *i. e.* if no part of it can fall, so in like manner we can get no work from heat, unless part of it can fall from higher to a lower temperature."

শুধু তাপ বলিয়া নহে সমস্ত শক্তি মাত্রেরই এই নিয়ম।

পুনর্ব্বার সৃষ্টি সম্ভব হইবে না। বিজ্ঞানত স্পষ্টই দেখায়াইছে, যে automatic (self acting) বা স্বতঃপরিচালিত যন্ত্র অসম্ভব।

অতএব বিজ্ঞান প্রলয়ের পর আবার সৃষ্টি হইবে, তাহা বুঝিতে পারে কিন্তু কিরূপে এই নিম্ন শক্তি উচ্চতর শক্তিতে পরিণত হইবে, তাহা আজিও বুঝে নাই।

পণ্ডিতবর কপিলই কেবল কত কাল পূর্ব্বে আশ্চর্য্য প্রতিভা বলে বুঝিয়াছিলেন, যে পুরুষের সান্নিধ্য জন্যই তাহার শক্তিপ্রকৃতিতে সংক্রামিত হয় বলিয়া প্রলয়কালে যে সত্বগুণ অকর্ম্মণ্য হইয়া তমোগুণে পরিণত হইয়াছিল— পুনর্ব্বার রজঃ ও তৎপরে সত্বগুণে পরিণত হইয়া থাকে—এবং সেইজন্যই এই পরিদৃশ্যমান জগতের আবার সৃষ্টি ও পরিণতি হইতে পারে। নতুবা আর সৃষ্টি সম্ভব হইত না। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণও এক্ষণে একথা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন।

পণ্ডিতবর টেট্ তাঁহার *Unseen Universe* নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,

We are compelled to imagine that what we see. has originated in the unseen (পুরুষ ?) and we must resort to the unseen not only for the origin of molecules of the visible universe (?) but also for an explanation of the forces which animate these molecules. * * * We are thus led to believe that there exists now an invisible order of things intimately connected with the present and capable of acting energetically upon it, for in truth the *energy of the present system must be looked upon as originally derived from the invisible universe,* while the forces which give rise to the transmutation of energy probably take their origin in the same region." p. 198-99.

সে যাহা হউক এক্ষণে যতদূর দেখা গেল, তাহাতে পঠকগণ বোধ হয় এপর্য্যন্ত বুঝিয়াছেন, যে সাংখ্যকার বহুকাল পূর্ব্বে সৃষ্টি ও প্রলয়ের যেরূপ তত্ব উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং জড় প্রকৃতির গতি ও শক্তি যেরূপ পুরুষ হইতে সংক্রামিত হয় বুঝিয়াছিলেন, ঠিক সেই কথাই ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষ কালে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা ক্রমে ক্রমে সাংখ্যের জগত সৃষ্টির বিবরণ ও ত্রিগুণের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না। *

হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ উচিত কিনা, এই প্রবন্ধের মীমাংসা করিতে হইলে, অনেক বিষয় অগ্রে পরিষ্কার করা উচিত।

ধর্ম্ম দেখিয়াই কোন বিষয় উচিত অনুচিত বুঝিতে হয়; প্রথমে দেখিতে হইবে হিন্দুরা ধর্ম্ম কি ভাবে দেখেন; তাহার পর বুঝিতে হইবে বিবাহ বলিলে হিন্দু কি বুঝেন।

জগতের যাবতীয় অনুষ্ঠানই দুইদিক্ দিয়া দুইভাবে দেখা যাইতে পারে। কেবল অনুষ্ঠান কেন,যাবতীয় পদার্থই দুইটি বিভিন্ন ভাবে দেখা যাইতে পারে। এই মনুষ্য,—খানিকটা অম্লজান, যবক্ষারজান, বায়ু বাষ্পের বিশেষ সমষ্টি,—রক্ত মাংস, অস্থি মজ্জা, শুক্র শোণিতের অপূর্ব্ব তেরিজ,—বক্ষঃ মস্তক উদর, উরু পাণি পদ প্রভৃতি অবয়বের এক প্রকার জড় যোগ—বলিলেও চলে; আবার, জ্ঞানের গুরুভাণ্ডার, বুদ্ধির লীলাপট, শ্রীর রঙ্গ ভূমি, ভক্তির অপূর্ব্ব আধার—বলিলেও চলে।—এই ছোট ফুলের গাছটি,—মূল, কাণ্ড, শাখা,উপশাখা,পত্র ফুল, এই সকলের সমষ্টি বলা যাইতে পারে; আবার নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্র, ঘ্রাণরঞ্জন সুগন্ধের খনি, হৃদয়উৎফুল্লকর কোমলতার ছবি, সদ্যোজাত শোভার সূতিকা গৃহ—এরূপ বলিলেও চলে। এই বিস্তীর্ণ ভারতক্ষেত্র—কেবল মাত্র বিংশতি কোটি দাসের বাসভূমি, আঠারটি ভাষার অধিষ্ঠান জন্য চারি লক্ষ বর্গ ক্রোশ ক্ষেত্র, গঙ্গা যমুনা সিন্ধু কাবেরী প্রভৃতির প্রবাহের স্থান, বিন্ধ্য হিমালয়াদির দাঁড়াইবার স্থল, শাল তাল তমালের বিস্তীর্ণ উপবন, ভারত সাগর, দক্ষিণ সাগর,আরব সাগর--ত্রিসিন্ধুর ত্রিবিক্রমের অভিঘাত স্থল--এভাবে বলিলেও চলে; আবার অন্যদিক্ দিয়া—বৈদিক দার্শনিক পৌরাণিক বৌদ্ধ,—নাস্তিক, বৈষ্ণব, ইসলাম, খ্রীষ্টান, ধর্ম্ম সকলের সম্মিলন স্থল, অনন্ত উৎসে উৎসারিত,কেন্দ্রাভিমুখে প্রসারিত জগদ্ব্যাপক ইতিহাস স্রোতের কেন্দ্রস্থিত জলপ্রপাত, অধর্ম্ম তাড়নায় ধর্ম্মের পরীক্ষা ভূমি, সহিষ্ণুতার আদর্শ ক্ষেত্র, ভবঘোর চক্রের লীলা রঙ্গের বিষম উত্থান পতনের ভীষণ নাগরদোলা, সমগ্র ইতি-

* বিগত ২৮শে বৈশাখ কলিকাতার সাবিত্রী লাইব্রেরিতে এই প্রবন্ধ পঠিত হয়।

হাস ক্লক পরিচালনের মূলশক্তি স্বরূপ সুমহৎ পেণ্ডুলম, শৌর্য্য বীর্য্যের দোদ্দণ্ড ভূতকালের সহিত, কোমল হইতে কোমলতর ভক্তিভরা ভবিষ্যতের মিলন মন্দির ;—ভারত ক্ষেত্রকে এরূপেও দেখা যায়।

সকল বিষয়ই এইরূপে দুই দিক দিয়া দুই ভাবে দেখা যায়। মানবীয় সমস্ত অনুষ্ঠানেরই সুতরাং দুই পৃষ্ঠ আছে।

একটি ভাবকে স্বার্থের ভাব, জড়ের ভাব, ঐহিক ভাব, টাকা-আনা-পয়সার ভাব, পদার্থ বিজ্ঞানের ভাব, আর অন্যটিকে ধর্ম্মের ভাব, আধ্যাত্মিক ভাব, পারত্রিক ভাব, হিত-মঙ্গল-ভালবাসার ভাব, মনোবিজ্ঞানের ভাব,—বলা যাইতে পারে।

ইংরাজি শিক্ষিতের পক্ষে এই দুইটি ভাব, বুঝিবার জন্য একটি সুন্দর উদাহরণ আছে। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা বকল এইটি দেখাইয়া দেন। আডাম স্মিথের দুই খানি গ্রন্থ আছে। এক খানির নাম Wealth of Nations বা বিভিন্ন জাতির অর্থ সংস্থান; আর একখানি, Theory of Moral Sentiments ধর্ম্মনীতিতত্ত্বে মত ভেদ; প্রথম খানি অর্থ নীতির পুস্তক ; তাহাতে ধনসংস্থানের কথা আছে ; দয়া ধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ের নাম গন্ধ সে পুস্তকে নাই ; আডাম স্মিথ নিক্তিপাল্লা লইয়া প্রকৃত বণিকের মত জাতি সুলভ বণিগ্‌ভাবে, রতি মাসা খুঁটাইয়া ওজন করিতেছেন, আর পাকা মুহুরির মত বসিয়া, তাহারই কাগ ক্রান্তি হিসাব করিতেছেন। ধর্ম্মাধর্ম্মের কথায় ভ্রূক্ষেপ নাই, হৃদয় বলিয়া ধুকধুকনির কোন সামগ্রী নাই, চক্ষুলজ্জা নাই, ভাবুকতার নাম গন্ধ নাই। আবার সেই আডাম স্মিথই যখন ধর্ম্ম নীতির তত্ত্ববিচারে প্রবৃত্ত, তখন তাঁহার আর এক মূর্ত্তি। মানব হৃদয়ের গূঢ় হইতে গূঢ়তর ভাবের, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর শক্তির বিচার করিতেছেন; তখন মানবের ধুক্ ধুকনির ক্ষুদ্র বস্তুটিই, তাঁহার এক মাত্র পুঁজি ; তাই লইয়াই নাড়া চাড়া, তাই লইয়াই সুদে খাটান, চোটা চালান আসল, বাড়ান।

এই রূপ করিয়া দুই ভাবে না দেখিলে কোন বিষয়ের প্রকৃত পর্য্যালোচনা হয় না। সকল বিষয়ের এ পীঠ ও পীঠ, দুই পীঠই এই ভাবে দেখা আবশ্যক।

আজি কালি একটা বড় বিষম বাতাস উঠিয়াছে; অনেকেই অনেক বিষয় কেবল বিজ্ঞানের চক্ষে দেখিতে উদ্যত; ধর্ম্মাধর্ম্মের, ভক্তি-ভালবাসার, দয়া-দাক্ষিণ্যের, হিতাহিত জ্ঞানের—বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে; স্পর্দ্ধা করিয়া মহামহা পণ্ডিতে বলিতেছেন, যে হিন্দুশাস্ত্র সমস্তই বৈজ্ঞানিক।

এ বড় বিষম কথা! আমাদের যৎসামান্য ক্ষুদ্র শক্তি কেন্দ্রস্থিত করিয়া আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই মতের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করি।

কোন একটি তত্ত্বের বিজ্ঞান কেবল একটি পৃষ্ঠ দেখিতে পায় মাত্র। হিন্দুর মতে সেটুকু সামান্য অংশ, অত্যল্প বিস্তৃত ভাগ; সেটুকুর পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু গৌণ কল্পে; ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বহু বিস্তৃত অংশের পর্য্যালোচনা করাই, অগ্রে কর্ত্তব্য, মধ্যে কর্ত্তব্য, শেষে কর্ত্তব্য; সেইটিই মুখ্য কর্ত্তব্য। উচিত অনুচিত বুঝিতে হইলে, কেবল ধর্ম্মের নিকষেই ঘষিতে হয়। এই সকল কথা বুঝিতে হইলে, অনেকগুলি কথা দেখিতে হইবে।

গুটি দুই উদাহরণ দিব;—

মনুষ্যের পক্ষে মাংসাহার করা উচিত কি না,—এ বিষয়ে তর্ক চিরদিনই আছে। বৈজ্ঞানিক প্রবর কোমৎ বলেন, যাহাতে শরীরের পুষ্টি হয়, সেইরূপ খাদ্য গ্রহণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য; কেবল জিহ্বার শিরা বিশেষের তৃপ্তিজন্য কোনরূপ খাদ্য গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য। ইহাকেই বলে কেবল বিজ্ঞানের দিক্ দেখা।

ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা মধ্যে মহর্ষি মনু সুপ্রসিদ্ধ; ধর্ম্মের দিকে তাঁহার দৃষ্টি প্রখরা, অথচ তাৎকালিক বিজ্ঞানেও তাঁহার অবহেলা নাই। মাংসাহার সম্বন্ধে তিনি তৎকালের আচার ও বিজ্ঞানের পরামর্শ লইয়া এটি খাবে, এটি খাবে না, এই ভাবে মত দিয়াছেন; এই গুলি বৈধ, এই গুলি অবৈধ— বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার শেষ মীমাংসা শুনুন;—

যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
সজীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন ক্বচিৎ সুখমেধতে॥

যে অহিংসক জীবকে আত্মসুখের ইচ্ছায় হনন করে, সে কি জীবন্তে, আর কি মৃত্যুর পর, ইহকালে পরকালে কথনই সুখ পায় না।

কিন্তু;—

যো বন্ধন বধক্লেশান্ প্রাণীনাং ন চিকীর্ষতি।
স সর্ব্বস্য হিতপ্রেপ্সু সুখমত্যন্ত মশ্নুতে॥

যে প্রাণীদিগকে বধ বন্ধনের ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করে না, সেই সর্ব্বহিতাভিলাষী ব্যক্তি অত্যন্ত সুখভোগ করে।

এখন কথা হইতে পারে, যে, এই যে কথা, ইহার কি কোন যুক্তি নাই; বিজ্ঞানেরই যুক্তি আছে, ধর্ম্মের কি কিছু যুক্তি নাই? আছে বৈকি।

না কৃত্বা প্রাণীনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
নচ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্য স্তস্মান্মাংসং বিবর্জয়েৎ॥

প্রাণীহিংসা না করিলে কখনই মাংস পাওয়া যায় না, আর প্রাণিবধ কাজটা কিছু ভাল কাজ নহে, সুতরাং মাংস ত্যাগ করাই ভাল।

তার্কিকে এই স্থলে বলিতে পারেন, যে, ও আবার কি কথা হইল? 'প্রাণিবধ কাজটা ভাল কাজ নয়,' সে আবার কেমন কথা হইল? এইরূপ পূর্ব্ব পক্ষের উত্তর পক্ষ স্বরূপে মনু পরের শ্লোকে বলিতেছেন,—

সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌচ দেহীনাম্।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্ততে সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ॥

জীবের শুক্রশোণিতে মাংসের উৎপত্তির কথাটা এবং প্রাণীগুলাকে বন্ধন ও বধ করিবার ক্লেশের কথাটা —বেশ করিয়া বুঝিয়া, সকল প্রকার মাংসভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়।

অতএব মীমাংসা হইল যে,—

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥

জীবগণের মাংসাহারাদি প্রবৃত্তির নিবৃত্তিতেই মহা ফল। এইটি হইল ধর্ম্মের কথা। বিজ্ঞান আজি বলিতেছে, গ্লুটেন-প্রধান খাদ্য ভাল, কালি বলিতেছে, ষ্টার্চ-প্রধান খাদ্য ভাল; বিজ্ঞান বা ইতিহাসের ভিত্তির উপর যে সকল ধর্ম্ম মত প্রচলিত আছে, তাহার এটিতে বলিতেছে শূকর মাংস নিষিদ্ধ, ওটিতে বলিতেছে, কুক্কুট মাংস অভক্ষ্য; কিন্তু ধর্ম্মের যে কথা, 'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা,' সে কথা সকল স্থানেই সমান ভাবে আছে। অর্থাৎ ধর্ম্মের টান, একটানা, একই দিকে চলিয়াছে; পদার্থ বিজ্ঞানে জোয়ার ভাটা আছে।

আর একটি উদাহরণ দিব;—

এক জন লোক নদীতে পড়িয়াছে, হাবুডুবু খাইতেছে। তুমি একজন পণ্ডিত লোক নিকটে তীরে, দাঁড়াইয়া আছ; কথাটা মনে উঠিল, উঁহাকে উদ্ধারের চেষ্টা করিবে কি না? বিজ্ঞান কি পরামর্শ দেন, দেখ,—বিজ্ঞান প্রথমেই বলিলেন, অগ্রে দেখ, উঁহাকে উদ্ধার করিবার সম্ভাবনা কতটা আছে; স্রোতের বেগের সহিত তোমার শরীরের বলের তুলনা কর; তুমি বলিলে তা ত এখন হয়ে উঠে না। বিজ্ঞান বলিতেছে, "তাহার পর দেখ, উহাকে উদ্ধার করিতে গেলে, যে অতিরিক্ত বলের প্রয়োজন, তোমার দেহের বল হইতে নদীর স্রোতের বেগ বাদ দিয়া, ততটা বল তোমার আছে কি না; তাহার

পর। দেখ, উহাকে রক্ষা করিতে গিয়া তোমার প্রাণ হারাইবার সম্ভাবনা কতটুকু আছে। যদি সিকি সম্ভাবনাও থাকে, তাহা হইলে, তোমাকে আমি ঐ কার্য্যের জন্য অগ্রসর হইতে বলি না, কেন না তুমি ঐ আসন্নমৃত্যু লোক অপেক্ষা চৌগুণের অধিক কৃতী। বিজ্ঞানের পরামর্শ মত কাজ করা তোমার পক্ষে অসাধ্য হইল; এরূপে সম্ভাবনা অসম্ভাবনার ঠিক ফাজিল করিতে তুমি পারিলে না; তখন ধর্ম্মের দিকে তুমি তাকাইলে, ধর্ম্ম বলিলেন, "কিসের গণনায় সময় নষ্ট করিতেছ? তুমি সাহায্য করিলে, যখন লোকটা রক্ষা পাইতে পারে; তখন তুমি আর নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া কেন?" কথাটা তোমার প্রাণের ভিতরে টং করিয়া বাজিল; ঘণ্টা শুনিলে যেমন দৌড়িয়া গাড়িতে উঠিবার জন্য আপনা আপনিই দ্রুতপদে চলিতে হয়, তেমনই ভাবে তুমি সেই প্রাণের ভিতরের আওয়াজে নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে; হঠাৎ তোমার চতুর্গুণ বল হইল; লোকটি উদ্ধার করিলে।

ইহাতে এই বুঝা যায়, যে বিজ্ঞানের পরামর্শানুসারে কার্য্য করা অনেক সময় অসম্ভব; ধর্ম্মের কথা সহজ, অথচ পরিষ্কার; তবে যাজনা করা তত সহজ নহে। Practical নহে। Practical নহে, সুতরাং ধর্ম্ম পালনীয়ও নহে, এমনই একটা কথা আজি কালি শুনা যাইতেছে।

কথাটা উঠিয়াছে অনেক দিন, কিন্তু আর বৎসর রাজমুখে নিঃসৃতি পাইয়া বড়ই কলঙ্ক বহন করিয়াছে। সকল বিষয়েই লোকের এখন প্রাক্‌টিকাল হইবার বড় ঝোঁক। প্রাক্‌টিকাল হইবার না হৌক, প্রাক্‌টিকাল কথাটা লইয়া গণ্ডগোল করিবার বড়ই প্রবৃত্তি। যাহাতে টাকার ঝন্‌ঝনানি, বা পদাঘাতের কন্‌কনানি নাই, তাহাই প্রাক্‌টিকাল নহে। সুতরাং চাক্‌রি জিনিষটাই বিষম প্রাক্‌টিকাল। এভাব অনেক দিন উঠিয়াছে, অনেক দিন চলিতেছে; কিন্তু এখন রাজমুখে বিবৃত হইয়াছে, যে ধর্ম্ম যদি প্রাক্‌টিকাল না হয়, তবে তাহা ধর্ম্মই নহে। প্রাক্‌টিকাল বাদীরা বলেন, * যে সকল মত প্রাকটিকাল নহে, তাহা যে গভীর ভাবে প্রচালিত হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে

---

* There are theories which are never serious, becaause they are not practical—We all hold theories which might be called dangerous if we ever thought of carrying them out; we all hold the theory, for instance, that we ought to love our neighbour exactly as ourselves, but no one seems afraid, that we shall ever do so.

পারে না। সেই সকল ধর্ম্মমত যদি কার্য্যে পরিণত করিতে যাই, তবে তাহাতে অনর্থ পাত হইতে পারে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে, আমাদের সকলেরই মত যে আমাদের প্রতিবেশীগণকে আমাদের আপনার মত ভাল বাসা উচিত, কিন্তু কখন যে আমরা সেরূপ করিব, সে আশঙ্কা আমাদের নাই।

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, যাহা সহজে যাজনা হয় না, তাহা ধর্ম্মই নহে। এমন ঘোরতর সয়তানি মত, ধর্ম্মের এরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা—আর হয় না।

মানব চরিত্র সংগঠনের ও সঞ্চালনের আদর্শ ব্যবস্থার নাম ধর্ম্ম। আদর্শ বলিয়াই ধর্ম্মের সম্পূর্ণ যাজনা অসম্ভব; এবং সম্পূর্ণ যাজনা অসম্ভব বলিয়াই উহা আদর্শ।

কোন আদর্শেরই পূর্ণভোগ হয় না; সম্পূর্ণ আয়ত্তি হয় না; ধর্ম্ম কখন হস্তামলক হন না। কোণিক বক্ররেখা হাইপর-বোলার মধ্যস্থিত বজ্ররেখা-দ্বয়ের মত, সাধু চরিত্র চিরদিনই ধর্ম্মের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর নিকটবর্ত্তী হয়, কিন্তু কখনই স্পর্শ করিতে পারে না। অথচ ধর্ম্ম, মরীচিকার মত মিথ্যা মোহজ পদার্থ নহে; ধর্ম্ম মরীচিকার মত ধোঁয়া ধোঁয়া, ঘোলা ঘোলা জিনিশ নহে; ধর্ম্ম মরীচিকার মত পিছাইয়া যায় না; ধর্ম্ম মরীচিকার মত বৃথা আশায় আশ্বাসিত করিয়া হঠাৎ নিরাশার কঠোরতায় আচ্ছন্ন করে না। ধর্ম্ম সত্য পদার্থ; নিত্য পদার্থ; উজ্জ্বল, শান্ত, ধীর, স্থির, আভা-ময়। ধর্ম্মের দিকে যত অগ্রসর হইবে, ততই তুমি আশ্বস্ত হইবে, শীতল হইবে; যে ধর্ম্মের দিকে কিঞ্চিৎ মাত্রও অগ্রসর হইয়াছে, তাহাকে কখনই ধর্ম্ম আর নিরাশে নিপতিত করেন না; অথচ চিরজীবন, জন্মে জন্মে সাধুব্যক্তি ক্রমেই ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, কখনই স্পর্শ করিতে পারেন না। সামীপ্য ক্রমেই গাঢ়তর হয়, অথচ সাযুজ্য অনন্তকাল সাধ্য।

লক্ষ্য স্থির, সম্মুখে উজ্জ্বল আভায় বিরাজমান, পান্থ ক্রমেই অগ্রসর হই-তেছেন, ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, অথচ কখনই ধরিতে পারেন না; এই বিচিত্র জীবন্ত রহস্যেই ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য, ধর্ম্মের গৌরব, ধর্ম্মের আদর্শভাব ও ধর্ম্মের উপকারিতা। যে, ধর্ম্মের এই গূঢ় রহস্য বুঝে নাই, সেই ধর্ম্মকে practical বা পূর্ণায়ত্ত করিতে চায়। practical ধর্ম্ম আর অশ্বডিম্ব সমান

কথা। যাহা অদ্য unpractical আছে কালে তাহাকে practical করিবার চেষ্টার নাম বৈজ্ঞানিক চেষ্টা। আর যাহা আজি unpractical, কল্য unpractical, চিরদিনই unpractical থাকিবে, এরূপ জানিয়া শুনিয়াও যাহার আমরা *practice* করিতে যাই তাহাই ধর্ম্ম।

এই দেবকন্যা বিদ্যুৎকে সম্বাদবাহিকা করিব, এই বজ্রধর বাষ্পরাশিকে শকটচালক করিব, এই প্রশস্ত পর্ব্বত উড়াইয়া দিব, এই বিষম সমুদ্র শুষ্ক করিব, এই মহামরু শাহারায় সাগর তরঙ্গ খেলাইব, এ সকলই বৈজ্ঞানিকের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও কীর্ত্তি।

আর, যে আপনাকে ভুলিলে আমাদের অস্তিত্ব থাকে না, যে আপনাকে ভুলা অসম্ভব, ঘোরতর unpractical, সেই আপনাকে ভুলিবার চেষ্টা করিব; আপনাকে ভুলিয়া পরের সেবা করিব; আপনারই অন্নসংস্থান করিয়া উঠিতে পারি না, অথচ পরকে দুমুটা দিতেই হইবে; নিজে রোগ শোকের জ্বালায় অস্থির, তবু পরকে সান্ত্বনা দিব; অনেক সময় হয়ত সত্য বলিতে গেলে প্রিয় হয় না, প্রিয় বলিতে গেলে সত্য থাকে না, ইহা জানিয়াও তবু কেবল সত্য কথা ও প্রিয় কথা বলিবার চেষ্টা করিব; যিনি অসীম, অনন্ত, কল্পনার অতীত, তাঁহার ধ্যান ধারণা, উপাসনা, আরাধনা সকলই অসম্ভব; তথাপি তাঁহার উপাসনা আরাধনা সকল সময়েই করিব,—ধার্ম্মিকের, আশা এইরূপ, আকাঙ্ক্ষা এইরূপ, কীর্ত্তি এইরূপ। আপাতত অসম্ভবকে কালে সম্ভব করার নাম বিজ্ঞান; আর নিত্য অসম্ভবের যাজনা করার নাম ধর্ম্ম। সুতরাং practical ধর্ম্মের মত বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম কথাটা নিতান্ত হাস্যকর শব্দসংযোগ।

ধর্ম্মের এই রহস্য ভাব আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কোন সদনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ যাজনা হয় না বলিয়া, সেই অনুষ্ঠানের পরীবর্ত্তন করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই; যদি অনুষ্ঠান ভাল হয়, তবে কিসে তাহার সুচারু যাজনা হইতে পারে, তাহাই দেখা আমাদের কর্ত্তব্য। হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হওয়া উচিত কি না? এই প্রশ্ন আর এক ভাবে বলিলে, এই বলিতে হয় যে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালনীয়া কি না? বিধবার ব্রহ্মচর্য্য যদি সদনুষ্ঠান হয়, তবে পালনীয় বটে; কঠোর হইলেও পালনীয়। সম্পূর্ণ যাজন অসম্ভব হইলেও, unpractical হইলেও, অবশ্য পালনীয়। তবে হিন্দু বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য সঙ্গত কি অসঙ্গত, ইহা বুঝিবার জন্য হিন্দু, বিবাহ বলিলে কি বুঝেন, তাহা অগ্রে বুঝা চাই।

সকল অনুষ্ঠানই যেমন দুইদিক্ দিয়া দুই ভাবে দেখা যায়, হিন্দুর বিবাহও সেইরূপ দুই দিক্ দিয়া দুই ভাবে দেখা যায়। এক ভাবে বলা যাইতে পারে, যে ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করাই বিবাহের উদ্দেশ্য। জড়দিক্ দেখিলে উদ্দেশ্য ঐরূপই বটে। কিন্তু বিবাহের উদ্দেশ্য যদি ঐরূপই হইল, তবে আর অত বাঁধা ছাঁদা কেন? উপবিবাহইত যথেষ্ট। ইহার উত্তর স্বরূপে বলা হইয়াছে, যে, পুত্রের জন্য বিবাহ করা আবশ্যক। ভাল, পুত্রেরই বা প্রয়োজন কি? পিণ্ড প্রাপ্তির জন্য পুত্রের প্রয়োজন। পিণ্ড আত্মতোষণের উপকরণ, উহাতে আর 'কেন' এই শব্দটা উঠিবে না। আত্মপোষণ, আত্মতৃপ্তি, স্বার্থ রক্ষা, এই সকলের একটি না হয় আরটিই, এরূপ যুক্তির চরমপদ।

অপত্যোৎপাদনের জন্যই বিবাহের প্রয়োজন এসিদ্ধান্ত—বিবাহের অতি নিকৃষ্ট ভাগ, অতি সামান্য ভাগ,—দেখিয়াই হইয়াছে। হিন্দুবিবাহের অতি উচ্চতর, অতি প্রশস্ততর, অতি পবিত্র, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য আছে; সকল ব্যাপারেই হিন্দুর আধ্যাত্মিক দিকে দৃষ্টি প্রখরা। হিন্দুর বিবাহ ব্যাপারেও আধ্যাত্মিক ভাবটা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত।

বিশাল হইতে বিশাল তরে, বিশালতর হইতে বশালতমে পরিণতি, অথচ বিলয়, ইহাই জগতের ক্রম, ইহাই জগতের নিয়ম, ইহাতেই জগতের সৌন্দর্য্য। এই ক্ষুদ্র মানবজীবনের বিশাল হইতে বিশালতমে পরিণতিই, ইহার পরমার্থ। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহার সুন্দর ক্রম আছে, সুচারুপদ্ধতি আছে। প্রথমে আপনার শারীরিক ও মানসিক উন্নতি, তাহার পর পারিবারিক বা সাংসারিক উন্নতি; তাহার পর সামাজিক উন্নতি; সর্ব্বশেষ ঐশ্বরিক উন্নতি। জীবনের এই চারিটি ক্রমহইতেই চারিটি আশ্রম। দ্বিতীয় আশ্রমের, অর্থাৎ গৃহীর পারিবারিক জীবনের মূল গ্রন্থি গৃহিণী। গৃহিণী লইয়াই গৃহ। গৃহিণী না হইলে গার্হস্থ্য হয় না; গার্হস্থ আশ্রমের পরে না হইলে সন্ন্যাস ধর্ম্ম হয় না। সন্ন্যাসরূপ বিশালতর সামাজিকতা হইতে বিশালতম বিশ্বযোগ বা সমাধি। কাজেই পণ্ডিতে বলিয়াছেন, "হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য মুক্তি।" "বিবাহ মোক্ষলাভের সুপ্রশস্ত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী।" বিবাহ গৃহস্থাশ্রমের অবলম্বন। "অসম্পূর্ণ পুরুষ, স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি" হন। হিন্দুবিবাহে পতি পত্নীর যেরূপ একত্ব হয়, "এরূপ মিশ্রণ, এরূপ একীকরণ পৃথিবীতে আর কোন জাতি কল্পনা করে নাই।" "সে বিবাহ-প্রক্রিয়া যখন আরম্ভ হয়, তখন আমরা

দুইটি ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করি, সে বিবাহ প্রক্রিয়া যখন সমাপ্ত হয়, তখন কেবল একটি ব্যক্তিকে দেখিতে পাই।" "জল যেমন জলে মিশিয়া যায়, বায়ু যেমন বায়ুতে মিশিয়া যায়, অগ্নিশিখা যেমন অগ্নি শিখাতে মিশিয়া যায়, তখন পুরুষ তেমনই স্ত্রীতে, এবং স্ত্রী তেমনই পুরুষে মিশিয়া গিয়াছে।" "স্বয়ম্ভূ নিজদেহ যে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া পুরুষ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই দুই খণ্ড মিলিয়া এবং মিশিয়া আবার সেই এক স্বয়ম্ভূ প্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছে।" "স্ত্রী এবং পুরুষের সম্পূর্ণ মিশ্রণ মনুষ্যত্ব সাধক।" হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য "এই মিশ্রণ এবং একীকরণ।"

একটি পুরুষের সহিত একটি স্ত্রীর একীকরণের নাম বিবাহ বটে; কিন্তু সেই পুরুষ আকাশ বিক্ষিপ্ত প্রান্তরস্থিত কোন ব্যক্তি নহেন; তিনি একটি বিশেষ গোত্রের, বিশেষ প্রবরের, বিশেষ কুলের অন্তর্গত এবং অঙ্গীভূত ব্যক্তি। স্ত্রীকে পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ হইতে হইলে অগ্রে তাঁহার গোত্রান্তর আবশ্যক; হিন্দুর বিবাহ বিলাতের মত রূপজ, গুণজ মোহের মিলন নহে; নেড়া নেড়ির কাণ্ডও নহে। একটি পরিবারে দশটি স্ত্রীপুরুষ আছেন, আর একটি আসিয়া তাহাতে মিশিয়া যাইবে, তবে তাহার বিবাহ হইবে। সেই বিবাহের পর হইতে সেই পরিবার মধ্যে আর একটি সম্পূর্ণ পুরুষ হইল, একথা ঠিক, কিন্তু একে আর একে মিলনে যে এরূপ হইল, তাহা নহে, দশে আর একে মিলন হইয়া, তবে সেই সম্পূর্ণতা সম্পাদন হইল। অতএব, কেবল একে আর একে মিলনের নাম বিবাহ নহে, আধ খানিকে পূরা একখানি করিবার জন্য একটি পরিবার মধ্যে একটি নারীর আগম, মিলন, ও মিশ্রণই বিবাহ। বিবাহ—কুল-লক্ষ্মীর কুলে প্রতিষ্ঠা। ভবিষ্যদ্ গৃহিণীর গৃহে অবিষ্ঠান। বৈদেশিক বিবাহের পরই যুবক, যুবতী মধুমাস কুলভ্রষ্ট, গোষ্ঠীভ্রষ্ট, সমাজভ্রষ্ট হইয়া বাস করেন; আমাদের দ্বিরাগমনের নবোঢ়া সমস্ত পরিবারের সাম্রাজ্ঞী-সেবিকারূপে অর্দ্ধহস্ত গুণ্ঠনে গুণ্ঠিত হইয়া কুটনা কুটিতে বসিলেন। হিন্দুর বিবাহ একটি কুল-কর্ম্ম। আত্মকৃতি নহে।

অতএব বুঝিতে গেলে বলিতে হয়, একটি পরিবারের সহিত একটি হিন্দু কুমারীর বিবাহ হয়; কেবল একটি পুরুষের সহিত নহে। আমাদের লৌকিক কথায় ও ব্যবহারেও আমরা সেই রূপ বুঝিয়া আসিতেছি। "মেয়েটির কোথায় বিবাহ দিলেন মহাশয়?" "উত্তর, শ্রীপুরের চৌধুরীদের বাড়ী।" 'ভাল বংশ বটে, ভাত কাপড়ের দুঃখ হবে না।" তাহার পরের প্রশ্ন "পাত্রটি কেমন"?

"কালেজে লেখা পড়া করিতেছে।" তবেই মুখ্য কথাটা হ'ল, যে কুল কেমন? কেননা হিন্দু বুঝেন, বিবাহ কুলের সহিত, বিশেষ পুরুষ কেবল পাত্র মাত্র।

বিবাহের মন্ত্রে বর বারম্বার বলিতে থাকেন, ;—

ওঁ ধ্রুবা দৌঃ, ধ্রুবা পৃথিবী,
ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ,
ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতাইমে,
ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্।

আকাশ ধ্রুব, পৃথিবী ধ্রুব, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই ধ্রুব, পর্ব্বত সকল ধ্রুব, এই স্ত্রীও পতি কুলে ধ্রুব।

কন্যা বলেন,—

ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং।
পতি কুলে ভূয়াসম্।

হে ধ্রুব নক্ষত্র; তুমি যেমন অচল, আমি যেন তেমনি পতি কুলে অচলা হই।

বর কন্যাকে বলিতেছেন;—

ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব,
সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব,
ননন্দরিচ সম্রাজ্ঞী ভব,
সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।

শ্বশুরে সম্রাজ্ঞী হও, শ্বশ্রূজনে সম্রাজ্ঞী হও, ননন্দায় সম্রাজ্ঞী হও, দেবর সকলে সম্রাজ্ঞী হও।

অতএব স্ত্রীকে কেবল The Empress of my heart হইলে চলিবে না, The Slave Empress of a whole family হওয়া চাই। 'যত গুলি লোক লইয়া পরিবার, পত্নীর তত গুলি সম্বন্ধ বা তত গুলি লোকের সহিত সম্বন্ধ," "হিন্দু পত্নীকে পতিতে এবং পতির কুলেতে চিরকালের জন্য অচল ভাবে," ধ্রুব নক্ষত্রের মত, স্থির রাখিতে "আবদ্ধ রাখিতে যত্নবান।*" হিন্দুর বিবাহে দুটি তারা দেখিতে হয়—একটি অরুন্ধতি, আর একটি ধ্রুবতারা। অরুন্ধতিকে সাক্ষি করিয়া, আদর্শ করিয়া, কন্যা বলেন, 'হে অরুন্ধতি আমি যেন তোমার মত

---

* বিবাহ সম্বন্ধে সমস্ত উদ্ধৃত বাক্যই বাবু চন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সাবিত্রী লাইব্রেরির পূর্ব্ব এক বাৎসরিক অধিবেশনে পঠিত, "হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য ও বন্ধন" নামক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। বঙ্গদর্শনের সপ্তম খণ্ডের শেষ ভাগে

পতিতে আবদ্ধ থাকি। (অরুন্ধতি বশিষ্ঠের জায়া, তিনি আকাশেও বশিষ্ঠের সহচরী) অর্থাৎ ইহকালে পরকালে যেমন সমান আবদ্ধ থাকি। আর ধ্রুবকে সাক্ষি করিয়া বলেন, আমি যেন তোমার মত পতি কুলে চিরস্থির থাকি।

এতক্ষণ ধরিয়া আমরা বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে একটিও কথা কহি নাই, এখন একবার আস্তে আস্তে, ভয়ে ভয়ে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বিবাহ কথাটা যেন কেমন কেমন লাগে না? ধর্ম্মের দিক্ দিয়া দেখিলে, হিন্দু নারীর বিবাহ যেরূপ পদার্থ, তাহাতে তাঁহার পুনর্ব্বিবাহের কথা উঠিতেই পারে না।

হিন্দু রমণী একবার যে কুলে গৃহীতা, নীতা, ও পরিণীতা হইয়াছে, সে কোন প্রকারেই আর সে কুল ত্যাগ করিতে পারে না। কুল-ত্যাগিনী, কুলটা ব্যভিচারিণী, আমাদের হিন্দুদের অভিধানে একই পর্য্যায় ভুক্ত। এই পরিভ্রাম্যমান জগতের মধ্যে এক মাত্র অচল, অটল পদার্থ ধ্রুব নক্ষত্রকে সাক্ষি করিয়া হিন্দু নারী বলিয়াছেন,—

ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং।
পতি কুলে ভূয়াসম্।

আমি যেন পতি কুলে অচলা হই; তবে আজি কোন প্রাণে সেই পতি-কুল ত্যাগ করিবেন? তবে যে ধর্ম্মের দিকে তাকাইবে না, তাহার কথা স্বতন্ত্র।

তাহার পর আবার দেখ, বিবাহ ঘোরতর আধ্যাত্মিক যোগের অনুষ্ঠান। হৃদয়ে হৃদয়ে মিল, প্রাণে প্রাণে মিল, আত্মায় আত্মায় মিল। হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস মানবের পঞ্চত্ব প্রাপ্তিতে তাঁহার আত্মার ধ্বংশ হয় না, পরকালে বিশ্বাস হিন্দুর জাতি-ধর্ম্ম। এখন বলুন দেখি, হিন্দু নারী স্বামীর পরলোক প্রাপ্তিতে কি বলিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে যাইবে? তাহা যদি সঙ্গত হয়, তবে স্বামী বিদেশে থাকিলে তো, তাঁহার পুনর্ব্বার বিবাহের দাবি চলিবে। পবিত্র সাবিত্রী নামে উৎসর্গীকৃত এই লাইব্রেরীর অধিবেশন অবসরে, এসকল কথা মুখে আনিতেও কুণ্ঠা হয়। সাবিত্রী চতুর্দ্দশীর ব্রত কথার শিক্ষা আমরা ভুলিতেছি; *শাস্ত্রের উপদেশ, যে, যিনি

এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; যাঁহারা আমাদের এই প্রবন্ধের এতদূর পর্য্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা সেই প্রবন্ধ এই সঙ্গে একবার পাঠ করিতে একান্ত অনুরোধ করি। হিন্দু বিবাহের ওরূপ পরিষ্কার ব্যাখ্যা আর কোথাও নাই।

সতী, তিনি স্বয়ং যম রাজকেও ভয় করেন না, কৃতান্ত তাঁহাকে পতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না! একথা আমরা বিশ্বাস করি, সতী কখন বিধবা হন না; স্বামী দেশেই থাকুন, আর বিদেশেই থাকুন, ইহ লোকেই থাকুন, আর পরলোক গতই হউন, দুই দিনের, দশদিনের, যুগের, মহাযুগের বিচ্ছেদ হইলেও, তিনি স্বামীর; স্বামী তাঁহার; তবে সতী আর বিধবা হইলেন কৈ? সাবিত্রী চতুর্দ্দশীর ব্রত কথার এই গভীর উপদেশ। যে নারী এই মহৎ উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। চমৎকার উপদেশ! চমৎকার ধর্ম্ম!

দেখা যাইতেছে, যে দুইটি তারাকে সাক্ষি রাখিয়া হিন্দু নারী বিবাহিতা হইয়াছিলেন, তাহারা দুই জনেই তাহার পুনর্বিবাহের একান্ত বিরোধী; অরুন্ধতি বলেন, 'তুমি যে আমার মত ইহকালে পরকালে স্বামী সহচরী থাকিবে বলিয়াছিলে,' তোমার সে কথা থাকে কৈ?' ধ্রুব বলেন, 'তুমি যে আমার মত স্বামীকুলে অচল অটল থাকিবে বলিয়াছিলে, তোমার সে কথাটাই বা থাকে কৈ?' তবেত হিন্দু বিধবার আর বিবাহ করা হয় না? যদি নাই হয়, তবে পঞ্চমবর্ষীয় বালকের পর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ 'নষ্টেমৃতে' শ্লোকের কি দশা হইবে? দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পৌনর্ভবও একপ্রকার বৈধ পুত্র, সে ব্যবস্থার কি হইবে?

আমার সুদীর্ঘ ব্যাখ্যার প্রথমাংশ যদি আমি বিশদ করিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলে, আপনারা অবশ্যই বুঝিয়া থাকিবেন, যে আমি এই তর্কের মীমাংসা জন্যই, মাংসাহার সম্বন্ধে মনুর মত সঙ্কলন করিয়াছি।

মাংস সম্বন্ধে হরিণটি, ছাগলটি,—কোন কোন স্থলে খাইতে পার বটে, কিন্তু—

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

এই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে পারিলেই ধর্ম্ম। এস্থলেও ঠিক তাই, 'নষ্টে' পারিবে, 'প্রব্রজিতে' পারিবে, ইত্যাদি, কিন্তু—

প্রবৃত্তিরেষা নারীণাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, যে দেবল, নারদ, পরাশর, মনু,—ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রয়োজক সকলেরই এই মত, সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রের এই মত। নষ্টে মৃতের পরের শ্লোকটি পড়িলেই তাহা বুঝা যায়। মনু যেমন পৌনর্ভবকে পুত্র মধ্যে ধরিয়াছেন, তেমনই কানীন ও গূঢ়োৎপন্নকেও পুত্র বলিয়াছেন।

যদি পৌনর্ভবের পুত্রত্ব দেখাইয়া বিধবা বিবাহ ধর্ম্ম সঙ্গত বলিতে পারা যায়, তাহা হইতে কানীন ও গূঢ়োৎপন্ন পুত্রের দোহাই দিয়া, পিনালকোডের ধারাবিশেষের ধর্ম্মত সাফাই করাও চলে। না, শাস্ত্রের ওরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে।

আদর্শ সমাজের রীতি নীতি লইয়া শাস্ত্র নহে। ধর্ম্মের আদর্শ ব্যবস্থা বলিয়া দিয়া, সমাজের সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সংস্করণ,—শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। যে দেশে বন্য বিন্ধ্যাচল-বাসী হইতে, বেদ নিরত ব্রাহ্মণ—চির দিনই আছেন, সে দেশে অষ্ট প্রকার বিবাহ, দ্বাদশ প্রকার পুত্র, শতকর্ম্মে শত বিধ ব্যবস্থা থাকিবেই থাকিবে; অন্তত থাকাই স্বাভাবিক; মাংসাহার প্রসিদ্ধ, আবার নিষিদ্ধ; যজ্ঞে পশুবধ শ্রেয়, আবার অহিংসা পরমধর্ম্ম; বিধবা বিবাহের নিষেধ, আবার বিধি; —এ সকলই থাকিবে; তাই বলিয়া তাহার সকল কথাই কি ধর্ম্ম সঙ্গত? কখনই কোন শাস্ত্রকার তাহা বলেন না। তাঁহারা সকলেই সকল কার্য্যে মুখ্য গৌণ ভেদ করিয়াছেন; যেটা হওয়া উচিত, কিন্তু পূরাপূরি হয় না, সেইটিই মুখ্য। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তাহাই ধর্ম্ম। সুতরাং শাস্ত্রের মুখ্য বিধি গুলিই ধর্ম্ম। তবে আবার গৌণ ব্যবস্থা গুলি লইয়া আমার ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারে প্রবৃত্ত হইবে কেন? কোনটি উচিত, কোনটি অনুচিত,—ধর্ম্মের নিকষেই তাহা স্থির হয়; মুখ্য ব্যবস্থা দেখিয়াই ধর্ম্ম বুঝিতে হয়; 'নষ্টেমৃতে' ইত্যাদি গৌণ ব্যবস্থা লইয়া উচিত অনুচিত মীমাংসা করা যাইতে পারে না।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া সহমরণ বিষয়ে শাস্ত্র বিচার করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে, হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ গ্রহণের কতকটা সঙ্কেত পাই।

বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের বিধিও শাস্ত্রে আছে, বিধবার সহমরণের বিধিও শাস্ত্রে আছে; মহাত্মা রামমোহন রায় বলেন, যে দুইরূপ বিধি থাকিলেও কেবল ব্রহ্মচর্য্যই বিধবার অবলম্বনীয়। এই কথা লইয়া সে সময়ে ঘোরতর বিচার বিতর্ক হয়। মহাত্মা কিরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, দেখুন;—

কোন কোন শাস্ত্রে আছে বটে, "যে স্ত্রীলোক সহমরণ ও অনুমরণ করে, তাহার বহুকাল ব্যাপিয়া স্বর্গ ভোগ হয়" "কিন্তু বিধবা ধর্ম্মে মনু প্রভৃতি যাহা কহিয়াছেন, তাহাতে অনুধাবন কর।" "আহারাদি বিষয়ে নিয়ম যুক্ত হইয়া

সাধ্বী স্ত্রী কেবল ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক থাকিবেন।” কিন্তু সহমরণ সকাম কার্য্য, ব্রহ্মচর্য্য নিষ্কাম ধর্ম্ম। “ভগবান্ মনু সর্ব্বাপেক্ষা বেদজ্ঞ হয়েন; তেঁহ, ঐ দুই শ্রুতির অর্থকে বিশেষ জানিয়া সকাম শ্রুতির দুর্ব্বলতা স্বীকার পূর্ব্বক, নিষ্কাম শ্রুতির অনুসারে, পতি মরিলে, স্ত্রীকে ব্রহ্মচর্য্যে থাকিতে বিধি দিয়াছেন।” যেহেতুক “ঐহিক কিম্বা পারত্রিক ফল কামনা পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, সেই কর্ম্মকে কাম্য কহা যায়, সে কাম্য কর্ম্ম সর্ব্বথা নিষিদ্ধ।” আর প্রতিবাদীরা যে লিখিয়াছেন, “কাম্য কর্ম্মের নিষেধ কোথাও নাই,—এ অশাস্ত্র; যে হেতুক কাম্য কর্ম্মের নিষেধক শ্রুতি ও স্মৃতি লিখিলে, স্বতন্ত্র বৃহৎ এক গ্রন্থ হয়।”* রাজা মহাশয় যদিও বৃহৎ গ্রন্থ লেখেন নাই বটে, কিন্তু তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায়, যে নিষ্কাম আশ্রম ধর্ম্মের যাজনা করাই হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ; সকাম কর্ম্মের নিষেধ শ্রুতি, স্মৃতিতে,—উপনিষৎ, গীতায়—সর্ব্বত্র সমান ভাবে আছে।

এখন মহাত্মার প্রদর্শিত যুক্তির অনুসরণ করিয়া হিন্দু বিধবার কোন পথ অবলম্বন করা উচিত তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন;—বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারেন, স্বামীসহমরণে তনুত্যাগ করিতে পারেন, আর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া জীবন অতিপাত করিতে পারেন; মনে করুন শাস্ত্রে তিন পন্থাই দেখান আছে—তিনটিই কি উচিত? তাহা কখনই হইতে পারে না। কোনটি ত্যজ্য, আর কোনটি অবলম্বনীয়, হিন্দু তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন।

স্বামীর পরলোক গতির পর, যে রমণী বিবাহ করেন, তিনি আপনার জন্যই বিব্রত; তাও আবার কেবল নিকৃষ্ট বৃত্তির চরিতার্থ করিবার জন্য উৎসুক। সুতরাং তাহার কার্য্য, কাম্য মধ্যে ঘোরতম কাম্য। নিকৃষ্ট সমাজ এরূপ প্রথা তখনও ছিল; এখনও আছে। নাগকন্যা উলূপী, রাক্ষস-জায়া মন্দোদরী, বা বানরপত্নী তারা, পুনর্ভূ হয়েন; শ্রেণীবিশেষ মধ্যে এরূপ প্রথা ছিল বলিয়াই শাস্ত্রে এরূপ কাম্য কর্ম্মের উল্লেখ আছে; কিন্তু কাম্য কর্ম্মের নিষেধ, শাস্ত্রের প্রতি শাখায় প্রশাখায় দেখিতে পাওয়া যায়। সহমরণও

* শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক প্রকাশিত মহাত্মার গ্রন্থাবলি মধ্যে সহমরণ বিষয়ক “প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সংবাদ” হইতে উদ্ধৃত-বাক্যগুলি সমস্তই গৃহীত।

কাম্য কর্ম্ম ; তবে পারত্রিক সুখভোগের কথাটা, স্বামীর ত্রিকোটি কুল উদ্ধারের কথাটা, উহার সহিত জড়িত থাকায়, এরূপ ঐহিক আত্ম-বিসর্জ্জন, কাম্য কার্য্য মধ্যে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু তবুত কাম্য বটে, সুতরাং হিন্দু বিধবার পক্ষে এক মাত্র ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বনীয়।

পতি বিয়োগের পর স্বামীকে স্মরণ করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক যাঁহারা জীবনের অবশিষ্ট ভাগ যাপন করেন, সকল সভ্য দেশেই এরূপ সাধ্বী নারী পুনর্ভূ অপেক্ষা সমধিক সম্মানিত এবং আমরণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পরোপকারে জীবন যাপন করেন, এরূপ নরনারীর সম্প্রদায় প্রায় সকল সভ্য দেশেই আছে, আর সভ্য জাতি সেব্য সকল ধর্ম্মেই এরূপ ব্রহ্মচর্য্যের আদর আছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের য়ুরোপে, মুসল-মান ধর্ম্মের আরব, পারস্য, তুরস্কে; বৌদ্ধ ধর্ম্মের চীন, জাপানে—আছে। কিন্তু হিন্দু মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য কেবল মাত্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সেব্য নহে। প্রতি গৃহের ভিত্তিরূপে এবং ছাদরূপে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা। এই অধঃপতনের পূর্ব্বে, এমন দিন ছিল, যখন সাধারণত কৈশোরের ব্রহ্মচারী, যৌবনে গৃহী হইয়া আবার সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেন। যে জাতি সমগ্র মনুষ্য-জীবন, কেবল মাত্র একটি অনুদযাপনীয় অনন্ত ব্রত বলিয়া এখনও মনে করে, সে জাতির পক্ষে এরূপ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

হিন্দুর সতীত্ব ধর্ম্মের পরিষ্কার আদর্শ বলে, হিন্দুর সমাজ সংগঠনের আধ্যাত্মিক প্রণালী প্রযুক্ত, হিন্দুর ব্রতবেদী গৃহের নিয়ম অনুসারে, হিন্দু বিধবা আমরণ ব্রহ্মচারিণী। পতিভক্তি, পতি-প্রীতি, পরকালে স্থিরতর বিশ্বাস,সামাজিক ব্যবস্থায় আন্তরিক শ্রদ্ধা, পারিবারিক নিষ্কাম ধর্ম্ম, এই সকল পবিত্র ভাব সংমিশ্রিত হইয়া হিন্দু বিধবাকে আমরণ ব্রহ্মচারিণী করিয়া রাখে। সাধারণত হিন্দু সমাজ মধ্যে যিনি হিন্দু বিধবার উপর বলব্যবস্থিত ব্রহ্মচর্য্যের (enforced widowhood) অত্যাচারের কথা বলেন, তাঁহার সহৃদয়তার প্রশংসা করিলে চলে, কিন্তু তিনি হিন্দুনারীর চিত্তক্ষেত্রের স্বচ্ছ, নির্ম্মল, পবিত্র, নিষ্ঠা-শক্তি যে সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

আধ্যাত্মিক আর্য্যধর্ম্মের মহিমা বলে, সর্ব্বজন পূজ্য মন্বাদি মহর্ষিগণের ধর্ম্ম সঙ্গত সুব্যবস্থার গুণে, বাল্মীকি প্রভৃতি কবিগুরুগণের প্রতিভাময়ী সৌন্দর্য্য সৃষ্টির আকর্ষণে, মহা মহা মুনি ঋষি প্রণীত পৌরাণিক উপাখ্যান

সকলের অপূর্ব্ব উপদেশে, বহুকালের পুরুষানুক্রমিক শিক্ষায়, সমাজের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে, হিন্দু নারীর পাতিব্রত্য—তাহার সহজ ধর্ম্ম, স্বভাব ধর্ম্ম, প্রাকৃতিক ধর্ম্ম হইয়াছে।

অথচ হিন্দুনারীর পাতিব্রত্য, জগতের একটি দুর্ল্লভ পদার্থ। ছাদন দড়ি, গোদা নড়ীর মত এই পাতিব্রত্যে "যখন যার, তখন তার" ভাব আসিতেই পারে না। হিন্দুর আধ্যাত্মিকতার মূল মন্ত্র 'সোহং।' হিন্দুনারীর সতীত্বের মূলমন্ত্র 'সোহং।' হিন্দুর ধর্ম্মের মূলমন্ত্র একমেবাদ্বিতীয়ং, হিন্দুনারীর সতীত্বের মূল মন্ত্র, সেই একমেবাদ্বিতীয়ং। হিন্দুনারীর সতীত্বের এই একমেবাদ্বিতীয়ং ভাব, যাঁহারা নষ্ট করিতে উদ্যত, আবার বলি, তাঁহাদের হৃদয়ের যে কোন ভাগের প্রশংসা করিতে হয়, কর, কিন্তু তাঁহারা যে হিন্দু সমাজের শক্তিতত্ত্বজ্ঞ—একথা মুখে আনিও না।

হিন্দুনারী জানেন, কেবল একং এবং অদ্বিতীয়ং; কাজেই তিনি পতিচারিণী হইলেই একচারিণী; সেই পতি যখন ব্রহ্মে লীন হইলেন, কাজেই তিনি ব্রহ্মচারিণী।

সেই মূর্ত্তি কি ক্ষেমঙ্করী, কেমন শান্তিময়ী; কেমন নিষ্কামে কার্য্যকরী; কেমন কোমলে কঠোর; যেন ইহকালে পরকালের ছায়া; সে সৌন্দর্য্যে বিলাস নাই; সে কোমলতায় আবেশ নাই; সে ললিত ভাবে গিট্‌কিরি কর্তপ নাই; সে বেহাগে 'ঢলিয়া পড়ি, ধর ধর" নাই। সে মূর্ত্তি আপনাতে নির্ভর করিতে জানে, করিতে পারে; বিনা মূল্যে সংসারের সেবা করে; তাঁহার কাছে ভোগের সহিত সেবার বিনিময় নাই; তাঁহার কর্ম্মই—প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম; তাঁহার ধর্ম্মই প্রকৃত—হিন্দুধর্ম্ম; তাঁহার জীবন—মহাব্রত; তিনিই যথার্থ ব্রতধারিণী; ব্রহ্মচারিণী; তিনি নারী হইয়াও দেবী।

হিন্দু সমাজে, সধবার সন্তান-পালনী, গণেশ-জননী মূর্ত্তি। সেই চোখে চোখে বজ্রহীন বিদ্যুতের নীর, স্থির চালনা, সেই হৃদয় নিঃসৃত ক্ষীরের সহিত স্নেহ সঞ্চার, সে সকলই ভাল; সকলই সুন্দর; কিন্তু তবু তাহার অন্তরতম স্তরে এতটুকু 'আপনি' আছে; জননী আপনাকে ভুলিয়াছেন বটে, কিন্তু কেবল আপনারই জন্য; আপনার সন্তানের জন্য। য়ুরোপের কবিরা এই মূর্ত্তি ধ্যান করিয়াছেন; য়ুরোপের ধর্ম্মশাস্ত্র এই দেবীমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন; পূজা করিয়াছেন; অঙ্কে শিশু যিশু শোভিতা মেরী মূর্ত্তিই গণেশ-জননী। কিন্তু হিন্দু বিধবার সংসার-পালনী ধাত্রী মূর্ত্তি, ব্রহ্মচারিণী মূর্ত্তি,—য়ুরোপের কবিরা

বুঝেন নাই, য়ুরোপের শাস্ত্রজ্ঞেরা জানেন না। বিধবার মর্য্যাদা য়ুরোপ জানেন না। ননেরিতে ব্রহ্মচর্য্যের অনুকরণ করিতে গিয়া ভ্রংশীকরণ করিয়াছে। সংসার-স্থিতা ব্রহ্মচারিণীর সংসার-নির্লিপ্তা মূর্ত্তি, সংসার সেবিকার সংসার কর্ত্রীর মূর্ত্তি, দাসীর দেবী মূর্ত্তি—এ বৈচিত্র, এ রহস্য, য়ুরোপ বুঝে না, জানে না; য়ুরোপের সহিত্যে নাই, কবিত্বে নাই, ধর্ম্মে নাই, সমাজে নাই। সেই রুক্ষ-কেশা, সামান্য-বেশা;—দেব-সেবানুরতা, ভোগ-রাগ-বিরতা,—অতিথি-সৎকার-কারিণী, পরিবার প্রতিপালনী—সেই সেবার কর্ত্রী, সর্ব্বজনের ধাত্রী,—ব্রতধারিণী ব্রহ্মচারিণীইত এই বঙ্গ সমাজ রক্ষা করিতেছেন। তুমি, আমি—আমরাত সকলেই—এক দিকে উদরের দায়ে ব্যস্ত, অন্য দিকে পৃষ্ঠের ঘায়ে ত্রস্ত। গৃহিণী সন্তানগণের সৃষ্টি স্থিতি দায়ে বিব্রত। কেবল হিন্দুর বিধবাই হিন্দুর ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছে। হিন্দুয়ানি রক্ষা করিতেছে; নহিলে এত দিন, আমাদের নিত্যসেবা উঠিয়া যাইত, ঠাকুর ঘরে drawing room হইত, তুলসী মঞ্চে ক্রোটন বসিত, শালগ্রামে বিলিয়ার্ড হইত; গৃহে ব্রাহ্মণ ভোজনের পরিবর্ত্তে ক্লবে ডিনর দিতাম, প্রাত্যহিক আতিথ্যের বদলে, poor fund এ subscribe করিতাম, মুষ্টি ভিক্ষুককে যষ্টি দিতাম। তাহা যে আজিও হয় নাই, চুণাগলি যে আজিও চুণাগলিই রহিয়াছে, এখনও রুই কাতলার রাস্তা হয় নাই,—সে কেবল ঐ বিধবার ব্রত পালনের ফলে। গৃহে গৃহে সেই নিষ্কাম ব্রত পালনের জলন্ত দৃষ্টান্ত এখনও আছে বলিয়া, এই ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে যেন আমরা একটু আলো দেখিতে পাইতেছি, আমরা এত যে মূর্খ হইয়াছি, তবু যেন একটা মহৎতত্ত্বের আভাস বুঝিতে পাইতেছি। এই ঘোর অমাবস্যার কোটালের প্রবল বানের তুফান তরঙ্গে পড়িয়াছি বটে, ভাসিয়াও যাইতেছি, তবু ঐ বেদ-ব্রাহ্মণ-অতিথি-পরিবারের সেবিকার মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয়, যে এ তুফান থাকিবে না, এই তরঙ্গ কমিবে, এ বান ফুরাইবে, এ জোয়ার থামিবে। আমরা আবার সেই অনন্ত বাহিনী সুর-তরঙ্গিণীর মন্দ স্রোতে অনন্ত সাগরাভিমুখে ধীরে ধীরে পূর্ব্বমত যাইতে পারিব।

বিনয়ে প্রার্থনা করি, হিন্দু সমাজের এখনকার দিনের এই একমাত্র জীবন্ত শিক্ষয়িত্রীকে, আপনারা ছলে, বলে, কৌশলে,—আইনে আন্দোলনে—সহৃদয়তায়, সভ্যতায়—তাঁহার পবিত্র বেদী হইতে অবতারিত না করেন। প্রকৃত শিক্ষকের অভাবে, আমাদের মধ্যে দিন দিনে শিক্ষা-বিভ্রাট হইতেছে। স্কুল

কালেজের শিক্ষকেরা শিক্ষা দেন না, get up করেন; পরীক্ষার জন্য ছাত্র গঠন করেন; লড়াইয়ের জন্য মেড়া বানান। দীক্ষা গুরু মৃত মন্ত্র কাণে দেন; সে মন্ত্রের প্রাণ নাই; তাহা প্রাণে লাগিবে কেন? পুরোহিত ঠাকুর শিক্ষা দিবেন কি, নৈবেদ্যের গুরুত্ব বুঝিয়া নিবেদকের গৌরব করেন; শিক্ষার ধার ধারেন না, ভিক্ষারই অবতার। তবে আর শিক্ষা দেবেন কে? এক শিক্ষা দিবে ইতিহাস? তাহাত জানি না; এক শাস্ত্র? তাহাত বুঝি না; এক ধর্ম্ম? তাহাত মানি না; এক অন্যের কর্ম্ম? তাহাত দেখিতে পাই না। ব্রত শিক্ষা দিতে, জীবনের মহাব্রত বুঝাইতে, বাঙ্গালা দেশে মানুষকে মনুষ্যত্ব শিখাইতে, বুঝাইতে, দেখাইতে,—এখনকার দিনে আছেন কেবল হিন্দুর বিধবা; প্রার্থনা করি, তাঁহাকে তাঁহার এই গরীয়সী বেদী হইতে মহীয়সী পরিচর্য্যা হইতে যেন পরিভ্রষ্ট না করেন।

হিন্দু সমাজের সহিত হিন্দু বিধবার, শিক্ষায়, দীক্ষায়, সুখে, দুঃখে, শিরায় শিরায় জড়িত। যেমন, আতিথ্য, দেব সেবা,—ক্রিয়া কর্ম্ম,—শ্রাদ্ধ তর্পণ—প্রভৃতি লইয়া হিন্দু সমাজ বলিয়া, ইহার কিছুই ত্যাগ করা যায় না; তেমনই বিধবার ব্রহ্মচর্য্যও এসমাজের নিতান্ত অঙ্গীভূত; কাজেই অবলম্বনীয়। উচ্চতর হিন্দু সমাজে বিধবার বিবাহ গরম গরম বরফের কুলপীর মত অতি উপাদেয় হইলেও, তাহা হয় না। গরম করিতে গেলে, বরফ থাকে না; বরফ রাখিতে গেলে, গরম করা হয় না। উচ্চতর শ্রেণীমধ্যে বিধবার বিবাহ দিলে, হিন্দুয়ানি থাকে না, হিন্দুয়ানি রাখিতে গেলে বিধবার বিবাহ হয় না। বরফ গরম করিলে, গরম জল হয়, গরম জল অনেক কাজে লাগে; কিন্তু তাতে ত প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না। হিন্দু নারীর পাতিব্রত্য বড় ঠাণ্ডা জিনিষ—প্রাণ শীতল কারী পদার্থ; যেখানে তাহা আবশ্যক, সেখানে বিধবা বিবাহের উষ্ণতা আনিলে চলিবে কেন? অবশ্য বলিতে পারেন, যে গরম জলও ত চাই? যেখানে চাই, সেখানে আছে; থাকিবেও। নিকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে আছেও, বটে; থাকিবেও বটে।

সুতরাং উচ্চতর সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলনের চেষ্টা করা, একরূপ অসম্ভবের সম্ভাবনা করা। হিন্দুর আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। ত্রিশ বৎসরের আইন খানির দুর্দ্দশা দেখাইয়া, এ কথার ঐতিহাসিক প্রমাণ হইয়াছে বলিলেও চলে; ত্রিশ বৎসর কেন বলি, সমস্ত কলিযুগ বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে সাক্ষি দিতেছে। পরাশর ত কলিকালের

ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজক; কেবল কলির জন্যইত বিধবা বিবাহের নিয়ম আছে; তবে কলিতেই আবার বিধবা বিবাহ দেখি না কেন ? তবে কি মুসলমানেরা বন্দ করিয়াছিলেন ? না তাহাত কেহই বলেন না। তবেই বলিতে হইতেছে, যে বিধবা বিবাহের আইন সমস্ত কলি কালেই আছে, তবে যেখানে খাটে, সেই খানেই খাটিতেছে।

বিধবা বিবাহের পূর্ব্ব পক্ষ, উত্তর পক্ষ তর্কবাদ করা,আমার সংকল্প নহে। ধর্ম্মাধর্ম্মের দোহাই দিয়া যে সকল কথা উঠে, প্রসঙ্গ ক্রমে আমি বোধ হয়, তাহার অনেক কথা বলিয়াছি; তবে সংক্ষেপে সেইগুলি এই সময় একবার ধারাবাহিক রূপে বলিলে ক্ষতি নাই।

ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতার কথা, ব্রহ্মাচারে ব্যভিচারের কথা, বংশবৃদ্ধিতে ব্যাঘাতের কথা, অবিবাহিত পুরুষ সকলের বিবাহে সুবিধা হইবার কথা, এই সকল কথা নানা কারণে আমি এই স্থানে তুলিব না; যাঁহারা ইহার জন্য আমাকে অপরাধী করিতে চান, তাঁহাদের কাছে আমি অপরাধ স্বীকার করিতেছি।

কিন্তু ঐগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি কথা আছে;—একটি তর্ক আছে; তাহার মূল বিলাতী সাম্যবাদ। বিপত্নীক পুরুষ যদি আবার বিবাহ করিতে পান, তবে বিধবা কেন না পারিবেন? কিন্তু আধুনিক সাম্যবাদীই ইহার উত্তর দিতে পারেন; "যে তবে বিপত্নীকের পুনর্দার গ্রহণ রহিত হোক।" হিন্দু কিন্তু সে ভাবে উত্তর দেন না। হিন্দু সাম্যবাদ মানেন না; হিন্দু মানেন অনুপাত-বাদ। ক খ যখন সমান নহে, তখন তাহারা সমান পাইবেও না; ক যেমন, তেমনই ক পাইবে; খ যেমন তেমনই খ পাইবে। ক খ মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ; কর ও খর স্বত্বাধিকার মধ্যেও সেইরূপ অনুপাত হইবে। হিন্দু এই অনুপাতবাদী। হিন্দু স্ত্রী পুরুষের সাম্য স্বীকার করেন না; কারণেই হিন্দু স্ত্রী পুরুষ মধ্যে অবস্থার সাম্য ব্যবস্থা করেন না। সাম্যবাদ হিন্দুর নহে। যাঁহারা সাম্যবাদী তাঁহারা আপনারাই বলিবেন, যে সাম্য হইতে বিধবার বিবাহ আসে না, বিপত্নীকের পুনর্বিবাহ বারণ হয়।

আর এক কথা বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অননুপালনীয়, unpractical, সুতরাং উহা ধর্ম্মই নহে। আমরা বিস্তারিত আলোচনায় দেখাইয়াছি, যে যাহা সম্পূর্ণরূপে পালন করা যায় না, অথচ পালন করিতে হয়, যত পালন করা যায়, ততই সহজ হয়, তাহাই ধর্ম্ম। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সেই জন্য মহাধর্ম্ম।

শেষ কথা Individual Liberty, বা স্বানুবর্ত্তিতা। হিন্দু বলেন, সামাজিকতাই ধর্ম্ম, মনুষ্যত্বই ধর্ম্ম; আত্মচারিতা ধর্ম্ম নহে। ঘোরতর অধর্ম্ম। বিধবা বিবাহের পোষকতায়, যিনি সম্প্রতি বঙ্গসমাজে এই তর্কের উত্থাপন করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়াছেন; স্পষ্ট বলিয়াছেন, যে আত্মচারিতা ধর্ম্ম নহে। আমরা কোন নাম নির্দ্দেশ না করিয়া পণ্ডিতবরের যুক্তির সেই ভাগ ইংরাজিতেই উদ্ধৃত করিলাম।

"I advocate it (widow marriage) on the broad ground of individual liberty of choice."

"I have no daughter. If I had the misfortune to have a young widowed one in my house, I would have certainly tried my utmost to get her remarried; but in that case, I would have thought of her and her only, and never cast a glance about the effect of her marriage on the community at large. In other words, I would have claimed my individual liberty, the 'liberty of choice of my daughter, and *not the claims of Morality.*"

লেখক স্পষ্টই বলিতেছেন, যে, যখন বিধবার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হই, তখন কেবল আত্ম-চারিতা বৃত্তি চরিতার্থ করিতে অবসর দান করি, সমাজের দিকে তাকাই না, ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখি না। হিন্দু বলেন, ধর্ম্মের দিকে, সমাজের দিকে না তাকাইয়া, আত্ম ইচ্ছার চরিতার্থ করা—কেবল অধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এক্ষণে যে সব মহিলা সাবিত্রী লাইব্রেরির অধ্যক্ষগণের প্রস্তাব অনুসারে এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জনের দুইটি কথা আপনাদের আলোচনার যোগ্য বলিয়া উদ্ধৃত করিব।

টাকী শ্রীপুরের শ্রীমতী পট্টেশ্বরী অধিকারী, অষ্টম বর্ষে বিধবা হন। তিনি বলেন;—"বাল্য বিবাহই বৈধব্যের মূল কারণ।" আমরা বলি, একথা ঠিক; পুরুষের বাল্য বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, নাতি বিরুদ্ধ কার্য্য। আসুন না, সকলে মিলিয়া আমরা বালক-বিবাহের কার্য্যত প্রতিবাদ করি। করিলে, বাল বৈধব্যের প্রতিরোধ করা হইবে; যাহার বিবাহ হয় নাই, সে বিধবা হইয়াছে, এ বিড়ম্বনা আর দেখিতে হইবে না।

যদি কিশোর বালকের সহিত অপোগণ্ড বালিকার বিবাহে হিন্দুসমাজ প্রশ্রয় দেন, তবে জানি না, কি বলিয়া সে সমাজ মজঃফরপুরের বহরমপুরার

শ্রীমতী শিবদাস দেবীর যুক্তি খণ্ডন করিবেন, তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবেন। তিনি লিখিয়াছেন ;—

"প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুই বিবাহ না হইলে বিবাহ সম্পূর্ণ হইল না। প্রথম বিবাহে আমাদের শাস্ত্রমতে পিতা কন্যাকে দান করিলেন, কিন্তু পিতার তো কাহাকেও কন্যার শরীর ভোগের অধিকার দিবার ক্ষমতা নাই। সে অধিকার আপনার ভিন্ন আর কাহারই নহে। ঘটনা বিশেষের পর স্ত্রীর সেই আত্মসমর্পণকে সেই জন্যই দ্বিতীয় বিবাহ বলে।

এই জন্য দ্বিতীয় বিবাহ না হইলে বিবাহ পূর্ণ নহে। দ্বিতীয় বিবাহের পূর্ব্বে যদি স্বামীর মৃত্যু হয়, স্ত্রী মুক্ত হইলেন, তখন পিতা যাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, তিনি আর নাই। তখন অবশ্যই তাঁহার অন্যকে আত্ম সমর্পণ করিবার অধিকার হইল। যখন তাহার পূর্ণ বিবাহই হয় নাই, তখন কেন না সে বিবাহ করিতে পারিবে?"

এই প্রশ্নের কি সঙ্গত উত্তর আছে আমরা জানি না; শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কোন উত্তর পাই নাই। ফল কথা, যদি এস্থলেও নাম-মাত্র বিধবার বিবাহ দিতে হিন্দু সমাজের আপত্তি থাকে, তবে বালক বিবাহের কার্য্যত প্রতিবাদ করা সকলের একান্তই কর্ত্তব্য।

এক্ষণে ঢাকার শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীর লিখিত প্রবন্ধের উপসংহার ভাগ, আমার শেষ কথা রূপে উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি। যে দেশের শিক্ষিতা রমণী এরূপ উচ্চতর ভাবে উদ্দীপিত, সে দেশে মোহকর সমাজ বিপ্লবের আশঙ্কা আমাদের না করিলেও চলে।

"বিধবা বিবাহ প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত হইলে, ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্টের পরিমাণ অধিক হইবে সন্দেহ নাই। যাহাতে হিন্দু বিধবাগণের সতীত্ব ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে পারে এবং তাঁহারা ধর্ম্মচারিণী হইয়া চিরকাল পরোপকার সাধন করিতে পারেন, তজ্জন্য প্রত্যেক নর নারীর যত্নবান হওয়া উচিত; যিনি একটি বিধবার জীবনও সৎপথে রাখিতে পারিবেন, তিনি হিন্দু সমাজের শত শত ধন্য বাদের পাত্র।

হিন্দু বিধবা রমণীগণ! আপনাদিগের নিকট আমরা সবিনয় নিবেদন, এই যে, আপনারা বাল্য, যৌবন, কি বৃদ্ধ, যে কালেই বিধবা হউন না কেন, পরম যতনে ধর্ম্ম সাধন রূপ মহৎব্রতে জীবনটি ব্রতি করুন; যথা,

শাস্ত্র যে ব্যক্তির সহিত আপনাদের বিবাহ হইয়াছিল, তিনি পাপী থাকুন, আপনাদের প্রতি করুণা-শূন্য থাকুন, যাহাই হউন না কেন, তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া সেই মৃত স্বামীর ধ্যানে জীবন যাপন করুন ; মৃত পতিকে বিস্মৃত হইয়া, কি অন্য পুরুষে প্রণয় স্থাপন করিয়া অধিক সুখী হইতে পারিবেন ? কখনই না।

আপনাদের ভাল বসন ভূষণ, উত্তম আহারাদি ও সন্তান সন্ততি হইবে বটে, কিন্তু তাহাই কি মনুষ্য জীবনের সার সুখ ?

পত্নী বিয়োগে পুরুষগণ যেরূপ আবার বিবাহ করিয়া অনেক বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে সুবিধা পান, সেরূপ আপনারাও পাইতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাতে আপনাদের কি মহত্ত্ব হইল ? বিবাহ না করিয়াও যখন ধর্ম্ম কার্য্যাদি আপনাদিগের আয়ত্তি রহিল, তখন পুরুষদের দাসীত্ব গ্রহণে কি ফল বুঝিতে পারি না।

মৃত পতির ধ্যানে জীবন যাপন করিলে, ধর্ম্ম বিষয়েও অনেক অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে।

আহা! যাহার সহিত একত্র চিরকাল ধর্ম্ম সাধন ও সাংসারিক সুখ ভোগাদি করিবেন বলিয়া, আপনারা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, দুর্ভাগ্য বশত যখন অকালে আপনাদের সেই জীবন সর্ব্বস্ব পতি সকল সাংসারিক সুখ ভোগাদি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন আপনারা কোন প্রাণে পুনঃ স্বামী গ্রহণ করিয়া অসার সংসার সুখে মত্ত হইবেন? কোন প্রাণেই বা সেই মৃত স্বামীর প্রেম-মুখ বিস্মৃত হইয়া অন্য পতির প্রতি অনুরাগিণী হইবেন ?

সেই মৃত স্বামীর মূর্ত্তি হৃদয় পটে অঙ্কিত করিয়া ধর্ম্ম সাধনায় রত হউন, ইহকাল ও পরকালে আপনাদিগের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।

মৃত পতির পাদ-পদ্ম-ধ্যানমগ্না ব্রহ্মচারিণী বিধবার মূর্ত্তি কি রমণীয়! তিনি কি শ্রদ্ধার পাত্রী! তাঁহাকে দর্শন করিলেও জীবন পবিত্র হয়; ধর্ম্মারাধনাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব; পশু পক্ষী আদিও ত অন্যান্য ইন্দ্রিয় সুখের অধিকারী ; মানব জীবন ধর্ম্মারাধনাতেই সম্পূর্ণ রূপে সফল হয়। আপনারা অন্যান্য সমস্ত সুখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মারাধনায় রত হউন। আপনারা লোকের কথায় উতলা না হইয়া, আপনাদের জীবনের যথার্থ সুখের

পথ খুলিয়া লইয়া নিজেরাও সুখী হউন, সমস্ত হিন্দু সমাজকেও পবিত্র করুন; আবার ভারত রমণীর সতীত্বের মহিমাতে পৃথিবী মোহিত হউক, এই আমাদের এক মাত্র কামনা।

নদী।

১

দেখেছি তোমারে নদি! বরষার কালে;
মত্তের গর্ব্বিত হাসি,অধীর তরঙ্গরাশি,
খেলিত তরল মুখে, চঞ্চল পরাণে;
আপন অতুল বীর্য্য গভীর নিস্বনে
ঘোষিতে,সংসারভুলি,নাচিতেলহরীতুলি
জগত হইত ভীত সেরূপ হেরিলে;
দেখেছি তোমায় নদি! বরষা আসিলে।

২

দেখেছি, প্রমত্তা নব যৌবনে মাতিয়া,
আপনার দুইকূলে, আঘাত করিতে বলে
ভাঙ্গিয়া গ্রাসিতে সেই স্বভাবের সীমা,
অনন্ত লালসা তব, অতন্ত গরিমা;
দিবানিশিরোষভরে আবর্ত্তেআবর্ত্তে ঘুরে
ভাসায়ে শ্যামল তট চলিতে গর্জ্জিয়া—
অহঙ্কারে পূর্ণ ছিল, যবে তোর হিয়া।

৩

দেখেছি;— পুলিনে এই তরু লতাগণ
সেই এই এক স্থানে,দাঁড়াইয়া একমনে
হেরিত তোমার সেই কুভাব ভীষণ;
ফিরিয়া কাহার পানে চাওনি কখন;
চাঁদের কিরণ রাশি,পড়িলে উরসেআসি
ছুড়িয়া ফেলিতে দূরে; খুলিয়া নয়ন
দেখ নাই চন্দ্র সূর্য্য—পঙ্কিল জীবন!

৪

দেখেছি সে মূর্ত্তি তব; কি দেখি এখন,
নাহি সেই অভিমান, ঔদ্ধত্য তোমার;
বীরত্বের চিহ্নমাত্র—সৈকতে লিখন—
নিশ্চল উর্ম্মির সম রজত আকার
তরঙ্গের মৃতদেহ—দর্পের শ্মশান,
পুঞ্জীভূত বালুরাশি রয়েছে প্রমাণ!

৫

কি দেখি; সঙ্কীর্ণ করি স্ফীত কলেবর,
অবিশ্রান্ত ক্ষুদ্র খাতে বহিতেছ ধীরে!
সে ভীম কল্লোল নাই, মৃদু স্নিগ্ধ স্বর।
পরাণে প্রেমের গীত, চলেছ সাগরে
বিমল দর্পণ যেন অনাবিল ছবি,
অচঞ্চল হৃদয়েতে হাসে শশী রবি।

৬

বিহঙ্গটি উড়ে যদি বিশাল আকাশে,
পাতিয়া হৃদয় আজি অঙ্কে লও তারে,
মেঘের বক্ষের বহ্নি তোমার উরসে—
জগতের হাসি কান্না ভাসিছে অন্তরে!
হেন সহ-অনুভূতি, পবিত্র প্রণয়
শিখে কি,যে জন দুঃখে পরিচিত নয়?

৭

নিরখি তোমায়, নদি! মনুষ্য জীবনে;
সম্পদ যৌবন মদে মাতিয়া যখন

সবল মানব দলে দুর্ব্বলে চরণে,
ঘৃণিত উপায়ে করে ইন্দ্রিয় সাধন,
বর্ষার পঙ্কিলময় প্রবাহ তোমার
ধমনি শিরায় তার বহে অনিবার।

৮

যৌবনের মাদকতা, সম্পদের বল,
সময়ে দুঃখের তাপে হইলে বিনাশ,
অতীত পাপের স্মৃতি রহে সে কেবল,
পরাণে মাখিয়া থাকে বিষাদ-নিশ্বাস!
কাতরে হৃদয় ধায় ঈশ্বরের পানে;—
নিদাঘের স্রোত তব হেরি সে জীবনে।

৯.

নয়ন ভরিয়া আজি তোমারে নিরখি,
অশ্রান্ত প্রশান্ত ভাবে করিছ গমন,
এক(ই)ক্ষুধা এক(ই)তৃষ্ণা একে মন রাখি;
অনন্ত অতুল রূপে মজিয়াছে মন!
দুঃখের শাসনে তুমি শিখেছ, হেথায়,
সুখের বিশ্রাম পাবে অনন্তের পায়!

১০

তরঙ্গে আবর্ত্তে আর উজানে কখন
অনন্ত হইতে দূরে নাহি তুমি সর!
সুধাংশু, তপন, তারা, জীব জন্তগণ,
তরু, লতা, এই আমি, অম্বর, ভূধর—
প্রকৃতির শত অঙ্গ, সলিলে ভাসিয়া
যাইতেছে তব সঙ্গে তোমারে লইয়া।

১১

সত্য, বিনশ্বর তুমি, কিন্তু স্রোতস্বতি।
তোমার সসীম দেহে অসীমের ভাস,
মরেতে অমৃত চিহ্ন; অশক্তে শকতি,
দেখিতেছি; শুনিতেছি পুরুষের শ্বাস;
পরা প্রকৃতির প্রাণে বহিতেছে মরি!
অণুময় জড় দেহে চেতনা সঞ্চারি।

১২

বুঝিতেছি, দেখিতেছি নিয়ত এখন
(তোমার জীবনে আজি বিশদ কেমন)
প্রকৃতির সঙ্গে সেই পুরুষের লীলা!
কেমন পরম প্রেম, কেমন বন্ধন!
মরি কিবা আকর্ষণে চলিতেছে ধীরে
অনন্ত, সুষমাময় প্রেমের সাগরে।

১৩

ক্ষুদ্রের বৃহতে গতি, বৃহতে বিশ্রাম,
(এক নিয়মেতে এই, বাঁধা ত্রিসংসার)
মিশিয়া মহতে পায় মহতের নাম,
মহান্ অস্তিত্বে লভে শান্তিপারাবার!
ক্ষুদ্রতম আমি নর কি বুঝিব তার,
—অচিন্ত্য অনন্ত মরি রহস্য অপার!

১৪

চলিয়াছ, শৈবলিনি! সিন্ধুর সকাশে—
অনন্ত বিস্তার-বক্ষ সে মহা জলধি,
সে অনন্তে মানবের স্বভাব বিকাশে,
সে মহান্ তত্ত্ব কথা—বুঝায়াছ নদি!
সে বিস্তার, সেই কাল, লাবণ্য যাহার,
তিনি ত বিশ্রাম স্থান চরমে সবার!

১৫

তোমার প্রফুল্ল অঙ্গ অনন্তের ছায়া
পড়িয়াছে; আজি তাই সুখের আস্বাদে
অবশ হয়েছে বপু; ঢালিয়াছ কায়া!
অসীমের অভিমুখে, প্রশান্ত আহ্লাদে।
মোরে সঙ্গে লও নদি! করিব গমন
সংসারের দুঃখ তাপ দিয়া বিসর্জ্জন!

নবজীবন।

১ম ভাগ } আষাঢ় ১২৯২ { ১২শ সংখ্যা।

মৈত্রী।

১।

পৃথিবীতে প্রেমের ন্যায় পদার্থ আর নাই। দয়া বল, করুণা বল, স্নেহ বল, ভক্তি বল, সকলই প্রেম-মূলক। প্রেম আছে বলিয়াই পৃথিবীতে সুখ আছে, সৌন্দর্য্য আছে, শ্রী আছে, সম্পদ্ আছে, উন্নতি আছে। স্বার্থ বৃত্তি পরিচালনা দ্বারাও সুখ সমৃদ্ধির সৃষ্টি হয়। বাণিজ্য-ব্যবসায় স্বার্থ-বৃত্তি মূলক এবং বাণিজ্য-ব্যবসায় হইতে সুখ সমৃদ্ধি উৎপন্ন হয়। কিন্তু সে সুখসমৃদ্ধি নিকৃষ্ট রকমের। সে সুখসমৃদ্ধি প্রাকৃতিক মনুষ্যের, আধ্যাত্মিক মনুষ্যের নয়; দেহের, আত্মার নয়। আবার সে সুখ সমৃদ্ধি যাহার তাহারি, আর কাহারও নয়। তোমার বাণিজ্য ব্যবসায় সুখ সমৃদ্ধি হয়, সে সুখ তোমারি, আর কেহ সে সুখে সুখী বা সে সমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধিশালী হয় না। আবার সে সুখ সমৃদ্ধির অপচয় আছে, ক্ষয় আছে, লয় আছে? আবার সে সুখ সমৃদ্ধি হইতে অহঙ্কার অসূয়া প্রভৃতি অসদ্ভাব উৎপন্ন হয়। অসদ্ভাব হইতে ঘোর অনর্থপাত হয়। অনর্থপাত হইলেই অমঙ্গল ঘটে। সে অমঙ্গল শুধু তোমার নয়, তোমার এবং অপরের অর্থাৎ সমাজের। অতএব স্বার্থ-বৃত্তি সুখ সমৃদ্ধির কারণ হইলেও পৃথিবীর প্রকৃত সুখ সৌন্দর্য্য এবং উন্নতির কারণ নয়। পৃথিবীর প্রকৃত সুখ সমৃদ্ধি এবং উন্নতির কারণ স্বার্থ-সংহার-মূলক প্রেম। প্রেম বাড়িলেই পৃথিবীর সুখ বাড়ে, সম্পদ্ বাড়ে, সৌন্দর্য্য বাড়ে, শ্রী বাড়ে, শোভা বাড়ে।

এখন জিজ্ঞাস্য—পৃথিবীতে প্রেম বাড়ে কেমন করিয়া? মনুষ্যের অন্তঃকরণে যে প্রেম-প্রবৃত্তি আছে, তাহা মনুষ্যের অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায় কিয়ৎ পরিমাণে আপনা আপনিই স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু সে পরিমাণে বড় বেশী নয়। স্বার্থমূলক না হইলেও স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেমের পরিমাণ বা পরিসর প্রায়ই স্বার্থের পরিমাণ বা পরিসরের অনুযায়ী হইয়া থাকে। পারিবারিক বা সামাজিক সম্বন্ধে যাহারা তোমার আপনার, অর্থাৎ তোমার পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ভাই ভগিনী শ্যালক শ্বশুর বৈবাহিক বন্ধু গুরু পুরোহিত, তোমার স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেম প্রায় তাহাদিগের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। তাহার প্রথম ফল এই হয়, যে প্রেম পৃথিবীর যত মঙ্গল সাধিতে সমর্থ, তত মঙ্গল সাধিতে সক্ষম হয় না, কেন না প্রেম স্বল্প সংখ্যক প্রাণীর মধ্যে সম্বদ্ধ থাকে। দ্বিতীয় ফল এই হয় যে প্রেম সম্পূর্ণ পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা লাভ করিতে পারে না এবং সেই জন্য কি প্রেমিক কি প্রেমের পাত্র কাহাকেও সম্যক্‌রূপে মহৎ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করিতে পারে না। যাহার সহিত আমি পারিবারিক বা সামাজিক সম্বন্ধে গাঁথা, তাহার সহিত আমার প্রেম যতই গাঢ় হউক না, সে প্রেম নিশ্চয়ই কতক পরিমাণে স্বার্থ মূলক, স্বার্থসংযুক্ত বা স্বার্থদূষিত। অতএব স্বার্থবিযুক্ত হইলে প্রেম প্রেমিক ও প্রেমের পাত্র যত মহৎ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়, স্বার্থসংযুক্ত হইয়া প্রেম এবং প্রেমের প্রেমিক ও পাত্র তত মহৎ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হইতে পারে না। তাই স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেম প্রায়ই সঙ্কীর্ণায়তন এবং সঙ্কুচিত-স্বরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু সঙ্কীর্ণায়তন এবং সঙ্কীর্ণ স্বভাব এবং সঙ্কুচিত-স্বরূপ যে প্রেম, তাহা পৃথিবীতে পূর্ণ সুখ, পূর্ণ মহত্ত্ব এবং পূর্ণ পবিত্রতার সৃষ্টি করিতে পারে না এবং সেই জন্য মানুষকে পূর্ণানন্দ পরমেশ্বরের পূর্ণ অধিকারী করিতে অসমর্থ হয়। এই জন্য মানব-শিরোমণিরা শুধু স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেম লইয়া সন্তুষ্ট হন না, শিক্ষা দ্বারা প্রেমের আয়তন বৃদ্ধি করিতে এবং প্রেমের প্রকৃতি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করিতে প্রয়াস পান। সে শিক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের বড়ই শ্লাঘার বিষয় যে, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে সে শিক্ষার যেমন পূর্ণতা এবং গভীরতা দেখিতে পাওয়া যায়, আর কাহারও ধর্ম্মশাস্ত্রে তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রেম অপরিমিত না হইলে পৃথিবীর অপরিসীম উন্নতি হয় না এবং স্বার্থবিযুক্ত না হইলে প্রকৃতপক্ষে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয় না। সুতরাং প্রেমকে

অপরিমিত করিবার প্রধান উপায় উহাকে স্বার্থবিযুক্ত করা। যতক্ষণ তুমি কেবল তোমার আপনার লোকগুলিকে ভালবাস, ততক্ষণ তোমার প্রেম পরিমিত। যখনই তুমি তোমার আপনার লোক নয় এমন একটি লোককে ভালবাস, তখনই তোমার প্রেম পরিমাণ অতিক্রম করিয়া যাহাকে অপরিমিত প্রেম বলে, সেই প্রেমের স্বভাব বা ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। এই আশ্চর্য্য এবং অপরিমিত পরিবর্ত্তনের অর্থ এই যে, তখন তুমি তোমার-আপনার-লোক বলিয়া যে একটা লোকের মধ্যে ইতর-বিশেষ করিবার মাপ-কাটি ব্যবহার করিতে, সেটা ফেলিয়া দেও। তখন তুমি আর তোমার-আপনার-লোক এবং তোমার-আপনার-লোক-নয় এরূপ লোক মধ্যে কোন প্রভেদ কর না। অর্থাৎ তখন যাহারা তোমার আপনার লোক এবং যাহারা তোমার আপনার লোক নয় সকলেই তোমার কাছে সমান হইয়া পড়ে। কিন্তু এরূপ হইলেও লোকে তোমার কাছে সম্পূর্ণরূপে সমান হয় না এবং সমান প্রেমের পাত্র হয় না। কারণ আপনার-লোক বলিয়া লোক মধ্যে যেমন একটা ইতর-বিশেষ করিবার মাপকাটি কাছে। বিদ্বান বুদ্ধিমান বিচক্ষণ দয়ালু দানশীল সুরসিক সুরুচি সম্পন্ন ইত্যাদি বলিয়া তেমনি লোক মধ্যে ইতরবিশেষ করিবার অনেকগুলি মাপকাটি আছে। সেই সমস্ত মাপকাটি ফেলিয়া দিয়া যতক্ষণ না তুমি সমস্ত লোককে সম্পূর্ণরূপে সমান জ্ঞান কর ততক্ষণ তোমার মানব প্রেম সম্পূর্ণরূপে অপরিমিত হয় না। আবার মানব এবং মানব নয়, এই বলিয়া জীবমধ্যে ইতরবিশেষ করিবার তোমার যে মাপকাটি আছে, সেই মাপকাটি ফেলিয়া দিয়া যতক্ষণ না তুমি যাহারা মানব এবং যাহারা মানব নয়, তাহাদের সকলকেই সমান জ্ঞান কর, ততক্ষণ তোমার প্রেম মানব-সম্বন্ধ থাকে, অর্থাৎ, প্রকৃতরূপে পরিমাণ শূন্য হয় না। এবং সে মাপকাটি ফেলিয়া দিয়া যখন তুমি সকল জীবকে সমান জ্ঞান করিয়া সমান ভালবাসিতে থাক, তখনও তোমার প্রেম সম্পূর্ণরূপে অপরিমিত ও অপরিসীম নয়। কেন না তখনও জীব ও জীব নয় বলিয়া পদার্থমধ্যে ইতরবিশেষ করিবার তোমার যে আর একটি মাপকাটি আছে সেটি তুমি ফেলিয়া দেও নাই। কিন্তু সে মাপকাটিটিও ফেলিয়া দিয়া যতক্ষণ না তুমি সকল পদার্থকে সমান জ্ঞান করিয়া সমান ভালবাসিতে আরম্ভ কর, ততক্ষণ তোমার প্রেমের সীমা ও পরিমাণ আছে, ততক্ষণ তোমার প্রেম সম্পূর্ণরূপে অপরিমিত মহৎ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ নয়।

এসকল কথার অর্থ এই যে সমদর্শিতা,—প্রেম বৃদ্ধি ও প্রেম বিস্তারের প্রধান হেতু। যতক্ষণ সকল লোককে, সকল জীবকে এবং সকল পদার্থকে সমান জ্ঞান করিতে না পারা যায়, ততক্ষণ সকল লোকের প্রতি সকল জীবের প্রতি এবং সকল পদার্থের প্রতি প্রেমও হয় না। এই জন্য পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রেমবর্দ্ধনার্থ প্রভেদ দর্শন নিষেধ এবং সমদর্শিতার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন ;—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মনং সব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ। (৬অ—২৯)

সব্বত্র সমদর্শী যোগী ব্যক্তি আপনাকে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূতকে আপনাতে দেখেন।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং সযোগী পরমোমতঃ। (৬অ—৩২)

হে অর্জ্জুন! যে যোগী, আত্ম দৃষ্টান্তে সকল ভূতে সুখ বা দুঃখই হউক সমানরূপে দেখেন, তিনিই পরম যোগী।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমনিয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ। (১২অ—১৮)

যে ব্যক্তি নিঃসঙ্গ হইয়া শত্রু মিত্রেতে সমদর্শী হয় এবং মান অপমান তুল্য বিবেচনা করে, শীতোষ্ণ সুখ দুঃখ সমস্তই যাহার চক্ষে এক (সেই ব্যক্তিই আমার প্রিয়)।

সম দুঃখ সুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়োধীরস্তুল্য নিন্দাত্মসংস্তুতিঃ। (১৪অ—২৪)

যে ব্যক্তির সুখ দুঃখ উভয়ই সমান এবং যে ব্যক্তি আপনাতেই আছে, লোষ্ট্র অশ্ম ও কাঞ্চন যাহার চক্ষে সমান প্রিয় অপ্রিয় যাহার পক্ষে সমান, নিন্দা ও স্তুতি যাহার পক্ষে তুল্য (সেই ব্যক্তিই গুণাতীত)।

সকল জীবকে সমান জ্ঞান করিবার বিষয় এরূপ উপদেশ ভগবদ্গীতায় অনেক আছে। বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ দৈত্যশিশুদিগকে এইরূপ উপদেশ দিতেছেন ;—

সর্ব্বত্রদৈত্যাঃ সমতামুপেত
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য। (প্রথম অংশ, ১৭অ—৯০)

হে দৈত্যগণ! তোমরা সর্ব্বত্র সমদর্শী হও ও সকলকেই আত্মবৎ জ্ঞান

কর। সর্ব্বত্র সমদর্শী হওয়া ও সর্ব্বপ্রাণীকে আত্মবৎ জ্ঞান করাই ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা।

আর এক স্থলে প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে কহিতেছেন ;—

সর্ব্বভূতাত্মকে তাত ! জগন্নাথে জগন্ময়ে।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্র কথা কুতঃ ?
ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ।
যততস্তোঽয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক কুতঃ ! ॥
(প্রথম অংশ ১৯—১৭ ও ৩৮)

পিতঃ যখন জগন্নাথ জগন্ময় সর্ব্বভূতাত্মাতে অবস্থান করিতেছেন, তখন মিত্র ও অমিত্রের কথা কোথায় ? যখন ভগবান বিষ্ণু আপনাতে আমাতে ও অন্য সমুদায়েই বিদ্যমান রহিয়াছেন, তখন এই আমার মিত্র এই আমার শত্রু এই প্রকার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কিরূপে স্থাপিত হইবে ?

গ্রন্থ বিশেষ হইতে আর এরূপ শ্লোক উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই। হিন্দুর সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র সমদর্শিতার উপদেশে পরিপূর্ণ। সে শাস্ত্রে সমদর্শিতার কথাই প্রধান কথা, সে কথা বই আর অন্য কথা নাই বলিলেই হয়।—তাই হিন্দুমাত্রেই সমদর্শিতার কথা অবগত—কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী ; কি নির্ধন, কি ব্রাহ্মণ, কি চণ্ডাল, কি রাজা, কি প্রজা সকল হিন্দুই ঐ কথা জানে— সকল হিন্দুই জানে, সকল হিন্দুই বলে। ইউরোপে কত কালের পর এই সে দিন কেবল মাত্র কয়েক জন দার্শনিক বুঝিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে সকল লোকই সমান। ভারতের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথা ছাড়িয়া দাও, ভারতের হাড়ি মুচি চণ্ডাল পর্য্যন্ত কতকাল হইতে যে পৃথিবীর সকল লোককে সকল জীবকে সকল পদার্থকে সমান বলিয়া জানে তাহার ঠিকানা নাই। অতএব প্রেম বিস্তারের জন্য যে সমত্ববাদ আবশ্যক, তাহা বহুকাল হইতে ভারতে যেরূপ প্রচলিত আছে এবং আপামর সাধারণের মধ্যে যেমন জানা আছে, তেমন আর কোথাও নাই।

প্রেম বিস্তারের জন্য যে সমদর্শিতা আবশ্যক, এ কথা বোধ হয় অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী শুধু হিন্দু শাস্ত্রের প্রমাণ দেখিয়া স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদের ইংরাজের শাস্ত্রে ভক্তি ও আস্থা বেশী। অতএব ইংরাজের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে তাঁহাদিগকে একটি প্রমাণ দি। যীশু খৃষ্ট তাঁহার শিষ্য দিগকে বলিতেছেন ;—

Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.

But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;

That ye may be the children of your Father which is in Heaven! for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.

[মথি—৫ অধ্যায়, ৪৩—৪৫।]

ভগবান ভাল মন্দ ন্যায়বান ন্যায়বিরোধী নির্ব্বিশেষে সকল লোককে সমান কৃপা করেন, অতএব মানুষেরও শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে সকল লোককে সমান ভালবাসা উচিত—একথার অর্থ এই যে সর্ব্বব্যাপী প্রেমের মূল সমদর্শিতা, অর্থাৎ সমদর্শিতা ব্যতীত প্রেম সর্ব্বব্যাপী হয় না। অগ্রে সমদর্শিতা পরে প্রেমের বিস্তার। সকল উন্নত ধর্ম্মশাস্ত্রেরই এই কথা।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে সমদর্শিতা হইলেই কি প্রেমের বিস্তার হইবে? আমি সকল লোককে, সকল জীবকে, সকল পদার্থকে সমান দেখি বলিয়া যে সকল লোককে, সকল জীবকে, সকল পদার্থকে ভালবাসিব এমন কি কথা আছে? কেন ভালবাসিব? কি জন্য ভালবাসিব? সমদর্শিতা আমার, সমদর্শী বলিয়া আমি না হয়, সকলকে সমান জ্ঞান করিলাম, কিন্তু ভাল বাসিব কেন? দুইটি বস্তুকে সমান বলিয়া বুঝিলে দুইটিকে যে ভালবাসিতে হইবে এমন ত কোন কথা নাই। সকলকে ভালবাসিতে হইলে সকলকে সমান দেখিতে হইবে একথা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না, যে সকলকে সমান দেখিলে সকলকে ভালবাসিতেই হইবে। এ প্রশ্নের উত্তরে খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীরা হয় ত বলিবেন যে, ঈশ্বর আমাদের প্রেমের পাত্র অতএব ঈশ্বরসৃষ্ট সকলকেই আমাদের ভালবাসা উচিত। প্রত্যুত্তরে বলি, যে ঈশ্বর আমাদের প্রেমের পাত্র বলিয়া তাঁহার সৃষ্ট সকল লোককেই যে ভালবাসিতে হইবে এমন কি কথা আছে? আমার পিতা আমার প্রেম-ভক্তির পাত্র। কিন্তু তাই বলিয়াই যে আমাকে তাঁহার সব সন্তানগুলিকে ভালবাসিতে হইবে এমন কি কথা আছে? এতটুকু স্বীকার করিতে পারি যে, আমার প্রেমের পাত্রের সন্তানকে আমি যদি ঘৃণা করি, তাহা

হইলে আমার দোষ হইতে পারে, কেন না তাহা হইলে আমার প্রেমের পাত্রের অবমাননা করা হয়। কিন্তু আমার প্রেমের পাত্রের সন্তানকে যদি আমি ঘৃণাও না করি এবং ভালও না বাসি, অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধে যদি আমি নির্ব্বিকার (indifferent বা impassive) হই, তাহা হইলেত আর আমি আমার প্রেমের পাত্রের কাছে কোন রকমে অপরাধী হইনা এবং আমার প্রেমের পাত্রকে আমার অবমাননা করা ও হয় না। তবে কেমন করিয়া স্বীকার করি যে ঈশ্বর সকল লোককে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া অর্থাৎ সকল লোক ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আমাকে সকল লোককে ভালবাসিতেই হইবে? সকল লোকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া সকল লোককে সমান জ্ঞান করিলেও করিতে পারি, কিন্তু সকল লোককেই যে ভালবাসিব, এমন ত কোন কথা নাই। ফল কথা, সকল লোককে ভালবাসিতে হইলে ভালবাসিতে পারা যায়, এমন কোন পদার্থ সকল লোকেই থাকা চাই, নহিলে মানসিক নিয়মানুসারে মনে প্রেমের বা ভালবাসার সঞ্চার হইবে কেন? হিন্দু ভিন্ন আর কাহারো ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে না, যে ভালবাসিতে পারা যায় এমন কোন পদার্থ সকল লোকেই আছে। পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুই বলেন যে সকল লোকেই এমন একটি পদার্থ আছে যাহা ভালবাসিতে পারা যায়, যাহা ভাল না বাসিয়া থাকা যায় না, যাহা ভালবাসিবার পদার্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ। বিষ্ণুপুরাণে মহামতি প্রহ্লাদ দৈত্যদিগকে কহিতেছেন;—

সর্ব্বভূতস্থিতে তস্মিন্ মতির্মৈত্রি দিবানিশম্।
ভবতাং জায়তামেবং সর্ব্বক্লেশান্ প্রহাস্যথ॥

(প্রথম অংশ, ১৭অ, ৭৯)

সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ভগবান বিষ্ণুতে তোমাদের অন্তঃকরণ সমাহিত হউক্। ভূতমাত্রই সেই ভগবানের অধিষ্ঠান, সুতরাং সর্ব্বভূতের প্রতি তোমাদের বন্ধুবৎ ব্যবহার হউক্। তোমাদের রাগদ্বেষাদি-কৃত সমুদয় ক্লেশ দূর হউক। (শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের অনুবাদ)

সেই পরম পদার্থ সেই পূর্ণ প্রেমের পদার্থ পরমেশ্বর সকলেতেই আছেন অতএব সকলকেই ভালবাসিবে। ইহার উপর আর কথা নাই। পরব্রহ্ম পরমেশ্বর যে বড়ই প্রেমের পদার্থ তাহা কি আর বলিতে হয়? সেই পরম প্রেমের পদার্থ যাহাতে আছে, সেই পরম প্রেমের পদার্থে যে গঠিত, সেও কি

তবে প্রেমের পদার্থ নয়? হিরণ্যকশিপুর ন্যায় পরমব্রহ্মবিদ্বেষী না হইলে কেমন করিয়া বলিব, যে সেও পরম প্রেমের পদার্থ নয়? এক ব্রহ্ম পদার্থে নির্ম্মিত বলিয়া সকল লোক সকল লোকের প্রেমের পদার্থ—একথা না বলিলে বুঝিতে পারি না কেন লোক সকল লোককে ভালবাসিবে। যিনি সোহংবাদের প্রকৃত অর্থ বুঝেন, যিনি সোহংমন্ত্রে দীক্ষিত, কেবল তিনিই বুঝেন এবং তিনিই বুঝাইতে পারেন কেন সকল লোককেই ভালবাসিতে হইবে। কি খৃষ্টান কি মুসলমান কি অপর কোন ধর্ম্মাবলম্বী কেহই তাহা বুঝেন না এবং বুঝাইতে পারেন না। তাঁহারা কেবল জোর করিয়া বলেন যে সকল লোককেই ভালবাসা উচিত এবং তাই তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত স্বার্থশূন্য ভালবাসাও বড় কম।

উপরে বুঝাইয়াছি যে প্রধান প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সমদর্শিতা ব্যতীত সর্ব্বব্যাপী প্রেম হয় না। কিন্তু সমদর্শিতার কারণ অথবা সমত্ববাদের মূল হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাই না। এক ঈশ্বরের সৃষ্টি হইলেই যে সকল জিনিস সমান হয় এমন কোন কথা নাই। এক বাপের সব ছেলেই যে রূপে গুণে ধনে মানে সুখে দুঃখে সমান তা নয়। ঈশ্বরের সবছেলেও সমান নয়। খৃষ্টান বলেন বটে যে ঈশ্বর maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust। কিন্তু পৃথিবীর এক দেশের লোক যত রৌদ্র ও যত বৃষ্টি পায় আর এক দেশের লোক তত রৌদ্র ও তত বৃষ্টি পায় না। আবার বায়ু বৃষ্টির কথা ছাড়িয়া দিয়া সুখ সম্পদস্বাস্থ্য প্রভৃতির কথা ধর, দেখিবে বায়ু বৃষ্টি যেমন অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক নির্ব্বিশেষে লোক মধ্যে সমভাবে বিতরিত, সুখ সম্পদ স্বাস্থ্য প্রভৃতি তেমন সমভাবে বিতরিত নয়। তবে কেমন করিয়া বলিব যে সকল লোক সমান? আবার গুণাগুণ সম্বন্ধেও সকল লোক সমান নয়। কেহ শিষ্ট কেহ অশিষ্ট, কেহ হিংস্রক কেহ অহিংসক, কেহ নম্র কেহ গর্ব্বিত, ইত্যাদি। তবে কেমন করিয়া বলি যে সকল লোক সমান? এবং কেমন করিয়াই বা সকল লোককে সমান ভাবিয়া শত্রু মিত্র সকলকে সমান ভালবাসি? কি খৃষ্টান কি মুসলমান কি অপর কোন ধর্ম্মাবলম্বী কেহই একথার উত্তর দিতে পারেন না। কাহারো ধর্ম্মশাস্ত্রে সমত্ববাদের মূল বা হেতু দেখিতে পাই না। সকলেই প্রীতিকর এবং অতি প্রয়োজনীয় প্রেমবাদ সংস্থাপনার্থ প্রকৃত বৈষম্যকে জোর করিয়া সমত্ব বলিয়া মনে করেন, সমত্ববাদ

জোর করিয়া প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু জোর করিয়া বৈষম্যকে সমত্ব বলিলে কত ক্ষণ সমত্ববাদে প্রকৃত আস্থা বা বিশ্বাস থাকে? বেশীক্ষণ আস্থা থাকে না বলিয়াই ইউরোপ সমত্ববাদ লইয়া এত চীৎকার করিয়াও অপর সকল দেশাপেক্ষা বেশী বৈষম্যময়। প্রকৃত সমত্ববাদের মূল একমাত্র হিন্দুশাস্ত্রে আছে। সুখ সম্পদ স্বাস্থ্য লোভ মোহ মাৎসর্য্য ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতি যে সকল বস্তু লোক মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে, অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি হইতে পৃথক করিয়া উভয় মধ্যে সমত্ব বিনাশ করে হিন্দু শাস্ত্র মতে সে সকল বস্তু বস্তুই নয়, স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল অবস্থার অর্থাৎ স্থূল ইন্দ্রিয়ের স্থূল এবং ক্ষণিক উপলব্ধি মাত্র। একথা যে সত্য এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত, তাহা নবজীবনের দশম সংখ্যায় সোহং নামক প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি। অতএব জ্ঞানী এবং তত্ত্বদর্শীর বিবেচনায় যাহা দ্বারা লোকমধ্যে ক্ষণিক বৈষম্য ঘটে, তাহা নাই বলিলেই হয়, যাহা প্রকৃত পক্ষে আছে, তাহা কেবল সেই নিত্য ব্রহ্ম পদার্থ; তাহা সকল লোকেই সমান, সকল অবস্থাতেই সমান। সেই ব্রহ্ম পদার্থ সকল লোকে আছে বলিয়াই সকল লোক সমান। অর্থাৎ লোকের অসার অস্থায়ী ক্ষণিক-উপলব্ধি স্বরূপ সুখ সম্পদ স্বাস্থ্য রূপ মোহ মাৎসর্য্য প্রভৃতি প্রকৃত পক্ষে কিছুই নয় এবং লোক মধ্যে তজ্জনিত যে বৈষম্য বা পার্থক্য হয়, তাহাও কিছুই নয়। অতএব সকল লোকে যে এক বৈষম্য-শূন্য ব্রহ্ম পদার্থ আছে, তাহাই তাহাদের প্রকৃত পদার্থ এবং সেই প্রকৃত পদার্থ সকল লোকে এক বলিয়াই সকল লোক সমান। তাই হিন্দুশাস্ত্রকার শত্রু মিত্র ভেদ কল্পনা করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন। গুরুগৃহে রাজনীতি শিক্ষা করিয়া প্রহ্লাদ যখন আপন পিতার নিকট আসিলেন এবং পিতা যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন করিয়া সাম দান ভেদাদি উপায় চতুষ্টয় দ্বারা শত্রু জয় করিতে হয়, তখন তিনি উত্তর করিলেন;—

মমোপদিষ্টং সকলং গুরুণা নাত্র সংশয়ঃ।
গৃহীতঞ্চ ময়া কিন্তু ন সদেতন্মতং মম॥

* * * *

সর্ব্বভূতাত্মকে তাত! জগন্নাথে জগন্ময়ে।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্র কথা কুতঃ?॥
ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ।
যতস্ততোঽয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্ কুতঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ—১৯ অধ্যায়, ৩৪, ৩৭ ও ৩৮)

পিতঃ আপনি যে সমস্ত বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন গুরুদেব তৎ সমুদায় বিষয়েই আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং আমিও তাহা শিক্ষা করিয়াছি সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার মতে ঐ নীতি সাধু বলিয়া বোধ হইতেছে না। * * * পিতঃ যখন জগন্নাথ জগন্ময় সর্ব্বভূতাত্মা পরমাত্মা গোবিন্দ সর্ব্ব-ভূতেরই অন্তরাত্মাতে অবস্থিত, তখন মিত্র ও অমিত্রের কথা কোথায়? যখন ভগবান বিষ্ণু আপনাতে, আমাতে ও অন্য সমুদায়েই বিদ্যমান রহিয়াছেন, তখন এই আমার মিত্র, এই আমার শত্রু, এই প্রকার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কিরূপে স্থাপিত হইবে?

তাই বলিতেছি প্রকৃত সমত্ববাদ এবং সমত্ববাদের প্রকৃত মূল হেতু এবং অর্থ একমাত্র হিন্দুশাস্ত্রে আছে, আর কোন শাস্ত্রে নাই। খৃষ্টীয় কি অপর ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সমত্ববাদ আছে, তাহা প্রকৃত সমত্ববাদ নয় এবং তাহার প্রকৃত মূল, হেতু এবং অর্থও নাই। অতএব বুঝা যাইতেছে, যে প্রেমবাদের মূলে যে সমত্ববাদ থাকা চাই, তাহা একমাত্র হিন্দুশাস্ত্রে আছে, আর কোন শাস্ত্রে নাই। অপরাপর শাস্ত্রকারেরা এরূপ বুঝিয়া থাকেন, যে প্রেমবাদের জন্য সমত্ববাদ আবশ্যক, কিন্তু প্রকৃত সমত্ব কি তাহা তাঁহারা বুঝেন না বলিয়া তাঁহাদের সমত্ববাদ কেবল মুখের কথা বই আর কিছুই হয় না। তাই বলি যদি প্রকৃত সমদর্শী হইয়া সকল লোককে ভালবাসা উচিত বোধ হয়, তবে হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন না করিলে চলিবে না, হিন্দুশাস্ত্রের শরণাপন্ন না হইলে চলিবে না।

শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে যাঁহারা আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্র পড়েন না কেবল ইংরেজের শাস্ত্র পড়েন, তাঁহারা হয়ত রাগান্ধ হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, ভাল, ভারতের সমত্ববাদ ও প্রেমবাদ লইয়া যে এত গর্ব্ব করিতেছেন, বলুন দেখি খৃষ্টানের ধর্ম্মশাস্ত্রে যীশুখৃষ্টকে যেরূপ আপন শত্রুদিগকে ভাল বাসিতে দেখিতে পাই, মৃত্যুকালে আপন হত্যাকারী শত্রুদিগকে (Father! forgive them!) পিতঃ! উহাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করুন) বলিয়া প্রেম প্রদর্শন করিতে দেখিতে পাই, হিন্দুশাস্ত্রে তেমন কিছু দেখিবার আছে? যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের কিঞ্চিন্মাত্রও পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন অনেক আছে। এখানে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। বিষ্ণুবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু আপন পুত্র প্রহ্লাদকে সংহার করণার্থ তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের আঘাত দ্বারা, সর্পের দ্বারা দংশন করাইয়া, বৃহদ্দন্ত-বিশিষ্ট হস্তী দ্বারা আক্রান্ত করিয়া, বিষম অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ

করিয়া এবং পাচকগণের দ্বারা বিষ ভক্ষণ করাইয়াও সংহার করিতে অসমর্থ হইয়া,—শেষে আপন পুরোহিতগণকে অভিচার ক্রিয়াদ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করিতে অনুমতি করিলেন। পুরোহিতগণ অভিচারের অনুষ্ঠান করিলেন। কিন্তু অভিচার ক্রিয়া ভীষণ অগ্নিশিখা রূপ ধারণ করিয়া নিষ্পাপ প্রহ্লাদকে পরিত্যাগ করিয়া পুরোহিতগণকেই ধ্বংস করিয়া ফেলিল। পুরোহিতগণকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া মহামতি প্রহ্লাদ আকুলপ্রাণে তাহাদিগের নিকট বেগে গমন করিয়া বলিয়া উঠিলেন ;—

সর্ব্বব্যাপিন্‌! জগদ্রূপ! জগৎস্রষ্টর্‌! জনার্দ্দন!
পাহি বিপ্রানিমানস্মাদ্‌ দুঃসহান্‌-মন্ত্রপাবকাৎ ॥
যথা সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী জগদ্‌গুরুঃ।
বিষ্ণুরেব তথা সর্ব্বে জীবন্ত্বেতে পুরোহিতাঃ ॥
যথা সর্ব্বগতং বিষ্ণুং মন্যমানো ন পাবকম্‌।
চিন্তয়াম্যরিপক্ষেঽপি, জীবন্ত্বেতে পুরোহিতাঃ ॥
যে হন্তুমাগতা দত্তং যৈর্বিষং যৈর্হুতাশনঃ।
যৈর্দ্দিগ্‌গজৈর্‌-অহং ক্ষুণ্ণো দষ্টঃ সর্পৈশ্চ যৈরপি ॥
তেষ্বহং মিত্রভাবেন সমঃ পাপোঽস্মি ন ক্বচিৎ।
তথা তেনাদ্য সত্যেন জীবন্তু সুরযাজকাঃ ॥

(বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ—১৮অ, ৩৬—৪০)

সর্ব্বব্যাপিন্! জগৎ স্বরূপ! জগৎ সৃষ্টিকারক! জনার্দ্দন! এই ব্রাহ্মণগণকে এই দুঃসহ মন্ত্রাগ্নি হইতে রক্ষা কর। সর্ব্বব্যাপী জগদ্‌গুরু বিষ্ণু যদি সর্ব্বজীবে থাকেন, তাহা হইলে এই পুরোহিতগণ জীবিত হউন। আমি সর্ব্বভূতময় বিষ্ণুতে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক যেমন অগ্নিকেও শত্রু বলিয়া গণনা করি নাই, সেই রূপ এই পুরোহিত গণ জীবিত হউন। পূর্ব্বে যাহারা আমাকে বিনাশ করিতে আসিয়াছিল, যাহারা বিষ প্রদান করে, যাহারা আমাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, যে সকল দিগ্‌গজ আমাকে দন্তাঘাত করিয়াছিল, যে সকল ভুজঙ্গ আমাকে দংশন করে, আমি তাহাদের সকলকেই মিত্রভাবে দর্শন করিতেছি, সকলের প্রতিই আমার সমদৃষ্টি রহিয়াছে। আমি কখন কাহারো অনিষ্ট চিন্তা করি নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সেই সত্য অনুসারে এই অসুর-যাজকগণ জীবন প্রাপ্ত হউন।

(শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের অনুবাদ।)

এ বড় কম দৃশ্য নয়। যীশু খৃষ্টের মৃত্যুকালের যে দৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছি, তদপেক্ষা ইহা কম দৃশ্য নয়। ইহা তদপেক্ষা বড় দৃশ্য। যীশুখৃষ্টের মৃত্যুকালীন দৃশ্যে নিকৃষ্টের প্রতি শ্রেষ্ঠের কৃপা করুণা দেখিতে পাই; প্রহ্লাদ চরিতের এদৃশ্যে ব্রহ্মাত্মকের প্রতি ব্রহ্মাত্মকের মিত্রতার গাঢ় অনুরাগ দেখিতে পাই। যীশুখৃষ্টের করুণা অতীব মনোহর, কিন্তু উহা তাঁহার নিজের অতীব মনোহর হৃদয়ের একটি ভাব মাত্র. ভাগ্য বলে তেমন হৃদয় না পাইলে, তেমন ভাবও কেহ অনুভব করে না। প্রহ্লাদের প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকৃত সমত্ববাদী সর্ব্বপ্রেমিকের প্রেম—যে কেহ হউক না কেন,সে সমত্ববাদ সম্যক্‌রূপে বুঝিলে,সেইরূপ সর্ব্বপ্রেমিক হইয়া সেইরূপ প্রগাঢ় প্রেম প্রদর্শন করিতে পারে। ভারতের সমত্ববাদ যুক্তি মূলক বলিয়া উপলব্ধি করিবার জিনিস এবং সেই জন্য সেই সমত্ববাদ-মূলক সর্ব্বব্যাপী প্রেমও শিখিয়া অধিকার করিবার জিনিস। খৃষ্টীয় প্রভৃতি শাস্ত্রের সমত্ববাদ সম্পূর্ণরূপে যুক্তিশূন্য ও অর্থহীন এবং ঘটনাক্রমে প্রেমিক হৃদয়ের অধিকারী না হইলে প্রায় কেহ সে সমত্ববাদ অবলম্বন করিয়া সর্ব্বব্যাপী প্রেম কেবল শিক্ষা দ্বারা অধিকার করিতে পারে না। খৃষ্টধর্ম্মে যে সমত্ববাদ আছে, তাহার অসারতা ও অযৌক্তিকতা বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে তাহা কেবল ভারতের সমত্ববাদের কথা শুনিয়া কথিত এবং সে ধর্ম্মে যে প্রেমবাদ আছে, তাহা ভারতের প্রেমবাদের ন্যায় সমত্ববাদ-মূলক নয়, কেবল যীশুখৃষ্টের পরম প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস এবং বাসনা মাত্র।

খৃষ্টীয় প্রভৃতি শাস্ত্রে যে প্রকৃত সমত্ববাদ ও প্রেমবাদ নাই, তাহার আর একটি উত্তম প্রমাণ আছে। খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীরা বলেন যে সকল মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্ট বলিয়া সমান। কিন্তু শুধু মানুষইত ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়, পশু পক্ষী বৃক্ষ প্রস্তর মৃত্তিকা সকলইত ঈশ্বরের সৃষ্ট। তবে শুধু মানুষই মানুষের সমান এবং মানুষের প্রেমের পাত্র কেন? পশুপক্ষী গাছ পালা প্রস্তর পর্ব্বতও মানুষের সমান ও প্রেমের পাত্র নয় কেন? সমদর্শী এবং সর্ব্বপ্রেমিক হিন্দু ত মানুষকে পশুপক্ষী গাছপালা প্রস্তর প্রভৃতি হইতে পৃথক জ্ঞান করেন না—মানুষ পশুপক্ষী গাছপালা প্রস্তর প্রভৃতি সকল পদার্থকে সমান জ্ঞান করেন এবং সমান ভালবাসেন। প্রহ্লাদ দৈত্যশিশুগণকে উপদেশ দিতেছেন:—

দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষিবৃক্ষ সরীসৃপাঃ।
রূপমেতদনন্তস্য বিষ্ণোর্ভিন্নমিব স্থিতম্॥

এতদ্বিজানতা সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
দ্রষ্টব্যমাত্মবদ্বিষ্ণুর্যতোহয়ং বিশ্বরূপধৃক্॥

(বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ — ১৯অ, ৪৭ও৪৮)

দেবতা মনুষ্য পশুপক্ষী বৃক্ষ ও সরীসৃপ, ইহারা অনন্তদেবেরই স্বরূপ, কেবল স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতেছে মাত্র। যিনি এই সমুদায় বিষয় জ্ঞাত আছেন, তিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বকে আত্মবৎ দেখেন, কারণ বিষ্ণুই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

বিশ্বে যত কিছু আছে, মানুষ বল, পশু বল, পক্ষী বল, সরীসৃপ বল, গাছ বল, লতা বল, প্রস্তর বল, মৃত্তিকা বল, সকলই সেই এক ব্রহ্ম পদার্থে নির্ম্মিত এবং সেই এক ব্রহ্মের রূপ মাত্র। অতএব শুধু সকল মানুষই যে সমান তা নয়, জগতে যত কিছু আছে সবই মানুষের প্রেমের পাত্র। তাই হিন্দুর ধর্ম্ম শাস্ত্রে শুধু সকল মানুষকে—শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে, সকল মানুষকে ভালবাসিবার উপদেশ নাই, শত্রু মিত্র স্বপক্ষ বিপক্ষ হিতকর অহিতকর নির্ব্বিশেষে, মানুষ পশুপক্ষী জল স্থল বৃক্ষলতা প্রস্তর মৃত্তিকা সকল পদার্থকেই সমান ভালবাসিবার উপদেশ আছে। সে উপদেশের নাম—মৈত্রী-বাদ। একমাত্র হিন্দুশাস্ত্রেই সে উপদেশ আছে। কি খৃষ্টীয় কি মুসলমান কি অপর কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রকৃত সমত্ববাদ নাই বলিয়াই সে মৈত্রীবাদরূপ উপদেশও নাই। মানবশাস্ত্রে মৈত্রীবাদের ন্যায় মহৎ উপদেশ আর নাই। এবং মানবশাস্ত্রের মধ্যে কেবল মাত্র হিন্দুশাস্ত্রে সে মহত্তম উপদেশ আছে।

হিন্দুর মৈত্রী বলিতেছে যে, হিন্দু পৃথিবীর অপর সকল লোকের অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ, উত্তম ও মহৎ। অতএব যদি সকলের অপেক্ষা মহৎ, উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হইতে হয়, তবে প্রাচীন হিন্দুর ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে এবং প্রাচীন হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের শরণাপন্ন না হইলে, চলিবে না।

ত্রিগুণ ও সৃষ্টি।

প্রকৃতির প্রথম পরিণাম—মহৎ-তত্ত্ব।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে সাংখ্যমতে সত্ব রজ ও তম গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, এবং তাহাতে পুরুষের সংক্রামিত শক্তি হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। জগত কারণ অনুসন্ধান করিয়া,সাংখ্যকার ইহার অধিক দূর অগ্রসর হন নাই। তিনি ইহাকেই জগতের মূল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং এই জন্যই ইহার প্রকৃতি নাম দিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"প্রকৃতেরাদ্যোপাদানতান্যেষাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ"। ৬।৩২।

প্রকৃতিই জগতের আদি উপাদান আর সমস্তই সৃষ্ট। বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন, "প্রকৃতিরিহ মূলকারণস্য সংজ্ঞামাত্রমিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ প্রকৃতি এই জগতের মূলকারণের সংজ্ঞামাত্র। প্রকৃতিই জগত কার্য্যের প্রকৃত কারণ "প্রকরোতি" এই জন্যই ইহার নাম প্রকৃতি হইয়াছে।

সে যাহা হউক, সাংখ্যকর্ত্তা মতে এই সাম্যাবস্থা (এই Equlibration অবস্থা—অথবা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যাহাকে nebulæ অবস্থা বলেন) সে অবস্থায়—পুরুষের সান্নিধ্যবশত—বৈষম্য হইলে তাহাতে, সত্বগুণের বিশেষ আধিক্য হয়। জড়প্রকৃতির সহিত প্রথম সম্মিলনে, অথবা প্রকৃতিতে পুরুষের সংক্রামিত শক্তিতে উল্লিখিত সত্বগুণের আধিক্যে প্রকৃতির প্রথম পরিণাম হইল মহৎ-তত্ত্ব।

প্রকৃতে র্মহান্।১।৬১।

বিজ্ঞানভিক্ষুও বলিয়াছেন, 'গুণক্ষোভে জায়মানে মহান্ প্রাদুর্বভূব হ।" "পরম পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতিতে চিৎশক্তি স্বরূপ বীর্য্য আহিত হইলে প্রকৃতির গুণক্ষোভ উপস্থিত হইয়া তাহা হইতে প্রকাশ বহুল মহত্তত্ত্ব প্রসূত হইল।" (শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ)

এই মহত্তত্ত্ব কি? সাংখ্যমতে কি মনুষ্য, কি পশুপক্ষী, কি উচ্চতর দেবতা, সমস্ত প্রাণী মাত্রেই (এমন কি জড়বৎ পদার্থেও?) যে বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—এই মহত্তত্ত্বই তাহার মূল কারণ—অথবা বীজ স্বরূপ। ইহাই জগতের সমষ্টি বুদ্ধি, বা সমষ্টি জ্ঞানের (Intelligence) বীজ। সমস্ত জগতের প্রত্যেক প্রাণীতে যে জ্ঞান ছিল বা আছে—তাহা সেই সমষ্টি জ্ঞানবীজের অধীন এবং তাহার আংশিক বিকাশ মাত্র। অনুগীতায় আছে—

"সর্ব্বত্রশ্রুতিমাল্লোকে সর্ব্বংব্যাপ্য স তিষ্ঠতি।"

এই মহত্তত্ত্ব সর্ব্বত্র শ্রুতিমান; এবং এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

যেমন বিজ্ঞান মতে সমষ্টি ভাবে ধরিলে প্রাকৃত শক্তির (Energyর) কখন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, যেখানে যে শক্তির বিকাশ হয় তাহা এই মূল শক্তিরই অংশ মাত্র, যখন তাহার লয় হইবে—তখন তাহা মূল সমষ্টি শক্তিতে গিয়া মিশিয়া যাইবে—কেহ কখন এই শক্তি সৃষ্টি বা নাশ করিতে পারে না, (ইহাকেই বিজ্ঞানে Law of Conservation অথবা Persistence of Energy or Force বলে) সেইরূপ মহত্তত্ত্বও সমষ্টি বুদ্ধি—যেখানে যখন বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশ দেখা যায়, তাহা এই সমষ্টি বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বের অংশ মাত্র। অথবা যেরূপ তাপ শক্তি এক হইলেও বস্তুবিশেষে এবং কারণ বিশেষে তাহা সমষ্টি তাপ হইতে ভিন্ন হইয়া আংশিকরূপে অধিক বা অল্প পরিমাণে প্রকাশ পায়, সেইরূপ মহত্তত্ত্বও বৈষম্য বশত যখন তাহা (রজঃপ্রভাবে অথবা তমঃ সহিত মিলিত হইয়া) আংশিকরূপে প্রকাশ পাইল, তখনই প্রাণীর উৎপত্তি—তখনই আমরা প্রাণীমধ্যে ইহার (বুদ্ধির) অস্তিত্ব দেখিতে পাই। এই মহত্তত্ত্বের ইংরাজিতে কোন প্রতিশব্দ বা ভাবব্যঞ্জক কথা নাই। Spirit world কিম্বা Soul, Psyche বলা যাইতে পারে।

এই বিষয়ে—সাংখ্যমতের সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মতের কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বলেন, যে ক্রমোন্নতি দ্বারা প্রকৃতির চরম পরিণামেই, বুদ্ধি প্রভৃতির উৎপত্তি ও উন্নতি হয়। যাঁহারা ডার্ব্বিন সাহেবের Origin of Species পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন, কিরূপে তিনি ক্রমোন্নতি দ্বারা মৎস্য হইতে সরীসৃপ তৎপরে স্তন্যপায়ী এবং সর্ব্বশেষে মনুষ্যসৃষ্টি হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন এবং কিরূপে বুদ্ধি বৃত্তির আরম্ভ ও ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইয়াছে, তাহাও বুঝাইয়া দিয়াছেন; সাংখ্য পণ্ডিতগণও বোধ হয় সাধারণ প্রাণীর ক্রমোন্নতির সহিত বুদ্ধি প্রভৃতি বৃত্তির ক্রমবিকাশ বুঝিতেন, নতুবা ভগবান পতঞ্জলি কেন বলিবেন, যে জন্ম ঔষধি মন্ত্র তপ বা সমাধি এই পাঁচ উপায় দ্বারাই সিদ্ধি অথবা প্রকৃতির আপূরণ (Development) হয় এবং সেই প্রকৃতির আপূরণ হইতেই জাত্যন্তর পরিণাম হইয়া থাকে। কিন্তু সাংখ্যকর্ত্তা একথা বলেন না যে বুদ্ধি

প্রভৃতি প্রথমে ছিল না—জীবসৃষ্টির ও উন্নতির সহিত তাহাদের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হইতেছে। বলিয়াছি ত সাংখ্যমতে যাহা ছিল না তাহার সৃষ্টি হইতে পারে না। "নাবস্তুনো বস্তু সিদ্ধিঃ" ।১।৭৮।

• যাহা নাই তাহা হইতে কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় না—অথবা বিনা কারণে কোন কার্য্যেরই উৎপত্তি হয় না—কারণের মধ্যে কার্য্য নিশ্চয়ই নিহিত থাকিবে। সুধু তাহাই নহে—"শক্তস্য শক্তকারণাৎ"। ১। ১১৭। অথবা "Effects pre-exist potentially in their cause"—উপযুক্ত কারণ হইতেই তদুপযুক্ত কার্য্য সম্ভব। সুতরাং তাঁহার মতে এই বুদ্ধি বীজ প্রথমেই সৃষ্টি হইয়া প্রকৃতিতে মিশিয়াছিল। যতদিন তাহার উপযুক্ত বৈষম্য ও পরিণাম হয় নাই, ততদিন তাহার আংশিক প্রকাশ ছিল না। যখন বৈষম্য হইয়া সত্ব, রজঃ ও তমের বিশেষ পরিণাম হইতে লাগিল, তখনই এই বুদ্ধির প্রকাশ আরম্ভ হইল। যতই ক্রমে ক্রমে রজঃ প্রভাবে বুদ্ধি শক্তির আংশিক বিকাশ ও বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাহা হইতে জৈবনিক শক্তির আধিক্য ও জাত্যন্তর পরিণাম হইল। এক কথায় এ বিষয়ে সাংখ্যের মত ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত ঠিক বিপরীত। বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতে বাহ্যিক অবস্থা জন্য—পরমাণুর বিশেষ সংযোগ বিয়োগ জন্য—জীবের উন্নতি ও তাহার শক্তির স্ফূর্ত্তি*—সাংখ্যমতে জীবের আন্তরিক শক্তি বা সত্ত্বগুণ জন্য বুদ্ধি বৃত্তির স্ফূর্ত্তি জন্যই তাহার উন্নতি। তবে সাংখ্যমতের পক্ষে আমরা বলিতে পারি যে, যখন দেখিতেছি, যে পরমাণুর সম্মিলনেই (integration of matter হইতেই) উত্তাপ প্রভৃতি শক্তির আবির্ভাব (evolution) হয়, পূর্ব্বে পরমাণুর মধ্যেই উত্তাপ প্রভৃতি তেজের মূল কারণের অস্তিত্ব না থাকিলে কখন যেমন তাহা হইতে তাহাদের আবির্ভাব হইত না, সেইরূপ প্রকৃতি মধ্যে বুদ্ধি প্রভৃতির বীজ পূর্ব্বে নিহিত না থাকিলে, তাহা হইতে কোনরূপ পরিণামেই প্রাণীগণের বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হইত না। সাংখ্যকার স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে বুদ্ধি পরমাণু সংযোগের সাংসিদ্ধিক বা আগন্তুক অথবা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম নহে,—

"ন ভূত চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ সাংহত্যেপি চ"। ৫।১২৯।

---

* পরমাণুবাদী পণ্ডিতদিগের মতে "Life proceeds from substance and energy, and yet not identical with either."

অর্থাৎ চৈতন্য (প্রকৃতিতে সংক্রামিত পুরুষের ধর্ম্ম ?) কোন ভূতে (elements এ) অথবা তাহাদের সংযোগ (combination) হইতে উৎপন্ন হয় না।

সুতরাং সাংখ্যমতে পূর্ব্বে বীজ না থাকিলে বুদ্ধি প্রভৃতির আবির্ভাব হইত না।

যাহা হউক এই মহত্তত্ত্ব—বা সমষ্টি-বুদ্ধি-বীজই, সাংখ্যমতে জন্য ঈশ্বর। পূর্ব্বে বলিয়াছি মহত্তত্ত্বই সমস্ত জগতময় ব্যাপিয়া আছে—এবং ইহার অতি সামান্য অংশ হইতেই আমাদের বুদ্ধি বৃত্তির উৎপত্তি হইয়াছে। এই জন্য আমাদের ব্যষ্টি (individual) বুদ্ধি ও মন এই সমষ্টিবুদ্ধি মহত্তত্ত্বের অধীন। ইহাই সমস্ত জাগতিক কার্য্যের আদি কারণ (First cause) কপিল বলেন,—

"মহদাখ্য মাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ।"

এই মহত্তত্ত্বই কার্য্যের আদি কারণ, ইহাই মন; অথবা ইহা হইতেই আমাদের মনের উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি এইরূপ জন্য ঈশ্বর বা জগতের আদি কর্ত্তা সাংখ্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করিতেন। তিনি এইরূপ ঈশ্বরই সর্ব্বপ্রমাণ সঙ্গত বিবেচনা করিতেন। তিনি বলিয়াছেন "ঈদৃশেশ্বর-সিদ্ধিঃ সিদ্ধা।"* পরববর্ত্তী আর্য্য পণ্ডিতগণও এই মহত্ত্বকেই ঈশ্বর বলিয়াছেন। অনুগীতায় আছে,

"মহানা মতির্বিষ্ণুর্জ্জিষ্ণুঃ শম্ভুশ্চ বীর্য্যবান।
বুদ্ধি প্রজ্ঞোপলব্ধিশ্চ তথা ব্রহ্মা ধৃতিঃ স্মৃতিঃ।
পর্য্যায়াবাচকৈরেভৈর্ম্মহানাত্মা নিপদ্যতে।"

* সাংখ্যকার ঠিক এরূপ কথা বলেন নাই। তিনি বলেন, যে পুরুষ নির্গুণ, এজন্য দেশ কাল গুণযুক্ত নহেন—অর্থাৎ তাঁহার ব্যাপ্তি প্রভৃতি আমরা বুঝিতে পারি না। তবে প্রকৃতির সান্নিধ্য জন্য—এবং সৃষ্টি অবস্থায় প্রকৃতির বহু পরিণাম থাকায়—পুরুষও তাহার সান্নিধ্যে বহুরূপ হইয়াছেন। ব্যাবৃত্তো ভুয়রূপঃ। ১। ২৬১। কারণ পুরুষ "সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাক্ষিবৎ" বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতির সহিত জড়িত এবং স্ফটিকবৎ তাহার দ্বারা রঞ্জিত। সুতরাং যখন পুরুষ প্রলয় কালে মূল প্রকৃতিতে লীন হয়—তখনও তাহার প্রকৃতির সহিত সংস্রব ঘুচে না। "ন কারণ লয়াৎ কৃত কৃত্যতা মগ্নবদুত্থানং"। ৩। ৫৪। সুতরাং ইহা হইতেই আবার সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চারিত হয় এবং সেই জন্যই পুনর্ব্বার সৃষ্টি হইতে থাকে। এই প্রকৃতিতে লীন পুরুষের অংশই প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর—ইনি

অর্থাৎ যিনি মহত্তত্ত্ব—তিনিই আত্মা (?) মহান্, মতি, বিষ্ণু, জিষ্ণু, শম্ভু, বীর্য্যবান্, প্রজ্ঞা, উপলব্ধি, ব্রহ্মা, স্মৃতি, ধৃতি প্রভৃতি শব্দ পর্য্যায়ক্রমে এই মহত্তত্ত্ব বাচক মাত্র।

বিজ্ঞানভিক্ষুও বলিয়াছেন,—

"মনো মহান্ মতির্ব্রহ্মা পূর্ব্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ।"

অতএব যাহা মহত্ত্ব তাহাই ব্রহ্মা, তাহাই হিরণ্যগর্ভ, তাহাই কার্য্য ঈশ্বর। ইহার দ্বারাই আমাদের সমস্ত বুদ্ধি বা সমস্ত কার্য্য নিয়মিত ও পরিচালিত হইতেছে।

অতএব দেখা গেল সাংখ্য মতে ঈশ্বর যিনি, তিনিও নিষ্ক্রিয় পুরুষের সান্নিধ্যবশত সৃষ্টির প্রথমে প্রকৃতি হইতে সত্ত্বাধিক্যে উৎপন্ন হইয়াছেন। এই সক্রিয় (জন্য) ঈশ্বর সাংখ্যের পুরুষ বা বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।* কপিল মুনির কি আশ্চর্য্য সাহস! তিনি জগৎ সৃষ্টি করিতে গিয়া ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন!! সেশ্বর সাংখ্য পণ্ডিত ভগবান্ পতঞ্জলি কিন্তু এতদূর যাইতে সাহস করেন নাই, তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে এই মাত্র বলিয়াছেন, যে

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।"

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, যে সাংখ্যমতে প্রলয়ের অবস্থায় যে তমোগুণ মাত্র সর্ব্বত্র বিদ্যমান ছিল, অথবা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যাহাকে পরমাণু

নিত্য নহেন, জন্য—এবং এইরূপ ঈশ্বরই সাংখ্যমতে সর্ব্বপ্রমাণ সিদ্ধ। "স হি সর্ব্ববিদ্ সর্ব্বকর্ত্তা"। ৩। ৫৬। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পুরুষের যে শক্তি প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হয়—তাহাকেই প্রকৃতিতে লীন পুরুষের অংশ বলা যাইতে পারে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি ইহাই মহত্তত্ত্ব। সাংখ্য ভাষ্যকারগণ এবং পরবর্ত্তী আর্য্য পণ্ডিতগণ এইরূপ বুঝিয়াছেন।

* বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন,

"অত্র শাস্ত্রে কারণ ব্রহ্ম তু পুরুষ সামান্যং নির্গুণমেবেষ্যতে।' ঈশ্বরানভ্যুপগমাৎ। তত্র চ কারণশব্দঃ স্বশক্তি প্রকৃত্যুপাধিকো বা নিমিত্ত কারণতাপরো বা পুরুষার্থস্য প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকত্বাদিতি মন্তব্যম্॥

সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য।

অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্রে কারণ ব্রহ্মকেই নির্গুণ পুরুষ সামান্য বলা হইয়াছে ঈশ্বর প্রমাণ সিদ্ধ নহে। এস্থলে কারণের অর্থ এই বুঝিতে হইবে, যে ইহারই শক্তি প্রকৃতিতে উপস্থিত হইয়াছে। ইহারই জন্য প্রকৃতি সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ এবং ইহারই জন্য প্রকৃতি জগতের প্রবর্ত্তক হইয়াছে।

স্তূপ মাত্র (integrated mass of matter at the absolute zero temperature) বলেন, তাহা বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে শ্রেষ্ঠতম পুরুষের সংক্রামিত শক্তি (higher potential) আহিত হওয়ায় তাহা হইতে প্রথমে রজঃ পরে সত্ত্ব গুণের উৎপত্তি হইয়া ক্রমে সঞ্চরিত পুরুষ শক্তি বলে তাহাদের সাম্যাবস্থার সত্ত্ব পরিণামে মহত্তত্ত্ব বৃদ্ধি হইলে সমুদয় তম অন্তর্হিত (disintegration) হইয়া গেল।

"জগতের অঙ্কুর স্বরূপ সেই মহত্তত্ত্ব আপনাতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত বিশ্বকে প্রকটীকৃত করিয়া যে ভীষণ তম প্রলয় কালে তাহার আপনাকে প্রকৃতিকে বিলীন করিয়া রাখিয়াছিল, সেই তমঃ পান করিল।" শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ। ২৬ অধ্যায়। এইরূপে সৃষ্টি বীজ-মহত্তত্ত্ব মধ্যে সমস্ত বিলীন হইয়া ক্রমে তাহা হইতেই সৃষ্টি আরম্ভ হইল।* অতএব মহত্তত্ত্বই সৃষ্টির মূল কারণ। প্রকৃতি এই মহত্তত্ত্ব হইতেই সৃষ্টির শক্তি প্রাপ্ত হয়। নতুবা প্রকৃতির স্বতঃ প্রবৃত্তি সম্ভব নহে। সাংখ্যকার বলিয়াছেন,—

"আদ্যহেতুতা তদ্দ্বারা পারম্পর্য্যেপ্যণুবৎ। ১।৭৪

অর্থাৎ এই মহত্তত্ত্ব দ্বারাই প্রকৃতি পরমাণুর মত সৃষ্টি শক্তি প্রাপ্ত হয়। আবার মহত্তত্ত্ব পুরুষ হইতে শক্তি প্রাপ্ত হয় বলিয়াই ইহা প্রকৃতিতে সৃষ্টি শক্তি সংক্রামিত করিতে পারে। সাংখ্যমতে,

"অন্তঃকরণস্য (মহতঃ) তদুজ্জ্বলিতত্বাল্লোহবদধিষ্ঠাতৃত্বং। ১।৯৯

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সান্নিধ্যজন্য লৌহ যেরূপ চুম্বক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় সেইরূপ মহত্তত্ত্ব পুরুষের নিকট প্রাপ্ত শক্তি হইতেই সৃষ্টির শক্তি প্রাপ্ত হয়। বাস্তবিক এই মহত্তত্ত্ব আর কিছুই নহে—প্রকৃতিতে আহিত (সত্ত্বগুণযুক্ত) পুরুষের শক্তি মাত্র।

৯৩। প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম—অহঙ্কারতত্ত্ব।

এই মহত্তত্ত্ব সৃষ্টির আদি কারণ হইলেও প্রকৃতপক্ষে যতক্ষণ ইহার বিকার না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয় না। কারণ বলিয়াছি, যত দিন এই সত্ত্ব শক্তি একভাবেই থাকে, (অথবা বিজ্ঞানের কথায় যতক্ষণ higher potential অবস্থায় থাকে) ততক্ষণ কোন কার্য্য হইতে পারে না। যে শক্তি দ্বারা—বা যে উপায় দ্বারা তাহার পরিণাম হয়—বা উচ্চতর

* পূর্ব্বে বিজ্ঞান মতে সৃষ্টি প্রক্রিয়া দেখাইবার সময় এ কথা কতদূর সত্য, তাহা দেখান হইয়াছে।

শক্তি, নিম্নতর শক্তিতে—অথবা সত্ত্ব শক্তি তমঃ শক্তিতে পরিণত হইতে পারে—তাহাই প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টির কারণ।

এই জন্যই সাংখ্যকার এই মহত্তত্ত্বকে, অথবা শুদ্ধ সত্ত্ব শক্তিকে কেবল পালনী শক্তি বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—

মহতো হন্যৎ। ৬। ৬৬

অর্থাৎ সৃষ্টি ব্যতীত সমুদায়ই মহত্তত্ত্বের উপর নির্ভর করে। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন,—

"সৃষ্ট্যাদের্যদন্যৎ পালনাদিকং তন্মহত্তত্ত্বাদ্ভবতি।
অনেন চ সূত্রেণ মহত্তত্ত্বোপাধিকং বিষ্ণোঃ পালকত্বমুপপাদিকং।
মহত্তত্ত্বোপাধিকত্বাৎ তু বিষ্ণুর্মহান্ পরমেশ্বরো ব্রহ্মেতি চ গীয়তে।"

অর্থাৎ সৃষ্টি ব্যতীত পালনাদি সমুদায়ই মহত্তত্ত্ব হইতে হইয়া থাকে। এইজন্য মহত্তত্ত্বকে পালক বিষ্ণু পরমেশ্বর বা ব্রহ্মা প্রভৃতি বলা হয়।*

অতএব যদি প্রকৃতপক্ষে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টির কর্ত্তা না হইল, তবে সৃষ্টি কার্য্যের কর্ত্তা কে? সংখ্যকার বলেন, এই মহত্তত্ত্ব হইতে যে অহঙ্কার তত্ত্বের উৎপত্তি হয়, (মহতোঽহঙ্কারঃ ১।৬১) তাহাই সৃষ্টির মূল কারণ। যেহেতু

"অহঙ্কার কর্ত্তাধীনা কার্য্য সিদ্ধিঃ।" ৬।৬৪,

বিজ্ঞান ভিক্ষু ব্যাখ্যায় বলেন, অহঙ্কার রূপ যে কর্ত্তা তাঁহারই অধীনে সৃষ্টি ও সংহার রূপ কার্য্য নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

এই অহংতত্ত্ব কি? যাঁহারা বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি প্রণালী বুঝিয়াছেন, তাঁহারা একথা সহজে বুঝিতে পারিবেন। যখন উচ্চতর শক্তি (higher potential) নিম্নতর শক্তিতে (lower potential) পরিণত (transformed) হয়—তখনই রজঃশক্তি বা ক্রিয়া শক্তির (Kinetic Energy) উদ্ভব হয়—তখনই কার্য্য (work) হয়। সৃষ্টিসম্বন্ধেও এই নিয়ম। যখন উচ্চতর সত্ত্বশক্তি,

* কারণ পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে উচ্চতর শক্তি না থাকিলে সৃষ্টি কার্য্য থাকিতে পারে না—উচ্চতর সত্ত্বভাব না থাকিলে, জাগতিক কার্য্য সমুদায়ই ধ্বংশ হইয়া যায়—প্রলয়ের দিকে জগতের গতি হয়। এই সত্ত্ব শক্তিই জগত রক্ষা করে, পালন করে। এই জন্যই বোধ হয়, যখন জগতের সত্ত্বশক্তি অল্প হইয়া আইসে—অথবা যখন ধর্ম্মের (সত্ত্বের) গ্লানি হয় "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি" তখন সৎস্বরূপ মহত্তত্ত্বের (বা বিষ্ণুর) অংশ জগতে আবির্ভাব হইয়া সত্ত্ব শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেন, প্রলয় বা ধ্বংশ হইতে জগতকে রক্ষা করেন। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের অবতার বাদ।

রজঃশক্তি উদ্ভব করিতে করিতে তমঃশক্তিতে পরিণত হইতে থাকে, তখনই সৃষ্টি হয়—তখনই ক্রমে ক্রমে এই পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি হয়। সুতরাং জগতের সৃষ্টির অবস্থা আর কিছুই নহে, কেবল যে উচ্চতর সত্ত্বশক্তি বা মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে নিম্নতর তমঃশক্তিতে পরিণত হইবার অবস্থা মাত্র। এই পরিণামের অবস্থার, এই কার্য্যের অবস্থার মূল কারণ—বিজ্ঞান মতে শক্তির ন্যূনাধিক ভাব (difference of potential)—আর সাংখ্য মতে অহঙ্কার।—অথবা সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ মধ্যে প্রভেদ ভাব।

বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন,—

"অতো (বৃত্ত্যোঃ) রপি কার্য্যকারণভাব উন্নীয়ত ইতি।"

এই শক্তি হইতেই কার্য্য কারণ ভাব উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয়, অনুমান করা যায়।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইলে, তাহার সহিত সমস্ত তমঃ মিলিয়া এক হইয়াছিল। তাহার পর সৃষ্টি সময়ে, বিভিন্ন বা বৈষম্য হইতে আরম্ভ হইয়া তমঃ এক দিকে ও সত্ত্ব একদিকে, অথবা সত্ত্ব তমঃ হইতে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন হইতেছিল। কিম্বা তমঃ মহত্তত্ত্ব দ্বারা উচ্চতর শক্তিতে পরিণত হওয়ায় তাহার যে অস্বাভাবিক (?) অবস্থা (State of tension) হইয়াছিল, তাহাই দূর হইতে আরম্ভ হইল। এই বৈষম্য এই বিভিন্ন ভাব হইতেই কার্য্য কারণের উৎপত্তি।

বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন,—

"অন্তঃকরণমেকমেব বীজাঙ্কুর মহাবৃক্ষাদিবদবস্থাত্রয়মাত্রভেদাৎ কার্য্য কারণ ভাবমাপদ্যত।"

অথবা মহত্তত্ত্ব এক হইলেও, বীজ, অঙ্কুর ও বৃক্ষবৎ তিনটি অবস্থা বিভিন্ন হওয়াতেই অবিশেষ ভাব হইতে বিশেষ হইতে আরম্ভ হওয়াতেই—কার্য্যকারণ ভাব উপস্থিত হইল। অতএব যে তত্ত্ব হইতে অথবা মহত্তত্ত্বের যে ভাব হইতে এই প্রভেদ হয়, যাহা হইতে এই "অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভ," হয়—তাহাকেই অহঙ্কার তত্ত্ব বলে। হর্বট্ স্পেন্সর যাহাকে Law of differentiation বলিয়াছেন, অথবা যে শক্তি বা ক্রিয়া (?) দ্বারা এরূপ differentiation হইয়া থাকে, তাহাকেই অহংতত্ত্ব বলা যায়। *

---

* সাংখ্যকার সমষ্টি সৃষ্টি প্রক্রিয়া ব্যষ্টি বা বিশেষ সৃষ্টি (বিশেষত আমাদের নিজের মনের সৃষ্টি ও গতি) হইতে অনুমান (Induction) দ্বারা

১৪। অহংতত্ত্ব হইতে সৃষ্টি প্রণালী।

তৎপরে মূল প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন শক্তিজন্য মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার শক্তির দ্বারা তিন ভাগে পরিণত হইল। স্যাংখ্যমতে মহত্তত্ত্ব প্রকৃত শুদ্ধ সত্ত্ব সম্ভূত হইলেও রজ ও তম প্রভাবে তাহার বৈষম্য বা বিকার হইতে পারে—অথবা তাহার রজ পরিণাম ও তমঃ পরিণাম হইতে পারে। কারণ,—

"মহদুপরাগাদ্বিপরীতং।" ২।১৫

অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারা বিপরীত বা বিভিন্ন হইয়া থাকে। বিজ্ঞান ভিক্ষুও ভাষ্যে শ্রুতি প্রমাণে দেখাইয়াছেন —

"সাত্ত্বিক রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্।"

অর্থাৎ মহান্ তিন অংশে বিভক্ত হয়ঃ—সাত্ত্বিক মহত্তত্ত্ব, রাজসিক মহত্তত্ত্ব, ও তামসিক মহত্তত্ত্ব।

পরবর্ত্তী পুরাণ কর্ত্তাগণ এই তিন অংশের নামকরণ করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যসারে বলিয়াছেন,—

"অত্র সত্ত্বাদ্যংশত্রয়েন মহতো দেবতোত্রয়োপাধিত্বাৎ তদাতিরেকেন ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবত্ববচনং। * * আদৌ বিষ্ণুরূপেনৈব মহানাবির্ভবতি।"

অর্থাৎ যিনি মহান্ তিনি সত্ত্বাদি গুণত্রয় আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই উপাধিত্রয় স্বীকার করিয়াছেন। তবে প্রথমে বিষ্ণুরূপে মহান্ আবির্ভূত হন, পরে তাঁহা হইতে ব্রহ্মা ও শঙ্করের উৎপত্তি হয়। অতএব

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মনুষ্যের অহংজ্ঞান ও ইচ্ছা মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। কক্স সাহেব বলিয়াছেন,—

What is this WILL? Is it not the expression of OURRSELVES? Is it not that which gives us the sense of *individuality* of *personality* of that *oneness* which * * is termed the EGO?

Mechanism of Man. p.389

এই will বা ঈপ্সা কি? বেন সাহেব বলিয়াছেন, 'The Primitive elements of the *will* have been stated to be the *Spontaneity of movement* and Self-*Conservation.* কক্স সাহেব বলেন It is the expression of the conscious-self and the force it works with is the *Psychic* force." অতএব যেমন এই ইচ্ছাবৃত্তি দ্বারা মানুষের মনে স্বতঃক্রিয়া উপস্থিত হইয়া বৈষম্য ঘটায়, সেই রূপ এই সমষ্টি সৃষ্টি সময়েও মহত্তত্ত্ব হইতে অহংকার উদয় হইয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ পরস্পর পৃথক হইয়া যায়।

দেখাগেল, যাহা সাত্ত্বিক মহত্তত্ত্ব, তাহাই পালনী শক্তি; ইহা হইতেই (এই higher potential হইতেই) জগত রক্ষা হয়। রাজসিক মহত্তত্ত্বই সৃষ্টি পরিবর্ত্তনী শক্তি; ইনিই ব্রহ্মা। আর যিনি জগৎ সংহার করেন, জগৎকে তমো রাশিতে পরিণত করেন, তিনিই তামসিক মহত্তত্ত্ব—তিনিই শিব।

সে যাহা হউক পুরাণের কল্পনা এস্থলে উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব দ্বারা ত্রিগুণ অনুসারে ত্রিধা বিভক্ত হইলে, তাহাদের তিন বৈষম্য ভাব, বা বিভিন্ন অবস্থা এই:—(১) বৈকারিক বা সাত্ত্বিক অহং (২) তৈজস বা রাজসিক অহং, আর (৩) তামস্ অহং।

" বৈকারিকাস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা।"

ইহাদিগেরই নামান্তর সাত্ত্বিক মহত্তত্ত্ব, রাজসিক মহত্তত্ত্ব, আর তামসিক মহত্তত্ত্ব। এই রূপে মহত্তত্ত্বের অহং পরিণাম (বা differentiation) হইতে প্রথমে যে তমঃ সহ মিলিত হইয়া মহত্তত্ত্ব অবস্থিত ছিল, তাহা বিভিন্ন হইয়া, শুদ্ধ সত্ত্ব মহত্তত্ত্ব একদিকে হইল, আর মহত্তত্ত্বের কতকাংশ তমের সহিত একত্র মিলিয়া তাহার তমোধিকার হইল এবং এই তমোধিকারের সহিত তাহার কতকাংশের রজোধিকার হইয়া গেল।

মহত্তত্ত্বের এই শুদ্ধ সত্ত্বাংশই মন। কারণ বলিয়াছি ত "মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ।" অহংতত্ত্ব হইতে ইহাই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পরিণাম। ইহাকে ইংরাজীতে sprit, mind, psyche (?) প্রভৃতি বলা যাইতে পারে। সংখ্যকার বলেন।

" সাত্ত্বিক মেকাদশকং প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহংকারাৎ। ২। ১৮

অর্থাৎ বৈকারিক অহঙ্কার হইতে সাত্ত্বিক মন (যাহাকে একাদশেন্দ্রিয় বলে) তাহাই উৎপত্তি হইল। আর মহত্তত্ত্বের যে অংশ তমঃ সহ মিশ্রিত হইয়া তমোবিকার হইল অথবা যে অংশ তমরূপে পরিণত হইল—সেই তামস অহংকার হইতে ক্রমে ক্রমে তমো বৃদ্ধি (বা concentration) হইয়া একে একে পঞ্চতন্মাত্রে সৃষ্টি হইল।

বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—

"বৈকৃতাৎ সাত্ত্বিকাহঙ্কারাজ্জায়তে মনঃ অতশ্চ রাজসাহংকারাদ্দশেন্দ্রিয়ানি, তামসাহঙ্কারাচ্চ তন্মাত্রানীত্যাপি গন্তব্যং।"

এই পঞ্চতন্মাত্রকে সূক্ষ্ম ভূত ও পরমাণুও বলা হয়। এই তন্মাত্র বা পরমাণু সৃষ্টির বিষয় আমরা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

আর এই সাত্ত্বিক মহত্তত্ত্বের তামসিক বিকার হইয়া যে তন্মাত্র সৃষ্টি হইল, তাহাতে সেই সময়ে রজঃ শক্তি উদ্ভূত হইয়া যে রাজসিক মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয় তাহাই ইন্দ্রিয় উৎপত্তির কারণ। সত্ত্ব প্রধান মন এবং তমঃপ্রধান তন্মাত্র মধ্যে পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে পঞ্চতন্মাত্র গ্রাহী ইন্দ্রিয় গুলির সৃষ্টি হইল।† এই ইন্দ্রিয় শক্তি জ্ঞান ও কর্ম্মভেদে দুই প্রকার। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় কেহ কেহ বলেন প্রাণের (vitalitya) ক্রিয়াশক্তি আবশ্যক বলিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়—আর বুদ্ধির বিকাশের জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়। সে যাহা হউক মনের এই রজো বিকৃত ও ইন্দ্রিয় প্রকাশক শক্তি হইতেই পাঞ্চভৌতিক জগতের সহিত আমাদের সম্পর্ক থাকে। অথবা যখন বাহ্য জগতের সহিত মনের সম্পর্ক থাকে, তখন মন, ইন্দ্রিয় বৃত্তি গুলির সহিত একীভূত হইয়া যায়; সাংখ্যকার বলেন "উভয়াত্মকং মনঃ"।২। ২৬। সকল অবস্থাতেই মন ইন্দ্রিয় বৃত্তি গুলির সহিত ঐকীভূত থাকে, তবে যোগে বা ধ্যানের দ্বারা মনকে কেবল, ইন্দ্রিয়গুলি হইতে পৃথক করিতে পারা যায়। কারণ "ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ।" আমরা সৃষ্টি ও ত্রিগুণ সম্বন্ধে অন্য কথা পরে বুঝাইব।

---

† বোধ হয় সামান্যতম জৈবনিক শক্তি (organisation) (এমন কি—organic compound গুলির সংমিলনী শক্তিও) এই রাজসিক ইন্দ্রিয় শক্তির নিম্নতম (lowest) বিকাশ মাত্র। ইহাকেই বোধ হয় জীবনী শক্তি (বা vital force) বলা যাইতে পারে। ইংরাজীতে যাহাকে Nerve force বলে তাহা ইহা হইতেই উৎপন্ন হয়। এই nerve force দুই প্রকার, sensuary nerves এবং motor nerves। বোধ হয় এই sensuary nerve force হইতেই জ্ঞানেন্দ্রিয় আর motor nerve force হইতেই কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণীদিগের সম্বন্ধে এই নিয়ম। এই ব্যষ্টি ইন্দ্রিয়তত্ত্ব হইতে সাংখ্যকার সমষ্টি ইন্দ্রিয় তত্ত্ব স্থির করিয়াছেন। অতএব ইন্দ্রিয় শক্তি বলিলে যেন কেহ আমাদের কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়কে না বুঝেন। এস্থলে ইন্দ্রিয় অর্থে সংসারের সমস্ত ইন্দ্রিয় সৃষ্টিকারী শক্তির সমষ্টি বুঝাইতেছে। সেই জন্য গোলযোগ হইতে পারে আশঙ্কা করিয়াই, বোধ হয় এক এক ইন্দ্রিয় শক্তিকে এক এক দেবতা বলা হইয়াছে—এক একটি সমষ্টি ইন্দ্রিয় শক্তিকে এক একটি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বলা হইয়াছে। "একাদশেন্দ্রিয় দেবাশ্চ, দিগ্বাতার্ক প্রচেতোশ্বি-বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্র মিত্রকা—চন্দ্রশ্চ ইতি।" বিজ্ঞানভিক্ষু ভাষ্যে বলিয়াছেন "সমষ্টি চক্ষুরাদি শরীরিণঃ * * চক্ষুরাদি দেবতা শ্রূয়তে। অতশ্চ ব্যষ্টি করণানাং সমষ্টি করণানি দেবতেত্যেব পর্য্যবস্যতি।"

ভক্তি।

ঈশ্বরে ভক্তি।

দ্বিতীয় কথা—শাণ্ডিল্য।

শিষ্য। এক্ষণে শাণ্ডিল্য সূত্রের মর্ম্মার্থ শুনিবার ইচ্ছা রাখি।

গুরু। প্রথমে তোমাকে আমার বলা কর্ত্তব্য যে, দুই জন শাণ্ডিল্য ছিলেন, বোধ হয়। একজন ভক্তি-ধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক; আর একজন শাণ্ডিল্য-সূত্রের প্রণেতা। প্রথমোক্ত শাণ্ডিল্য প্রাচীন ঋষি, ছান্দোগ্য উপনিষদে তাঁহার নাম আছে। দ্বিতীয় শাণ্ডিল্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক পণ্ডিত। ভক্তিসূত্রের ৩১ সূত্রে প্রাচীন শাণ্ডিল্যের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে।

শিষ্য। অথবা এমন হইতে পারে যে, আধুনিক সূত্রকার প্রাচীন ঋষির নামে আপনার গ্রন্থখানি চালাইয়াছেন। যাই হোক, যদি সূত্রকার শাণ্ডিল্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক পণ্ডিত হয়েন, তবে তাঁহার মত শেষে শুনিলেও হয়, না শুনিলেও হয়। এক্ষণে প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্যের মতই ব্যাখ্যা করুন।

গুরু। দুর্ভাগ্য ক্রমে সেই প্রাচীন ঋষি-প্রণীত কোন গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই। বেদান্ত সূত্রের শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে সূত্রবিশেষের ভাষ্যের ভাবার্থ হইতে কোলব্রুক সাহেব এইরূপ অনুমান করেন, যে পঞ্চরাত্রের প্রণেতা এই প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্য। তাহা হইতেও পারে, না হইতেও পারে; পঞ্চরাত্রে ভাগবত ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই রূপ সামান্য মূলের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করা যায় না যে, শাণ্ডিল্যই পঞ্চরাত্রের প্রণেতা। ফলে প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্য যে,ভক্তি ধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক, তাহা বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে। কথিত ভাষ্যে জ্ঞানবাদী শঙ্কর, ভক্তিবাদী শাণ্ডিল্যের নিন্দা করিয়া বলিতেছেন,—

"বেদবিপ্রতিষেধশ্চ ভবতি। চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োহলব্ধ্বা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রমধিগতবান্ ইত্যাদি বেদনিন্দা দর্শনাৎ। তস্মাদসঙ্গতা এষা কল্পনা ইতি সিদ্ধং।"

অর্থাৎ। "ইহাতে বেদের বিপ্রতিষেধ হইতেছে। চতুর্ব্বেদে পরং শ্রেয়ঃ লাভ না করিয়া, শাণ্ডিল্য এই শাস্ত্র অধিগমন করিয়া ছিলেন। এই সকল বেদনিন্দা দর্শন করায় সিদ্ধ হইতেছে, যে এ সকল কল্পনা অসঙ্গত।"

শিষ্য। কিন্তু এই প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্য ভক্তিবাদে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার কিছু উপায় আছে কি?

গুরু। কিছু আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের চতুর্দ্দশ অধ্যায় হইতে একটু পড়িতেছি, শ্রবণ কর।

"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্বৈব্রহ্মৈমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভাবিতস্মীতি যস্যসাদদ্ধা নাবিচিকিৎসাঽস্তীতিঽস্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ।"

অর্থাৎ, "সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, এই জগতে পরিব্যাপ্ত বাক্য বিহীন, এবং আপ্তকাম হেতু আদরের অপেক্ষা করেন না এই আমার আত্মা হৃদয়ের মধ্যে, ইনিই ব্রহ্ম। এই লোক হইতে অবসৃত হইয়া, ইহাঁকেই সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। যাঁহার ইহাতে শ্রদ্ধা থাকে, তাঁহার ইহাতে সংশয় থাকেনা। ইহা শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন। *"

একথা বড় অধিক দূর গেল না। এসকল কথা উপনিষদের জ্ঞানবাদীরাও বলিয়া থাকেন। তবে "হৃদয়ের মধ্যে" কথাটা নূতন কথা,—ভক্তির কথা বটে। "শ্রদ্ধা" কথা ভক্তি বাচক নহে বটে, তবে শ্রদ্ধা থাকিলে, সংশয় থাকে না, এ সকল ভক্তির কথা বটে। কিন্তু আসল কথাটা বেদান্তসারে পাওয়া যায়। বেদান্তসার কর্ত্তা সদানন্দাচার্য্য উপাসনা শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

"উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়কমানসব্যাপাররূপাণি শাণ্ডিল্যবিদ্যাদীনি।"

এখন একটু অনুধাবন করিয়া বুঝ। হিন্দু ধর্ম্মে ঈশ্বরের দ্বিবিধ কল্পনা আছে—অথবা ঈশ্বরকে হিন্দুরা দুই রকমে বুঝিয়া থাকে। ঈশ্বর নির্গুণ, এবং ঈশ্বর সগুণ। তোমাদের ইংরেজিতে যাহাকে "Absolute" বা "Unconditioned" বলে, তাহাই নির্গুণ। যিনি নির্গুণ তাঁহার কোন উপাসনা হইতে পারেনা। যিনি নির্গুণ, তাঁহার কোন গুণানুবাদ করা যাইতে পারে না। যিনি নির্গুণ, যাঁহার কোন "Conditions of Existence" নাই বা বলা যাইতে পারেনা—তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব? কি বলিয়া তাঁহার চিন্তা করিব? অতএব কেবল সগুণ ঈশ্বরেরই উপাসনা হইতে পারে। নির্গুণবাদে উপাসনা নাই। সগুণ বা ভক্তিবাদী অর্থাৎ শাণ্ডিল্যাদিই উপাসনা করিতে পারেন। অতএব বেদান্তসারের এই কথা হইতে দুইটি

* তত্ত্ববোধিনী। জ্যৈষ্ঠ ১৮০৭।২৫ পৃ।

বিষয় সিদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রথম সগুণ বাদের প্রথম প্রবর্ত্তক শাণ্ডিল্য। ও উপাসনারও প্রথম প্রবর্ত্তক শাণ্ডিল্য। আর ভক্তি সগুণ বাদেরই অনুসারিণী।

শিষ্য। তবে কি উপনিষদ্ সমুদয় নির্গুণ-বাদী?

গুরু। ঈশ্বরবাদীর মধ্যে কেহ প্রকৃত নির্গুণবাদী আছে কি না, সন্দেহ। যে প্রকৃত নির্গুণ বাদী, তাহাকে নাস্তিক বলিলেও হয়। নাস্তিক বা Agnostic ভিন্ন যথার্থ নির্গুণবাদী কেহই নাই। তবে, জ্ঞানবাদীরা মায়া নামে ঈশ্বরের একটি শক্তি কল্পনা করেন। সেই মায়াই এই জগৎ সৃষ্টির কারণ। সেই মায়ার জন্যই আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি না। মায়া হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং ব্রহ্মে লীন হইতে পারা যায়। অতএব ঈশ্বর তাঁহাদের কাছে কেবল জ্ঞেয়। এই জ্ঞান ঠিক "জানা" নহে। সাধন ভিন্ন সেই জ্ঞান জন্মিতে পারে না। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধা, এই ছয় সাধনা। ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণ, মনন, ও নিধিধ্যাসনা ব্যতিরেকে অন্য বিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহই শম। তাহা হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ দম। তদতিরিক্ত বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন, অথবা বিধিপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগই উপরতি। শীতোষ্ণাদি সহন, তিতিক্ষা। মনের একাগ্রতা সমাধান। গুরু বাক্যাদিতে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। সর্ব্বত্র এইরূপ সাধন কথিত হইয়াছে, এমত নহে। কিন্তু ধ্যান ধারণা তপস্যাদি প্রায়ই জ্ঞানবাদীর পক্ষে বিহিত। অতএব জ্ঞানবাদীরও উপাসনা আছে। কিন্তু সেই উপাসনা মানসিক, আন্তরিক নহে। উহা Discipline মাত্র, উপাসনা নহে। যথার্থ উপাসনা ভক্তি-প্রসূত। ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্ব তোমাকে বুঝাইতে হইবে, সেই সময়ে একথা আর একটু স্পষ্ট হইবে।

তৃতীয় কথা।

ভগবদ্গীতা। স্থূল উদ্দেশ্য।

শিষ্য। এক্ষণে গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্বের কথা শুনিবার বাসনা করি।

গুরু। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। কিন্তু, প্রকৃত ভক্তির ব্যাখ্যা দ্বাদশ অধ্যায়ে অতি অল্পই আছে। দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত সকল

অধ্যায় গুলির পর্য্যালোচনা না করিলে,গীতোক্ত প্রকৃত ভক্তিতত্ত্ব বুঝা যায় না। যদি গীতার ভক্তিতত্ত্ব বুঝিতে চাও, তাহা হইলে এই এগার অধ্যায়ের কথা কিছু বুঝিতে হইবে। এই এগার অধ্যায়ে জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভক্তি, তিনেরই কথা আছে। তিনেরই প্রশংসা আছে। যাহা আর কোথাও নাই, তাহাও ইহাতে আছে। জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য আছে। এই সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই ইহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেই সামঞ্জস্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, এই তিনের চরমাবস্থা যাহা, তাহা ভক্তি। এই জন্য গীতা প্রকৃত পক্ষে ভক্তি-শাস্ত্র।

শিষ্য। কথা গুলা একটু অসঙ্গত লাগিতেছে। আত্মীয় অন্তরঙ্গ বধ করিয়া রাজ্য লাভ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অর্জ্জুন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে ছিলেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রবৃত্তি দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। ইহাই গীতার বিষয়। অতএব ইহাকে ঘাতক-শাস্ত্র বলাই বিধেয়; উহাকে ভক্তিশাস্ত্র বলিব কি জন্য?

গুরু। অনেকের অভ্যাস আছে যে,তাঁহারা গ্রন্থের এক খানা পাতা পড়িয়া মনে করেন, আমরা এ গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। যাঁহারা এই শ্রেণীর পণ্ডিত, তাঁহারাই ভগবদ্গীতাকে ঘাতক-শাস্ত্র বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। স্থূল কথা এই যে,অর্জ্জুনকেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত করা, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সে কথা এখন থাক। তোমাকে আগে জিজ্ঞাসা করি, যে যুদ্ধ মাত্রই কি পাপ?

শিষ্য। যাহাতে অসংখ্য মনুষ্য বধ করিতে হয়, তাহা অপেক্ষা মহাপাপ আর কি আছে?

গুরু। ঠিক এই কথাই, মহা বলবান্ হিন্দুজাতির অধঃপতনের মূল-কারণ। সে কথা আমি সপ্রমাণ করিতে পারি, কিন্তু সে তত্ত্ব এখন তুলিয়া কাজ নাই। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ওলন্দাজ উইলিয়ম্ দি সাইলেণ্ট যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই যুদ্ধের অপেক্ষা গুরুতর পুণ্যকর্ম্ম পৃথিবীতে আর কে কবে করিয়াছে?

শিষ্য। সহজে মনে হয় না।

গুরু। যদি তাই হয় তবে অনেক সময়, যুদ্ধও পুণ্য কর্ম্ম।

শিষ্য। কিন্তু সে কখন?

গুরু। এ কথার দুই উত্তর আছে। এক, ইউরোপীয় হিতবাদীর উত্তর। সে উত্তর এই যে, যুদ্ধে যেখানে লক্ষ লোকের অনিষ্ট করিয়া কোটি

কোটি লোকের হিত সাধন করা যায় এমন যুদ্ধ পুণ্য কর্ম্ম। কিন্তু কোটি লোকের জন্য এক লক্ষ লোককেই বা সংহার করিবার আমাদের কি অধিকার? এ কথার উত্তর হিতবাদী দিতে পারেন না। দ্বিতীয় উত্তর ভারবতর্ষীয়। এই উত্তর আধ্যাত্মিক এবং পারমার্থিক। হিন্দুর সকল নীতির মূল আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক। সেই মূল, যুদ্ধের কর্ত্তব্যতার ন্যায় এমন একটা কঠিন তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া যেমন বিশদ রূপে বুঝান যায়, সামান্য তত্ত্বের উপলক্ষে সেরূপ বুঝান যায় না। তাই গীতাকার অর্জ্জুনের যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি কল্পিত করিয়া, তদুপলক্ষে পরম পবিত্র ধর্ম্মের আমূল ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শিষ্য। কথাটা কিরূপে উঠিতেছে?

গুরু। ভগবান্ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে প্রথমে দ্বিবিধ অনুষ্ঠান বুঝাইতেছেন। প্রথমে আধ্যাত্মিকতত্ত্ব, অর্থাৎ আত্মার অনশ্বরতা প্রভৃতি, যাহা জ্ঞানের বিষয়। ইহা জ্ঞান যোগ বা সাংখ্য যোগ নামে অভিহিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন,—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরাপ্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্। ৩।৩

ইহার মধ্যে জ্ঞানযোগ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বুঝাইয়া কর্ম্মযোগে সবিস্তারে বুঝাইতেছেন। এই জ্ঞান ও কর্ম্ম যোগ প্রভৃতি বুঝিলে তুমি জানিতে পারিবে, যে গীতা ভক্তি শাস্ত্র—তাই এত সবিস্তারে ভক্তির ব্যাখ্যায়, গীতার পরিচয় দিতেছি।

চতুর্থ কথা।

ভগবদ্গীতা—কর্ম্ম।

গুরু। এক্ষণে তোমাকে গীতোক্ত কর্ম্মযোগ বুঝাইতেছি, কিন্তু তাহা শুনিবার আগে, ভক্তির আমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা মনে কর। মনুষ্যের যে অবস্থায় সকল বৃত্তি গুলিই ঈশ্বরাভিমুখী হয়, মানসিক সেই অবস্থা, অথবা যে বৃত্তির প্রাবল্যে এই অবস্থা ঘটে, তাহাই ভক্তি। এক্ষণে শ্রবণ কর।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিয়া অর্জ্জুনকে কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতেছেন।

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ। ৩।৫

কেহই কখন নিষ্কর্ম্মা হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। কর্ম্ম না করিলে প্রকৃতিজাত গুণ সকলের দ্বারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব কর্ম্ম করিতেই হইবে। কিন্তু সে কি কর্ম্ম ?

কর্ম্ম বলিলে বেদোক্ত কর্ম্মই বুঝাইত, অর্থাৎ আপনার মঙ্গল কামনায় দেবতার প্রসাদার্থ যাগযজ্ঞ ইত্যাদি বুঝাইত ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ কাম্য কর্ম্ম বুঝাইত। এইখানে প্রাচীন বেদোক্ত ধর্ম্মের সঙ্গে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের প্রথম বিবাদ, এইখান হইতে গীতোক্ত ধর্ম্মের উৎকর্ষের পরিচয়ের আরম্ভ। সেই বেদোক্ত কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানের নিন্দা করিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন,

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিংপ্রতি।
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃত চেতসাং
ব্যাবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌন বিধীয়তে। ২।৪২—৪৪

"যাহারা বক্ষ্যমানরূপ শ্রুতি সুখকর বাক্যপ্রয়োগ করে, তাহারা বিবেক শূন্য। যাহারা বেদবাক্যে রত হইয়া, ফল সাধন কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহা বলিয়া থাকে, যাহারা কাম পরবশ হইয়া স্বর্গই পরমপুরুষার্থ মনে করিয়া জন্মই কর্ম্মের ফল ইহা বলিয়া থাকে, যাহারা (কেবল) ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির সাধনীভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্যমাত্র প্রয়োগ করে, তাহারা অতি মূর্খ। এইরূপ বাক্যে অপহৃত চিত্ত ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্ত ব্যক্তিদিগের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কখন সমাধিতে নিহিত হইতে পারে না।"

অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্ম বা কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান ধর্ম্ম নহে। অথচ কর্ম্ম করিতেই হইবে। তবে কি কর্ম্ম করিতে হইবে ? যাহা কাম্য নহে, নিষ্কাম, তাই। যাহা নিষ্কাম ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, তাহা কর্ম্ম মার্গ মাত্র, কর্ম্মের অনুষ্ঠান।

শিষ্য। নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলি ?

গুরু। নিষ্কাম কর্ম্মের এই লক্ষণ ভগবান নির্দ্দেশ করিতেছেন,

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মাফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ ২। ৭

অর্থাৎ তোমার কর্ম্মেই অধিকার, কদাচ কর্ম্মে ফল যেন না হয়। কর্ম্মের ফলার্থী হইও না; কর্ম্ম ত্যাগেও প্রবৃত্তি না হউক।

অর্থাৎ, কর্ম্ম করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করিবে, কিন্তু তাহার কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা করিবে না।

শিষ্য। ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কর্ম্ম করিব কেন? যদি পেট ভরিবার আকাঙ্ক্ষা না রাখি, তবে ভাত খাইব কেন?

গুরু। এইরূপ ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা বলিয়া ভগবান পর শ্লোকে ভাল করিয়া বুঝাইতেছেন—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।

অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়। সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর।

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না প্রথম, সঙ্গ কি?

গুরু। আসক্তি। যে কর্ম্ম করিবে, তাহার প্রতি কোন প্রকার অনুরাগ না থাকে। ভাত খাওয়ার কথা বলিতেছিলে। ভাত খাইতে হইবে সন্দেহ নাই; কেন না "প্রকৃতিজ গুণে" তোমাকে খাওয়াইবে, কিন্তু আহারে যেন অনুরাগ না হয়। ভোজনে অনুরাগযুক্ত হইয়া ভোজন করিও না।

শিষ্য। আর "যোগস্থ" কি?

গুরু। পর চরণে তাহা কথিত হইতেছে।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥

কর্ম্ম করিবে, কিন্তু কর্ম্ম সিদ্ধ হউক, অসিদ্ধ হউক সমান জ্ঞান করিবে। তোমার যতদূর কর্ত্তব্য তাহা তুমি করিবে। তাতে তোমার কর্ম্ম সিদ্ধ হয়, আর নাই হয়, তুল্য জ্ঞান করিবে। এই যে সিদ্ধাসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করা, ইহাকেই ভগবান যোগ বলিতেছেন। এইরূপ যোগস্থ হইয়া, কর্ম্মে আসক্তি শূন্য হইয়া কর্ম্মের যে অনুষ্ঠান করা, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান।

শিষ্য। এখনও বুঝিলাম না। আমি সিঁধ কাটি লইয়া আপনার বাড়ী চুরি করিতে যাইতেছি। কিন্তু আপনি সজাগ আছেন, এজন্য চুরি করিতে পারিলাম না। তার জন্য দুঃখিত হইলাম না। ভাবিলাম, "আচ্ছা, হলো হলো না হলো না হলো।" আমি কি নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলাম?

গুরু। কথাটা ঠিক সোণার পাথর বাটীর মত হইল। তুমি মুখে, হলো হলো, না হলো না হলো বল, আর নাই বল, তুমি যদি চুরি করিবার অভিপ্রায়

কর, তাহা হইলে তুমি কথনই মনে এরূপ ভাবিতে পারিবে না। কেন না চুরির ফলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া, অর্থাৎ অপহৃত ধনের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, তুমি কখন চুরি করিতে যাও নাই। যাহাকে "কর্ম্ম" বলা যাইতেছে, চুরি তাহার মধ্যে নহে। "কর্ম্ম" কি, তাহা পরে বুঝাইতেছি। কিন্তু চুরি "কর্ম্ম" মধ্যে গণ্য হইলেও তুমি তাহা অনাসক্ত হইয়া কর নাই। এজন্য ঈদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানকে সৎ ও নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান বলা যাইতে পারে না।

শিষ্য। ইহাতে যে আপত্তি, তাহা আমি পূর্ব্বেই করিয়াছি। মনে করুন, আমি বিড়ালের মত ভাত খাইতে বসি, বা উইলিয়ম দি সাইলেণ্টের মত দেশোদ্ধার করিতে বসি, দুইয়েতেই আমাকে ফলার্থী হইতে হইবে। অর্থাৎ উদর পূর্ত্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া ভাতের পাতে বসিতে হইবে, এবং দেশের দুঃখনিবারণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া দেশের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

গুরু। ঠিক সেই কথারই উত্তর দিতে যাইতেছিলাম। তুমি যদি উদর পূর্ত্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া ভাত খাইতে বসো, তবে তোমার কর্ম্ম নিষ্কাম হইল না। তুমি যদি দেশের দুঃখ নিজের দুঃখ তুল্য বা তদধিক ভাবিয়া তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিলে, তাহা হইলেও কর্ম্ম নিষ্কাম হইল না।

শিষ্য। যদি সে আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তবে কেনই এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব?

গুরু। কেবল, ইহা তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া। আহার, এবং দেশোদ্ধার উভয়ই তোমার অনুষ্ঠেয়। চৌর্য্য তোমার অনুষ্ঠেয় নহে।

শিষ্য। তবে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, আর কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে, তাহা কি প্রকারে জানিব? তাহা না বলিলে ত নিষ্কাম ধর্ম্মের গোড়াই বোঝা গেল না?

গুরু। এ অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-প্রণেতা কোন কথাই ছাড়িয়া যান নাই। কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, তাহা বলিয়াছেন।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ।৩।৯।

এখানে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর। আমার কথায় তোমার ইহা বিশ্বাস না হয়, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যের কথার উপর নির্ভর কর। তিনি এই শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"যজ্ঞোবৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরস্তদর্থং।"

তাহা হইলে শ্লোকের অর্থ হইল এই যে, যে ঈশ্বরার্থ বা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট যে কর্ম্ম, তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্ম বন্ধনমাত্র (অনুষ্ঠেয় নহে); অতএব কেবল ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্মই করিবে। ইহার ফল দাঁড়ায় কি; দাঁড়ায়, যে সমস্ত বৃত্তিগুলিই ঈশ্বর-মুখী করিবে, নহিলে সকল কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম হইবে না। এই নিষ্কাম ধর্ম্মই নামান্তরে ভক্তি। এইরূপে কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য। কর্ম্মের সহিত ভক্তির ঐক্য স্থানান্তরে আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে। যথা—

মযি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যাস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী নির্ম্মমোভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।

অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিতে কর্ম্ম সকল আমাতে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম হইয়া এবং মমতা ও বিকার শূন্য হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

শিষ্য। ঈশ্বরে কর্ম্ম অর্পণ কি প্রকারে হইতে পারে?

গুরু।—"অধ্যাত্ম চেতসা" এই বাক্যের সঙ্গে "সংন্যস্য' শব্দ বুঝিতে হইবে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য "অধ্যাত্ম চেতসা" শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "অহং কর্ত্তেশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা।" "কর্ত্তা যিনি ঈশ্বর, তাঁহারই জন্য, তাঁহার ভৃত্য স্বরূপ এই কাজ করিতেছি।" এইরূপ বিবেচনায় কাজ করিলে, কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ হইল।

এখন এই কর্ম্মযোগ বুঝিলে? প্রথমতঃ কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু কেবল অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই কর্ম্ম। যে কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, অর্থাৎ ঈশ্বরাভিপ্রেত, তাহাই অনুষ্ঠেয়। তাহাতে আসক্তিশূন্য এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধি অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিবে। কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবে অর্থাৎ কর্ম্ম তাঁহার, আমি তাঁহার ভৃত্য স্বরূপ কর্ম্ম করিতেছি, এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবে। তাহা হইলেই কর্ম্মযোগ সিদ্ধ হইল।

ইহা করিতে গেলে কার্য্যকারিণী ও শারীরিকী বৃত্তি সকলকেই ঈশ্বর-মুখী করিতে হইবে। অতএব কর্ম্মযোগই ভক্তিযোগ। ভক্তির সঙ্গে ইহার ঐক্য ও সামঞ্জস্য দেখিলে। এই অপূর্ব্বতত্ত্ব, অপূর্ব্ব ধর্ম্ম, কেবল গীতাতেই আছে। এরূপ আশ্চর্য্য ধর্ম্মব্যাখ্যা আর কখন কোন দেশে হয় নাই। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তুমি এখন প্রাপ্ত হও নাই। কর্ম্ম যোগেই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল না, কর্ম্ম, ধর্ম্মের প্রথম সোপান মাত্র। কাল তোমাকে জ্ঞান যোগের কথা কিছু বলিব।

পঞ্চম কথা।

ভগবদ্গীতা—জ্ঞান।

গুরু। এক্ষণ জ্ঞান সম্বন্ধে ভগবদ্‌ক্তির সার মর্ম্ম শ্রবণ কর। কর্ম্মের কথা বলিয়া, চতুর্থাধ্যায়ে আপনার অবতার কথন সময়ে বলিতেছেন,—

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞান তপসা পূতা মদ্ভাবমাগতা॥ ৪।১০।

ইহার ভাবার্থ এই যে, অনেকে বিগত রাগভয়ক্রোধ, মন্ময় (ঈশ্বরময়) এবং আমার উপাশ্রিত হইয়া জ্ঞান তপের দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার ভাব অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব বা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে।

শিষ্য। এই জ্ঞান কি প্রকার?

গুরু। যে জ্ঞানের দ্বারা জীব, সমুদায় ভূতকে আত্মাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পায়। যথা—

যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষস্যাত্মন্যথো ময়ি। ৪।৩৫।

শিষ্য। সে জ্ঞান কিরূপে লাভ করিব?

গুরু। ভগবান তাহার উপায় এই বলিয়া দিয়াছেন,

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তিতে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ। ৪।৩৪।

অর্থাৎ প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা এবং সেবার দ্বারা জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীদিগের নিকট তাহা অবগত হইবে।

শিষ্য। আপনাকে আমি সেবার দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া প্রণিপাত এবং পরিপ্রশ্নের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন।

গুরু। তাহা আমি পারি না, কেননা আমি জ্ঞানীও নহি, তত্ত্বদর্শীও নহি। তবে একটা সোজা সঙ্কেত বলিয়া দিতে পারি।

জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় ভূতকে আপনাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, ইতিবাক্যে কাহার কাহার পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞেয় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

শিষ্য। ভূত, আমি, এবং ঈশ্বর।

গুরু। ভূতকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে কোম্‌তের প্রথম চারি—Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব

এবং রাসায়ন। এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু করিবে। তার পর আপনাকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্ব্বিজ্ঞানে এবং অন্তর্ব্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ কোম্‌তের শেষ দুই—Biology, Sociology. এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের নিকট যাচঞা করিবে।

শিষ্য। তারপর ঈশ্বর জানিব কিসে?

গুরু। হিন্দু শাস্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়।

শিষ্য। তবে, জগতে যাহা কিছু জ্ঞেয়, সকলই জানিতে হইবে। পৃথিবীতে যত প্রকার জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে, সব জানিতে হইবে। তবে জ্ঞান এখানে সাধারণ প্রশস্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে?

গুরু। যাহা তোমাকে শিখাইয়াছি, তাহা মনে করিলেই ঠিক বুঝিবে। জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তিসকলের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হওয়া চাই। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের চর্চ্চা ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তি সকলের উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইলে, সেই সঙ্গে অনুশীলন ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে যদি ভক্তি বৃত্তির ও সম্যক স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইয়া থাকে, তবে জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তিগুলি যখন ভক্তির অধীন হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে, তখনই এই গীতোক্ত জ্ঞানে পেঁাছিবে। অনুশীলন ধর্ম্মেই যেমন কর্ম্মযোগ, অনুশীলন ধর্ম্মেই তেমনি জ্ঞানযোগ।

শিষ্য। আমি গণ্ডমূর্খের মত আপনার ব্যাখ্যাত অনুশীলন ধর্ম্ম সকলই উল্‌টা বুঝিয়াছিলাম; এখন কিছু কিছু বুঝিতেছি।

গুরু। এক্ষণে সে কথা যাউক। এই জ্ঞানযোগ বুঝিবার চেষ্টা কর।

শিষ্য। আগে বলুন, কেবল জ্ঞানেই কি প্রকারে ধর্ম্মের পূর্ণতা হইতে পারে? তাহা হইলে পণ্ডিতই ধার্ম্মিক।

গুরু। পাণ্ডিত্য জ্ঞান নহে। যে ঈশ্বর বুঝিয়াছে, যে ঈশ্বরে জগতে যে সম্বন্ধ তাহা বুঝিয়াছে, সে কেবল পণ্ডিত নহে, সে জ্ঞানী। পণ্ডিত না হইলেও সে জ্ঞানী। শ্রীকৃষ্ণ এমত বলিতেছেন না, যে কেবল জ্ঞানেই তাঁহাকে কেহ পাইয়াছে। তিনি বলিতেছেন,

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ
বহবো জ্ঞান তপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ। ৪।১০

অর্থাৎ, যাহারা চিত্তসংযত, এবং ঈশ্বরপরায়ণ তাঁহারাই জ্ঞানের দ্বারা পূত হইয়া তাঁহাকে পায়। আসল কথা, কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের এমন মর্ম্ম নহে যে কেবল জ্ঞানের দ্বারাই সাধন সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞানও কর্ম্ম উভয়ের সংযোগ চাই। কেবল কর্ম্মে হইবে না, কেবল জ্ঞানে ও নহে। কর্ম্মেই আবার জ্ঞানের সাধন। কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। ভগবান বলিতেছেন,

আরুরুক্ষোর্মুনে র্যোগং কর্ম্ম কারণ মুচ্যতে। ৬।

যিনি জ্ঞানযোগে আরোহনেচ্ছু, কর্ম্মই তাঁহার তদারোহনের কারণ বলিয়া কথিত হয়। অতএব কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। এখানে ভগবদ্বাক্যের অর্থ এই যে কর্ম্মযোগ ভিন্ন চিত্ত শুদ্ধি জন্মে না। চিত্ত শুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞানযোগে পেঁছান যায় না।

শিষ্য। তবে কি কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান জন্মিলে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে?

গুরু। উভয়েরই সংযোগ ও সামঞ্জস্য চাই।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহবিদ্যতে।
তৎস্বয়ং যোগ সংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বাপরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো নসুখং সংশয়াত্মনঃ॥
যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ং।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥ ৪। ৩৮—৪১।

ইহলোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র কিছুই নাই। আত্মাতে সেই জ্ঞানকালে কর্ম্মযোগ দ্বারা সংসিদ্ধ হইলে, তাহা হইতে লোক স্বয়ংই তাহা লাভ করে। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি সেই জ্ঞানে একনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া জ্ঞান লাভ করেন; এবং জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে পরাশান্তি লাভ করেন। অজ্ঞ ও শ্রদ্ধাহীন সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, সুখও নাই। হে ধনঞ্জয়! কর্ম্ম যোগের দ্বারা যে ব্যক্তি সংন্যস্ত কর্ম্ম, এবং জ্ঞানের দ্বারা যার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, সেই আত্মবান্‌কে কর্ম্ম সকল বদ্ধ করিতে পারে না।

তবেই চাই (১) কর্ম্মের সংন্যাস বা ঈশ্বরার্পণ এবং (২) জ্ঞানের দ্বারা সংশয়-ছেদন। এইরূপে কর্ম্মবাদেরও জ্ঞানবাদের বিবাদ মিটিল। ধর্ম্ম সম্পূর্ণ

হইল। এইরূপে ধর্ম্মপ্রণেতৃশ্রেষ্ঠ, ভূতলে মহামহিমাময় এই নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত করিলেন। কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর; কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া পরমার্থ তত্ত্বে সংশয় ছেদন কর। এই জ্ঞানও ভক্তিতে যুক্ত; কেন না,—

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎ পরায়ণাঃ
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূত কল্মষাঃ। ৫।১৬।

ঈশ্বরেই যাহাদের বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাহাদের আত্মা, তাঁহাতে যাহাদের নিষ্ঠা, ও যাহারা তৎপরায়ণ, তাহাদের পাপ সকল জ্ঞানে নির্দ্ধূত হইয়া যায়, তাহারা মোক্ষপ্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। এখন বুঝিতেছি, যে এই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমবায়ে ভক্তি। কর্ম্মের জন্য প্রয়োজন, কার্য্যকারিণী ও শারীরিকীবৃত্তিগুলি সকলেই উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে। জ্ঞানের জন্য চাই জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তিগুলি ঐরূপ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে। আর চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি?

গুরু। এরূপ স্থলে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি মধ্যে গণ্য।

শিষ্য। তবে মনুষ্যের সমুদায় বৃত্তি উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইলে এই গীতোক্ত জ্ঞানকর্ম্মন্যাস যোগে পরিণত হয়। এতদুভয়ই ভক্তিবাদ। মনুষ্যত্ব ও অনুশীলন ধর্ম্ম যাহা আমাকে শুনাইয়াছেন, তাহা এই গীতোক্ত ধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যা মাত্র।

গুরু। ক্রমে একথা আরও স্পষ্ট বুঝিবে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিধবার প্রার্থনা।

চিত্তে নিধায় পতিপাদ গতানুভাবং
কীদৃগ্বিধিং মৃতপতিঃ পরিপালয়ামি।
ধর্ম্মং নিসর্গবিমলং বদ মাতৃকং মে
সাক্ষী ত্বমার্য্য চরিতস্য যতোঽসি গঙ্গে॥

১

অয়ি মাতর্গঙ্গে, অযুত তরঙ্গে,
কল কল করি কোথায় যাও?
আমি অভাগিনী, ডাকি মন্দাকিনী
দুখিনীর পানে ফিরিয়া চাও॥

২

চিরদিন তরে, প্রাণের ঈশ্বরে,
গিয়াছি রাখিয়া তোমার তীরে।
তাই হেথা আসি, অশ্রুনীরে ভাসি,
দিবে না তো আর দিবেনা ফিরে॥

৩

আমি মূঢ় অতি, স্বর্গ ধামে পতি
তবে কেন খেদ হে সুরনদি।
এই পুণ্য ভূমি, তার মাঝে তুমি,
পাপী উদ্ধারিতে রয়েছ যদি॥

৪

দেও দিব্য জ্ঞান, অস্ত্র খরশাণ,
খণ্ড খণ্ড করি মোহের জাল।
কত কাল তুমি, বস আর্য্য ভূমি,
কত কাল—হায় সে কত কাল॥

৫

যবে ঋষিগণ, বেদমন্ত্র কন,
তখনো কি তুমি আছিলা সতি?
কোথা ব্রহ্মাবর্ত্ত, কত পরিবর্ত্ত
হেরিলে নয়নে হে ভাগীরথি।

৬

তবে কেন শোক, কোটি কোটি লোক
লক্ষ লক্ষ নারী আমি যেমনি।
ছিল কোন ঠাঁই, কোন চিহ্ন নাই
অতীতের সাক্ষী তুমি জননী॥

৭

কত রাজ্য পাট, কত দুর্গ ঠাট,
কত সৌধমালা তোমার তীরে।
ছিল এই দেশে, আছে ভগ্নশেষে,
কত বা সমূলে পশিল নীরে॥

৮

তবে রে কি ছার, জীবন আমার,
কত দিন তবে থাকিব ভবে।
এযে ভব মেলা, ভোজ বাজী খেলা,
মাটির সংসারে মাটিতে রবে॥

৯

এই মম নাম, এই মম ধাম,
কেমন ছিল তা কেবা ভাবিবে।
নব নব বর, নব নারী নর
নব পরিচ্ছদে দেশ ঢাকিবে॥

১০

তখন কোথায়, রব আমি হায়,
কোথায় রহিবে প্রাণের পতি!
যত কালে হক, ত্যজে এই লোক,
পাবতো পাবতো পাব সংহতি ॥

১১

যে কথা বলেছ, যে আশা দিয়েছ,
সেই আশা ধরে কাল সম্বরি!
জীবনান্ত হলে, রেখো পদতলে,
অবিচ্ছেদ পণ স্মরণ করি ॥

১২

যত দিন ভবে পরমায়ু রবে
বল গো মা গঙ্গে! করি কি কর্ম্ম?
আর্য্যভূমে রহি, যুগ যুগ বহি,
'দেখ পতিহীনা সতীর ধর্ম্ম' ॥

১৩

জানি শৈলসুতে, সহস্র অযুতে,
পুণ্যের প্রতিমা বিধবা নারী।
তোমার প্রবাহে, নিত্য অবগাহে,
পবিত্র করিলা তোমার বারি ॥

১৪

ধরণী লুটাই, এই ভিক্ষা চাই,
সেই ধন্যা-সতী-চরণ ধূলি।
ধুইয়া লইয়া, প্রবাহে বহিয়া,
দেও মা আমার মস্তকে ধূলি ॥

১৫

আকাশের পটে, গঙ্গার দু তটে,
হে অনল! উঠে শিখা তোমার।
কত নিষ্ঠাবতী, হয় আর্য্যসতী,
তুমি কি জান হে প্রমাণ তার ॥

১৬

চির-আরাধিত, তেজ অপ্রমিত,
শুদ্ধির নিদান তুমি অনল।
পাপ মলা নাশি, কর ভস্ম-রাশি,
কার কি হে সত্ত্ব, জান সকল ॥

১৭

কত পতিহীনা, তোমাতে বিলীনা,
তুমি তো সবার শেষ আশ্রয়।
জান তুমি মর্ম্ম, সেই সতী-ধর্ম্ম
কহ তা আমারে হয়ে সদয় ॥

১৮

ভারতে সুধন্যা, সতী পঞ্চকন্যা, *
নিবসে মানস পর্ব্বত ধামে।
সাবিত্রী গায়ত্রী, আর সরস্বতী,
চন্দ্রপাদা আর বহুলা নামে ॥

১৯

সতীত্ব শিখাতে আইলা ধরাতে
লোক মাতা নারী-রতন-সার।
সুপবিত্র মতি দেবী অরুন্ধতি;
সতী ধর্ম্ম-শিষ্যা হইলা যার ॥

২০

কাঁপে মম অঙ্গ, সে সতী প্রসঙ্গ,
আমি কি সাহসে করিতে পারি।
চাহি বা কেমনে, এই হীন মনে,
তাঁদের পবিত্র প্রসাদ বারি ॥

২১

বিবাহের কালে, ধ্রুবত্ব শিখালে,
ধ্রুব তারা সহ হে অরুন্ধতি।
পতি পদ নিষ্ঠা, পাইতে প্রতিষ্ঠা,
চাহে যত নারী তোমার প্রতি ॥

* কালিকা পুরাণোক্ত।

২২

তাই কৃপা জোরে, তরাইতে মোরে,
হে জননি! যদি কটাক্ষে চাও।
বৈধব্য ধরম, সতীর করম,
নারীর অধমে কিছু শিখাও॥

২৩

বিষম দশায়, পড়িয়াছি হায়,
শত্রু পায় পায় বহিরন্তরে।
হীন সর্ব্ব বল, না কিছু সম্বল,
অভাগীরে কেবা করুণা করে॥

২৪

যাঁরে দিয়া ভার, পেতাম নিস্তার,
কভু ভুগি নাই কোনই তাপে।
কুল ধর্ম্ম তাঁর, বন্ধু পরিবার,
সকল সংসার আমায় চাপে॥

২৫

দুস্তর সংসার —, গতিবুঝা ভার,
একাকিনী পড়ি বিষম ফেরে।
কোন্ দিকে যাই, পথ নাহি পাই,
গভীর আঁধার চৌদিকে ঘেরে॥

২৬

আত্ম বন্ধু যত, হইতেছে গত,
মনোব্যথা কব যাদের কাছে।
কেহ শোকে ভরা, কেহ রোগে জরা,
না জানি অদৃষ্টে আরো কি আছে॥

২৭

কর মোরে পার, এ ঘোর সংসার,
অয়ি লোক মাতঃ সতী-ললনা!
দেহ তব বল, নিষ্ঠা অচঞ্চল,
তিতিক্ষা সন্তোষ করি সাধনা॥

২৮

হে মাতঃ জাহ্নবি, সাধ্বী কর্ম্ম ছবি,
তব কূলে যাহা ছিল ফলিত।
ধৈর্য্য গিরিবর, দয়ার নিঝর,
আমার হৃদয়ে কর অঙ্কিত॥

২৯

কোথা প্রাণ পতি, অবলার প্রতি,
চাহ স্বর্গ হতে হয়ে সদয়।
তব নাম স্মরি, কত বল ধরি,
তরিব সংসার না করি ভয়॥

৩০

যত দিন বিধি, তব প্রতিনিধি,
রাখিবে আমারে ধরণী মাঝে।
তব পদ ধ্যানে, তব কর্ম্মজ্ঞানে,
সমর্পিব প্রাণ তোমার কাজে॥

৩১

তোমারি এ দাসী, নহি অভিলাষী,
পৃথিবীর সুখে তৃণের সম।
অর্দ্ধ মৃত্যুদ্বারে, অর্দ্ধ এসংসারে,
তোমাতে অর্পিত জীবন মম॥

৩২

করি প্রণিপাত, দেহ দেহ নাথ,
দেহ দিব্য বল এ মর্ত্ত ধামে।
যত যত ধর্ম্ম, যত পুণ্য কর্ম্ম,
সকল আচরি তোমার নামে॥

৩৩

দেব হুতাশন, বরুণ পবন,
বিতত লোচন হে দিনমণি।
নক্ষত্র মণ্ডল, দিক্ পাল দল
আর্য্য ধর্ম্ম সাক্ষী তোমরা গণি॥

৩৪

কর আশীর্ব্বাদ, দেও হে প্রসাদ,
এ অধম জনে তোমরা সবে।
যেন সতীপদ, অতুল সম্পদ,
পাইয়ে এড়াই এ ঘোর ভবে॥

৩৫

প্রতিকূল বাতে, রিপুর আঘাতে,
সহস্র ব্যাঘাতে কভু না টলি।
যত দুঃখ পাই, তাতে ক্ষতি নাই,
সত্য ধর্ম্ম পথে স'ব সকলি॥

৩৬

ছিন্ন হবে স্নেহ, ভিন্ন হবে দেহ,
শত শত ক্লেশ তাতেই বা কি!
অনলে পশিব, সাগরে ডুবিব,
সতী ধর্ম্ম-মণি হৃদয়ে রাখি॥

৩৭

করি ধর্ম্ম শিক্ষা, সাধিতে পরীক্ষা,
এ হেন সংসারে নরের জন্ম।
ধন মান কায়, সব লয় পায়,
সঙ্গের সঙ্গী কেবল সে ধর্ম্ম॥

৩৮

আর্য্যজাতি-প্রাণ, তুমি হে কল্যাণ
পুরুষ-প্রধান অখিল পতি!
তুমি সতীশ্বর, পবিত্র সুন্দর,
দেহ ধর্ম্মরাজ, দেহ সুগতি॥

৩৯

সতী ধর্ম্মে দীক্ষা, সতী ধর্ম্ম শিক্ষা,
যুগে যুগে যেন ভারতে রয়।
সতী অগ্রগণ্যা, আর্য্য জাতি কন্যা,
অধন্যা যেন সে কভু না হয়॥

৪০

দূরে যাক্ রোগ, কু-আশা কু-ভোগ,
কর শক্তি-যুত মঙ্গল কাজে।
মানব-হৃদয় পবিত্রতাময়,
সাজুক ধরণী সুন্দর সাজে॥

ভূগর্ভস্থ অগ্নি।

বৈজ্ঞানিক।

ভূগর্ভস্থ অগ্নিই যে প্রলয়ের হেতু তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না। তবে তাহা একমাত্র হেতুরূপে শাস্ত্রে কথিত হয় নাই। প্রলয়ের প্রধান হেতু ভোগক্ষয় এবং বাহ্য হেতু অগ্নি দহন, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি। প্রত্যেক পদার্থের বিনাশ-বীজ—সেই পদার্থেই আছে। নরদেহের—বিনাশ কারণ সেই দেহেতেই আছে, তাহারই নাম তমোগুণ। সেইরূপ পৃথিবীর বিনাশ-বীজ পৃথিবীতেই আছে, তাহাই ঐ কালানল। তাহা তমোগুণের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি; সে কথা সংকর্ষণ প্রকরণে উক্ত হইয়াছে।

ডাক্তার কমিং বলেন যে অগ্নি দ্বারা পৃথিবীর ন্যায় গ্রহের দগ্ধ হওয়া নূতন নহে। সুবিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্ব্বিৎ ল্যাপলাস্ আকাশমণ্ডলে আঠারটি লোকমণ্ডল জ্বলিয়া যাইতে দেখিয়াছেন। তিনি আমাদের ভূলোকের ন্যায় বৃহৎ, একটি তারার ঐরূপ অবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন। সেই তারাটি তাঁহার দৃষ্টিতে প্রথমত ধূম্রবর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়। তাহার পর অতিশয় রক্তবর্ণ হয়; তাহার পর জ্বলিয়া যায়। তাহার পর তিনি সেটি আর দেখিতে পান নাই। উক্ত বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আঠারটি তারার সম্বন্ধে ঐরূপ ঘটনা দর্শন করিয়াছিলেন।

এই ভূমণ্ডল বাসোপযোগী হওয়ার পূর্ব্বে একবার যখন অগ্নিময় ছিল, তখন পুনর্ব্বার সেরূপ হইতে পারে। সামান্য পরিবর্ত্তন সকল যেমন সামান্য কালান্তে হয়, উক্ত রূপ মহা মহা পরিবর্ত্তন যে, সেইরূপ দীর্ঘকালান্তে সংঘটিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এই ভূমণ্ডলের—একটি প্রলয়াবস্থা যদি পূর্ব্বে ঘটিয়া থাকে, এবং যদি তাহা বিজ্ঞানের অনুমোদিত হয়, তবে পরেও যে সেই অবস্থা হইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যখন ভূগর্ভস্থ অগ্নির উৎপাতে, সময়ে সময়ে পৃথিবীর নানা স্থান ধ্বংস হইয়া থাকে, তখন কোন সময়ে তদ্দ্বারা সমস্ত পৃথিবীও নষ্ট হইতে পারে।

বিশ্ববিখ্যাত হমবোল্টের গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, পৃথিবীর গভীর অভ্যন্তরে ঐ মহা জ্বালাগ্নি অবস্থিতি করে। তৎ কর্ত্তৃক তথা অনবরত নানাবিধ মৃত্তিকা ও ধাতুমিশ্রিত তরল পদার্থ আবর্ত্তিত ও দগ্ধ হইতেছে। ভূগর্ভের যে স্থল হইতে পৃথিবীর কঠিন স্তর আরম্ভ, তৎকর্ত্তৃক সেই পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই ধূম ও বাষ্পাচ্ছন্ন। সেই বাষ্প কখন স্বয়ং, কখন বা তত্র প্রবিষ্ট জলস্পর্শে জ্বলিয়া উঠে। তখন তাহা আগ্নেয় গিরিমুখে অথবা অন্য যে কোন দিকে পথ পায়, সেই দিক্ ভেদ পূর্ব্বক ভয়ঙ্কররূপে ধাতু নিঃস্রব ও প্রভৃত ভস্মরাশি সহকারে নিষ্ক্রান্ত হয় এবং ভূমিকম্পেরও উৎপত্তি করিয়া থাকে। এইরূপ উৎপাতে সময়ে সময়ে বিস্তর নগর গ্রাম ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অনেক বিস্তীর্ণ প্রদেশ রসাতলে প্রোথিত হইয়াছে, যাহা ভূমি ছিল; তাহা জলে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে, অনেক স্থান যাহা মনোহর নগর, গ্রাম, জনপদ দ্বারা সুশোভিত ছিল, তাহা একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছে।

যখন সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে এই সকল বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে, তখন এমন এক সময়-শির আসিয়া উপস্থিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে, যখন

চতুর্দ্দিক দিয়া ভূগর্ত্তস্থ সেই কালানল উদ্গীরিত হইয়া ভূমণ্ডলকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। হমবোল্ট্ কহেন যে উক্ত মহা অনল আমাদের পদতলের নিম্নভাগে অবনীবিবরে প্রত্যেক স্থানে রহিয়াছে এবং আমাদের এই গ্রহের (পৃথিবীর) বাল্যাবস্থায় তাহার গর্ত্তস্থ তরল আগ্নেয় পদার্থ বহুবার পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিয়াছে। তাহার বিদীর্ণীকৃত শত সহস্র পথ ভূগর্ত্ত মধ্যে এখন ঘনীভূত ধাতু পদার্থে রুদ্ধ হইয়া আছে। কিন্তু কালপ্রাপ্তে সেই সকল পথ ভেদ করিয়া আবার সর্ব্বনাশ করিতে পারে। অনেক স্থলে বহুকালের নির্ব্বাপিত আগ্নেয় গিরি আবার জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এতাবতা শাস্ত্রীয় সঙ্কর্ষণাগ্নিই যে এই বৈজ্ঞানিকাগ্নি, তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না।

হম্‌বোল্‌টের গ্রন্থপাঠে অনুমান হয় যে, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত সর্ব্বতোভাবে প্রলয়-লক্ষণ-সম্পন্ন। ঐরূপ মহা বিপদ আরম্ভ হওয়ার দীর্ঘ-কাল পূর্ব্ব হইতে অনাবৃষ্টি হয়। তাহাতে শস্যক্ষেত্র সকল জলকণাশূন্য ও মরুভূমি হইয়া উঠে। তাহার পর আগ্নেয় গিরি বিদারিত হইয়া ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হয়। অবশেষে প্রচণ্ড ব্যাত্যা সহকৃত ঘোরতর বৃষ্টিধারা নিপতিত হইয়া ভূমি প্লাবিত করিয়া থাকে। কখন কখন মহাসাগর ক্ষুব্ধ হইয়া অবনীপৃষ্ঠকে গ্রাস করিতে আসে। পর্ব্বত ভগ্ন হইয়া তুমুল শব্দ-সহকারে ধরণীতলে পতিত হয়। ভূগর্ত্ত হইতে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর নাদ উৎপন্ন হয়। বসুন্ধরা সাদ্রি সমুদ্র কানন কম্পিত হইতে থাকে। কম্পন-কালে পর্ব্বতাদির অধোভাগে সাগরজল প্রবেশ করিয়া ভূগর্ত্তমধ্যে স্থানে স্থানে অন্ধকারাচ্ছন্ন হ্রদ ও বিস্তীর্ণ ভোগবতী গঙ্গার উৎপত্তি করিয়া থাকে। যেমন কখন কখন কোন কোন দেশে এইরূপ ঘটনা সকল উপস্থিত হয়, সেইরূপ কোন এক দীর্ঘ কালান্তে যখন সকল প্রকার বিপদের লক্ষণ একত্র দেখা দিবে, তখন ঐ তমোমূর্ত্তি মহা অনল যে ভূমণ্ডলকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ আমাদের নিম্নদেশে ঐ কালসর্প সদা চঞ্চল রহিয়াছে, কোন একদিন উহা ভূমি ভেদ পূর্ব্বক যে পৃথিবীর সর্ব্বনাশ করিবে তাহা অসম্ভব নহে।

কিন্তু বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যে কিছুই নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলকর নহে। কোন ঘটনাই অমঙ্গলোদ্দেশে সংঘটিত হয় না। প্রাগুক্ত ভূগর্ত্তস্থ অগ্নির যে এত উৎপাত তাহাও চিরবিনাশক নহে। বিশেষত তাহার যেমন প্রলয়-ধর্ম্ম আছে, সেইরূপ সৃষ্টিকে পুষ্ট করার শক্তিও আছে।

উহা যেমন দেশ নগর গ্রামকে অধোপ্রোথিত এবং সমগ্র দেশকে কম্পমান করে, সেইরূপ পৃথিবীর উপরিস্থ আবরণকে নিম্নস্থ তরল প্রজ্বলিত পদার্থ হইতে স্বতন্ত্রপূর্ব্বক ধারণ করে; অবনীপৃষ্ঠকে নিম্নস্থ তেজ প্রভাবে সর্ব্বদা উন্নয়ন করিয়া রাখে; সমুদ্রমধ্যে সময় সময় জলগর্ত্ত হইতে দ্বীপ উৎপন্ন করিয়া দেয়, এবং ভূমিভেদপূর্ব্বক পর্ব্বতকে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া রাখে। ভারতীয় শাস্ত্র যে কোন কোন স্থলে সঙ্কর্ষাণলকে পৃথিবীর ধারণ-শক্তি কহিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক নহে। বোধ হয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ শাস্ত্রীয় তত্ত্বটির প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওয়া যাইতে পারিবে। যেমন সমস্ত গ্রহমণ্ডলে, সেইরূপ পৃথিবীতে বিনা আধারে আকাশে স্থিতি করার শক্তি শাস্ত্রে ও বিজ্ঞানে সমান রূপে স্বীকার করেন। যেমন পৃথিবীর সেইরূপ সমস্ত গ্রহমণ্ডলের অভ্যন্তরেই অগ্নি ও আগ্নেয় তরল ধাতু থাকা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। ঐ অগ্নি যখন দ্বীপ পর্ব্বত ও ভূপৃষ্ঠকে উত্তোলন করিয়া রাখিতে পারে, এবং যখন উহাই পৃথিবীরূপ অণ্ডের, গ্রন্থী স্বরূপ সন্ধিস্থল, তখন সেই অগ্নিময় তরল সন্ধিস্থলে ঐ ভূধারণ শক্তির অধিকাংশ প্রবাহ স্থিতি করে, বলিলেও দোষ না হইতে পারে। অভ্যন্তরস্থ জালা-জিহ্ব অগ্নি যেমন বেলুন যন্ত্রকে শূন্যে উন্নয়ন করে, এবং বায়ু তাহার গতিবিধান করিয়া থাকে; সেই রূপ ভূগর্ভস্থ প্রজ্বলিত মহা অনল স্বীয় অনন্তশক্তিবলে ভূমণ্ডলকে শূন্যে গতিবিশিষ্ট করে, এবং সূর্য্যের অসীম শক্তি তাহার পরিশ্রম বিধান করিয়া দেয়, এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে বোধ হয় বিজ্ঞানের বিপর্য্যয় হইবে না। তাহা হউক বা না হউক, আর্য্য শাস্ত্রে—কিন্তু ঐ অগ্নিকেই ভূমণ্ডলের ধারয়িত্রী-রূপ অনন্তশক্তি কহিয়াছেন। আর্য্যশাস্ত্রমতে ঐ অগ্নিই তমঃ স্বভাব ভূবীজ অথবা লিঙ্গভূমি। যে শক্তির বলে ধরণী আকাশে স্থিতি করে, তাহা ঐ অগ্নিরই শক্তি। তাৎপর্য্য এই যে, বীজরূপী অগ্নিময় ভূগ্রন্থীই ভূমণ্ডলকে ধারণ করে। ফলে মূলত শক্তি ঈশ্বরের। তাহাই ভূমণ্ডলকে প্রদত্ত হইয়াছে। ভূগর্ত্তে অগ্নিস্থানে তাহার অধিক প্রবাহ; এই মাত্র শাস্ত্রীয় যুক্তি। এই সিদ্ধান্তকে অমান্য করার কারণ নাই। শাস্ত্রানুসারে ঐ মহাঅগ্নি ভূতলস্থ সমস্ত পদার্থকে আকর্ষণপূর্ব্বক আপনার গ্রন্থীরূপ মধ্যভাগের সহিত দৃঢ় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এবং বিকর্ষণ প্রভাবে আপনার ভয়ঙ্কর আগ্নেয় গ্রন্থী হইতে ভূমি পৃষ্ঠকে ঊর্দ্ধে বিস্তীর্ণ করিয়াছে। এই নিমিত্ত উহাকে সঙ্কর্ষণ কহে।

ঐ অগ্নি প্রলয়-ধর্ম্মী হইলেও, উহার আর এক উপকারিণী শক্তি আছে বিশ্বমান্য হমবোলট্ বলেন, যে ভূগর্ভস্থ যে অগ্নি ধরাপৃষ্ঠে বিস্তর সর্ব্বনাশ করে, তাহাই ভূমণ্ডলস্থ উত্তর দক্ষিণ শীত-গ্রীষ্ম-প্রধান সর্গ কটিবন্ধে আদিকালে পৃথিবীর নবীন ত্বকের উপরি বিস্ময়কর উর্ব্বরাশক্তি উৎপন্ন করিয়াছিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পুরাণ শাস্ত্র সংকর্ষণ দেবের হস্তে একখানি লাঙ্গল দিয়া এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তটি বুঝাইয়া দিয়াছেন প্রত্যেক নবসৃষ্টিতে সেই শেষমূর্ত্তি অনন্তদেব হলধর-বেশে ধরণী পৃষ্ঠে প্রথমেই হল-যোজন করিয়া থাকেন। এবং প্রত্যেক কল্পান্তকালে তিনিই রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন। প্রত্যুত, পরম কারুণিক পরমেশ্বর স্বীয় অস্বা ভাবিক করুণা বা রোষভরে জগতের সৃষ্টি বা প্রলয় করেন না। যথা জীবগণের ভোগশক্তি ও বাহ্য জগতের ভোগদানের শক্তি যুগপৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া মূল প্রকৃতিতে উপসংহৃত হয়, তিনি তাদৃশ কালেই সেই প্রকৃতিরূপ শক্তিদ্বারা স্বভাবত জগতের প্রকৃতি অনুসারে সৃষ্টি প্রলয়াদি করিয়া থাকেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

খড়্গপুর।

রাহু ও কেতু।

১১ সংখ্যার নবজীবনে সংক্রান্তি-তত্ত্ব-লেখক বিষুব-রেখা ও রাশি-চক্রের দুই সন্ধিস্থলকে যে রাহু ও কেতু বলিয়াছেন, তাহাদিগের সহিত রাহু ও কেতুর কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তিনি বলিয়াছেন যে, "সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ (astronomy) শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রমাণানুসারে সাহস-সহকারে বলা যাইতে পারে, উক্ত ক্রান্তিপাত দুইটিই রাহু ও কেতু। ঐ দুই স্থলেই চন্দ্র ও সূর্য্যদেব পৃথিবী ও চন্দ্রবিম্বের ছায়াদ্বারা সময়বিশেষে আবৃত হইয়া থাকেন"। কিন্তু সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রে এ কথা ত কোথাও বলে না।

আকাশস্থ নক্ষত্র-পুঞ্জ-মধ্যে যে কল্পিত বৃত্ত রেখায় সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করিতে দেখা যায়, তাহার নাম রাশিচক্র (বা Ecliptic), আর যে রেখাপথে চন্দ্রকে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়, হিন্দু-জ্যোতিষ অনুসারে তাহাকে নক্ষত্র-চক্র বলা যায়। এই নক্ষত্র-চক্র ও রাশিচক্র পরস্পরকে যে দুই স্থলে কাটিয়াছে, তাহাদের ইংরাজীতে মূনস্ নোড্স্ (moon's nodes) বলে। এই মুনস্ নোডস্ দুইটি স্থিরবিন্দু নহে। নক্ষত্রপুঞ্জ মধ্যে ইহাদেরও গতি আছে, এই বিন্দুদ্বয় যে সময়ের মধ্যে একবার রাশি চক্র ভ্রমণ করে, সেই সময়ের মধ্যেই আমাদের রাহুও একবার রাশিচক্র ঘুরিয়া থাকে। চন্দ্র বা সূর্য্য এই দুইটি বিন্দুর সন্নিকটস্থ না হইলে, গ্রহণ হয় না। সংক্রান্তি-তত্ত্ব-লেখক এই দুইটি বিন্দুকে লক্ষ্য করিয়া ভুলক্রমে অন্য বিন্দুদ্বয়কে রাহু ও কেতু বলিয়াছেন। বিষুব রেখা ও রাশিচক্রের সন্ধিস্থলকে অয়নবিন্দু বলা যায়। সূর্য্য ঐ বিন্দুতে আসিলে, দিন রাত্রি সমান হয়। আকাশস্থ ঐ বিন্দুদ্বয় আর মূনস্ নোড্স্ ইহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্থানীয়।

যাহাকে ইংরাজীতে মূনস্ নোড্স্ বলে, প্রাচীন জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ যে সেই দুইটি বিন্দুকেই রাহু ও কেতু বলিয়া গিয়াছেন, ইহাও কিন্তু আবার ঠিক কথা নহে।

বরাহ মিহির প্রণীত বৃহৎসংহিতা নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে কেতু শব্দের যেরূপ প্রয়োগ আছে, তাহাতে এই বোধ হয়, যে জ্যোতিষ্ক পদার্থের আচ্ছাদনকারী পদার্থকেই প্রাচীনগণ কেতু নাম দিতেন। যাহাকে আজকাল-কার জ্যোতিষে সোলারস্পটস্ (Solar spots) বা সূর্য্যের কলঙ্ক বলে, বরাহ মিহিরের গ্রন্থে তাহাকে কেতু নাম দেওয়া হইয়াছে। ধূমকেতু, কালকেতু, এই সকল কথাতেও যে কেতু শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহারও অর্থ জ্যোতির-আবরণকারীপদার্থ। সুতরাং মূনস্ নোডস্ নামক দুইটি বিন্দুকে রাহু ও কেতু না বলিয়া ঐ দুই বিন্দুগত সূর্য্য বা চন্দ্রের জ্যোতি আবরণকারী পদার্থকে রাহু ও কেতু বলা সঙ্গত হয়।

এই রাহু ও কেতু নামক সূর্য্য বা চন্দ্রের জ্যোতি-আবরণকারীপদার্থকে দৈত্য বা অসুর বলিয়া বর্ণনা করিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ ভারতবাসীগণকে কেন এরূপ ভ্রমে ফেলিয়া গিয়াছেন?

গ্রহণের সময় চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর সমসূত্রপাতঅবস্থায়, স্বভাবের অন্তস্তলে কিরূপ কার্য্য হইতে থাকে, তাহা যদি আজকালকার জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ বুঝিতে

পারিতেন, তবে রাহু ও কেতুকে দৈত্য বলিতে তাঁহাদেরও বোধ হয় কোন আপত্তি থাকিত না। আজকালকার বৈজ্ঞানিকগণ ইহা দেখিয়াছেন যে, সূর্য্যে যে সময় সোলার স্পট্‌স্ বা সৌর কলঙ্ক দেখা যায়, পৃথিবীতে সেই সময় পৃথিবীর (Magnetism) চৌম্বকশক্তির কেমন একটা গোলমাল অবস্থা উপস্থিত হয়। এই অবস্থাকে তাঁহারা (Magnetic Storm) চৌম্বক-বিপর্য্যয় বলিয়া থাকেন। আধুনিক বিজ্ঞান আরও কিছু অগ্রসর হইলে বুঝিতে পারিবে যে, গ্রহণের সময় পৃথিবীতে এমন এক প্রকার সূক্ষ্মশক্তির চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় যে, মনুষ্য যদি সেই সূক্ষ্মশক্তির অধীন হইয়া পড়ে, তবে সেই শক্তির স্রোত তাহাকে কখন কোন্ পথে লইয়া যাইবে, তাহার স্থিরতা থাকে না। যাহাকে (Animal Magnetism) জীবস্থ চৌম্বক শক্তি বলে, এই গ্রহণ কালীন উদ্ভূত-শক্তি সেই জাতীয়। যাঁহাদের সূক্ষ্মানুভূতি কথঞ্চিৎ বিকশিত হইয়াছে, তাঁহারা গ্রহণের সময় ঐ সূক্ষ্মশক্তি অনুভব করিতে সক্ষম হন।

এই জগতের কোন ঘটনা হইতে যে, কখন্ কি ফল ফলে, তাহা কে বলিতে পারে? এই জগতের ঘটনা সকল সম্বন্ধে যখন আমরা সম্পূর্ণ মূর্খ, তখন দুখানা ইংরাজী বই পড়িয়া জগৎ সম্বন্ধে সব বুঝিয়া লইয়াছি, এরূপ স্থির করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আর্য্যঋষিগণ স্থির করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, গ্রহণের সময় পৃথিবীস্থ সূক্ষ্মশক্তি সকলের এরূপ একটি ভাবান্তর উপস্থিত হয়, যে সেই ভাবান্তর জন্য সেই সময় মানব মাত্রেরই কামনা-শূন্য হইয়া ঈশ্বরোপাসনা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে রত থাকা উচিত নহে। তাই গ্রহণেরসময় এত শঙ্খধ্বনি, এত দান ধ্যানের গণ্ডগোল, এত একটা উল্লাসের ছড়াছড়ি—হিন্দু-সমাজে এখনও দেখা যায়। আমি শুনিয়াছি যে গ্রহণের দিন যে একবার কাশীর অবস্থা নয়নগোচর করিয়াছে, সে হাজার কেন অধার্ম্মিক হউক না, তাহার মনে ধর্ম্মভাব স্বতই উদিত হইয়া থাকে।

দেখ, রাহু ও কেতু দৈত্য বা অসুর কিছুই নহে, তুমি যে গ্রহণের সময় শাঁখ ঘণ্টা বাজাইয়া নানা উল্লাসে মত্ত হও,—তাহা কুসংস্কারপূর্ণ কর্ম্ম,—এই রূপ শিক্ষা দিয়া, যিনি গ্রহণকালীন হিন্দুর চিত্তের ধর্ম্মতরঙ্গ নষ্ট করিতে চান, আমি তাঁহার নিকট হইতে জ্যোতিষ শিখিতে চাই না।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি, এল্।

——oo——

বঙ্গে ইংরেজাধিকার।

যখন সেরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করেন, তখন য়ুরোপে ফরাসী ইংরেজে যুদ্ধ চলিতেছিল। কিন্তু এই যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া চন্দননগরের ফরাসীরা সে সময়ে কলিকাতার ইংরেজদিগের কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। নবাব ক্রোধান্ধ হইয়া কলিকাতা আক্রমণ করিয়াছিলেন; কলিকাতার দুর্গ সুরক্ষিত ছিল না; আক্রান্ত ইংরেজেরাও সৈন্যবলে বলীয়ান ছিলেন না। আক্রমণ নিবারণে বা আত্মসংরক্ষণে তখন তাঁহাদের তাদৃশ ক্ষমতা ছিল না। প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীরা এ সময়ে অনায়াসে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিতে পারিতেন। কিন্তু ফরাসীরা ইহা করেন নাই। এসঙ্কট কালেও প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্ষমতা ও প্রাধান্য পর্য্যুদস্ত করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মে নাই। ইংরেজেরা নবাবের আক্রমণে ভীত হইয়া ওলান্দাজ ও ফরাসীদিগের সাহায্য-প্রার্থনা করেন। ওলন্দাজ এই প্রার্থনা পূরণে সম্মত হন নাই—কিন্তু ফরাসীরা ইংরেজের সাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সকলেই ভবিষ্যৎ বিষয়ে অন্ধ। সিরাজউদ্দৌলা যদি জানিতেন, ইংরেজেরা তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট ও প্রণষ্ট-সর্ব্বস্ব করিবেন, তাহা হইলে, তিনি তাঁহাদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতেন না। ফরাসীরা যদি জানিতেন, ইংরেজ পরে তাঁহাদের প্রাধান্য নষ্ট করিতে অগ্রসর হইবেন, তাহা হইলে তাঁহারা নবাবের কলিকাতা আক্রমণ সময়ে, ইংরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতে উদাসীন থাকিতেন না। ফরাসী ভবিষ্যদ্দর্শী বা ইংরেজ কোম্পানির কূটমন্ত্র কৌশলের মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন না। এই ভবিষ্যদ্দর্শিতার অভাবে বাঙ্গালায় ফরাসীর অধঃপতন হইয়াছে, আর লর্ড ক্লাইবের কূট মন্ত্র-কৌশলের প্রভাবে বাঙ্গালায় ইংরেজের আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে।

ইংরেজ কলিকাতা পুনরধিকার করিলেন। নবাবের সহিত সন্ধি বন্ধন হইয়া সন্ধির নিয়মে ইংরেজ বণিক কোম্পানি অনেক বিষয়ে লাভবান্ হইলেন। তাঁহারা যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই পাইলেন। সুতরাং তাঁহাদের বাসনা ফলবতী, সাধনা সিদ্ধি-বিধায়িনী হইল। তাঁহারা এখন বাঙ্গালায় ফরাসীদিগের প্রাধান্য নষ্ট করিতে সচেষ্ট হইলেন। ফরাসীরা

চন্দননগরে আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিতেছিলেন, ক্লাইব এই প্রাধান্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন। রোমের সিপিও যেমন কার্থেজের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, ক্লাইবও তেমনি চন্দনগর রোষের চক্ষে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। যখন তিনি হুগলী আক্রমণ করেন, তখন ফরাসী অধিকার চন্দননগরও উৎসন্ন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল। এ ইচ্ছা ফলবতী করিতে, তিনি এখন কৃত সঙ্কল্প হইলেন।

ইংরেজদিগের সহিত সন্ধির বন্দোবস্ত করিয়া, নবাব মুর্শিদাবাদের অভিমুখে যাইতেছিলেন। পথে, ইংরেজ কোম্পানির চন্দন নগর আক্রমণের প্রস্তাব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। নবাব এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। ফরাসীরা তাঁহার অধিকারে শান্তভাবে বাস করিতেছিলেন। তিনি উহাদিগকে নিরাপদে রাখিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক এ প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে উদাসীন হইলেন না। তিনি ইংরেজের প্রস্তাব অনুমোদন করিতে অসম্মত হইলেন। ইহা সিরাজউদ্দৌলার ধীরতা ও শান্তভাবের আর একটি প্রমাণ। সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রপট যাঁহাদের হস্তে কলঙ্কিত হইয়াছে—যাঁহারা সিরাজউদ্দৌলাকে ঘোর দুর্বৃত্ত ও অমানুষ প্রকৃতি বলিয়া সাধারণের সমক্ষে পরিচিত করিয়াছেন, সিরাজ উদ্দৌলা এক সময়ে তাঁহাদের সমক্ষেই এইরূপ ধীরতা ও প্রশান্ত ভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। ইংরেজ নবাবের অধিকারে শান্তি ভঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন, নবাবের আশ্রিত লোকদিগকে স্থান ভ্রষ্ট ও সম্পত্তি ভ্রষ্ট করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন; নবাব এ প্রার্থনা পূরণে অসম্মত হইলেন। ইহাতে শান্তি প্রত্যাশী তরুণ-বয়স্ক রাজ্যাধিপতির চরিত্র যেমন উজ্জ্বল হইতেছে—শান্তি-বিদ্বেষী কলিকাতাস্থ ইংরেজ বণিকের প্রকৃতি তেমনি আত্ম স্বার্থের গভীর কালিমায় ঢাকিয়া পড়িতেছে।

কিন্তু লর্ড ক্লাইব আপনার সঙ্কল্প ছাড়িলেন না—স্বার্থ সিদ্ধির পথ পরিষ্কার করিতে কিছুতেই উদাসীন রহিলেন না। তিনি চন্দন নগর আক্রমণের যোগাড় করিলেন। চন্দন নগরের শাসন কর্ত্তা রেণল্ট, ইংরেজদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া নবাবকে জানাইলেন। নবাব অগ্রদ্বীপে উপনীত হইয়াছেন, এমন সময় ফরাসীদিগের দূত তাঁহার কাছে আসিল। সিরাজউদ্দৌলা দূত মুখে শান্তি ভঙ্গের সংবাদ পাইয়া বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইংরেজেরা তাঁহার রাজ্যে শান্ত ভাবে থাকিতে সম্মত

নুছেন। তাঁহাদের দুরভিসন্ধিতে ক্রমে নানা স্থানে অশান্তির আবির্ভাব হইবে, ক্রমে হয়ত তিনি স্বয়ং এই অশান্তি জালে জড়িত হইয়া পড়িবেন। সুতরাং তিনি এই গভীর অশান্তির পূর্ব্ব সূচনা দেখিয়া, স্থির থাকিতে পারিলেন না। সংবাদ পাওয়া মাত্র সিরাজউদ্দৌলা সেই অগ্রদ্বীপ হইতেই ইংরেজদিগকে উপস্থিত আক্রমণে নিবৃত্ত থাকিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। ইংরেজদিগের ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তাহাদের উপর কেমন একটা অবিশ্বাস জন্মিয়া ছিল—সুতরাং নবাব কেবল পত্র লিখিয়াই নিরস্ত থাকিলেন না—হুগলী সুরক্ষিত করিবার জন্য পনর শত সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। এই সময়ে রাজা নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার ছিলেন। ইংরেজেরা চন্দন-নগর আক্রমণ করিলে, নবাব ফরাসীদিগকে যথোচিত সাহায্য করিতে নন্দকুমারকে আদেশ দিলেন, অধিকন্তু তিনি আত্ম সংরক্ষণ ব্যয়ের জন্য ফরাসী-গবর্ণর রেণল্টের নিকট এক লক্ষ টাকা পাঠাইলেন।

সিরাজউদ্দৌলার পত্র কলিকাতায় পৌঁছিল। ক্লাইব কিছু চিন্তিত হইলেন। একবারে দুই পক্ষের সহিত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হন, উপস্থিত সময়ে তাঁহার এমন ক্ষমতা বা যোগাড় ছিল না। সুতরাং তিনি নবাব ও ফরাসী উভয়কেই আপনাদের শত্রু করিয়া তুলিতে অনিচ্ছুক হইলেন। উপস্থিত সময়ে চন্দননগরে ফরাসীদিগের ১৪৬ জন মাত্র ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। ক্লাইব ইহাদের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু নবাবের সৈন্য ইহাদের সহিত সম্মিলিত হইলে, চন্দননগর অধিকার বড় একটা সহজ ব্যাপার হইবে না। সুতরাং ক্লাইব কিছু ভগ্নোৎসাহ হইলেন। এসময়ে চন্দননগর আক্রমণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি ফরাসীদিগের সহিত শত্রুতা করিতে নিরস্ত হইলেন। ইংরেজদের রেসিডেণ্ট ওয়াট্‌স্‌ সাহেব নবাবের সঙ্গে ছিলেন। ক্লাইবের আদেশে তিনি নবাবকে জানাইলেন যে, ইংরেজেরা চন্দন নগর আক্রমণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা আর ফরাসীদিগের সহিত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইবেন না।

কিন্তু ক্লাইব মুখে যাহা বলিতেন কার্য্যে তাহা পরিণত করিতে জানিতেন না। সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া তিনি আপনার কর্ত্তব্য পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতেন। ইহাতে লোকলজ্জা, ধর্ম্মভয় বা সুনীতির অবমাননা, কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। যে কোন উপায়েই হউক, আপনার স্বার্থ সাধনাই তাঁহার অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার কার্য্য সাধনী বৃত্তি ন্যায়ের

দিকে চাহিয়া দেখিত না,উদারতার দিকে দৃক্‌পাত করিত না,লোক হিতৈষিতার দিকে মনোযোগ দিত না, আত্মসম্মানের দিকে দৃষ্টি রাখিত না, কেবল আত্ম-সাধনার তৃপ্তিতেই আপনি তৃপ্ত হইত। তিনি আজ যাহা বলিতেন, কাল তাহার বিপরীত আচরণ করিতেন, আজ যে প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ হইতেন, কাল সে প্রতিজ্ঞা পাশ ছিন্ন করিয়া ফেলিতেন। ঘটনা স্রোতের পরিবর্ত্তের সহিত তাঁহার চিত্তবৃত্তি পরিবর্তিত হইত। সুতরাং তাঁহার কথা ও তাঁহার অঙ্গীকারের কোন মূল্য ছিলনা। তিনি উচ্চশ্রেণীর সেনাপতি, উচ্চ শ্রেণীর শাসন কর্ত্তা ছিলেন,কিন্তু সাধুতার অভাবে মহাপুরুষের শ্রেণীতে স্থান পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই।

অসুবিধা দেখিয়া ক্লাইব নবাবকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি চন্দন নগর আক্রমণ করিবেন না, ফরাসীদিগের অনিষ্ট সম্বন্ধে উদ্যত হইবেন না। কিন্তু সহসা এই অসুবিধা দূর হইয়া সুযোগ ও সুবিধা ক্লাইবের হৃদয়ে গভীর আশা ও বিশ্বাসের রেখাপাত করিল। এই সময়ে অহম্মদ খাঁ দুরাণী দিল্লী আক্রমণ করিয়াছিলেন। অল্পবয়স্ক অপরিণতবুদ্ধি নবাব এই সম্বন্ধে আতঙ্কগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল, আক্রমণ কারী পাঠান ক্রমে বিহারে ও বাঙ্গালায় আসিয়া পড়িবে, সুতরাং তাঁহার আশঙ্কা বাড়িয়া উঠিল, তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া ক্লাইবের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। যে দিন নবাবের পত্র ক্লাইবের নিকট উপস্থিত হয়, সেই দিন ক্লাইব সংবাদ পাইলেন যে তিন খানি জাহাজ অনেকগুলি ইউরোপীয় সৈন্য লইয়া বোম্বাই হইতে ভাগীরথীর মুখে আসিয়া পঁহুছিয়াছে, আর একখানি জাহাজ আর এক দল সৈন্য লইয়া মান্দ্রাজ হইতে বালেশ্বরে উপনীত হইয়াছে। ক্লাইব এখন নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সাহসী হইলেন। এতদিন তিনি সৈন্য বলে প্রবল ছিলেন না,সুতরাং নবাবের কথাতেই সম্মতি প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন। এখন সৈন্যসমাগমের সংবাদে প্রফুল্ল হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বের আশা জাগিয়া উঠিল। তিনি নবাবের কাছে যে অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন, শান্তভাবে যে শান্তিময় কথায় নবাবকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গেলেন। ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, সুনীতির অবমাননা করিয়া ক্লাইব আবার চন্দননগর আক্রমণে উদ্যত হইলেন।

এখন লর্ড ক্লাইবের পার্শ্বে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে রাখিলে উভয়ের চরিত্রগত তারতম্য বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। ইংরেজ ও ফরাসী উভয়েই

সিরাজউদ্দৌলার রাজ্যে বাস করিতেছিলেন। উভয়েই শান্তভাবে আপনাদের অবলম্বিত কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন, ইহাই নবাবের ইচ্ছা ছিল। অধিকন্তু নবাব ফরাসীদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি প্রযুক্তই তিনি ফরাসীদিগের সাহায্যের জন্য টাকা পাঠাইয়া দেন, এবং এই প্রতিশ্রুতি প্রযুক্তই লর্ড ক্লাইবকে চন্দননগর আক্রমণে নিরস্ত থাকিতে অনুরোধ করেন। রাজ্যাধিপতির এই অনুরোধ রক্ষা করা লর্ড ক্লাইবের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু এই কর্ত্তব্য প্রতিপালনে ক্লাইবের মনোযোগ ছিল না, সিরাজউদ্দৌলা নিজের অধিকারে শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইতে ক্লাইবকে নিষেধ করিয়াছিলেন, চতুর ক্লাইব চাতুরী অবলম্বন করিয়া, নবাবকে আশ্বাস দিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা শান্তি প্রয়াসী, ক্লাইব শান্তি বিদ্বেষী। সিরাজউদ্দৌলা আশ্রিতের রক্ষাবিধানে যত্নশীল, ক্লাইব আশ্রিতের অনিষ্টসাধনে উদ্যত। সিরাজউদ্দৌলা সরল হৃদয়ে ক্লাইবের নিকট সরলতার আশা করিয়াছিলেন, ক্লাইব স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপূর্ব্ব চাতুরী ও প্রবঞ্চনার বলে তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা সরলভাবে ইংরেজ বণিকের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়াছিলেন, ক্লাইব সেই সরলতা ও সুবিধার বিনিময়ে তাঁহাকে প্রতারিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা সদ্ব্যবহারের সম্মান রক্ষক, ক্লাইব সাধুতার অমর্য্যাদাকারক। সিরাজউদ্দৌলা প্রতারিত, ক্লাইব প্রতারক। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কে? বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার অদ্বিতীয় অধিপতি। আর ক্লাইব কে? বাঙ্গালার একদল বিদেশী বণিকের একজন সামান্য সেনাপতি মাত্র। এই আশ্রিত সেনাপতি এক সময়ে আশ্রয় দাতা অধিপতিকে এইরূপ প্রতারিত করিয়াছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থাপন কর্ত্তা লর্ডক্লাইবের সমক্ষে তরুণবয়স্ক সিরাজের চরিত্র কতদূর উজ্জ্বল হইয়াছে, তাহা ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে।

রণতরীর অধ্যক্ষ ওয়াট্‌সন সাহেব পদগৌরবে ক্লাইব অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীতে নিবেশিত ছিলেন; সুতরাং ক্লাইব তাঁহার বিনা সম্মতিতে চন্দন নগর আক্রমণ করিতে পারিলেন না। এদিকে আডমিরাল ওয়াট্‌সনও নবাবের অনুমতি ব্যতিরেকে উপস্থিত বিষয়ে সম্মত হইলেন না। যাহা হউক, তিনি শেষে এবিষয়ে নবাবকে সম্মত করাইতে একখানি পত্র লিখিলেন। ফরাসীদিগকে সাহায্য করাতে পত্রে নবাবকে যথোচিত

ভৎর্সনা করা হইল। ইহার পর আডমিরাল লিখিলেন—"পাঠানের আক্রমণ নিবারণ জন্য আপনি পাটনায় যাইতেছেন; এজন্য আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন, আমাদিগকে চন্দননগর অধিকার করিতে অনুমতি করুন, আপনার ইচ্ছা হইলে আমরা আপনার সহিত দিল্লী পর্য্যন্ত যাইব। আমরা শপথপূর্ব্বক কি এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হই নাই যে, আমাদের এক পক্ষের বন্ধু ও শত্রু,অপর পক্ষের বন্ধু ও শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবে? এখন যদি আমরা এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করি, তাহা হইলে প্রবঞ্চকের শাস্তি বিধান কর্ত্তা ঈশ্বর কি আমাদিগকে শাস্তি দিবেন না?" পত্র পাইয়া নবাব বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তিনি যখন সন্ধিপত্রে স্বীকার করেন, তখন কখনও ভাবেন নাই যে, সেই পবিত্র সন্ধি পত্রের কথা এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইবে। অনুগত ও আশ্রিতের উচ্ছেদ সাধন কি প্রবঞ্চকের দণ্ড বিধাতা ঈশ্বরের অভিপ্রেত? অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক—ইংরেজের এই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যায় অধীর হইলেন। বিস্ময় ও অধীরতার সঙ্গে তাঁহার ক্রোধের সঞ্চার হইল। ফরাসীগণ বাঙ্গালায় শান্ত ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল—তাহারা কলিকাতায় ইংরেজদিগের অনিষ্টসাধনে উদ্যত হয় নাই, তথাপি ওয়াট্‌সন্ সাহেব পবিত্র সন্ধির নামে, দুর্জ্জনের শাস্তিদাতা ঈশ্বরের পবিত্র নামে, তাহাদের উচ্ছেদসাধন জন্য অনুরোধ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। ইংরেজের বর্ণিত নীতিশূন্য—ধর্ম্ম জ্ঞান শূন্য সিরাজউদ্দৌলা ন্যায় ও ধর্ম্মের এ অবমাননা সহিতে পারিলেন না। নিদারুণ ক্রোধের সহিত তিনি ইংরেজদিগের কথা রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন। যাহারা ছলে বলে ও কৌশলে নির্দ্দোষ ও নিরীহ লোকের সর্ব্বনাশে উদ্যত হয়, ঈশ্বরের সমক্ষে তাহারাই প্রবঞ্চক ও শাস্তির উপযুক্ত। নবাব এইরূপ প্রবঞ্চকের প্রবঞ্চনাজালে জড়িত না হইয়া আপনার হৃদয় বলের পরিচয় দিয়াছেন, আক্ষেপের বিষয় অধিকাংশ ইংরেজের ও তাঁহাদের ছন্দানুবর্ত্তী ভারতবর্ষীয়ের লিখিত ইতিহাসে এই হৃদয় বলের সমুচিত সম্মান রক্ষিত হয় নাই। ন্যায়পরতা ও দূরদর্শিতার অভাবে—পক্ষপাতিতা ও স্বার্থপরতার প্রভাবে ইহাদের লেখনী প্রায়ই অমৃতের বিনিময়ে গরল ধারা উদ্গীরণ করিয়াছে।

হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না?

আমার বোধ হয় বিধবা-বিবাহের দৃষ্টান্ত হিন্দু সন্তানগণ মুসলমান জাতির মধ্যেই প্রথম দেখিতে পাইয়াছিলেন। (অতি প্রাচীন কালের বিষয় বলিতেছি না) তৎপরে সভ্য, জ্ঞানবান ও সাম্যবাদী খ্রীষ্ট শিষ্যগণ মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষের অধিপতি হইলে পর দেশীয়গণ দেখিলেন যে ইংরেজ মহিলাগণ এক স্বামীর পরলোক গমনের পর অন্য স্বামী গ্রহণ করিয়া পরম সুখে হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইয়া থাকেন, অধিকন্তু ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়া হিন্দু সন্তানগণ এমন অনেকানেক রমণীয় বিষয় জানিতে পারিয়াছেন এবং পারিতেছেন যে, তাঁহারা নিতান্ত বিদ্যা ও গুণবতী হইয়া, ২।৪ টি সন্তান সন্ততি থাকিলেও বিধবা হইয়া স্বচ্ছন্দে অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন।

মুসলমান ও ইংরেজ জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত দেখিয়া এবং আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রেও মধ্যে মধ্যে, ২।৪ টি বিধবাবিবাহের কিম্বা দেবরাদিদ্বারা পুত্রোৎপাদনের বিষয় পাঠ করিয়া, আর বর্ত্তমান কালের বহুতর বিধবাকে সতীত্ব রক্ষণে ও ব্রহ্মচর্য্য পালনে অক্ষম দেখিয়া, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত যুবকদিগের মনে বিধবা বিবাহের অনুকূল ভাব জন্মে। তাঁহারা সভা করিয়া বক্তৃতাদিদ্বারা এবং লেখনীচালনে এই মত সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন। তন্মধ্যে যাঁহারা কেবল ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ তাঁহারা এবিষয়ের পোষকতার জন্য বহুল পরিমাণে বিলাতের বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও সাম্যবাদ প্রয়োগ দ্বারা বিধবা-বিবাহ উচিত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, আর যাঁহারা ইংরেজী ভাষার ন্যায় আর্য্যজাতির প্রাচীন উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা করিয়া হিন্দুশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া পুরাণাদি হইতেও বিধবাবিবাহের বিধি সংগ্রহ করিয়াছেন। পরদুঃখ-কাতর বিদ্যাসাগর মহাশয় যথার্থ পরদুঃখকাতরতায় বাধ্য হইয়াই, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত কার্য্য কি না, তদ্বিষয় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা স্বীয় মত যথেষ্ট প্রমাণিত ও প্রচারিত করিয়াছেন; বিধবাবিবাহ যে কলিকালের জন্য শাস্ত্র-সম্মত, তদ্বিষয় তিনি যথাসাধ্য দেখাইয়াছেন; বহু

বিবাহের প্রতিবাদ করিয়াও তিনি আপনার সুমহৎ হৃদয়ের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন বটে।

অনেক বালবিধবা নানা প্রকার পাপানুষ্ঠান করে এবং রাজবিধি দ্বারা সহগমন প্রথা রহিত হওয়াতে বহু মানাস্পদ বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু বিধবাগণের বিবাহ হওয়া উচিত বোধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা এরূপ প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই, যে বিবাহ করাই বিধবাদিগের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম; না করিলে, কোনরূপ প্রত্যবায় আছে; এবং ভরসা করি, শাস্ত্রেও মহর্ষি পরাশরাদি মুনি ঋষিগণ বিধবাগণের বিবাহাপেক্ষা যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যেরই অধিক প্রশংসা করিয়াগিয়াছেন, তিনিও তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্য পালনই শ্রেষ্ঠ মনে করেন।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, বিবাহবিষয়ে মুশলমানদের ন্যায় প্রথা অবলম্বন করিতে ২।১টী হিন্দু শাস্ত্রে নিষেধ নাই; তাই বলিয়া এমন পাপিষ্ঠা স্ত্রী কেহ আছেন কি, যে সন্তানাদি হইয়া বিধবা হইলে, কিম্বা সন্তানাদি ত দূরের কথা, স্বামীর প্রতি একবার পবিত্র প্রণয়ে আবদ্ধা হইয়া, আবার পরস্থলে অন্যপুরুষের নিকট বিবাহিতা হইতে পারেন? যে রমণী সেরূপ কর্ম্ম করিতে পারে, তাহাকে কুলবতী না বলিয়া কুলটার শ্রেণীতে গণনা করিলেই উত্তম হয়; সেই পাপিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়া যে পাষণ্ড আবার সংসার ধর্ম্ম পালনের আশা করে, সেও যে ঘোরতর মূর্খ এবং পবিত্র প্রণয়ের অবমানকারী তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বামীর নষ্ট মৃতাদি পাঁচটি অবস্থা ঘটিলে, বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ হইবার বিধি পরাশর সুস্পষ্ট রূপে প্রদান করিয়াছেন, এবং তদীয় মতই কলিতে অবলম্বনীয় তদ্বিষয়ে বিদ্যাসাগর যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন কিন্তু এসমস্ত অনুকূলতা থাকিলেও হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠে নাই।

নানারূপ ব্যভিচার স্রোত নিবারিত ও স্বামীভিন্ন অন্যদ্বারা পুত্রোৎপাদন রহিত হওয়ার পরেই, কলিকালের জন্য ঔরসাভাবে দত্তক ও কৃত্রিম পুত্রের পরাশর ব্যবস্থা দিয়াছেন; ক্ষেত্রজ পুত্রের উল্লেখ থাকিলেও হিন্দুসন্তানগণ তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন; তদ্রূপ ক্ষেত্রজ পুত্রের ন্যায় তাঁহারা কলিতে পরাশরমতে বিধবাদি স্ত্রীর পুনঃপরিণয়ে ব্যবস্থা থাকিলেও তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

কি পুত্র-শোকাতুরা জননী কি স্বামী-শোক-কাতরা পত্নী সকলেরই হৃদয় বেদনা প্রশমিত করিবার জন্য একটি মহৌষধ রহিয়াছে,—ধর্ম্মই মানব-হৃদয়ের শোক তাপাদির একমাত্র মহৌষধ। যিনি ধর্ম্মাত্মা তাঁহার মনে কোন প্রকার বিকার উপস্থিত হইতে পারে না। ধর্ম্মাচরণ দ্বারা বিধবাগণের হৃদয়ের প্রাপ্ত অগ্নি অবশ্যই শীতল হইতে পারে,—জগৎস্বামী ভগবানের চরণে প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিলে, স্বামীশোক অবশ্যই অনেকাংশে নিবারিত হয়।

অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া এখন মূল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। সাধারণ ভাবে বিবেচনা করিলে উপলব্ধি হয় যে পুরুষ যখন স্ত্রীবিয়োগে অন্যবার বিবাহ করেন, তখন স্ত্রীলোক কেন পতিবিয়োগে অন্য-পতিগ্রহণ করিতে পারিবেন না? অনেক স্থলে এমনও দেখা যায় যে পুত্র, কন্যা, এমন কি পৌত্র ও দৌহিত্রাদি থাকিলেও শেষ বয়সে, স্ত্রীর মৃত্যু হইলে পুরুষ ভার্য্যান্তর গ্রহণ করেন; ৮।৯ বর্ষীয়া বালিকা কেন বিধবা হইয়া যাবজ্জীবন অবিবাহিতা থাকিবেন?

পুরুষদিগের ঘোরতর পক্ষপাতিতাই এরূপ করিবার কারণ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্ব-বিষয়ে-নিস্বার্থপর ভারতীয় হিন্দুসন্তানগণ যখন পূর্ব্বকাল হইতেই বিধবাবিবাহপ্রথা সমাজে প্রচলতি হইতে দেন নাই, তখন কেবল স্বার্থপরতায়-পরিচালিত হইয়াই যে তাঁহারা বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইতে দেন নাই, একথা কোন মুখে বলা যায়? তাঁহাদের মনে কোন উচ্চাভিপ্রায় ছিল কি না দেখা উচিত। প্রাচীনকালের হিন্দুসন্তানগণ মুখে মুখে স্ত্রীস্বাধীনতা বলিয়া অনবরত চিৎকার না করিলেও, তাঁহারা যে স্ত্রীলোক-দিগকে অতি উচ্চদৃষ্টিতে দর্শন করিতেন, তাহার সহস্র প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। "যে গৃহে স্ত্রীলোক সকল অনাদৃতা হয় সেই গৃহে দেবতাও অপ্রসন্ন থাকেন।" ইত্যাদি বাক্য প্রাচীন হিন্দুগণ কেবল মুখে বলিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই কার্য্যেও অনেক দূর করিয়াছেন—তাঁহারা নিজেরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সংসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকিলেও দেবীর ন্যায় পবিত্রা রমণীদিগকে বিধবা হইয়াও আবার বিবাহিতা হওত আজন্ম সংসার কূপে ডুবিয়া থাকা বড় উত্তম মনে করিতেন না; তাঁহারা নিজেরাইত সংসারধর্ম্ম পালনাপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্যাচরণেই অধিক অনুরক্ত ছিলেন; সুতরাং পরাশর মতে কলিতে বিধবাদি স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহ সঙ্গত হইলেও তাহা অগ্রাহ্য করিয়া সহগমন ও ব্রহ্মচর্য্যই প্রচলন করিলেন। একজন ৫০ বর্ষীয় পুত্র-পৌত্রবান হিন্দুকে

হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না।

স্ত্রী বিয়োগে পুনরায় বিবাহ করিতে দেখিয়া এবং হয়ত তদীয় একটি ... বর্ষীয়া বিধবা কন্যাকে ব্রহ্মচর্য্য পালন অথবা স্থলান্তরে ব্রহ্মচর্য্য ... হইয়া ব্যভিচারপঙ্কে নিমগ্ন হইতে দেখিয়া, নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট স্বার্থপর প্রতীয়মান হয় সন্দেহ নাই; বস্তুতও এই প্রকার অভিভাবক স্বার্থপরই বটেন।

কিন্তু যাঁহারা প্রথমাবস্থায় হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করেন নাই, তাঁহাদিগকে স্বার্থপর কোনরূপেই বলা সঙ্গত নয়, তাঁহারা আপনারও বৃদ্ধ বয়সে কিম্বা পুত্র থাকিলে আর দারপরিগ্রহ করিতেন না।

তাঁহারা যে সর্ব্ববিষয়ে বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ লোক হইতে সহস্রগুণে ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; ভারতবর্ষ মুসলমান জাতি দ্বারা অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া অবধিই হিন্দুদের নানা প্রকার অধোপতন আরম্ভ হইয়াছে, এবং ধর্ম্ম ভাবেরও শিথিলতা ঘটিয়াছে; বোধ হয়, আর্য্যগণ যে গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা ধর্ম্ম সাধন ও তপোবনাশ্রম অধিক ভাল বাসিতেন এবং তাঁহাদের মনে যে সংসারাসক্তি হইতে ধর্ম্মাসক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যই সেই প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগের পরিচায়ক।

তৎকালে বর্ত্তমান কালের ন্যায় সাংসারিক সুখ মাত্র বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল না। অনেক হিন্দু সন্তান শুদ্ধ ধর্ম্ম কার্য্যের সহায়তা জন্যই বিবাহ করিতেন; তজ্জন্যই প্রাচীন কাল হইতে স্ত্রীর নাম সহধর্ম্মিণী, অপরন্তু পুত্রার্থেও অধিকাংশ হিন্দু সন্তান বিবাহ করিতেন "পুত্র প্রয়োজনে ভার্য্যা," এ প্রাচীন কথা—সকলেই জানেন। পুত্র প্রয়োজনে বিবাহ করিলেও হিন্দু সন্তানগণ সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ করিতে ক্ষান্ত থাকেন নাই; অনেক তপোধন হিন্দু সন্তান আবার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বাদি দোষ ঘটিলেও পুনর্ব্বিবাহ করিতেন না, এবং মধ্যে মধ্যে দুই চারি জনে ধর্ম্ম সাধনোদ্দেশে চির জীবনে এক বারও দারগ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করত জীবন যাপন করিতেন; ধর্ম্মের নিকট তাঁহারা বিবিধ প্রকার ইন্দ্রিয় সুখাদি ও স্ত্রী পুত্র সংসার পর্য্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন।

অতএব বিধবা-বিবাহের কোন শাস্ত্রে বিধি, এবং কোথাও বা নিষেধ থাকিলেও হিন্দু সন্তানগণ সেই বিধি নিষেধের বড় একটা ধার না ধারিয়া সাধারণ ভাবে এরূপ বিবেচনা করিয়া ছিলেন বোধ হয়, যে, বিধবাগণ

যখন পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই পতিহীনা হইয়া সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলেন, তখন আবার উহাদিগকে অনর্থক সংসারের পাপ হ্রদে ডুবাইয়া কাজ কি? বিশেষত নানা শাস্ত্রে যখন এরূপ কথিত হইয়াছে যে, "সাধ্বী বিধবা পুত্র ব্যতিরেকেও স্বর্গে যাইতে পারেন," এবং যখন পরাশর মুনির মত লইয়াই কলিতে বিধবাবিবাহের আয়োজন, তাহাতেও বিধবাগণের বিবাহ করা অপেক্ষা সহগমন ও ব্রহ্মচর্য্যেরই অধিক প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তখন বিবাহ নিষ্প্রয়োজন। শাস্ত্রাদি ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ ভাবে চিন্তা করিলেও উপলব্ধি হয় যে, সংসার করা অপেক্ষা ধর্ম্মাচরণই শ্রেষ্ঠ এবং বিধবা হইয়া আবার অন্য পুরুষকে বিবাহ করিয়া সংসার করা অপেক্ষা মৃত স্বামীর ধ্যানে ও পরমেশ্বরাধনায় সমস্ত জীবন যাপন করা কিম্বা স্বামী-শোক সহিতে না পারিয়া, স্বর্গকামনায় সহগমন করা প্রণয়ের চরমোৎকর্ষ বটে, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এ জন্য হিন্দু সন্তানগণ বিবাহ বিধি অগ্রাহ্য করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও সহগমনের পক্ষপাতী হইলেন। কিন্তু আজ কালের হিন্দু সন্তানগণ অনেকে যেরূপ জঘন্যাচরণাদি করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের বাল বিধবা কন্যা ভগিনী পুত্র-বধূ ইত্যাদিকে দেশাচারের ভয় বশত বিবাহ না দিয়া গোপনে গোপনে অনেক স্থানে যেরূপ ব্যভিচারের প্রশ্রয় দান করিয়া থাকেন, এবং আপনারা পুত্রাদি থাকিলে পত্নী বিয়োগ হইলে অনেক বয়সেও পুন দারপরিগ্রহণ করিয়া থাকেন, এ সকল দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাদিগকে ঘোর স্বার্থপর, মহাপাতকী এবং নিতান্তই দেশাচারের দাস বলিতে হয়।

যে পাষণ্ড পিতা অশীতি বর্ষ বয়সেও নিতান্ত-সাধ্য ইন্দ্রিয় দমনে অক্ষম হইয়া পত্নী বিয়োগে আবার বিবাহ করিয়া থাকে অথবা বিবাহ না করিলেও নানা প্রকার ব্যভিচার কার্য্য করিয়া থাকে, সে নরাধম কেমন করিয়া আপন বিধবা যুবতী কন্যার ব্রহ্মচর্য্য পালনে আশা করিতে পারে? সেই প্রকার ব্যক্তিই নিতান্ত দেশাচারের কৃতদাস এবং ঘোরতর পাপী— সেই প্রকার লোক দ্বারাই হিন্দু সমাজ অধঃপাতে গমন করিয়াছে।

পূর্ব্বকালে হিন্দু সন্তানগণ যেরূপ ধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন, তৎসময়ে যে, দেশে ব্যভিচার স্রোত বর্ত্তমান কালাপেক্ষা মন্দীভূত ছিল, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই; তৎসাময়িক আর্য্য সন্তান গণ ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগী হইয়া অতি কঠিন তপস্যাচরণ করিতে পারিতেন এবং ধর্ম্মের জন্য অম্লান

বদনে ভোগ সুখাদি পরিহারপূর্ব্বক অরণ্য-বাসী হইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না; সেই প্রকার পবিত্রতাময় সমাজে বাস করিয়া বালবিধবাগণ যে স্বচ্ছন্দে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে সমর্থ হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?

আবার শাস্ত্রে ও সামাজিক ব্যবহারাদিতে বিধবাদিগের আহার ব্যবহারাদির ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল যে সমস্ত নিয়ম নির্ব্বাচিত ছিল, তৎসমুদয় সর্ব্বতোভাবে পালন করিলে যে অনেক পরিমাণে ইন্দ্রিয় সংযম হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তু হায়! দুঃখের বিষয় কি বলিব, আজি কালি সহরবাসিনী ধনী লোকের বিধবা কন্যাদিগকে আহার ও পরিচ্ছদাদি বিষয়ে সেই পবিত্র নিয়মের অনেক অন্যথাচরণ করিতে দেখা যায়। কলিকাতা অঞ্চলের অনেক হিন্দু বিধবাকে গহনা ও উত্তম বস্ত্র পরিধান করিতে দেখিয়া অনেক সময় মনে ক্লেশ হয় ও চক্ষু যেন পীড়িত বোধ হয়।

সৎপরিবার মধ্যে বাস করিয়া সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে এবং আত্ম সুখাপেক্ষা না করিয়া সংসারস্থ সর্ব্ব লোকে দয়াবতী হইতে পারিলে, বিবাহে প্রয়োজন থাকে না; মৃত স্বামীকে ভাল বাসিতে পারিলে প্রণয়স্পৃহাও চরিতার্থ হইতে পারে; পতি বিদেশে থাকিলে যেরূপ তাঁহার প্রতি মন অধিক আকৃষ্ট হয় এবং অধিক প্রণয় জন্মে, তদ্রূপ মৃত স্বামীরও প্রতি অধিক প্রণয় হইতে পারে—সংসারে বাস করিয়া দুর্ভাগ্যবশত নানা প্রকার প্রণয়ের বাধা উপস্থিত হইতে পারে- অদৃষ্টক্রমে অনেকের পতি লম্পট, মদ্যপ ও স্ত্রীর প্রতি অনুরাগশূন্য হইতে পারেন, তজ্জন্য স্ত্রীরও তাঁহার প্রতি প্রণয়ের অল্পতা ঘটিতে পারে, কিন্তু পরলোকগত স্বামীকে ভাল বাসিতে কোন বাধাই নাই; কেবল মাত্র নিজের মনটি উন্নত করিলেই এ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে; স্বামীর স্বর্গীয় পবিত্র মূর্ত্তি ধ্যানে ও জগৎ স্বামী ভগবানের আরাধনায় জীবন শেষ করা অপেক্ষা পুনঃ পুনঃ বিবাহ করা কি ভাল?

হিন্দু বাল-বিধবার সঙ্গে আমাদের নয়ন মুগ্ধকর কুসুমের বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখিতে পাই। ফুল যেমন আপনার মনে আপনি ফুটিয়া থাকে, নিজের কোন প্রকার সুখের বাসনা না রাখিয়া চারি দিকে আপন মনোহর সুগন্ধ বিস্তার করিয়া থাকে, এবং ধার্ম্মিকের হস্তগত হইলে তদ্দ্বারা দেবারাধনা সাধিত হয়, সেইরূপ পবিত্রা বাল-বিধবাগণও নিজে কিছু মাত্র ভোগ সুখের আশা না করিয়া পরিবারের উপকারে জীবন কাটাইয়া থাকেন,

পরের ছেলেকে খাওয়ান, পরের সংসারের কাজ দিবারাত্র নির্ব্বাহ করেন এবং সৌভাগ্য ক্রমে মহৎ-হৃদয় অভিভাবকের নিকট সৎশিক্ষা পাইলে সম্পূর্ণরূপে দেবারাধনায় অর্পিত হন।

ফুল যেমন লম্পটের হাতে পড়িলে বার বনিতার কুন্তল ভূষণ হইয়া থাকে, হিন্দু বাল-বিধবাগণও মধ্যে মধ্যে সেই রূপ দুরাচারের প্রলোভনে পাপ-পঙ্কে কলঙ্কিত হয়।

আহা! কবে আবার আমাদের সমাজের এমন অবস্থা হইবে যে, নর নারী মিলিয়া সংসারকে কেবল মাত্র ধর্ম্ম সাধনার একটি কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া আপনাদের ঐহিক ও পারলৌকিক অশেষবিধ মঙ্গল সাধন করিবেন; ব্যভিচার, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাদি কবে হিন্দুসমাজ হইতে বিতাড়িত হইবে; কবে আবার পবিত্র হিন্দু বংশধরগণের মন এত দূর উন্নত হইবে যে, তাঁহারা পতি ও পত্নী বিয়োগে পুনঃ বিবাহ না করিয়া ও ব্যভিচার কার্য্যে লিপ্ত না হইয়া, মৃত পতি ও পত্নীর ধ্যানে ও পরমেশ্বরাধনাতে জীবন শেষ করিবেন, এবং নিজেরা সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়া পরহিত কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিবেন; হায়! স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ও স্বামী পুত্রাদি লইয়া সংসার করাই কি কেবল সুখের নিদান? এ সমস্ত ব্যতিরেকে পৃথিবীর নর নারীগণের হিত-সাধনে জীবন উৎসর্গ করিলে এবং ধর্ম্ম কার্য্যাদি করিলে কি মহান সুখ হয় না! স্থির ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, যে সেই অবস্থাই পরম সুখের মূল।

যাঁহার স্বামী কি স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিবেন তিনি অবশ্যই তৎসমভিব্যাহারে সংসার ও ধর্ম্ম সাধন করিবেন, কিন্তু যাঁহার ঈশ্বর-ইচ্ছাক্রমে পতি বা পত্নী বিয়োগ ঘটিবে, আমার মতে তাঁহার আর পতি কি পত্নী গ্রহণ করা উচিত নয়।

স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরই ব্যভিচার কার্য্য সমান দূষণীয়, তাহাতে ইহ-কাল পরকাল দুই দিকই বিনষ্ট হয়, যদিও আমাদের সামাজিক রীত্যনুসারে ব্যভিচারী পুরুষাপেক্ষা ব্যভিচারিণী রমণীর প্রতি অধিক ঘৃণা করা হয় বটে; কিন্তু পরম ন্যায়বান মহর্ষিগণ, হিন্দু শাস্ত্রাদিতে পাপের শাস্তি ভোগ উভয়তই তুল্যরূপ বর্ণনা করিয়াছেন; আমার সামান্য বিবেচনায় প্রতীত হয় যে,আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকের পক্ষে এ বিষয়ে অধিক শাসন থাকাতে স্ত্রীলো-কের লাভ ভিন্ন কিছুই ক্ষতি হয় নাই। সাম্যবাদীগণ বলিতে পারেন যে,পুরুষ ব্যভিচার করিতে পারে, স্ত্রীলোক ব্যভিচার করিতে পারিবে না কেন? কিন্তু

এ স্থলে বলা যায় যে, অনেক লোকত বিষ খাইয়া মরে, তবে তোমরাও মর না কেন? পুরুষ পাপ করিতেছে বলিয়া স্ত্রীলোকেরও পাপ না করিলে বড় সর্ব্বনাশ হইল না কি? বরং এজন্য স্ত্রীলোকগণের প্রতি আঁটা আটি থাকিয়া ভালই হইয়াছে, সন্দেহ নাই; সংসারে যে জিনিষ যত উৎকৃষ্ট, তাহার মন্দাবস্থাও ততই নিকৃষ্ট হইয়া থাকে; এ স্থলে আমি বলিতেছি না যে, পুরুষ ব্যভিচারী হইলেও কোন দোষ নাই কিম্বা পত্নী-বিয়োগে আবার বিবাহও করিতে পারিবেন, স্ত্রীলোকই কেবল সেই সুখে (দুঃখে) বঞ্চিতা থাকিবেন না; আমি কথনও এরূপ মনে করিতে পারি না। পুরুষের পক্ষেও স্ত্রীবিয়োগে আবার বিবাহ করা উচিত নয়। ব্যভিচারের কথা আর কি বলিব? সেত জ্বলন্ত নরক; ইচ্ছা করিয়া কি জীবিত প্রাণী নরকে ডুবিতে চায়?

তবে যদি পুরুষগণ এ সুমহৎ নিয়মের অন্যথাচরণ করিয়া থাকেন, তাই বলিয়া কি রমণীগণও সঙ্গে সঙ্গে ডুবিবেন? স্বভাবত রমণী জাতির মনত কোমলও বটে; সেই কোমল হৃদয়েও কি সুকোমল পবিত্র বিশুদ্ধ প্রণয়ের স্থান হইবে না? হায়! প্রণয় কি সংসারে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির নিকটই পণ্য দ্রব্য হইবে! হিন্দু বিধবাগণ! আপনারা কুসঙ্গ ও কদাচার পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গগামী পতি ও ভগবানের আরাধনায় জীবন উৎসর্গ করুন, দেখিবেন সংসার আপনাদিগের নিকট মস্তক অবনত করিবে।

ধর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র সুখের মূল, যদি বল সংসার না করিলে—স্ত্রী পুত্রাদি না হইলে ধর্ম্মসাধন হয় না; কিন্তু কেন হইবে না, আমিত বুঝিতে পারি না। নিজের সংসার না থাকিলেও ত পৃথিবীতে সহস্র সহস্র নর নারী আছে, নিজের পুত্র কন্যা না থাকিলেও ত পৃথিবীতে অনেক শিশু আছে তাহাদের সুখের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলে কি সুখ হইতে পারে না? এ স্থলে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, তবেত বিবাহ না করিলেও চলিতে পারে; কিন্তু সে বড় ভ্রান্ত মত, কেননা তদ্রূপ আচরণ সকলে করিলে সৃষ্টি হইতে পারে না; এবং উৎকৃষ্ট বৃত্তি প্রণয়ের অনুশীলন হইতে পারে না। তবে যদি দুই চারি জন ধর্ম্মাত্মা পুরুষ কি ধার্ম্মিকা রমণী লোক হিতার্থে কার্য্য করিবার বিশেষ কোন বিঘ্ন আশঙ্কাতে বিবাহ না করেন, তাহাতে সৃষ্টি রক্ষার অধিক কিছু আসিয়া যায় না; স্বেচ্ছাচারী কিম্বা স্বেচ্ছাচারিণী হইবার লোভে যাঁহারা বিবাহ না করেন, তাঁহারা নিতান্ত পাপিষ্ঠ সন্দেহ

নাই; কিন্তু সংসারের হিতের জন্য যদি কোন মহৎ-হৃদয় ব্যক্তি নিজের সুখেচ্ছা পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁহাকে দেবতার শ্রেণীতে গণনা করিতে হয়।

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, অতি বালিকাবস্থায় বিবাহ হইয়া অমনি বিধবা হইলে স্বামীর প্রতি প্রণয় জন্মিতে পারে না। অতএব সেই প্রকার বিধবাগণের সচ্ছন্দেই আবার বিবাহ হইতে পারে, তাহাতে প্রণয়ের অবমাননা করা হয় না। এ কথা বড় সঙ্গত মনে হয় না, কেন না হিন্দু বলিকাগণ যদি পঞ্চম বর্ষের পরই বিবাহিতা হন, এবং নিতান্ত দুর্ভাগ্য বশত দুই চারি বৎসরের মধ্যেই বিধবা হন, তবেই কি যথাশাস্ত্র যাঁহার সহিত বিবাহ হইয়াছে, তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া যাইতে পারেন?—তাঁহাদের সুবিমল ও সুকোমল মন হইতে কি পতির মূর্ত্তি অপনীত হইতে পারে? আর যথা শাস্ত্র যে বালিকার পাণি গ্রহণ করিলেন, দুর্ভাগ্য বশত বিবাহ মাত্র সেই বালিকার মৃত্যু হইলেই কি পবিত্র-হৃদয় যুবকের অন্তঃকরণ হইতে সেই মোহিনী বালিকা মূর্ত্তি তিরোহিত হইতে পারে? যদি মানুষ পশু না হইয়া যথার্থ মানুষই থাকে, তবে বিস্মৃত হওয়ার কথা নয়। বিবাহ কতদূর গুরুতর বিষয়, তাহা সকলেই ভাবিলে বুঝিতে পারেন, বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া কি, মৃত্যুতেই পতি ও পত্নীর স্মৃতি লোপ হইতে পারে? আর হিন্দু সমাজে যেরূপ রমণীগণের প্রতি নিয়ম আছে, যে স্বামীর মৃত্যু হইলে আর বিবাহ হইতে পারে না, তেমন পুরুষগণও স্ত্রীর মৃত্যু হইলে আর বিবাহ করিতে পারিবেন না, যদি এরূপ রীতি হয়, তবে স্বামী, স্ত্রীর মধ্যে বড় আশ্চর্য্য একটি মহৎ ভাবের সমাবেশ হইবে। কেন না জীবনে মরণে যাহাকে ভিন্ন আর অন্য পতি কি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিবার সাধ্য নাই এবং যাঁহাকে ভিন্ন আর অন্যকে হৃদয়েও ভাবা উচিত নয়, সেই ব্যক্তি যে কতদূর ভালবাসার পাত্র হইতে পারে, তাহা সকলেই একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারেন। আমাদের সমাজ যদি পূর্ব্বকালের পবিত্র নিয়ম সকল রক্ষা করিয়া নূতন ন্যায় সঙ্গত নিয়ম আদরের সহিত সমাজে প্রচলন করেন, তবে প্রভূত মঙ্গল হইবে, দম্পতি যদি এরূপ দৃঢ় বন্ধনে সংযোজিত হন, তবে দেখিবেন দাম্পত্য প্রণয় আরও শত গুণে বৃদ্ধি হইবে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, আমাদের দেশে হিন্দু বিধবাগণের বিবাহ হইতে পারে না; কাজেই মনের ইচ্ছা থাকিলেও বিধবাগণ আর বিবাহ করিতে

রেন না। এতদ্দ্বারা তাঁহাদের মহত্ত্ব কিছুই প্রকাশ পায় না, বিবাহের নিয়ম কিলে যে রমণী প্রলোভন দূর করিয়া মৃত স্বামীর ধ্যানে জীবন কাটাইতে রেন, তিনিই যথার্থ স্বামীর প্রতি প্রণয়বতী। পুরুষগণ যদি সাধ্যসত্ত্বে স্ত্রীর ত্যু হইলে অন্য স্ত্রী বিবাহ না করেন, তবে তাঁহাদিগের মহত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

একথায়ও আমি সম্মতি প্রদান করিতে পারি না। বিবাহ না করিতে পারিলেও অনেক বিধবা ব্যভিচারিণী হইতে পারে, যাঁহারা তদ্বিষয়ে বিরত তাঁহাদিগকেই প্রসংশা করিতে হয়; প্রলোভনের মধ্যে বাস করিয়াও যিনি কোন প্রকারে প্রলোভিতা হয়েন না, তিনিই যথার্থ মহৎ-হৃদয়া, স্বীকার করিলাম। কিন্তু সেতো শিক্ষা-সাপেক্ষ। দশবর্ষীয়া বালিকার নিকট প্রলোভনের দ্বার খুলিয়া দিয়া কোন্ মূর্খ তাঁহার মহত্ত্ব পরীক্ষা করিতে যায়। হায়! তেমন তেমন জ্ঞানী ব্যক্তিগণও প্রলোভন হইতে দূরে বাস করিতে বাসনা করেন। এরূপ হইলে আর অসৎ সংসর্গের ও সদ্দৃষ্টান্তের আবশ্যক কি? শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে পরে অবশ্যই প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছেন, যে "তোমাদের নেত্র যদি তোমাদিগকে কুপথে নেয়, তবে তাহা উৎপাটন করিয়া ফেল, কেন না তোমার চিরকাল অনন্ত নরক ভোগাপেক্ষা বরং চক্ষু নষ্ট হওয়া ভাল।"

মনুষ্যের মনের গতি বারিস্রোতের ন্যায়; একদিকের গতি রোধ কর, জল যেরূপ অন্যদিকে ছুটিবে, মনের বাসনা ও মনুষ্য জীবনের কার্য্য স্রোতও তেমন অন্য দিকে ছুটিয়া চলিবে। অতএব বিবাহের নিয়ম সমাজে প্রচলন করিয়া দিলে হিন্দু বিধবাগণ অনেকেই বিবাহিতা হইবেন। পুরুষদের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিলেই ত একথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। পুরুষের বিবাহের নিয়ম আছে, কয়জন যুবক—যুবক কেন, কয়জন বৃদ্ধ—স্ত্রী বিয়োগ হইলে, যুটিয়া উঠিলে, আবার বিবাহ না করিয়া থাকেন? সেরূপ রমণীগণও পুত্র কন্যা থাকিলেও বিবাহ করিতে থাকিবে। তবেই পবিত্র হিন্দুসমাজ শীঘ্রই যবন-সমাজের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে পথে বাঁধ থাকাতে দুচারি জন হিন্দু বিধবার জীবন যেমন পাপাকার্য্যে নষ্ট হয়, তেমন আবার সহস্র জনের মন ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যে সমাজে বিবাহের নিয়ম থাকিলেও রমণীগণ বিবাহ না করিয়া মৃত স্বামীর আরাধনায় জীবন কাটান, সে

তাঁহাদের নিজের মহত্ত্ব, তাঁহাদের সমাজের মহত্ত্ব কি? আমাদের হিন্দু-সমাজ মহৎ বলিয়াই পরাশর বিধিতে বিবাহ নিয়ম থাকিলেও তাহা প্রচলিত করিলেন না; এমন দুর্ব্বুদ্ধি কে যে সুনিয়ম সমাজ হইতে দূর করিয়া সেই স্থানে কুনিয়ম প্রচলিত করত বিধবাগণের মহত্ত্ব পরীক্ষা করিবে? আমাদের হিন্দুশাস্ত্রেত বিধবাবিবাহের বিধি আছেই এবং ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনেরও ত বিধি আছে, হিন্দু সন্তানগণ নিতান্ত বিশুদ্ধ হৃদয় হইয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়াই ঐ সকল অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্যামাসুন্দরী দেবী।

ঢাকা। ২৭নং বাঙ্গালা বাজার।

শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীর সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। স্থানাভাবই তাহার প্রধান কারণ। স্থলে স্থলে, দুই তিন চারি পৃষ্ঠা ক্রমাগত পরিত্যাগ করা গিয়াছে। প্রবন্ধের শৃঙ্খলা রাখিবার জন্য, কোন কোন প্যারাগ্রাফের আরম্ভের দুই একটি শব্দ পরীবর্ত্তিত করিতে হইয়াছে। কুত্রাপি ভাষার পরীবর্ত্তন করা যায় নাই। কলিকাতার সাবিত্রী লাইব্রেরি হইতে শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী 'বিধবাবিবাহ' বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায় পারিতোষিক পাইয়াছেন; তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহার ভাগ বিগত মাসের নবজীবনের শেষপ্রবন্ধের উপসংহার-রূপে উদ্ধৃত হয়।

সম্পাদক।

সূচিপত্র।

বর্ষশেষে দুই একটি কথা।

নবজীবনের একবৎসর পূর্ণ হইল। দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

বড়ই আহ্লাদের কথা, সকল সম্প্রদায়ের সুলেখকগণই নবজীবন পোষণ করিয়াছেন, আরও আহ্লাদের কথা সকল শ্রেণীর পাঠকেই আগ্রহের সহিত নবজীবন গ্রহণ করিয়াছেন। লেখক পাঠকের মর্য্যাদায় আজি আমরা অকিঞ্চন হইয়াও মর্য্যাদাবান্।

এত আহ্লাদের কথায় একটু বিষাদের কথা আছে। জনকত লোক সূতিকা হইতেই আমাদের উপর বিরূপ। ইঁহারা কথায় কথায় আমাদের উপর সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্ক আরোপ করিতে যত্নবান্। আমরা উত্তরে মুখ ফিরাইলে, বলেন, এই চলিল তিব্বতে; ইহারা এবার থিয়সফিষ্ট হইবে। পূর্ব্বমুখ হইলে বলেন, ঐ দেখ বুড়া ঋষিগণের না বুঝিয়া অনুকরণ করিতেছে, পশ্চিম মুখে ফিরিলে বলেন, এইবার ইহারা মক্কায় গিয়া ফতোয়া পড়িবে,—দক্ষিণমুখ হইলে, বলেন—যাক্, এইবার ইহারা যমালয়ে গেল।

এরূপে অঙ্কুশ ইঙ্গিত দেখিয়া আমাদের উপর যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্ক আরোপ করিতে চাহেন, আমরা তাঁহাদেরই নিকট আমাদের দীর্ঘজীবন কামনা করি; কেন না সেই দীর্ঘজীবনই কেবল তাঁহাদের অনর্থক আশঙ্কা তিরোহিত করিতে পারে। ভগবানের ভরসায় তাঁহাদের শাপে আমাদের বর হইবে।

ত্রুটি আমাদের বহুতর হইয়াছে; ইহাবার কথা বটে, কিন্তু শ্লাঘার কথা নহে; আমরা সকলের নিকট সেই অসংখ্য ত্রুটির জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করি। একটি কথা বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক; 'বড় গল্প নয়' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ জন্য, আমরা সত্য সত্যই দুঃখিত। অনেকে ভাসা ছাসারূপে প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে তাহাতে সম্প্রদায় বিশেষের উপর অযথা লক্ষ্য আছে; একটু ভাল করিয়া দেখিলেই সকলে বুঝিবেন, সেরূপ কোন লক্ষ্য নাই; সুতরাং আমরা সেজন্য দুঃখিত নহি। সুরুচি কুরুচির কথা তুলিয়া কেহ কেহ ভ্রূকুটি করিয়াছিলেন; সেজন্যও নহে। তবে গল্পটি যে ইংরাজি গল্পের অনুবাদ তাহা আমরা প্রকাশের সময় ধরিতে পারি নাই তজ্জন্যই দুঃখিত; ধরিতে পারিলে ওরূপ গল্প কখনই নবজীবনে স্থান পাইত না।

নবজীবনের আটকৌড়ে।

আটদিনে আট্‌কৌড়ে আছে পূর্ব্বাপরে,
নবজীবনের আট্‌কৌড়ে হল' সম্বৎসরে।
আটকৌড়ে বাট্‌কৌড়ে ছেলে আছে ভাল?
ছেলের মার কোল জুড়িয়ে
ছেলের বাপের মুখে চাল।

বাপে গালি দিয়া করে ছেলের আশীর্ব্বাদ
আত্মবন্ধুর খোসার করে যার যত বাদ।
চীৎকারে ধীৎকার দেয় ছন্দে বন্দে আর,
কুলোবাজায়ে ফেলেদেয় আঁতুড় ঘরের
পার।

এমন উৎসব আর কোন দেশে নাই
গরল দিলে আশীর্ব্বাদ এই দেশে ভাই।
তবে,
যাও লেগে তেগেতেগে যে যেখানে আছ
বাজাও কুলো ছিড়াও ধূলো
লম্ফে ঝম্পে নাচ,
গালাগালি চূণকালি কর মনের আশে
আহ্লাদে হাসিব মোরা জল্লাদের ভাষে।
নবজীবনের আটকৌড়ে পড়ে গেল ধূম,
চারিদিকে কুলোবাজে ধুড়ুম্ ধুড়ুম্
হুলস্থূল তোলপাড় হয় বঙ্গভূম
সেই রবে ভেঙ্গে যায় কুম্ভকর্ণ ঘুম
অঙ্গে বঙ্গে রঙ্গে ঢঙ্গে নানারূপে আজি
বাহিরিল শত্রুমিত্র নানা বেশে সাজি।
নেংটা পরী কন্ধে লয়ে রুচির বাহার দিয়ে
অঙ্গনেতে সঞ্জীবনী এলো সঙ্গী নিয়ে,
এম এ বি এল এলো কত উড়ায়ে পতাকা
ভুবন বিখ্যাত চিহ্ন অঙ্গে আছে আঁকা।
সঙ্গে তার শাস্ত্রী মিস্ত্রী ইস্ত্রী কারীগর
সাম্যভাবে কাম্যলাভে সব ধনুর্দ্ধর।
কাঁসাই ভাসায়ে এল নবীনা মেদিনী
ভারত করেছে মাটি তবু তেজস্বিনী;
বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য আসি উপস্থিত,
অষ্ট কপর্দ্দীর স্মৃতি প্রমাণ সহিত
সুরভি আইল মৃদু সুরভিসঞ্চারে
নীলপাড় লাগায়েছে গরবের ভরে।
সস্তাদরে কস্তাপেড়ে লম্বাকোঁচা দোল,
"এত সস্তা আর নাই" অহরহ বোল।
হাঁটু পাড়ি হামাগুড়ি এলো ভারতবাসী
তেই তেই থেই থেই গালি দেই হাসি
পাদমূলে বসি কেহ শিক্ষা লভে গিয়া,
গুরু গালি দিল এবে গুরুকে লইয়া।
শিক্ষা বটে দীক্ষা বটে কলির ব্যাভার,
আটকৌড়ে দিনে কাণ্ডজ্ঞান নাহি আর
গলা উঠে মুখ ছুটে লাজ টুটে এবে;
মন যে বা গালি দিবা ডর কিবা তবে।

তবে,
যাওলেগে তেগেতেগে যে যেখানে আছ
বাজাও কুলো ছড়াও ধূলো
লম্ফে ঝম্পে নাচ;
গালাগালি ঢলাঢলি কর মনের হাসে।
আহ্লাদে হাসিব মোরা জল্লাদের ভাষে
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে আছে ভাল
ছেলের মার কোল জুড়িয়ে
ছেলের বাপের মুখে ঢাল।
নাহি বোধ মানামান,
কেবল অসত্য প্রাণ
নিতান্ত নীচার্থ লঘুচিত্ত।
ভাষাকে সাজায় সাজে,
অলঙ্কারে, ঘসে, মাজে,
এসব লেখক বেশ্যাবৃত্ত।*
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে (নব)জীবন ভাল
পাঠকদের প্রাণজুড়ায়ে
লেখকদের উপর ঢাল।
নবজীবন সম্পাদক,
রাধাকৃষ্ণ উপাসক,
খেলে সেই সুচতুর খেলা,
হিন্দুধর্ম্ম উত্থাপক,
বিষ্ণু-ধর্ম্ম প্রচারক
কণিক মাকিয়াবেলি চেলা। †
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে,(নব)জীবন ভাল
পাঠকদের কোল জুড়ায়ে,সম্পাদকে ঢাল।

* "কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে,বঙ্গীয় পাঠক সমাজ এইরূপ কুলটাবৃত্ত, লঘুচিত্ত, আত্মসম্মান-বোধ-হীন লেখকগণেরই আদর ও প্রতিপত্তি বেশী।" প্রতিবাদ, নবজীবন সম্পাদক ও বিধবা বিবাহ। আলোচনা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

† "আর একটি বিষয় অক্ষয় বাবুকে কনগ্রাচুলেট করিতে ইচ্ছা হয়। সেটি অক্ষয় বাবুর সূক্ষ্মদর্শিনী, কণিক ম্যাকিয়াবেলি পদানুসারিণী

নবজীবন।

প্রথম ভাগ।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

প্রথম বৎসরের লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে
,, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	,, জানকীনাথ চট্টোপাধ্যায়
,, নবীনচন্দ্র সেন	,, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়
,, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	,, হেমচন্দ্র মিত্র
,, চন্দ্রনাথ বসু	,, নরেন্দ্রনাথ বসু
,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	,, ষষ্ঠীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
,, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	,, রামগতি মুখোপাধ্যায়
,, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	,, চিরঞ্জীব শর্ম্মা
,, চন্দ্রশেখর বসু	,, দীনেশচন্দ্র সেন
,, নীলকণ্ঠ মজুমদার	,, তারণবন্ধু ভট্টাচার্য্য
,, দেবেন্দ্র বিজয় বসু	,, মোহিনী মোহন দত্ত
,, কালিনাথ দত্ত	,, গোপালচন্দ্র চৌধুরি
,, রজনীকান্ত গুপ্ত	,, সিদ্ধেশ্বর রায়
,, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়	,, হেমচন্দ্র ঘোষ
,, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	,, গোবিন্দচন্দ্র দাস
,, প্রমথ নাথ বসু B. Sc. London.	,, গোবিন্দমোহন রায়
,, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	,, রসিকলাল রায়
,, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	,, বামদেব দত্ত
,, কালিবর বেদান্তবাগীশ	,, ঈশানচন্দ্র বসু
,, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়	শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী

কলিকাতা।

৫১ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, সাধারণী প্রেসে শ্রীউমাচরণ চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯২ সাল। মূল্য তিন টাকা মাত্র।

এই ত হিন্দু সমাজ,
এই পরিবার মাঝ,
পূতি গন্ধময়ী নারী, তাকি তুমি জান না?
কেবল ভাষার চোটে,
কেবল কথার জোটে,
পশার জাঁকাবে বলি, সত্য কথা মান না।*
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে (নব) জীবন ভাল?
সম্পাদকে গালি দিয়া, মনের দুঃখ ঢাল।
চিরকাল গেল বয়ে,
এবে যারা প্রৌঢ় বয়ে,
অনুবাদকেরে সাথী করি,
পড়ে মনুসংহিতা,
অথবা ভগবদ্গীতা,
তারা ধর্ম্ম প্রচারক! মরি!
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে, ছেলে ভাল
আছে?
প্রচারকে গালি দিয়া ভারতবাসী নাচে।
পুণ্যভূমি বারাণসী,
অন্নসত্রে অন্নরাশি,
ধ্বংশ করি অঙ্গপুষ্ট যার,
গৈরিক বসন পরি,
মুখে বলি শিব হরি,
সেই করে ধর্ম্মের প্রচার।*
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে দেখাও,
আন।
সকলকে ছেড়ে দিয়ে চূড়ামণিকে টান;
নাহি কিছু সৎসাহস,
নৈতিক ভীরুতাবশ,
জনগত স্বতন্ত্রতা নাই,
ঘোর আত্মম্ভরী তায়,
শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়,
সৎকর্ম্মে কেবল বালাই।†
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে আপ্তসার কর,
নবজীবনেরে রেখে, শিক্ষিতকে ধর।
বিধবার ব্রহ্মচর্য্য,
তব মুখে, অত্যাশ্চর্য্য,
তুমিই না শিক্ষিত? হা! ধিক্!
ধিক্ তব শিক্ষায়,
ধিক্ তব দীক্ষায়,
জীবনেতে ধিক্ ততো ধিক্।‡

বুদ্ধি। * * * * * * * * নবজীবন-সম্পাদক, বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারক, আদর্শ নায়ক নায়িকা রাধা-কৃষ্ণের উপাসক, হিন্দুধর্ম্মের উত্থাপক মহাশয় যে অতি সুচতুর লোক, তাহা না বলিলেও চলে।" ঐ ঐ ঐ

* "এ কথা যিনি বলেন, তিনি হয়, সাধারণ হিন্দু সমাজ ও হিন্দু পরিবারের কথা কিছুই জানেন না; অথবা জানিয়া শুনিয়া ভাষার চোটে, কল্পনার তরঙ্গে, পসার জাঁকানর লোভে সত্যের অপলাপ করেন। * * * * * * (হিন্দু) রমণীগণ সর্ব্ব প্রকার পূতিগন্ধ হইতে মুক্ত থাকিয়া নিষ্কাম হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম পালন করিতেছে, এ অসম্ভব কথা প্রচার কর কেমন করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি না।" ঐ ঐ ঐ।

* "আধুনিক ধর্ম্ম প্রচারক * * * * সম্ভবত প্রৌঢ় বয়সে কষ্টে অনুবাদকের সাহায্যে কিয়দংশ মনুসংহিতা বা ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়াছেন, নতুবা পুণ্যভূমি বারাণসীর অন্নসত্রে কিয়ৎকাল দেহ পুষ্ট হইয়া গৈরিক বসন পরিধানপূর্ব্বক ধর্ম্ম সমুদ্ধরণার্থ ব্রতী হইয়াছেন।" [ভারতবাসী ১৮ই জ্যৈষ্ঠ]

† "সৎসাহসের পরিবর্ত্তে নৈতিক ভীরুতা, জনবিশেষের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পরিবর্ত্তে ঘোর আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি বিশেষ দোষ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জীবনে পরিলক্ষিত হইতেছে।" [নব-মেদিনী। প্রবন্ধ 'তুমি না শিক্ষিত যুবক?'

‡ "* * * বিধবা বালিকার বিবাহ দেওয়া অন্যায়, তাহাদিগকে ব্রহ্ম-

আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে আছে ক'টি;
নবজীবনের দায়ে, এবার শিক্ষিতের কাটি।
আপনারা ভোগসুখে,
থাক দেখি মুখে মুখে
বিধবায় বল ব্রহ্মচর্য্য।
লঘুচেতা স্বার্থপর,
কাপুরুষ—পামর,
এই তব শিক্ষা পারম্পর্য্য। *
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে নবজীবন আন,
একজনকে ছেড়ে দিয়ে দশ জনকে টান।
শকুন্তলা অভিজ্ঞান,
জয়দেব গীতিগান
পড়ি কর শাস্ত্রের বিচার।
স্বর্গের দেবতাগণ,
পদক্ষেপে কুণ্ঠ হন,
নির্ব্বোধের সেথা অধিকার। †
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে আছে ভাল?
ছেলের মার কোলজুড়ায়ে,
ছেলের বাপের মুখে চাল।

ভ্রূণহত্যা পাপকর্ম্ম,
বঙ্গে সনাতন ধর্ম্ম,
ব্যাখ্যা পুন হইবে সভায়,
সুকুলীন বংশজাত,
এম এ উপাধি গত,
সভাপতি থাকিবেন তায়।
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে তুল ঘর
লেখককে ছেড়ে দিয়ে সভাপতিকে ধর।
গদ্যে পদ্যে কুলোরবাদ্যে বাঙ্গালা হল স্থুল,
বঙ্গাঙ্গনে প্রলয়ের হয় যেন ভুল।
সম্পাদক লেখকের প্রচারকের আর।
ক্রমেতে হইল এবে ত্রিকুল উদ্ধার।
শেষে বঙ্গবিধবার হইল খোয়ার,
প্রমাণ হলো ঘরে ঘরে হয় ব্যভিচার।
শতেকে নিরানব্বই বিধবা অসতী,
চীৎকারে বলিল বঙ্গে 'শ্রীপূঃ' মহামতি,
দেবানন্দ শান্তিপুর নাম মাত্র সার,
সাব্যস্ত সমস্ত বঙ্গ মেছুয়াবাজার।
শেষেতে সিদ্ধান্ত হল মিলি বিচক্ষণ,
বঙ্গদেশে সুজাতক নাহি একজন।
সুসিদ্ধান্ত তবু ক্ষান্ত নহে গণ্ডগোল;
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে চারিদিকে রোল,
কবি কহে না মিটিবে মিঠাই না পেলে
গিন্নি বলে এই লও হাতে হাতে পেলে।
তোমাদের গালাগালি আমাদের বর।
আশীর্ব্বাদ করি এবে সবে যাও ঘর।
ঘরে গিয়া গালাগালি কর মনের আশে,
আহ্লাদে হাসিব সবে জল্লাদের ভাষে।
এবার পেলে অল্পস্বল্প ভাল মুখে যাও,
ষষ্ঠী পূজায় দিব খই—বাকি যাহা চাও।

চর্য্য অবলম্বন করিতে শিক্ষা দেও বলিয়া চীৎকার করেন, স্বদেশ হিতৈষী বলিয়া বুক ফুলাইয়া চলেন, আপনাকে অতি সুশিক্ষিত লোক বলিয়া মনে করেন। "ধিক্ ইহাদের শিক্ষা, ধিক্ ইহাদের জীবন।" ঐ ঐ ঐ

* "বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে এক শ্রেণীর হৃদয় বিহীন, লঘুচেতা, স্বার্থপর, কাপুরুষ লোক জন্মিয়াছে, যাহারা সেইরূপ পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া ও উৎকৃষ্ট ভোগসুখে নিজেরা থাকিয়া, দুঃখিনী হিন্দু বিধবাদিগকে উপদেশ দিতেছেন, "তোমরা ব্রহ্মচর্য্য কর, ব্রহ্মচর্য্যের সমান গুণ নাই।" ৩রা জ্যৈষ্ঠ, পতাকা।

† "অভিজ্ঞান শকুন্তলা উত্তর রাম চরিত, জয়দেব গোস্বামীর গ্রন্থ পাঠ করিয়া শাস্ত্রালোচনায় হওয়া বিড়ম্বনা। * * * কিন্তু ইংরাজি কথায় বলে যেখানে স্বর্গের দেবতাগণ পাদক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হন, নির্ব্বোধেরা সবেগে সেস্থানে গিয়া উপস্থিত হয়।" সোমপ্রকাশ ২০শে জ্যৈষ্ঠ।